Talkes delivered by Swami Samarpanananda on ***Kathopanishada***
before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at
Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math.
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্
আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।।২/১/১।।

(পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখী করে বিনাশ করেছেন, সেইজন্য জীব বাহ্যবিষয় সমূহকেই দর্শন করে অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। কোনও বিবেকী মুক্তি অভিলাষ করে বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করে সর্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মাকে তথা আত্মস্বরূপকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন।)

অনেক সাধু মহাত্মারা কঠোপনিষদকে বলেন আত্মারামের কৌটা। ঠাকুরের যেমন আত্মারামের কৌটা আছে, তেমনি তাঁরা বলেন এই আত্মারামের কৌটতে আত্মতত্ত্বের সারকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। এই মুহূর্তে যে মন্ত্র আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, এইসব মন্ত্রের জন্যই কঠোপনিষদকে আত্মারামের কৌটা বলা হয়।

আগের অধ্যায়ে আমরা একটি মন্ত্রকে পেরিয়ে এসেছি, যে মন্ত্রে বলছেন *এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽহত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।* মন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, যাঁরা সূক্ষ্মদর্শি, বুদ্ধি যাঁদের প্রখর, তাঁরা জিনিষটা যেমনটি আছে তেমনটি দেখতে পান। সূক্ষ্ম বুদ্ধি যা, স্বচ্ছ বুদ্ধিও তাই, সাত্ত্বিক বুদ্ধিও তাই। এই প্রখর বুদ্ধি বৈষয়িক প্রখর বুদ্ধি নয়, কিসে লাভ হবে, কিসে লোকসান হবে এই বেনে বুদ্ধির কথা বলছেন না। অন্ধকার ঘরে একটা ছোট্ট জিনিষ হারিয়ে যাওয়ার পর সেই জিনিষকে খুঁজে বার করার জন্য আমাদের মনকে কত কেন্দ্রিত করতে হয়, দৃষ্টিকে কত প্রখর করতে হয়। ঠিক তেমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মাকে ধরতে হলে মনকে আরও কত বেশি কেন্দ্রিত করতে হবে আমরা ধারণাই করতে পারব না। জীবানুকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, জীবানুকে দেখার জন্য মাইক্রোস্কোপে ফেলে মনকে অনেক সূক্ষ্ম করতে হয়। আত্মা সব জায়গাতেই আছেন কিন্তু *গূঢ়োঽহত্মা ন প্রকাশতে*, তাঁকে দেখা যায় না, কেউ তাঁর ব্যাপারে জানতেও পারে না। উপনিষদে এই আলোচনা মাঝে মাঝেই চলতে থাকে।

আত্মার ব্যাপারে এই জিনিষগুলো আমরা যে একেবারেই কিছু জানি না তা নয়, কিন্তু জানলেও উপলব্ধি হয় না। কারণ আমাদের মন অত্যন্ত স্থুল আর মন স্থুল জিনিষের মধ্যেই সব সময় থাকতে চায়। ধ্যানের গভীরে ঋষিদের মনের পর্দাগুলো এক এক করে সরে যেতে থাকে আর সেখানে তাঁদের আধ্যাত্মিক সত্যগুলো ভেসে ওঠে। ধ্যান থেকে নেমে বাহ্য জগতে যখন ফিরে আসছেন, তখন তাঁদের মনে এই ভেবে করুণার উদয় হয় যে, আহা! এই পরম শান্তি, এই অনাবিল সুখ কাছে থাকা সত্বেও মানুষ কিভাবে অন্ধকারে কিলবিল করছে, কত দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে। তাঁরা তখন চেষ্টা করেন মানুষ যাতে আত্মার রহস্যের সন্ধান পায়।

নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক এ্যলবে ক্যামুর 'প্লে' একটি নামকরা উপন্যাস। উপন্যাসে তিনি এক জায়গায় বর্ণনা দিচ্ছেন, যদি চিন্তা করা যায় মানবজাতির একটা দল কোন ভাবে একটা গুহার ভেতরে ঢুকে গেছে। আর ওখানে শত শত বছর থাকতে থাকতে ওরা ভুলেই গেছে মাটির উপর বাস করা কাকে বলে। ঐ অন্ধকার গুহার ভেতরে তাদের সব কিছুই আছে, ওখানেই তাদের অস্তিত্ব। কিন্তু সেখানে কঠিন ঠাণ্ডা আর আলোর অভাব, ওর মধ্যেই মারামারি, লড়াই করে তারা বেঁচে আছে। ওদের মধ্যে একজন লোক অনেক কষ্ট ও মেহনত করে কোন রকমে ঐ গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে চারিদিকে ঝলমলে আলো, মিষ্টি বাতাস, সবুজ মাটি, চারদিকে সব কিছুর পরিপূর্ণতা দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে। লোকটি দৌড়ে আবার গুহার ভেতরে ঢুকে নিজের লোকদের বলছে 'আমরা সবাই কেন অন্ধকারে এত কষ্টের মধ্যে পড়ে থাকব, চল আমরা সবাই এখান থেকে বেরিয়ে আলোর রাজ্যে চলে যাই। অনন্তের দ্বার উন্মুক্ত, গুহার বাইরে অনন্ত সুখ পড়ে আছে, সেখানে কত আলো, কত বাতাস'। বেশির ভাগ গুহার বাসিন্দারা লোকটির কথা বিশ্বাস করতে চাইছে

না, তাকে পাগল ভাবছে। একজন দুজন বলছে 'তোমার কথা শুনতে খুবই ভালো লাগছে, আমিও তোমার কথা মানতে চাইছি, কিন্তু এইমাত্র একটা ঘোষণা হয়েছে যে, রেশনের দোকানে পাঁউরুটি পাওয়া যাচ্ছে। অনেক দিন ধরে পাঁউরুটি আসছিল না, এতদিন পরে এসেছে। রুটিটা নিয়ে আসি, তারপর না হয় তোমার কথা শুনব'। মানব জীবন এই রকমই, এক অন্ধকার গুহার ভেতরে আমরা কিলবিল করছি। এর মধ্যেই নিজেদের অস্তিত্বকে আমরা সীমিত করে রেখেছি। আমাদের নিজেদের কিছু কিছু নির্দিষ্ট ভাব-বিচার আছে, আমার খাওয়া-দাওয়া এই এই, আমার আচার ব্যবহার এই এই, আমার বন্ধু এই রকম, আমার নাম-যশ এই রকম, আমার নিরাপত্তা এতটুকু, এটুকু যদি সব ঠিক মত চলে তাহলে আমরা বলি, আমার সব ঠিক আছে, আমি বেশ আছি। ঐ অতটুকুর মধ্যে কেউ আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলে আমাদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

ঋষিরা আমাদের বলতে চাইছেন, অনন্তের দুয়ার তোমার জন্য খোলা পড়ে আছে, কেন তুমি মিছিমিছি কেঁদে মরছ। বেশির ভাগ লোক শুনতেই চাইবে না, শুনলেও বলবে পাগলের প্রলাপ। ক্বচিৎ কেউ যদি শোনে, বলবে কথা তো ভালই বলছেন, শুনতেও ভালো লাগছে। ব্যস্ ওখানেই শেষ, আবার স্ত্রী-পুত্র, নাতিপুতি, অফিস, বন্ধুর মধ্যে সিঁদিয়ে যাচ্ছে। ঋষিরা একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলে বলে আমাদের মনকে অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখী করাতে চাইছেন। যখন বলছেন *এষ সর্বেষু ভূতেষু*, সবারই মধ্যে অনন্ত আত্মা বিদ্যমান। সবার ভেতর আছে বলছেন, তাহলে আমাকে দেখিয়ে দিন। একজন এসে ঠাকুরকে বলছে, ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে আমাকে দেখা দিন, আমাকে কেউ দেখিয়ে দিক। ঠাকুর বলছেন, তোমাকে দেখাতে তাঁর ভারি বয়ে গেছে। গুরু, অবতার সব কিছু করে দিতে পারেন কিন্তু আমাদের বুদ্ধিকে তিনি কি করে সূক্ষ্ম করে দেবেন! ফাঁকিবাজ ভক্তরাই বলে, তিনি চাইলে সব কিছু করে দিতে পারেন। তিনি কিছুই করতে পারেন না, কেন তিনি করতে যাবেন, তাঁর ভারি বয়ে গেছে। নিজেকেই খেটে খেটে নিজের বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম করতে হবে। আমাদের সমস্যাটা কোথায় দেখাবার জন্য উপনিষদ আবার নতুন করে এখানে শুরু করছেন।

যে একাগ্র বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে জানা যায়, সেই আত্মাকে জানার প্রতিবন্ধক কি? সাধনার পথ মূলতঃ দুটি। একটা দ্বৈতবাদের পথ, আরেকটি অদ্বৈতবাদের পথ। দুটো পথের তফাৎ কোথায়? একটা বড় তফাৎ আছে, এই তফাৎটা না ধরতে পারলে দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাকে ঠিক বোঝা যাবে না। আর দর্শনের এই খুঁটিনাটি জিনিষগুলো না জানা থাকলে উপনিষদ বোঝাও খুব কঠিন হয়ে যাবে। অদ্বৈতবাদ তার সিদ্ধান্ত থেকে বলছে, স্বাভাবিক জ্ঞান, স্বাভাবিক আনন্দ তোমার ভেতরেই আছে। কিন্তু কোন কারণে ঐ জ্ঞানের উপর একটা প্রতিবন্ধক এসে গেছে। কি কারণে প্রতিবন্ধক এসেছে, সেই কারণের খোঁজ নেওয়ার তোমার দরকার নেই, শুধু এটুকু জেনে নাও প্রতিবন্ধক আছে। আচার্য শঙ্কর চন্দন কাঠের উপমা দিচ্ছেন, চন্দন কাঠে স্বাভাবিক সুগন্ধ আছে, কিন্তু অনেকদিন সে জলের সংসর্গে থাকলে ওর মধ্যে দুর্গন্ধ এসে যায়। এই দুর্গন্ধ সরানো হবে কি করে? আচার্য তখন বলছেন চন্দন কাঠ বা অগুরুকে যদি ঘষা হয় তাহলে আবার যেমনটি ছিল তেমনটি হয়ে যাবে। রান্নার বাসন নোংরা হয়ে যায়, তার একটা স্বাভাবিক গুণ আছে, নোংরা বাসনকে ঘষে মেজে দিলে তার আগের অবস্থা ফিরে আসবে। অদ্বৈতবাদ পুরোপুরি এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। অদ্বৈতবাদ বলছে, তোমার যে প্রকৃত স্বভাব, বাস্তবিক তুমি যা, সেটা মলিন হয়ে গেছে। এই মলিনতাকে যে কোন উপায়ে ধুয়ে মুছে বা ঘষে মেজে পরিষ্কার করতে হবে। অথবা বলতে পারা যায় তোমার শুদ্ধ স্বভাবের উপর একটা প্রতিবন্ধকতা এসে গেছে। নদীতে বাঁধ দেওয়া আছে, নদী থাকা সত্ত্বেও আমরা জল পাচ্ছি না, অদ্বৈতবাদ বলছে ঐ বাঁধকে ভেঙে দাও। বৃষ্টির জলকে ক্ষেতে আল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, ঐ জল আর কোন ক্ষেতে যেতে পারছে না। চাষী যদি ক্ষেতে জল আনতে চায় তাহলে তাকে জলের ঐ প্রতিবন্ধকটা সরিয়ে দিতে হবে।

দ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ অন্য ভাবে চলে। দ্বৈতবাদের সামনে একটা আদর্শ আছে, সবাইকে ঐ আদর্শের মত হতে হবে। আদর্শের মত হওয়ার জন্য তাকে চেষ্টা করে করে ঐ গুণগুলো তার ভেতরে নিয়ে আসতে হবে। তাঁরা বলেন, ভগবানের যা যা গুণ আছে, অনন্ত করুণা, অনন্ত ভালোবাসা, সর্বজীবে দয়া এই গুণগুলো আমার ভেতরে জাগাতে হবে। অনেক সাধু, মহাত্মাদের মধ্যেও এই গুণগুলো পাওয়া যাবে। দ্বৈতবাদীরা বলেন, তুমি জন্ম থেকেই অপূর্ণ, চেষ্টা করে করে তোমার ভেতর এই গুণগুলো নিয়ে এসে তুমি পূর্ণ হয়ে যাও। এই গুণ সমূহ তোমার মধ্যে জাগরিত হয়ে গেলে তোমার ঈশ্বর দর্শন হয়ে যাবে। খ্রীষ্টানদের মতে মানুষ জন্ম থেকেই

পাপী, কারণ তাদের পূর্বপুরুষ আদম আর ঈভ স্বর্গের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছিল, সেই পাপ এখনও মানুষ বহন করে চলেছে। নিজের চেষ্টার দ্বারা অনেক কিছু করে করে তোমাকে ঈশ্বরের উপযুক্ত হতে হবে। দ্বৈতবাদে আমার ভেতরে যে অশুদ্ধতা, আমার যা কিছু দোষ সবটাই সত্য। অদ্বৈতবাদে আমার ভেতরের অশুদ্ধতা, দোষ সবটাই মিথ্যা। দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদের এটাই মূল তফাৎ। অদ্বৈতবাদ দৃপ্ত কণ্ঠে বলে দিচ্ছে পূর্ণতাই তোমার স্বাভাবিক, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ ভালোবাসা তোমার মধ্যেই বিদ্যমান কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধক লাগান আছে, সেইজন্য তুমি নিজেকে অপূর্ণ, অজ্ঞান মনে করছে। প্রতিবন্ধকটা সরিয়ে দাও, দেখবে হুড়মুড় করে সব বেরিয়ে চলে আসছে। কিন্তু দ্বৈতবাদীর মতে তুমি জন্ম থেকেই অপূর্ণ, তুমি পাপী, তোমার মধ্যে অনেক মলিনতা ইত্যাদি। তোমাকে চেষ্টা করে গুণগুলো তোমার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। কঠোপনিষদ ঘোর অদ্বৈতবাদী গ্রন্থ, আচার্য শঙ্কর ঘোর অদ্বৈতবাদী। কঠোপনিষদ বলেই দিচ্ছেন *এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহহত্মা ন প্রকাশতে*, তোমার ভেতরে সেই আত্মা পূর্ণ রূপে বিদ্যমান, কিন্তু একটা প্রতিবন্ধক আছে বলে আত্মা প্রকাশিত হতে পারছেন না। প্রতিবন্ধকের জ্ঞান যদি একবার হয়ে যায়, অনেক সময় আমরা যেমন বলি, দেখতো জলটা আসছে না কেন, কোথায় আটকাচ্ছে। একবার যদি জেনে যায় এই জায়গাটায় আটকাচ্ছে, প্রতিবন্ধকটা জেনে গেল, এরপর মেরামত করতেও বেশি সময় লাগে না, অবশ্য যদি সারিয়ে নেবার ইচ্ছে থাকে। বেশির ভাগ লোকের ইচ্ছেই নেই। এই মন্ত্রে এই প্রতিবন্ধকের আলোচনা করছেন।

কঠোপনিষদের এটি একটি অন্যতম খুব মূল্যবান ও ব্যতিক্রমী মন্ত্র। *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূঃ*, কঠোপনিষদে কিছু কিছু শব্দ বা নাম যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, পরের দিকে সেই শব্দ বা নামের অর্থ পাল্টে যাওয়াতে সঠিক অর্থের অনুধাবন করতে গিয়ে অনেক সংশয় এসে যায়। 'স্বয়ম্ভূ' সেই রকম একটি শব্দ। ইদানিং আমরা জানি স্বয়ম্ভূ শিবের একটি নাম। কিন্তু পরম্পরাতে শিবকে অনেক পরে স্বয়ম্ভূ বলা শুরু হয়েছে। উপনিষদে স্বয়ম্ভূ মানে যিনি আছেন, সেই আদি পুরুষ, যিনি চৈতন্য স্বরূপ, সর্বশক্তিমান ভগবান। আর বেদান্তে যিনি সর্বশক্তিমান তিনিই পরম সত্তা, তিনিই আত্মা। পরমসত্তা, সর্বশক্তিমান, আত্মা এগুলোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। স্বয়ম্ভূর আরেকটি অর্থ, যিনি স্বাধীন, যাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটিও নড়ে না। সেই স্বয়ম্ভূ কি করলেন? প্রাণীর সৃষ্টি করে তিনি তাদের মধ্যে কয়েকটা ছিদ্র করে দিলেন। আর তার সাথে ভেতরের সঙ্গে সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন। ভেতরের সাথে সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে মানুষের দৃষ্টি বাইরের দিকেই থাকে, ভেতরের দিকে তার আর দৃষ্টি যায় না। কিন্তু কখন সখন সৃষ্টিতে কোন ধীর পুরুষ এসে বলেন আমি ভেতরের দিকেই তাকাব, তখন তিনি ঐ ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেন। এটাই আচার্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন *পরাঞ্চি পরাক্ অঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি*।

প্রত্যগ্ আর পরাগ্ এই দুটো শব্দ শাস্ত্রে প্রায়ই আসে, প্রত্যগ্ মানে ভেতরে আর পরাগ্ মানে বাইরে। পর বলতেই বোঝায় বাইরে বা দূরে। *পরাঞ্চি পরাক্ অঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি*, *পরাঞ্চি* মানে বহির্মুখী, যে জিনিষগুলি বাইরের দিকে যায়। অঞ্চন মানে যাওয়া, বাইরের দিকে যে জিনিষগুলি যায় তাকে *পরাঞ্চি* বলে। *পরাঞ্চি খানি*, *খানি* শব্দে 'খ' এর অনেকগুলো অর্থ হয়, খ মানে আকাশ, ব্রহ্মকেও খ বলা হয় আবার খ মানে ছিদ্র, যেখান থেকে খনি শব্দ এসেছে। যে জিনিষকে ছেঁদা করে বার করা হয় তাকে বলা হয় খনিজ। সেইজন্য বলছেন খানি, খানির আরেকটা অর্থ ইন্দ্রিয়। কারণ সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিদ্র রয়েছে, চোখ, কান, নাক সব ছিদ্র। মনের যে শক্তি, মনের মাধ্যমে আত্মার যে প্রকাশ, এই ছিদ্রগুলি দিয়ে মনের সব শক্তি পালিয়ে যাচ্ছে। কেল্লার মধ্যে দশটা দরজা রাখা হয়েছে। দরজাগুলো যদি সব সময় খোলা থাকে রাজা যতই সবাইকে কেল্লার মধ্যে আটক রাখতে চান না কেন, লোকজন দশটা দরজা দিয়ে বেরোতেই থাকবে আর বাইরের অবাঞ্ছিত লোকজন ঢুকতে থাকবে, রাজার কিছুই করার থাকবে না। যদি রাজাকে কোন পদক্ষেপ নিতে হয়, প্রথমে তাঁকে কেল্লার দরজাগুলো বন্ধ করতে হবে। এইজন্যই এগুলোকে ইন্দ্রিয় বলে। আত্মা, যিনি চৈতন্য স্বরূপ, মন দিয়ে যখন চৈতন্য শক্তি প্রকাশিত হন আর বস্তুর প্রতি যখন ধাবিত হন, তখন সেটাকেই ইন্দ্রিয় বলে। শেষমেশ আত্মা ছাড়া কিছু নেই, আত্মার শক্তি ছাড়া, আত্মার জ্ঞান ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁর প্রবৃত্তিটা অন্য রকম হয়ে যায় তখন তাঁর মনটা পাল্টে যায়। আমরা চাইলেই যে ইন্দ্রিয় অন্য রকম কিছু করে দেবে তা করবে না, এটাই তার স্বভাব। যেমন অগ্নির স্বভাব দহন করা, জলের স্বভাব নীচের দিকে যাওয়া, হাল্কা

জিনিষের স্বভাব উপরের দিকে যাওয়া, ভারী জিনিষের স্বভাব নীচের দিকে আসা, ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই হল, ইন্দ্রিয় তার নিজের বস্তুর দিকে ছুটে যাবে।

ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই বাইরের দিকে যাওয়া। অন্য দিকে যিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্বদা স্বতন্ত্র, সর্বদা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য বলা হয় যিনি পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনি জানেন আমি সেই আত্মা, যে আত্মা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত আর সবারই ভেতরে বিদ্যমান, তিনিও পরমেশ্বরের সাথে এক হয়ে যান। তিনি মহিমান্বিত হয়ে যান, মানুষ তাঁর পূজা করে। এই কারণে আমাদের কাছে অবতারত্ব মানা কোন সমস্যা হয় না, অন্য দিকে বিদেশীদের কাছে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। কারণ আমাদের কাছে যিনি পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জেনে গেলেন আমি সেই সত্তা যে সত্তা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত আবার সব কিছুর মধ্যেও ব্যপ্ত হয়ে আছেন, তিনি সেই ঈশ্বরই হয়ে গেলেন, কারণ ঐ জ্ঞানের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। যিনি স্বয়ম্ভূ, যিনি জ্ঞানী, আর যাঁর জ্ঞান আছে তাঁর শক্তি আছে, জ্ঞান আর শক্তি এক, তিনি সর্বশক্তিমান, সেই তিনি হিংসিত করে দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে কেটে দিয়েছেন। কেটে দিয়েছেন মানে, তুমি যখন বাইরের দিকেই দৌড়াতে চাইছ তাহলে বাইরের দিকেই দৌড়াতে থাক, ভেতরের দিকে আর আসতে হবে না।

সেইজন্য কি হয়? *তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্*, ইন্দ্রিয় বাইরের জিনিষ গুলিকেই অনুভব করে, *নান্তরাত্মন্*, ভেতরে যিনি অন্তরাত্মা তাঁকে তারা কখন জানতে পারে না। রাজা কারুর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে বলে দেয়, যাও তুমি বাইরে দারোয়ানি কর। তার মানে সে রাজমহলে আর প্রবেশ করতে পারবে না। *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূ* এই মন্ত্রের প্রথম দুটো পঙতি এই জন্য খুব মজার যে, এই জিনিষটাকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটা হল, কঠোপনিষদে আখ্যায়িকার ব্যবহার করা হয়েছে, সেইজন্য এটাকে আখ্যায়িকা রূপে দেখান হয়েছে। মানুষকে বোঝানর জন্য যেন বলতে চাইছেন ইন্দ্রিয়গুলো স্বাভাবিক ভাবেই বাইরের দিকে যায়, যার জন্য ইন্দ্রিয় কখনই ভেতরের জিনিষকে জানতে পারে না। এর আগের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছিল ইন্দ্রিয় থেকে আরও সূক্ষ্ম মন, মন থেকে আরও সূক্ষ্ম বুদ্ধি। সেখানে জিনিষটাকে একভাবে আলোচনা করেছিলেন। এখানে সূক্ষ্ম স্থূল কিছু না বলে বলছেন, স্বয়ম্ভূ হিংসিত করে দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভেতর থেকে কেটে দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়কে হিংসিত করাটা এত ব্যাপক যে, ঈশ্বর ছাড়া এই জিনিষ কেউ করতে পারেন না। কেন ভেতর থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি জানি না। এটাকে মায়া বলতে পারি, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলতে পারি, প্রকৃতির এটাই নিয়ম বলতে পারি, মূল কথা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ভেতরের খবর আমরা কেউ জানি না। এখানে একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যিনি শুদ্ধ আত্মা, যিনি চৈতন্য সত্তা তিনি নিজে থেকে সব কিছুকে দূরে করে দিয়েছেন। আরও গভীর ভাবে বোঝানর জন্য এভাবে বলছেন।

একটি প্রচলিত কাহিনীর সাথে এই মন্ত্রের খুব মিল পাওয়া যায়। বলা হয়, ভগবান মানুষ তৈরী করার পর তাকে সব রকম গুণ দিয়ে দিলেন, তার সাথে তাদের আত্মজ্ঞানটাও দিয়ে দিলেন। আত্মজ্ঞান মানে, তুমি যে ঈশ্বরের সাথে এক, এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে দিয়ে দিলেন। দেবতারা তখন খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাঁরা ভগবানকে গিয়ে বললেন 'হে প্রভু! আপনি যে মানুষের মধ্যে আত্মজ্ঞান দিয়ে দিলেন যার ফলে এরা দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, অসুর, দৈত্য সবারই রাজা হয়ে বসবে। মানুষের মধ্যে আত্মজ্ঞান দিয়ে খুব অবিচার করা হয়েছে'। ভগবান বললেন 'একবার যখন আমি দিয়ে ফেলেছি, এরপর আর আত্মজ্ঞানকে মানুষের থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না'। দেবতারা বললেন 'আপনাকে একটা কিছু তো উপায় করতে হবে। কারণ মানুষ যদি জেনে যায় আমি কে, এরপর তো ওকে আর কোন দিন দাবিয়ে রাখা যাবে না'। ভগবান তখন বললেন 'তাহলে আত্মজ্ঞানটা কোথাও লুকিয়ে রাখ'। দেবতার এরপর আত্মজ্ঞানটা লুকিয়ে রাখার জন্য, চাঁদে চলে গেল, সূর্যে চলে গেল, গভীর জঙ্গলে চলে গেল, সমুদ্রের তলদেশে চলে গেল। সব জায়গায় গিয়ে দেবতারা দেখছেন মানুষের যা ক্ষমতা এরা সব জায়গাতেই পৌঁছে যাবে। তখন দেবতারা মিলে ঠিক করল, এক কাজ করা যেতে পারে, মানুষের ভেতরেই ঢুকিয়ে দাও। মানুষ বাইরে সব জায়গাতেই খুঁজে বার করে নিতে পারবে কিন্তু নিজের ভেতরে কোন দিন খুঁজতে যাবে না। দেবতারা মহা খুশী, এতো দারুণ ব্যাপার হবে। তখন আবার সবাই ভগবানকে গিয়ে বললেন 'আপনি আত্মজ্ঞানটা এদের ভেতরেই ঢুকিয়ে দিন। এরাও কোন দিন ভেতরের দিকে তাকাবে না আর আমাদেরও কোন দিন জয় করতে পারবে না'। তবে থেকে আত্মজ্ঞান মানুষের মধ্যেই আছে।

ভেতরের দিকে কোন দিন সে অনুসন্ধান করতে চায় না, তাই আত্মজ্ঞানকেও আর পায় না। মানুষ সব জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে, সূর্যের সব খবর জেনে যাবে, চাঁদে পৌঁছে যাবে, মঙ্গলে গ্রহে মহাকাশযান পাঠিয়ে দেবে, সমুদ্রের ভেতরের সব খবর বার করে আনবে কিন্তু নিজের ভেতরের খবর কোন দিন জানবে না। সুখের জন্য মানুষ বিশ্বের যেখানে খুশী চলে যাবে, নিজের লেজে আগুন লাগিয়ে শান্তির খোঁজে চারিদিকে দৌড়াবে। নিজের লেজের আগুন নিবিয়ে দিলেই যে শান্তি হবে সেটাও মানুষ জানতে পারছে না। কারণ মানুষ বলতে বোঝায় মন আর ইন্দ্রিয়। *আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্,* আগের বল্লীতেই এই মন্ত্র পেরিয়ে এসেছি, ইন্দ্রিয় আর মনের যে সংযোগ তাকেই আমরা আমি বলে মনে করছি। কিন্তু ইন্দ্রিয় আর মনের পেছনে যে আত্মা আছেন তাঁর খবর আমরা কখনই জানতে পারছি না। মন আর ইন্দ্রিয় কোথায় আর যাবে, ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই হল নিজের বস্তুর দিকে দৌড়ান। আর মন বেচারা ইন্দ্রিয়ের সাথে এমন বাঁধা হয়ে আছে যে কিছু করার ক্ষমতা তার নেই।

এক পঞ্চাশোর্ধ মহিলার পাঁচটি নাতি, নাতিদের তিনি খুব স্নেহ করেন। নাতিগুলি স্বভাবে এত চঞ্চল যে সারাটা দিন ওরা খেলা করেই কাটায়, কিছুতেই শান্ত রাখা যায় না। দিদিমার মধ্যে অনেক গুণ, কবিতা লিখতে পারেন, ছবি আঁকতে পারেন, ভালো সেলাই জানেন, সুন্দর রান্না করেন। কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নাতিরা সারাটা দিন দৌড়াতে থাকে, ওদের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে দিদিমাও ক্লান্ত হয়ে পড়েন, রাত হলেই অবসন্ন শরীর নিয়ে আর কিছু করতে পারেন না, ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন নাতিরা আগেই উঠে খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। আবার সারাটা দিন ওদের পেছনে ছুটতে হবে, তাদের খাওয়াতে হবে, স্নান করাতে হবে, ওদের সাথে ক্রিকেট খেলতে হবে, ওরা যা যা করবে দিদিমাকেও সারাটা দিন ওদের সাথে তাল দিয়ে যেতে হবে। একদিন কোন এক মহাপুরুষ দিদিমাকে দেখে সব বুঝতে পেরেছেন, এতো ভারী অন্যায়। মহিলা বললেন আমার তো কোন পথ নেই, আমি এদের ছাড়তে পারব না, এরা আমার, আমি তাদের। তখন তিনি বাচ্চাগুলোকে বুঝিয়ে বলছেন, তোমরাও উৎপাত কর কিন্তু দিদিমাকে দিনে কয়েক ঘন্টার জন্য কিছুক্ষণ একটু রেহাই দাও। তখন একটা সমঝোতা করে নিয়ে ইন্দ্রিয়গুলো কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হতে শুরু করল। ঐ দু-এক ঘন্টায় দিদিমা এবার কিছু কিছু কাজ করতে শুরু করলেন। একবার যখন বুঝিয়ে-ভাজিয়ে ইন্দ্রিয়কে কিছু সময়ের জন্য শান্ত করা গেছে, এবার আরও কিছু সময়ের জন্য ওদের শান্ত করে দেওয়া যাচ্ছে, দু-এক ঘন্টা থেকে এখন চার পাঁচ ঘন্টা শান্ত করে দেওয়া যাচ্ছে। এরপর ধীরে ধীরে মনের শক্তি যত প্রকাশ হতে শুরু হল, তখন দেখছে এই মন দিয়ে কত কিছুই হচ্ছে। তারপর দিদিমা ঠিক করে দিলেন, দেখ বাপু! তোমাদের সাথে এবার থেকে আমি দু ঘণ্টাই খেলতে পারব, বাকি সময় আমাকে আমার নিজের মত কাজকর্ম করতে দিতে হবে। এইভাবে করতে করতে নিজেকে ধীরে ধীরে নাতিদের থেকে দিদিমা পুরো মনকে তুলে নিচ্ছেন। কিন্তু এখানে পাঁচটা নাতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলোই প্রধান, আমি যাই করে নিই না কেন, যতক্ষণ আমি ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে থাকব আমার কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না।

কিন্তু *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্*, কখন সখন কোন ধীর পুরুষ আসেন। ধীর বলতে বাংলায় বোঝায় স্থির, কিন্তু আচার্য এর অর্থ করছেন বুদ্ধিমান। ধী মানে বুদ্ধি, ধীমান মানে যার বুদ্ধি আছে। তিনি কেমন ধীর পুরুষ? আচার্য ধীর পুরুষের বর্ণনা করছেন *প্রতিষ্ঠিতোঃ প্রবর্তনিব ধীরো*, তিনি এমন বুদ্ধিমান, এমনই ধৃতিমান যে তিনি বলছেন নদীর স্রোতকে ঠেলে আমি এর উৎসে পৌঁছে দেব। ধীর পুরুষের এত বুদ্ধি, এত তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা যে তিনি গঙ্গাকে গঙ্গাসাগর থেকে ঠেলে গঙ্গোত্রীতে পৌঁছে দিচ্ছেন। কখন সখন কোন পুরুষ এসে যাবেন, যিনি বলবেন আমার এই অস্তিত্বকে আমি মূলে পৌঁছে দেব, এই ধরণের পুরুষরাই ধীর পুরুষ। এই ধীর পুরুষ তখন প্রত্যগাত্মাকে জানতে ইচ্ছা করেন *প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্*। আত্মা অনেক রকমের হয়। আত্মার খুব নিকৃষ্ট রূপ হল পরাগ্ আত্মা। পরাগ্ আত্মা মানে শরীরের বাইরের যে জিনিষকে মানুষ আমি বলে মনে করছে। মানুষ মনে করছে আমার স্ত্রী না থাকলে আমি শেষ, একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে, মেয়েটিকে মনে করে ঐ আমার সব কিছু, ও যদি না থাকে আমি শেষ। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় অমুক চাষী আত্মহত্যা করেছে। চাষীরা কেন আত্মহত্যা করছে? সব লোভের জন্য। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দেনা করে চাষে লাগাচ্ছে। সরকার চারিদিক থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে এভাবে যাতে চাষীরা না মরে। তাও কেন চাষীদের বিষপান করতে হচ্ছে? বীজের জন্যও ঋণ নিচ্ছে, সারের জন্যও ঋণ নিচ্ছে, জলের জন্যও ঋণ নিচ্ছে সব কিছুর জন্য ঋণ করেই যাচ্ছে আর ভাবছে একবার যদি ফসলটা বাজারে ফেলে দিতে পারি আমি রাজা হয়ে

যাব। চাষীরা চাষের জন্য মরছে না, মরছে তাদের লোভের জন্য। আগেকার দিনেও খরা হত, বন্যা হত কিন্তু কোথাও শোনা যেত না চাষীরা আত্মহত্যা করছে। খরাতেও চাষীরা চাষ করে যেত, বন্যা হলেও বসে থাকত না। ঠাকুরও বর্ণনা করছেন, জাত চাষা ফসল হোক আর না হোক সে চাষ করে যাবে। কিন্তু এখন সবাই চাইছে আমাকে রাতারাতি বড়লোক হতে হবে, আমাকেও সব কিছু পেতে হবে। এরাই বালবুদ্ধির, যারা কোন নারীর জন্য, কোন পুরুষের জন্য, কিছু টাকার জন্য বা কোন কিছু পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করছে। গীতায় বলছেন *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে*। সম্মানিত লোকের পক্ষে কখন মরে যাওয়াকে শ্রেয় বলছেন? যখন সে ধর্ম ছেড়ে অধর্মের পথে নেমে পড়ে আর তার সম্মানের হানি হতে যাচ্ছে। তাও আমাদের অনেক প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে, ভুল হয়ে গেছে প্রায়শ্চিত্ত করে নাও। যারা কটা টাকার জন্য বা স্ত্রী মরে গেল, সন্তান মরে গেল আর গলায় দড়ি দিয়ে দিচ্ছে, বিষ খেয়ে নিচ্ছে এরা হল সব থেকে নিকৃষ্ট। কারণ সে নিজের অস্তিত্ব, নিজের আত্মাকে টাকা-পয়সা, স্ত্রী পুত্রের মধ্যে দেখছে। এদের থেকে একটু উপরে হল অসুররা, যারা বাইরের জিনিষের থেকে সরে এসে নিজের দেহ ইন্দ্রিয়কেই মনে করে এটাই আমি। দেহকেই আত্মা মনে করাকে যদি অসুর বলা হয় তাহলে সেদিক দিয়ে আমরা সবাই হয় অসুর না হলে মহামুর্খদের দলে। সত্যিই তাই, এখানে ধামাচাপা দেওয়ার কিছু নেই, আমরা বেশির ভাগই হলাম বোকা আর তা নাহলে অসুর। এটাকেও পরাগ্ আত্মা বলা হয় যদিও দেহকেই আত্মা মনে করে। এর আরেক ধাপ যাঁরা এগিয়ে যান তাঁরা *প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্*, ভেতরে যিনি আত্মা আছেন, সেই আত্মাকে জানতে ইচ্ছা করেন।

এই ধরণের *কশ্চিদ্ধীরঃ* পুরুষরা তখন কি করেন? *আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন*, নিজের চক্ষুকে তাঁরা আবৃত করে দেন। আচার্য এখানে বোঝাচ্ছেন আত্মা সব সময় প্রত্যগ্ অর্থেই হয়। বোঝাবার জন্য রূঢ় আর ব্যুৎপত্তি এই দুটো শব্দকে নিয়ে এসেছেন। রূঢ় মানে প্রচলিত অর্থ আর ব্যুৎপত্তি বলতে বোঝাতে চাইছেন, শব্দকে বিশ্লেষণ করার পর সেখান থেকে যে অর্থটা বেরিয়ে আসে। সচরাচর শব্দের দু ভাবে অর্থ করা হয় – প্রচলিত অর্থাৎ পরম্পরাতে কি অর্থ বলা হয়ে এসছে আর ব্যুৎপত্তির দিক থেকে কি অর্থ হয়। অনেক সময় রূঢ় আর ব্যুৎপত্তির অর্থটা একটু পাল্টে যায়। যেমন ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রের ব্যুৎপত্তি করলে ব্যঘ্রের অর্থ হয় যে বিশেষ রূপে আঘ্রাণ করে। এই নিয়ে মজার কাহিনী আছে। একটি ছেলে অনেক দিন সংস্কৃতের এক পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিখছিল। ছেলেটি একদিন জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল, সেখানকার লোকেরা তাকে সাবধান করে দিল 'পণ্ডিত মশাই এই জঙ্গল দিয়ে যাবেন না, এখানে ব্যাঘ্র আছে'। সংস্কৃত শেখা ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি করতে বসে গেল 'এরা ব্যাঘ্র বলছে, তার মানে জঙ্গলে এমন কোন জন্তু আছে যে আমাকে বিশেষ ভাবে শুঁকে নেবে। ঠিক আছে, শুঁকে নিয়ে আমাকে চলে যাবে এতে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই'। জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় বাঘ যখন এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন বেচারীর মনে পড়ল ব্যাঘ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি এভাবেও হয় 'কশ্চিদ হননে', ঘ্রাণ ধাতু কখন কখন মৃত্যুর অর্থেও হয়। কিন্তু রূঢ় অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে যদি দেখত তাহলে বেচারা বেঁচে যেত, ব্যাঘ্র মানে তোমাকে গিলে ফিলবে। আচার্য আত্মার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে লিঙ্গপুরাণ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছেন আত্মার অর্থ সব সময় প্রত্যগ্ অর্থেই হয়। আর রূঢ় অর্থে, আত্মার প্রচলিত অর্থ যা সাধারণ লোকেরা বোঝে তাতেও আত্মাকে প্রত্যগ্ রূপেই বোঝায়। আত্মার অর্থ যখন পরাগ্ রূপে করা হয় তখন বুঝতে হবে সে একেবারেই মুর্খ, এদের আলোচনার মধ্যে আনা যায় না।

এই ধীর পুরুষরা তখন *আবৃতচক্ষুঃ* হয়ে যান। এখানে চক্ষু বলতে সব কটি ইন্দ্রিয়কেই উপলক্ষ করা হয়েছে। শুধু যে চোখে ঠুলি দিয়ে বাকি ইন্দ্রিয়গুলোকে খুলে রাখা হয়েছে তা নয়, চোখে ঠুলি দেওয়া মানেই সব কটি ইন্দ্রিয়ের কার্যকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একই লোক বহির্জগতে ভোগ করে যাচ্ছে আর অন্তর্জগতেও বিচরণ করছে, এই জিনিষ কখনই সম্ভব নয়। স্বামীজী আমেরিকায় কথা প্রসঙ্গে বলছেন, কিছু দিন আমি যদি হিমালয়ে গিয়ে থাকি আমার ভেতর আবার সেই শক্তি ফেরত চলে আসবে। কেশব সেনের নামে বা আরও কয়েকজনের নামে ঠাকুর বলছেন, এদের যোগ আর ভোগ দুইই আছে। কিন্তু ঠাকুর যে যোগের কথা বলছেন, এই যোগ জ্ঞান নয়, ঐদিকে প্রবৃত্তি আছে। ভোগ থাকা মানে ইন্দ্রিয়ের জগতে বাস করা, ইন্দ্রিয় জগতে যতক্ষণ বাস করবে ততক্ষণ প্রত্যগ্ আত্মার জ্ঞান হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ দুটোই সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। বাইরের জগতে ঘুরঘুর করছে, জগতের রস আস্বাদ করছে, আর মাঝে মাঝে অন্তর্জগতের কথা ভাবছে, চিন্তা করছে আর মনে করছে আমার হচ্ছে, এরাও কখনই আত্মজ্ঞানের দিকে

এগোতে পারে না। আমরাও যখন একাগ্র ভাবে কোন কাজে ডুবে থাকি, তখন কোন প্রিয়জন এসে কথা বললেও বিরক্ত অনুভব করি। ঠিক তেমনি যিনি নিজেকে প্রত্যগ্ আত্মাতে একাগ্র করার দিকে এগোচ্ছেন, তার পক্ষে আর ইন্দ্রিয় জগৎ থেকে আনন্দ নেওয়া সম্ভবই নয়। এর খুব ভালো দৃষ্টান্ত হলেন ঠাকুর, যেভাবে তিনি বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে গুটিয়ে নিচ্ছেন, এই জিনিষ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যতটা ওদিকে ছাড় দেওয়া হবে ততটা ওজনে কম পড়বে। অন্য দিকে স্বামীজী আবার সব কিছুই করতেন, বাইরের জগতেরও খবর রাখতেন, সংবাদপত্রও পড়তেন। কিন্তু তাঁর সাধনার সময়, যখন তিনি আত্মপোলব্ধির জগতে বিচরণ করছিলেন, ঐ সময় তিনি নিজেকে সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। একই সাথে সাধনাও করছে আর অন্যান্য কাজও করে যাচ্ছে, এভাবে কিছুই হবে না। স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বা মঠের যে অন্যান্য খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসীরা ছিলেন এনাদের একটা pattern ছিল, যেটাতে ওনারা কাজও করছেন আবার জপ-ধ্যানও করছেন আর গ্রন্থাদি রচনাও করতেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর কাছে গ্রন্থ রচনা করা বা অনুবাদের কাজ করাটা বহির্জগৎ ছিল না, সেটাও তাঁর কাছে অন্তর্জগৎ ছিল। উপনিষদ বা অন্যান্য গ্রন্থ রচনার কাজটাও তাঁর কাছে ধ্যান। কিন্তু কেউ নিউজ রিপোর্টিং করছে, বাইরের সব খবরা-খবর রাখছে ঐ ভাবে বহির্জগতকে অন্তর্জগতে নিয়ে যাওয়া যায় না।

সন্ন্যাসীও যদি খুব চালাক চতুর হন, সাংসারিক বুদ্ধি খুব ভালো, সংসারের সব কাজ খুব চটপট করে দেন, বুঝতে হবে তাঁর সন্ন্যাস জীবনে কিছু গোলমাল আছে। একবার এক আশ্রমের এক সাধুকে কোন কাজে বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা হচ্ছে। তিনি যে স্টেশন থেকে যাবেন, সেখানকার সব ট্রেনের টাইমিং আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী এসে হড়হড় করে বলে দিলেন, আর যেখানে যাবেন সেখান থেকে লিঙ্ক ট্রেন আরও কত রকমের পাওয়া যেতে পারে সেটাও বলে দিলেন। সাধু খুব অবাক হয়ে ব্রহ্মচারীর সব বিবরণ শুনলেন, শোনার পর বলছেন – বাইরের জগতের সব খবরই দেখছি জানা আছে, অন্তর্জগতের কোন খবরই নেই। সাধুর কথা শুনে ব্রহ্মাচারী খুব লজ্জিত হয়ে গেলেন, মনে মনে একটু রাগও হয়েছে, টাইমটেবিল না দেখে মহারাজের এত সাহায্য করে দিলাম আর উল্টে তিনি এরকম কথা বলছেন! এখন সেই ব্রহ্মচারীর অনেক বয়স হয়ে গেছে, উনি যখন পেছন ফিরে নিজের জীবনের এই ঘটনার কথা ভাবেন, দেখছেন সেই মহারাজ তখন ঠিক কথাই বলেছিলেন। বাইরের লোকদের এসব কথা বলতে গেলে তারা আবার অন্য অনেক ধরণের উপমা দিয়ে দেবেন। যেমন ঠাকুরকে একজন বলছেন, কেন, চৈতন্য মহাপ্রভুও তো ভোগ করেছিলেন। সেখানে মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন, ঠাকুর চমকিত হইয়া বলিলেন, ইত্যাদি। এগুলোই বিষয়ী লোকেদের কথা, বিষয়ীরা এভাবেই কথা বলে। আমাকে নিজেকে ঠিক করতে হবে আমি কি পেতে চাই। আমি কি প্রত্যগ্ আত্মাকে জানতে চাই? যদি জানতে চাই, তাহলে বহির্জগৎ থেকে মুখটা ঘুরিয়ে আমাকে অন্তর্মুখী হতে হবে।

আচার্য তাই বলছেন, মন যখন বাইরে দৌড়ায় তখন বহির্জগতের জ্ঞান হয়, অন্তর্জগৎ তখন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে। সেই মন যখন অন্তর দিকে ধাবিত হয় তখন প্রত্যগ্ আত্মার জ্ঞান হয়। অন্তর্জগতের দিকে মন সবার ধাবিত হয় না, *কশ্চিদ্ধীরঃ,* ক্কচিৎ কখন সখন কেউ আসেন যাঁরা প্রত্যগ্ আত্মাকে জানতে চান। গীতায় ভগবানও বলছেন, *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে,* হাজার মানুষের মধ্যে ক্কচিৎ কখন এমন কেউ আসেন যিনি বলেন আমি আত্মার সাক্ষাৎ করতে চাই। আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকটা কি? এই প্রতিবন্ধককে নিয়েই প্রথম থেকে আলোচনা চলছে, প্রতিবন্ধক ইন্দ্রিয়গুলি। ইন্দ্রিয় সব দৌড়াচ্ছে, ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা সব কিছুকে জানছি সেইজন্য এরা ভেতরের দিকে আসতে পারে না। কিন্তু কারা ইন্দ্রিয়ের কার্যকে বন্ধ করতে চাইছেন? *অমৃতত্বমিচ্ছন্,* যিনি অমরত্ব পেতে চাইছেন, আত্মজ্ঞান পেতে চান। এবার ইন্দ্রিয়ের উপরেই তিনি একটা প্রতিবন্ধক লাগিয়ে দিলেন, *আবৃতচক্ষুঃ।* এখানে অমৃত শব্দকে আক্ষরিক অর্থে নিলে সমস্যা হয়ে যাবে, তখন বলবে তিনি শিব হয়ে যান, অমৃত মানে স্বর্গের দেবতারা যা পান করেন, কিন্তু তা নয়, রূপকের মাধ্যমে বলছেন। যার মূল অর্থ, মানুষ তার স্বভাবেই ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে থাকে, ইন্দ্রিয়গুলি তাকে বাইরের জগতের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মানুষ যদি আত্মজ্ঞান পেতে চায়, যদি সে অমরত্ব পেতে চায়, এটাই এখানে বলছেন *অমৃতত্বমিচ্ছন্,* তাহলে তাকে *আবৃতচক্ষুঃ* হতে হবে, ইন্দ্রিয়গুলির উপরেই প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দিতে হবে, এছাড়া আর কোন পথ নেই, এটাই একমাত্র পথ। এই হল প্রথম মন্ত্রের অর্থ। পরের মন্ত্রে বলছেন –

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।।২/১/২।।

(অল্পবুদ্ধির ব্যক্তিরা বাহ্য ভোগ্যবিষয়ের অনুগমন করে। ফলস্বরূপ তারা সর্বতোব্যাপ্ত অবিদ্যা-কাম-কর্মাদিতে আবদ্ধ হয়। সেইজন্য বিবেকিগণ অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্য কূটস্থ নিত্যস্বরূপকে অবগত হয়ে জগতের কোন কিছুই কামনা করেন না।)

বালবুদ্ধি, বুদ্ধি যাদের বিকশিত হয়নি। বালবুদ্ধি কারা? জগতের সবাই। আমেরিকা থেকে ফেরার পর স্বামীজী মাদ্রাজে এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, শ্রোতারা সবাই সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানীগুণী, তাঁদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলছেন you are moustache baby, তোমাদের দাঁড়িগোফ থাকতে পারে কিন্তু তোমরা সবাই শিশু। ছোটবেলা থেকে যেভাবে শিক্ষা পেয়ে এসেছি তাতে চালাক চতুরদেরই আমরা বুদ্ধিমান ভাবি। হাতি যত বড়ই হোক মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী কখনই নয়, ঠিক তেমনি জাগতিক অর্থে যারা খুব চালাক চতুর তাদের বুদ্ধিকে কখনই পরিণত বলে মানা হয় না। বালবুদ্ধির কারা? বলছেন, *পরাচঃ কামান*, যারা পরাগ্ আত্মা অর্থাৎ মন আর ইন্দ্রিয়ের জগতে যারা ঘুরে বেড়ায় এদের সবারই বুদ্ধি বালবুদ্ধি, সে যেই হোক। কাজকর্ম সবাইকেই করতে হয়, সংসারীকেও করতে হয়, সন্ন্যাসীকেও করতে হয়। সন্ন্যাসীর জাগাতিক কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাও আশ্রম থেকে যে কাজ করতে বলা হয় সেই কাজ করে দিতে হয়, বদলে আশ্রম সন্ন্যাসীকে খাওয়া-পড়ার চিন্তা থেকে রেহাই দিচ্ছে। স্বামীজী বিধান করে দিলেন, ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে কেন খাবে, এক জায়গায় সবাই থাকবে, খাওয়া-পড়া সমাজ দিয়ে দেবে বদলে সাধুরা সমাজের দুটো ভালো কাজ করে দেবে। আগেকার দিনে সাধুরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাটাও কাজ, বদলে ভগবানের দুটো কথা শুনিয়ে দিতেন, খুব কম হলে ঈশ্বরের নামগান শুনিয়ে দিতেন। সবাইকেই পেট চালাতে হবে, পেটে চালাতে কাজ সবাইকেই করতে হবে, এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু কাজের যে মাহাত্ম্য, যেটা এরপরে আসছে, যাকে আমরা achievements বলছি, সেটা কখনই পেটের জন্য হতে পারে না। আগেকার দিনে জীবনের আদর্শ বলতে ছিল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এরই রূপ পাল্টে বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগের আদর্শ এসেছে। বিদ্যার জন্য পরিশ্রম করা বা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কাজ করাকে কখনই ইন্দ্রিয়ের পেছনে দৌড়ান বলা যাবে না। কেউ সেবার ভাব নিয়ে সব কাজ করে যাচ্ছেন সেটাও ইন্দ্রিয়ের পেছনে দৌড়ান নয়। কিন্তু আমাকে এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করতে হবে, তাতে আমার নামযশ হবে, দশজন লোক আমাকে জানবে, এটাই বালবুদ্ধি। আমি জানতে চাই এই জিনিষটা কেন এই রকম হয়, কিভাবে হয়, এর পেছনে যে বিদ্যাটা আছে তাকে পেতে চাইছি, সেটাও ইন্দ্রিয়ের পেছনে দৌড়ান হয় না। একটু চিন্তা-ভাবনা করতে করতে এসব ব্যাপারে মানুষের নিজের বুদ্ধি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়। তারাই বালবুদ্ধি, যারা ইন্দ্রিয় আর মনের পেছনে দৌড়াচ্ছে, সে যেই হোক, নেতা, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার সবাই মনের জগতে দৌড়াচ্ছে, সবারই বালবুদ্ধি। এর ফলস্বরূপ কি হয়?

তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্, বিততস্য মানে বিস্তির্ণ, বিশাল রূপে বিস্তৃত, *পাশম্*, বিস্তির্ণ পাশ। কিসের বিস্তির্ণ পাশ? মৃত্যুপাশ, উপনিষদের এই সব মন্ত্র থেকেই ধীরে ধীরে পরম্পরাতে মৃত্যুপাশ, সেখান থেকে যমরাজের পাশ এই ধারণাগুলো আরও বিস্তার পেয়েছে। মৃত্যুকে আচার্য বারবার বলছেন অবিদ্যা, কাম ও কর্ম। প্রথমের দিকে বলা হল, অজ্ঞান যখন চেপে ধরে মানুষ তখন নিজের স্বভাব ভুলে যায়। নিজেকে তখন অপূর্ণ মনে করতে শুরু করে, অপূর্ণ যখন মনে করে তখন তার মধ্যে পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছা জাগে। আমার টাকা নেই, আমি অপূর্ণ, টাকা রোজগার করে পূর্ণ হতে চাই, জীবনে সুখ নেই তাই সুখ চাই, এই ধরণের নানান রকম অপূর্ণতার ভাব চলে আসে আর মনে করে এটা পেয়ে গেলে বা ওটা হয়ে গেলে আমি পূর্ণ হয়ে যাব। কাম পুর্তির জন্য তাকে কর্ম করতে হয়, যত কর্ম করে তত তার অবিদ্যা বা অজ্ঞান বাড়তে থাকে। কেউ যদি বড়লোকের সঙ্গ করা শুরু করে দেখা যাবে ধীরে ধীরে তার চাহিদাও বেড়ে যেতে থাকে। চাহিদা যত বাড়ছে তাকে আরও কর্ম করতে হচ্ছে, সেই কর্মের জন্য আরও অন্য ধরণের চাহিদা এসে যাচ্ছে। মানুষ যে কত কি চায় সে নিজেও বুঝতে পারে না। মনে করছে আমি বিয়ে করলে সুখী হব। একটা ছোট্ট কামনা, ঐ কামনা পূরণের জন্য তাকে এবার চাকরি করতে হবে। তারপর তার সন্তান হবে, সন্তান হলে আরও তার কামনা বাড়বে, সেই কামনা পুর্তির জন্য আরও কর্ম করতে হবে। এটাকেই বলছেন বিস্তির্ণ পাশ, এটাই মৃত্যু। অবিদ্যা,

কাম ও কর্মের যে এই বিস্তৃত জাল এটাই মৃত্যু, এছাড়া আর কোন কিছুকেই মৃত্যু বলা যায় না। আমরা যাকে মৃত্যু বলে মনে করি, সেটা কোন মৃত্যুই নয়। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মার কাছে এগুলো সব দৃশ্য। ঐ দৃশ্যের মধ্যে যে অজ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে তার জন্য কাম ও কর্ম আসছে। ঐ কাম ও কর্মের মধ্যেই সবাই ঘুরপাক খাচ্ছে, এটাই মৃত্যু। ছোট্ট একটা জীবনকে যখন দেখি তখন দেখছি আমার সামনে জন্মাল আমার সামনে মারা গেল। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন, মানুষ নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছে, ভুলে গিয়ে অজ্ঞানের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে, জন্মাচ্ছে আর মরছে। দ্বৈতবাদীরা দেখেন জন্মটাও সত্য মৃত্যুটাও সত্য, অদ্বৈত বেদান্ত অন্য ভাবে দেখে। তাঁদের কাছে হল অজ্ঞান, অজ্ঞানজনিত কাম, কামজনিত কর্ম আর এর যে বিস্তির্ণ পাশ এটাই মৃত্যু। যারা পরাগ্ আত্মার পেছনে বহির্মুখী হয়ে ইন্দ্রিয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে তারা এই অবিদ্যা, কাম আর কর্মের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে, এর থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই।

কিন্তু *অথ ধীরাঃ*, যে ধীর পুরুষের কথা আগে বলা হল, যিনি বলছেন আমি উৎসকে জানতে চাই, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কে জানতে চাইছেন। আজ একটা জায়গায় এসে গেছি, হঠাৎ মনে হল এই শরীর সেই আদিমকাল থেকে প্রবাহে ভেসে এসেছে, এবার আমি একে স্রোতের বিপরীতে উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, এরাই ধীর পুরুষ। মানুষের জীবন যেন এক একটা প্রবাহ, নদীর মত বয়ে চলেছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে এবার আমি ঠেলে ফেরত নিয়ে যাব। আমি জানতে চাই আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি। এই অজ্ঞান রূপী নদী আমাকে ঠেলে এত দূর নিয়ে এসেছে, এবার এখান থেকে সেই জায়গায় যেতে হবে যেখান থেকে আমাকে ঠেলে এত নীচে নামিয়ে দিয়েছে, সেই জায়গাটাই হল জ্ঞান। *অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা*। কি বিদিত্বা? এই যে অমৃতত্ব, যার কথা আগে বললেন, এটাই ধ্রুব, এটাই স্থির, নিত্য। জগতে কর্মই সব কিছু বাড়ায় আর কমায়, মানুষের সম্পদ কর্মের দ্বারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার কর্মের দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, খরচ করলে কমে যাবে, আয় করলে বাড়বে। মানুষের নাম-যশও এক রকম কর্ম করলে বাড়ে আবার অন্য রকম কর্ম করলে কমে। জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যা কর্মের দ্বারা বাড়ে না আর কর্মের দ্বারা কমে না। যে জিনিষই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায় আবার কর্মের দ্বারা হ্রাস হয়, সেটাই অধ্রুব। তার বিপরীত হল ধ্রুব, আত্মজ্ঞান। কারণ আত্মজ্ঞান কখন কর্মের দ্বারা বাড়েও না কর্ম দিয়ে কমেও না। ঋষিরাই এই সব কথা বলে গেছেন, যাঁরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছেন তাঁরাও বলছেন কোন কর্ম দিয়েই আত্মজ্ঞান বাড়ে না। ফিজিক্সের জ্ঞান পড়াশোনা করলে বাড়বে, অনেকদিন চর্চা না করলে কমে যাবে। আত্মজ্ঞানে তা হয় না, জ্ঞান মানে জ্ঞান, বাড়বেও না কমবেও না। একবার প্রত্যগ্ আত্মার উপলব্ধি হয়ে গেলে যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে।

অমৃতত্ব, আত্মজ্ঞান কি রকম? *কূটস্থম্*, একেবারে সুদৃঢ়, কোন নড়চর নেই। *অবিচাল্যম্*, চালন করা যায় না। সেইজন্য যাঁরা ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মকে যাঁরা জানার ইচ্ছা করেন তাঁরা কি করেন? *ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে*, জগতের কোন কিছুই কামনা করেন না। ধ্রুব জিনিষটা কি, অধ্রুব জিনিষটা কি, এটাকে জেনে নিয়ে তাঁরা আর কখনই অধ্রুব জিনিষের কামনা করেন না। অধ্রুব জিনিষ বলতে আচার্য বলছেন পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। এষণা মানে কামনা করা বা ইচ্ছা করা, উপনিষদ মানুষের সব রকম ইচ্ছাকে এই তিনটে মূল ইচ্ছার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, পুত্রের ইচ্ছা, বিত্তের ইচ্ছা আর লোকের ইচ্ছা, লোক মানে স্বর্গলোক। মানুষ সন্তান কামনা করে এই জগতে সুখী থাকার জন্য আর মৃত্যুর পর সন্তান তার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম করবে এই আশায়। মানুষ এই জগতেও সুখী থাকতে চায় আর মৃত্যুর পরেও সুখী থাকতে চায়, সেইজন্য সে স্বর্গলোকের কামনা করে। স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য পুত্র চাই, আর পুত্র ও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যে যজ্ঞ করতে হবে তার জন্য অর্থের প্রয়োজন, সেইজন্য বিত্ত চাই। পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গলোক এই তিনটের মধ্যেই মানুষের সব কামনা বাঁধা। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের মন সব সময় এই তিনটের মধ্যেই থাকত। পুত্রৈষণা থাকলে একজন স্ত্রী দরকার, স্ত্রী থাকলেই অর্থের দরকার, সাধারণ মানুষের মন তাই পুত্র আর বিত্তের মধ্যেই ঘুরতে থাকে। ঠাকুর পুত্র বিত্ত না বলে কামিনী-কাঞ্চন বলছেন। কারণ এখনকার দিনে মানুষ আরও বেশি পশু স্বভাবে নেমে গেছে। বেদ উপনিষদ আগে ব্রাহ্মণরাই অধ্যয়ন করতেন, তাঁরা কখনই ভোগের জন্য নারী সঙ্গ করতেন না। ওনাদের কাছে নারীর সম্পর্ক ছিল একমাত্র পুত্র প্রাপ্তির জন্য। আগেকার দিনে যাকে পুত্র বিত্ত বলা হত, সেটাকেই ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন বলছেন। আর লোকৈষণা, স্বর্গাদির ইচ্ছা ইদানিং উঠেই গেছে বলতে হয়। এটাই এখানে বলছেন, যাঁরা ধীর পুরুষ, ব্রহ্মবেত্তা, বুদ্ধিমান তাঁরা কখনই এই জগতের অধ্রুব পদার্থ, অনিত্য জিনিষ চান না।

এর আগে বলা হল *পরাঞ্চি খানি*, ইন্দ্রিয়গুলো শুধু বাইরে গেলেই হবে না। ইন্দ্রিয়গুলো বাইরে গিয়ে কি করে? নিজের স্বভাবকে তারা জানে না, সেইজন্য কাম আর কর্মের মধ্যে ডুবে থাকে আর জগতের যত অধ্রুব জিনিষ, অনিত্য জিনিষের প্রতি দৌড়াতে থাকে। তাহলে কোন জিনিষকে জানলে ব্রাহ্মণদের এই পরিবর্তন হয়ে যায়? সেটাই পরের মন্ত্র বলছেন –

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ।।২/১/৩।।

(মানুষ রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মিলনসুখকে যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা অবগত হয়, সেই আত্মার কাছে এই জগতে কোন্ বস্তু অবিজ্ঞেয়রূপে অবশিষ্ট থাকতে পারে? ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।)

এখানে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটি জিনিষকে বলছেন, আর তার সাথে *মৈথুনান্* শব্দ বলছেন, মৈথুন জনিত সুখ। মৈথুন বলতে পুরুষ নারীর সঙ্গ হতে পারে বা ইন্দ্রিয় আর তার বিষয়ের সংযোগও হতে পারে। আচার্য মৈথুন শব্দ নিয়ে বিশেষ কিছু বলছেন না, শুধু বলছেন মৈথুন জনিত সুখ। মোটামুটি সুখ বলতে এই পাঁচ রকমের সুখকেই বোঝায় বা মৈথুন জনিত সুখকে নিয়ে ছয় রকম সুখ। পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটা সুখ দেয়। হাত, পা, চোখ আদি কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ সুখ পায় না। কারণ যে সুখ আসে সেটা স্পর্শ সুখ, এর সাথে হাতের কোন বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তারপরে যেটা আছে, যার দ্বারা মৈথুন হয় সেটা দিয়ে মানুষ আনন্দ পায়। এই যে আনন্দগুলো পায়, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ আর তার সাথে মৈথুন, যেটা দিয়ে এই ছয়টির আনন্দ পাওয়া যায় সেটা কি? বলছেন এই ছয়টির আনন্দ আত্মাকে দিয়েই পাওয়া যায়। এখানে পরিষ্কার বলছেন না যে আত্মা দিয়ে পাওয়া যায়, বলছেন *এতদ্বৈ তৎ*, এটা সেই। এখানে জিনিষটাকে খোলা ছেড়ে দিচ্ছেন, অন্য ভাবেও এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু পরে পরে যে মন্ত্র আছে সব মন্ত্রকে একসাথে নিলে তখন অর্থটা স্পষ্ট হয়। সেই অর্থ হল, এমন কিছু একটা জিনিষ আছে যেটা দিয়ে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আর মৈথুন এগুলোর বোধ হয়।

তাহলে তো শঙ্কা হতে পারে, এ আপনি কি বলছেন? জগতে তো কেউ বলে না যে কোন জিনিষ দিয়ে রূপ, রসাদির ভোগ করা হয়, সবাই জানে আমিই এগুলো ভোগ করছি। আর এই দেহের বাইরে যে আত্মা, এই আত্মার কথা তো কেউ ভাবে না। এখানে যুক্তিটা হল, সাধারণ মানুষ তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে জানে দেহ আর ইন্দ্রিয়ের বাইরে যে কোন আত্মা আছেন এটা কেউ জানে না। কিন্তু এই মন্ত্র বলতে চাইছেন মানুষ আত্মার দ্বারা রূপ, রস, গন্ধাদির ভোগ করে আর বোধ করে। আচার্য তখন বলছেন, একটু চিন্তন করলে দেখা যাবে, যেভাবে মানুষ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শকে বোধ করে, এগুলোকে জানতে পারে, আচার্যের ঠিক ঠিক শব্দটা হল জ্ঞেয়স্বরূপ অর্থাৎ যেটাকে জানা যেতে পারে, ঠিক সেভাবে দেহ আর ইন্দ্রিয়কেও মানুষ জানতে পারে। আমরা বলি আমার শরীর আজ ভালো নেই, শরীর ব্যাথা করছে, তার মানে শরীরকে সে জানতে পারছে। শরীরকে জানতে পারা যাচ্ছে তাই শরীর জ্ঞেয় হয়ে গেল, শরীর তাহলে জ্ঞাতা কখন হতে পারে না। মনও তাই, আমি বলছি আমার মন ভালো নেই, খারাপ খবর পেয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল, তোমাকে দেখে আমার মন খুশীতে ভরে উঠেছে, তার মানে মনকে আমি জানতে পারছি। তাহলে মন জ্ঞাতা হতে পারে না। খুবই সহজ যুক্তি। ইদানিং যাঁরা consciousness নিয়ে লেখালেখি করেন, যদিও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা, তাঁরাও এই সহজ যুক্তি দিচ্ছেন। উপনিষদ আত্মাকে জ্ঞাতা রূপে পরিভাষিত করছেন, যে জ্ঞাতা সেই আত্মা। তাহলে তো খুব সাধারণ বুদ্ধিতে আমি বলতে পারি, আমি সব জানছি, আমি শাস্ত্রের কথা শুনছি, শাস্ত্রের কথা জানছি। কিন্তু আমি বলতে কাকে বলছি দেখতে হবে, আমি বলতে আমরা দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের সঙ্ঘাতকেই আমি বলছি। আচার্য বলছেন, এই জিনিষ কখন হবে না, কারণ গ্লাশকে তুমি যেভাবে জানছ, সেভাবে তুমি কিন্তু তোমাকে কখনই জানতে পারছ না, গ্লাশকে তুমি যেভাবে জানছ, ঠিক সেভাবে তুমি তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকেও জানছ আর ঠিক সেভাবে তুমি তোমার মনকেও জানছ। তাহলে তো জ্ঞাতার যে আসল সংজ্ঞা সেই অনুসারে এগুলো জ্ঞাতা হবে না। হয় তোমাকে আত্মার পরিভাষাটাই পাল্টে দিতে হবে, যে কথা আগে আচার্য বললেন রূঢ় অর্থাৎ আত্মার প্রচলিত সংজ্ঞাতে আত্মা মানে তাই আর ব্যুৎপত্তির অর্থে আত্মার সংজ্ঞাও তাই, আত্মা মানে যিনি জ্ঞাতা, যিনি বোধ করেন। যদি বলি চোখ সব জানতে পারছে, কিন্তু চোখকেও তো জানা যাচ্ছে। যখন বলছি চোখে আমি ভালো দেখতে পারছি না, তাহলে চোখকেও আমরা জানছি। তাহলে

চোখ জ্ঞাতা হতে পারে না, চোখের পেছনেও অন্য কিছু আছে। এগুলো নিয়ে নিউরোলজি, সাইকোলজিতে প্রচুর আলোচনা করা হয়, কিন্তু বেদান্ত খুব সহজ যুক্তি দিয়ে চলে। এই সহজ যুক্তি কিন্তু শুধু যে যুক্তিতর্কের খাতিরে দিচ্ছেন তা নয়, এর পেছনে ঋষিদের যে আত্মজ্ঞান, যে সাক্ষাৎ দর্শন সেই উপলব্ধি রয়েছে। আগে এই রকমটি দেখেছেন আর পরে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপিত করছেন।

যদি সত্যিকারের জ্ঞাতাপনের সম্ভবনা থাকত তাহলে রূপ, রসাদি যে বস্তুগুলো রয়েছে এরাও কিন্তু এক অপরকে জেনে যেত। গ্লাশ জলকে জেনে যেত, জল গ্লাশকে জেনে যেত, আমাদের সাধারণ যে বোধ সেই বোধে কিন্তু আমাদের এই বোধ হয় না যে পাখা টিউবলাইটকে জানে, টিউব পাখাকে জানে। কবিরা কল্পনাতে অনেক কিছু দেখেন, ফুলকে হাসতে দেখেন, নদীকে নৃত্য করতে দেখেন। কিন্তু আমার আপনার এই ধরণের বোধ কখনই থাকে না, বোধ হওয়ার কথাও নয়, কারণ এই ধরণের কিছু হয় না। এখানে দুটো যুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথম যুক্তি হল, রূপ, রসাদি এদের মধ্যে যদি সত্যিই জ্ঞাতাপন থাকত তাহলে এরা এক অপরকে সরাসরি জেনে যেত। চোখ দিয়ে কেউ শুনতে পায় না, কান দিয়ে কেউ দেখতে পায় না, তার মানে এদের মধ্যে জ্ঞাতাপন নেই। দ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়গুলি বা দেহকে আমরা জানতে পারছি, শুধু জানতেই পারছি না, অনবরত এগুলোকে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি, তার মানে ইন্দ্রিয় বা দেহের জ্ঞাতাপন আসতে পারে না। যে জিনিষটাকে আমরা জানতে পারছি, সেই জিনিষ কখনই জ্ঞাতা হতে পারে না। সেইজন্য বলছেন *বিজ্ঞাতারবরে কেনবিজানিয়া*, যিনি জ্ঞাতা তাঁকে আমরা কিভাবে জানব! যেমন চোখ, চোখ জগতের সব কিছুকে দেখতে পায় কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না, তার মানে চোখের যে কাজ সেটা দিয়ে সে নিজেকে করতে পারে না। কিন্তু আমরা চোখকে জানতে পারছি, কানকে জানতে পারছি, তাহলে এরা কেউ জ্ঞাতা হতে পারে না। তার ইন্দ্রিয় জ্ঞান হতে পারে, বস্তু জ্ঞান হতে পারে কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিও এক একটা যন্ত্র, আমাদের শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়গুলিকে বলে করণ, করণ মানে এগুলোকে দিয়ে ধরা হয়। মনের ক্ষেত্রেও একই যুক্তিকে ব্যবহার করা হয়, মনকে আমরা সবাই বুঝতে পারি, তাই মন কখনই জ্ঞাতা হতে পারে না। শুধু তাই না, যোগ মতে ধ্যানের মাধ্যমে মনকে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আচার্য তখন বলছেন, *যথা যেন লোহো দহতি সোহগ্নিরিতি তদ্বৎ*, আমরা যেমন বলি তপ্ত লোহা তৃণকে পুড়িয়ে দেয়, কিন্তু লোহা তৃণকে পোড়ায় না, লোহা যার দ্বারা পুড়িয়ে দেয় জগতে তাকে অগ্নি বলে, ঠিক তেমনি যেটা দিয়ে বিষয়কে ঠিক ঠিক জানা যায় তাকেই আত্মা বলে। আত্মার সংজ্ঞা হল যিনি জ্ঞাতা তিনিই আত্মা। ইন্দ্রিয়সমূহ কখনই জ্ঞাতা হতে পারে না, ইন্দ্রিয় যদি জ্ঞাতা হত তাহলে আমরা এই বোতলকে কখন জানতে পারতাম না। যখন এই আত্মাকে জেনে যাবে তখন *এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে*, এরপর জগতে জানার জন্য কি আর বাকি থাকে, কোন কিছুই তার আর জানার বাকি থাকে না। যিনি আত্মাকে জেনে গেছেন তিনি জগতের সব কিছুকেই জেনে যান। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ তাই তিনি সর্বজ্ঞ। *এতদ্বৈ তৎ*, এই যে সর্বজ্ঞ এটাই সেই। যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, হে নচিকেতা! তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে, এই রকম কোন কিছু আছে কিনা, তার কি স্বভাব, এখানে তারই বর্ণনা করলাম। আর তাই না, যেখানে বলেছিলে *অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্রধর্মাৎ*, ধর্ম ও অধর্মের পারে, আবার *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*, বিষ্ণুর যে পরম পদ, এই যে পদের কথা বলা হচ্ছে এটাকেই তুমি জান, এটাই শেষ কথা। তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে আত্মা আছেন কি নেই, এটাই সেই ব্রহ্মপদ, ধর্মাধর্মের পারে সেই আত্মা, যাঁকে দিয়ে তোমার সব ক্রিয়াকর্ম চলছে। এইভাবে এখান থেকে পর পর যমরাজ আত্মার বর্ণনা করে যাবেন। মন্ত্রের মূল ভাব হল, ইন্দ্রিয় যে কাজগুলো করে, কাজ করছে ঠিকই কিন্তু ঠিক ঠিক জানা, রূপ, রসকে জানার যে ব্যাপার সেই জানাটা আত্মাই জানেন। যদি আত্মা না জানেন তাহলে আত্মার সংজ্ঞাই ভুল হয়ে যাবে, কারণ জ্ঞাতাকেই আত্মা বলা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলিকে জানা যায়, দেহ, মনকে জানা যায়। দ্বিতীয়, যদি এদের মধ্যে সত্যিকারের জ্ঞাতাপন থাকত, তাহলে জগতের সব পদার্থই এক অপরকে জানত। তাহলে জ্ঞাতাপন অন্য কিছুতে আছে, বলছেন যাতে আছে *এতদ্বৈ তৎ*, সেটাই সেই।

এখানে কিন্তু বলছেন না যে ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ করে দিলে আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে। এখানে কেবলমাত্র একটা শুরু হল। এর আগে *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থ* দিয়ে একবার শুরু করা হয়েছিল, এখানে এসে আবার শুরু করা হচ্ছে। তারও আগে বলেছিলেন *নাবারিত দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ*, আবার এখানে বলছেন *পরাঞ্চি*

খানি ব্যতৃণৎ। প্রত্যেকটি মন্ত্রে পেছন থেকে আবার টেনে নিয়ে আসছেন। বক্তব্য হল যতক্ষণ তুমি ইন্দ্রিয় জগতে বাস করছ ততক্ষণ তোমার আত্মাভিমুখী হওয়ার যাত্রা শুরু হবে না। আধ্যাত্মিক পথের যাত্রার সূচনা হয়েছে কিনা কি করে বোঝা যাবে বলতে গিয়ে ঠাকুরও বলছেন, যখন সংসারকে পাতকুয়া আর নিজের লোকজনদের কালসাপ মনে হবে। এখানেও ঠাকুর বলতে চাইছেন, যারা একেবারে বালবুদ্ধির, যারা পরাগ্ আত্মার সাথে নিজেকে একেবারে জুড়ে রেখেছে আগে সেখান থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। পরের ধাপে ঠাকুর বলছেন, খাওয়া-দাওয়ার বিরাট কোন আয়োজন করে না, একটু সামান্য ঝোলভাত হলেই চলে যায়। এখানেই তো তার ইন্দ্রিয় সংযম হয়ে গেল। যে ইন্দ্রিয়ের প্রধান কাজ শরীরকে চালনা করা, সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে আবার ভোগও হয়। যেমন চোখ দেখার জন্য, কিন্তু চোখ দিয়ে মানুষ আবার ভোগও করে, সিনেমা দেখছে, সুন্দর মুখ, সুন্দর দৃশ্যের উপভোগ করছে। এখানে এটাই বলা হচ্ছে, ইন্দ্রিয়গুলি হল দেহের কার্যের জন্য, তাকে দেহের কার্যেই লাগাও। কিন্তু মানুষই একমাত্র জীব যে ইন্দ্রিয়কে শুধু ইন্দ্রিয় রূপেই ব্যবহার করে না। পশুপাখি আর মানুষের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এটাই প্রধান পার্থক্য। পশুপাখিরা ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় রূপেই ব্যবহার করে, মানুষ ইন্দ্রিয়কে ভোগের জন্যও ব্যবহার করে। পশুপাখিরা ইন্দ্রিয়কে কখনই সংযম করতে পারে না, অন্য দিকে মানুষ চাইলে ইন্দ্রিয়কে সংযমও করতে পারে, ইন্দ্রিয় সংযম করে সে আত্মজ্ঞান পর্যন্ত পেতে পারে। এটাই মানুষের বিচিত্র ধর্ম, সেইজন্য মানুষ একদিকে পশুকেও ছাড়িয়ে অসুরের মতে হয়ে পুরো ভোগে নেমে যেতে পারে আবার অন্য দিকে ইন্দ্রিয় সংযম করে সে দেবতাদেরও অতিক্রম করে গিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। এখানে বলছেন যেটার জন্য ইন্দ্রিয়গুলি আছে সেটার জন্যই ইন্দ্রিয়কে লাগাও। এরপর যেমন যেমন এগোবে তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে এই ইন্দ্রিয়ের পেছনে আরেকটি শক্তি কাজ করছে, সেই শক্তির পেছনে আবার আরেকটি শক্তি কাজ করছে, এভাবে একাগ্র হতে হতে পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

প্রথম অবস্থায় এগুলো একেবারেই বোঝা যায় না। মনে হবে চোখ বন্ধ করে দিলেই হয়, কানে তুলো গুজে দিয়ে রাখলেই তো সব হয়ে যাবে। না, হবে না। ইন্দ্রিয়গুলো সব সচল থাকবে, যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে। যাদের ইন্দ্রিয় খুব শক্তিশালী তারাই যদি ঐ শক্তিকে ঐ দিকে ঘুরিয়ে দেয় তারাই তখন আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। পশুপাখিরা তাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে দেহের কাজটুকু চালিয়ে নেয়, ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করতে পারে না। কোন পশুই তার যতটুকু খাওয়ার কথা তার বেশি খেতে পারে না, কিন্তু মানুষ পারে। মানুষই বলতে পারে, রোজ যা খাই আজ তার দ্বিগুণ খেলাম। কোন পশু তার স্বভাবের বাইরে যেতে পারে না, কিন্তু মানুষ তার স্বভাবের বাইরে যেতে পারে। ঠিক তেমনি স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে সে ঈশ্বরও হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য মানুষকে বিচিত্র জীব বলা হয়। দেবতা, অসুর, পশু সবার থেকে মানুষ বিচিত্র জীব। যখন নীচে নামে তখন অনেক নীচে নেমে যায়, যখন উপরে যেতে চায় তখন সে সবার উপরে চলে যেতে পারে। এনারা প্রথমে বলছেন নীচে যাওয়াটা বন্ধ কর। কিন্তু সবার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে উপনিষদ খুব উচ্চমানের গ্রন্থ, আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। আমাদের জন্য নিদান হল, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, নিত্য পূজা পাঠ, এগুলো করে করে বুদ্ধি যখন সূক্ষ্ম হতে শুরু হবে তারও অনেক পরে এগুলো ধারণা হবে। ঋষিরা যেখান থেকে শুরু করছেন, সেখানে পৌঁছাতেই আমাদের অনেক জীবন চলে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয়কে কখনই খারাপ বলা হচ্ছে না, শুধু বলছেন ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্জগত থেকে সরিয়ে আন। পরের মন্ত্রে বলছেন –

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।২/১/৪।।

(যে আত্মার দ্বারা লোক স্বপ্ন ও জাগ্রত এই উভয় অবস্থার দৃশ্যসমূহ দর্শন করে, সেই মন্ ও বিভু আত্মাকে সাক্ষাৎ করে ব্যক্তি শোকাতীত হন।)

এতক্ষণ বলা হল জাগ্রত অবস্থায় কিভাবে মন আর পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ, রসাদিকে ভোগ করে আর তার সাথে মৈথুনের কথাও বলা হল। এর সাথে বললেন ইন্দ্রিয়গুলো নিজে থেকে কখনই ভোগ করতে পারে না। আত্মাকে বলা হয় জ্ঞাতা, আবার বলছেন মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়কে মানুষ জানতে পারে। যে জিনিষকে জানা যায় সেই জিনিষ কখনই আত্মা হতে পারবে না, যিনি জানছেন তিনিই আত্মা। এই জায়গাতে খুব সূক্ষ্ম যুক্তি চলে বলে জ্ঞাতাপন জিনিষটাকে ধারণা করা খুব কঠিন হয়ে যায়। আচার্যের যুক্তি খুব সহজ, তিনি রূঢ় অর্থ

আর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়ে আত্মার অর্থ বলে দিলেন। আত্মার পরম্পরাগত অর্থ হল যিনি জানেন আর ব্যুৎপত্তি, শব্দকে বিভাজন করে শব্দের অর্থ করলে তখনও আত্মার অর্থ হয় যিনি জানেন। ঋষিরাও বলছেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পেছনে আরেকটি সত্তা আছে যিনি ইন্দ্রিয়কে জানেন। ঐ জিনিষটাকে কোন দিন জানা যায় না, শুধু বোধে বোধ করা যায়। এই ভাবটাই কেনোপনিষদেও অন্য ভাবে এসেছে, সেখানেও বলছেন *যেন চক্ষূংসি পশ্যতি*, যার দ্বারা চোখের কার্যকে বোঝা যায়। চোখ নিজে দেখতে পায় না, কান নিজে থেকে শুনতে পায় না। পেছনে আরেকটি সত্তা আছেন বলেই চোখ দেখে, কান শোনে।

স্বপ্নান্তং, অন্ত মানে শেষ, স্বপ্নের শেষ মানে স্বপ্নের মধ্যে যেটা জানা যায়, *জাগরিতান্তং*, জাগ্রত অবস্থায় যাকে জানা যায়, *চৌভৌ*, এই উভয়কে, *যেনানুপশ্যতি*, যেটা দিয়ে জানা যায়। স্বপ্নাবস্থায় আর জাগ্রত অবস্থায় যেটা জানা যায় সেটা কে জানছে আর কিভাবে জানছে? বেদান্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অবস্থাত্রয়বিচার, তিনটি অবস্থার বিচারের কথা বলা হয় – জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। আমাদের সবারই জীবন এই তিনটে অবস্থার মধ্য দিয়েই চলছে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা কিছু ভোগ করি, যেটা আগের মন্ত্রে বললেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আর মৈথুন, ইন্দ্রিয় আর মন দুজনে মিলে জাগ্রত অবস্থায় এই ভোগগুলো করতে থাকে। যেমন আমরা এখন সবাই জাগ্রত অবস্থায় আছি এবং সবাই ইন্দ্রিয়ের জগৎকে ভোগ করছি। আরেকটি অবস্থা হল স্বপ্নাবস্থা বা নিদ্রার অবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলো শান্ত হয়ে যায়, ইন্দ্রিয় তখন আর কাজ করে না, কিন্তু মন তখনও কাজ করতে থাকে। নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলো যদি কাজ করত তাহলে ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা সব রকম শব্দ শুনতে পেতাম। বায়োলজি, সাইকোলজি বা নিউরোলজিতে এর উপর অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু বেদান্ত বলবেন, এত ব্যাখ্যা দিয়ে তোমার কি লাভ, নিদ্রাবস্থায় তোমার অহঙ্কারই কাজ করে না, সেখানে ইন্দ্রিয় কি করে কাজ করবে! ঠাকুরও বলছেন, মানুষের এত অহঙ্কার অথচ ঘুমিয়ে থাকলে মুখে কুকুর প্রস্বাব করে দিলেও কোন বোধ হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি যদি ঘুমের মধ্যে কাজ করত তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে জানবে যে কুকুর আমার মুখে প্রস্বাব করছে। ঘুমন্ত অবস্থায় শুধু মনই কাজ করে। বলাই হয় যে, ঘুমন্ত মানুষকে খাট শুদ্ধু তুলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গেলে সে টেরও পায় না। ঘুম যদি পাতলা থাকে বা জাগ্রত আর স্বপ্নের মাঝামাঝি অবস্থায় যখন থাকে তখন বুঝতে পারে।

তৃতীয় অবস্থা হল সুষুপ্তি, সুষুপ্তিতে মানুষ গভীর নিদ্রায় চলে যায়। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয় তো কাজ করা বন্ধই করে দেয়, তার থেকেও গুরুত্ব হল মনও কাজ করা বন্ধ করে দেয়। সুষুপ্তির অবস্থার পর একটা ছোট্ট বোধ থেকে যায়, আমি ঘুমিয়েছিলাম, তার সাথে একটা সুখের বোধ, খুব আনন্দে ঘুমিয়ে ছিলাম। এই যে অল্প একটু জ্ঞান, এই জ্ঞানের সাথেও একটা অজ্ঞান মিশে আছে, আমার কিছু মনে নেই। নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান আছে, আমি খুব জোর ঘুমিয়েছিলাম। তাহলে তিনি কি নিজের ঘুমকে দেখতে পাচ্ছিলেন? না, পাচ্ছিলেন না। ঘুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার একটা রসবোধ থেকে যাচ্ছে আর সেই সাথে সুখের বোধ, খুব আনন্দে ছিলাম। বেদান্ত বলছে, আত্মা সব সময় জাগ্রত, কিন্তু আত্মা যখন এই তিনটে অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্য দিয়ে দেখেন তখন তিন ভাবে দেখেন। যখন তিনি ইন্দ্রিয় দিয়ে বাহ্য জগৎকে দেখেন তখন তাকে বলছে জাগ্রত অবস্থা। সেই শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা শুধু মন দিয়ে যখন দেখছেন তখন তাকে বলছে স্বপ্নাবস্থা। আর নিজেকে যখন অজ্ঞান দিয়ে দেখেন তখন সেই অবস্থাকে বলে সুষুপ্তি। সুষুপ্তি অবস্থা আর সমাধির অবস্থার তফাৎটা খুব হাল্কা। সমাধি অবস্থাতেও একই হয়, তখনও ইন্দ্রিয় কাজ করা বন্ধ করে দেয়, মনও কাজ করা বন্ধ করে দেয়। শুধু সুষুপ্তিতে যে অজ্ঞানের পর্দা আছে সেই পর্দাটা সমাধি অবস্থায় খসে যায়। সমাধি অবস্থা থেকে যখন বেরিয়ে আসছেন তখন তাঁরও কিছু মনে থাকে না। তখনও তিনি বলেন কী আনন্দে ছিলাম। ঠাকুর যে ব্রহ্মানন্দের কথা বলছেন, ব্রহ্মানন্দে কোটি রমণসুখ অনুভূত হয়, সমাধির আনন্দে সেই আনন্দের কথাই ঠাকুর বলছেন। কিন্তু সুষুপ্তির পর যে অজ্ঞানবশতঃ আমার কিছু মনে নেই বলছে, সেটা বলেন না। তিনি তখন বলেন, ভাইরে! তোমরা কেন এই কষ্টে পড়ে আছ, ঈশ্বরের দিকে চল তোমাদের সব কষ্ট মিটে যাবে। সুষুপ্তি আর সমাধিতে এই ছোট্ট একটা তফাৎ থাকে। সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের আবরণটা থেকে যায়, সমাধিতে অজ্ঞানের আবরণটা খসে পড়ে যায়। কিন্তু সমাধির অবস্থাকে ঠিক অবস্থা বলা যায় না, কারণ এটাই আত্মার স্বাভাবিক। অবস্থা বলতে বোঝায় অবস্থার পরিবর্তন। মন এই তিনটে অবস্থার মধ্যেই ঘুরতে থাকে, এই তিন অবস্থার পারে যেতে পারে না। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল। বেদান্তে কিছু কিছু প্রকরণে শুধু

এই তিনটে অবস্থার উপর বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন, সেখানে আবার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থার থেকে বিলক্ষণ, এর থেকে পুরো আলাদা আরেকটি অবস্থা, যে অবস্থা হল আত্মানুভবের অবস্থা, সেই অবস্থার কথাও বলা হয়। সেই তুরীয় অবস্থায় যিনি আছেন তিনিই এই তিনটে অবস্থাকে দেখেন। এখানে এটাই বলছেন, *স্বপ্নান্তং জাগরিততান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি*, স্বপ্ন ও জাগরণ এই দুটোকেই যিনি দেখেন।

নচিকেতার প্রশ্ন ছিল আত্মা কি। আত্মার কথা বলতে গিয়ে প্রথমে আত্মার ব্যাপারে কিছু আভাস দিচ্ছেন, যেটা দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে জানা যায় সেটাই আত্মা, *এতদ্বৈ তৎ*। আবার একটু এগিয়ে এসে বলছেন, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তোমার যত রকম ক্রিয়াকলাপ হয়, তিনি আছেন বলেই সব হয়। নচিকেতা, তুমি জানো সেটাই সেই আত্মা, *এতদ্বৈ তৎ*। আর বলছেন, *মহান্তং বিভূমাত্মনং*, তারপর তিনি যখন দেখতে পান, সেই যে আত্মা যিনি এই জাগ্রত স্বপ্ন অবস্থাকে দেখেন, এই আত্মাই মহান, এটাই ব্রহ্ম আর এটাই বিভূ, সর্বত্র ব্যপ্ত। এই যে সর্বব্যাপী, এই যে মহান, আমিই সেই। *মত্বা ধীরো ন শোচতি*, ধীর ব্যক্তি এই *মহান্তং বিভূমাত্মনং*কে জেনে যাওয়ার পর তিনি আর কোন শোক করেন না। পরের মন্ত্রে এটাকে আরও ব্যাখ্যা করবেন, পরের মন্ত্রগুলো এক অপরের সাথে যুক্ত।

এতক্ষণ অবস্থাত্রয়কে ব্যষ্টি স্তরে বলা হল। ব্যষ্টি মানে ব্যক্তি রূপে আমি যখন এই তিনটে অবস্থাকে দেখছি। এর পারে আবার আছে সমষ্টি। প্রত্যেকের যেমন আলাদা আলাদা ব্যক্তি আত্মা আছে, এই আত্মা যেমন তিনটে অবস্থাকে দেখছেন, ঠিক তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যিনি চৈতন্য সত্তা, সেই বিশ্বাত্মার উপরেও একটা অজ্ঞানের আবরণ রয়েছে। অজ্ঞান আবরণের ভেতর দিয়ে তিনি যখন এই জগৎকে দেখেন তখন তিনিও এই তিনটি অবস্থাকে দেখেন। বেদান্ত এই তিনটেকেই এক করে দেয়। আমাদের ভেতর যে চৈতন্য সত্তা আছেন তিনি জাগ্রত অবস্থায় জিনিষগুলিকে একভাবে ভোগ করেন, এখানে খামখেয়ালীর মত করছেন তা নয়, কারণ তাঁর করণগুলো পাল্টে যাচ্ছে। যেমন আমি চাঁদ দেখছি, চোখ দিয়ে দেখলে এক রকম দেখছি, সেই চাঁদকে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে আরেক রকম দেখাবে। জগৎকে খোলা চোখে এক রকম দেখছেন আবার চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলে আরেক রকম দেখাবে। আত্মাও যখন মন দিয়ে জগৎকে দেখেন তখন এক রকম দেখেন আবার মন আর ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন দেখেন তখন আরেক রকম দেখেন, মনেরও ক্রিয়াকলাপ যখন বন্ধ করে দেখেন তখন অন্য রকম দেখেন। আর সবটাই যখন বন্ধ করে দেন তখন নিজের আনন্দেই বুঁদ হয়ে থাকেন। এখানে আলোচনা চলছে জ্ঞাতাকে নিয়ে। ইন্দ্রিয়, মন এরা কেউই জ্ঞাতা নয়, প্রকৃতি বা শক্তিও জ্ঞাতা নন, জ্ঞাতা হলেন সেই পরমাত্মা, যাঁকে আমরা সাধারণ ভাষায় অন্তর্যামী বলছি বা আত্মা বলি, জীবাত্মা বলি। যে চৈতন্য সত্তা বিভিন্ন অবস্থায় নিজেকে দেখছেন, সেই চৈতন্য সত্তাকে তুমি যখন জানবে, তখন কি জানবে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যিনি চৈতন্য সত্তা আছেন আর অন্তর্যামী যাঁকে বলছি, এই দুটো এক। যিনি মহান, বিভূ, যিনি সর্বব্যাপী, সব জায়গাতেই যিনি আছেন, তাঁকে যখন জেনে যাবে তখন কি হবে? *মত্বা ধীরো ন শোচতি*, তোমার সব শোক, তোমার মনে যত দুঃখ-কষ্ট আছে সব চলে যাবে।

শোক কখন হয়? তোমার যেটা আছে সেটা চলে গেল। তার মানে তুমি নিজেকে খণ্ডিত রূপে জানছ, আর যেটা চলে গেছে সেটাকেও খণ্ডিত মনে করছ। পাঁচ বছরের বাচ্চার জামার পকেট থেকে কোন জিনিষ তুলে যদি তার প্যান্টের পকেটে রেখে দেওয়া হয় তাতেই সে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে, তুমি কেন এই পকেট থেকে তুলে অন্য পকেটে রাখলে! কিন্তু বড়দের কাছে জামার পকেটে থাকা যা প্যান্টের পকেটে থাকাও তাই। জামার পকেটে থাকলেও তারই থাকবে, প্যান্টের পকেটে থাকলেও তারই থাকবে। আত্মজ্ঞানে ঠিক তাই হয়, তখন সবটাই তার নিজের বলে মনে হয়। সেইজন্য কেউ চলে গেলে বা কোন বস্তু চলে গেলে তাঁর কিছু আসে যায় না। শোক, যেটা হারানোর ভাব থেকে আসে, আত্মজ্ঞানীর কাছে হারানোর ভাব আর থাকে না, সেইজন্য তিনি কোন শোক করেন না। শোক আর মোহই সংসার, চোখের হাসি আর চোখের জল এই নিয়েই জগৎ। এই দুটোকে পার করে দিলেই সে মুক্ত। কিন্তু মুক্ত হওয়ার কোন পথ নেই। Self development আর জীবনে আনন্দ পাওয়ার উপর বাজারে কত বই ছড়িয়ে আছে, আর কত লোক এই সব বই পড়ছে কিন্তু জীবনে কারুরই আনন্দ আসছে না। কোন দিন আনন্দ আসবেও না, তারা যে পথ বেছে নিয়েছে ঐ পথ দিয়ে জীবনে কোন দিন আনন্দ আসবে না। কারণ ঐ পথে খণ্ডিত ভাব থেকেই যাচ্ছে। নচিকেতার প্রশ্ন ছিল আত্মা কি, এই

প্রশ্নকে স্পষ্ট করা হচ্ছে। তুমি এটাকে বোঝার চেষ্টা কর, যিনি জগৎকে জাগ্রত অবস্থায় জানছেন, যিনি স্বপ্নে স্বপ্নাবস্থাকে জানছেন তিনিই সেই আত্মা।

এই মুহূর্তে যে মন্ত্রের উপর আলোচনা চলছে, মন্ত্রের মূল বক্তব্যকে আধার করে চলতে ফিরতে একটু চিন্তা করলে জীবনের অনেক সমস্যা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হব। আমাদের জীবনে যা কিছু হচ্ছে, শুভ অশুভ যা কিছুই হয়, এগুলোর সাথে আমার সত্যিই কি কোন সম্পর্ক আছে? আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, সেই মেঘের ছায়া আমার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তার জন্য আমি যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেই মাটির কোন পরিবর্তন নেই। আকার পরিবর্তন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আসলে কোন আকার পরিবর্তন হচ্ছে না, সবই ছায়া ছায়া। আর আমি একজন দ্রষ্টা হয়ে দৃশ্যগুলি দেখে যাচ্ছি। হাটতে চলতে, বসে বসে এগুলোকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যও একটু যদি ভাবি তখন নিজের কাছেই সব কিছু অবাক লাগবে। আমার দুঃখটাও যেন মেঘের ছায়ার মত ভেসে এসেছে। মেঘ সরে গেলে আবার উজ্জ্বল আলোতে সব কিছু ঝলমল করে উঠছে, আত্মাই এই দৃশ্যগুলিকে চলচ্চিত্রের মত দেখে যাচ্ছে। সত্যিই খুব অবাক লাগবে। আর মজার ব্যাপার হল, সাধনা করে করে অনেক দূর এগিয়ে গেলে বাস্তবিক সব কিছুকে এই রকমই দেখেন। যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলছি, যাঁদের কথা এখানে বলছেন, এই জ্ঞান যাঁদের হয় তাঁরাই মহিমান্বিত হয়ে যেন, জগতে তাঁদেরই পূজা হয়। তাঁরাও জগৎকে, জীবনকে ঠিক এভাবেই দেখেন। স্বামীজী বারবার অদ্বৈতের কথা বলতে গিয়ে এটাই বলছেন, যিনি চৈতন্য, যাঁর কোন পরিবর্তন হয় না, যিনি জ্ঞানস্বরূপ তিনিই সব দেখছেন। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা হচ্ছে, আপনি স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখছেন। আপনি হয়ত মোহনবাগানের সমর্থক। ভালো দেখা যাচ্ছে না, এবার বাইনাকুলার দিয়ে দেখছেন। মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা বল নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের গোলের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, আপনি লাফিয়ে উঠছেন, আবার ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার মোহনবাগানের গোলের সামনে এগিয়ে গেছে আপনি হায় হায় করছেন। অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে আপনি নিজের সত্তাকেই ভুলে যাবেন। খুব ভালো সিনেমা দেখতে দেখতেও মানুষ নিজের সত্তাকে ভুলে যায়, সিনেমার মধ্যেই হারিয়ে যায়। একটা খেলা, একটা সিনেমা দেখতে গিয়েই আমরা এমন একাত্ম হয়ে যাচ্ছি যে নিজেদের ভুলে যাচ্ছি, আর সেখানে জগতের এই বিশাল ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় সমুদ্রে আমরা একাত্ম হয়ে হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছি, এর থেকে আমরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারি না। সেটাই এখানে বলছেন, যিনি সব কিছুর দ্রষ্টা, তাঁর স্বরূপ কি? *মহান্তং*, তিনি মহান, ব্রহ্ম মানেই মহান আর বিভূ, তিনি সর্বব্যাপী। এটাকে জেনে গেলে সে আর কোন শোক করে না। যদি জেনে যান মোহনবাগান আপনার টিম ইস্টবেঙ্গলও আপনার টিম, তখন কে হারল আর কে জিতল তাতে কিছুই আসে যায় না। আত্মারও ঠিক তাই হয়, আত্মা দেখেন জীবনও আমার মৃত্যুও আমার, কোনটাতেই আত্মার কাছে কিছু আসে যায় না। জগতের কোন কিছুর সাথেই আত্মার একাত্ম ভাব হয় না, একাত্ম ভাব আমার আপনার হবে, একাত্ম ভাব মনের হয়, ইন্দ্রিয়ের হয়। শোক করেন না যে বলা হল, এটাকেই আরেকটু এগিয়ে নিয়ে পরের মন্ত্রে বলছেন –

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ।।২/১/৫।।

(যিনি এই কর্মফলভোক্তা ও প্রাণাদির ধারক জীবরূপী আত্মাকে ভূত, ভবিষ্যতের অর্থাৎ সর্বকালের, সর্বজগতের নিয়ন্তারূপে পরমাত্মা থেকে অভিন্নরূপে জানেন তিনি তারপর আর নিজেকে গোপন করতে বা রক্ষা করতে বা কাউকে ঘৃণা করতে উৎসুক হন না।)

আবার আত্মাকে পরিভাষিত করছেন *এতদ্বৈ তৎ* বলে। *মধ্বদং* শব্দ উপনিষদে প্রায়ই আসে, যার অর্থ যিনি মধু পান করেন। কে মধু আহরণ করেন? জীবাত্মাই পান করেন, জীবাত্মাকে বলে *মধ্বদং*। জীবাত্মা আনন্দ পান। কি দিয়ে আনন্দ পান? আচার্য বলছেন, *কর্মফলভুজং*, কর্মফল ভোগ করে। খেটেখুটে যা কাজ করছি, রান্না করলাম, রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করলাম, কর্ম হল রান্না করা আর খাওয়া-দাওয়া করাটা আনন্দ। এই ফলের আনন্দ ইন্দ্রিয় পায় না, মনও পায় না, পায় একমাত্র জীবাত্মা। জীবাত্মা কে? ঐ যে শুদ্ধ আত্মা যিনি অজ্ঞানের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন আর তার ফলে নিজেকে ইন্দ্রিয় আর মনের সাথেও একাত্ম করে নিয়েছেন। অনন্ত আত্মা নিজেকে সীমিত করে নেন, প্রথম অজ্ঞান দিয়ে সীমিত করেন, অজ্ঞানের পর মন দিয়ে সীমিত করেন আর মনের পর ইন্দ্রিয় দিয়ে নিজেকে আরও সীমিত করেন। অজ্ঞানের জন্য তিনি

সুষুপ্তি অবস্থাকে অনুভব করেন, মনের জন্য তিনি স্বপ্নাবস্থা আর ইন্দ্রিয়ের জন্য জাগ্রত অবস্থাকে অনুভব করেন। তিনিই থাকেন, অজ্ঞানও তাঁর মধ্যে থাকে, মনও তাঁতে থাকে, কিন্তু আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। এই যে তিনি ভোগ করছেন সেইজন্য তিনি *মধ্বদং।* এই *মধ্বদং,* ইনি কিন্তু স্বাধীন সত্তা নন। এই জায়গাতে এসেই সমস্যার উদ্ভব হয়, এখান থেকেই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত সব আলাদা হতে শুরু করে।

মধ্বদং মানে যিনি ভোগ করেন? কে ভোগ করেন? জীব। এই জীবকে কে ধারণ করে আছেন? এখানে বলাই হচ্ছে, *য ইমং মধ্বদং,* সেই জীবকে তিনি ধারণ করে আছেন। সেই তিনি যদি নারায়ণ হন, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ হন তাহলে দুটি সত্তা এসে যাচ্ছে, জীবের সত্তা আর ঈশ্বরের সত্তা। আচার্য শঙ্কর বিভিন্ন শাস্ত্রে যত মন্ত্র আছে সব মন্ত্রের পুরো বক্তব্যকে সমন্বয় করে একটা ঐকতান দাঁড় করিয়ে দেখাচ্ছেন, যিনি অজ্ঞানে আবৃত জীব তিনিই জ্ঞানবান শুদ্ধ আত্মা। কিন্তু এই জ্ঞানবান শুদ্ধ আত্মা কোন ভাবে নিজেকে অজ্ঞানের সাথে জড়িয়ে নিয়েছেন বলে নিজেকে জীব মনে করছেন। তাহলে অজ্ঞানে জড়িত যে জীব, যাঁকে *মধ্বদং* বলছেন, তাঁকে কে ধারণ করে আছেন? তাঁরই শুদ্ধ রূপ অজ্ঞানে আবৃত জীবকে ধরে আছেন। আমারই শুদ্ধ রূপ আমার অশুদ্ধ রূপকে ধারণ করে আছেন। আমি যদি স্নান না করি দুদিন পর থেকে আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোবে। এই দুর্গন্ধকে কে ধারণ করে আছে? আমার যে শুদ্ধ রূপ সেই এই অশুদ্ধ রূপকে ধারণ করে আছে। এটা অবশ্য উপমা। তার মানে দাঁড়াল, আমার যে শুদ্ধ আত্মা তিনিই জীবকে ধারণ করে আছেন। তার সাথে বলছেন *আত্মানং জীবমন্তিকাৎ,* নানান রকম যে প্রাণন ক্রিয়া চলছে এটাকে যিনি জানেন, *ঈশানং ভূতভবস্য,* তিনি ঈশান, মানে শাসন করেন। *ভূতভবস্য,* ভূত, ভবিষ্যত সর্বকালের, সর্বজগতের নিয়ন্তা রূপে জানেন। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা বলবেন, ভগবান ধারণ করে আছেন। ভগবান ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিনটে কালকে জানেন আর জীবকে ধারণ করে আছেন। কিন্তু আচার্য শঙ্কর বলছেন, যিনি শুদ্ধ আত্মা, নচিকেতা যমরাজের কাছে যাঁর ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন, *এতদ্বৈ তৎ,* এটাই সেই। নচিকেতা জানতে চেয়েছিলেন, কেউ বলে আত্মা আছেন কেউ বলে নেই, যমরাজ তার উত্তরে বলছেন এটাই সেই শুদ্ধ আত্মা। যিনি ঈশান, সব কিছুকে যিনি শাসন করছেন, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটে কালকে শাসন করছেন তার সাথে ধারণ করে আছেন। কাকে ধারণ করে আছেন? *য ইমং মধ্বদং,* সেই জীবকে, যিনি ভোগ করেন। সেই জীব কি রকম? *জীবমন্তিকাৎ,* জীবন চালানর জন্য যত রকমের প্রাণন ক্রিয়াদি হচ্ছে, এটাকে ধারণ করে আছেন। সেই ঈশানকে, সেই শুদ্ধ আত্মাকে যিনি জানেন তিনিই আত্মাকে জেনেছেন। সেইজন্য এখানে ঈশান বলতে ভগবানকে, শিবকে, বিষ্ণুকে বলছেন তা নয়। *এতদ্বৈ তৎ* না বললে তাও ভগবান মানার সুযোগ থাকত, কিন্তু *এতদ্বৈ তৎ* বলার পর সেই সুযোগটাও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জেনেছেন কিনা আমরা কি করে বুঝব? *ন ততো বিজিগুপ্সতে,* ঈশোপনিষদেও বলছেন *ন ততো বিজিগুপ্সতে।* *জুগুপ্সা,* কোন কিছু গোপন করা ইচ্ছা তাঁর থাকে না। তাঁর যা আছে সবটাই খোলা, একেবারে প্রাণখোলা। আমি করেছি, হ্যাঁ আমি করেছি, আমি করিনি, সত্যিই আমি করিনি। এরপর তোমার যা করার কর। এই ধরণের খোলামেলা সরল আচরণ একমাত্র আদিম আদিবাসীরাই করে। মিথ্যা কথা বলা যায় এই বোধটাও তাদের মধ্যে থাকে না। আর যিনি মহাপুরুষ, যিনি আত্মাকে জেনেছেন একমাত্র তিনিই এই খোলামেলা আচরণ করতে পারেন। এই দুইয়ের মাঝে যারা আছে, আমি, আপনি সবাই মিথ্যা কথা বলবই, গোপন করবই। গোপন করা মানুষের স্বভাব। মানুষ গোপন কেন করে? ভয়ের জন্যই করে। গোপন যদি না করি পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ভারতের সব আদালতে বড়লোকদের কত অপরাধের মামলা চলছে, সেই অপরাধকে ধামা চাপা দেওয়ার কত রকমের প্রচেষ্টা চলতে থাকে, কারণ তাদের ভয়, জেলে যেতে চায় না। মানুষের স্বভাব, তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচা আবার অনেক স্তরের হয়। নিজের শরীরকে বাঁচাতে হয়, নিজের পরিজনদের বাঁচাতে হয়, নিজের সম্পত্তি বাঁচাতে হয় আর সবচেয়ে বেশি নিজের মান-সম্মানকে বাঁচাতে হয়। মান-সম্মান নিয়েই তো মানুষ সমাজে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মান-সম্মানই যদি চলে যায় তার কি বাকি থাকল! সে প্রাণপন চেষ্টা করে কিভাবে আমি এই তিনটে জিনিষকে রক্ষা করব। পুত্র, বিত্ত আর লোক, আমার নাম-যশ, টাকা-পয়সা আর পরিজন এই তিনটেকে রক্ষা করতে গেলে আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে। এখানে মিথ্যে কথা না বলে বলছেন জুগুপ্সা, গোপন করার ইচ্ছা। গোপন করার পেছনে একটা জিনিষই কাজ করে, তা হল ভয়। কিন্তু ভয় সে কাকে করছে? ভয় করছে অপরকে, যাকে পর মনে করে মানুষ তাকেই ভয় করে।

আমি আপনাকে পর মনে করি, আপনি আমার গোপন কিছু জেনে গেলে ফাঁস করে দেবেন। আমি আপনাকে পর মনে করছি, আপনার কাছে আমার সম্মান আছে, সেই সম্মান চলে যাওয়ার ভয় আছে। সেইজন্য আপনার কাছে আমাকে অনেক কিছু গোপন করতে হয়।

কিন্তু যিনি ঈশানকে জেনে গেলেন, আত্মাকে যিনি জেনে গেলেন তাঁর আর কিসের ভয়! হিরণ্যগর্ভ জন্ম নিয়েই ভয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, সত্যিই তো, আমি কেন কাঁদছি? ভয়ের জন্য। কিন্তু এখানে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই, তাহলে আমি কার ভয়ে কাঁদছি? ভাবতেই তাঁর কান্না থেমে গেল। আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই, তখন কার ভয়ে আমি কাঁদব? সেইজন্য বলছেন *অদ্বৈতমেবম্ অভয়ম্*, অদ্বৈতে গিয়েই মানুষ অভয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাছাড়া অভয়পদ প্রাপ্ত হবে না। অন্ধকার রাত্রে রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক রকম ভয় হবে, চোর-ডাকাতের ভয়, সাপ-বিছের ভয়, কুকুরের ভয় আর বয়স কম থাকলে ভূতের ভয়। চোর-ডাকাতও পর, সাপ-বিছেও পর, ভূতও পর, পরকে মানুষ ভয় করে। কিন্তু যখন দেখছে চোর-ডাকাতও সেই, সাপ-বিছেও সেই, ভূতও সেই তখন সে কাকে ভয় করবে! ভয় করে না বলে কোন কিছু গোপন করার চেষ্টাও করে না। ট্রেনে যাওয়ার সময় বলে মালপত্র সামলে রেখ, চুরি হয়ে যেতে পারে। এখানেও গোপন করছে, সম্পত্তি হারাতে চাইছে না। কথামৃতের পাতায় পাতায় ঠাকুর পরমহংসের বর্ণনা দিচ্ছেন, বলছেন পরমহংস শিশুর মত হয়ে যায়। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, শিশু বাহ্য করে এসে সবাইকে তার পেছন দেখাতে থাকে, দেখতো পরিষ্কার হয়েছে কিনা! শিশুর কাছে পর বলে কোন বোধ নেই, লজ্জা বলে কোন বোধ নেই। ঠাকুরের হাত ভেঙে গেছে, হাতে বার বাঁধা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে লোকজন এসেছে দেখা করতে। লোকেরা অবতারের ভাঙা হাত দেখে কি মনে করবে ভেবে রাখাল ঠাকুরের ভাঙা হাতের উপর ধুতি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ঠাকুর রাখালের মনের ভাব বুঝে গেছেন। উনি চেঁচাতে চেঁচাতে বলছেন, এই দেখো গো আমার কেমন হাত ভেঙে গেছে। পরমহংস বা আত্মজ্ঞানীর গোপন করার ইচ্ছা চলে যায়, ভয়ও চলে যায়। ঠাকুর বলছেন, তখন কাউকে বড়লোক বলে বোধ হয় না। ভেতরে এমন একটা শক্তি এসে যায় তখন কাউকে ক্ষমতাশালী, বড়লোক বলে বোধ হয় না।

আমরা সবাই চাই, আমার জীবনে যেন কোন শোক না আসে, কোন ভয় যেন না থাকে, আমাকে লুকিয়-চুরিয়ে কিছু যেন না করতে হয়। লুকোচুরির জন্য কত রকমের জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায়, মানুষকে তার জন্য কত রকম চেষ্টা করতে হয়, সে যেটা নয় সেটা অন্যকে দেখাতে হয়। একজনকে পছন্দ করি না, সে বাড়িতে চা খেতে এসে গেছে, এখন আমার কি করার আছে! অফিসের বসকে পছন্দ করি না, কিন্তু রোজ সকালে অফিসে গিয়ে গুডমর্নিং স্যার করতে হয়। সবাইকেই নিজের ভাব গোপন করতে হয়। গোপন না করেও কোন উপায় নেই, নিজের ভাব যদি দেখিয়ে দেয় সেও নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দেবে। গ্রামের একটি লোক সিগন্যালম্যানের কাজ করত। বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পর স্ত্রীকে তার ক্ষমতা দেখাতে হবে। স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে 'তোমার কি ক্ষমতা? 'আমি পুরো ট্রেনকে আটকে দিতে পারি'। স্ত্রী গ্রামের মেয়ে, খুব খুশী, আমার স্বামীর এত ক্ষমতা! লোকটি স্ত্রীকে নিয়ে গেছে তার ক্ষমতা দেখাতে, সিগন্যাল নামিয়ে দিয়েছে। আর সেটা ছিল মিলিটারি স্পেশাল ট্রেন। মিলিটারির কর্ণেল নেমে এসেছে 'কেঁও রোকা'! 'আমার স্ত্রীকে আমার ক্ষমতা দেখাচ্ছিলাম'। কর্ণেল এক চড় মেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যাল তুলে দিয়েছে। স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে 'এটা কি হল'? বলল 'ওটা ওর পাওয়ার ছিল। সিগন্যাল নামিয়ে দেওয়াটা আমার পাওয়ার আর চড় মারাটা কর্ণেলের পাওয়ার'। এভাবে সব জায়গায় নিজের ভাব দেখাতে গেলে চড় খেয়ে বেড়াতে হবে। আমি যদি বলি, আমি আপনার ব্যাপারে এই ভাবি। তখন সে আপনার ব্যাপারে কি ভাবে আর আপনাকে কি করতে পারে দেখিয়ে দেবে। ফলে আমাদের সব জায়গায় গোপন করে চলতে হয়। কারণ আমাদের ভয় আছে, ভয় যদি না পাই তাহলে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি পরমহংস তাঁর কিছুই আসে যায় না। কেটে দেবে? কেটে দাও। আলেকজাণ্ডার ঋষিকে বলছে আমি তোমাকে কেটে ফেলব। আলেকজাণ্ডারকে ঋষি বলছেন, তুমি জীবনে এর থেকে বড় মিথ্যে কথা বলনি, আমি শুদ্ধ আত্মা আমাকে তুমি কিভাবে শেষ করে দেবে?

যিনি মুক্ত, তাঁর কাছে শরীরটা শেষ বন্ধন, শরীর খসে পড়ে গেলে তিনি পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যান। সেইজন্য মুক্ত পুরুষ মৃত্যু এলে আনন্দিতই হন। ঠাকুর বলছেন, আমি চলে গেলে ছোকড়া গুলো কষ্ট পাবে,

তাই ওরা না যতক্ষণ বলে ইনি গেলে ভালো হয়, আমার কষ্টটা দেখতে পারছে না, ঠিক তত দিনই আমি থাকব। শেষে ঠিক তাই হল, ঠাকুরের শরীর শুকিয়ে শুকিয়ে এমন হয়ে গেছে যে তারাই চাইছে, গেলে এই কষ্ট থেকে বাঁচেন। ঠাকুরের কোন অবস্থাতেই কোন হা হুতাশ নেই, যখন সুস্থ তাতেও কিছু নেই, যখন অসুস্থ তখনও কিছু নেই। এই জিনিষগুলো বোঝা আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে এই জিনিষগুলি ঠিক এভাবেই চলে এসেছে। *য ইদং মধ্বদং*, আত্মাকে জানতে পারেন। তিনি কে? ঈশান। বাড়িতে ঈশান কে হয়? বাড়ির স্ত্রী বা স্বামীই ঈশান হয়। কিন্তু উপনিষদ সেটাকে নাকচ করছে। এই ভুলটা যেন কেউ না করে বসে। যদি কোন মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার মালিক কে? আমার স্বামী। আগেও কি তাই ছিল? ভবিষ্যতেও কি সেই থাকবে? না তা নয়, বিয়ের পর স্বামী মালিক। চিরদিন সে তোমার মালিক ছিল না, তাহলে সে ঈশান নয়। ভবিষ্যতেও সে তোমার মালিক থাকবে না। বর্তমানে তুমি তাকে মালিক মনে করতে পার। ঈশান, যিনি ভূতেও ছিলেন, এখনও আছেন আর ভবিষ্যতেও মালিক থাকবেন, ঈশান মানে যিনি সর্বনিয়ন্তা। কিন্তু আমাদের সমস্যা, আমরা বর্তমানকে নিয়েই পড়ে থাকি। বর্তমানে যে তোমার মালিক তারও একজন মালিক আছেন, যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুর মালিক। শুধু তাই না, আবার তাঁকে গুণান্বিত করছেন, যিনি সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। আমি যাকে ভালোবাসি আমার মন, প্রাণ তার উপরই পড়ে থাকে। গতকালও কি সে তোমাকে ধারণ করেছিল? না তা নয়, যবে থেকে আমার জীবনে এসেছে। রোজ রোজ মালিক পাল্টাতে পারে না। মালিক যিনি হবেন তার বৈশিষ্ট্য এখানে বলে দিচ্ছেন। ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যত তিনটে কালেরই তাঁকে মালিক হতে হবে। জীবনের যে প্রাণন ক্রিয়া সেটাকে তিনি ধারণ করে আছেন, আর *মধ্বদং*, যিনি নানান রকম কর্মফল ভোগ করছেন, সেই জীবকেও তিনি ধারণ করে আছেন। কিভাবে ধারণ করে আছেন? আগের মন্ত্র বলা হল, *স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং*, সেই আত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনটে অবস্থাকেই ধরে আছেন। যিনি এই তিনটের সাথে নিজেকে একাত্ম করে সব কিছু ভোগ করছেন, সেই জীবাত্মাকে তিনিই ধরে আছেন।

সমুদ্র আর তার ঢেউ। ঢেউ নিজেকে মনে করছে আমি এখন উঁচু, আমি এখন নিচু। সমুদ্র ঢেউয়ের কথা শুনে হাসে, তুমি কিসের উঁচু আর কিসের নিচু, তুমিও যা আমিও তাই। তুমি বোকার মত নিজেকে উঁচু নিচু মনে করছ। ঢেউকে ধারণ করে আছে সমুদ্র। সমুদ্র ঢেউ নয়, ঢেউ কিন্তু সমুদ্র। যিনি জীবাত্মা তিনি ব্রহ্মের সাথে এক, ব্রহ্ম কখন জীবাত্মা হন না। যে সুখ-দুঃখ ভোগ করছে সে কখন ব্রহ্ম হয় না। জীবাত্মা কখন ঈশ্বর হতে পারবে না। যিনি শুদ্ধ হয়ে গেলেন তিনি আর জীবাত্মা কিসের, তিনি তো শুদ্ধ আত্মা। আমার ভেতরে যিনি আছেন, যাঁকে আমরা অন্তর্যামী বলছি, সেই অন্তর্যামীকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে তিনি সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন নাকি করছেন না। যদি ভোগ করেন তাহলে তিনি জীবাত্মা, তিনি সীমিত। এই জীবাত্মাকে যিনি ধারণ করে আছেন, তাঁর কাছে পৌঁছানই আমাদের উদ্দেশ্য। জীবাত্মাকে আমরা সব সময়ই বোধ করছি। সবেতেই যদি এই বোধ থাকে আমি আছি, আমি মরে গেলাম, তখন এই জীবাত্মাকেই বোধ করছি। এখানে জীবাত্মাকে বোধ করার কথা বলছেন না, বলছেন জীবাত্মাকে যিনি ধারণ করে আছেন, কে করে আছেন, সেই শুদ্ধ আত্মা ধারণ করে আছেন, তাঁকে বোধে বোধ করতে হবে। তাঁর মধ্যে যখন অজ্ঞানের ভাব এসে যাচ্ছে তখন তিনি তিনটে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিচ্ছেন। হে নচিকেতা! *এতদ্বৈ তৎ*, তুমি যে আত্মার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলে, ইনিই সেই আত্মা। আত্মাকে যিনি জেনে যান, তখন তিনি আর কোন কিছুকে সুরক্ষিত রাখার জন্য জুগুপ্সা, গোপন করার ইচ্ছা করেন না। পরের মন্ত্রে বলছেন –

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ।।২/১/৬

(যে হিরণ্যগর্ভ জলাদি পঞ্চভূতের পূর্বে জ্ঞানঘন ব্রহ্ম থেকে প্রথম উদ্ভূত হয়েছিলেন এবং যিনি সর্বভূতের হৃদয়াকাশে প্রবেশ করে পাঞ্চভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে অবস্থিত আছেন, সেই হিরণ্যগর্ভকে যিনি দর্শন করেন, তিনি সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন।)

যে মুমুক্ষুরা আদিপুরুষকে, আদিপুরুষ মানে যিনি প্রথম জাত হয়েছেন, কিভাবে জাত হয়েছেন, জল থেকে জন্ম নিয়েছেন আর যিনি সবারই হৃদয়রূপী গুহায় নিবাস করেন, যিনি এভাবে জানেন তিনি ব্রহ্মকেই জানেন, *এতদ্বৈ তৎ*। যমরাজ নচিকেতাকে আবার আত্মার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করছেন। মূল বক্তব্য হল, ভেতরে যিনি অন্তর্যামী, ভেতরে যিনি জ্যোতিস্বরূপ আত্মা আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যিনি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই দুটো

এক। যিনি এই দুটোকে এক দেখছেন তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। এই জিনিষটাকেই যদি বিস্তারিত ভাবে বিচার করতে যাওয়া হয় তখন এটাই অনেক দীর্ঘায়িত আলোচনা হয়ে দাঁড়াবে।

যঃ পূর্বং তপসো, যে মুমুক্ষুগণ তপস্যা থেকে যে হিরণ্যগর্ভের জন্ম, সেই হিরণ্যগর্ভকে জানেন। এখানে ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়, পরিষ্কার না থাকার জন্য পরের দিকে পুরাণাদি শাস্ত্র অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়ে গেছে। সেই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মের উপর যখন একটা অজ্ঞানের আবরণ এসে যায়, তখন তিনি যেন ঈশ্বর রূপে সামনে প্রকটিত হন। বেদে ঈশ্বর শব্দ ছিল না, তার বদলে হিরণ্যগর্ভ শব্দ ছিল। বলা হয় এই হিরণ্যগর্ভের জন্ম তপস্যা থেকে হয়েছে। তপস্যা বলতে এখানে বলছেন জ্ঞান। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি সর্বদা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। সেই জ্ঞান থেকে তাঁর ইচ্ছে হল আমি সৃষ্টি করব। কিন্তু যিনি নির্গুণ নিরাকার, শুদ্ধ চৈতন্য তিনি তো সৃষ্টি করতে পারবেন না, কারণ সৃষ্টি মানেই দুই, সেইজন্য নির্গুণ নিরাকারের সৃষ্টির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, সচ্চিদানন্দের দুই কখন হতে পারেন না, সেইজন্য তিনি তপস্যা করলেন, তপস্যা বলতে এখানে জ্ঞান। তপস্যা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা হল, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করে, ঠাণ্ডা, গরম সব কিছু সহ্য করে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানে বসে থাকা। কিন্তু আচার্য শঙ্কর বারবার তপঃ শব্দকে পরিভাষিত করছেন জ্ঞান রূপে। তপস্যা মানেই জ্ঞান, শুধু এখানেই নয়, ভাগবতাদি অনেক গ্রন্থেও তপস্যা বলতে জ্ঞানকেই বলছেন। তপস্যাই জ্ঞান কিভাবে হয়? জ্ঞানই শক্তি, একটা জিনিষকে জেনে যাওয়া মানেই শক্তি। যখন তপস্যা কোন কারণে বস্তুর দিকে যায়, তখন পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। যেমন রাবণ, সে তপস্যা করল আমি এই ক্ষমতা পেতে চাই। যে অর্থে উপনিষদাদিতে তপস্যার অর্থ হয় সেই অর্থে রাবণের এই তপস্যাকে তপস্যা বলা যায় না। ঠিক ঠিক তপস্যা হল, ঋষি মুনিরা যে তপস্যা করেন। সেই তপস্যাতে জ্ঞান অর্জন হয়, সেই জ্ঞান হওয়ার জন্য ঋষি মুনিদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। জিনিষটাকে জেনে যাওয়ার পর তাঁর যে ক্ষমতা হবে, ঐ ক্ষমতার মত ক্ষমতা আর কিছুতে হবে না।

এখানে বলছেন, সেই যে আদিপুরুষ, বেদে যাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলছেন, পুরাণে যাঁকে ব্রহ্মা বলছেন বা যাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। কেন এই শব্দগুলো বলা হয়? সেই সচ্চিদানন্দই আছেন, যিনি চৈতন্য তিনিই আছেন, কোন এক অজানা কারণে, যে কারণ আমাদের কারুরই জানা নেই আর জানার কথাও নয়, তাঁর বহু হওয়ার ইচ্ছা হয়। বহু হওয়ার ইচ্ছা হওয়ার জন্য অজ্ঞান এসে তাঁকে ধারণ করে নেয়। অজ্ঞান ধারণ করে নেয় আমরা বলছি বটে, কিন্তু যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ তাঁর মধ্যে সব শক্তিই আছে। সব শক্তি থাকার জন্য তাঁর সৃষ্টি করারও শক্তি আছে। কিন্তু সৃষ্টি এক হলে হবে না, সৃষ্টি করতে গেলে তাঁকে দুই হতে হবে। তখন তিনি তাঁর জ্ঞানের শক্তিতে হিরণ্যগর্ভ রূপে এসে যান বা দেখা দেন বা জাত হন। এই তত্ত্ব সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। সেইজন্য পুরাণ এই জিনিষটাকে আখ্যায়িকার মাধ্যমে নিয়ে এসেছে। তিনি যখন সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন দেখা গেল ভগবান নারায়ণ ক্ষীর সাগরে শুয়ে আছেন, তাঁর নাভি থেকে হঠাৎ একটা বিরাট পদ্মফুল ফুটে উঠল, সেই পদ্মের উপর ব্রহ্মাকে বসে থাকতে দেখা গেল। কত সহজ ভাবে দেখিয়ে দিলেন, আসলে তা নয়। এটা আখ্যায়িকা, একটা জিনিষকে বোঝানর জন্য এই আখ্যায়িকা। ক্ষীর সাগর হল কারণ সলিল। কারণ সলিল কেন? অজ্ঞানের ক্ষীণতম আবরণ যেটা সেটাকেই কারণ বলছেন। আমাদের স্থূল শরীর পঞ্চভূত দিয়ে নির্মিত, স্থূল শরীরের পেছেন সূক্ষ্ম শরীর যেখানে পঞ্চপ্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি আছে, এরও পেছনে আছে কারণ শরীর। কারণ হল, শুদ্ধ আত্মার উপর একটা ক্ষীণ অজ্ঞানের আবরণ। ঠিক তেমনি যিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁকে যখন সমষ্টির দৃষ্টিতে দেখা হবে, তাঁর উপর অজ্ঞানের যে একটা ক্ষীণ আবরণ, এটাই সেই কারণ সলিল। কারণ সলিল মানে, কারণের উপর ভাসছে। কারণকে অনেক জায়গায় জল বলা হয়। কিন্তু জল বলতে আমরা সব সময় সাধারণ জল ভাবব। কিন্তু সাধারণ জল তো নয়, সেইজন্য বলছেন কারণ সলিল। কারণ কি? সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটি গুণই সব কিছুর কারণ। জগতের সব কার্যের পেছনে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ রয়েছে। এই তিনটেকেই প্রকৃতি বলা হয়, তাই মূলাকারণ হল প্রকৃতি। প্রকৃতি দিয়ে যখন সেই সচ্চিদানন্দকে দেখা হয় তখন তাঁকে বলছেন হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ হলেন সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। আমাদের প্রচলিত ধারণা হল, ভগবান ক্ষীরসাগরে শুয়ে আছেন, যখন অল্প একটু তন্দ্রা ভাঙে তখন সেখানে বিরাট পদ্মের উপর ব্রহ্মাকে দেখা যায়। আর ব্রহ্মা কোথা থেকে মাটি নিয়ে সৃষ্টি করে দেন। তার মানে চার-পাঁচটা সত্তা এসে গেল, একটা হল জল যার উপর ভগবান শুয়ে

আছেন, শেষনাগ আছে, দুই পদ্মফুল, তিন ব্রহ্মা, চার ব্রহ্মা আবার মাটি জোগাড় করলেন। সেই মাটি থেকে আমাদের সৃষ্টি করলেন। আমাদের কাছে এসে ছটি সত্তা হয়ে গেল। পরম সত্তা হয়ে গেল ছটি। এরপর এটা আর দ্বৈতবাদও থাকল না। আমাদের একটা সত্তা, ব্রহ্মা আলাদা সত্তা, ব্রহ্মা পদ্মফুলের উপর আছেন সেই পদ্মফুল আলাদা, পদ্মফুল যে ভগবানের নাভিতে আছে সেটাও আলাদা, ভগবান আবার শেষনাগের উপর শুয়ে আছেন সেটা আলাদা আর শেষনাগ যার উপর ভাসছে সেই সমুদ্র আলাদা, কারণ এদের কারুরই কোন মিল হতে পারে না। কতগুলি সত্তা এসে গেল, সাংখ্যবাদীরা তো দুটি সত্তার কথা বলেন, পুরুষ আর প্রকৃতি। এটাই আমাদের স্থূল মস্তিষ্কের প্রচলিত ধারণা। আসলে তা নয়, বেদান্ত তাই খুব সহজ করে বলছেন, এই যে *অদ্ভ্যঃ*, *অদ্ভ্যঃ* মানে জল। কি জল? কারণ সলিল, কারণ সলিল মানে যা সব কিছুর কারণ। সব কিছুর কারণ হল মায়া বা প্রকৃতি, প্রকৃতি মানে সত্ত্ব, রজো আর তমো। সেই ভগবানের উপর প্রকৃতি রূপ কাঁচের আবরণ পরে গেল তখন তিনি হিরণ্যগর্ভ রূপে দেখাচ্ছেন। হিরণ্যগর্ভ কি রকম? যেমন আমাদের প্রত্যেকের দেহে জীবাত্মা বাস করেন, যিনি সব সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, ঠিক তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে এক আত্মা আছেন, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুখ-দুঃখকে ভোগ করেন। যেমন জীবাত্মা আমাদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, ঠিক তেমনি সেই বিশ্বাত্মা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেই বিশ্বাত্মাকে বলছেন হিরণ্যগর্ভ।

সমস্যা হল আমরা আমাদের অবস্থা অনুযায়ী সব কিছু বিচার করতে যাই। আমি একটা শহরে থাকি, সেখানে আমার বাড়ি আছে, আমার বাবা আছে, আমার স্ত্রী পুত্র আছে। ঠিক তেমনি এই সৃষ্টির একজন কর্তা আছেন, ব্রহ্মা হলেন সেই সৃষ্টির কর্তা। এখন ব্রহ্মাকেও একটা জায়গায় থাকতে হবে, সেখানে তার একটা বাড়ি থাকতে হবে, বানিয়ে দেওয়া হল ব্রহ্মালোক, ব্রহ্মার একজন বাবা থাকতে হবে, ভগবান বিষ্ণু তাঁর বাবা। তাঁর একজন স্ত্রী থাকতে হবে, স্ত্রী আনতে গেলে আবার গোলমাল লেগে যাবে, তখন অনেক কিছু মিলবে না। সেইজন্য ব্রহ্মার আরও কিছু কিছু গোলমাল আছে। ব্রহ্মাকে অতটা না হলেও বিষ্ণুকে তো আমরা পুরোপুরি আমাদের মত বানিয়ে দিয়েছি। ভগবান বিষ্ণুর নাতি-পোতা সবই আছে, তাঁর দেহরক্ষী আছে, বৈকুণ্ঠধামে তাঁর ভালো মহল আছে, সেখানে লক্ষ্মী সব সময় তাঁর পদসেবা করে যাচ্ছেন। আরও কত কি আছে, শিবের ধুতরা ফুল প্রিয়, নারায়ণের তুলসী প্রিয়, এই যা কিছু আছে আমাদের জন্যই বানানো হয়েছে। মানুষের মন উচ্চতত্ত্ব নিতে পারে না, এই ধরণের কাহিনীর মধ্যেই মন ঘোরাফেরা করতে থাকে। তাতে খারাপ কিছু নেই, এগুলি দিয়ে আমাদের মনকে একটু patternise করছে। কিন্তু উপনিষদ যখন অধ্যয়ন করছি তখন আমরা ঘোর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মধ্যে আছি, এগুলোকে এবার আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

এই কাহিনী আমাদের একটা তত্ত্বকে বুঝতে সাহায্য করছে, কাহিনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেলে আর কোন দিন আমরা এগোতে পারব না। কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলীর কোথাও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক তারপর এদের ছানাপোনা, নাতি-পোতার কোন বর্ণনা পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ লীলাপ্রসঙ্গে কিছু কিছু এসেছে, যেখানে ঠাকুরের মায়ের এই দর্শন, সেই দর্শনের কথা বলছেন। কিন্তু ঠাকুর নিজে কোথাও এই ধরণের কোন কিছু বর্ণনা করছেন না। আচার্য শঙ্করও কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। ব্রহ্মা সৃষ্টি করছেন কি করছেন না, তাতে আমার আপনার কি হবে! সমুদ্র মন্থন থেকে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত করলেন তাতে আমার আপনার কি হয়ে গেল! আর লক্ষ্মী দেখতে কেমন, তাঁর কটি গয়না আছে জেনে আমার আপনার কি হবে! বলছেন লক্ষ্মীর উপাসনা করলে ঐশ্বর্য হবে, সারা দেশ তো লক্ষ্মীর উপাসনা করে যাচ্ছে কিন্তু লক্ষ্মী তাঁর দারিদ্র রূপকেই সবার জন্য পাঠিয়ে যাচ্ছেন, আর যারা লক্ষ্মীর উপাসনা করা দূরে থাক, যারা তাঁর নামও জানে না সেই আমেরিকাবাসীদের নিজের আসল রূপ দেখিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মীর উপাসনা করলে যদি ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হত তাহলে তো ভারতে এত দরিদ্র থাকত না। শিবের পাশুপত, পিনাক এই সেই কত অস্ত্র, কিন্তু বিদেশীরা এসে হিন্দুদের গলা কেটে যাচ্ছে। তাহলে কোথাও কিছু গোলমাল আছে। যে কাজ আমি নিজের হাতে করে নিতে পারি সেই কাজের জন্য ভগবানকে ডাকার কোন অর্থই হয় না। ঠাকুর বলছেন, দুই বন্ধু জঙ্গলে গেছে, বাঘ এসে গেছে, একজন বন্ধু বলছে, চলো ভগবানকে ডাকি। অন্য বন্ধুটি বলছে, এর জন্য ভগবানকে বিরক্ত করার কি দরকার, চলো আমরা গাছে উঠে যাই। যে কাজ আমার পরিশ্রমে হয়ে যাবে, সেই কাজের জন্য ভগবানকে কেন ডাকতে যাব! মা আমজাদকে রুটি খাইয়েছিলেন কিনা, খাওয়ালে কটা রুটি খাইয়েছিলেন, এসব জেনে আমার আপনার কি হবে! মূল যে আধ্যাত্মিকতা, সেদিকে কারুরই দৃষ্টি নেই। কিন্তু এগুলোকেই রসিয়ে রসিয়ে

ভাষা দিয়ে, অলঙ্কার দিয়ে বর্ণনার পর বর্ণনা করে যাচ্ছে। এগুলো কখনই আধ্যাত্মিকতা নয়, ঘোর তমোগুণী ধর্ম। নিজের যেমন নাতি-পোতার সংসার ঠিক তেমনি ভগবানেরও নাতি-পোতার সংসার বানিয়ে দিয়ে তার মধ্যেই মস্ত হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের ধর্ম হল জীবন্ত ধর্ম। যে ধর্ম ধ্যান-ধারণা করে, তপস্যা করে জ্ঞান উপলব্ধি করার কথা বলছে, সেটাই জীবন্ত ধর্ম। তপস্যাই জ্ঞান। আমার আপনার অভাব কোথায়? টাকা-পয়সা যাদের আছে তাদেরও শান্তি নেই, যাদের নেই তাদেরও শান্তি নেই, তাদের আরও কষ্ট। অভাবের জন্য লোকে গলায় দড়ি দিয়ে দেয়, কিন্তু টাকা বেশি হয়ে গেছে বলে কেউ গলায় দড়ি দিয়েছে শোনা যায় না। কিন্তু তাই বলে কি তাদের শান্তি আছে? কারুরই শান্তি নেই। শান্তি কার আছে? শান্তি একমাত্র তারই আছে যার জ্ঞান আছে। যার জ্ঞান আছে সে কখনই অশান্ত হয় না। সমস্ত উপনিষদ জুড়ে এই কথাই বলে যাচ্ছেন। স্টেশনে নিজের বাচ্চাকে নিয়ে ট্রেন ধরার জন্য বাবা-মা অপেক্ষা করছে, বাচ্চা প্রত্যেক এক মিনিট অন্তর জিজ্ঞেস করে যাবে, মা ট্রেন কখন আসবে, মা ট্রেন কখন আসবে। যে জেনে গেছে ট্রেন চল্লিশ মিনিট পরে আসবে, সে শান্ত। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই সব কিছু। যার জ্ঞান আছে সে কখন অশান্ত হয় না। যার জ্ঞান আছে সে কখন কষ্ট পায় না, কখন শোক করে না। যে জানে একটাই ট্রেন আছে, কিন্তু টাইমিং জানে না। দৌড়ে এসে একে একবার জিজ্ঞেস করবে, তাকে একবার জিজ্ঞেস করবে, দাদা ট্রেন কি চলে গেছে। অশান্তি তারই হয়। ট্রেন যদি চলে গিয়ে থাকে শোক তারই হবে। কিন্তু যে জানে, একটাই ট্রেন আছে, আর ট্রেন এতক্ষণ পরে আসবে, সে হেলতে দুলতে শান্ত মনে স্টেশনে আসবে। আমরা আমাদের প্রকৃত স্বভাব জানি না বলে সবাই কাঁদছি, সবারই অশান্তি। যিনি জানেন আমার প্রকৃত স্বভাব কি, তিনিই একমাত্র শান্ত। ঠাকুর বেড়াল ছার স্বভাবের কথা বলছেন। মূল কথা, মাকে ধরে রাখ। ঠাকুর খুব উচ্চ আধ্যাত্মিকতার কথা বলছেন। মা যেমন বলছেন, শরৎ যেমন আমার ছেলে, আমজাদও আমার ছেলে। এই ভাবকে অবলম্বন করে কেউ যদি সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, স্বামীজী যেমন মায়ের সন্তান, আমিও ঠিক সেই মায়েরই সন্তান, সে সিদ্ধি পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের সেই দৃঢ় বিশ্বাস নেই, শুনতে খুব মিষ্টি মিষ্টি লাগে, নাটক, নভেল, টিভি দেখার মত এই কাহিনীগুলোকে আমরা উপভোগ করি। এভাবে উপভোগের কোন মূল্য নেই।

পুরাণের সব কাহিনীই একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে আমাদের মত মুর্খদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। আমরা এত এত শাস্ত্র কথা নিষ্ঠা নিয়ে দিনের পর দিন শুনে যাচ্ছি, কিন্তু আমরাও ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারছি না। সেখানে যারা গ্রামের সাধারণ লোক, কোন দিন শাস্ত্রের কথা শোনেনি তারা কী ধারণা করবে! সেইজন্য তাদের বলছেন, যখন সৃষ্টি হয় তখন এভাবে হয়। কিন্তু আমরা যারা শাস্ত্রের কথা শুনছি, আমাদের জন্য এই কাহিনী আর চলবে না। আমাদের চলতে হবে আসল তত্ত্বকে নিয়ে। আসল তত্ত্বটা কি? শুদ্ধ আত্মা ছাড়া কিছু নেই। শুদ্ধ আত্মা কোন একটা কারণে, যে কারণ আমরা কেউই জানি না, তিনি বললেন আমি এক আমি এবার বহু হব। তখন সৃষ্টি করেন। কিভাবে সৃষ্টি করেন? নিজের জ্ঞান শক্তিতে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ যিনি তিনিই সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি হলেন সর্ব ঐশ্বর্যবান। আচার্য এটাকেই বলছেন *স চ ভগবান*। ভগবান কে? জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ এই ছটি ঐশ্বর্যে যিনি সদা সম্পন্ন, তিনিই ভগবান। ছটিরও কোন দরকার নেই, শুধু একটা থাকলেই হবে, তা হল জ্ঞান। যাঁর জ্ঞান আছে তাঁর আছে শক্তি, যাঁর আছে শক্তি তাঁর বাকি সব আছে। ঐশ্বর্য তাঁর, সব ক্ষমতা তাঁর, শান্তি তাঁর। এখানে ঠিক তাই বলছেন, হিরণ্যগর্ভের যে জন্ম হয় তা তাঁর জ্ঞানের জোরে। আর হিরণ্যগর্ভ কি করেন? তিনি তপস্যা করেন, তপস্যা করেন মানে একটা জিনিষকে নিয়েই একাগ্র হয়ে যান। একাগ্রতার জন্য তিনি জ্ঞান উপলব্ধি করেন। কি উপলব্ধি করেন? আগের কল্পে সৃষ্টি যেমনটি ছিল এবারে আমাকে সেভাবেই সৃষ্টি করতে হবে। এটাও জ্ঞান। তপস্যা মানে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বা দুটো হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বা রাতে না খেয়ে, দিনে না খেয়ে থাকাটা তপস্যা নয়, তপস্যার ঠিক ঠিক অর্থ বেদ উপনিষদ বলছেন জ্ঞান, যেখানে বলছেন, *তপো ব্রহ্মেতি স তপোঽতপ্যত*, তপস্যাই ব্রহ্ম, তিনি তপস্যা করলেন, মানে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যিনি হয়ে গেলেন তাঁর শক্তি এসে গেল। শক্তি এসে যাওয়া মানে তিনি এবার সমস্ত জগতের মালিক হয়ে গেলেন। সমস্ত যোগসাধনার লক্ষ্য জ্ঞানোপলব্ধি, সমগ্র উপনিষদের বক্তব্য জ্ঞানোপলব্ধি, জ্ঞানোপলব্ধি ছাড়া আমাদের শাস্ত্রে আর কিছু নেই। বাইবেলেও ঘুরে ঘুরে সেই একই কথা বলছে, তুমি জানো knowledge will make you free।

আগেও বলা হয়েছে *অদ্ভ্যঃ* মানে জল। জল দিয়ে পাঁচটি তত্ত্ব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর কথাই বলছেন। এই জল পরের দিকে গিয়ে অন্য রকম হয়ে গেছে। যে পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে সৃষ্টি কার্য চলছে, এই পাঁচটি তত্ত্বের জন্মের আগেও জন্ম হয়েছিল মহতের। মহৎ যখনই এসে গেল তখন হিরণ্যগর্ভ এসে গেলেন। কিন্তু এরও অনেক পরে পঞ্চ তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। আমাদের জন্ম পৃথিবী, জল, আকাশ তত্ত্ব থেকে, আমরা তাই এই পঞ্চ তত্ত্বকে দেখছি। সেইজন্য আমাদের উদ্দেশ্যে বলছেন এই পঞ্চ তত্ত্বেরও আগে হিরণ্যগর্ভের জন্ম হয়েছে। কিভাবে জন্ম হয়েছে? জ্ঞানের দ্বারা, ভগবানের মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান সেই জ্ঞান থেকে আর পুরাণাদি মতে ব্রহ্মা তপস্যা করে সৃষ্টি করেছেন।

ব্রহ্ম হলেন জ্ঞানলক্ষণ, যার জন্য আত্মাকেও বলা হয় তিনি সব কিছু জানতে পারেন। ব্রহ্মের লক্ষণ হল জ্ঞান, তাঁর এই জ্ঞানের জন্য জন্ম হল ব্রহ্মা, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের। সেই হিরণ্যগর্ভ থেকে জন্ম হয়েছে পঞ্চ তত্ত্ব। এই হিরণ্যগর্ভই দেবতাদি যত প্রাণী আছে সবাইকে তিনি সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করার পর তিনি তাদের মধ্যে নিজে ঢুকে গেলেন। ঢুকে যাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে চেতনা এসে গেল। ভাগবতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ভগবান তো পঞ্চ তত্ত্বগুলিকে সৃষ্টি করে দিলেন। কিন্তু পঞ্চ তত্ত্বরা কেউ সৃষ্টি কার্য করতে পারছে না। তখন তারা ভগবানকে গিয়ে বলল, আপনি তো আমাদের সৃষ্টি করে দিলেন কিন্তু আমরা কোন সৃষ্টি কার্য করতে পারছি না। ভগবান বললেন, ঠিক আছে, বলে তিনি পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। তারপর থেকে তারা সৃষ্টি কার্য করতে সক্ষম হল। বলতে চাইছেন, চৈতন্য শক্তি যদি বস্তুর পেছনে না থাকে সৃষ্টি হতে পারে না। সেইজন্য তিনি দেবতাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন তার সাথে মানুষ জাতি, আমাদের সবার মধ্যে যে হৃদয়াকাশ সেখানেও তিনি প্রবেশ করে গেলেন। এই রকম যিনি দেখেন তিনিই ঠিক ঠিক আত্মাকে জানতে পারেন। তার মানে, সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্ম যিনি, উনি কোন কার্য করেন না, কিন্তু তাঁর আছে জ্ঞান, জ্ঞান তাঁর লক্ষণ, এটাই তাঁর স্বরূপ। তিনি নিজের সেই শক্তিতে যেন মায়ার সৃষ্টি করেন। অন্যান্য দর্শনে বলবে তিনি ও তাঁর শক্তি অভেদ। কিন্তু যে সুপ্ত শক্তি ছিল সেই শক্তি এবার জেগে গেল। এটাকেই আবার অনেকে জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি বলে। এত কিছুতে আমাদের গিয়ে কাজ নেই, মূল কথা হল, সচ্চিদানন্দের ভেতরেই যে শক্তি ছিল, সৃষ্টি হওয়া মানে সেই শক্তি এবার প্রকাশিত হল। ঠাকুর বলছেন, জল হেললে দুললেও জল শান্ত থাকলেও জল, সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ আবার তির্যক গতিতে চললেও সাপ। ব্রহ্ম যখন তির্যক গতি নিয়ে এলেন তখন সৃষ্টি গতিমান হল। অন্যান্য ক্ষেত্রে গতিটা বাইরে থেকে আসে, সমুদ্রের যে চাঞ্চল্য তা বাতাস থেকে আসে। ঈশ্বরের যে জ্ঞানশক্তি সেই জ্ঞানশক্তি দিয়ে জগতের সৃষ্টি ক্রিয়া হয়। ব্রহ্মা সব কিছুর সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। এর আগে আমরা কতগুলো সত্তা দেখেছিলাম, ক্ষীর সাগর আছে, শেষনাগ আছে, পদ্মফুল আছে, ব্রহ্মা আছেন, কিন্তু আবার পুরো ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গেল। কি রকম অন্য রকম হয়ে গেল? সেই ভগবান নিজের জ্ঞানশক্তিতে ব্রহ্মা হয়েছেন, সেই ব্রহ্মা এবার সৃষ্টি করলেন। পুরাণে বলছে ব্রহ্মা প্রথমে নিজের মন থেকেই সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি সেগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। তার মানে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যে চৈতন্য সত্তা, সেই চৈতন্য সত্তা প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান হয়ে আছেন। সেই চৈতন্য সত্তা আবার প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে ঢুকে আছেন। যত পিণ্ডাণ্ডে তত ব্রহ্মাণ্ডে, অণু, এ্যটমের পেছনে যে চৈতন্য সত্তা আছে সেই একই সত্তা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে আছেন। এটাকে যিনি জানেন তিনিই আত্মাকে জানেন, এটাই এই মন্ত্রের মূল বক্তব্য।

এর আরেকটি সিদ্ধান্ত হয়, অদ্বৈতের ব্যাপারে লোকে মনে করে যে অদ্বৈত জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তা নয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও একটা দাম আছে। কি দাম? বস্তু রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন মাহাত্ম্য নেই। তাহলে মাহাত্ম্য কোথায়? এর পেছনে যে চৈতন্য সত্তা আছে সেই রূপে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, মানুষ বস্তুকে বস্তুর জন্য ভালোবাসে না, বস্তুর মধ্যে নিজের ছবি দেখতে পায়। বস্তুকে যদি বস্তু রূপে কেউ ভালোবাসে তাহলে সে কিন্তু বিপদে পড়বে। যখন তাকে ব্রহ্ম রূপে দেখছে বা সেই চৈতন্য সত্তা তার মধ্যে প্রবেশ করে আছেন দেখছে, তখনই সে জ্ঞানের দিকে এগোতে পারবে। কাউকে দুশ্চরিত্র বলা মানে আমি তাকে বস্তু রূপে দেখছি। বস্তু রূপে দেখলে, আমার মনে লোভ হবে, শোক হবে, পাপ হবে। কিন্তু যদি চৈতন্য রূপে নেওয়া হয়, তখন আর কোন পাপ হয় না। ঠাকুর টাকা মাটি, মাটি টাকা করে দুটোই গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করে দিলেন, টাকাকে ঠাকুর বস্তু রূপে ত্যাগ করছেন। তিনি ধাতুকে বস্তু রূপে চিরদিনের জন্য ত্যাগ

করে দিলেন। অন্য দিকে শ্রীমা সেই টাকাকেই কপালে ঠেকিয়ে খুব শ্রদ্ধার সাথে সামলে রাখতেন, মা টাকাকে ব্রহ্ম রূপে সামলে রাখছেন। আমরা সবাই টাকাকে টাকা রূপেই দেখি। কিন্তু টাকাকে যখন লক্ষ্মী রূপে দেখবে, টাকা হল মা লক্ষ্মীর রূপ, তখন স্বাভাবিক ভাবেই খুব সাবধানে সে খরচ করবে। আমরা বলি লক্ষ্মী চঞ্চলা, তাই টাকা কারুর কাছে চিরদিন থাকে না, কিন্তু এই ভাব যদি এসে যায় তখন পুরো জিনিষটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। মা, বোন, দিদি, স্ত্রী এরা মায়েরই একটা রূপ, শক্তিরূপিণী, প্রত্যেক নারীর প্রতি যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী এসে যায় তখন কি আর নারী নির্যাতন, নারী উৎপীড়ন এই শব্দগুলো থাকবে! বাঙ্গালীরা নিজের মেয়েকে মা বলে ডাকে, মা বলে ডাকা মানে কত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, নিজের মেয়ের মধ্যে জগজ্জননীকে দেখছে, কত সম্মান দিচ্ছে। এখানে সেটাই বলছেন, জগৎকে জগৎ রূপে ত্যাগ করে যখন জগতের পেছনে যে চৈতন্য সত্তা আছে সেই চৈতন্য সত্তা রূপে জগৎকে দেখে তখনই মানুষ আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে। আমার ভেতরে যে সত্তা আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনেও সেই একই সত্তা, সেই সত্তাই সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করে আছেন, এই দৃষ্টি যাঁর হয়ে যায় তিনিই ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানী।

এই মন্ত্রে বলছেন, যত রকম তত্ত্ব আছে সব তত্ত্বেরও আগে হিরণ্যগর্ভের জন্ম, এটাই সেই ব্রহ্ম। *গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং*, মানুষের শরীরের ভেতরে চৈতন্য রূপে তিনিই বিদ্যমান। যিনি পরমব্রহ্ম তিনি হিরণ্যগর্ভ রূপে এই জগতে বিদ্যমান আর তিনিই সমস্থ প্রাণীর দেহের ভেতরে চৈতন্য সত্তা রূপে বিরাজ করে আছেন। খুব সামান্য কয়েকটা জিনিষ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুরের ভাষায় বলতে হলে বলা যেতে পারে, যিনি নিরাকার তিনিই সাকার আবার তিনিই সবার হৃদয়ে আছেন। এই কথাই এখানে বলতে চাইছেন। কিন্তু উপনিষদের ঋষিরা যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই বর্ণনা করছেন। এই নয় যে ঋষিরা খুব কঠিন করে বলছেন, তখনকার দিনে ঋষিদের কাছে এই ভাষাই ছিল। তখন কেউ হিরণ্যগর্ভের পূজা করতেন, যোগীরা নিজের উপর ধ্যান করতেন আর কর্মবাদীরা ছিলেন যাঁরা অগ্নির উপাসনা করতেন, আহুতি দিতেন আর বলতেন এর দ্বারাই সব কিছু হবে। কিন্তু যিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তিনি দেখছেন যিনি শুদ্ধ আত্মা, মানে ভগবান বা পুরুষ, যিনি নিরাকার, তিনিই এই প্রথম পুরুষ রূপে জন্ম নিয়েছেন, তিনিই সবার হৃদয়ে বাস করছেন, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় সেই অগ্নিও তিনিই হয়েছেন, যে সূর্যের পূজা হয় সেই সূর্যের পেছনে যে সত্তা সেটাও তিনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লীর পাঁচ থেকে নয়, এই পাঁচটি মন্ত্রের বক্তব্য খুব সরল, কিন্তু ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। কয়েকটা জিনিষ পরিষ্কার থাকলে এই কটি মন্ত্রের সাথে পরের কয়েকটি মন্ত্রও ধারণা করতে সুবিধা হবে। প্রথমে তিনটি ছোট ছোট ঘটনার কথা আমরা উপমার জন্য বলছি। প্রথম ঘটনা হল, লায়লা-মজনুর কাহিনীতে নাকি বলা হয় লায়লা দেখতে ভালো ছিল না, গায়ের রঙ কালো ছিল। অবশ্য এটা বলা যেতে পারে যে, লায়লা-মজনুর কাহিনী ভারতে এসে লায়লার গায়ের রঙ কালো হয়ে গেছে। এই কাহিনী আরব দেশের, আরব দেশে কেউ কালো হয় না। লায়লা আর মজনুকে নিয়ে দুটো উপজাতির মধ্যে মারামারি হচ্ছে দেখে রাজা দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছে। লায়লাকে দেখে রাজা অবাক হয়ে গেল, এই মেয়ের জন্য এত কাণ্ড! মজনুকে ডেকে বলল 'এরকম বাজে দেখতে একটা মেয়ের জন্য তুমি লড়াই যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছ'! মজনু তখন যে কথা রাজাকে বলছে, এই কথাই পরে খুব বিখ্যাত হয়ে গেছে। মজনু বলছে 'জাঁহাপনা! আপনি নিজের চোখে লায়লাকে দেখবেন না, আপনি আমার চোখ দিয়ে দেখুন'। একটা জিনিষকে বোঝানর জন্য পরের দিকে লায়লা-মজনুর কাহিনীতে এই ঘটনাটা সংযোজিত করা হয়েছে। লায়লা সত্যিই খুব রূপসী ছিল। দ্বিতীয় ঘটনা, যিশুর কাছে এক খঞ্জকে নিয়ে আসা হয়েছে। তখনকার দিনে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল যে, সাধু মহাত্মারা যাকে যা আশীর্বাদ করবেন সেটাই তার হয়ে যাবে। অন্ধ দেখতে শুরু করবে, খঞ্জ হাটতে পারবে, কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে যাবে। যিশুর কাছেও তাই খঞ্জকে নিয়ে আসা হয়েছে। যিশু বলছেন, In the name of my Father in Heaven get up and walk, বলতেই, খঞ্জের পা ঠিক হয়ে গেল। আনন্দে লোকটি যিশুকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। যিশু তখন বাইবেলে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, খ্রীষ্টানরা প্রায়ই এই কথাকে বিভিন্ন সময় উল্লেখ করে। বুঝে করে নাকি না বুঝে করে আমাদের জানা নেই। তবে বুঝে যদি করত তাহলে খ্রিশ্চানিটি আর খ্রিশ্চানিটি থাকত না, ওটাই বেদান্ত হয়ে যেত। যিশু বলছেন, Go, thy faith yield thy। ঈশ্বরের প্রতি তোমার যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসই তোমাকে সারিয়েছে। তার মানে যিশু বলতে চাইছেন, আমি কিছু করিনি তোমার বিশ্বাসই তোমার খঞ্জত্ব সারিয়েছে। তৃতীয় কাহিনী, ঠাকুর বলছেন, যদ্যাপি

আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। একদিকে বলছেন সচ্চিদানন্দই গুরু আবার অন্য দিকে বলছেন গুরু এই রকম গোলমেলে হলেও তিনিই আমার গুরু। প্রথমটা হল, আমি যাকে ভালোবাসি তাকে আমার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। দ্বিতীয় আমার ভেতরে যে বিশ্বাস এই বিশ্বাসই আমাকে সারিয়েছে। তৃতীয়, ঠাকুর একদিকে বলছেন সচ্চিদানন্দই গুরু আবার অন্য দিকে বলছেন, আমার ভক্তি। তাহলে জগতের যে সত্য তা হল ভালোবাসার সত্য। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, মানুষ যে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে স্ত্রীর জন্য ভালোবাসে না, নিজের আত্মাকেই স্ত্রীর মধ্যে দেখে বলেই ভালোবাসে।

তিনটি ঘটনা বলতে চাইছে Objective Reality বলে কিছু নেই, Subjective reaction এরই গুরুত্ব। এখানে এই কলম আছে, এর সাথে আরও কয়েকটি কলম রেখে দেওয়া হয়েছে। এই কলমের একটা objective value হল কলম। কিন্তু এর একটা subjective value আছে। কি মূল্য? পাঁচটা কলমের মধ্যে আমি বলছি ওটাই আমার কলম, এই তো আমার কলমটা পাওয়া গেছে। খুব নামকরা কাঠুরিয়ার গল্প, কাঠ কাটতে গিয়ে কুঠারটা নদীর জলে পড়ে গেছে। কাঠুরিয়া কাঁদছে। জলদেবী সোনার একটা কুঠার এনে বলছে, এটা কি তোমার? না, এটা আমার না। রূপোর কুঠার নিয়ে দেখালেন। এটাও আমার না। ওর আসল কুঠার নিয়ে আসতেই লাফিয়ে উঠে বলছে, এটাই আমার। যদি কুঠার বস্তুর গুরুত্ব থাকত তাহলে যে কোন একটা কুঠার নিয়ে নিলেই হত। কিন্তু কুঠারের যে subjectivity চলছে সেটাই তার মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। এত জিনিষ থাকতে বিশেষ কিছু জিনিষ আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান কেন? আমাদের জীবনে মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র কত মূল্যবান, কিন্তু কেন? পুত্রই যদি আমার কাছে মূল্যবান মনে হয় তাহলে যে কোন একজনের পুত্র হলেই হয়ে যেত। আমার যে subjectivity জড়িয়ে আছে, এই subjectivityই বস্তুকে মহৎ করছে। এটা হল জাগতিক অর্থে। এটাই যখন আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে তখন বলছেন Thy faith had yield thy, তোমার মধ্যে তোমার নিজের যে বিশ্বাস এই বিশ্বাসই তোমাকে সারিয়ে দিয়েছে। আরেক ধাপ যখন এগিয়ে গেল, তখন ঠাকুর বলছেন, গুরুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হয়, গুরুর প্রতি বিশ্বাস, গুরুবাক্যে বিশ্বাস না থাকলে হবে না।

এবার ঈশ্বরের ব্যাপারে গেলে কি হবে? ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই নিত্য ঠাকুর এই কথা বারবার বলছেন বা সব শাস্ত্রই বলছে। বাকি সবই অনিত্য এই ধরণের কিছু বিশ্বাস আমাদের মধ্যে কাজ করছে ঠিকই। কিন্তু যেটা সত্য, সেটা ত্রিকালে একই সত্য থেকে যায়, সেখানে এখন কি হবে? ঈশ্বরই সত্য, যে জিনিষ দেশ, কাল ও বস্তুতে বাধিত নয় সেটাই পরম সত্তা বা ঈশ্বর। বাকি সব কিছু বাধিত সত্য। বাধিত সত্য না হয় আমাদের subjective influenceএ যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কি হবে? আসলে এই ব্যাপারটা ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও হয়। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও হয় বলেই এত গোলমাল। কারণ ঈশ্বরকে দেখা মানেই মন দিয়ে দেখা। যেখানেই মন দিয়ে দেখা হবে সেখানেই জিনিষটা কিন্তু subjective হয়ে যায়। সেইজন্য হিন্দুদের যে এত রকমের ঈশ্বর রয়েছে, শিব আছেন, কালী আছেন, বিষ্ণু আছেন, শ্রীকৃষ্ণ, গণেশ রয়েছেন তার কারণ এটাই, subjective realityতে কখনই একটা দেখাবে না, যিনি পরম সত্তা তাঁকেই বহু রূপে দেখাবে। তাহলে কি কখন এক হবে না? হ্যাঁ, একও হবে। দুটো তিনটে মন্ত্রের পরেই বলবেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো* বা *জ্যোতিরিবধুমকঃ*, সেখানে এক হবে। কবে হবে? যখন মনের এলাকাকে ছাড়িয়ে যাবে। মনের এলাকা ছাড়িয়ে গেলে সত্য যেমন সত্য ঠিক সেই সত্যই অনুভব হবে। মনের এলাকায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সে যেমনটি চাইছে তেমনটি হবে। একজন ভক্ত ঠাকুর দর্শন করতে গিয়ে দেখছে ঠাকুরের বিগ্রহ সজীব, কিন্তু ঠাকুরের কানের দুল দুলছে না। ভক্ত তখন বলছে, ঠাকুর তোমার কানের দুল দুলছে না কেন? তুমি দোলাচ্ছ না তাই দুলছে না।

তাহলে ঈশ্বরের সত্তা কি মিথ্যা? কখনই না, পুরোপুরি সত্য। শুধু মন দিয়ে দেখছে বলে এক রকম দেখাচ্ছে। এই কলমটা কি নেই? অবশ্যই আছে, আমি কলমকে যেমনটি দেখছি। একটা অবস্থায় অনেকে বলবে, আরে বাবা পেন হলেই হল অত ভাবার কি আছে, সই করা নিয়ে কথা, তোমার পেনে সই করলেও যা আমার পেনে সই করলেও তাই। তার মানে এখন সে পুরোপুরি objective realityতে চলে এসেছে। মনের এলাকায় ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কখনই objective reality হয় না। জ্ঞাতা একমাত্র ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া জ্ঞাতা আর কেউ হয় না। তিনি যখন তিনিকে তিনি যেমন তেমনটি বোধ করেন, তখন জিনিষটা এক রকম দেখায়। কিন্তু যখন তাঁকে তাঁর মত দেখাচ্ছে না, তখন আমার মনের যেমন সংস্কার তৈরী হয়ে আছে সেই সংস্কার অনুযায়ী

যেমনটি দেখছি, তিনি তেমনটি দেখাচ্ছেন। এই পর্যন্ত আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যতক্ষণ আমরা মনের এলাকায় আছি, সেই মন শুদ্ধ হোক, পরিশুদ্ধ হোক, অশুদ্ধ হোক যাই হোক না কেন, জগৎকে আমি তেমনটিই দেখব। মনের এলাকা থেকে পরম সত্তা বা ঈশ্বরকে যখন দেখব তখনও ঠিক সেভাবেই দেখব যেমনটি আমার মনের গঠণ। কিন্তু একটা অবস্থায় শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক হয়ে যাচ্ছে। তখন কেমন দেখাবে? তখন তো মন দিয়ে দেখছে না, তখন তিনি যেমন ঠিক তেমনটি দেখাবে। তিনি যেমনটি তেমনটি দেখা যাচ্ছে, আর শুদ্ধ মন দিয়ে তাঁকে দেখছে, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু কোন তফাৎ নেই, ব্যাপারটা আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখা দরকার। এটাকেই বলছেন, সগুণ ঈশ্বর আর নির্গুণ ঈশ্বরে কোন তফাৎ নেই। সগুণকে জানা যা নির্গুণকে জানাও তাই, তফাৎ হল সগুণ ঈশ্বরকে একজন মন দিয়ে অনুভব করছেন আর নির্গুণ ঈশ্বরকে যথাবৎ মন ছাড়া বোধে বোধ করছেন। এছাড়া আর কোন তফাৎ নেই, অথচ দুটো রূপ আলাদা, কেউ কৃষ্ণ দেখবেন, কেউ কালী দেখবেন, কেউ কৃষ্ণকে বাঁশী নিয়ে দেখবেন কেউ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথী রূপে দেখবে। কিন্তু কোথাও কোন তফাৎ নেই, চিনির ডেলা বিভিন্ন আকৃতি রূপে আসছে। আত্মাকে যখন মন দিয়ে দেখছেন তখন কেমন দেখেন তারই বর্ণনা করলেন পাঁচ থেকে আট নম্বর মন্ত্রে। পরের কয়েকটি মন্ত্রে মনকে অতিক্রম করে যাওয়ার পর যা দেখেন সেটাকে বলছেন।

আজ আমরা খুব সহজ ভাবে বলে দিচ্ছি কালীও যা কৃষ্ণও তাই, বিষ্ণুও যা শিবও তাই। উপনিষদের ঋষিদের কাছে কালী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব এনারা কেউ ছিলেন না, কিন্তু এনারাই তখন বিরাট রূপে ছিলেন। সেই বিরাট রূপকেই ঋষিরা বলছেন আদিপুরুষ, কখন অধিপুরুষও বলছেন। আর দেখছেন প্রথম জাত ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ রূপে। অথবা দেখছেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে প্রাণশক্তি, সেই রূপে। বা দেখছেন সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, তারকা এদের পেছনে যে দিব্য শক্তি বিদ্যমান, সেই শক্তি রূপে। বা দেখছেন আমাদের সবার ভেতরে যে জীবাত্মা বা চৈতন্য সত্তা বিদ্যমান, সেই রূপে। উপনিষদে পর পর মন্ত্রে এই জিনিষগুলির বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, পরম সত্তা তিনিই আমাদের সবার ভেতরে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করে আছেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণ রূপে সঞ্চালন করছেন। তিনিই আবার হিরণ্যগর্ভ রূপে প্রথম জাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের সবার ভেতরে যে প্রাণনক্রিয়া চলছে, এই প্রাণনক্রিয়া যে কেন্দ্র থেকে সঞ্চালিত হচ্ছে সেই কেন্দ্রটাও তিনি। আজকের দিনে আমাদের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে বলা হচ্ছে কালীও যা কৃষ্ণও তাই। এই কথা ঠাকুর বলছেন, উপনিষদের এই কথাগুলো যে ঋষিরা বলছেন তাঁরাও ঠাকুরের মতই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরুষ। ঋষিরা যে কথাগুলো বলেছেন, ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলো আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। কিন্তু এর পরে যারা বলছে সব ঈশ্বরই সমান, এদের কথা আমাদের ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ আগে তুমি কোন একটা ঈশ্বরকে দর্শন কর, ঈশ্বরীয় কোন একটা ভাবকে উপলব্ধি কর তারপর তুমি বল সব ঈশ্বর এক। কিছুই হয়নি, তাই এই কথা গুলিও কারুর হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

এখানে বলছেন, ব্যষ্টিতে যে চৈতন্য সত্তা বা সেই চৈতন্য সত্তার জন্য যে ক্রিয়া হয়, সেটা তিনি। আবার সমষ্টিতে যে চৈতন্য সত্তা আর সেই সত্তার জন্য যে সমষ্টিতে সব সময় ক্রিয়া চলছে, সেটাও তিনি। এটাই ঈশ্বরের স্বরাট আর বিরাট রূপ, বিরাট রূপ হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমরা সবাই বেলুড় মঠে ঠাকুর মন্দিরে যাই, ঠাকুরকে দর্শন করি, প্রণাম করি, চরণামৃত পান করে বেরিয়ে আসছি। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখছি উন্মুক্ত খোলা আকাশ, সামনে পূণ্যতোয়া গঙ্গা যুগ যুগ ধরে বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একবারও কি শান্ত মনে একদিনও ভাবার চেষ্টা করেছি, আহা! গর্ভমন্দিরে যে ঠাকুরের রূপ দর্শন করলাম আর বাইরে মাথার উপর ব্যপৃত খোলা আকাশ, গঙ্গা, বৃক্ষলতাদি, মানুষজন, বাড়িঘর, এই বেলুড় মঠ সবটাই ঠাকুরেরই রূপ? খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ার লাইনে যখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি তখন কি একবারও ভেবে দেখছি যে এটাই বিশ্বতোমুখম, বহু মুখে ঠাকুরই প্রসাদ খাচ্ছেন। এই বিরাট রূপটাও তাঁরই রূপ আবার মন্দিরে যিনি বসে আছেন সেটাও তাঁরই রূপ, আমরা অন্তরে যিনি অন্তর্যামী হয়ে বিরাজ করছেন সেটাও ঠাকুরেরই রূপ। একই সত্তা তিনটে রূপে ভাসছে। দক্ষিণেশ্বরে বৃক্ষের ডালে ডালে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি, ঠাকুর বলছেন, দেখছি সেই বিরাটেরই পূজা হচ্ছে, বৃক্ষের পুষ্পস্তবক বিরাটের সামনে যেন অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে। তিনি বাস্তবিকই দেখছেন। কঠোপনিষদে এখানে তারই বর্ণনা চলছে। ঠাকুর বলছেন বলে আমাদের এখানে বুঝতে সহজ হচ্ছে। কিন্তু যমরাজের কাছে যে আত্মার কথা নচিকেতা জিজ্ঞেস করেছিল, আত্মা আছেন কি নেই, সেই আত্মার

ব্যাপারে বলতে গিয়ে তাঁরই বিভিন্ন রূপকে দেখাচ্ছেন। তুমি ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে চৈতন্যকে দেখবে, ইনি সেই আত্মা, হিরণ্যগর্ভও তিনি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে বিরাট রূপ সেটাও তিনি, যত রকমের প্রাণন ক্রিয়া চলছে, যত কাজকর্ম চলছে সব কিছুর পেছনে একটি সত্তা, সেই সত্তাও তিনি। প্রভু রূপ, বিভু রূপ, বিরাট রূপ, যত রকম রূপ সবটাই তিনি, এটাই সেই, *এতদ্বৈ* তৎ। এই জিনিষটাই কয়েকটি মন্ত্রে বলছেন।

মূল কথা হল, একটা Objective Reality আরেকটি Subjective Reaction। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে গিয়ে যখন শুদ্ধ মন দিয়ে দেখেন, তার মধ্যেও সেখানে নিজের subjectivity যেন একটু জড়িয়ে থাকে। আরেকটা ধাপে গিয়ে subjectivity পুরো খসে যায়, তখন শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ আত্মাকেই বোধ করেন। Objective জিনিষ থেকে Subjective Reactionকে যখন বাদ দিয়ে পুরো ঈশ্বরীয় কথায় চলে আসছেন, তখন ঐ বিন্দু থেকে বিভিন্ন ধরণের অনুভূতি হবে, ঠাকুর যেমন বলছেন নিরাকারও যা সাকারও তাই, ঠাকুরের যেমন বিভিন্ন রকম দর্শন হয়েছিল, উপনিষদের ঋষিরাও পরম সত্তাকে বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন। ঠাকুর আবার বলছেন, এখানকার কথা বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। বেদ-উপনিষদাদিতে যত রকমের বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষ ভাববে মোটামুটি এত ধরণের বর্ণনাই আছে। ঠাকুর বলছেন, তাঁর অনুভূতি তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ঠাকুর কি কি ছাড়িয়ে গেছেন সেটাকে দেখতে গেলে পৃথক একটা গবেষণার বিষয় হয়ে যাবে। কারণ তখন খুঁজে দেখতে হবে ঠাকুরের কি কি অনুভূতি আছে বেদ উপনিষদে যার বর্ণনা নেই। কিন্তু সাধু মহাত্মাদের মুখে ঠাকুর যা যা শুনেছেন, সেখান থেকে তিনি বুঝেছেন তিনি এগুলোকে ছাড়িয়ে গেছেন। ঠাকুরের মত আর কেউ কি ছাড়িয়ে যেতে পারবে? কেন পারবে না, তবে ছাড়ানোর আগে একটা শর্ত হল, যত কিছু বর্ণনা আছে এর সব অনুভূতি যেন তাঁর হয়ে থাকে। তার সাথে তিনি আরও কিছু দেখছেন। সেই পরম সত্তাকে কত ভাবে দেখা যেতে পারে এর বর্ণনা এত বেশি আছে যে, এর সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাওয়া খুব মুশকিল, একমাত্র ঠাকুরের মতই কেউ কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। এত কথা বলা হল শুধু বোঝাবার জন্য যে এই মন্ত্রগুলিতে কি বলতে চেয়েছেন। এগুলো অনেক দিন ধরে শুনে যেতে হয়, শুনে যাওয়ার সাথে সাথে নিজে থেকে গভীর ভাবে চিন্তন মনন করলে ধীরে ধীরে আমাদের মনের আবরণ গুলি সরতে শুরু হয়। পরের মন্ত্রে আবার বলছেন –

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত।। এতদ্বৈ তৎ।।২/১/৭।।

(সর্বদেবস্বরূপা যে অদিতি ভূতবর্গের সাথে উৎপন্ন হয়েছেন এবং যিনি হিরণ্যগর্ভ রূপে অভিব্যক্ত হন, তাঁকে যিনি হৃদয়াকাশে প্রবিষ্টরূপে দর্শন করেন, তিনি সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন।)

অদিতি শব্দ এসেছে *অদন্* থেকে, *শব্দাদীনাম্ অদনাৎ অদিতিঃ*, অদন্ মানে ভক্ষণ করা, অদিতির মানে যিনি ভক্ষণ করেন। অদিতি একজন দেবী, তাঁর বৈশিষ্ট্য হল তিনি প্রাণরূপিণী। আমাদের শরীরে যে জীবনী শক্তি, যে পঞ্চপ্রাণ কাজ করছে তিনিই অদিতি। এই মন্ত্রে কি বলতে চাওয়া হয়েছে সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু মন্ত্রে এমন কিছু জিনিষ নিয়ে আসা হয়েছে যেগুলো আমাদের বোঝা দরকার। ঋষিরা ধ্যান ধারণা করে, বা যে কেউই যদি ধ্যান ধারণা করেন তাহলে খুব সহজে বুঝতে পারবেন যে আমাদের শরীরে প্রথমে আছে অন্নময়কোষ, অন্নময়কোষের পেছনে আছে প্রাণময়কোষ যেখানে প্রাণন ক্রিয়া চলছে, তার পেছনে মনোময়কোষ যেখানে মন কাজ করছে, তার পেছনে রয়েছে শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ বুদ্ধির পেছনে আছেন জীবাত্মা, যেখানে চৈতন্য সত্তা একটা অজ্ঞান আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে আছেন। ঐ আবরণ সরে গেলে শুদ্ধ আত্মাই শুধু থেকে যান। প্রত্যেকটি সংস্কৃত শব্দের পেছনে একটা ধাতু থাকে, ঐ ধাতু থেকে সংস্কৃতের সব শব্দ বেরিয়েছে। সেই ধাতুর ক্রিয়ানুসারে তার শব্দগুলি সংযুক্ত থাকে। আমি খাচ্ছি, খাচ্ছি মানে মুখ খাচ্ছে, সেখান থেকে উদরে যাচ্ছে বা আমরা বলতে পারি জীবাত্মা খাওয়ার মাধ্যমে সুখ বোধ করছে। এখন ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রতিনিয়ত যে খাদ্য আমাদের ভেতরে আসছে, চোখ দিয়ে আসছে, কান দিয়ে আসছে, এদের কারুরই তো মুখ নেই। কিন্তু এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যে আহার্য পদার্থগুলি যাচ্ছে সেগুলো কি? এগুলোকে বলছেন আহুতি। কোথায় আহুতি হচ্ছে? অগ্নিতে। কোন অগ্নিতে? প্রাণন ক্রিয়ারূপ অগ্নিতে। পাঁচটি প্রাণ এই শরীরে কাজ করে, এই প্রাণ যেন অগ্নি। তাহলে কি জড় পদার্থ জড় পদার্থকে ভক্ষণ করছে? তা কখনই নয়। যিনি প্রথম জাত, হিরণ্যগর্ভ ও অদিতি, আমরা যেমন বলি আত্মা জীবাত্মা, ঠিক তেমনি হিরণ্যগর্ভ আর অদিতি। অদিতিকে এখানে দেখান

হচ্ছে দিব্য শক্তি রূপে। মা কালী যিনি আদ্যাশক্তি, তাঁকে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে মূলাশক্তি রূপে দেখান হয়, আদ্যাশক্তি বা আদি শক্তি আমাদের ভেতরেও আছেন, সেই আদি শক্তিকে বলছেন অদিতি। এই অদিতি প্রাণময়ী, দেবতাময়ী। যেমন হিরণ্যগর্ভের সাথে সমস্ত দেবতারা জুড়ে রয়েছেন, ঠিক তেমনি আমাদের ভেতরে সব দেবতারা অদিতির সাথে জুড়ে রয়েছেন। আমাদের চোখের পেছনে একজন দেবতা আছেন, তিনি হলেন আদিত্য বা সূর্য দেবতা। এই সূর্য দেবতা আবার স্থূল সূর্যের পেছনেও চৈতন্য সত্তা রূপে রয়েছেন। চোখ যে দৃশ্য গ্রহণ করার কার্য করছে, এই কার্য সেইজন্যই সম্ভব হচ্ছে যেহেতু চোখের পেছনে সূর্য দেবতা রয়েছেন। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সব আহুতি অদিতিতে গিয়ে পড়ছে। ঠিক তেমনি কর্ণেন্দ্রিয়ের আহুতিও অদিতিতে গিয়ে পড়ছে। সব ইন্দ্রিয়ের আহুতিকেই অদিতিতে গিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু আবার সব ইন্দ্রিয়ের পেছনে দেবতারা আছেন। এইভাবে সব দেবতারা অদিতির সাথে যুক্ত হয়ে আছেন। তাই অদিতি হলেন সব দেবতাদের মা। উপনিষদের এই জিনিষটাই পুরাণে এসে অদিতি হয়ে গেলেন দ্বাদশ আদিত্যের মা। অন্য দিকে দৈত্যদের মা হয়ে গেলেন দিতি, যিনি অদিতিরই বোন। উপনিষদ পড়লে বোঝা যায় পুরাণের কাহিনী কিভাবে এসেছে। মা কালীতে গিয়ে সব দেবী দেবতা যেমন মিশে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি আমাদের শরীরে যত দেবী দেবতা আছেন সবাই অদিতিতে গিয়ে মিশে যাচ্ছেন। আমাদের ভেতরে যে দেবী তিনি হলেন অদিতি। কিন্তু অদিতি নামটা হঠাৎ কোত্থেকে এসে গেল? অদিতি নাম না বলে অন্য অনেক নাম বলা যেত। কিন্তু অদিতি শব্দের অর্থ হল *অদনাৎ ইতি*, সব কিছু ভক্ষণ করে নেন। যিনি সব ভক্ষণ করে নিচ্ছেন তাঁর নাম অদিতি। তাঁর কার্য থেকে তাঁর নাম বেরিয়ে আসছে। অদিতি কি ভক্ষণ করেন? ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে থেকে যা কিছু ভেতরে যাচ্ছে সব কিছুকে তিনিই ভক্ষণ করছেন, সেইজন্য তাঁর নাম অদিতি। কিন্তু ইন্দ্রিয়দের পেছেন এক একজন করে দেবতারা আছেন, অদিতি যতক্ষণ না থাকবেন ততক্ষণ দেবতারা কোন কাজ করতে পারবেন না। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার প্রাণন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, অদিতি নেই, এবার যতই টেনে তার চোখকে খুলে রাখার চেষ্টা করা হোক চোখ কিছু দেখতে পারবে না, নাক খোলা আছে কিন্তু কোন কিছুর গন্ধ তার নাকে অনুভব হবে না, কান খোলা থাকা সত্ত্বেও কোন শব্দ তার কান দিয়ে ভেতরে যাবে না। চোখ, কান, নাক সব ইন্দ্রিয়ই আছে, ইন্দ্রিয় আছে মানে তাদের দেবতারাও আছেন, কিন্তু তাঁরা আর কার্য করতে সক্ষম হচ্ছেন না। আমরা যেভাবে ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ বলছি, সেইভাবে জীবাত্মা আর অদিতি অভেদ। যদিও ইদানিং এই জিনিষটাকে বেশি কোথাও উল্লেখ করা হয় না, কারণ আমাদের দর্শন এখন অনেক পালটে গেছে।

কিন্তু উপনিষদের ঋষি বলছেন, আত্মা কে? এই অদিতি। অদিতি কে? আমাদের শরীরের মধ্যে যিনি ক্রিয়া করছেন। জীবাত্মা কোন ক্রিয়া করেন না। দেহে ইন্দ্রিয় রয়েছে, ইন্দ্রিয়ের পেছনে দেবতারা রয়েছেন, পাঁচজন দেবতার জন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ হচ্ছে, বন্যার জলের মত বিষয় সমূহ আমাদের মধ্যে ঢুকছে, ঢুকে প্রাণের মধ্যে সব আহুতি রূপে পড়ছে, প্রাণ যেন সব কিছুকে গিলে ফেলছে। গীতায় ভগবান বলছেন *অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।।* তুমি যে চার ধরণের খাদ্য ভক্ষণ করছ, বৈশ্বানর রূপে আমিই ভক্ষণ করছি। শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যত রকম বিষয় আমাদের ভেতরে ঢুকছে সব ভগবানই ভক্ষণ করছেন। কিন্তু ভগবান সরাসরি খান না, যে রূপে তিনি খান সেই রূপের নাম অদিতি। উদরে যিনি ভক্ষণ করছেন তিনিও ভগবান, কিন্তু সেখানে তাঁর নাম বৈশ্বানর বা জঠরানল।

অদিতি হিরণ্যগর্ভ রূপে পরমব্রহ্ম থেকে জন্ম নিয়েছেন। প্রাণন ক্রিয়া দুটো রূপে হয়ে চলেছে, একটা সমষ্টি রূপে আরেকটি ব্যষ্টি রূপে। সমষ্টি রূপে যে প্রাণন ক্রিয়া হয় তাঁকে তখন বলছেন হিরণ্যগর্ভ, আমার আপনার ভেতরে ব্যষ্টি রূপে যে প্রাণন ক্রিয়া চলছে তাঁকে বলছেন অদিতি। তিনি দেবতাময়ী, কেন দেবতাময়ী? পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলির দেবতারা সব অদিতির সাথে জুড়ে আছেন। *গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং*, এর আগে যেমন বলা হল প্রাণময়কোষ, তার পেছনে মনোময়কোষ, তারও পেছনে বিজ্ঞানময়কোষ, যদিও এটি অন্য ধরণের বর্ণনা, কিন্তু এখানে বলছেন ধ্যানের গভীরে যখন তুমি যাবে তখন দেখবে তোমার বুদ্ধিরূপী গুহায়, একটু পরেই তারও আলোচনা হবে, সেই অদিতি ঐ বুদ্ধিরূপী গুহায় বাস করছেন। *যা ভূতেভির্ব্যজায়ত*, নানান রকমের যে পঞ্চভূত রয়েছে, সব পঞ্চভূতের যেমন সেখান থেকে জন্ম হয়েছে, ঠিক তেমনই অদিতিরও একই সাথে সেখান থেকে জন্ম। এর আগেও কয়েকবার আলোচনা করা হয়েছে, পরমব্রহ্ম থেকে যে প্রকৃতির জন্ম হয় সেই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণে সমন্বিত। সৃষ্টি হওয়া মানেই প্রকৃতির জন্ম, প্রকৃতির জন্ম হওয়া মানেই সৃষ্টি হওয়া।

প্রকৃতির জন্ম হওয়া মানেই সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের আবির্ভাব। সত্ত্ব, রজো ও তমো আসা মানেই সৃষ্টি। সত্ত্ব, রজো ও তমো আসা মানেই পঞ্চভূতের জন্ম হওয়া, instantly সব হয়। শুধু পঞ্চভূত হলেই তো হবে না, পঞ্চভূতের কার্য হতে হবে, কার্য হতে গেলেই শক্তি লাগবে, শক্তি মানেই প্রাণ। আর প্রাণময়ী মানেই অদিতি। হে নচিকেতা! তুমি জানতে চেয়েছিলে আত্মা আছে কি নেই, তুমি জেনো আত্মা আছেন, শরীরের ভেতরে অদিতি রূপে তিনিই আছেন, বুদ্ধিরূপী গুহাতে ধ্যান করে যোগী তাঁর সাক্ষাৎ করেন, *এতদ্বৈ তৎ*, তিনি সেই।

যদিও এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, ঠাকুর মা কালীকে দেখছেন মা কালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, তাঁর শক্তিতেই এই জগৎ চলছে, সেই শক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। ঠিক তেমনি আমাদের স্থূল শরীরটা চলছে অদিতির জন্য, অদিতি আবার জীবাত্মার সঙ্গে এক। ঠাকুর যেমন মা কালীর দর্শন করছেন, ঠিক তেমনি যোগী ধ্যানের গভীরে তাঁকে শক্তি রূপে দেখেন বা শিব রূপে দেখেন বা শিব ও শক্তি একসাথে দেখেন। এই দর্শনও মনের এলাকাতে হচ্ছে, মনের এলাকাতে থাকার জন্য যে জিনিষকে অবলম্বন করে সাধনা শুরু হয়েছিল, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও সেই রূপেই হবে। যদি প্রস্তুতি অন্য ভাবে হয়ে থাকে তখন অন্য ভাবে দেখবেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলছেন, তোমার শরীরের যে প্রাণন ক্রিয়া চলছে, তোমার ইন্দ্রিয়ের আহরিত সমস্ত বিষয়কে যিনি ভক্ষণ করে নিচ্ছেন তিনিই দেবতাময়ী অদিতি। সেই অদিতিকে বুদ্ধিরূপী গুহাতে দেখা যায়, *এতদ্বৈ তৎ*, সেটাই আত্মা। নচিকেতার প্রশ্নের এটাই একমাত্র উত্তর নয়, তার আগে বলেছিলেন *যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যো*, যিনি সর্বপ্রথম জাত, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিব্যসত্তা হিরণ্যগর্ভ তিনিই সেই। এখানে বললেন অদিতি রূপে তোমার শরীরে যে প্রাণন ক্রিয়াতে সব কিছুকে ভক্ষণ করছেন তিনিই সেই। এরপর আবার আরেকটা বলবেন। উপনিষদের পর পর মন্ত্রে এটাই দেখাতে চাইছেন, চৈতন্য সত্তা বা যাঁর দ্বারা চৈতন্য সত্তার প্রথম প্রকাশ হয় সেটাই সেই। তাহলে এই শরীরটা কি ব্রহ্ম নয়? শরীরটাও ব্রহ্ম, তবে অত্যন্ত স্থূল রূপে। শরীর থেকে যেমন যেমন সূক্ষ্মে যাবে, প্রথমেই দেখবে শক্তি। কোন শক্তি? যেখানে গিয়ে সব কিছু একত্রিত হয়ে যাচ্ছে, তার পেছনে আছেন চৈতন্য সত্তা। আবার অন্য ভাবেও দেখা যায়, যে চৈতন্য সত্তা আমাদের ভেতরে, সেই চৈতন্য সত্তাই আছেন, তাঁর বাইরে আর কিছু নেই। আবার কেউ দেখেন, যিনি আমার ভেতরে চৈতন্য সত্তা, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে আছেন, সেই চৈতন্য সত্তাতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসমান। আবার কেউ দেখেন তিনি নির্গুণ নিরাকার, সৃষ্টিই নেই, আমিই আছি বা আত্মাই আছেন। আমাদের সমস্যা হল আমরা যখনই ঈশ্বরের কথা বলতে চাই বা আলোচনা করতে চাই তখন আমরা ঈশ্বরকে এই গ্লাশের মত চিন্তা করি। অনন্ত আত্মাকে নির্দিষ্ট করে কখনই বলা যাবে না যে তিনি এটাই। সেই আত্মা বা চৈতন্যের উপর যেন একটা চিন্তনের স্তর চলছে যেখানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে গেছে। আকাশে যখন মেঘ হয়, পুরো মেঘটাই মনে হয় যেন এক একটা জলকণা। মেঘ এক রকম চলে, তার মধ্যে জলকণারও নিজস্ব একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। সেই জলকণা কখন বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কখন জল হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়ছে, আবার ওখানেই কোন জলকণা বরফ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটাই এক একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যেমন আমরা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার সাথে ওটা মেঘ হয়েও আছে। আবার একদিন ঐ মেঘও শেষ হয়ে গেল, কোথাও কোন কিছুই নেই, ঐ আকাশই আছে। ঋষি মুনিরা আত্মা, সৃষ্টি, জগৎকে এভাবেই দেখেন। গুরু তাঁকে যেভাবে নির্দেশ দিয়ে যে পথে নিয়ে গেছেন আর তিনি যেমনটি সাধনা করেছেন, কিন্তু যে পথেই গুরু নিয়ে যান আর যেভাবেই তিনি সাধনা করুন হয় তিনি দেখতে শুরু করবেন যে প্রাণময়ী অদিতিই তিনি, জীবাত্মা যিনি তিনিই বিশ্বভুবনের আত্মা। আবার যাঁরা বহির্সাধনা করছেন, বাইরে বিগ্রহ বা মুর্তি নিয়ে সাধনা করছেন তিনি আবার দেখবেন সূর্যের পেছনে যে শক্তি সেটা তিনিই, আর এই সূর্য চন্দ্রের যিনি দেবতা তাঁদেরও পেছনে যে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা সগুণ সাকার সেটাও তিনি। আরেক ধাপ এগোলে দেখবেন, আমার ভেতরে অন্তর্যামী রূপে যাঁকে দেখছি সেই অন্তর্যামীই সাকার, আরেক ধাপ এগোলে, এগোবারও আর দরকার নেই কারণ তিনি জেনে গেছেন, তখন আবার দেখবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লীন। তখন আবার দুই রকমের অনুভূতি হয়, কেউ দেখেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, কেউ দেখেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নেই। যাঁরা দেখেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নেই তাঁরা সেই শুদ্ধ নিরাকার দেখেন। যাঁরা দেখেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে তাঁরা দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে তিনিই আছেন, আল্লা রূপে, গড্ রূপে তিনিই আছেন, তিনি আবার সমস্ত জীবের ভেতরে অন্তর্যামী রূপে আছেন। এখানে এই মন্ত্রে অদিতি রূপে দেখছেন, প্রাণের যিনি সঞ্চালনকারিণী। কালীকে যেমন অনেক সময় বলেন যিনি কালের সাথে রমণ করেন,

কিন্তু অন্য জায়গায় বলছেন শক্তিরূপিণী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যে শক্তি আছে সেই শক্তিরূপিণী আমাদের শরীরের ভেতরে যখন প্রাণন ক্রিয়া করছেন তখন তাঁকে বলছেন অদিতি, বলছেন ঐটাই আত্মা। এর আগে দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছিলেন, *পরাচ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ,* এখানে উপনিষদ আমাদের শরীরকে আত্মা রূপে এগোতে দিচ্ছেন না, ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের কার্যকে আত্মা বলে এগোতে দিচ্ছেন না, আটকে দিয়ে বলছেন তুমি ভেতরে চল। কঠোপনিষদ *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* এই ভাবকেও নিতে চাইছেন না, ওটা আরেকটা ভাব। কঠোপনিষদের ভাব হল আত্মা যেমনটি ঠিক তেমনটি আমাদের সামনে রাখা। কিন্তু এখানে শিব আর শক্তি এই দুটো রূপে নিচ্ছেন। সবাই বলছি জগতে শিব আছে শক্তি আছেন, জগৎ মানেই শিব আর শক্তির খেলা। শিব মানে চৈতন্য আর শক্তি মানে প্রাণন ক্রিয়া। শিব, শক্তি, প্রাণন ক্রিয়া পরের দিকে এই জিনিষগুলো উপনিষদ থেকেই এসেছে। শিবও যা শক্তিও তাই, ঠাকুর বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এখানেও তাই বলছেন, এই অদিতিই সেই আত্মা, যে আত্মার কথা নচিকেতা জানতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু প্রাণন ক্রিয়াই তো শেষ কথা নয়। উপনিষদের বিভিন্ন জায়গায় এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে প্রাণন ক্রিয়া হচ্ছে সেটাই কি সেই আত্মা? না, আত্মা হলে গোলমাল লেগে যাবে, তখন পুরোটাই সাংখ্য মতে চলে যাবে, প্রকৃতি আত্মা বা পুরুষ হয়ে যাবেন। তখন বলছেন চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই প্রাণন ক্রিয়া চলছে। এখানে বলছেন, অদিতিই সেই আত্মা। স্বামীজী বারবার বলছেন তোমার ভেতরের শক্তিকে জাগাও। আত্মার সাথে যে শক্তি জড়িয়ে আছে, এই আত্মশক্তির জাগরণের কথা স্বামীজী বলছেন। আত্মশক্তির আসল শক্তি অদিতি থেকে আসে। অদিতি কোথা থেকে পাচ্ছেন? আত্মা থেকে। আত্মা তো সবারই ভেতরে আছেন। তাহলে সবাই কেন পাচ্ছে না। কারণ ঐ জ্ঞানটা নেই, জ্ঞান নেই মানে তপস্যা নেই। তপস্যা মানে জ্ঞান, জ্ঞান মানে শক্তি। তাহলে শক্তি কার আছে? যার তপস্যা আছে। তপস্যা মানে জ্ঞান, যাঁর আত্মজ্ঞান আছে তাঁরই শক্তি হয়। জ্ঞান তো সবারই আছে, আমিত্ব বোধ, আমি আছি এই জ্ঞান সবারই আছে, কারুর দেহ রূপে, কারুর ইন্দ্রিয় রূপে, কারুর বুদ্ধি রূপে আমিত্ব বোধ আছে। কিন্তু যত সূক্ষ্মের দিকে যাবে তত শক্তি বাড়বে। যিনি বুদ্ধিতে বোধ করেন তাঁর শক্তি অনেক বেশি, কারণ বুদ্ধি আত্মার সব থেকে কাছে থাকে। কিন্তু যিনি নিজেকে শুদ্ধ আত্মা রূপে জানেন বা অদিতি রূপে জানেন তিনি তো মহাশক্তিমান, তাঁর শক্তি আর কেউ দাবাতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, স্বামীজী এনারা এত লোককে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার কারণ তাঁরা সবাই আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাঁরা আরেক ধাপ নীচে নেমে শক্তিকে মানছেন তাঁরাও অনেক শক্তি রাখেন, তারও আরেক ধাপ নীচে যাঁরা বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও অনেক শক্তিশালী। ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে যারা জয় করে নেয় তারাও অনেক শক্তিশালী হয়ে যায়, সব থেকে অপদার্থ হল যারা শুধু শরীরকে নিয়ে চলে। এরাও আত্মাকে জানে কিন্তু শরীর রূপে জানছে। আবার অন্য ভাবে বলছেন –

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভো ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ।।২/১/৮।।

(অন্তঃসত্ত্বা রমণীগণ দ্বারা গর্ভ যেভাবে সুরক্ষিত হয়, উত্তরারণি ও অধরারণি কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত জাতবেদা নামক যে যজ্ঞীয় অগ্নি ঋত্বিকগণ কর্তৃক প্রতিদিন সুরক্ষিত হন এবং হৃদয়স্থিত যে অগ্নি যোগিগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হন, এই যজ্ঞীয় অগ্নি ও বিরাট পুরুষরূপ অগ্নিই সেই ব্রহ্ম।)

ঋষিরা সেই পরম সত্তাকে বিভিন্ন ভাবে দেখেছিলেন, এখানে তারই একটা ভাবের বর্ণনা করছেন। ঠাকুরের যেমন দেখার ইচ্ছে হয়েছিল, মুসলমানরা কিভাবে সাধনা করেন, খ্রীষ্টানরা কিভাবে করেন, বৈষ্ণবরা, শাক্তরা কিভাবে সাধনা করেন। কঠোপনিষদকে যিনি সংকলন করেছিলেন সেই ঋষিও দেখাতে চাইছেন বিভিন্ন উচ্চমানের ঋষিরা, সিদ্ধ পুরুষরা সেই পরমার্থ সত্যকে কিভাবে দেখেছেন। প্রথমে দেখালেন হিরণ্যগর্ভ রূপে, তারপরে দেখালেন অদিতি রূপে, এবার আরও দুটো রূপে নিয়ে এসেছেন, অগ্নি রূপ আর জীবাত্মা বা আত্মা রূপে। যাঁরা যজ্ঞাদি করেন এখানে সেই যজ্ঞের কথা বলছেন। ইদানিং কালে যজ্ঞের প্রাধান্য অনেক কমে গেছে, যজ্ঞের জায়গায় এখন কর্মের প্রাধান্য এসে গেছে। যাঁরা কর্ম করেন সেখানে যজ্ঞের সেই নিষ্ঠাটা নেই। বেদের সময় যাঁরা যজ্ঞ করতেন, যজ্ঞ করা মানে তাঁরা অগ্নির সেবা করছেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণরা প্রচণ্ড শ্রদ্ধার সাথে অগ্নিকে ধারণ করতেন। উপনয়ন হয়ে যাওয়া মানে তিনি এবার অগ্নিকে ধারণ করে নিলেন আর সারাটা জীবন সেই অগ্নির সেবা করে যেতেন। ঈশোপনিষদের ঋষি বলছেন *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে,* আমি যা তা

লোক নই, আমি সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*। হে আদিত্য! তুমি তোমার মুখের উপর থেকে স্বর্ণময় উজ্জ্বল আবরণটা সরিয়ে দাও। আমি তোমার স্থুল রূপ সূর্যকে দেখতে চাইছি না, আমি সূর্য দেবতার অনাবৃত রূপকে অবলোকন করতে চাইছি, যে সূর্য দেবতা এই ব্রহ্মের সাথে এক। তারপরেই ঋষি বলছেন, আমি কোন কাঙালী ভিখারী নই। ইদানিং কালে আমাদের ধর্মীয় সাহিত্যে, বিশেষ করে এখনকার ভক্তিশাস্ত্রে নিজেকে দীন হীন কাঙালী রূপে দেখানোর প্রবণতাটা বেশি মাত্রায় এসে গেছে। কাঙালী ভিখারী রূপে নিজেকে দেখানোর ভাব নিয়ে আজ পর্যন্ত কারুরই কিছু হয়নি, কোন দিন হবেও না। উপনিষদের ধর্মে এ জিনিষ কোথাও পাওয়া যাবে না। উপনিষদে কি আছে? *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*, আমার এটা পাওনা, কারণ সারাটা জীবন বেদ উপনিষদের যে ধর্ম সেই ধর্মে আমি প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, সৎ জীবন-যাপন করেছি, জীবনে যখনই দুর্বলতা, কাপুরুষতা এসেছে তখনই তাকে জয় করে এগিয়ে গেছি। এখন আমার মৃত্যুর সময় এসে গেছে, এখন আমি যেমনটি দেখতে চাইব, যেমনটি চিন্তন করব আমার তেমনটিই হবে। সেইজন্য হে পূষন্! হে সূর্য দেবতা তোমার মুখের উপর যে আবরণ রয়েছে সেটাকে সরাও আমি তোমার পেছনে যে পরমার্থ সত্য রয়েছে তাঁকে দেখতে চাই। আমি তোমার কোন অনুগ্রহ, অনুকম্পা চাইছি না, এটা আমার অধিকার। কাঙালী কি চায়? দুটি পয়সা। রাজপুরুষ কি চায়? রাজ্যের উত্তরাধিকার, প্রয়োজন হলে সে যুদ্ধ করে তার অধিকার কায়েম করে নেবে। উপনিষদের সাধক হলেন রাজপুরুষ। তিনি কাঙালী ভিখারীর মত দীন হীন ভাব নিয়ে কখনই বলতে যাবে না, হে ঠাকুর! আমাকে রক্ষা কর, মরার সময় আমাকে নিয়ে যেও। উপনিষদের কোন ঋষি এসব কথা শুনলে চমকে উঠবেন। সারা জীবন ইন্দ্রিয়ের সুখভোগে কাটিয়ে, যত রকমের বদমাইশি করে মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে হাত ধরে নিয়ে যাবেন, উপনিষদ এই ভাব জানেই না। উপনিষদের কাছে একটাই পথ, *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*। সারাটা জীবন তুমি সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলে কিনা? যদি কোন গোলমাল করে থাক তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছ কিনা? প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ পবিত্র হয়েছ কিনা? হ্যাঁ হয়েছি। তারপর কি করলে? সাধনা করেছি।

ঈশাবাস্যোপনিষদে যেভাবে বলছেন, এখানেও ঠিক সেইভাবে বলছেন, *অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা* আর তার সাথে *গর্ভো ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ*। বাড়ির বউমা অন্তঃসত্ত্বা হলে, কথামৃতে ঠাকুর বলছেন শাশুড়ি তার কাজ কমিয়ে দেয়। ঈশ্বরের দিকে মানুষ যত এগোয় প্রভু তার কাজ কমিয়ে দেন, এটাকে বোঝাবার জন্য ঠাকুর শাশুড়ি বউমার কাজ কমিয়ে দেওয়ার উপমা নিয়ে এসেছেন। এখানে কিন্তু বিষয়টা অন্য, বলছেন গর্ভিণী যেভাবে তার গর্ভকে রক্ষা করে। এখনও বিশেষ করে গ্রাম দেশে, এমনকি অন্যান্য জায়গাতেও গরু, ছাগল, বেড়াল, কুকুর গর্ভিণী হয় গেলে বড়রা এদের মারতে নিষেধ করেন। গর্ভকে খুব সম্মান দেওয়া হয়। আততায়ীর সংজ্ঞাতেও বলছেন, যারা গর্ভিণীর ক্ষতি করে তারা আততায়ী। মনু গর্ভিণীকে এত উচ্চস্থান দিয়েছেন যে সাধারণ মানুষ কল্পনাই করতে পারবে না। মনু বলছেন অতিথি হলেন দেবতা, বাড়িতে অতিথি এলে সবার আগে অতিথিকে খাওয়াতে হবে। কিন্তু আবার বলছেন, বাড়িতে যদি কোন গর্ভিণী থাকে তাহলে অতিথিরও আগে তাকে খাওয়াতে হবে। বাড়ির কুমারী মেয়ে, নববধূ আর গর্ভিণী এই তিনজনকে সবার আগে খাওয়াতে হবে। অথচ মুর্খরা বলে মনু নাকি মেয়েদের বিরুদ্ধে বলে গেছেন। মনুস্মৃতিটা একবার খুলে দেখুক মনু মেয়েদের কত সম্মান দিচ্ছেন। তিনজনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন সেখানে বাচ্চা ছেলেরও উল্লেখ নেই। বাড়িতে সবার আগে গর্ভিণী, নববধূ আর কুমারী মেয়েকে খেতে দিতে হবে, এদের পর অতিথিকে, অতিথির পর বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা খাবে। যে গর্ভিণীকে সমাজ এত সম্মান দিচ্ছে, সেখানে গর্ভিণী নিজে কিভাবে তার গর্ভকে রক্ষা করবে ভাবাই যায় না। গর্ভিণী কত সতর্ক, সচেতন থাকে গর্ভ যেন নষ্ট না হয়ে যায়। বাড়ির সবাইও তার সাথে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে গর্ভের যেন কোন ক্ষতি না হয়ে যায়, গর্ভ যেন ঠিক থাকে। উপনিষদ এখানে এই উপমাটাই নিচ্ছেন। একটা গর্ভের পেছনে কত যত্ন, কত শ্রদ্ধা, কত ভালোবাসা, কত আশা, এত দিনের কামনা-বাসনা, অপেক্ষা সব কিছু জড়িয়ে আছে, কত আনন্দের প্রত্যাশা লেগে আছে। এমনকি কোন ত্রুটি যাতে না হয়ে যায় তাই গর্ভিণীকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে গর্ভিণীর গর্ভধারিণী আরও বেশি যত্ন নেবে। এই গর্ভিণীকে উপনিষদ কার সাথে তুলনা করছেন? ব্রাহ্মণরা হোমের অগ্নিকে ঠিক সেইভাবে যত্ন নেন। যাঁরা অগ্নিকে চয়ন করতেন, ত্রিনাচিকেত করতেন, যাঁরা অগ্নিহোত্র করতেন তাঁরা দিনে তিনবার অগ্নিহোত্র করতেন। হোম আদি করেই জীবন অতিবাহিত করছেন। অগ্নির যে যত্ন নিতেন,

অগ্নির প্রতি যে তাঁদের সেবা, পূজা, শ্রদ্ধা কি রকম? বলছেন গর্ভিণীর কাছে তার গর্ভ যেমন, ব্রাহ্মণদের কাছে অগ্নি ঠিক সেই রকম। কোন অগ্নি? বিড়ি সিগারেটের অগ্নি? না, তা নয়, *অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা*, যে কোন অগ্নির কথা বলছেন না, দুটো অরণি কাষ্ঠকে ঘর্ষণ করে যে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করতেন, সেই জাতবেদার কথা এখানে বলছেন। জাতবেদা মানে যাঁর সদ্য জন্ম হয়েছে, অগ্নিকে জন্ম দেওয়া হচ্ছে। অরণি মন্থন করার পর যজ্ঞের যে অগ্নি জন্ম নিচ্ছেন তাঁর সেই একই সম্মান, গর্ভিণীর গর্ভের প্রতি যে সম্মান দেওয়া হয়।

আমরা প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে গীতার অষ্টম অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন যে সাতটি প্রশ্ন করছেন সেটাকে একটু আলোচনায় নিয়ে আসছি – *কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম্। অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।।* অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন, অধ্যাত্ম কি, অধিযজ্ঞ কি, অধিভূত কি, অধিদৈব কি এর সাথে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করছেন। আট নম্বর আর নয় নম্বর মন্ত্রে অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিভূত আর অধিদৈব এই চারটি জিনিষকে সেই ব্রহ্মের সাথে এক করা হয়েছে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে প্রশ্নগুলো ঐ কারণেই করা হয়েছে। অধিযজ্ঞ মানে অধিষ্ঠাতা, ভেতরে যিনি আছেন। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ভগবান নিজে। এই জাতবেদা, অগ্নি ভগবান নিজে। যদিও এখানে যজ্ঞ হচ্ছে, যেখানে অগ্নি দেবতা আছেন, আমরা আগুন দেখছি। স্থূল মানসিকতার লোক যখন যজ্ঞ দেখতে যাবে সে তখন দেখবে একটা আগুন জ্বলছে সেখানে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। হয়ত চেঁচিয়ে উঠে বলতে শুরু করবে, ওমা! আগুনে ঘি দিয়ে ঘি নষ্ট করছে! এই ঘি গরীবদের খাওয়ালে কত মঙ্গল হত। কত আবেগময় কথা মনে হবে। এটাই যদি ঘুরিয়ে তাকে বলা হয়, তোমার বাড়িতে গর্ভিণীকে এত ভালো ভালো খাবার খাইয়ে কেন খাবারগুলো নষ্ট করছ, ঐ খাবারগুলো গরীবদের খাইয়ে দিলে কত মঙ্গল হত। অনেকে এসে বলে বেলুড় মঠে এত বড় মন্দির কেন করা হয়েছে! বড় বড় মল তৈরী হতে পারে, বিলাসবহুল সিনেমা হল বানাতে পারে তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু মন্দির করলেই যত আপত্তি।

ঋষিদের কাছে মানব জীবনের একটা গুরুত্ব আছে, তার থেকেও গুরুত্ব তার পেছনে যে দৈবী সত্তাগুলি রয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দৈবী সত্তা হলেন অধিযজ্ঞ, যজ্ঞের পেছনে যে দেবতা রয়েছেন তিনি হলেন অধিযজ্ঞ। যজ্ঞে তাঁকে আহুতি দেওয়া হবে। যজ্ঞে যে তিনি আসবেন কিভাবে আসবেন? অরণি মন্থন করে যে অগ্নি জাত হবেন তিনি হলেন অধিযজ্ঞ। ঠিক তেমনি অধ্যাত্ম হলেন, আমাদের এই স্থূল শরীরের পেছনে যে চৈতন্য সত্তা আছেন তাঁকে বলছেন অধ্যাত্ম। আমাদের ইন্দ্রিয়ের পেছনে যে দৈবী সত্তা রয়েছেন তাঁকে অধিদৈব বলা হয়। ঠিক তেমনি বাইরে সূর্য, চন্দ্র এদের পেছনে যে দৈবী সত্তা আছেন তাঁকেও বলা হয় অধিদৈব। আর যত পঞ্চভূত রয়েছে তাদের পেছনে যে দেবতারা আছেন, তাঁকে অধিভূত বলছেন, অনেক সময় ভূতবর্গকেও অধিভূত বলে। এই কয়েকটি পরিভাষা দিয়ে দেখাচ্ছেন অধিযজ্ঞ, অধ্যাত্ম, অধিদৈব আর অধিভূত এগুলো সব সেই ব্রহ্ম। প্রথমটা বলছেন *অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভো ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ*, সোজা বলে দিতে পারতেন অধিযজ্ঞ হলেন ভগবান, কিন্তু তা বলছেন না, অধিযজ্ঞ না বলে সম্মান দিয়ে কবিতার ভাব নিয়ে বলছেন জাতবেদা।

জাতবেদা কে? আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন অরণি কাঠের মধ্যে অধিযজ্ঞ রূপে যিনি নিবাস করেন। দুটো অরণি কাঠ, একটা উপরে আরেকটি নীচে, দুটোতে ঘর্ষণ করে অগ্নির জন্ম হচ্ছে। সেইজন্য বলছেন, দুটো অরণি কাঠের মধ্যে যিনি বাস করেন। তারপর কাব্যিক ভাবে বলছেন, যে অগ্নিকে যাজ্ঞিক পুরুষরা ঠিক সেইভাবে সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে, আর খুব সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করেন যেভাবে গর্ভিণী নিজের গর্ভকে রক্ষা করেন। সাধারণ লোককে এই ধারণা দিচ্ছেন যাজ্ঞিক পুরুষ, ব্রাহ্মণদের কাছে অগ্নির কি অপরিসীম মূল্য। ব্রাহ্মণকে কেউ যদি বলে আপনি অগ্নিতে ঘি ঢেলে অপচয় করছেন কেন, তার চাইতে বরং গরুকে খাইয়ে দিন, ব্রাহ্মণ তাকে হয়ত মেরেই ফেলবে। *দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ* তৎ। যেমন অধিযজ্ঞকে বলা হচ্ছে এটা সেই ব্রহ্ম, ঠিক তেমনি যোগীপুরুষ হলেন জাগরণশীল, ইন্দ্রিয়জগতে তিনি খুব সজাগ। সদা জাগরণশীল আর সজাগ থাকার জন্য যোগীর মন কখন প্রমাদগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ পায় না, যোগী সব সময় প্রমাদশূন্য। যোগী প্রমাদশূন্য হয়ে তাঁর হৃদ্দেশে যে আত্মাকে দর্শন করেন, সেই আত্মা কে? তিনি সেই অধিযজ্ঞ, যে অধিযজ্ঞকে যাজ্ঞিক পুরুষরা *জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ*, নিত্য অগ্নিতে বা বিশেষ দিনের অগ্নিতে অরণি কাষ্ঠ মন্থন করে অগ্নি উৎপন্ন করে তাতে আহুতি প্রদান করেন। পুরোহিতরা বা পূজারীরা বা

ঋষিরা নিত্য অরণি কাঠ মন্থন করে যে অগ্নি উৎপন্ন করেন সেই অগ্নির সেবা করছেন, সেই অগ্নি হল জাতবেদা, এই জাতবেদাকে যোগীরা হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন কারণ ঐ জাতবেদা সবারই হৃদয়ে আত্মা রূপে বাস করছেন। এখানেও দুই ধরণের সাধকের কথা এসে যাচ্ছে, গীতাতেও এই দুই ধরণের সাধকের কথা বলছেন, একজন যিনি যজ্ঞাদি করে যাচ্ছেন আরেকজন ধ্যানাদি করে যাচ্ছেন, দুটো পথ আলাদা। যোগীরা যাঁর ধ্যানাদি করেন এবং হৃদয়ে দেশে যাঁর জ্ঞান উপলব্ধি করেন তিনি আবার জাতবেদ রূপে যাজ্ঞিক পুরুষদের দ্বারা রক্ষিত ও পূজিত হন। পুরোহিত, যাজ্ঞিক বা ঋষি সেই জাতবেদকে কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন? গর্ভিণী যেভাবে নিজের গর্ভকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

ছয় নম্বর মন্ত্রে বললেন যিনি হিরণ্যগর্ভ, যিনি প্রথমজাত তিনিই সেই আত্মা, পরের মন্ত্রে বলছেন সবার শরীরে অদিতি যিনি প্রাণ রূপে কাজ করছেন তিনিই আত্মা। এই মন্ত্রে বলছেন জাতবেদই আত্মা আর যোগীরা হৃদয়ে যাঁর ধ্যান করেন সেটাই আত্মা। আমরা আজ খুব সহজ ভাষায় বলে দিচ্ছি তোমার শরীরে যে চৈতন্য জ্যোতি আছে সেটাই আত্মা। কিন্তু ঋষিরা বলছেন অত সহজে নেই, আরও বিস্তারে আছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যে চৈতন্য সত্তা সেটাও আত্মা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যে ক্রিয়াশক্তি সেটাও তিনি আর আমাদের সবার পেছনে যে চৈতন্য সত্তা সেটাও তিনি আর আমাদের ভেতরে যে ক্রিয়াশক্তি সেটাও তিনি। এখানেই শেষ নয়, তিনি যখন মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে, শ্রীকৃষ্ণ রূপে, কালী রূপে পূজিত হচ্ছেন, সেটাও তিনি। আগেকার ঋষিরা যজ্ঞে যে জাতবেদকে আহুতি দিতেন সেটাও তিনি।

নির্গুণ নিরাকারের তো পূজা হয় না পূজা সব সময় সগুণ সাকারেরই হবে, সেই প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ হলেন সগুণ সাকার, তাঁকেই কর্মিরা অগ্নি রূপে পূজা করছেন, যোগীরা তাঁকেই হৃদয়ে আত্মা রূপে ধ্যান করছেন। কারণ নির্গুণ নিরাকারের যেমন পূজা হয় না তেমনি নির্গুণ নিরাকারের ধ্যানও হয় না। নির্গুণ নিরাকারকে সব সময় বোধে বোধ করা হয়। প্রথমেই তাই সরাসরি নির্গুণ নিরাকারের ধ্যান করা যাবে না, সগুণ সাকারের সাহায্য নিতে হয়। ব্রহ্মকে যাঁরা জানতে চাইছেন, আত্মাকে জানতে চাইছেন, তাঁকে জানার সহজ পথ হল নিজের হৃদয়ে ধ্যান করা বা অগ্নির উপাসনা করা বা কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা। আমাদের মধ্যে প্রচলিত একটা ধারণা চলে আসছে যে কর্ম করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, এখানে তা বলছেন না। এটাকেই ঠাকুর একটু অন্য ভাবে বলছেন, যেখানে স্বার্থ সেখানে পাওয়া যায় না। অহং বোধ থাকলে পাওয়া যাবে না, কর্মেও পাওয়া যাবে না, ধ্যানেও পাওয়া যাবে না। কর্মের স্বভাব হল বেশি কর্ম হতে থাকলে অহং বোধটা আরও বেশি জড়াতে থাকে, যার জন্য কর্মকে ঐভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হল, যেখানেই অহং ভাব সেখানে এটা হবে না। এখানে যিনি সাধক, তিনি যে সাধনার পথে যাচ্ছেন তাঁকে দেখাচ্ছেন, দেখ ভাই! এই জিনিষটা কত বিশাল, এর ব্যপ্তি কত বিরাট কিন্তু তোমার যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের সত্তা সেই সত্তাও তিনি, ক্রিয়াশক্তি রূপেও তিনি, জ্ঞানশক্তি রূপেও তিনি।

কথামৃতে বর্ণনা আছে, একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁর ঘরে বসে আছেন, কয়েকজন ভক্তও আছেন, ঠাকুর তাদের কিছু বলছেন। একজন ভক্ত বলছেন 'হ্যাঁ মহাশয়! এগুলো জানা আছে'। শুনে ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন 'শুধু জানলে হবে না, ধারণা করতে হবে'। উপনিষদের কথাও ধারণা না করা পর্যন্ত কোন কাজেই আসবে না, শব্দ মাত্র হয়ে থেকে যাবে। মন, কায় আর বাক্, এই তিনটে যতক্ষণ এক না হয় ততক্ষণ স্পষ্ট ধারণা হবে না। আমাদের শরীর হল ত্রিমাত্রিক অভিব্যক্তি। মন আমাদের চিন্তাকে অভিব্যক্ত করছে, বাক আমাদের বাক্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করছে। তিনটে আকৃতি একটা ত্রিমাত্রিকে নিচ্ছে, একটা চিন্তাজগতের আকৃতি আরেকটা কথাবার্তা। এই তিনটে পুরোপুরি এক না হওয়া পর্যন্ত শব্দের দাম হবে না। সেইজন্য দেখা যায় জীবনে ঠিক ঠিক কোন শব্দ যদি স্পর্শ করে থাকে তা হল মা যখন নিজের সন্তানকে খোকা, বাবা বলে ডাকে। মায়ের শরীর সেই ভালোবাসারই প্রতিরূপ, মায়ের চিন্তভাবনাও তাই আর শব্দটাও তাই। এই তিনটে এক না থাকলে শব্দ কখনই আমাদের স্পর্শ করবে না। এর জন্য শ্রোতারও একটা শক্তি থাকা দরকার। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছে গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরের কাছে এলেন, মধুসূদন দত্ত এলেন কিন্তু ঠাকুরের কোন কথা তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নিজস্ব একটা গ্রহণ ক্ষমতা থাকা দরকার। যিনি বলছেন তাঁর তো অবশ্যই চাই। আমরা এখানে শাস্ত্রের যে কথা শুনছি এই কথাগুলো বাইরের লোককে এমনকি বাড়ির লোককে

বলতে গেলে তারা আমাদের কথাকে কোন গুরুত্বই দেবে না। তাদের গ্রহণ করা ক্ষমতা নেই ঠিকই কিন্তু তার সাথে আমাদের মধ্যেও শক্তির অভাব আছে। আবার এই কথাই যখন কোন সন্ন্যাসী বলবেন তখন সেই প্রভাব পড়বে না যত না স্বামী ভূতেশানন্দজী বা স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বললে পড়ত। তবে আমরা উপনিষদের যে কথাই শুনছি এগুলোকে আমাদের ধারণা করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার, মন্ত্রে ঠিক কি বলতে চাইছেন, সেটা বুঝে নিয়ে চিন্তার জগতে গিয়ে ধারণা করতে হয়। চিন্তার জগৎ শব্দটা বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এখানেও আমাদের বুঝে নিতে হবে, সূক্ষ্ম জগতে জিনিষগুলো যেমনটি থাকার ঠিক তেমনটি আছে সেই জিনিষই পরে স্থূল জগতে এসে আরেকটু বিকৃত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে।

মন্ত্রের ভাবের সাথে যে যত একাত্ম তত তার শব্দের দাম হবে। আমরা ঠাকুরকে বলছি ভাববিগ্রহ। ঠাকুর বিগ্রহ নন, তিনি ভাববিগ্রহ, ঠাকুর একটা ভাবের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ফলহারিণী কালীপূজার দিন ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে ষোড়শী রূপে ষোড়শপাচারে পূজা করার পর তাঁর পায়ে সাধনার ফল অর্পণ করলেন। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ইতিহাসে দিনটি একটি বিশেষ মাহাত্ম্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে পূজা করে সমস্ত নারীজাতিকে এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন ঠিকই বলা হয়, কিন্তু তার আগে আমাদের একটু চিন্তা করা উচিৎ ঠাকুর কোন ভাবের মূর্ত রূপ ছিলেন, তিনি যে ভাববিগ্রহ, কোন ভাবকে তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন। দক্ষিণেশ্বর আসার আগে তিনি কি ছিলেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সাধনা করার সময় তিনি কি ছিলেন আর সিদ্ধি যখন হয়ে গেল তখন তিনি কি ছিলেন। আমাদের কাছে ঠাকুর বলতে, যিনি সিদ্ধি পেয়ে গেছেন তিনি। তার মানে তিনি সেই পুরোপুরি আধ্যাত্মিক ভাবের বিগ্রহ। ঐ ভাবের মূর্ত রূপ যিনি, তাঁর কাছে মন্দিরের মা কালীও যা, নিজের গর্ভধারিণী মাও তাই, তাঁর স্ত্রীও তাই আর পাড়ার মেয়েরাও তাই, কলকাতার গণিকারাও তাই। এরপর নিজের স্ত্রীকে পূজা করাকেই যারা বেশি প্রাধান্য দেয় বুঝতে হবে তাদের ঠাকুরের ভাব, ঠাকুর যে ভাবের প্রতিমুর্তি সেই ভাবের ধারণা এখনও স্পষ্ট হয়নি। এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই। শুধু নিজের স্ত্রীকেই কেন, যে কেন মেয়েকেই যদি ঠাকুর পূজা করেন, যে পরিস্থিতিতেই করুন জিনিষটা একই হবে। কিন্তু আমরা সাধারণ জগতের লোক, ভৌতিক জগতের বাসিন্দা, আমরা জানি যতই বলুক না কেন নিজের স্ত্রী আলাদা জিনিষ, নিজের মাকে জগতের মা বলে মানা যায়, জগতের মাকে সবারই মা বলে মানতে পারি কিন্তু নিজের স্ত্রীকে জগতের স্ত্রী বলে কখন মানা যাবে না। জীবন যখন চলে তখন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই জীবন চলে, অধ্যাত্ম যখন চলে তখন সমষ্টিকে কেন্দ্র করে চলে। আধ্যাত্মিক হওয়া মানেই ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বজনীনতার দিকে চলে যাওয়া। যিনি *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* দেখছেন, ঈশ্বরই আছেন তাছাড়া আর কিছুই নেই দেখছেন, সেখানে স্ত্রী শব্দটা কোথায় আসবে! লোকব্যবহার অবশ্যই থাকবে। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে, বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যেতেই শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করছেন। বশিষ্ঠদেব বলছেন, আমি জানি আপনি সেই পরমাত্মা, কিন্তু লোকব্যবহারে আপনি গৃহস্থ আর আমি রাজপুরোহিত, ঠিক আছে আমি আপনার প্রণাম গ্রহণ করলাম। লোকব্যবহারে শ্রীমা ঠাকুরের সহধর্মিণী, ঠাকুর শ্রীমার স্বামী। কিন্তু যাঁরা অবতার পুরুষ বা উচ্চকোটির মহাপুরুষ, নিজের তরফ থেকে তাঁদের কাছে লোকব্যবহার বলে কিছু থাকে না, যদিও লোকসংগ্রহনার্থে যখন কোন লোকব্যবহার করছেন, সেখানেও তাঁদের নিজের কোন স্বার্থ থাকে না।

ঠাকুরের কাছে সব ভাবই হয় শক্তিকে আর তা নাহলে পরমব্রহ্মকে আশ্রিত করে চলত, কখন ঐ ভাবে আবার কখন এই ভাবে, তার নীচে তাঁর অন্য কোন ভাব ছিল না। একটা অবস্থায় গিয়ে ঠাকুর বলছেন মা এখন আমাকে নতুন নতুন অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাতে তাঁর শেষ অনুভূতিটা কোন দিন আর পাল্টাবে না। আর কিছু কিছু জিনিষ থাকবে যেগুলো কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু এই যে ভাব, যে ভাবে এসে কোন মহান ঋষি দেখছেন যে কোন মেয়েই জগজ্জননী, ঐ অবস্থায় মেয়েটি কে, কার মেয়ে, কার স্ত্রী, কোনটারই কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকছে না। হৃদয়রাম দ্বারিকাবাবুর মেয়েকে যখন পূজা করতে গেছে তখন হৃদয়রাম জাগতিক ভাব নিয়েই পূজা করতে গিয়েছিল, ভেবেছিল এতে মালিক খুশী হবে। কিন্তু মালিক অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ঠাকুরের ষোড়শী পূজায় কোন জাগতিক ব্যাপার ছিল না, পুরোটাই পারমার্থিক। ঠাকুর দেখছেন মা ভবতারিণী জগজ্জননী, গর্ভধারিণী মা জগজ্জননী, নিজে স্ত্রী তিনিও জগজ্জননী। এতদিন ঠাকুর যা কিছু সাধনা করেছেন, সাধনার যা কিছু ফল সবটাই জগজ্জননীকে অর্পণ করলেন। ঠাকুর দেখছেন সাক্ষাৎ জগজ্জননীই আছেন, মা ছাড়া কিছু নেই। এই ভাবের সাথে একাত্ম হয়ে নিজের স্ত্রীকেও দেখছেন সাক্ষাৎ

জগজ্জননী, এটাই সত্য। আর তিনি যে অবস্থায় আছেন সেখানে কোন মুর্তি পূজা করার কোন দরকার নেই। কিন্তু পূজা মানেই সেখানে জাগতিক ব্যাপার এসে যাবে, পূজো মানেই লৌকিক ব্যাপার থাকবে।

একজন ব্রহ্মজ্ঞানী হৃদয়রামকে দিয়ে ঠাকুরকে বলে পাঠালেন যেদিন গঙ্গার জল আর নর্দমার জল এক মনে হবে, যেদিন বিষ্ঠা আর সন্দেশ এক মনে হবে সেদিন বুঝবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। ঠাকুর পরে নিজের বিষ্ঠাতে জিহ্বা ঠেকাচ্ছেন। তখন ঠাকুরকে বলা হল, এতো নিজের বিষ্ঠা, অপরের বিষ্ঠাতে ঠেকাতে হবে, ঠাকুর তাও করলেন। এটাই বহুত্বের নাশ হয়ে অভেদ দর্শন। নানা বলে কিছু নেই, একটু পরেই বলবেন, *নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন*, গঙ্গার জল আর নর্দমার জল আলাদা বলে কিছু নেই, বিষ্ঠা আর সন্দেশে পৃথকত্ব কিছু নেই। এখানে ভাব আরোপ করার কিছু নেই, এটাই এনারা প্রত্যক্ষ করছেন। তবে এই ভাব নিয়ে থাকলে শরীর চলবে না। সেইজন্য বুদ্ধির উপর ক্ষীণ একটা পর্দা যেন এসে যায়। পর্দা এসে গেলেও অদ্বৈত জ্ঞান পুরোপুরি কখনই চলে যাবে না। ঠাকুর এতদিন সাধনা করলেন, এত কিছু করলেন, এবার একটা জপ সমর্পণ করতে হবে। ঠাকুর যে বারো বছর ধরে সাধনা করে গেলেন, এর তো একটা ফল হবে। এই ফলটা এখন কোথায় যাবে? ঠাকুর এখন সেই ফল মাকে অর্পণ করছেন। মন্দিরে না গিয়ে, মায়ের যে ষোড়শী রূপ সেই রূপে শ্রীমাকে পূজা করলেন। শ্রীমারও সেই সময় ষোল-সতের বয়সই ছিল, পূজা করে সব ফল মাকে অর্পণ করলেন। কোন মায়ের চরণে অর্পণ করলেন? জগজ্জননী রূপে যে শ্রীমার পূজা করলেন, তাঁর চরণে সমস্ত সাধনার ফল সমর্পণ করলেন। নারী জাতির সম্মান বৃদ্ধির জন্য, সমস্ত নারী জাতিকে এক উচ্চস্থান দেওয়ার জন্য ঠাকুরের ষোড়শী পূজা নয়, এখানে অনেক উচ্চমানের ভাব। উপনিষদের এই মন্ত্রগুলিতে যা বলা হচ্ছে, ষোড়শী পূজার মাধ্যমে ঠাকুরও একই জিনিষ বলছেন। আধ্যাত্মিক সত্যগুলি যখন ব্যবহারিক জগতে আসবে তখন এই ভাবেই দেখাবে। এই ভাবের সাথে যতক্ষণ এক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক ঠিক ধারণা হবে না, তা ব্যাকুলতা দিয়েই হোক, *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে* দিয়েই হোক যেভাবেই হোক ঐ ভাবের সাথে এক হয়ে যেতে হবে। ঠাকুরের লীলাচিন্তন করা, পাঠচক্র চালান, ভক্ত সম্মেলন করা সব কিছুর উদ্দেশ্য হল এই ভাবগুলিকে আমাদের সচেতনতার মধ্যে জিইয়ে রাখা। পরের মন্ত্রেও ঠিক এই ভাবকে নিয়ে বলছেন –

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।।২/১/৯।।

(যাঁর থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যাঁতে অস্তমিত হয়, তাঁতেই সকল দেবতা প্রবিষ্ট আছে, তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, ইনিই সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম।)

নচিকেতা যে প্রশ্ন করেছিলেন, শুদ্ধ আত্মা কে বা ব্রহ্ম কি জিনিষ, ঈশ্বর কি, এই বিষয়ের উপরই আলোচনা চলছে। বোঝাবার জন্য যমরাজ মূলতঃ দুটো জিনিষ নিচ্ছেন। আজকের দিনে ঈশ্বর বা আত্মাকে বোঝানর জন্য আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, উপনিষদ সেই ভাষায় বলছেন না। আমরা এখন বলছি শিব আর শক্তি। সৃষ্টিকে শিব রূপেও বোঝান যায় আবার শক্তি রূপেও বোঝান যায়। তার সাথে শিব শক্তির লীলা রূপেও বোঝান যায়। অধ্যাত্ম রামায়ণে নারদ স্তুতি করার সময় এটাই বলছেন, হে রামচন্দ্র! জগতে পুং বাচক যা কিছু আছে সব আপনি আর স্ত্রী বাচক যা কিছু সব সীতা। আবার শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা এক, সেইজন্য সব কিছু সেই এক। এই একত্বকে চৈতন্য দিয়েও বোঝান যায় আবার শক্তি দিয়েও বোঝান যায়। উপনিষদের ঋষিদের কাছে এই প্রশ্নটা এসেছিল, সেই চৈতন্য যখন জগৎ রূপে ভাসিত হন তখন তাঁর শ্রেষ্ঠতম কি হবে? যেখান থেকে পুরো সৃষ্টি বেরোচ্ছে সেটা কোন জায়গা? গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান বলে যাচ্ছেন, নদীর মধ্যে আমি জাহ্নবী, শব্দের মধ্যে আমি প্রণব। সবটাই ভগবান কিন্তু তিনি আলাদা আলাদা করে কেন বলছেন? যেখানে যেখানে শ্রেষ্ঠ জিনিষ সেখানে সেখানে তাঁর প্রকাশ বেশি ঠিকই কিন্তু তার থেকে বেশি গুরুত্ব হল মানুষ যাতে সহজে ঈশ্বরকে ধরা যায়। ঈশ্বর মানে আত্মা, আত্মা মানেই শ্রেষ্ঠতম। যেমন দুধ, দুধের আত্মা হল ঘি। ঘি যেমন দুধের সার, ঠিক তেমনি যে কোন জিনিষের যেটা সার সেটাই সেই জিনিষের আত্মা। সমস্ত নদীর মধ্যে সার হল গঙ্গা। সার হল যেটা শ্রেষ্ঠতম বা উচ্চতম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আত্মা ছাড়া কোন কিছু নেই। এই জগতে ভগবান ছাড়া কোন কিছু নেই। কিন্তু যে মুহুর্তে দ্বৈতের জগতে চলে এল, সেখানে ভালো আর মন্দ দুটোই থাকবে। ঠাকুর বলছেন সবটাই নারায়ণ, কিন্তু বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। যতক্ষণ আমাদের

মধ্যে দ্বৈত বোধ থাকবে, ভালো-মন্দ বোধ থাকবে ততক্ষণ ঈশ্বরও সত্য আর ভালো-মন্দটাও পুরোপুরি সত্য। আর আমাদের তাঁর ভালোটাই সব সময় নিতে হবে, মন্দটা কোন ভাবেই নেওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা যেভাবে মন্দকে মন্দ বলি সেভাবে মন্দের নিন্দা করা যাবে না। যাকে আমি পছন্দ করি না, কেউ যদি তার নিন্দা করে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠব, এই জিনিষটাকে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ নারায়ণ তার মধ্যেও আছেন, কিন্তু তাই বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা যাবে না, খারাপ লোককে বুকে লাগান যাবে না। সেইজন্য যোগশাস্ত্রে বলছেন মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা ও মুদিত এই চারটের অনুশীলন করতে। যে জায়গায় খারাপ জিনিষ দেখবে উপেক্ষা করে সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। দ্বৈতে সবই ঈশ্বরের রূপ ভেবে খারাপ জিনিষকে, মন্দকে কখনই আলিঙ্গন করা যাবে না। কিন্তু তাতেও এই বোধ থাকতে হবে এও সেই। ঠিক তেমনি জাগতিক ক্ষেত্রে ছোট হোক আর বড় হোক সবটাতে তিনিই আছেন, কিন্তু বড়র মধ্যে তাঁর ভাব ও প্রকাশ অনেক বেশি। দ্বৈতে সর্বশ্রেষ্ঠ সগুণ ঈশ্বর ভগবান বিষ্ণু, ভগবান শিব আর উপনিষদের ভাষায় হিরণ্যগর্ভ। পরের ধাপে এসে বলছেন, ভগবান থাকার জন্য যে প্রাণন ক্রিয়া চলে, প্রাণন ক্রিয়া মানে চাঞ্চল্য আসা, বলছেন যত ধরণের প্রাণন ক্রিয়া হতে পারে সেটাও তিনি, সেইজন্য শিবও যা শক্তিও তাই। এর পরের ধাপে মানুষের ভেতরে এনে বলছেন, সবার ভেতরে যিনি আত্মা তিনিও তাই। আর মানুষের ভেতরে সব প্রাণন ক্রিয়া যেখানে গিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে সেটাও তিনি। ঐ এক আধ্যাত্মিক সত্তাকে ঋষিরা বিভিন্ন ভাবে দেখছেন।

জগতে তিনি যে কত ভাবে অভিব্যক্ত হন বোঝানর জন্য এবার বলছেন *যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি*। এর আগে অধিযজ্ঞকে নিয়ে বলেছিলেন, এবার অধ্যাত্ম আর অধিদৈবকে নিয়ে বলছেন, যেখান থেকে সূর্যের উদয় হয় আর যেখানে সূর্যের অস্ত হয়। আসলে সূর্যের কি উদয় আর অস্ত হয়? সেইজন্য বলা হয় উপমাকে নিয়ে সব সময় চলতে নেই। উপমার সাহায্যে একটা জিনিষকে ধারণা করানো হয়, পরে যদি দেখা যায় উপমাটা ভুল, তাতে কিন্তু সত্যটা পাল্টে যাবে না। শুধু উপমাকে পাল্টে দিতে হবে বা উপমাকে অন্য ভাবে বুঝতে হবে। আচার্য শঙ্করও জানতেন সূর্যের উদয় হয় না, সূর্যের অস্তও হয় না। আর্যভট্ট, ভাস্কর এনারা আচার্য শঙ্করের চারশ বছর আগে ছিলেন। নিউটন এসে যা বললেন তার হাজার বছর আগেই ভারত সেটা বলে দিয়েছিল যে সূর্যের কোন উদয় অস্ত হয় না, পৃথিবী ঘুরছে। সমস্যা হল ভারতবর্ষে শিক্ষা বলে কোন দিন কিছু ছিল না। তখন শিক্ষা বলতে ছিল ব্রাহ্মণরা বেদ মুখস্ত করত, আর পরের দিকে সংস্কৃতের টোল হল যেখানে ষড়্দর্শন, কাব্য আর ব্যাকরণ এগুলো পড়ান হত। তাও ব্রাহ্মণ বংশের সন্তানরাই পড়ত। ব্রাহ্মণরাও ইতিহাস কি জানতেন না, ভূগোল কি জানতেন না, বিজ্ঞান কি জানতেন না। তার মধ্যেও এনারা এই রকম কাজ করেছিলেন এটাই আশ্চর্যের। আমরা যতই লাফালাফি করি, আসলে ভারতবর্ষ ছিল মুর্খদের দেশ। সাধারণ জনগণ তো মুর্খ ছিলই, কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত আর ব্রাহ্মণদের সাথে ক্ষত্রিয়রা যারা পড়াশোনা করত তারাও ঐ উদ্ভট জিনিষগুলোকেই সারা জীবন পড়ে যেত। ইতিহাস বলতে জানতেন রামায়ণ আর মহাভারত। ভূগোলের যে জ্ঞান ছিল পুরাণের বর্ণনা পড়লেই মাথা ঘুরে যাবে। জানতেনই না বিজ্ঞান কি। অথচ তার মধ্যে আর্যভট্ট, ভাস্কর, চরক, শুশ্রুতদের মত ঋষিরা বিজ্ঞান আর চিকিৎসা শাস্ত্রে কী বিশাল অবদান রেখে গেছেন ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়। এছাড়া মানুষ কেন্দ্রিক কোন বিদ্যাই ভারতে ছিল না। মানুষ কেন্দ্রিক বিদ্যা সব থেকে বেশি চলে অঙ্ক শাস্ত্র দিয়ে। কিন্তু শুভঙ্করী, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ আর শতকরা দিয়েই অঙ্ক শেষ। অথচ উচ্চ গণিত শাস্ত্রে লীলাবতীর বিরাট অবদান, বীজগণিতের ভিত্তি তিনিই বিশ্বে প্রথম দিয়ে গেছেন। জ্যামিতিতেও বিরাট উন্নতি করেছিল। কারণ বৈদিক সময়ে যজ্ঞের বেদি তৈরী করতে জ্যামিতি লাগত। যজ্ঞের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন ছিল, সেখান থেকে আর্যভট্ট, ভাস্করের মত উচ্চমানের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এসেছিলেন। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে কোন বিদ্যাই প্রসার লাভ করতে পারেনি। ফলে একজন দুজন ব্যতিক্রমী এসে গেছেন তারপরে পুরোটাই ফাঁকা।

আচার্য শঙ্কর আর্যভট্টের খবর জানতেন না তা কখনই সম্ভব নয়, স্বামীজীর মত আচার্যও সব খবরই রাখতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এক জায়গায় আছে, যদিও অন্য ভাবে আছে, সেখানে বলছেন যে জানে সূর্যের উদয় অস্ত হয় না, সেই ঠিক জানে। দেখে মনে হতে পারে কোন ঋষি হয়ত এটা জানতেন। কিন্তু সাধারণ লোকদের বললে বুঝবে না বলে কিছু বলতেন না। এই মন্ত্রের বক্তব্যকে যদি নিত্যের অর্থে নেওয়া হয়, যেটা আচার্যও বলছেন, তখন মনে হবে ঠিক আছে। একটা বাচ্চা ছেলে জিজ্ঞেস করছে, এই সূর্যের উদয়

হল তারপর পশ্চিমে অস্ত হয়ে গেল, আবার সূর্য কোথা থেকে এসে গেল? কিছু তো তাকে বলতে হবে। আমরা বলছি পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে এটা কি সত্যি? এটাও সত্য নয়। সত্য হল, আপনি বা আমি যেটাকে সত্য মানতে চাইছি। কারণ সূর্য সত্যিই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে আর পৃথিবীও সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, নির্ভর করছে আমি যেটাকে ধরব। পৃথিবীকে যদি কেন্দ্র ধরা হয় তাহলে সূর্য ঘুরছে, সূর্যকে কেন্দ্র ধরলে পৃথিবী ঘুরছে। তাহলে নিউটন কি এমন আহামরি করলেন! সমস্যা হল পৃথিবীকে যদি কেন্দ্র নেওয়া হয় তাহলে আরও অনেক কিছু ঠিক ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু সূর্যকে কেন্দ্র করলে অনেক জিনিষকে খুব সহজে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। এটা অনেকটা সেই রকম হবে, একটা বাচ্চা ছেলে বাবার সাথে মেলা দেখতে গেছে। মেলাতে বাচ্চাটি বাবার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এখন কে কাকে হারাল? বাবা হারিয়েছে নাকি ছেলে হারিয়েছে? বাবা বলবে আমার ছেলে হারিয়ে গেছে, আর ছেলে বলবে আমার বাবা হারিয়ে গেছে। একটা মজার গল্প আছে, বাচ্চা ছেলে তার বন্ধুকে বলছে 'জানিস এই ভাঙা ব্রিজ পার করার সময় বাবা খুব ভয় পায়'। বন্ধুটি জিজ্ঞেস করছে 'কি করে তুই বুঝলি'? 'আমি দেখেছি ভাঙা ব্রিজ দিয়ে যাওয়ার সময় বাবা আমার হাতটা খুব জোরে চেপে ধরে থাকে'। সব কিছুই আপেক্ষিক। যদি বলা হয় সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, ইদানিং কালে বললে সবাই হাসবে, কিন্তু যাঁরা ফিজিক্স জানেন তাঁরা বলবেন জিনিষটা বেঠিক কিছু নয়। কিন্তু যেমনি ফিজিক্সে আরেক পা এগোতে যাবে তখনই সমস্যা এসে যাবে, কারণ তখন গণিতের হিসাব অনেক জটিল হয়ে যাবে। কিন্তু সূর্যকে কেন্দ্র ধরলে গণিতের হিসাব অনেক সহজ হয়ে যাবে। সেইজন্য আর্যভট্টাদিরা অনেক আগেই সূর্যকে কেন্দ্র ধরে নিয়ে এগিয়েছিলেন। আর্যভট্টাদিরা চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের পেছনে ছায়ার ভূমিকাকে প্রথম থেকেই বলে দিয়েছিলেন। অথচ রাহু কেতুর ধারণা তখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে পুরোদমে ছিল। আজ হোক বা কাল হোক যখন বিগ ব্যাঙ হবে তখন সূর্যও নাশ হয়ে যাবে। সৌরমণ্ডলের জন্ম হয়েছিল আবার লয় হয়ে যাবে, ফিজিক্সও তাই বলছে। আরও পেছনে যদি যাওয়া হয় যেখানে dissolution হয়ে আছে, সূর্য তখন থাকবে না। ফিজিক্সে যাই হোক সূর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তখন সূর্য থেকে হাজার গুণ বড় তারা থাকতে পারে, তাদেরও সৌরমণ্ডল থাকতে পারে, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

এর আগে তন্মাত্রা নিয়ে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, কত এ্যাটম, কত ইলেক্ট্রন, কত প্রোটন এগুলো জেনে আমার কি হবে! আমার কাছে জগৎ মানে আমি যেটাকে গ্রহণ করছি। জগতে যাই থাকুক, সেখানে একশ খানা এ্যাটম থাকুক, দুশো খানা ইলেক্ট্রন প্রোটন থাকুক, ওটা ফিজিক্সের কাজ, আমি যখন জগৎকে নেব তখন আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েই নেব, এর বাইরে আমি যেতে পারব না। ঠিক তেমনি সৌর মণ্ডলাদি যাই থাকুক, শেষ পর্যন্ত আমি যখন নেব তখন এই সূর্য, চন্দ্র আর আমাদের এই পৃথিবীকেই নেব, এর বাইরে আমার আর কিছু লাগবে না। আমি দেখছি সূর্য উঠছে আবার সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এরপর তোমার সিদ্ধান্ত যাই হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আজ হোক কাল হোক সূর্যের তো লয় হবেই। আর আজ হোক কাল হোক সূর্যের জন্ম হয়েছিল। কোথা থেকে হয়েছিল? ফিজিক্স বলবে পদার্থ থেকে হয়েছে। কিন্তু এনারা আরেক ধাপ এগিয়ে বলছেন পদার্থ থেকে হয় না, শক্তি থেকে হয়। শুধু তাই নয়, ঐ শক্তির পেছনে আবার একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, যাকে বলছেন অধিদৈব। আমাদের শরীরের পেছনে যে শক্তি কাজ করছে তাকে জীবাত্মা বলে, ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র, তারা বা অন্য যে কোন বস্তুর পেছনে যে শক্তি বা দেবতা আছেন তাকে অধিদৈব বলা হয়। পৃথিবীর পেছনে যে আধ্যাত্মিক সত্তা তাঁকে আমরা বলছি ধরিত্রী বা মা পৃথিবী। আমরা এখন সবাই জেগে আছি, সবাই কঠোপনিষদের কথা শুনছি। শুনতে শুনতে যদি ঝিমুনি লাগে তখনও আমাদের ভেতরে কথাগুলো যেতে থাকে কিন্তু একটা স্বপ্নের মধ্যে যেন কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাকি যে কার্য হচ্ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এটাকে বলছে লয় হয়ে যাওয়া। লয় হয়ে যাওয়া মানে, এই যেন মিলিয়ে গেল আবার একটা সময় উদিত হবে। ইন্দ্রিয়গুলো যেন শুয়ে পড়ল, এই শুয়ে পড়াকে বলছেন লয় হয়ে যাওয়া। কিন্তু লয় হয়ে গেলে আবার উদয় হবে। যখন গভীর নিদ্রায় চলে যাব তখন মনও লয় হয়ে যাবে। সুষুপ্তি থেকে আবার যখন স্বপ্নাবস্থায় আসবে মনের আবার উদয় হবে। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির লয় হয়ে যাচ্ছে, জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলোর আবার উদয় হয়ে যাচ্ছে। এই যে লয়প্রাপ্তি আবার সেখান থেকে পুনঃ সৃষ্টি, এই জিনিষটা কোথাও তো হচ্ছে। ঐ জায়গার পরিভাষা যাই দিয়ে থাকুক, একটা জায়গার উপরেই হতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলো কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে,

আমরা আমাদের ভাষায় বলি তার ব্রেণ কাজ করছে না, তার হার্ট কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। হার্ট বন্ধ করে দিয়েছে এই জন্যই বলি যে, ঐ হার্ট আর কোন দিন কাজ করবে না। বলছেন, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে। চোখ বন্ধ দু রকম হয়, সাধারণ ভাষায় চোখ বন্ধ করে দেওয়া মানে সব শেষ। কিন্তু চোখ বন্ধ হওয়া মানে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের লয় হয়ে যাওয়া। যখন চাঙ্গা হয়ে উঠবে আবার চক্ষু ইন্দ্রিয় বেরিয়ে আসবে। লয় যে জায়গাতে হল আমরা বলছি স্বপ্নাবস্থা, কিন্তু মনটাও যে জায়গাতে লয় হয়ে যায় সেটা কোথায় হচ্ছে? সুষুপ্তির অবস্থায়। শরীরের যত রকমের শক্তি, ইন্দ্রিয়, মন যে জায়গাতে লয় হচ্ছে সেই জায়গাটাই আত্মা। ঠিক তেমনি বহির্বিশ্বে যা কিছু আছে, সূর্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছুর যেখান থেকে জন্ম আর যেখানে তাদের লয় হয়, সেটাই সেই হিরণ্যগর্ভ। বাইরে যাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলছেন, সবারই ভেতরে তাঁকে জীবাত্মা বলছেন। বাইরের জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব হিরণ্যগর্ভে গিয়ে লয় হয়। আমাদের শরীরে যাবতীয় যা কিছু আছে সব আমাদের ভেতরে লয় হয়। ভেতরে যিনি আছেন তাঁকে বলছেন অধ্যাত্ম আর বাইরে যিনি আছেন তাঁকে বলছেন অধিদেব। বাইরের আধ্যাত্মিক সত্য অধিদেব আর ভেতরের আধ্যাত্মিক সত্য অধ্যাত্ম। যত রকমের ক্রিয়াকর্মাদি হয় সব অধ্যাত্মে গিয়ে লয়প্রাপ্ত হয়। বাইরে যত দেবতারা আছেন, কারা সেই দেবতা? এই সূর্যের পেছনে একজন দেবতা আছেন যাঁকে আদিত্য বলছেন, তেমনি চন্দ্রের পেছনে একজন দেবতা আছেন, পৃথিবীর পেছনেও একজন দেবতা আছেন। যখন সূর্যকে দেখা যাচ্ছে তার মানে তখন দেবতা বেরিয়ে এসেছেন। যখন সূর্য লয়প্রাপ্ত হয়ে গেল তখন সেই দেবতাও লয়প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। কোথায় এই লয়প্রাপ্তি আর উদয় হয়? বলছেন, যেখানে হচ্ছে সেটাই সেই ব্রহ্ম। সেটা কে? বলছেন হিরণ্যগর্ভ।

সাইকেলের চাকার কেন্দ্রের যে রীম আর বাইরের যে রীম, এই দুটোকে সংযুক্ত করে কতকগুলি স্পোক্স। ঠিক তেমনি গরুর গাড়ির চাকাতে একটা হল তার নাভি, সেই নাভিকে কাঠের সাহায্যে বাইরের গোলাকার কাঠের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এই শরীরটা হলে সেই বাইরের রীম, আর তার সাইকেলের স্পোক্স হল ইন্দ্রিয়গুলি। স্পোক্সগুলো একটা জায়গাতে গিয়ে জুড়ে থাকে। ঠিক তেমনি বহির্জগতে যত অধিদেব আছেন সবাই এইভাবে হিরণ্যগর্ভের সাথে জুড়ে রয়েছে। সেই হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্ম। ওখানে যে লয়প্রাপ্ত হয় এই লয় কিন্তু আধ্যাত্মিক লয় নয়। আধ্যাত্মিক লয় আর সুষুপ্তির লয়ের পার্থক্য হল, সুষুপ্তিতে মানুষ যেমনটি বোকা হয়ে যায় তেমনটিই বোকা হয়ে বাইরে আসে, কিন্তু সমাধিতে যখন লয়প্রাপ্ত হয় সেখান থেকে তিনি জ্ঞানী হয়ে ফেরেন।

তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতা, *তং* সেই ব্রহ্মে বা আত্মাতে সব দেবতারা অর্পিত হয়ে আছেন। কিভাবে অর্পিত হয়ে আছেন? সাইকেলের চাকার স্পোক্সগুলো যেমন ভেতরের রীমের সাথে বাইরের রীমের সাথে জুড়ে থাকে ঠিক সেইভাবে সমস্ত দেবতারা অর্পিত হয়ে আছেন। অর্পিত আহুতি দেওয়ার অর্থে নয়, সব কিছু জুড়ে রয়েছে। আমরা এখানে যাঁরা কথা শুনছি সবাই জুড়ে রয়েছি। কার সাথে জুড়ে আছি? হয় নিজের সাথে তা নাহলে উপনিষদের সাথে। আমাদের সবারই একটা আলাদা সত্তার বোধ আছে, তাহলে এখানে কেন এসেছি? উপনিষদের জন্য। উপনিষদ হল সেই সাইকেলের চাকার সেন্ট্রাল রীম। ক্লাশ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা এক এক করে সবাই বেরিয়ে যাব, কিন্তু উপনিষদ থাকবে বাকি জিনিষগুলিও থাকবে। তাহলে দেবতারা কি বেরিয়ে যাবে? না, তাঁরা বেরতে পারবেন না। কেন পারবেন না? *তদু নাত্যেতি কশ্চন*, *অত্যেতি* মানে অতিক্রম করে যাওয়া, কেউই তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না। এই দেবতারা জড়িয়ে আছে সেই হিরণ্যগর্ভের সাথে। যদি কোন দেবতা মনে করেন আমি এদের থেকে বেরিয়ে যাব আর আমার আলাদা একটা ব্যক্তিসত্তা এসে যাবে, দেবতারা তা পারবেন না। কেন অতিক্রম করতে পারবেন না? একটা সাইকেল আলোর গতিতে যদি যায় সেই সাইকেলকে কি কেউ ওভারটেক করে বেরিয়ে যেতে পারবে? পদার্থ বিজ্ঞানেই বলছে আলোর গতিকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ঠিক তেমনি এই ব্রহ্মকেও কেউ অতিক্রম করতে পারে না। অতিক্রম করাটা কখন হয়? এগিয়ে থাকা বস্তুকে অতিক্রম করতে হলে আগে তার ভাবকে পেতে হবে, ভাব পাওয়ার পর নিজের গতি বৃদ্ধি করে আগেরটাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে পারবে। একটা সাইকেল তিরিশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে। পেছন থেকে একটা সাইকেল তাকে তাড়া করে আসছে, সে হয়ত পঁচিশ কিলোমিটার বেগে তেড়ে আসছে। প্রথমে আগের সাইকেলের ভাবটা তাকে পেতে হবে, আগের সাইকেলের ভাব মানে তাকেও তিরিশ কিলোমিটার বেগটা নিয়ে আসতে হবে। তিরিশ কিলোমিটার ভাব পেয়ে গেল, এর ভাব আরও বেশি হয়ে গেলে কিছুক্ষণ পরে আগের সাইকেলকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাবে। অতিক্রম করা মানেই আগে তার

ভাবকে পেতে হবে। তুমি যতই বড় হও আমার থেকে বড় কোন দিন হতে পারবে না। কেন পারবে না? কারণ আমার যে ভাব ঐ ভাবে তুমি কোন দিন পৌঁছাতে পারবে না। ক্লাশ ফাইভের অঙ্ক পরীক্ষায় একজন একশতে একশ পেয়েছে। এই নম্বরকে সে নিজেও আর কোন দিন অতিক্রম করতে পারবে না। যতক্ষণ সাতানব্বুই, আটানব্বুই থাকবে ততক্ষণ অতিক্রম করা যাবে, কিন্তু একশ পেয়ে গেলে তাকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। কারণ একশ নম্বরটাই পূর্ণ। আত্মা হলেন পূর্ণ, যে ঐ পূর্ণের মধ্যে ঢুকে গেল তাকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। সে অন্য দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, যে একশতে একশ পেয়ে গেল, সে অন্যান্য সাবজেক্টে এগিয়ে যেতে পারবে। ঠাকুর অদ্বৈত ভাব পেয়ে গেছেন, কিন্তু বলছেন মা এখনও আমাকে নতুন নতুন অনুভূতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর বলছেন, অনন্ত আকাশ, পাখি তার মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে, যাওয়ার আর শেষ নেই। খুব প্রতিভাবান ছাত্র, সে নিজের সাবজেক্ট গণিতও পড়ে আর অন্যান্য বইও পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরীক্ষায় কখন একশতে একশর উপরে নম্বর আনতে পারবে না। একশতে গিয়ে পূর্ণত্ব হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি যে ব্রহ্মের সাথে সব জড়িয়ে আছে, সে অন্যান্য যাবতীয় যত কিছুকে নিয়েই লাফালাফি করুক না কেন, সূর্যের টুকরো হয়ে যেতে পারে, চন্দ্রের টুকরো হয়ে যাক, দুটো সূর্য দুটো চাঁদ হয়ে যেতে পারবে কিন্তু হিরণ্যগর্ভকে কখনই অতিক্রম করতে পারবে না, কারণ হিরণ্যগর্ভই হলেন পূর্ণত্ব।

এটাকেই অন্য জায়গায় অন্য ভাবে বলছেন, আত্মা সবার থেকে এগিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি যখন এগিয়ে চলে যাচ্ছি, যেখানেই যাব সেখানেই আমার এই বোধ আসবে আমি এখানে এলাম। একজন লোক দৌড়ে হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেল, গিয়ে বলছে আমি এসে গেলাম, আমি এই বোধ। আবার যখন চিন্তা ভাবনা করছি, আমি চাঁদে পৌঁছে গেছি, আমি তারায় পৌঁছে গেছি। কে পৌঁছে গেল? আমি। আমিত্বটা আগে যায় বোধটা পরে আসে। আমিত্ব মানেই তো আত্মা, আত্মাই তো সবার থেকে এগিয়ে চলে যাচ্ছেন। যখন এই বোধ হচ্ছে আমি সবার থেকে এগিয়ে চলে আসছি, তখনও কিন্তু আমি বোধটা আগে আগে যায় আর বাকি বোধগুলো পেছনে পেছনে যায়। এখানে অধিদেব, অধ্যাত্ম সবটাই পেছনের বোধ, আমি তো সব সময়ই এগিয়ে যাবে। কল্পনার জগতে আমরা যেখানেই যাই না কেন, কারণ কল্পানা জগতের মত দ্রুত গতিতে কেউই যেতে পারবে না, কল্পনায় আমেরিকাতেই যাই, চাঁদেই যাই আর তারাতেই যাই, যেখানেই যাই সেখানে কে আগে পৌঁছাচ্ছে? আমিই তো পৌঁছালাম, আমি এই ভাবটা আগে পৌঁছাল, পরে বাকি জিনিষ পৌঁছাচ্ছে। এগুলো উপমা, জিনিষটাকে বোঝানর জন্য বলা হল। জিনিষটা হল আত্মাকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। যে কোন জিনিষ তার নিজের যে স্ব-ভাব সেটাকে কক্ষণ অতিক্রম করতে পারবে না। যত অধিদেব, সূর্য, চন্দ্র, এনারা কখনই ঈশ্বরকে অতিক্রম করতে পারবেন না। মানুষ কখনই ঈশ্বরকে অতিক্রম করতে পারবে না, কারণ ঈশ্বর হল মানুষের স্ব-ভাব।

এখানে এটাই বলতে চাইছেন, সমস্ত দেবতারা জুড়ে রয়েছেন ঈশ্বরের সাথে, হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে বা সেই শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে। *ন অত্যেতি কশ্চন*, কোন পরিস্থিতিতেই এনারা তাঁকে অতিক্রম করতে পারবেন না। আমি আমার মায়ের সাথে জুড়ে রয়েছি, মা ক্লাশ টেন পাশ, মায়ের টেন পাশকে পড়াশোনা করে আমি অতিক্রম করে যেতে পারি। তাহলে হিরণ্যগর্ভের সাথে দেবতারা জুড়ে আছেন, সেখান থেকেই তাঁদের জন্ম, দেবতারাও কি ছেলে যেমন মাকে অতিক্রম করে গেছে সেভাবে অতিক্রম করে যাবেন? না, কখনই পারবেন না, দেবতারা ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন, অতিক্রম কখনই করতে পারবে না। মূল কথা হল প্রাণ বা শক্তিও ভগবান, কার্যব্রহ্মের এটাই উচ্চতম অবস্থা। সূর্যের প্রতি আমাদের সবারই দৃষ্টি যায়, আমাদের জীবন সূর্যকে কেন্দ্র করেই চলে, সেই সূর্যকে উপলক্ষ করে বলছেন এই প্রাণ থেকেই সূর্যের জন্ম আবার এই প্রাণেতেই তার লয় হয়ে যাবে। শক্তি সমুদ্র থেকেই তার জন্ম আর শক্তি সমুদ্রেই তার লয়।

পরের মন্ত্রে যাওয়ার আগে আমাদের কয়েকটা জিনিষকে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। এর আগেও আমরা কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে, ঘাসের ছোট্ট ডগা থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই একই চৈতন্য সমান ভাবে সর্বত্র বিরাজ করে আছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে এক চৈতন্য রূপে দেখতে পাই না, সব ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছি, সবেতেই আমাদের ভেদ দৃষ্টি। আমার কাছে আমি আলাদা, আপনি আলাদা, গ্লাশ, মাইক্রোফোন সব কিছুই আলাদা আলাদা। অথচ উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অভেদের কথা বলছে। সাধারণ বুদ্ধি আর আধ্যাত্মিক

বুদ্ধিতে এটাই বিরাট তফাৎ। বঙ্কিম বাবুকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন জীবনের উদ্দেশ্য কি? উনি বলছেন আহার, নিদ্রা, মৈথুন। এটাকে জানার জন্য একজন পণ্ডিতকে কেন জিজ্ঞেস করতে যাব!। একটা গাধা বা গরুও আহার, নিদ্রা, মৈথুনের ব্যাপারটা জানে। এটাকে জানার জন্য আমাকে পণ্ডিতের কাছে যাওয়ার কি দরকার! আমার মাথা ব্যাথা করছে, মাথা ব্যাথা সারাবার জন্য আমি একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার আমাকে দেখে বলল, আপনার মাথা ব্যাথা কেন হচ্ছে আমার জানা নেই, তবে আপনার যদি আবার কিছু হয় আমার কাছে আসবেন। পরের দিন আমার পায়ে ব্যাথা হল, ডাক্তার আমাকে দেখে বললেন, আমি জানি না কেন আপনার পায়ে ব্যাথা হচ্ছে, তবে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা হলে আপনি অবশ্যই আমার কাছে আসবেন। পরের দিন আমার হাতে ব্যাথা হল, ডাক্তার বললেন, আমার জানা নেই কেন আপনার হাতে ব্যাথা হচ্ছে। এরপর কি আমি আবার ডাক্তারের কাছে যাব? যাদের আমরা জ্ঞানী মনে করছি এরা কিন্তু সবাই এই ডাক্তারের মত। বঙ্কিম বাবু যে আহার, নিদ্রা, মৈথুনের কথা বলছেন আসলে তিনি কি বলতে চাইছেন? জীবনের উদ্দেশ্য আমার জানা নেই। তাহলে আপনার কাছে কিসের জন্য যাব? যে জিনিষগুলি একটা গাধা, গরু, ছাগলও জানে, সেও জানে খিদে পেলে আমাকে খেতে হবে, সেও জানে আমাকে ঘুমোতে হবে, সেও জানে আমাকে প্রজনন ক্রিয়ায় নামতে হবে। তার জন্য আমাকে বই কেন লিখতে হবে!

কোন মহারাজের কাছে গিয়ে বললাম, মহারাজ! আমার জীবনে প্রচুর কষ্ট। মহারাজ যদি আমাকে বলেন, ভাই! জীবন এই রকমই, জীবনে কষ্ট ছাড়া কিছু নেই। এরপর দ্বিতীয়বার আমি কি সেই মহারাজের কাছে আমার কষ্টের কথা নিয়ে যাব? সন্তান মারা গেছে বা স্ত্রী মারা গেছে, প্রচণ্ড সন্তপ্ত হয়ে কোন মহারাজের কাছে গেছে। মহারাজ তাকে বলে দিলেন জীবনটা এই রকমই, জীবনে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই। সে কি পরে আর তাঁর কাছে যাবে? ঠাকুরের কাছে একজন সদ্য সন্তানহারা পিতা এসেছেন। ঠাকুর নিজে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। দুঃখ প্রকাশ করার পরেই ঠাকুর একটা গান গাইলেন, জীব সাজ সমরে। ঠাকুর তাঁকে ঐ সন্তপ্ত অবস্থা থেকে তুলে আনছেন। আমাকে যদি সমস্যা থেকে তুলে না আনতে পারো, নতুন কিছু যদি না বলতে পারো, তাহলে মানুষ কি করতে তোমার কাছে যাবে। আমরা সবাই জানি আমাদের ভেদ দৃষ্টি আছে। একটা গরুও জানে আমি আলাদা আর আমার ঘাস আলাদা। গরু নিজের লেজকে খায় না, ঘাসকেই খায়। গরুও জানে লেজ আমার অঙ্গ আর ঘাস আমার খাদ্য। কুকুরের যতই খিদে পাক নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে কখনই খাবে না, সেও জানে মাংসের টুকরোটা আমার খাদ্য আর বাচ্চাগুলো আমার নিজের, এরা আমিই। আমরা যে জগজ্জননীর কৃপার কথা বলি, সেতো একটা কুকুরও জানে, নতুন কি বলছি! নিজের সন্তানকে একটা কুকুরও ভালোবাসে, একটা বেড়ালও ভালোবাসে। তাহলে আমার আপনার মহত্ব কোথায়? আমি যে নিজেকে একজন বিকশিত ব্যক্তিত্ব রূপে ভাবছি, কিসের জোরে ভাবছি? অন্যদের সাথে কোথাও তো একটা তফাৎ থাকতে হবে। তফাৎটা হয় বিশ্বজনীনতাতে। যেখানে সব কিছু বিশ্বজনীনতার দিকে এগোয় সেখানেই আপনার আমার মহত্ব। এখানে এবার এই ভেদ দৃষ্টি আর অভেদ দৃষ্টি নিয়েই বলতে যাচ্ছেন।

ভেদ দৃষ্টি অতি সাধারণ ব্যাপার, সবারই ভেদ দৃষ্টি। ছোট্ট শিশু যার এখনও বুদ্ধি হয়নি সেও নিজের বাবা আর মাকে আলাদা করে জানে। অথচ আমাদের ঋষিরা বারবার অভেদ দৃষ্টির কথা বলে যাচ্ছেন। অভেদ দৃষ্টি মানেই অদ্বৈত, তাছাড়া আর কিছু না। অদ্বৈত বলতে আমরা কয়েকটা বড় বড় শব্দ শিখে রেখেছি, অদ্বৈত মানে মায়া, অদ্বৈত মানে জগৎ বলে কিছু নেই ইত্যাদি। অদ্বৈত এসব কিছুই নয়, অদ্বৈত মানে একটাই তা হল অভেদ দৃষ্টি। অভেদ মানে একত্ব, এক অস্তিত্বের কথা বলছেন। মায়া কি? তুমি ভেদ যেটা দেখছ, এই ভেদ জিনিষটাই মায়া, তোমার মনের ভুল। মায়া বলতে আমরা কত কি বলছি, মায়া মানে মোহ, মায়া মানে মিথ্যা, মায়া মানে ইন্দ্রজাল। এগুলো কিছু নয়, মায়া মানে stupidity, বলছেন তুমি ভেদ যেটা দেখছ এটাই তোমার মুর্খতা। সাধারণ অর্থে মায়া বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে এখানে বলছেন না। তুমি যে ভেদ দেখছ এটা তোমার মনের ভুল। ভেদ দৃষ্টির জন্যই তোমার জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট, তোমার জীবনে এত শোক, এত মোহ, এত চোখের জল। আনন্দেও চোখে জল আসে। মেয়েরা বিয়ে করছে, আবার নারী উৎপীড়ন, নারী নির্যাতনের কথাও বলছে। নারী উৎপীড়ন যদি হয় তাহলে মেয়েরা বিয়ে করছে কেন, বিয়ে না করলেই তো পারে। বিয়ে না করলে স্বামী-সুখ কি করে পাব! এই যে এতটুকু সুখের চাহিদা, এই এতটুকু সুখের জন্যই জগতে এত কাণ্ড চলছে। আমাদের জীবন-দর্শনের দিকে একটু যদি তাকাই, তখন দেখব এই যে মনে করছি একটু যে

হাসি মুখ দেখছি, একটু যে আনন্দ পাচ্ছি, এই এতটুকু সুখের জন্য এত দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করতে রাজী আছি। তখন এনারা বলছেন, তুমি বলছ তোমার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু সবাইকে ভালোবাসছ, তারাও তোমাকে ভালোবাসে। ভালোবাসা কাকে বলে তুমি জান? ভালোবাসা সেখানেই হয় যেখানে একাত্ম বোধ হয়। আর respect মানেই দুই বোধ, আমি আলাদা তুমি আলাদা, আমি তোমাকে সম্মান করি। মা সন্তানকে ভালোবাসে, মা আর সন্তানের ভালোবাসা একাত্ম বোধ। স্বামীজী সুফিদের একটা কবিতার উল্লেখ করে বলছেন, এক প্রেমিক তার প্রেমিকার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। ভেতর থেকে প্রেমিকা জিজ্ঞেস করছে, কে? বাইরে থেকে বলছে আমি। দরজা খুলল না। আবার এসে কড়া নাড়ছে। কে? আমি। দরজা আবারও খুলল না। আবার এসে দরজায় নাড়া দিয়েছে। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল কে? বাইরে থেকে বলল তুমি। দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। ভালোবাসাতে আমি তুমি এই বোধ থাকে না। কেউ যখন ভালোবাসছে একাত্ম ঠিকই আসছে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু দিন পর ছিটকে যায়। আগেকার দিনে হত না। তখন বিয়ের পর ভালোবাসাটা দিনে দিনে বাড়ত, আর বয়স হয়ে গেলে বুড়ো-বুড়ি দুজনে এক হয়ে যেত। তুমি যে আনন্দের কথা বলছ, জীবনে হাসিও আসে বলছ, জীবনে কখন হাসি আসবে, কখন আনন্দ আসে? যখন তোমার মধ্যে একাত্ম বোধ আসবে। একজনের সাথে একাত্ম বোধ হতেই যদি তোমার জীবনে এত হাসি আসে, এত আনন্দ আসে, এই একাত্ম বোধ যদি তোমার জগতের সাথে হয়ে যায় তখন তোমার জীবনে কত আনন্দ আসবে এবার ভেবে দেখ।

ভেদ দৃষ্টি কক্ষণ আনন্দ দেয় না। জীবনে যে ক্ষণিকের আনন্দ, এই আনন্দটুকুও আসছে তোমার অভেদ দৃষ্টি থেকে। সন্তান যে আনন্দ পায়, মা যে আনন্দ পায় অভেদ দৃষ্টির জন্যই পায়। ছেলে আর মেয়ের ভালোবাসাতে যে আনন্দ তারা পায় সেটাও অভেদ দৃষ্টিতে পায়। যেমনি ভেদ দৃষ্টি আসে তখন দুঃখও এসে যায়। জগতের সাথে ভেদ দৃষ্টি যত বাড়বে জীবনে কান্না তত বেশি হবে। শোক আর মোহের মূলে ভেদ দৃষ্টি। আনন্দ সব সময় আসে অভেদ দৃষ্টিতে। বলছেন, যদিও আমরা চারিদিকে ভেদ দৃষ্টি দেখছি কিন্তু বাস্তবে অভেদ দৃষ্টিই আছে। এটাকেই ব্যাখ্যা করার জন্য পরের মন্ত্রে বলছেন –

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।২/১/১০।।

(যিনি এখানে তিনিই সেখানে, যিনি সেখানে তিনিই এখানে, উপাধি অনুযায়ী বিবিধরূপে বিভাসিত হন। যে এই ব্রহ্মে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।)

বলছেন যেটা এখানে আছে সেটা সেখানেও আছে। এই দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতের ভেতরে যিনি আছেন তিনিই সেইখানে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যে সত্তা সেখানেও তিনি আছেন। যে এখানে ভেদ দেখে সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে পায়।

এর আগের পাঁচটি মন্ত্রে দেখান হল আমাদের ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি জীবন সেই পরম সত্য বা আত্মার সাথে কিভাবে এক হয়ে আছে। আত্মাই অদিতি রূপে মানুষের মধ্যে আছেন, ওটাই হিরণ্যগর্ভ, ওটাই প্রাণ। পুরো জিনিষটাকে আরও গুটিয়ে এনে এবার সরাসরি দেখান হচ্ছে। এতক্ষণ সব কিছুকে ছড়িয়ে দিয়ে পরোক্ষ ভাবে বলছিলেন, এবার গুটিয়ে এনে সরাসরি বলছেন সত্যটা কি রকম। নিজেকে নিয়ে বিচার করার উপর পাশ্চাত্য জগতে একটা নতুন দর্শনের জন্ম হয়েছে যাকে বলছেন Existencialism। এই দর্শনের নামকরা একজন ব্যক্তিত্ব হলে জাঁ পল সার্ত্রে। এনারা অস্তিত্ব জিনিষটাকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। আমাদের অস্তিত্বকে নিয়ে সামান্য একটু বিচার করতে গেলে আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু প্রশ্ন উদিত হয় আর সেই প্রশ্নেরও একটা উত্তর দেওয়া হয়। অস্তিত্ব জিনিষটা কি? এই অস্তিত্বের মধ্যে কি কি জিনিষ জড়িয়ে আছে? অস্তিত্ববাদীরা একটা খুব সাধারণ উত্তর দেন যে, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকটাই অস্তিত্ব। এই উত্তরে অস্তিত্ব জিনিষটা কি বলা হচ্ছে না, অস্তিত্বের ক্রিয়াকে বলছেন। যদি বলা হয় অস্তিত্ব মানে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা, তাহলে প্রশ্ন হবে, এখানে কে বাঁচছে? আমি আপনি। কার সাথে সংগ্রাম করছে? জগতের সাথে। তাহলে অস্তিত্ব বলতে দুটো জিনিষ, আমি ও জগৎ। Existencialismএর পণ্ডিতরা এই দুটোকে নিয়েই যা কিছু বলার বলেন। যখনই কেউ অস্তিত্বকে নিয়ে ভাবে তখন এটাই ভাবে, আমি আছি আর জগৎ আছে। আর এই জগতের যা কিছু বোধ আমার ইন্দ্রিয় দিয়েই হয়। বেঁচে থাকার লড়াইটা আমার। এটাকেই যখন বেদান্তের ভাষায় নিয়ে

আসা হবে তখন আমিটা আর থাকে না, তখন বলে জীব। জীব শব্দ দিয়ে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হল। অস্তিত্ব মানেই জীব আর জগৎ। জীব মানে যে কোন সজীব পদার্থ, শুধু আমাকে নিয়ে তো অস্তিত্ব চলবে না, অস্তিত্ব সবারই জীবনকে নিয়েই চলবে। আমরা এখানে পঞ্চাশ জন বসে আছি, সবাইকে এখন আর পঞ্চাশটা নাম নিয়ে বলা হবে না, বলা হবে একটা living principle, living principleকে বলে জীব। জীব আর জগৎ এই দুটি সত্তাকে নিয়ে কখন প্রশ্ন করা যাবে না।

কিন্তু এখান থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে, কিছুটা সংস্কারবশতঃ আর কিছুটা নানান রকমের গ্রন্থাদি পড়ে, একটা তৃতীয় সত্তা এই দুটো সত্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে, বিশেষ করে যারা নিজেদের হিন্দু বলছে বা বেদান্ত অধ্যয়ন করেছে, এই তৃতীয় সত্তা খুব নামকরা সত্তা যাঁকে বলছেন ঈশ্বর। আস্তিক অর্থাৎ যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে তাদের কাছে তিনটে সত্তা, জীব, জগৎ আর ঈশ্বর। যারা ঈশ্বর মানে না তাদের কাছে জীব আর জগৎ এই দুটি সত্তা। এবারে দেখতে হবে জীব, জগৎ আর ঈশ্বর এই তিনটের মধ্যে কি সম্পর্ক? অনেকে মনে করেন, বিশেষ করে যারা অনেক দিন শাস্ত্রাদির কথা শুনেছেন বা পড়েছেন, তাঁরা বলেন জীব আর জগৎ ঈশ্বরেরই দুটি রূপ। জীব আর জগৎ যদি ঈশ্বরেরই দুটি রূপ হয়ে থাকে তাহলে মোট কটি সত্তা হবে? যদি জীব আর জগৎ ঈশ্বর থেকেই আসে তাহলে একটি সত্তাই হয়, ঈশ্বরের সত্তা। কিন্তু জীব আর ঈশ্বরের সত্তা সত্যিই এক হয় কি? একথা বারবার বলা হয় যে কোন পরিস্থিতিতেই জীব আর ঈশ্বরের সত্তা এক হবে না। আত্মা আর ব্রহ্মের ঐক্য হবে কিন্তু জীব আর ঈশ্বর কোন দিন এক হবে না। ঈশ্বর মানেই যিনি স্রষ্টা, যিনি জগতের অধিষ্ঠাতা। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বা ভগবান, ভক্ত কোন দিন শ্রীকৃষ্ণ হতে পারবে না। ব্রহ্ম রূপে যখন দেখবে তখন আমিও ব্রহ্ম তিনিও ব্রহ্ম। কিন্তু তখন জীব আর ঈশ্বর শব্দ আসবে না, জীবের সব উপাধিকে সরিয়ে দিতে হয়। সত্তা তাহলে হয় দুটো নাহলে তিনটে, ঈশ্বর আর ঈশ্বরের চৈতন্য শক্তি জীবের মধ্যে, এই শক্তি যেভাবেই নেওয়া হোক না কেন, কলা অংশে নেওয়া হোক, চিদ্ অংশ রূপে নেওয়া হোক, পূর্ণ অংশই নেওয়া হোক, অন্য দিকে জড়, চিজ্জড়গ্রন্থি, তাহলে চৈতন্য, জড় আর ঈশ্বর। এটাই দ্বৈতবাদ। বৈষ্ণব, রামায়ৎ, খ্রীষ্টান, মুসলমান এরা সবাই দ্বৈতবাদী। ঈশ্বর আছেন, তিনি জীব আর জগৎ রূপে সৃষ্টি করেছেন।

এরমধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিষ ঢুকছে তা হল পরমাত্মা। শুধু পরমাত্মাই নয়, এই পরমের সাথে অনেক উপাধি জুড়ে দেওয়া যাবে, পরমশক্তি, পরম মালিক, পরম ঐশ্বর্য্য, উপাধির সাথে যত খুশী পরম লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাহলে তিনি হয়ে গেলেন রাজাধিরাজ আর জীব হয়ে গেল তার সত্তা বা সেবক। এখন জীবের যে গতি সেটা কে দেখবেন? ভগবান দেখবেন, কারণ তিনিই পরম মালিক। ঠাকুরের ভক্তরাও জানে আমি এক আর জগৎ আরেকটি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ আরেকজন। আর যদি জগৎ না মানে, আমি তো জগতেরই একটা অংশ। কিন্তু আমার ভেতরে শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তা আর আমার সত্তা, এই দুটি সত্তাই চলছে। আমার কাছে জীবনের উদ্দেশ্য হল যো সো করে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে এক হয়ে যাওয়া। বৃক্ষ আর তার পাতা যেমন আলাদা, আমিও ঠিক সেই রকম মনে করছি আমি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে আলাদা, কোন রকমে আমার এই বোধটা যেন আসে আমি ঈশ্বরের সাথে এক। বিশ্বে যারাই ধর্মের অনুশীলন করছে তাদের কাছে এটি একটি খুব জনপ্রিয় থিয়োরী, সবাই ঘুরে ফিরে এই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়াবে।

তাহলে অস্তিত্ব মানে জড় আর জীব। জড় মানে জগৎ, জীব মানে জড় আর চৈতন্যের গ্রন্থি। জড় আর চৈতন্য দুটোই ভগবানের রূপ। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন আমার দুটো প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি বা পঞ্চোদশ অধ্যায়ে বলছেন *দ্বাবিমৌ পুরুষ লোকে*। ঈশ্বর একজন আর আমি একজন, আমার যা কিছু হওয়ার সব ঈশ্বরের হাতেই হবে, এটাও একটা ভাব। কিন্তু উপনিষদের এই ভাব নয়। আচার্য শঙ্কর এই ভাবকে গীতার ভাষ্যে প্রচণ্ড কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন। আচার্য সেখানে বলছেন, এই ভাবকে নিয়ে যারা চলে তারা আর যাই হোক এরা কোন মতেই বেদান্তী নয়। বেদ, উপনিষদ জানতে পারে কিন্তু এরা মুর্খ আর মুর্খের মতই এদের কথা উড়িয়ে দিতে হয়। সম্প্রদায়বিদরা কখনই এই মতকে নেবেন না। সম্প্রদায়বিদ আসলে কি? আমি অস্তিত্ব জিনিষটা কি জানার জন্য নিজে স্বাধীন ভাবে অস্তিত্বের পেছনে সত্যটা কি চিন্তা ভাবনা করে বোধ করালাম যে, অস্তিত্ব হল জীব, জগৎ ও ঈশ্বর। আমার মত আরেকজনও চিন্তা ভাবনা করে এই কথা বলল। প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলিও বলছে অস্তিত্ব মানে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর। তাহলে কি এটাই সত্য?

বলছেন, তোমার এই বোধ সত্য নয়। যে কোন সত্যকে দেখতে হলে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি, এই তিনটের মধ্যে ফেলে দেখতে হবে। আমার বর্তমান অনুভূতি হল জীব, জগৎ ও ঈশ্বর, খুবই ভালো কথা। জীব আর জগতের অনুভূতি আমার হয়ে থাকতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের অনুভূতি আমার এখনও হয়নি, ঈশ্বরের ব্যাপারে আমি যেটা বলছি সেটা আমার মনের কল্পনা বা বিশ্বাস হতে পারে। আমার কাছে অস্তিত্বের সত্য হল জীব, জগৎ ও ঈশ্বর, এবার যুক্তি দিয়ে এই সত্যকে দেখতে হবে। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে অকাট্য যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন কেন তিনটি সত্তা কখনই হতে পারে না। সব থেকে গুরুত্ব হল শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, উপনিষদের কথা, ঋষিদের কথা, তাঁরা সম্প্রদায় বিদ্যা নিয়ে চলেন। সম্প্রদায় বিদ্যা মানে, একজন ঋষি এক রকম দেখেছেন, তিনি আবার তাঁর কৃতী শিষ্যদের শিখিয়েছেন, তাঁরাও আবার সেই জিনিষটাকে সেই ভাবেই দেখেছেন। ঈশোপনিষদের ঋষি তাই বলছেন *ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্*, যাঁরা ধীর পুরুষ তাঁদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি আর *বিচচক্ষিরে*, যাঁরা বিচক্ষণ পুরুষ তাঁদের কাছে আমরা শুনেছি, তার মানে এটা সম্প্রদায় বিদ্যা। বেদান্ত পুরোপুরি সম্প্রদায় বিদ্যা, সম্প্রদায় বিদ্যা মানে, আচার্য ঋষিরা, মহাপুরুষরা তাঁরা জিনিষটাকে যেমনটি দেখেছেন সেই ধারাতে চলে আসছে। আপনার কথা খুব সুন্দর হতে পারে, খুবই যুক্তিযুক্ত হতে পারে কিন্তু আপনার কথাকে এই কারণেই নেওয়া যাবে না, ঋষিদের যে পরম্পরা, যে ধারা চলে আসছে তাতে এই মত নেই। শ্রুতি যেখানে অন্য রকম বলে দিয়েছে সেখানে আপনি যতই যুক্তি দেখান সেটা আর চলবে না। যদি আপনার মতকে দাঁড় করাতে হয় তাহলে আপনি আরেকটা নতুন সম্প্রদায় দাঁড় করান, এই সম্প্রদায়ে আপনার এই মত চলবে না। উপনিষদ, বেদান্ত আগাগোড়া সম্প্রদায় বিদ্যা। এখানে কারুর যুক্তি, ভাগবতে কি বলছে, অমুক গ্রন্থে কি বলছে এসব কিছুই চলবে না। একমাত্র চলবে, ঋষিরা যা অনুভব করেছেন, যেটা বলেছেন, ওখানে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। তাঁরা যখন তিনটে সত্তাকে বাতিল করে দিচ্ছেন তখন কি বলছেন? তাঁরা বলছেন, সত্তা কিন্তু তিনটে নেই। তুমি যে জীব আর জগৎ দেখছ ঠিকই দেখছ, এই দেখাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু সত্তা সেই এক, ঐ এক সত্তা ছাড়া অন্য কোন সত্তা নেই। এই জিনিষটাই এই মন্ত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

এই মন্ত্রের যে আধ্যাত্মিক সত্য, এই সত্যকে বাস্তবিক যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ হয় সেই অবস্থাকে বলে চেতন সমাধি। ঠাকুরও চেতন সমাধির কথা বলছেন, চেতন সমাধির কথা বলার পর বলছেন, চেতন সমাধি কার হয়েছিল? শুকদেবের হয়েছিল। চেতন সমাধি কারুরই হয় না, সিদ্ধ পুরুষদের জড় সমাধিই হয়। জড় সমাধিতে ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, মন সম্পূর্ণ ভাবে একটা জিনিষকে নিয়েই আছে, তিনি তখন দেখেন সেই এক পরম সত্তাই আছেন। কিন্তু সমাধির ঐ অবস্থা থেকে নেমে আসার পর তাঁর কাছে আবার দুটি সত্তা এসে যায়, জড় আর চৈতন্য। একমাত্র চেতন সমাধিতে চোখ খুলেও ঈশ্বরকে দেখা যায়। চোখ খুলে জগৎকে যখন দেখেন তখনও তিনি ঐ এক পরম সত্তাকেই দেখেন যে অবস্থা আচার্য শঙ্কর, স্বামীজীর মত কয়েকজন যুগপ্রবর্তক ছাড়া লাভ করতে পারেন না। ওনারা কি দেখেন? সেটাই এই মন্ত্রে বলছেন। *যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।* যখনই কারুর জীবনে প্রচুর রোগ-শোকের প্রবাহ চলছে, এই মন্ত্রের অর্থ ও ভাবকে স্মরণ করলে রোগ-শোক-তাপ এগুলো অনেক কমে যাবে।

এখানে দুটি ব্রহ্মের কথা বলছেন – উপাধিসহিত ব্রহ্ম আর উপাধিরহিত ব্রহ্ম বা কার্যব্রহ্ম আর কারণব্রহ্ম। যেখান থেকে সৃষ্টি বেরিয়েছে তাঁর কথাও বলছেন তার সাথে সৃষ্টি জিনিষটাকেও বলছেন। বেদান্ত মতে সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে আলাদা কিছু নয়। উপাধিসহিত কি রকম? ঠাকুর বলছেন জলের উপর একটা লাঠি ফেলে দেওয়া হল, জলের এখন দুটো বিভাজন হয়ে গেল। লাঠি ফেলে দেওয়াটাই উপাধি, এই উপাধিটা মিথ্যা। মিথ্যা হলে কি হবে, মিথ্যা দিয়ে যেটা আসছে সেটাও তিনি। বাজিকরের খেলা বাজিকর থেকে আলাদা কিছু নয়। উপাধিটা মিথ্যা কিন্তু উপাধির দরুণ যেটা দেখাচ্ছে সেটা তিনি। কার্য আর করণ, দেহকে বলছেন কার্য আর করণ মানে ইন্দ্রিয়। কার্য আর করণ হল সংঘাতরূপ, সংঘাত হেতু উপাধিযুক্ত হয়ে সংসার বা জগৎ রূপে যা ভাসছে, বলছেন সেটাও ব্রহ্ম। আর নিজের স্ব-স্বরূপে অবস্থিত যে ব্রহ্ম তিনি নিত্যবিজ্ঞানঘন, তার সাথে সর্বসংসারধর্মবর্জিত, সংসারের যত রকমের ধর্ম আছে, জন্ম, মৃত্যু বা ষড়্বিকার এগুলো থেকে তিনি আলাদা। নিত্যবিজ্ঞানঘন ও সর্বসংসারধর্মবর্জিত যে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, এটাই উপাধিরহিত ব্রহ্ম। এর বিপরীত উপাধিসহিত ব্রহ্ম হয়ে গেলে কার্য, করণ, দেহ এসে যায়। ইন্দ্রিয় এসে গেলেই প্রাণশক্তিও এসে যাবে। সেই তিনিই এখন জগৎ রূপে ভাসমান, দেহ রূপে ভাসমান। এখানে এসে তিনটে সত্তাকেই দেখাচ্ছে, জীব, জগৎ ও

ঈশ্বর এই তিনটেকেই দেখাচ্ছে। জীব, জগৎ আর ঈশ্বর উপাধিসহিত ব্রহ্ম। জীব, জগৎ আর ঈশ্বরকে সরিয়ে দিলে উপাধরহিত ব্রহ্ম। দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এটাই বলছেন, *যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*, যে কার্যব্রহ্মকে দেখা যাচ্ছে এটা সেই কারণব্রহ্ম। ঠিক তেমনি *অমুত্র* মানে দূরে, যিনি পরমাত্মা ভাবে অবস্থিত তিনিই আবার এই লোকে নাম, রূপ, কার্য, করণ উপাধিসহিত আত্মতত্ত্ব। এই জগৎটা যিনি উপাধি নিয়ে আছেন, তিনিই উপাধিরহিত পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। অনেক সময় দেখা যায়, এ তার মত কিন্তু সে তার মত নাও হতে পারে, ছোট বড় তফাৎ থাকতে পারে। যেমন চিনি আর চিনির পাহাড়, চিনির ডেলা চিনির পাহাড়ের সাথে এক, কিন্তু চিনির পাহাড় চিনির ডেলার সাথে কখন এক নয়। অনেকে বলেন নদীর ঢেউ, ঢেউ নদীরই অঙ্গ, নদী কখন ঢেউ নয়। সেটাকে এখানে counter করছেন, বিশুদ্ধ পরমাত্মা যিনি *যদমুত্র*, যিনি পরমব্রহ্ম তিনিই এই জগৎ রূপে ভাসমান, দুটোর মধ্যে কোথাও কোন তফাৎ নেই। এই জিনিষটাকে খুব উচ্চমানের সাধক না হলে ধারণা করা অসম্ভব। ঠিক এই ধরণেরই বিখ্যাত শান্তিমন্ত্র আছে যেখানে বলছেন *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে*। শান্তিমন্ত্রেরও ঠিক একই ভাব। *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং*, ওটাও পূর্ণ এটাও পূর্ণ, কার্যব্রহ্মও পূর্ণ কারণব্রহ্মও পূর্ণ। *পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যতে*, কারণ ব্রহ্ম থেকেই কার্য ব্রহ্ম এসেছে। আর কার্যব্রহ্মকে যখন আলাদা করে দিচ্ছে, এই পূর্ণ নিয়ে নিলেও ঐ পূর্ণটা থাকবে, পূর্ণ পূর্ণই থাকে, পূর্ণের কোথাও কোন পার্থক্য হয় না। এটাই বেদের ঠিক ঠিক ভাব। এখানে যে বিচ্ছিন্ন কোন মন্ত্র নিয়ে আসা হয়েছে তা নয়, এটাই আমাদের পরম্পরার ভাব।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঠিক এর উপর আচার্য তাঁর বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করছেন। সেখানে বিরোধীরা আচার্যকে বলছেন, আপনি যা বলছেন ঠিকই বলছেন, কিন্তু আমি জানি আমি জীব, আমার অমুক আছেন তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন। যতই বিচার করি না কেন, এই দ্বৈত ভাব থেকে আমরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারি না, মাথার মধ্যে দ্বৈত ভাব ঘুরে ফিরে এসে যাবে আমি আছি ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আমাকে উদ্ধার করবেন। আমরা যতক্ষণ এটাকে ব্যবহারিক জগতের একটা সত্তা রূপে রাখছি ততক্ষণ কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি পারমার্থিক সত্য রূপে ভাবি তখন একে আর সম্প্রদায় বিদ্যা রূপে নেওয়া যাবে না। সাধনার জন্য দ্বৈত একজনের ভাব হতে পারে, যেমন মা আছেন আর আমি আছি। উপনিষদের এই ভাব নয়। এই ভাবকে অবলম্বন করে কেউ সাধনা করতে পারে, নিজেকে আরও শুদ্ধ করতে পারে, আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু শেষ কথা বলা যাবে না। উপনিষদের এটা শেষ কথা কখনই হতে পারে না। যারা বলে এটাই শেষ কথা, আচার্য খুব কড়া ভাষায় বলছেন তার মুর্খ। এই ভাব আর যাই হোক, এটা কখনই বেদান্ত নয়। আচার্য খুব প্রখর যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন এ জিনিষ কখন হতে পারে না। আচার্য এত উচ্চমানের যুক্তির অবতারণা করছেন সাধারণ লোকের পক্ষে ঐ যুক্তিকে ধরা সম্ভব নয়। মূল কথা হল এটাই আমাদের ভাব। কথামৃতে ঠাকুরের যে কথাগুলো আমাদের মনের মত আমরা সেই কথাগুলিকেই ধরে নিচ্ছি। ঠাকুরের যে কথাগুলি খুব গভীর সেগুলো পড়ার পর বলছি পড়তে ভালো লাগছে, ভাবতে ভালো লাগছে। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগছে বলার পর বাকি জিনিষগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ঠাকুর বারবার বলছেন, বাবু যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সে বাবু। আবার বলছেন সাপ হেললে দুললেও সাপ কুণ্ডুলি পাকিয়ে পড়ে থাকলেও সাপ, দুটোর কোন তফাৎ নেই। তফাৎ কখন হয়? যখন ব্যবহারিক জগতে আসে তখন এক অপরের থেকে তফাৎ হয়ে যায়। কিন্তু এটাই কখন শেষ কথা হতে পারে না। সেইজন্য আচার্য দুটি শব্দ নিয়ে এলেন, পারমার্থিক সত্য আর ব্যবহারিক সত্য। ব্যবহারিক সত্যে আলাদা হতে পারে, ব্যবহারি সত্যে আমি আলাদা আপনি আলাদা, ব্যবহারিক সত্যে ঠাকুর আছেন, ব্যবহারিক সত্যে তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু এটাকে কখনই পারমার্থিক সত্য বলা যাবে না। এখানে পারমার্থিক সত্য হল, *যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*।

বেদ ও উপনিষদের যে কোন মন্ত্রেই যাওয়া হোক না কেন, যেমন বলছেন *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।* এখানেও সেই একই কথা বলা হচ্ছে, তিনিই নানান রূপে বিরাজমান হয়ে আছেন। স্বামীজী যে সবার জন্য সেবার আদর্শের কথা বলছেন সেখানেও এই একই ভাবকে সামনে রেখে বলছেন। জগতে যত মুখ সব তাঁরই মুখ, *বিশ্বতোমুখঃ* বেদেরই কথা। তিনিই নানান রূপে আমাদের সামনে বিরাজ করে আছেন। বেদের এটাই সামগ্রিক ভাব, উপনিষদেরও

এই একই ভাব। ঠাকুরও এই একই কথা বলছেন। স্বামীজী শুধু বলছেন না, তিনি এই ভাবকে কার্যকরী করতে গিয়ে যে সেবার আদর্শের কথা বলছেন সেখানেও তিনি এই একই কথা বলছেন, এটাই সত্য।

যতক্ষণ কোথাও সামান্যতম একত্ব বোধ না থাকে ততক্ষণ আমি অপরকে কেন সেবা করতে যাব? আপনাকে সেবা করা আগে কোথাও তো আমাকে আপনার সাথে একটা জায়গায় জুড়ে থাকতে হবে। আমরা কত বড় বড় কথা বলি, আমরা সবাই ভারতবাসী, আমরা সবাই মানুষ, মানুষের জন্য কিছু করুন, ভারতবাসীর জন্য কিছু করুন। নিকুচি করেছে সব বড় বড় কথায়, আগে আমাকে বাঁচতে হবে, আগে আমি বাঁচলে পরে ভারতবাসীর জন্য কিছু করব। আগে নিজের সেবা পরে পরের সেবা করা যাবে। পর মানেই পর, সেখানে কিসের সেবা। উপনিষদ পুরো জিনিষটাকে পাল্টে দিচ্ছেন, পর বলে কিছু নেই। শ্রীমা যখন বলছেন কারও দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। তারপর কি বলছেন? জগতে কেউ পর নয়। পর নয় না, পর বলে আদৌ জগতে কিছু নেই। শ্রীমা একজন সাধারণ মহিলাকে বোঝানর জন্য সাধারণ ভাষায় বলছেন জগতে কেউ পর নয়। বেদান্ত বলছে পর বলে কিছু নেই। কিন্তু আমরা কি কখন মানতে পারি বা বুঝতে পারি আমি আর আপনি এক? কে আছে যে পর বলে কিছু দেখে না? তাও আমাদের ভ্রাতৃত্বের কথা বলতে হয়, আমরা সবাই ভারতবাসী, আমরা মানবজাতি এইসব বড় বড় কথা বলতে হয়। বলার পরেও সবাই পর দেখে। তাহলে এই উপদেশ দেওয়া কেন? কারণ, অবতার পুরুষরা তত্ত্ব কথাকে সাধারণের জন্য সাধারণ করে বলেন। উপনিষদ বলছেন পর বলে কিছু নেই। উপনিষদের এই কথাকেই শ্রীমা আমাদের মত সাধারণের জন্য বলছেন, জগতের কেউ পর নয়। আমার গলা কাটতে আসছে, আমি কি মেনে নেব সে আমার পর নয়, একি কখন সম্ভব। বলবেন হ্যাঁ সম্ভব, যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদের কোথাও তো শুরু করতে হবে, একদিনে তো পর বোধ চলে যাবে না। এখানে এটাই বলছেন, জগতে পর বলে কিছু নেই। চেতন সমাধি যাঁর হয় তিনি এটাই দেখেন। ঠাকুরও এই কথা বলছেন, আর স্বামীজী একেবারে ব্যবহারিক স্তরে নামিয়ে এনেছেন। যেখানে যেখানে স্বামীজী যা যা বলছেন, দেশভক্তির আদর্শ, সমাজের প্রতি সেবার আদর্শ সব আদর্শের পেছনে ঐ একটি ভাব – জগতে পর নেই। একদিনে তো আমরা সেই অবস্থায় যেতে পারব না, কোথাও তো একটা শুরু করতে হবে। এর আগে আচার্য বললেন, কোন শাস্ত্র বা কোন ঋষি বলেননি তুমি এই শরীর কিন্তু সবাই নিজেকে শরীর মনে করে। স্বামীজী আর কি করে বলবেন যে তুমি আর তোমার শরীর পর নও, তুমি আর তোমার পরিবারের লোকেরা পর নও, এটাকে বোঝানর জন্য অবতারকে কেন আসতে হবে! একটা কুকুরও জানে আমার সন্তান মানে আমারই সন্তান, তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। এটা করার জন্য কাউকে বলে দিতে হয় না। ভাঙনটা আরও উপর থেকে শুরু করতে হবে। আমরা সবাই বাঙালী, তাও কিছুটা এগোল। স্বামীজী এরও উপরে নিয়ে চলে গেলেন, আমরা ভারতবাসী, সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই, এটা আরও বৃহৎ একত্বের ভাব। এরমধ্যে আবার কয়েকজন বুদ্ধিজীবি বলতে শুরু করল, ভারতবাসী ভারতবাসী বলা বন্ধ করে জগৎকে এক দেখতে শিখুন। ঠাকুর বলছেন হেলে ধরতে শেখেনি, কেউটে ধরতে যায়। এটাই আমাদের সমস্যা, যারা সব দিক দিয়ে অপদার্থ তাদের দেশভক্তি, দেশসেবার কথা বলতে গেলেই বলতে শুরু করবে, সমস্ত জগৎকে এক দেখুন, ভ্রাতৃত্ব বোধ নিয়ে আসুন। নিজের পাড়ার মঙ্গল চিন্তা করতে পারে না এদিকে আবার সারা জগদ্বাসীকে ভ্রাতৃত্ব শেখাতে যাচ্ছে।

আমরা সবাই ভাই, জগৎ এক, এই কথাগুলো কান দিয়ে শুনতে খুব ভালো লাগে। যারা বলছে তাদের কি কোন বোধ আছে কি বলতে চাইছে! কিসের ভ্রাতৃত্বের কথা বলছেন! আমাকে আগে বাঁচতে হবে, আমি মরে গেলে সব শেষ, আমার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সব শেষ হয়ে যাবে। মহাভারতে বিশ্বামিত্রের কাহিনী আছে, কয়েক বছর অনাবৃষ্টিতে চারিদিকে দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে। বিশ্বামিত্র এক চণ্ডালের বাড়িতে মরা কুকুরের মাংস চুরি করতে ঢুকেছেন। চণ্ডাল দেখে ফেলতেই বলছে 'ছি! ছি! আপনি একি করছেন'? বিশ্বামিত্র বলছেন 'অনাহারে আমি যদি মরেই যাই আমার তো সব শেষ। এই অপবিত্র মাংস খেয়ে আমার শরীর যদি বেঁচে যায় তাহলে পরে আমি প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে পারব তাতে বাকি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে তো আগে বাঁচতে হবে'। তাহলে স্বামীজীর দেশসেবার আদর্শ কেন পালন করতে যাব? এইজন্যই করতে যাব কারণ পর বলে জগতে কিছু নেই। যাঁরা বলছেন আমরা এদিকে এগোতে চাই, তাঁদের জন্য বলছেন তোমরা দেশসেবা দিয়ে শুরু কর। আর যারা একেবারে স্বার্থপর, নিজের স্বার্থটুকু ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না, তাদের

একটু টোপ খাইয়ে বলছেন, গরীবের জন্য একটু কিছু তো কর। বেশির ভাগ লোক করবে না, নিজের স্বার্থ থেকে তারা বেরতে পারে না। জীব, জগৎ আর ঈশ্বর তিনটে সত্তাকে যদি আলাদা করে দেওয়া হয়, বিশেষ করে ভৌতিকবাদের জীব আর জগতে যদি নেমে যায় তখন আর কোন প্রশ্নই উঠবে না কারুর সেবা করার। ভৌতিকবাদীদের বড় প্রবক্তা হল কম্যুনিস্টরা। কম্যুনিস্টদের বিশ্বের সব থেকে বড় দুজন নেতার জীবন-দর্শন আর চরিত্রের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেগুলো পড়লে মানুষ আঁতকে উঠবে। মানবজাতির ইতিহাসে মানুষ কতটা ভোগবিলাসী আর নৃশংস হতে পারে এই দুজনের জীবনী না পড়লে বোঝাই যাবে না। এদের নৃশংসতার কাছে হিটলারও শিশু। এরা বলছে ভ্রাতৃত্বের কথা, সাম্যের কথা, সবাই সমান! কম্যুনিস্টদের আদর্শ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সাম্যবাদ, সেই আদর্শের বিষফল বিশ্বের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সব থেকে বড় এই দুই নেতা।

স্বামীজী যে দেশভক্তির কথা বলছেন সেখানে তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সাম্য এসব কিছু বলছেন না। একটু মনযোগ দিয়ে স্বামীজীর রচনাবলী পড়লে দেখা যাবে স্বামীজী বারবার একটা কথাই বলতে চাইছেন, কেউ পর নয়। যিনি ঈশ্বর তিনিই বহু রূপে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। যারা অভক্ত, নাস্তিক তারা স্বামীজীর কথা শুনতে যাবে না, তারাই যাবে জীবনে যাদের একটা আদর্শকে সামনে রেখে চলার ইচ্ছে আছে। তাদের স্বামীজী বলছেন, কোন একটা আদর্শ যদি জীবনে চাও তাহলে এই রকমটি কর। তখনকার দিনে মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি বেশি ছিল, সেইজন্য বেশি লোক তখন শুনতেন। তিনি একটা নতুন আদর্শ তাদের জন্য রেখে দিলেন তোমরা সেবা কর। স্বামীজীর পত্রাবলী, বক্তৃতায় এই একটি কথা, একটি নীতি, একটিই তত্ত্ব – *যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*। এটাকেই অন্য ভাবে যখন নিয়ে আসছেন তখন বলছেন *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং* বা *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি*। সব একই কথা, বিভিন্ন ভাবে বলছেন। আর যদি তুমি এভাবে না কর তখন কি হবে?

যারা বহু দেখে, সব কিছুকে আলাদা দেখে, জীব আলাদা, জগৎ আলাদা দেখছে আর ঈশ্বর আলাদা দেখছে, আচার্য বলছেন *ভেদদৃষ্টিলক্ষণয়াঽবিদ্যয়া মোহিতঃ,* যারা ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন ও অবিদ্যায় যারা মোহিত হয়ে গেছে, তখন তারা বলে আমি পরমাত্মা থেকে আলাদা পরমাত্মা আমার থেকে আলাদা, এরাই *মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি*, মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। আমি আলাদা শ্রীরামকৃষ্ণ আলাদা এই ভাব নিয়ে আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করছে ঠিক আছে, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু এই ভাবকেই পরমার্থ তত্ত্ব রূপে নিলে গোলমাল লেগে যাবে। তখন কি হয়? *মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি*, বারবার জন্ম-মৃত্যু হবে। তাহলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র, পুনর্জন্ম কার জন্য? *বিজ্ঞানৈকরসং নৈরন্তর্যেণ আকাশবৎ পরিপূর্ণং*, যেমন আকাশের বিভজান হয় না, আকাশ সব সময় পরিপূর্ণ, আমিই সেই ভেদরহিত একরস বিজ্ঞানস্বরূপ আকাশতুল্য পরিপূর্ণ ব্রহ্ম এই বোধ যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র ও পুনর্জন্মের খেলা চলতে থাকবে।

কঠোপনিষদেই পরে এক জায়গায় জন্ম-মৃত্যুকে নিয়ে বলবেন। জন্ম-মৃত্যু নিয়ে কয়েকটি মতবাদ আছে। পুনর্জন্মবাদ বেদে কতটা গুরুত্ব পেয়েছে পরিষ্কার করে জানা নেই। কঠোপনিষদে জন্ম-মৃত্যু বা পুনর্জন্মবাদের কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না জন্ম-মৃত্যু বলতে ওনারা ঠিক কি বলতে চাইছেন। মহাভারত আসার পর জন্ম-মৃত্যু ভারতীয় মনে পুরোদমে বসে গেছে। বাল্মীকি রামায়ণেও এত জোরালো ভাবে বসেনি। কোথাও কোথাও হাল্কা একটু যেন উঁকি মারছিল, সেটাও আবার বেশির ভাগই দেবতাদের ক্ষেত্রে। তবে দেবতাদের ক্ষেত্রে যদি থাকে তাহলে মানুষের ক্ষেত্রেও আসবে। জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারটা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর আগে সম্প্রদায় বিদ্যার কথা বলার সময় বলা হয়েছিল একটা জিনিষ যখন প্রচলিত ধারার মধ্যে আগে থেকেই আছে, ঐ ধারার মৌলিক জিনিষগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন করতে নেই। কিন্তু পুনর্জন্মবাদকে নিয়ে অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে। যেমন বলা হয়, জ্ঞানী কোথাও আসা যাওয়া করেন না। জ্ঞানী দেখেন জন্ম নেই মৃত্যুও নেই, তিনি দেখেন জন্ম-মৃত্যু কখন ছিলই না। সেইজন্য জন্ম-মৃত্যু, পুনর্জন্মবাদ এগুলো খুব জটিল বিষয়। এইসব কারণে পরের দিকে বেদান্তীরা এগুলোকে একটা কাঠামোর মধ্যে বেঁধে দিলেন। কিন্তু এনাদের কতটা সুনিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে বলা খুব মুশকিল। কোথাও কোথাও যেন মূল ভাবের সাথে মেলে না। যেমন শঙ্করাচার্যের পরবর্তীকালের অদ্বৈতীরা বলে দিলেন ত্রিকাল মে জগৎ নেই হ্যায়, জগৎ মায়া। আপনি যে বলছেন তিন কালে জগৎ নেই, কি করে বলছেন? তাহলে এই মন্ত্র কি বলতে চাইছে? এই মন্ত্র বলছে উপাধি জিনিষটা মিথ্যা, নানাত্ব আমরা যেটা দেখছি, নানাত্ব দেখাটাই দোষ।

মায়া বলতে আমরা বেশির ভাগ সময় অলীক বলে মনে করি। অলীক মানে যে জিনিষটা কোন কালেই নেই। যেমন আকাশকুসুম, আকাশকুসুম জিনিষটা অলীক, তার মানে জিনিষটা আদৌ নেই। যখন বলছি জগৎটা মায়া তখন আমরা সব সময় বুঝে নিই যে জগৎ অলীকবৎ। কারণ বৌদ্ধ দর্শনে জগৎকে অলীক রূপেই দেখে। বেদান্তে জগৎ কিন্তু অলীক নয়। বেদান্ত যখন মায়া বলছে, আসলে বলতে চাইছে সচ্চিদানন্দের উপর উপাধি এসে গেছে। আমি অমুক, আমি শিক্ষক, আমি সন্ন্যাসী, এগুলো প্রত্যেকটা এক একটা উপাধি। উপাধি জিনিষটাই মিথ্যা। কিন্তু উপাধি যে জিনিষটাকে ঢেকে রেখেছে সেটা সত্য আর সেটাই পরম সত্য।

মায়ার মত পুনর্জন্মবাদকে এত বেশি নাড়াচাড়া করা হয়েছে যে, মানুষ গুলিয়ে ফেলছে। স্বামীজী এক জায়গায় একটা ব্যাখ্যা করছেন, যে ব্যাখ্যা বেদান্তের সাথে ঠিক ঠিক মেলে আর ঐ মতকে নিলে সবটাই খাপে খাপে বসে যাবে। সেই যে চৈতন্য তিনি অনন্ত, অনন্ত হলেই অদ্বিতীয় হবেন, বিজ্ঞানঘন। অনন্তের কোন অংশ হয় না, যদি অংশ হয় সেই অংশটাও অনন্ত হবে। সেই অনন্ত চৈতন্য এখন চিন্তা করছেন। কি চিন্তা করছেন? আমি এক আমি বহু হব। বহু হয়ে গেলেন। কিভাবে বহু হলেন? জগৎ হয়ে গেলেন। এখন তাঁর কাছে জগতের নানান রকম দৃশ্য ঘুরছে। দেখছেন তিনি সনক, সনন্দন, সনৎ ও সনাতন হয়েছেন। দেখছেন খেলা জমল না, লীলা পোষ্টাই হল না। এবার তিনি নিজেকে প্রজাপতি রূপে দেখতে শুরু করলেন। সেখান থেকে তিনি আরও নীচে নামলেন, ওখান থেকে নিজেকে নানা রকম জীবজন্তু রূপে দেখতে থাকলেন। এবার এই খেলাতে মজে গেলেন। ওর মধ্যে যে এখন কোটি কোটি জীব এসে গেছে, এগুলো সব তিনিই নিজেকে এভাবে ভাবছেন। আমরা যখনই চিন্তা করি তখন আমাদের মতই চিন্তা করি, তাঁর মত তো আর চিন্তা করতে পারব না। কিন্তু এভাবে যদি ভাবি, তিনি নিজেকে সনক ভাবছেন আবার সনন্দনও ভাবছেন, অন্য দিকে সপ্তর্ষি মণ্ডলে ঋষিরা আছেন তাঁদের ভাবছেন, আবার কাশ্যপের মত ভাবছেন আর প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে ভাবছেন। একটা জীবন চলতে শুরু করল, চলতে চলতে আজকে আমি হয়েছি। আমার সাথে যে চৈতন্য সত্তা জড়িয়ে আছেন, তিনি দেখছেন এ মারা গেল, আবার জন্মাল। এইভাবে চলতে চলতে সমস্ত রকমের অনুভূতি যখন শেষ হয়ে গেল তখন মুক্তি হয়ে গেল। মুক্তি কার হল? কারুরই মুক্তি হয়নি, সৃষ্টিই হয়নি মুক্তি কোথা থেকে হবে। সৃষ্টি কেন হয়নি? কারণ সবটাই সেই চৈতন্যের উপর চিন্তনের এক বিরাট খেলা চলছে, তাঁর মধ্যে চিন্তনের লহরী চলছে, চিন্তন লহরী না বলে আমরা বলছি লীলা লহরী। এই লীলা লহরীতেই তিনি জন্ম নিচ্ছেন, মরছেন, জন্মাচ্ছেন, হাসছেন, শোক করছেন, আনন্দ করছেন, কিন্তু মূলতঃ কিছুই হচ্ছে না। লীলা যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ চৈতন্যই ঐ চিন্তন করছেন, কারণ একমাত্র চৈতন্যই আছেন, চৈতন্য থেকে আলাদা কখনই হবে না। সেইজন্য বলছেন, যে এখানে নানা দেখে, যতক্ষণ complete unified existence না দেখছে ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু রূপ লীলালহরী চলতে থাকবে। জন্ম-মৃত্যু মানে শোক মোহ চলতে থাকবে। দুঃখ থেকে বাঁচার জন্য পাঁচ রকমের জিনিষ করবে, মোহ পুর্তির জন্য আরও পাঁচটা জিনিষ করবে। এগুলো করার জন্য তার আরও শোক, আরও মোহ হবে। এভাবে চলতেই থাকবে, কোন দিন শেষ হবে না। কারণ সে নানা দেখছে, আমি আলাদা তুমি আলাদা, জীব আলাদা জগৎ আলাদা।

যদি কেউ পরম সত্তাকে নিজের থেকে বা জগৎ থেকে আলাদা দেখে তাহলে সব থেকে বড় সমস্যা হবে, আমি আর আপনি সব সময় আলাদা থেকে যাব। আমি আর আপনি যদি আলাদা থেকে যাই তাহলে আজ হোক কিংবা কাল হোক শোক মোহ আসবেই। শোক আর মোহ এসে গেলে আবার এই জীবন চলতে থাকবে, কিছুই করার থাকবে না। জীবন চলতে থাকলে জন্ম-মৃত্যুও চলতে থাকবে। তাহলে মুক্তি জিনিষটাও কোন দিন হবে না। মুক্তি মানেই একত্ব দর্শন। একত্ব দর্শন আমি ঈশ্বর রূপেই দেখি আর ব্রহ্ম রূপেই দেখি তাতে কিছু হবে না, কিন্তু একত্ব দর্শন ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। এই একত্ব দর্শন একদিনে হয় না। এরজন্য অনেক আগে থেকে অনেক রকমের প্রস্তুতি নিতে হয়। কি রকম প্রস্তুতি লাগে?

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।২/১/১১।।

(মনের দ্বারাই এই ব্রহ্ম উপলভ্য, ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ নেই, যে এঁতে ভেদ-সদৃশ বস্তু দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।)

ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের ব্যাপারে শুনে এক রকম ধারণা হবে, চিন্তা করে এক রকম ধারণা হয় আর বাস্তবিক দেখলে আরেক রকম ধারণা হয়। উপনিষদের কথা শুনে মনে হবে সব বুঝে গেছি। কিন্তু এভাবে শুধু শুনে গেলে হয় না, মন দিয়ে বোধ না হওয়া পর্যন্ত এই বুঝে নেওয়ার কোন দাম নেই। আরোপিত ভেদ, উপাধিসহ আমরা যে জগৎকে দেখছি, নিজের মন দিয়ে এটাকে আমাদের উপলব্ধি করতে হয়। কি উপলব্ধি করতে হবে? আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নেই। একটু আগে যে বলা হল জগৎটা মিথ্যা নয় উপাধিটা মিথ্যা, আসলে উপাধি বলে কিছু নেই। এর খুব সহজ উপমা হল মাটির তৈরী যত রকমের খেলনা সবটাই মাটি। নানান রকমের ডিজাইনের সোনার অলঙ্কার, তার সবটাই সোনা। চিনি দিয়ে যে নানা রকমের মঠ তৈরী করা হয় তার সবটাই চিনি। মাটি, সোনা, চিনিই সত্য কিন্তু এর উপাধিগুলো মিথ্যা। চিনির খেলনা কখনই মিথ্যা না, কিন্তু খেলনার হাতি, ঘোড়ার যে ভাব আমরা আরোপ করছি সেটা মিথ্যা। চিনিও মিথ্যা নয় চিনির খেলনাও মিথ্যা নয়, কিন্তু খেলনার যে উপাধিগুলি, খেলনার উপর আরোপিত সংস্কারগুলি মিথ্যা। সাপ দেখলে আমার মনে এক ধরণের সংস্কার চাড়া দেয়, রসগোল্লা দেখলে অন্য ধরণের সংস্কার জেগে উঠবে, আবার নিজের উপর চিন্তা করলে আরেক ধরণের সংস্কার ভেসে ওঠে। আমার কাছে সংস্কারগুলোই সত্য। সংস্কার যদি সত্য হয় তখন জগৎকে আমরা যে অর্থে সত্য বলে নিচ্ছি তাতে তার উপাধিটাও সত্য হয়ে যায়, তার ধর্ম সত্য হয়ে যায়। বেদান্ত বলছে এই উপাধিগুলো মিথ্যা, তার ধর্ম বলতে যেটা বুঝছি, আমরা মনে করছি এর এই ধর্মটাই সত্য। কারুর উপর যদি কখন খুব রাগ হয়ে থাকে, ঐ মানুষটির কথা যখনই মনে পড়বে তখনই মনে হবে ঐ লোকটি আগে যা যা করেছে বা ওর যা যা সংস্কার আছে সেটাকেই আমার সত্য বলে মনে হবে। পঁচিশ বছর আগে কি করেছিল সেটাকে আমি মাথায় বসিয়ে রেখে মনে করছি, ওর তো ঐ রকমই স্বভাব। পঁচিশ বছরে কি মানুষটা একটুও পাল্টায়নি! সে পাল্টেছে কিনা পরের কথা আমি পাল্টায়নি। ওর মধ্যে ধর্ম, অধর্ম যা আছে সেটাই আমার কাছে সত্য, মানুষ রূপে আমার কাছে সত্য নয়। মানুষটি সত্য এই বোধ আমার কাছে আসছে না, মানুষ পরিবর্তনশীল, তার মনে রয়েছে হুঁশ, সে মনকে নিয়ে জীবন-যাপন করছে, কিন্তু কবে কি একটা করেছিল সেটাকে সত্য মনে করে আজও আমি বসে আছি। মানুষের মন প্রতি নিয়ত পাল্টাচ্ছে, ভালোটা মন্দ হতে কতক্ষণ আর মন্দটা ভালো হতে কতক্ষণ। তার ভালোটাও সত্য নয় মন্দটাও সত্য নয় কিন্তু আমি মন্দটাই সত্য বলে ধরে আছি। অনেকে বলে, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না বা উল্টোও বলে তুমি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ। কাকে বিশ্বাস করবে? মানুষ মানুষকে কি কখন বিশ্বাস করতে পারে? কারণ তোমার ধর্ম অধর্ম কোন দিন বিশ্বাস করার মত নয়। কেন নয়? কারণ উপাধি কখনই সত্য হয় না। যদি কেউ আমাকে বলে, আপনি কেমন পাল্টে গেছেন! এই কথা বলে আমাকে সম্মান করা হচ্ছে, আমি যদি না পাল্টে থাকি তাহলে তো আমি একটা পাথর, পাথর কখন পাল্টায় না, পাথরও পাল্টায় কিন্তু তার জন্য তাকে দীর্ঘ সময় দিতে হয়। উপনিষদ এটাই বলছেন উপাধিই মিথ্যা, উপাধি থেকে বেরিয়ে এস। উপাধিকে সরিয়ে দেওয়ার পর যা দেখবে সেটাই সত্য

উপাধির ভেতরে যেটা আছে সেটা সত্য। আমরা মানুষ রূপে সত্য কিন্তু তার উপর ধর্ম অধর্মের যে উপাধিগুলি রয়েছে, ধর্ম অধর্মটা মিথ্যা। যখন উপাধিকেও সরিয়ে দেবে তখন তুমি দেখবে তিনিই এটা হয়েছেন। জগৎটা শূন্যে প্রতিষ্ঠিত নয়, শূন্য থেকে তাঁর জন্ম নয়, এটা তিনিই। জগতের মধ্যে কিঞ্চিৎ অণুমাত্র ভেদ নেই। বেদান্তের এটাই মূল কথা, নানাত্ব বলে কিছু নেই। বেদান্তে যখনই বলবে ত্রিকালে জগৎ নেই, যখন অজাতবাদ বলবে, যখন বলবে অদ্বৈত, যখন বলবে সমাধি, যেটাই বলছে, যেভাবেই বলা হোক, বেদান্তের মূল কথা সব সময় একটাই, নানাত্ব বলে কিছু নেই। বেদান্তের কাছে এটাই পরমার্থ সত্য। ব্যবহারিক সত্য আপনি যা কিছু নিয়ে আসুন তাতে আচার্য শঙ্কর বা উপনিষদের কিছু আসে যায় না। জগতে আমরা সবাই নানাত্বই দেখছি, এই নানাত্বকে নিয়ে এত লেখালেখি করার কি আছে! দর্শন শাস্ত্র সেটাকে নিয়েই আলোচনা করবে যেটাকে মানুষ সচারচর বুদ্ধি দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারে না। আপনি এমন একটা নতুন চিন্তা-ভাবনা দিলেন তাতে তার জীবন উন্নততর হবে। বেদান্তই উচ্চতম দর্শন, কারণ মানুষ যাই হোক, শ্রেষ্ঠ যে সাধু মহাত্মা তাঁদের মধ্যেও নানাত্ব দেখা যায়, আমি ঈশ্বরের সন্তান, সেখানেও নানাত্ব থেকে যায়। ঈশ্বর আর আমি, এটাকেও বেদান্ত ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বলছেন *নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন*, এখানে নানা বলে কিছু নেই।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং, এটাকে বোধে বোধ কর, এটাই জীবনের লক্ষ্য হোক। সাধারণ মন দিয়ে বোধ হবে না, শুদ্ধ মন শুদ্ধি বুদ্ধি হতে হবে। উপলব্ধি যেটা হবে মন দিয়েই তা হবে। অশুদ্ধ মনকে আমরা মন বলি আর শুদ্ধ মনকে আত্মা বলি। মন শুদ্ধ হয়ে গেলে যা হয় সেটাকেই আত্মা বলে। ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক। বলছেন এটাকে তোমায় বোধে বোধ করতে হবে। *মনসৈবেদমাপ্তব্যং*, এটাকে আপ্ত কর, পাও, জানো। নানাত্ব বলে কিছু নেই এটাকে তত্ত্বগত ভাবে জেনে কিছু হবে না। *য ইহ নানেব পশ্যতি*, যদি নানাত্বকে দেখ, ভেদ দৃষ্টি যদি থাকে তাহলে জেনে নাও *মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি*, আবার তুমি জন্ম নেবে আবার তুমি মরবে, আবার সেই *জননী জঠরে শয়নং*, বাঁচার কোন পথ নেই। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যে তোমাকে মার খেতে খেতে এগোতে হচ্ছে, কে মারছে তোমাকে? অজ্ঞান, সাধারণ স্তরে দুঃখ, শোক দিয়ে মারছে আর উচ্চস্তরে পুনর্জন্ম দিয়ে মারছে। অজ্ঞান কি? নানাত্ব। নানাত্ব, ভেদ দৃষ্টি এটাই অজ্ঞান। ভেদ দৃষ্টি যদি না থাকে আমি তোমাকে পেতে চাইব না, আমি তোমার থেকে দূরেও চলে যেতে চাইব না। আমি কাউকে ভালোবাসতেও যাব না আবার কাউকে অপছন্দ করতেও যাব না। বলছেন *একরস বিজ্ঞানঘন*, শুধু ঐ অস্তিত্ব, অস্তিত্বটুকু ছাড়া আর কিছু নেই, যেখানে আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই। সব সময় দরজা খোলা, আসার জন্যও খোলা, চলে যাওয়ার জন্যও খোলা। কাউকে ধরেও রাখতে চাইবে না, কাউকে ছেড়েও দিতে চাইবে না। কি করে চাইবে! সবটাই তো তার। এটাই *নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন*, এর প্রস্তুতি যদি না থাকে, মন দিয়ে যদি উপলব্ধি না হয়, বোধে বোধ যদি না হয় তাহলে এর আগের যে মন্ত্রে বলা হল, *যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*, এই উপলব্ধি আসবে না। উপলব্ধিতেই নানান বোধ হওয়াটা মিটে যায়। জগতের নানান বোধটা মিটে গেল, এবার সে অবাক হয়ে দেখে এই জগৎটা একটা unified existence। আর এই unified existenceটা cosmic existenceএর সাথে এক। দশ নম্বর আর এগারো নম্বর মন্ত্র অদ্বৈতবাদের পরাকাষ্টাতে নিয়ে যাচ্ছে। মাধ্বাচার্যের মত দ্বৈতবাদীরাও এই সব মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন ঠিকই, কিন্তু উপনিষদের সামগ্রিক ভাবকে মাথায় না রেখে যদি অন্য ভাবে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে যায় তাহলে এর অর্থে অনেক অসঙ্গতি এসে যাবে। নানাত্বকে কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করাটাই উপনিষদের মূল, উপনিষদ কোন ভাবেই নানাত্বকে মানবে না। সাধারণ মানুষ জানে আমি আলাদা, জগৎ আলাদা, আমার সব কিছুই আলাদা কিন্তু এর মধ্যেই আমাকে আমার জীবন চালিয়ে যেতে হবে। আমার একটা ছোট্ট গণ্ডি আছে, যেখানে আমি আছি, আমার পরিবার আছে, আমার আরও দশজন আছে, এটাই আমি। খুব হলে যাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি তার সাথে আমি একত্ব বোধ করতে পারি। তার বাইরে আমি কোথাও একত্ব বোধ করতে পারি না। এটাই জগতের মূলে, অজ্ঞানের জোরেই জগৎ চলছে। এই দুটি মন্ত্রকে তাই ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। আমাদের কাছে অস্তিত্ব হল, আমি আছি, জগৎ আছে আর ঈশ্বর আছেন। এত দিনের জমাট বাঁধা পাথরের মত শক্ত এই ধারণাকে ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সাধ্যি কার! কার সাধ্যি আছে যে বলবে জগতে পর বলে কিছু নেই, নানাত্ব বলে কিছু নেই। দশ নম্বর মন্ত্রের এই সত্যকে পেতে গেলে এগারো নম্বর মন্ত্র লাগবে। সেটাও যখন আসে তার আগে বা এটারই আরেকটি অন্য রূপকে বারো নম্বর মন্ত্রে বলছেন –

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ।।২/১/১২।।

(যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষরূপে শরীরের মধ্যে অবস্থিত, তিনিই আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। এই দর্শন হলে মানুষ নিজেকে রক্ষা করার জন্য আকুল হয় না। ইনিই সেই আত্মা।)

এতক্ষণ আত্মাকে নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে, এবার আরও সরাসরি যেন স্পষ্টিকরণ করে বলছেন। এখানে যেন শব্দটা বলা হচ্ছে। এই মন্ত্র এবং পরের মন্ত্রে মূলতঃ জ্যোতিদর্শনের কথা বলছেন। সিদ্ধ পুরুষ চৈতন্যকে যখন বোধে বোধ করেন, তখন চৈতন্যকে তিনি কিভাবে বোধ করেন আর কেমন ভাবে দেখেন?

শাস্ত্রের গভীর কথা শোনার সময় আমাদের একটা জিনিষ অবশ্যই হয়, ভেতরে কিছু তথ্য যাচ্ছে। এরপর এই তথ্যগুলিকে আরেকটু ভেতরে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তথ্যগুলি জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। ঐ জ্ঞানকে যখন কাজে লাগান হয় তখন সেটাই বিজ্ঞান হয়ে যায়। যে কোন কথা তিনটে ধাপে চলে, তথ্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ঠাকুরের ভাষায় কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। উপনিষদের কোন কথাই খোসগপ্প নয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে খুব নামকরা একটা কথা প্রচলিত আছে,

কঠোপনিষদ শুনেও মানুষ যদি মুক্তির দিকে না এগোয়, কঠোপনিষদের কথা শোনা বৃথা। কঠোপনিষদের এই অমূল্য সম্পদকে জীবনে একটুও যদি না কাজে লাগানো যায়, কিছুই না হোক অন্তত একটু চিন্তন করে অভেদ দৃষ্টিকে যদি না আনা হয় তাহলে এগুলো শ্রবণ করার কোন অর্থই হয় না। সারাদিনের জন্য না পারলাম, কিছুক্ষণের জন্যও জীবনে এগুলোকে নামাতে হবে। একটু গভীরে চিন্তন-মনন না করলে কোন কাজে লাগবে না। কিভাবে কাজে লাগাব? এরা আমার প্রিয়, এরা অপ্রিয়, এরা আমার ঘনিষ্ঠ, এরা অপরিচিত, ব্যবহারিক জীবনে এই ব্যবধান গুলিকে গুটিয়ে এনে নানাত্বের নাশের সদিচ্ছার মানসিকাতাকে যদি না তৈরী করা হয় বা নিজের মনকে কিছুক্ষণের জন্যও যদি উচ্চস্তরে না নিয়ে যাওয়া হয়, এসব মন্ত্র শোনাটাই বৃথা। কোথাও তো আমাদের শুরু করতে হবে। জীব, জগৎ আর ঈশ্বর এই তিনটে পৃথক সত্তাকে আমরা যেভাবে আঁকড়ে আছি, এই আঁকড়ে থাকাটা একটু আলগা না করা পর্যন্ত আমরা শুরুই করতে পারব না। শ্রীরামকৃষ্ণই হন, যিশুই হন, বুদ্ধই হন তাঁরাও কোথাও একটা শুরু করেছিলেন। ভেদ দৃষ্টি থেকে অভেদ দৃষ্টিতে যে যেতে শুরু করেছিলেন, প্রথম পা সবাইকেই ফেলতে হয়েছিল। অনেকে দু-চার পা এগিয়ে আর এগোতে পারেন না, তাতে কোন সমস্যা নেই, কিছুটা তো এগিয়েছেন। কিন্তু আমরা পা ফেলাটাই শুরু করতে পারছি না। ধ্যান মানে আমিত্বের নাশ। আমিত্বটাই কি জিনিষ আমরা এখনও বুঝলাম না, সেখানে আমিত্বের নাশ কি করে করব! ধ্যান মানেই আমিত্বের নাশ, পুরো নাশ না হলেও আমিত্বকে একটু আলগা করে দেওয়া। ধ্যান মানেই নিজেকে আরেকটি সত্তাতে লয় করে দেওয়া। আমাদের অবস্থা হল কাপড়ও সামলাচ্ছি আবার নদীতে সাঁতার কাটতেও যাচ্ছি। সেকি কখন সম্ভব! আমি স্নান করব কিন্তু পুকুরে নামব না, সেকি কখন হয়!

একজন নামকরা পুলিশ অফিসার, অবসর নেওয়ার আগে তিনি এক রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ছিলেন। খুব পড়াশোনা করা লোক। তিনি নিজের কর্ম জীবনের একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন। ঘটনাটা খুবই গভীর। একবার রাঁচিতে বিএসএফ জোয়ানদের পতাকা উত্তোলন দিবসের অনুষ্ঠান ছিল। ওখানে বেশির ভাগই নেপালী বিএসএফ ছিল। অনুষ্ঠানে তাদের পরিবারের সবাই থাকে, বিএসএফের জোয়ানদের প্যারেড হয়। এনাকে সেখানে চিফ গেস্ট করা হয়েছিল, হঠাৎ তাঁর সখ হল গুর্খালি ভাষায় বক্তৃতা দেবেন। তার জন্য উনি একটা বই আনিয়েছেন 'Learn Nepali in 30 days'। বিকেলবেলায় উনি বইটাকে উল্টেপাল্টে দেখলেন, কয়েকটা শব্দ বেছে নিলেন। তখন আইজি ছিলেন। স্টেজে গেছেন, ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিংএর অনুষ্ঠান চলছে। এরপর ওনার ভাষণ দেওয়ার সময় হয়েছে। বলতে উঠেছেন, দু-চার মিনিটের জন্য নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার পর বললেন এবার আমি নেপালী ভাষাতেই বলব। অথচ তিনি নেপালী ভাষা জানতেন না। প্রায় চল্লিশ মিনিট তুখোড় নেপালী ভাষায় ভাষণ দিলেন। শেষ হতেই তুমুল হাততালি। অফিসাররা পরে এসে বলছেন, স্যার! আপনি তো দুর্ধর্ষ স্পিচ দিলেন। সন্ধ্যেবেলায় ওদের আবার ডিনার পার্টি ছিল। ডিনার পার্টিতে গিয়ে আবার নেপালী ভাষায় কিছু বলার চেষ্টা করলেন। একটা কথা বলতে না বলতেই সবাই হাসাহাসি শুরু করে দিল। স্যার আপনার নেপালী ভাষা বলা বন্ধ করুন। যে মানুষটি চল্লিশ মিনিট এক নাগাড়ে বলে চলে গেলেন, সেই মানুষটিই পরে একটা বাক্যও ঠিক ভাবে বলতে পারলেন না। পরে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ব্যাপারটা কি করে হল? তখন উনি ফ্রয়েডিয়ান সাইকোলজি থেকে বলতে শুরু করলেন। আমিত্বের ভাব যেখানে থাকে, উপনিষদের ভাষায় নানাত্বের ভাব, বলছেন তখন আমার যে সীমিত মন সেটাকেই নিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু ঐ আমিত্বকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন ঐ আমিত্বটা সমষ্টি আমিত্বের সাথে এক হয়ে যায়। সমষ্টি আমিত্বে সব কিছুই আছে। আপনি প্রথমে যা চেয়েছিলেন তার সবটাই তখন হুড়মুড় করে চলে আসে। নিজেকে তখন আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখন যা আসার আপনা থেকেই এসে যাচ্ছিল। তারপর উনি বলছেন, যাঁরা বইটই লেখেন তাঁরা নিজেরাও জানেন যে তিনি যখন লিখতে বসে ঠিক করে নেন আমাকে এটাই লিখতে হবে, তখন তিনি ওটাই লিখবেন। কিন্তু তিনি যখন নিজেকে ছেড়ে দেন তখন উচ্চ উচ্চ ভাবগুলো আসতে শুরু করে দেয়। ধ্যান মানে তাই, আমিত্বটা ছাড়তে হয়। আমরা একটুও আমিত্ব ছাড়তে রাজী নই। একটু বিচার করে দেখতে হবে আমার আমিত্বটা কোথায়। মন্ত্রের শুরুটা ঠিক এই জায়গা থেকেই করা হচ্ছে, আমিত্ব জিনিষটা কি।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি, আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ আকাশ আছে, সেই হৃদয়াকাশে তিনি বিরাজমান। তিনি কে? *ঈশানো ভূতভব্যস্য*, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের তিনি নিয়ন্তা।

তাঁকে জানতে পারলে *ততো ন বিজুগুপ্সতে*, মানুষের গোপন করার আর ইচ্ছে থাকে না। সবাই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভগবান অন্তর্যামী রূপে আছেন। এটি আমাদের খুব প্রচলিত ধারণা, আমরা নতুন কিছু শুনছি না। কিন্তু জিনিষটাকে যখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব, অন্তর্যামীর ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে হয়, তখন আরও একটু স্পষ্ট হবে।

আগেও কয়েকবার খুব সহজ একটা জিনিষকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আচার্য শঙ্করও জিনিষটাকে বোঝাবার জন্য এভাবেই আলোচনা করেছেন। ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে তা নাহলে এর যুক্তিটা ধরা যাবে না, একবার এই আইডিয়াটা পরিষ্কার হয়ে গেলে উপনিষদাদি বোঝা সহজ হয়ে যাবে। এই গ্লাশ আছে এর মধ্যে দুটো সত্তা কাজ করছে, একটা হল গ্লাশ আরেকটি হল আছে, যাকে বলছি অস্তিত্ব। গ্লাশের যদি নাশ হয়ে যায় তাহলেও অস্তিত্বের যে সত্তা তার কখন নাশ হবে না। কারণ গ্লাশ না থাকলে অন্য অনেক কিছু থাকবে, মাইক্রোফোন থাকবে, মাইক্রোফোন না থাকলে বই থাকবে, বই না থাকলে পেন থাকবে। কিছু না থাকলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকবে। যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও নাশ হয়ে যায়? যারা লৌকিক পুরুষ তারা থিয়োরেটিক্যালি বলছেন তখন আর কিছু থাকবে না। কে দেখেছে যে তখন কিছু নেই? যদি থিয়োরেটিক্যালি বলে তাহলে আমিও থিয়োরেটিক্যালি বলব ভগবান থাকবেন। তুমি থিয়োরেটিক্যালি বলছ কিন্তু তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই যে তখন কিছু নেই। বড় বড় বিজ্ঞানীরা যতই হিসাব করে দেখিয়ে দিক যে বিগ ব্যাঙের আগে কিছু নেই, কিন্তু কিছু নেই সেটাকে কেউ দেখাতে পারছে না, বিজ্ঞানীরা মনে মনে হিসাব করে বলছেন। আমিও মনে মনে হিসাব করে বলছি ভগবান থাকবেন। তাহলে সত্তা জিনিষটা, অস্তিত্ব জিনিষটা কখনই নাশ হবে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও কোন জিনিষই শূন্য থেকে বেরিয়ে আসবে না। বিজ্ঞানীরা বলে দেন ওখানে আমাদের ফিজিক্স কোন কাজ করে না, সেইজন্য আমরা জানি না বিগ ব্যাঙের আগে কি আছে। কিন্তু ঠিক ঠিক বিজ্ঞানীরা বলবেন, কোন না কোন ভাবে অস্তিত্ব তো থাকবেই। অস্তিত্বের কখন নাশ হবে না। কিন্তু তার উপর এক একটা বস্তু যা কিছু চলছে, যেমন এই গ্লাশ, গ্লাশের কি হবে? গ্লাশ একটা অবস্থা থেকে আরেকটা অবস্থায় যাবে। গ্লাশকে যদি গুড়িয়েও দেওয়া হয়, গ্লাশ তখন আরেকটা অবস্থায় থাকবে, এই গ্লাশ রূপে থাকবে না কিন্তু অন্য কোন রূপে থাকবে। আর যদি গ্লাশ বলে আদপেই কিছু না হয়ে থাকে, যেমন এই গ্লাশ সিলিকন থেকে তৈরী, তখন সিলিকন রূপে থাকবে বা অন্য কোন রূপে থাকবে।

এই যে দুটি সত্তা, যেখানে একটা হল সত্তামাত্রম্ আর ঐ সত্তামাত্রম্এর উপর স্থান, কাল ও পাত্র বিভেদে আরেকটা সত্তাকে দেখা যাচ্ছে যেটা ইন্দ্রিয়গোচর। এই দুটি সত্তা একসাথে চলে, একটা ইন্দ্রিয়ের অগোচর সত্তা আরেকটা ইন্দ্রিয়গোচর সত্তা। যে কোন জিনিষ, যে জিনিষকে আমরা আছে বলছি তার সব সময় দুটি সত্তা থাকবে। দৃষ্টিগোচর সত্তাকে সংসার বলে। এখানে দৃষ্টিগোচর সত্তা বলতে কিন্তু আমাদের যে সত্তা, মানুষের যে সত্তা সেটাও দৃষ্টিগোচর সত্তাতেই আসে। আমি আপনাকে দেখছি, আপনি দৃষ্টিগোচর সত্তা। কিন্তু তার পেছনে মহাসমুদ্র রয়েছে যা কিনা সত্তামাত্রম্। এই সত্তামাত্রমই ভগবান। সচ্চিদানন্দের যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই সৎ হল সত্তামাত্রম্, এই সত্তামাত্রম্ ভগবান নিজে। যত বেশি গভীরে চিন্তন করা যাবে, তত জিনিষটা পরিষ্কার হবে যে, বস্তুর নাশ করে দেওয়া যায় কিন্তু তার পেছনে যে সত্তা আছে, যাকে অস্তিত্ব বলছি, সেটাকে নাশ করা যায় না। ত্রিকালে যে জিনিষকে নাশ করা যাবে না, তিনিই ভগবান, এটাই ভগবানের পরিভাষা। এটাকেই যুক্তি দিয়ে, শ্রুতি প্রমাণ দিয়ে আচার্য দেখাচ্ছেন, যেটা সত্তামাত্রম্ আছে সেটাই চৈতন্য স্বরূপ সেটাই আনন্দ স্বরূপ, সেইজন্য তিনি সচ্চিদানন্দ।

মস্তিষ্কের চঞ্চলতার জন্য বহু বিচিত্র বিচিত্র জিনিষ আমাদের সাথে হতে থাকে। কিন্তু এগুলোকে আমরা খেয়াল করি না। মানুষের মন সব সময় একটা প্যাটার্ন খোঁজে, একই প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে চায়। ফলে তার মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে সেটাকে সে ভুলে থাকে বা দেখলেও দেখতে চায় না, মানতে চায় না। শুধু মাত্র অস্তিত্ব, শুধু সত্তামাত্রম্ কিন্তু তার কত রকমের খেলা। খুব সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে দেখালে জিনিষটা পরিষ্কার হবে। আপনি আমাকে দেখছেন, আমাকে যখন দেখছেন তখন ফিজিক্সের নিয়মানুযায়ী আপনি আমার ছবিই চোখ দিয়ে দেখছেন। আমার উপর আলো এসে পড়েছে, সেই আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে আপনার চোখে

যাচ্ছে, সেখানে স্নায়ুতে অনুভূতি হচ্ছে, সেখান থেকে মস্তিষ্ক একটা আকার তৈরী করে নিচ্ছে। কিন্তু আমি ঠিক ঠিক যা সেটা আপনার কাছে যাচ্ছে না। ফিজিক্সও বলছে আমার ইমেজটা আপনার কাছে যাচ্ছে। যারা চশমা লাগিয়ে দেখছে তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল, তারা ইমেজের ইমেজ দেখছে। চশমা মানেই ইমেজ তৈরী করা। আপনি চশমা পড়ে আমাকে দেখলে আমাকে দেখার তখন কোন প্রশ্নই নেই, চশমা দিয়ে আপনি আমার ইমেজের ইমেজকে দেখছেন। আসলে আমরা কেউই কাউকে দেখতে পাই না। আমার একটা ছবি তোলা হল, যেমনই ছবি হোক না কেন, টু ডাইমেনশানাল, থ্রী ডাইমেনশানাল যাই ছবি হোক, ছবিতে আমাকে আরেক রকম দেখাবে। আপনি আমার ছবি যখন দেখছেন তখন আপনি আমাকে আরেক রকম দেখছেন। যদি চোখ বন্ধ করে আমাকে ভাবেন তখন দেখবেন আপনার চোখে আমার আকৃতি পুরো পাল্টে গেছে। যদি আপনি আমাকে স্বপ্নে দেখেন তখন আকৃতি পুরোটাই পাল্টে গেছে। কিন্তু সব কটি ক্ষেত্রেই জানছেন যে, আপনি আমাকেই দেখছেন। আমাকে দেখছেন এখানে বসে কথা বলছি সেটাও আমি, আমার ফটো তুলে দেখছেন সেটাও আমাকে দেখছেন, চোখ বন্ধ করে আমার কথা ভাবছেন তখনও জানছেন আমাকে দেখছেন আর স্বপ্নে যাকে দেখছেন সেটাও আমি। অথচ আকৃতিতে কোথাও কোন মিল নেই আর কোন সম্পর্কও নেই, তাও আপনি জানেন সবটাই আমি।

এবার পুরো জিনিষটাকে জগতের ক্ষেত্রে নিয়ে আসুন। আপনি জগৎকে যখন দেখছেন তখন সেই দেখার মধ্যেও কোথাও কোন ধারাবাহিকতা নেই। কিন্তু আমরা জানি সবটাই এক। আপনি নিজেকে যখন দেখেন তখনও ঠিক তাই হয়। জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে আমি এক রকম বোধ করছি, নিজেকে নিয়ে চিন্তা করছি তখন নিজেকে আরেক রকম বোধ হয়। পুরুষ মনে করে আমি সর্বশক্তিমান, নারী মনে করে আমার মত সুন্দরী কেউ নেই। সুন্দরী না হলেও মনে করছে আমার মত মেয়ে কোথায় পাবে! আর যে মেয়ে কোন কাজের নয়, দেখতেও সুন্দরী নয় সে মনে করে আমার মত পতিব্রতা নারী কেউ পাবে না। এই যে নিজের একটা ইমেজ তৈরী করছে, এই ইমেজের সাথে বাস্তব ইমেজের সাথে যদি অনেক তফাৎ হয়ে যায় তখন তাকে পাগল বলে, স্রিজোফেনিয়া মানেই তাই। সেলফ ইমেজ আর বাস্তব ইমেজের মাঝখানে তফাৎ সবারই থাকে, কারও বেশি কারও কম। সবাই মনে করে আমার মত কেউ আছে নাকি! এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। তার কারণ মানুষের ভেতরে ভগবান নিজেই পূর্ণ রূপে বিরাজমান, কোথাও তাঁর সেই পূর্ণতার ভাব নানান রকমের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পূর্ণসত্তা কখনই নিজেকে অপূর্ণ দেখতে চায় না। মানুষের মধ্যেও সেই পূর্ণতার ভাব সব সময় আছে কিন্তু নানান রকমের উপাধি দিয়ে আবৃত। আমার আপনার ভেতর যে পূর্ণতার ভাব, এই ভাবই উপাধির আবরণকে ভেদ করে আসতে আসতে অহঙ্কারের রূপ ধারণ করে নেয়। আমাদের ভেতরে যে অহঙ্কার বোধ এই অহঙ্কার বোধই আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভেতরে এমন কিছু একটা জিনিষ আছে যার জন্য আমাদের সবাইকে ঐ রকম বোধ করাচ্ছে। যৌবনে মানুষ মনে করে আমি জগৎ জয় করে নেব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না, গজেরি-বাগেরি হয়ে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তখনও বলে আমার মধ্যে অনেক সম্ভবনা ছিল। ভুল কিছুই বলছে না, কারণ তার ভেতরে সর্বশক্তিমান ভগবান চাপা আছেন কিনা। স্বামীজী যে বারবার আমাদের সজাগ করে দিচ্ছেন, তোমার ভেতরে অনন্ত শক্তি, স্বামীজী আমাদের উৎসাহিত করা বা উদ্দীপনা আনার জন্য কিছু বলছেন না, শুধু বাস্তব একটা তথ্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে বিদ্যমান তিনি সেই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানবান ভগবান। কিন্তু তার উপর অজ্ঞানের আবরণ এত বেশি যে ভগবানের পূর্ণ জ্ঞানের আলো সামান্য একটু ছিড়িক ছিড়িক করে বাইরে বেরিয়ে আসছে। ঐ সামান্য আলোটুকুও যতক্ষণ এসে পৌঁছাচ্ছে তখনও এত আবরণ থাকে যে সেই আলো শেষমেশ আমাদের কাছে যখন এসে পৌঁছায় তখন সেটাই অহঙ্কার রূপ ধারণ করে নেয়। তোমার কী অহঙ্কার! অহঙ্কার আছে মানেই অহম্ সেখানে আছে, অহম্ শব্দকে বাংলায় বলে আমি, আমি মানে আমি আছি। আমি আছি মানেই অস্তিত্ব এসে গেল। অস্তিত্ব মানেই ভগবান, সত্তামাত্রম্। ভগবানের অস্তিত্ব আছে বলেই তার অহঙ্কার। জেনেই হোক আর না জেনেই হোক আমরা সবাই ঐ সত্তার সাথে জুড়ে রয়েছি, সেইজন্যই সবার মধ্যে অহঙ্কার কাজ করে, অহঙ্কারকে বাস্তবে পরিণত করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য। কোন এক সময়ে আপনি মনে করতেন আমি সব করে দিতে পারি, আপনি বলতেন, মা! আমি তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব, আপনি মনে করতেন আমি সব ক্ষমতা অর্জন করব। বাস্তবে কিন্তু কোন তফাৎ নেই। আপনি যে কথাগুলো বলতেন কোথাও আপনার মধ্যে

একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আপনি পারবেন। কিন্তু একটা misplaced ego আছে, এখানে misplaced শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ। এর পুরোটাই গোলমেলে নয়। গোলমেল এইজন্যই নয়, সেই ভগবানের সত্তা অন্তর্যামী রূপে তার ভেতরে আছেন, কিন্তু অজ্ঞান আবরণের দরুন অহঙ্কার রূপে আসছে আবার আত্মবিশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয় রূপেও আসে। কিন্তু বাস্তবে দুটোকে মেলাতে হয়। যত আপনি ভেতরের দিকে যাবেন শক্তি আপনার ভেতরে তত বাড়বে। এই শক্তি বৃদ্ধি না করেই আপনি যদি অপরকে বলেন আপনাকে মেনে নিতে, সে তখন আপনাকে হয় পাগল বলবে, নয়ত অহঙ্কারী বলবে। কিন্তু সেই শক্তি অবশ্যই আপনার ভেতরে আছে। স্বামীজী বলছেন, কাপুরুষতা ছাড়, কাপুরুষতা মানে আমার দ্বারা কিছু হবে না। যখন বলছে তোমার দ্বারা কিছু হবে না তখন কি বলতে চাইছে? তার মধ্যে কি ঈশ্বরের সেই শক্তি নেই? যদি ঈশ্বরের শক্তি থাকে তাহলে সে অবশ্যই পারবে। তার জন্য তাকে খাটতে হবে, বাস্তবে নামাতে হবে, ঐ অজ্ঞানের আবরণগুলিকে ছেঁদা করতে হবে। তখন আবার তার সব শক্তি বেরিয়ে চলে আসবে। এটাই বাস্তব, এখানে কোন থিয়োরী কিছু নেই।

যে self imageএর কথা বলা হল এটা একটা তত্ত্বের কথা বলা হল। কিন্তু নিজেকে যখন ভাবছে তখন ভাবে বর্তমানে সে নিজে যা আছে আর ভেতরে যিনি আছেন এই দুটোর মাঝামাঝি কোথাও ভাবছে। না পুরোপুরি এদিকে না পুরোপুরি ঐদিকে। যত গোলমাল অশান্তির এটাই কারণ। সে নিজেকে স্বপ্নে যখন দেখছে তখন আবার অন্য ভাবে দেখে। ঠিক তেমনি জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে যখন দেখে তখন শরীর রূপে দেখে, যাদের ভালোবাসে তাদের সাথে এক করে নিজেকে দেখে। সবাই ছোট্ট ছোট্ট একটা গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে দেখে, ঐ গণ্ডীতে যারা আছে তাদের কষ্ট হলে নিজেও কষ্ট পায়, ভালো হলে তারও ভালো বোধ হয়। ঐ গণ্ডীর মধ্যেই অস্তিত্বটা আরও কয়েকজনের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যারা পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক তারা নিজের শরীরটুকুর মধ্যেই বদ্ধ হয়ে থাকে, এরাই পশু স্বভাবের। মানুষের মধ্যেও এই পশু স্বভাবের মানুষ পাওয়া যায়, নিজের স্ত্রীকে খেতে দেয় না, বাচ্চাদের খেতে দেয় না। এরা একেবারে বর্বর প্রকৃতির। আমার যে সত্তা এই আমিত্বটাই কত রকমের। দেহ রূপে আমি আছি, আমার যে পরিজনরা আছে তাদের দেহ রূপেও আছি। চিন্তনের জগতে আমি এক রকম আছি, স্বপ্নের জগতে আমি আরেক রকম। আমিই যখন গভীর নিদ্রায় চলে যাচ্ছি তখন আমিত্বটাও হারিয়ে যায়। সুষুপ্তির অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পর তখন এই বোধ হয় যে আমি ছিলাম কিন্তু কিছু মনে নেই। আমাদের সবারই এই আমিত্ব বোধ কত ভাবে পাল্টাচ্ছে। আর তার সাথে জগতের প্রতি আমাদের বোধটাও কত ভাবে পাল্টাচ্ছে। অথচ আমাদের সাধারণ ভাবে ধারণা হচ্ছে আমি আর এই জগৎ একই আছি। আমি গতকাল যা ছিলাম আজকেও তাই আছে, কিন্তু একদিনেই কত কি হয়ে গেছে বুঝতেই পারছি না, সবটাই ফেলে দিচ্ছি। কারণ অসীমের সত্তা আর সসীমের সত্তা, এই দুটো সত্তাই পাশাপাশি চলে। আমরা নিজেকে একটা ছোট্ট ধরে নিয়ে বলছি এটা আমি, আমার আমি বলতে এইটাই। অথচ সারাদিন ধরে আমিত্ব পাল্টাচ্ছে, কিন্তু আমি ঐ আমিত্বটাকে ছাড়ব না, বানরের মৃত বাচ্চাকে যেমন তার মা বুকের মধ্যে ধরে রাখে সেভাবে আমরা ঐ আমিত্বটাকে ধরে রেখেছি। বানরের দলে একটাই পুরুষ থাকে আর পঁচিশ তিরিশটা মেয়ে থাকে। বাচ্চা হওয়ার সময় হয়ে গেলে মেয়ে বানরটা লুকনোর চেষ্টা করে, কিন্তু পুরুষ বানরটা সেও ছাড়বে না, খুঁজে ঠিক বার করে নেবে। যেমনি বাচ্চা হল, দেখল বাচ্চাটা পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে। না মেরে দিলে সেই পরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। ছেলে হলে ওর মা লুকিয়ে রাখে। পুরুষ বানরটা খুঁজতে থাকে। শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে খুঁজে বার করে নেয়। মেয়ে হলে ঠিক আছে। বাচ্চাকে মেরে দেওয়ার পর ওর মা আর বাচ্চাকে ছাড়তে চায় না, ঐ মরা বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ঘুরতে থাকে। বাচ্চাটা আস্তে আস্তে পচে যায়, মা কিন্তু তখনও ছাড়বে না। যখন প্রচুর দুর্গন্ধ হয় তখন বাকিরা জোর করে ছাড়িয়ে দেয়। আমার আপনার সেই অবস্থা, আমরাও দুর্গন্ধ যুক্ত আমিত্বকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার যে আমিত্বকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই আমিত্বটা বিশ্রী ভাবে সীমিত। যে কোন জিনিষ সীমিত হলে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। আমাদের ব্যক্তিত্বও তাই দুর্গন্ধযুক্ত, যার ফলে তার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সব এসে যাচ্ছে। ওর মধ্যেও সেই যে অসীম সত্তা আছে সে কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের ঝাঁকুনি দিতে থাকে, তুমি ওটা নও। কখন সখন আমাদের চিন্তন জগতে একটা তরঙ্গের মত নিয়ে আসছে, স্বপ্নের জগতে অন্য রকম নিয়ে আসছে। স্বপ্নও অনেক রকমের হয়, তন্দ্রায় এক রকম আসে, গভীরে ধ্যানে আরেক রকম থাকে। ইমেজ গুলো পাল্টাতে থাকে, কিন্তু আমরা ওটাকে ছাড়ব না।

কারা ছাড়েন? যাঁরা যোগী পুরুষ, যাঁরা *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ*, প্রথম মন্ত্রে বলছেন। যাঁরা বলছেন আমার এই আমিত্বটা প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত একে ফেলে দিতে হবে। এবার সে একটার পর একটা ভাঙতে শুরু করল, তখন ধীরে ধীরে তাঁর ঐ আমিত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ আসতে শুরু হয়ে যায়। ততক্ষণ আমিত্ব আপনাকে চালিয়ে নিয়ে চলে যায়। আমরা একটা কথা প্রায়ই শুনে থাকি, এটা তুমি বলছ না, তোমার টাকা বলছে, হিন্দীতেও বলে তুম নেহি তুমহারা পয়সা বোল রহা হ্যায়, তুম নেহি তুমহারি কুর্সী বোল রহি হ্যায়। সে ভুল বলছে না, তার যে আমিত্ব সেটা টাকার সাথে বা পদমর্যাদার সাথে নিজেকে জুড়ে নিয়েছে। এরপর সে ভাঙতে শুরু করল। যে জিনিষগুলিকে সহজে ছেড়ে দেওয়া যায়, সেই জিনিষগুলি থেকে নিজেকে আলাদা করতে শুরু করল। অন্য দিকে বৃহতের সঙ্গে নিজেকে এক করতে শুরু করে দিয়েছে।

দীক্ষা দেওয়ার সময় গুরু শিষ্যকে বলে দেন, ধ্যানে বসে প্রথমে সকলের মঙ্গল কামনা করবে। সবার মঙ্গলা কামনা করা মানেই ব্যক্তিত্ব যেটা সীমিত হয়ে আছে, ওর প্রতি রাগ, এর প্রতি ক্রোধ, তার প্রতি হিংসা সবটাই সীমিত আমিত্বের লক্ষণ, আমিত্বের এই সীমাটা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধ্যান করা মানে নিজেকে বিস্তার করা। অথচ আমাদের ব্যক্তিত্ব হল বানরের পচা দুর্গন্ধযুক্ত সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াবার মত। এতটাই সীমিত করে রেখেছি যে একটা মরা পচাগলা জিনিষকে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি। এরপর এরা কি করে ধ্যান করতে বসবে! সংসারে সবাইকে শত্রু মনে করে রেখেছি। পাড়া প্রতিবেশী যে আমার বাড়ির সামনে ময়লা ফেলছে তাকে গালাগাল দিচ্ছি, ভিড় ট্রেনে পাশের লোকটির কনুই আমার মুখের সামনে তাকে গালাগাল দিচ্ছি, অফিসে পিওনকে গালাগাল দিচ্ছি, জগতে এমন কিছু নেই যে যেখানে আমাদের আক্ষেপ নেই, ক্রোধ নেই, হিংসা নেই, লোভ নেই, থাকবেই থাকবে। এরা বলছে ধ্যান করবে! হল্লা চলেছে যুদ্ধে।

যোগীর বৃহতের দিকে যাত্রা শুরু হওয়া মানে তাঁর আমিত্বের সীমাকে ভাঙতে আরম্ভ করলেন। ব্যক্তিত্বের প্রসার হওয়ার পথে যেখানেই বাধা প্রাপ্ত হচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে সেই বাধাকে উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। যার প্রতি বিশেষ ভালোবাসা তাকেও গুডবাই করে দিচ্ছেন, যার প্রতি ক্ষোভ আছে সেই ক্ষোভকেও গুডবাই করছেন। রাগ দ্বেষ কোনটাই তাঁর নেই। তখন কোথাও সীমিত সত্তা থেকে অসীম সত্তার দিকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। সেই সাথে তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে যায়, পরের ধাপে মনের উপরেও তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসতে শুরু হয়ে যায়। তাঁর নিজের ব্যাপারে আর জগতের ব্যাপারে যে এত দিনের ধারণা ছিল সেটাও পাল্টাতে শুরু হয়। ধারণা পাল্টানো মানে, আমিত্ব আর জগতের মাঝখানে যে সীমারেখাটা আছে এই সীমাটা ভাঙতে শুরু হয়ে যায়। ফলে মনের চাঞ্চল্যটা কমতে থাকে। আমাদের মনে যে চাঞ্চল্য তৈরী হয় জগৎ থেকেই সেই চাঞ্চল্য আসছে। জগৎ ক্রমাগত ঢিল ছুড়ছে। জল নিজে থেকে কখন ঢেউ সৃষ্টি করে না। জলের উপর ঢেউ সৃষ্টি করার জন্য বাইরে থেকে কিছু একটা আসতে হবে। আমাদের মন কেন চঞ্চল? বাইরে থেকে ঢিল পড়েছে। বাইরে থেকে যে ঢিল ক্রমাগত পড়ে পড়ে ভেতরে জমছে, সেগুলোই আবার স্মৃতি রূপে যখন ঢেউ হয়ে আসছে সেটাও বাইরেরই জিনিষ। যোগী যত নিজেকে বৃহৎ করতে থাকেন তত বাইরের জিনিষগুলো বন্ধ হতে থাকে, আসলে পর বলে কিছু থাকছে না।

এই যে পর বলে কিছু থাকে না, এর সাধনা আবার অনেক রকমের। ঠাকুরের প্রথম সাধনা শুরুই হয় ব্যাকুলতা দিয়ে। মা! তুই একে একে দেখা দিয়েছিস আমাকে কেন দেখা দিবি না! সেখানে জগতের সত্তাটা উড়ে যাচ্ছে আর আমি, এই যে সত্তা, এই সত্তাও উড়ে যাচ্ছে। তাহলে জগতের যে সীমিত সত্তা সেটাও উড়ে যাচ্ছে আর আমার আমি যে সীমিত সত্তা সেটাও উড়ে যাচ্ছে। তাহলে কি থাকছে? ঠাকুরের কাছে তখন সত্তামাত্রম্ থেকে যাচ্ছে। যোগীর কাছে এই সত্তামাত্রম্ যখন বোধ হয় তখন আবার বিভিন্ন ভাবে বোধ হয়। আমি তুমির বিভেদটা মিটে গেছে, আমি বোধ আর জগৎ বোধ দুটোই খসে পড়ে গেছে, থেকে গেল এক অনন্ত রাশি। যোগের দৃষ্টিতে মনের বৃত্তি থেমে গেছে, মনের বৃত্তি থেমে যাওয়া মানেই আমি তুমির ভেদ মিটে যাওয়া। কারণ বৃত্তি মানেই আমি তুমি বোধ। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যাকুলতা বা অন্য যেভাবেই হোক আমি আর তুমি, আমি আর জগৎ, যেটাকে আচার্য বলছেন *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়*, আমিত্ব বোধ ও জগতের বোধ খসে যায়। খসে গেলে কি থাকবে? থিয়োরেটিক্যালি বলতে গেলে কিছুই থাকবে না। বেদান্ত মতে তা হবে না, বেদান্ত মতে

অস্তিত্ব মাত্র থাকবে, সত্তামাত্রম্ হয়ে থাকবে। তখন ঐ সত্তা কিভাবে তাঁর সামনে আসেন, তিনি যে বোধ করবেন সেটা কিভাবে বোধ করবেন? এই জায়গাতে আমাদের আবার বোঝার আছে।

এই পেন দেখছি, পেনকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছি। ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা মানেই জগৎ বোধ। প্রথম মন্ত্রে বললেন *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্*, বাইরের জিনিষ ইন্দ্রিয়ে দিয়ে দেখছে। তারপর *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানামৈক্ষদ্*, এবার ভেতরের জিনিষকে দেখছে। ভেতরের জিনিষকে কি দিয়ে দেখবে? ইন্দ্রিয় দিয়ে নিশ্চয় দেখবে না। যখনই আমরা বলছি আমি জানছি, আমি দেখছি, আমি শুনছি সব সময় আমরা কিন্তু মনে করছি ইন্দ্রিয় দিয়ে সব কিছু জানছি। এর বাইরে আমরা যেতে পারব না, সম্ভবই নয়। প্রথম মন্ত্রেই বলছেন জগৎকে দেখা মানেই ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা। প্রথমেই বলে দিচ্ছেন ইন্দ্রিয় বন্ধ করে ভেতরের দিকে যাও। ভেতরে তো যেতে বললেন, কিন্তু ভেতরটা দেখব কি দিয়ে? চিন্তন বা কল্পনা দিয়ে দেখা। কিন্তু এখানে বলছেন চিন্তন দিয়ে হবে না, কারণ *প্রত্যগাত্মানামৈক্ষদ্*, যোগী আত্মাকে জানতে চাইছেন, কল্পনা দিয়ে কখনই জানা যাবে না। নিজেকে নিয়ে ভাবা, অপরকে নিয়ে ভাবা, চিন্তন করা, স্বপ্নে যা কিছু দেখা, সবটাই মনের জগতের কার্য, স্বপ্নকেও যোগশাস্ত্র বৃত্তিজ্ঞান বলছে। বৃত্তিজ্ঞান আর জ্ঞানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য, বৃত্তি জ্ঞানের যন্ত্র হল মন যেটা ইন্দ্রিয় রূপে আসছে, ইন্দ্রিয় রূপ মানেই জগদ্রূপ। প্রথমেই বলে দিচ্ছেন অস্তিত্ব জ্ঞান জগতের জ্ঞান নয়। তাহলে অস্তিত্বের জ্ঞানের যে কথা বলছেন, এই জ্ঞান কি দিয়ে হবে? বলছেন এই জ্ঞান বোধে বোধ হয়। যার হয়নি সে কোন দিন বুঝতে পারবে না। কারণ জগতের বোধ সব সময় ইন্দ্রিয় দিয়ে বা মন দিয়ে হয়, কিন্তু যেখানে আমিত্ব চলে গেছে, তুমিত্ব চলে গেছে সেখানে কি দিয়ে বুঝবে, তাই এটা বোধে বোধ হয়। কিভাবে বোধ হয় আমরা কেউ বলতে পারব না। যার হয় তিনিই জানেন আমার বোধ হয়েছে, কিভাবে হয়েছে তাও বলতে পারবেন না। কারণ শরীরের কোন অঙ্গ দিয়ে এটা হয় না। সত্তামাত্রম্ কিভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়ে? বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন ভাবে ধরা পড়ে। ঠাকুর কিভাবে সত্তামাত্রমকে দেখলেন, যেখানে তাঁর আমি তুমির ভেদ মিটে গিয়েছিল? ঠাকুর দেখছেন চৈতন্যের সমুদ্র আর তার মধ্যে মা কালীর মুখ। ঠাকুরের কাছে মা কালী কি? ঠাকুরের কাছে মা কালী জগজ্জননী আর তিনি দেখছেন মা কালী সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তার মানে ঠাকুর দুটো সত্তা দেখছেন। ঠাকুরের ঐ চরম ব্যাকুলতায় তাঁর আমিত্ব খসে পড়ে গেল, আর জগতের সত্তাটাও খসে পড়ে গেল। আমি সত্তা চলে যাওয়ার পর তিনি আর মাকে না দেখে থাকতে পারছেন না, তখনও তাঁর মন কাজ করছে। ঠাকুর বলছেন, তুই যদি দেখা না দিবি এই খড়্গ দিয়ে আমার গলাটা কেটে দেব। তখন তাঁর শেষ বাঁধনটাও খুলে গেল। শেষ বাঁধনটা খুলে যেতেই মা কালী তাঁর হাতটা ধরে নিয়েছেন। তখন তিনি দেখছেন চৈতন্যের মহাসমুদ্র, আলো আর আলো শুধু আলোর ঢেউ আর তার মধ্যে মা কালীর মুর্তি। মা কালীকে দেখছেন তিনিই জগজ্জননী। পরে ঠাকুর বলছেন, দেখছেন তাঁর চোখের চাহনিতে জগৎ নড়ছে। দুটো জিনিষকে দেখছেন আলো আর জগজ্জননী।

এই জিনিষটাকেই মন্ত্রে বলছেন *ঈশানো ভূতভব্যস্য*। ঐ অবস্থায় চলে যাওয়ার পর তাঁর আমি তুমির ভেদ আর জগৎ খসে যায় তখন শুধু সত্তামাত্রমকে দেখেন। কোথায় দেখেন? হৃদয়ের মধ্যে সেই ভগবানকে দেখেন, যিনি *ঈশানো*, যিনি জগৎকে জন্ম দিয়েছেন আর *ভূতভব্যস্য*, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটের নিয়ন্ত্রণকর্তা। ঠাকুর মা কালীকেও এই রূপেই দেখছেন। এই দেখাটা তিনি তাঁর হৃদয়াকাশে দেখেন। দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যকে বলে দেন, ধ্যান করার সময় মনে মনে ভাববে তোমার হৃদয়াকাশে একটা পদ্মফুল রয়েছে, ঐ পদ্মফুলে ইষ্টের ধ্যান করবে। এটাই বর্তমান কালে ইষ্টের ধ্যানের পদ্ধতি, আগেকার দিনে ইষ্টের ধ্যানের ব্যাপার ছিল না। ইষ্টের ধ্যান করতে করতে মন শান্ত হয়ে আসে, এরপর একটাই বৃত্তি চলতে থাকে, ইষ্টের বৃত্তি। একমাত্র ইষ্টের বৃত্তিই আছে, ভগবানের চিন্তনই শুধু আছে, এখানে এসে তাঁর আমিত্ব আর জগৎ খসে পড়ে যায়। এখন যিনি আছেন তিনিই সত্তামাত্রম্। সব কিছু চলে যাওয়ার পর এবার যিনি থেকে গেলেন তিনিই ভগবান, ত্রিকালের নিয়ন্তা, মহাকাল যিনি কালকেও নিয়ন্ত্রণ করছেন। এর জন্য মনের পুরোপুরি নাশ হয়ে যেতে হবে। কারণ মন দিয়েই জগৎ ঢোকে। সেটা কিভাবে হয়? যোগ দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, নেতি নেতি পদ্ধতি দিয়ে, কর্ম দিয়ে হবে, অনেক ভাবেই হবে। যেভাবেই হোক, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, যে জ্ঞান দিয়ে জগতের বোধ আর আমি বোধ হয়, এই দুটো বোধ বন্ধ না হলে হবে না। এরপর তিনি ভেতরে দেখছেন নাকি বাইরে দেখছেন তাতে কিছু যায় আসে না, সবটাই এক। সাধনার পদ্ধতিতে শুধু পার্থক্য থাকে।

সিদ্ধ পুরুষ শুধু সত্তামাত্রমকে দেখছেন। সত্তামাত্রম্ দু রকমের দেখেন, একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্তা রূপে আরেকটি নিজের ভেতরে সত্তা রূপে। যিনি নিজের উপর একাগ্র করছেন তিনি যখন সত্তামাত্রম্ দেখবেন তখন তাঁর হৃদয়ের মধ্যেই সেই সত্তাকে দেখবেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সত্তামাত্রম্ দেখছেন, যেমন ঠাকুর প্রথম থেকেই মা কালীর ধ্যান করছেন, মা কালীর ধ্যান মানেই জগৎপ্রসবিনী, তখন ভগবানকে বাইরেই দেখবেন। এই দুটো প্রত্যয় সব সময়ই থাকে, আমি আর তুমি বোধ বা আমি আর জগৎ। যিনি আমি রূপে ধ্যান করেন, আমিকে সরিয়ে দেওয়ার পর নিজের ভেতরেই সেই সত্তাকে দেখবেন। আর যিনি বাইরে ধ্যান করছেন, ভক্তি মানে বাইরে, তিনি সেই সত্তাকে প্রথমে বাইরে দেখবেন, তারপর ভেতরে দেখবেন। এই মন্ত্রের যিনি ঈশান তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, এই নিয়ন্তাকে দুটো জায়গায় দেখবেন, ভেতরেও দেখবেন বাইরেও দেখবেন। কেউ প্রথমে ভেতরে দেখেন আর পরে বাইরেও দেখেন আবার অনেকে আগে বাইরে দেখেন পরে ভেতরে দেখেন। এখানে কোন তফাৎ নেই, কারণ তিনি তো সেই অখণ্ড। শুধু সাধক মনকে কোথায় একাগ্র করছেন তার উপর নির্ভর করে তিনি আগে কোথায় দেখবেন। ঠাকুর দেখছেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আলোর সমুদ্র আর তার মধ্যে মা কালী আছেন। ঠাকুর মা কালীকে দর্শন করছেন বলতে আমরা মনে করছি তিনি দেখছেন মানে ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা মানসচক্ষু দিয়ে দেখছেন। এই ধারণা থেকে আমরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারব না। এখানে দেখাদেখির কোন ব্যাপার থাকছে না। যাঁকে দেখছেন আসলে তিনিই দেখেন। যে মা কালীকে দেখছেন বা যে চৈতন্যকে দেখছেন আসলে সেই চৈতন্যই যা দেখার দেখছেন। ঠাকুরের আলাদা কোন ব্যক্তিসত্তা তখন থাকছে না। কারণ ঠাকুরের নিজের ব্যক্তিসত্তা আগেই নাশ হয়ে গেছে। ঠাকুরের কিন্তু তখনও কিছুই মনে ছিল না, তিন দিন ঐ অবস্থার মধ্যে ছিলেন। তিন দিনের ব্যাপারটা তিনি কি করে জানলেন, তাঁর তো কোনই হুঁশ নেই? পরে হৃদয়রাম বলছে। এরপর ঠাকুর ঐ অবস্থার বাইরে যখন আসছেন তখন তাঁর একটা স্মৃতির আভাস থেকে যাচ্ছে। ঐ তিন দিন ঠাকুর কি দেখেছিলেন, কি অনুভব করেছেন বলার কোন পথ নেই, কারণ বলতে গেলেই ইন্দ্রিয় এসে যাবে। ঠাকুরের ইন্দ্রিয়াতীত যা কিছু অনুভূতি হয়েছে এর কোনটাই আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়, আমাদের শুধু শুনে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু যে সত্তাকে দেখছেন তিনি হলেন ঈশান, ভগবান। আমরা তাঁকে যে নামেই বলি না কেন, সচ্চিদানন্দ বলি, আত্মা বলি, কালী, শিব, আল্লা যাই বলি তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি হলেন ঈশান, তাঁর বৈশিষ্ট্য হল তিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা।

তিনি যে ঈশানকে দেখেছেন আমরা কি করে বুঝব? তখন বলছেন *ন ততো বিজুগুপ্সতে*, কোন কিছুকে গোপন করার ইচ্ছা আর থাকে না। এর আগেও বিজুগুপ্সকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জুগুপ্সা, লুকোনর ইচ্ছা কখন হয়? মানুষ যখন নিজেকে সীমিত মনে করে। আমি এক তুমি আরেক হলে কি হয়? আমি আমার অস্তিত্বকে তোমার তুলনায় বড় করে বানিয়ে রাখতে চাইছি, ফলে আমার যত দুর্বলতা আছে বা আমার যে জিনিষকে জানলে তোমার দুর্বলতা হতে পারে, তুমি আমাকে আক্রমণ করতে পার, তোমাকে আমি আমার এই জিনিষগুলিকে জানতে দেব না। কিন্তু যিনি সত্তামাত্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তাঁর কাছে আমি তুমি বলে কিছু নেই। এখানে জুগুপ্সা একটা শব্দ, লুকোনোর ইচ্ছাটা ততো গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল নিজেকে সীমিত জানা। নিজেকে সীমিত রূপে জানলে ভয় আসবে, কামনা-বাসনা আসবে। সীমিত হলে আমি আলাদা তুমি আলাদা, আমি তোমাকে পেতে চাইব। তোমার উপর আমার বিজয় পতাকা উত্তোলন করতে চাইব। আমি জয়ী হতে চাইছি কেন? আমি আলাদা তুমি আলাদা। তোমার থেকে আমাকে বাঁচতে হবে কেন? কারণ আমি আলাদা তুমি আলাদা। কিন্তু যিনি শুধু সত্তামাত্রম্ দেখছেন তাঁর এই ভেদ দৃষ্টিটাই নাশ হয়ে গেছে, কাম-ক্রোধ সব খসে গেছে। প্রথমে গ্লাশ আর গ্লাশের অস্তিত্ব নিয়ে বলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল গ্লাশের গ্লাশত্ব চলে যেতে পারে কিন্তু সত্তামাত্রম্, আছে এই বোধ কোন দিন যাবে না। যিনি নিজেকে আছে এই অস্তিত্ব বোধে নিয়ে চলে যান তখন তাঁর জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটাই পুরো পাল্টে যায়। এখানে তার একটা ভাবকে নিয়ে বলছেন, *ন ততো বিজুগুপ্সতে* দিয়ে বাকি সব কিছুকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

অস্তিত্ব বোধ সাধারণ ভাবে যা হয়ে থাকে সেটাকেই উপনিষদ বলছেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্র*। মানুষ ধ্যানের ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারে। প্রথমে দেহের নড়চড়া বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অন্তঃকরণে যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে সেই ইন্দ্রিয়ের কাজও বন্ধ হয়ে গেছে, মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর শুধু থেকে যাচ্ছে যে ইষ্টকে

ধ্যান করছিল সেই ইষ্ট। শিবের ভক্ত ওঁ নমঃ শিবায় জপ করছেন। এখন থেকে যাচ্ছে শুধু মন্ত্র আর মন্ত্রের অর্থ। তার মানে তাঁর আমি বোধ চলে গেল, ইন্দ্রিয়ের কাজও বন্ধ, তার মানে জগতের বোধও চলে গেল। যে মন নিজেকে দেখছিল আর যে মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগৎকে দেখছিল সেই মনও বন্ধ। এখন তাহলে কি থাকবে? সত্তামাত্রম্, ঈশ্বর, ভগবান শিব। কোথায় দেখেন? ভেতরে যে জায়গাতে ধ্যান করছিলেন সেই জায়গায় দেখবেন। ধ্যান করছিলেন হৃদয়ে, সেইজন্য হৃদয়ে দেখবেন। হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ যে আকাশ আছে সেই আকাশে পদ্মফুলে ইষ্টকে দেখেন। এখানে শুধু একটা বর্ণনা দেওয়া হল, এটাই যে সার্বজনীন, এটাই যে সবার ক্ষেত্রে হবে তা নয়। বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন ভাবে বোধ হয়। কিন্তু প্রত্যেক বোধের আগে কয়েকটি ব্যাপার জড়িত। প্রথম হল আমিত্বের নাশ, ঐ ধ্যানের অবস্থায় গায়ের উপর দিয়ে যদি একটা সাপ বা বিছে চলে যায় বা গায়ে কেউ পিন ফুটিয়ে দিচ্ছে তার কোন বোধ থাকবে না। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে গিরিশ ঘোষ স্বামীজীর সাথে বসে ধ্যান করছেন। মশার কামড়ে গিরিশ ঘোষ ধ্যান করতে পারছেন না। চোখ খুলে দেখেন স্বামীজীর পুরো শরীরটা মশার জন্য কালো হয়ে গেছে। বাস্তবিক এই অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোন ধ্যান হবে না। ঠাকুর বলছেন, ধ্যানে বসে আছেন গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যাচ্ছে অথচ কোন বোধ নেই, পাখি এসে মাথায় শস্য দানা খুঁজছে। পাখিও বুঝতে পারছে না জড় না চেতন পদার্থ। এই অবস্থা না হলে ধ্যান হয় না। এর বাইরে যত ধ্যান শেখানো হয় সবটাই মনোরঞ্জন। একটা রান্না শিখতেই কত দিন লাগে। বাচ্চা বয়স থেকে একটা মেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া হয় কিভাবে হাতা খুন্তি ধরতে হবে, উনুনে কড়াই বসান, উনুন ধরানোই দিনের পর দিন শিখতে থাকে। একবার সব কিছুতে দখল এসে গেল এরপর কেউ একটা বিশেষ কোন রান্নার পদ্ধতি একবার বলে দিতেই বুঝে যায়। ধ্যানের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ চলে, বছরের পর বছর সকাল বিকাল বসেই যাচ্ছে। এক সময় শরীরটা ধ্যানের মধ্যেই অচল হয়ে গেল, গায়ে মশা বসছে কোন হুঁশ নেই। এবার বলা যায় তার ঠিক ঠিক ধ্যান হতে শুরু হয়েছে।

এর আগেও মনের তিনটি অবস্থা, অবস্থাত্রয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল জাগ্রত অবস্থায় আমরা জগৎকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, স্বপ্নাবস্থায় শুধু মন দিয়ে জানছি আর সুষুপ্তি অবস্থায় মনের লয় হয়ে যায় কিন্তু অজ্ঞানের আবরণ থেকে যায়। এই তিনটে অবস্থার পারে একটা চতুর্থ অবস্থার কথা বলা হয়, যাকে বলছেন চত্বারীয়, চত্বারী মানে চার নম্বর, 'চ' টা সরে গিয়ে থেকে যায় তুরীয়। তুরীয়কে ঠিক অবস্থা বলা যায় না, কারণ অবস্থা মানে একটা জিনিষের পরিবর্তন হওয়া। চতুর্থ অবস্থাটা পরিবর্তনের অবস্থা নয়, এটাই বাস্তব। সেইজন্য তুরীয়কে অবস্থা বলা হয় না। তবে বোঝানর জন্য তুরীয় অবস্থা বলাটাই প্রচলিত হয়ে গেছে। তুরীয় হল – এখন ইন্দ্রিয় নেই, মন নেই আর অজ্ঞানও নেই। অজ্ঞান যদি না থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই জ্ঞান আছে। কিন্তু তুরীয় ঠিক জ্ঞানও নয়, সত্তা যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি আছে। সেইজন্য এটাকে জ্ঞানের অবস্থা বা অজ্ঞানের অবস্থা বলা যায় না। গ্লাশ, বোতল এগুলো এক একটি পদার্থ, এখানে বস্তু জ্ঞান হচ্ছে। তুরীয় কোন মতেই অবজেক্ট নয়। তাহলে যেটা অবজেক্ট নয় সেটা তাহলে সাবজেক্ট। আমি আর এই বস্তু, এই বস্তু আমার কাছে বিষয় আমি কর্তা এই বস্তুকে জানছি। তুরীয় কর্মও নয়, কর্তাও নয়। কিন্তু তুরীয় অবস্থায় তো সব সময় থাকা যাবে না, ঐ অবস্থায় থাকলে সমাধির অবস্থা হয়ে যায়, জগতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সেখান থেকে যখন বেরিয়ে আসেন তখন আমরা বলি জ্ঞানী। এই সেই জ্ঞানী, যাঁর জীবনে আর কোন দিন অজ্ঞান অবস্থা আসবে না, চিরদিনের মত অজ্ঞান চলে যায়। তখন তিনি জানেন আমি কর্মও নই, কর্তাও নই। আমি কোন ক্রিয়া করি না, আমার উপরে কোন ক্রিয়া হতে পারে না। গীতায় ভগবান অর্জুনকে কর্তা, ক্রিয়া, কর্মকে নিয়ে যা যা বলছেন বা হনন ক্রিয়া, মৃত্যু এই জিনিষগুলি নিয়েই বলছেন, এই জিনিষটাই তখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন আমি এর কোনটাই নয়। আচার্য শঙ্করের নির্বাণষটকমে যে বলছেন *চিদানন্দ রূপং শিবোহহম শিবোহহম*, এই যে বলছেন আমি সেই শিব, এখানে কোন কর্তাপন্ নেই, ক্রিয়া নেই, সাবজেক্ট অবজেক্ট কিছুই নেই।

আমরা অনেকেরই জ্যোতি দর্শনের কথা শুনি। জ্যোতি দর্শনের কোন কথা হলেই আমাদের মনে হবে আমরা বাইরে যেমন আলো দেখছি, ভেতরেও সেই রকম কোন আলো দেখেন। কিন্তু জিনিষটা তা নয়। তিনিই সেই আলো, এই জিনিষটাকে যতই বোঝান হোক না কেন আমাদের বদ্ধ ধারণাকে কিছুতেই আমরা সরাতে পারব না। আমাদের কাছে জ্যোতি দর্শন মানে একটা কিছু দেখা, দেখে তিনি কিছু অনুভব করছেন। কিন্তু

ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়, জ্যোতি যেটা দেখছেন সেটাই তিনি, সেটাই তাঁর অস্তিত্ব। এর আগে ঠাকুরের জীবনের ঘটনা দেখলাম। ঠাকুর দুটো জিনিষ দেখছেন, প্রথম জগৎ আর তিনি নিজে উড়ে গেছেন, এরপর একদিকে তিনি মা কালীকে দেখছেন, অন্য দিকে দেখছেন চৈতন্যের আলো মহাসমুদ্রের মত ব্যপ্ত আর সেই চৈতন্যের আলোর ঢেউ একটার পর একটা আছড়ে পড়ছে। অল্প বয়স থেকে শুনে শুনে মনে করছি সমুদ্রে যেমন ঢেউ হয়, ঠাকুরও সেই রকম আলোর ঢেউ দেখছিলেন। আসলে তিনি কিন্তু দেখেন না, এই জিনিষটাকে আমাদের পক্ষে বোঝা খুব মুশকিল। এটাকে বলে intuitive knowledge বা সজ্ঞাত জ্ঞান। Intuitive knowledge মানে সেখানে ইন্দ্রিয় বা মনের কোন যোগদান নেই। যেমন যদি বলা হয় এই গ্লাশের কি কোন প্রাণ আছে? এটাকে জানার জন্য কোন যুক্তি বিচার করার দরকার হবে না, নিজের সহজাত বোধ দিয়েই জানছি গ্লাশের কোন প্রাণ নেই। জগতের অনেক কিছুই আমরা সহজাত জ্ঞান দিয়েই জানি। কিন্তু ঐ intuition বা intuitive knowledgeএ সেখানেও sixth senseএর কথা বলা হয়, কিন্তু এটা sixth senseও নয়। এই জ্যোতি যিনি দেখছেন তিনিই ঐ জ্যোতি। তবে এক ধাপে হয়ে যাবে না। প্রথমে মনে হয় তিনি object নন তিনি subject। পরে দেখেন তিনি subject object কিছুই নন, তিনিই আছেন। Subject Object মানেই দুটো সত্তা, এ আর ও। যেখানে ও নেই সেখানে subject object শব্দ ব্যবহার হয় না। একটা ফুটবল ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোন কারণে খেলাটা হলই না, তাহলে খেলাতে গোলের কোন প্রশ্নই আসবে না, ফলাফল জিজ্ঞেস করলে শূন্য শূন্য ফলও বলা যাবে না। ঠিক তেমনি প্রথমের দিকে মনে হয় এই চৈতন্য সত্তাই আছে। যেখানে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলা হয় সেখানে একটু যেন ভেদ থেকে যায়। প্রকৃতিলীন পুরুষের কথা যেখানে বলছেন সেখানেও একটু যেন ভেদ থেকে যায়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাতেও একটু ভেদ থেকে যায়, তখন মনে হবে এটা Subject। শেষ অবস্থায় subject object দুটোই উড়ে যায়। এটাকেই পরের মন্ত্রে বলছেন –

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ।।২/১/১৩।।

(যিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা তিনিই নির্ধূম জ্যোতিসদৃশ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অন্তরাত্মা। ইদানিং তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালও তিনিই বর্তমান থাকবেন। ইনিই সেই আত্মা।)

এটাই ভগবানের সঠিক প্রাঞ্জল বর্ণনা। *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ*, যোগী সাধনা করতে করতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে এনেছেন, বৃত্তিজ্ঞান থেকেও নিজেকে সরিয়ে এনেছেন, সব স্মৃতিকে সরিয়ে দিয়েছেন আর মনকে একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তনে কেন্দ্রিত করে রেখেছেন। মনে করা যাক তিনি ঠাকুরের ধ্যান করছেন। সব কিছু থেকে মনকে গুটাতে গুটাতে একটা অবস্থায় এসে শুধু ঠাকুরের উপর একাগ্র করে নিয়েছেন। এতদিন তিনি যে ঠাকুরের চিন্তা করছিলেন বা ঠাকুরের রূপের চিন্তা করছিলেন ততদিন সেটা ছিল চিন্তা বা চিন্তন। সেই চিন্তনটাই হঠাৎ জ্ঞানে পরিণত হয়ে যায়। তখন ঠাকুরকে তিনি শুধু জীবন্তই দেখেন না, জ্যোতির্ময় দেখেন। এই জ্যোতির্ময় দেখাকেই উপনিষদে বলছেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো*, হৃদয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ আকারে বাস্তবিক জ্যোতির্ময় দেখেন। এই জ্যোতি কোন objective রূপে নয়, চৈতন্য জ্যোতি, ইনিই সব কিছুর আসল জ্ঞাতা।

জ্যোতির আলো কি রকম? *অধুমকঃ*, আগেকার দিনে মানুষ কাঠের আগুন, প্রদীপের আলোই জানত, ধুয়ো নির্গত হওয়ার জন্য ঐ আলোতে একটু কালচে ভাব থাকে। কিন্তু এই আলো একেবারে শুভ্র জ্যোতি। ইদানিং অনেক আলোই শুভ্র, টিউবলাইটের আলোও শুভ্র। কিন্তু চৈতন্যের জ্যোতি পুরোপুরি আলাদা, *অধুমকঃ*, একেবারে শুদ্ধ, তাতে কোন রকম মলিনতার ভাব, কালিমার ভাব নেই। আর তখন তিনি বুঝতে পারেন ইনিই সেই ঈশান, ইনিই ভগবান। যিনি শিবের ধ্যান করছেন, ধ্যান করতে করতে ইন্দ্রিয় জগৎ, মনের জগৎ সব খসে গেল তখন এই দর্শন হয়। কিন্তু তখনই কি দর্শন হয়ে যায়? না, হয় না। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান, জগতের জ্ঞান বন্ধ হয়ে গেল, মনের জগৎ খসে পড়ে গেল, তাও কিন্তু জ্যোতি দর্শন হয় না। জ্যোতি দর্শনের আগে একটা বাধা থেকে যায়। কিসের বাধা? অজ্ঞানের আবরণটা তখনও থেকে যায়। সুষুপ্তিতে যেমন অজ্ঞানের আবরণ থেকে যায়, ধ্যানের গভীরেও অজ্ঞানের আবরণ থেকে যায়। বাকি সব কিছুই করে নেবেন, জগৎ থেকে সরিয়ে নেবেন, ইন্দ্রিয় দমনও করে নেবেন, মনকেও নিয়ন্ত্রণ করে নেবেন, কিন্তু তিনি অজ্ঞানের আবরণকে সরাতে পারবেন না। ওটাকে সরানো সাধকের এক্তিয়ারের বাইরে। ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মা কালীর দর্শনের

জন্য ব্যাকুলতায় তিনি সব কিছুই করে যাচ্ছেন, কিন্তু তাও হচ্ছে না। কারণ অজ্ঞানের আবরণ, আমির একটা ক্ষীণ পর্দা থেকে যাচ্ছে। ঠাকুর প্রথমের দিকে কোন গুরুর কাছে সাধনার শিক্ষা নেননি যে, গুরু বলে দেবে এটা এভাবেই হয়। তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈত সাধনা করতে গিয়ে একটা অন্য ধরণের অজ্ঞান এসে ঠাকুরের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তোতাপুরীকে বলতে তিনি ঠাকুরের কপালে কাঁচের টুকরো দিয়ে আঘাত করলেন, বললেন এখানে মনকে একাগ্র করো। কিন্তু প্রথম যখন ঠাকুর ব্যাকুলতা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখনও সেই একই সমস্যা এসেছে। সেই জায়গাতে এসে ঠাকুর মা কালীর খাঁড়া হাতে নিয়ে বলছেন আমি নিজেকেই শেষ করে দিচ্ছি। এরপর ঠাকুরের ক্ষেত্রে যা যা হয়েছে, তা না হয়ে অন্য রকম কি কিছু হতে পারত? ঠাকুর খাঁড়া হাতে নিয়ে গলা কাটতে যাচ্ছেন, মা হাতটা চেপে ধরলেন না, আর ঠাকুরের গলাটা কেটে বেরিয়ে গেল। রীতিমত সম্ভবনা ছিল। দৈবাৎ দুটো জিনিষ একসাথে হয়ে গেছে। আমরা বলব ঠাকুর অবতার, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়, সবই মানছি। কিন্তু যে কোন সাধক যতই ব্যাকুল হোক আর যাই হোক আর যদি ঠাকুরের মতই ব্যাকুলতা নিয়ে এগোয় কিংবা ঠাকুর নিজেও যদি ঐ রকম করেন সবারই গলা কেটে বেরিয়ে যেতে পারে। ঐ অজ্ঞান আবরণ কখন খসবে এটা কারুর হাতে নেই, এই আবরণ সরাবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতে। ঠাকুরও পদে পদে এই জিনিষটাকে কথামৃতে বলছেন। এটাকেই ঠাকুর একটা কাহিনী দিয়ে বলছেন। একজন লোক জঙ্গলে শবসাধনা করছিল, হঠাৎ একটা বাঘ এসে তাকে নিয়ে চলে যায়। গাছের উপর বসে আরেকজন সব দেখছিল। সে দেখল শব রয়েছে, আরও যা যা দরকার সবই আছে। সে তখন গাছ থেকে নেমে আচমন করে শবের উপর বসে একটু জপ করতেই তার সিদ্ধি হয়ে গেল। মা দেখা দিয়ে বলছেন, বল তুই কি চাস! তখন লোকটি বলছে, মা! আমি কি চাই সেটা না হয় পরে বলব কিন্তু তার আগে আমাকে বল যে লোকটি এত খাটাখাটনি করে সব জোগাড়-যন্ত্র করে বসল তাকে বাঘে নিয়ে চলে গেল, আর আমি কিছুই করলাম না, একটু জপ করতেই তুমি সন্তুষ্টা হয়ে গেলে। মা বলছেন, তোর আগের জন্মে অনেক করা ছিল। ঠিক এটাই এখানে বলা হচ্ছে, তাকে যেমন বাঘে নিয়ে চলে গেল, ঠাকুরের গলাটাও কেটে বেরিয়ে যেতে পারত। পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হত দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দিরের পূজারির আত্মহত্যা। সব কাহিনী ওখানেই শেষ হয়ে যেত। ঐ অজ্ঞানের আবরণ কখন খসবে কেউ জানে না। তবে ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা অন্য রকম জানি, তিনি ভগবান, ভগবানকে কিভাবে ব্যাকুল হয়ে ভালোবাসতে হয় শিক্ষা দিতে এসেছেন, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় গলা কেটে বেরিয়ে যাওয়ার পুরো মাত্রায় সম্ভবনা ছিল।

বরাহনগর থেকে গোপাল সেন নামে এক ছোকড়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই আসত। একদিন এসে ঠাকুরকে বলছে, তোমার যেতে এখনও দেরী আছে, আমি চললাম। তারপর বাড়ি গিয়ে আত্মহত্যা করে নিল। এই ধরণের ঘটনা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়। এত কিছু করার পরেও আমার যখন কিছুই হচ্ছে না, আর কবে হবে, বলে আত্মহত্যা করে নিল, এ রকম অনেক ঘটনা আছে। কই মা কালী গিয়ে তো তাদের হাত চেপে ধরছেন না। শব সাধনায় যে কেউই শেষ পর্যায়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁর জ্ঞান হয়ে যাবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। গুরু থাকলে এই বাড়াবাড়িটা করতে দেন না, তিনি শিষ্যকে আটকে দেন। ঠাকুরের সেই সময় কোন গুরু ছিলেন না, কোন নির্দেশক ছিলেন না। ঠাকুরের এই ঘটনা খুবই দৈবাৎ আর বিরল, দুটো এক সঙ্গে হয়েছে। আগে পরেও হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আগে পরে শব্দটা বলব না, কারণ ঠাকুরেক আমরা অবতার বলে জানি। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এই নয় যে এই জন্ম হল না বলে পরের জন্মে হবে। সাধক রূপে দেখলে এই জিনিষ হওয়ার খুবই সম্ভবনা ছিল, গলাটাই হয়ত আলাদা হয়ে যেত। তার জন্য যে তাঁর সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল তা নয়, পরের জন্মে হবে, বরঞ্চ অনেক আগেই হয়ে যাবে। লোকে ভাববে এনার এই বয়সেই এত কিছু কি করে সম্ভব হল। এই শেষ অজ্ঞান আবরণকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারুর হাতে নেই। এই আবরণ কার খসে যাবে, কবে খসবে কেউ জানে না। একজন যোগী সব কিছু করে চলে যেতে পারেন, ইন্দ্রিয় জয়, মন জয়, সব কিছুকে জয় করে নিতে পারেন, ঐ জ্ঞান কিন্তু তাতে হবে না। কখন হবে কেউ বলতে পারবে না। এমন কি রমণ মহর্ষি, যিনি একজন কট্টর বেদান্তী, তিনিও বলছেন ঐ শেষ অবস্থায় গিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়। সাধু মহাত্মারা যে শরণাগতির কথা বলেন, এই কারণেই বলেন। ওখানে এসে সাধকও বুঝে যান, এবার আমার চেষ্টা দিয়ে আর কিছু হবে না।

জ্যোতি দেখার পর তিনি দেখছেন *ঈশানো ভূতভব্যস্য*, আরে! তাইতো, এই জ্যোতিই তো তিনি। এর আগেও বললেন *ঈশানো ভূতভব্যস্য*, এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে দিলেন। দেখছেন এই জ্যোতিই সেই ভগবান। কিন্তু এখানে ভগবানকে অন্তর্যামী রূপে দেখছেন, ঠাকুর যেমন মা কালী রূপে দেখছেন, একই জিনিষ। যিনি দেখছেন তিনি জানেন যিনি পরমাত্মা তিনিই আমার হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করে আছেন। ঠাকুর দেখছেন যিনি পরমাত্মা তিনিই মা কালী রূপে তাঁর সামনে বিরাজ করছেন। আগের মন্ত্রে বললেন, এই *ঈশান* হলেন ত্রিকালের নিয়ন্তা। পরের মন্ত্রেও বলছেন *ঈশানো ভূতভব্যস্য*, কিন্তু তার সাথে বলছেন *স এব অদ্য স উ শ্বঃ*, তিনি আজও আছেন তিনি কালও থাকবেন। কোথায় থাকবেন? আমার ভেতরে, সমস্ত প্রাণীর ভেতরে, সমস্ত জগৎ জুড়ে তিনিই থাকবেন। হে নচিকেতা! তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে, কেউ বলে আছে, কেউ বলে নেই, তা নয়, তিনি আছেন। কিভাবে আছেন? সর্বকালে সর্বব্যাপী *স এবাদ্য স উ শ্বঃ*, আজকে আছেন কালও থাকবেন, তাতেই বলে দেওয়া হল গতকালও ছিলেন। এখানে অস্তিত্বের কথা বলছেন না, এর অর্থ হল তিনিই আছেন। প্রথমে যে গ্লাশ আর তার অস্তিত্বের কথা বলে হয়েছিল, গ্লাশ আছে, এই আছে জিনিষটাকে এখানে এভাবে বলছেন *স এবাদ্য স উ শ্বঃ*। গ্লাশ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সৃষ্টিও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাশ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সত্তামাত্রম্ এর কখন নাশ হবে না। গতকালও ছিলেন, আজও আছেন আর আগামীকালও থাকবেন, এটা বোধ করা যায়।

নরেন্দ্রনাথ এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি ঈশ্বর দেখেছেন? ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ দেখেছি। নরেনকে তখন ঠাকুর অন্তর্যামী রূপে দেখার কথা বলছেন না, তিনিই আছেন দেখেছেন। কিন্তু খুব সাধারণ ভাবে সবাই জ্যোতি রূপেই দেখেন। তবে জ্যোতি রূপে দেখাটাই শেষ কথা নয়। জ্যোতি দর্শনও সবার ক্ষেত্রে এক রকম হয় না। আল গাজালী একজন নামকরা সুফী সাধক ছিলেন। তিনি সুফী সন্তদের উপর অনেক গবেষণাও করেছিলেন। তিনিও সুফি সন্তদের জ্যোতি দর্শনের অনেক রকম বর্ণনা দিচ্ছেন। হৃদয়রাম অনেক দিন ধরে ঠাকুরের কাছে বায়না করে যাচ্ছিল, মামা কিছু একটা অনুভূতি দাও। ঠাকুর একদিন হৃদয়রামকে ছুঁয়ে দিলেন, ছুঁয়ে দিতেই হৃদয়রাম নিজেকে আলোময় দেখছেন, ঠাকুরও আলোময়। হৃদয়রাম তখন চিৎকার করে বলছে, মামা! মাম! এখানে আমরা কি করছি! চল আমরা জগৎকে উপদেশ দিই। শুধু এক অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ দর্শনই হয় না। প্রত্যেক ধর্মে মহাপুরুষদের ছবির পেছনে একটা আলোর বলয় দেখানো হয়। যিশুও বলছেন, I am the light of the world জগৎকে আমি দিশা দেখাচ্ছি। এই যে আলোর ভাব, এর অনেক রূপ আছে, সবাই একই রকম দেখেন না। কথামৃতের শেষের দিকে বর্ণনা আছে, বরানগর মঠে একজন গায়ত্রী মন্ত্র স্বর্ণাক্ষরে ভাসছে দেখতেন। অনেকে নিজের ইষ্টমন্ত্রকেও জ্বল জ্বল জ্যোতি রূপে ভাসতে দেখেন। তখন তিনি দেখেন এই মন্ত্রই ভগবান, নাম আর নামী অভেদ। নাম আর নামী অভেদ হওয়ার জন্য ভগবানের যে মন্ত্র আর তিনি দুটোই জ্যোতি রূপে আসে। জ্যোতি দর্শনের কোন সীমা নেই, কিন্তু প্রত্যেকটিতে শর্ত একই থাকে। যে আলোই দেখা হোক না কেন, সেই আলো চৈতন্যময় আলো। যাঁরই জ্যোতি দর্শন হচ্ছে, সেই জ্যোতি যে রূপেই আসুন, মন্ত্র রূপেই আসুন, ইষ্ট রূপেই আসুন আর শুদ্ধ জ্যোতি রূপেই আসুন, শর্ত কিন্তু ঐটাই থাকতে হবে, *স এবাদ্য স উ শ্বঃ* আর তার সাথে সাথে *ঈশানো ভূতভব্যস্য*। আপনি তাঁকে আল্লা বলুন, মা কালী বলুন, শ্রীরামকৃষ্ণই বলুন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও ত্রিকালের নিয়ন্তা হতে হবে। শুধু Rular of the Universe হলে হবে না, তাঁকে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটে কালে সমান ভাবে থাকতে হবে, তিনিই প্রকৃত রাজা। এই কটি বোধ যদি না থাকে তাহলে জ্ঞান যে অর্থে বলা হয়, এই জ্ঞান সেই জ্ঞান নয়। স্বামীজীর অল্প বয়সে ঘুমোবার সময় যে জ্যোতি দর্শন হত, ঐ জ্যোতি সম্পর্কিত যে জ্ঞান, এই জ্যোতিই যে সেই পরমব্রহ্ম, তার সাথে *স এবাদ্য স উ শ্বঃ* এই জ্ঞান স্বামীজীর মধ্যে তখনও আসেনি। কোথাও এই জ্ঞানটা স্বামীজীর মধ্যে চাপা ছিল। ঠাকুরও যখন মা কালীকে দেখছেন তখন জ্যোতি রূপে দেখছেন। পরে তোতাপুরী এলেন, তোতাপুরী দেখছেন এনার মধ্যে এখনও কোথাও একটা অজ্ঞানের হাল্কা আবরণ আছে। অজ্ঞান কিছু না, এখানে আমি তুমি ভেদটা অল্প একটু থেকে যায়। এই আমি তুমি বলতে, তিনি ঈশ্বর আর আমি তাঁর ভক্ত, জাগতিক অর্থে যে আমি বোধ সেই আমি নয়। তিনি প্রভু আমি তার ভক্ত, এই ভেদ। সেই বোধকেও তিনি মিটিয়ে দিচ্ছেন। ঘুমোবার সময় স্বামীজীর যে জ্যোতি দর্শন হত সেটা জ্ঞানের অবস্থা নয়। পরে ঠাকুর যখন ধীরে ধীরে স্বামীজীকে এগিয়ে দিচ্ছেন, তখন বুঝতে পারছেন এটাই জ্ঞান। তখন দেখেন সমস্ত প্রাণী

এবং যাবতীয় যা কিছু আছে এটা সেই আলো, এটাই সেই সত্তামাত্রম্‌, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এটাই আছে। যেখানে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সেখানেই এই চৈতন্যের আলো আছে।

আচার্য বলছেন *স এবাদ্য স উ শ্বঃ* এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা যত রকমের নাস্তি বাদ আছে, যেমন বৌদ্ধ ধর্মে বলে শূন্য বাদ বা বিজ্ঞানীরা বলে বিগ ব্যাঙের আগে কিছু ছিল না, এই ধরণের সব অপসিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে দেওয়া হল। কিন্তু শ্রুতি বাক্যকে বাকিরা মানতে চাইবে না, তাই ঠাকুর এবারে নিজেই সরাসরি অনুভূতি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আচার্য শঙ্কর আবার যুক্তি দিয়ে ব্রহ্মসূত্রাদিতে প্রতিষ্ঠিত করছেন। ঠাকুর এত কিছু জানতেনও না যে উপনিষদে এই রকম কোন কথা আছে মানুষ জ্যোতি দেখবে, সেই জ্যোতিকে জানবে তিনি ঈশ্বর, তিনি আজও আছেন, কালও থাকবেন, তিনি কালের সাথে রমণ করেন, কিন্তু ঠাকুর সরাসরি অনুভূতির দ্বারা দেখলেন। আজ থেকে সাত-আট হাজার বছর আগে উপনিষদের ঋষিরা যেটা বলছেন, যেটা দেখেছেন ঠাকুরও সেটাই সরাসরি দেখছেন। এতেই প্রমাণিত যে এটাই আধ্যাত্মিক সত্য।

পরের মন্ত্রে যাওয়ার আগে জীবনের কয়েকটি জিনিষকে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের জীবন কয়েকটি জিনিষের দ্বারা পরিভাষিত হয়ে আছে, যেখানে ভালো মানে এই এই, সুখ মানে এই এই, এই এই জিনিষগুলি যদি থাকে তাহলে আমার জীবন ঠিক ঠিক চলবে। আমরা কিন্তু ভুলে যাই, জীবনের যেটা মূল, সেটাকে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবটাই সব পরিস্থিতিতে নিয়ে চলতে হয়। আগেকার দিনে মেয়েদের শ্বশুড় বাড়িতে কিভাবে থাকতে হবে আগে থেকেই একটা শিক্ষা দিয়ে সচেতন করে দেওয়া হত। ইদানিং কালে হয় কিনা ভগবানই জানেন। সেখানে মেয়েদের কতকগুলি সাধারণ জিনিষ বলে দেওয়া হত, যেমন স্বামীর সুখে ও দুঃখে সব সময় সাথে থাকবে, স্বামীর ভালো মন্দ যাই হোক সব সময় সাথে থাকবে। এটারই সম্প্রসারিত রূপ হল যখন ঠাকুর বলছেন, যদ্যাপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। তবে গুরুর প্রতি শিষ্যের এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী খুবই ব্যাতিক্রমী। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে খুব ভালো বোঝা যায়। স্বামীকে যখন লুচি-হালুয়া খাওয়ায় তখনও সে তার স্ত্রী আর যখন জল-মুরি খাওয়ায় তখনও সে তার স্ত্রী। যখন ভালো বাড়িতে থাকছে তখনও সে স্ত্রী আবার অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার পর, দ্রৌপদী যেমন স্বামীদের সাথে জঙ্গলে জঙ্গলে আনন্দের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বা সীতা যেমন শ্রীরামচন্দ্রের সাথে ঘুরছেন, তখনও সে স্ত্রী। যার সাথে যার সম্পর্ক পুরোপুরি পাকা হয়ে গেছে, পরিস্থিতি অনুসারে সে সম্পর্কটা পাল্টে যাবে না। ইদানিং বেশির ভাগ স্বামী-স্ত্রীর ভাব হল ভালোটা আমার, মন্দটা তোমার। এভাবে জীবন চলতে পারে না। ছেলে ভালো হলেও আপনার ছেলে, ছেলে অপদার্থ হলেও আপনারই ছেলে। আধ্যাত্মিক জীবন মানে এটাই। একটা বিদ্যাকে নিয়ে চললেও তাই। কখনও বৃষ্টি পড়ছে, কখনও ঠাণ্ডা, কখনও খুব গরম, কখনও দিনকাল ভালো চলছে, কখনও খারাপ চলছে। আমাদের সমস্যা হল আধ্যাত্মিকতা, জপ-ধ্যান, তপস্যা এগুলো আমাদের কাছে পার্ট-টাইমের মত। বাড়িতে থাকা এক রকম আর মেলা দেখা আরেক রকম। আগেকার দিনে বেশির ভাগ মেলা গ্রাম দেশেই হত। মেলা দেখা মানে, যখন গরম থাকবে না, বন্যা থাকবে না, আবহাওয়া ভালো থাকবে, হাতে সেই রকম বিশেষ কাজকর্ম থাকবে না, পকেটে কিছু টাকা থাকবে তখন আমরা সেজেগুজে মেলা দেখতে যাই। আমাদের কাছে ঈশ্বর আরাধণা পুরোপুরি মেলা দেখার মত। যখন কোন ঝামেলা-টামেলা নেই, শরীর ফিট, অন্য কোন কাজ নেই, কোন বিধ্বস্ততা নেই তখন ভাবি এবার জপ-ধ্যান করতে বসব। কিন্তু আজ শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, কাল পারিবারিক কোন ব্যস্ততা আছে বা পরশু কোন ঝামেলা এসে গেছে, তেমন তেমন ইচ্ছেটাও উবে যায়। জপ-ধ্যান এগুলো আমাদের কাছে পার্ট-টাইম, মেলা দেখার মত। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলন করেন তাঁদের জীবন-ধারা কখনই মেলা দেখার মত হয় না। আধ্যাত্মিক জীবন বাইরে হোটেলে খাওয়ার মত নয়, বাড়ির রান্নার মত রোজ এটাই তাঁকে খেতে হবে। আমরা সবাই ধ্যান শিখতে চাই, ধ্যান করতে চাই। কিন্তু একবারও আমরা নিজের কাছে প্রশ্ন করেছি আমি ধ্যান করে কি পেতে চাইছি? কেন ধ্যান করতে চাইছি, ধ্যান করে কি পেতে চাইছি সেটাই আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। দোকানে গেছি। দোকানদার জিজ্ঞেস করল আপনি কি চান? আমি বললাম, ভাবছি কি নেওয়া যায়। সব দোকান ঘোরা হয়ে গেল। দোকানদার জিজ্ঞেস করছে, আপনি কি চান? ভাবছি কি নেওয়া যায়, এটাও নিতে পারি, ওটাও নিতে পারি। এক ঘন্টা দোকানে ঘুর ঘুর করার পর দোকানদার আমাকে বলবে, বাড়ি গিয়ে আপনি আগে ঠিক করুন আপনার কি চাই, তারপর আসুন। ধ্যান করে তুমি কি পেতে চাও জিজ্ঞেস করলে, সবাই এই উত্তরই দেব – ভাবছি কে পেতে চাই।

কেউ ধ্যান করে পবিত্র হতে চাইছে, কেউ ধ্যান করে ইষ্টের সান্নিধ্য পেতে চায়, কেউ ধ্যান করে চঞ্চল মনকে শান্ত করতে চায়। প্রত্যেকেটিই খুব সাধারণ কথা, কোথাও প্রকোষ্ঠবদ্ধ, compartmentalize করা হচ্ছে। আমরা ভাবছি জগৎ আর ঈশ্বর আলাদা, ভাবছি জগতের কাজ আলাদা আর ধ্যান আলাদা। কখনই তা হয় না। যে জিনিষটা আমরা ধ্যানে পেতে চাইছি, ঐ একই জিনিষ ধ্যানের বাইরেও পাওয়া যায় আর পেতে হয়। তফাৎ হল, যে জিনিষটা জগৎ সমেত আমি নিচ্ছি, সেটাই ধ্যানের গভীরে জগৎ ছেড়ে নিতে হয়। যেমন মনকে কেন্দ্রিত করা। মন একাগ্র করা খুব সহজ জিনিষ। কেউ চাইছেন, ধ্যান করে মনকে একাগ্র করতে চাই। ধ্যানে মন কি করে একাগ্র হবে! যাদের মন একাগ্র তাদেরই মন ধ্যানে বসে। ধ্যান করে কখনই মন কেন্দ্রিত হয় না। ধ্যান তারাই করতে পারে যাদের মন কেন্দ্রিত। মন কেন্দ্রিত করা খুব সহজ, একটা কাঁচের গুলি নিয়ে নিন, দেওয়ালে একটা দাগ দিন এবার কাঁচের গুলিটা ঐ দাগে ছুড়তে থাকুন, সারাদিন অনুশীলন করতে থাকুন। যত মন কেন্দ্রিত হবে তত বেশি বেশি নিশানায় লাগবে। যাদের মন খুব চঞ্চল তারা যদি অনেকবার এই অনুশীলন করে, মন তাদের অনেক কেন্দ্রিত হয়ে যাবে। বার্ণাড'শএর একটা নাটকে একটা মেয়ের চরিত্র আছে যে বল ছোড়ার প্র্যাক্টিস করে যেত। একটা বল ছুড়ছে, বলটা উপরে ছুড়ছে, পড়ার সময় আরেকটা হাত দিয়ে ধরে নিচ্ছে। এরপর বাড়িয়ে দুটো বল করল, দুটো থেকে তিনটে, তিনটে থেকে চারট বল একসাথে ছুড়ছে। মেয়েটি বলছে সকালে সাতটা বল নিয়ে যদি না খেলতে পারছি ততক্ষণ আমি দিনের কাজ শুরু করি না। তার মানে তখনও মেয়েটির মন একাগ্র হয়নি। যদিও একটু বাড়িয়ে লেখা হয়েছে, কিন্তু যদি কেউ ঠিক করে নেয় যতক্ষণ আমার মন একাগ্রতার এই স্তরে না যাচ্ছে ততক্ষণ আমি কোন কাজ শুরু করব না, কয়েক দিনের মধ্যে তার মন একাগ্র হয়ে যাবে। বা ছুঁচে সুতো ভরা, মন একাগ্র থাকলে চোখ বন্ধ করেও ঢুকিয়ে দেবে। যে বলছে আমি ধ্যানে পবিত্র হতে চাই, ধ্যানের গভীরে পবিত্রতা থাকবে আর ধ্যানের বাইরে আমি নোংরামি করে বেড়াব! এটা কি ধরণের পবিত্রতা! যে এই রকম, ধ্যানের সময়ও সে নোংরা কথাই ভাববে। যেটা আমি ধ্যানে পেতে চাইছি আমাকে আগে সেটা বাইরে পেতে হবে। ধ্যানের ব্যাপারে আমরা অনেক ভুল ধারণা নিয়ে চলি। সাধু সন্ন্যাসীদের মনে জগতের কোন কিছুর চাহিদা নেই। কিন্তু সংসারীদের অনেক কিছুই দরকার, খাওয়া-পড়ার দরকার, ঘর সামলানো দরকার, সেইজন্য বিয়ে করতে হয়, বিয়ে করলে চাকরী করতে হচ্ছে। ফলে সংসারীদের জগৎটা বটবৃক্ষের মতে ছড়িয়ে গেছে। জগতের এই বিস্তার ঈশ্বর থেকে আলাদা কিছু নয়। উপনিষদে আমরা এই জিনিষগুলিকে নিয়েই আলোচনা করে যাচ্ছি।

ঠিক ঠিক যাঁরা ধ্যান করেন, ধ্যানের গভীর থেকে বেরিয়ে আবার যখন বিস্তৃত ইন্দ্রিয় জগতের মাঝখানে আসছেন তখনও তাঁর কাছে কোন তফাৎ বোধ হবে না। ধ্যানের এই ব্যাপারটা অন্যদের বোঝান অসম্ভব। দুটো একই সাথে চলে, যতটা তিনি বাইরে দিব্যত্ব দেখবেন ততটাই ভেতরে দিব্যত্বের ধ্যান হবে। ভেতরে যতটা দিব্যত্বের ধ্যান হয় বাইরেও ঠিক ততটাই দিব্যত্ব থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বা ঈশ্বরের ধ্যানকে প্রেমিক-প্রেমিকার উপমা দিয়ে সব থেকে ভালো বোঝা যায়। প্রেমিক-প্রেমিকা দুজন যদি একসাথে থাকে, পার্কে বা নদীর ধারে বসে আছে তখন দুজন দুজনের সাথে কথা বলতে থাকে। দুজন যখন আলাদা থাকে তখনও এক অপরের কথা চিন্তা করতে থাকে। ঠাকুর যেমন বলছেন, বড়লোকের ঝি সব কাজ করে যায় কিন্তু ওর মন পড়ে আছে দেশের বাড়িতে। ধ্যান বলতে এটাই। তুমি আমার সামনে নেই তখন তোমার কথাই ভাবছি, যখন তুমি কাছে আছ তখন তোমাকে নিয়েই আছি। নতুন বিয়ে হয়েছে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে, আমার স্বামী পতি পরমেশ্বর। স্বামীও স্ত্রীকে ভালোবাসে। স্বামী সকালবেলা কাজে চলে গেল। স্ত্রী এবার ঘরের কাজকর্ম করছে, রান্না করছে যা করছে জানে সবটাই আমার স্বামীর জন্য করছি। সন্ধ্যেবেলা স্বামী কাজ থেকে ফিরে এসেছে, তখন শুধু স্বামীকে নিয়েই আছে। ঈশ্বরের প্রতি এই ভাব, যদি ভাবে যতক্ষণ তুমি আছ ততক্ষণ তুমি, বাকি সময় আমার জগৎ, এই ভাব থাকা মানেই ছন্নছাড়া জীবন। দীক্ষা নিয়েছি, ঠাকুরকে মানলাম কিন্তু ঠাকুরের বাইরে যে সংসার এটাকে আর মানছি না। কিছু দিন চলবে, তারপর ঠাকুরও উড়ে যাবে, মাঝখানে পুরোটাই খাণ্ডাহার হয়ে পড়ে থাকবে। এই ব্যাপারটাই পরের মন্ত্রে বলছেন –

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তেনাবানুবিধাবতি।।২/১/১৪।।

(দুর্গম পর্বতগাত্রে বর্ষিত বৃষ্টিধারা পার্বত্য নিম্নভূমিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে বিনষ্ট হয়, সেইরকম যে ব্যক্তি প্রাণিসকলকে আত্মা থেকে পৃথক্ দর্শন করে, সেই ঐ সকল ভেদেরই অনুসরণ করে থাকে)

আগে এখানে জলের উপমাটা বুঝতে হবে। সব জলেরই উৎস সমুদ্র, এমনকি জীবনের মূল উৎসও সমুদ্র। বায়োলজি বা বর্তমান কালের বিবর্তনবাদীরাও বলছেন, জীবন মানে জল। শুধু মানুষ নয়, যে কোন প্রাণীর শরীরে জলের ভাগ বেশি। বক্তব্য হল জীবের উৎপত্তি সমুদ্রে। সামুদ্রিক প্রাণীই বিবর্তিত হয়ে হয়ে ভূচর ও খেচর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। মূল জল জিনিষটা থেকে গেছে। নদীর জল, ডোবার জল, যত জায়গায় যত জল আছে সব জলই আসছে সমুদ্র থেকে। সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয়, মেঘ থেকে নেমে আসে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির জলই আবার নদী, নালা হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশছে, পর্বতগাত্রে বর্ষিত বৃষ্টির জলও নানান রকম ধারা হয়ে চলছে। হিমালয়ে সেই জলই ছোট ছোট ধারা হয়ে বেরিয়ে আসছে। ধারাগুলি চলতে চলতে কোন ভাবে গঙ্গায় বা যমুনায় মিশে গেল। গঙ্গা যমুনা আবার এলাহাবাদে এসে এক হয়ে গেল। সেখান থেকে চলতে চলতে মাঝখানে আরও অনেক নদী এসে মিশছে, এরপর বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে, কলকাতা হয়ে গঙ্গাসাগরে গিয়ে সমুদ্রে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ের এই জলধারা কোন কারণে যদি বড় জলধারায় মিশে যেতে না পারে, যে ধারা তাকে ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে নিয়ে যেত, তাহলে কি হবে? ঐ জলটা কোথাও কোন জমির তলায়, কোন গহন অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে মাটিতেই শেষ হয়ে যাবে। এটা একটা উপমা, জলটা হারিয়ে গেল। ক্ষেতের আল ভেঙে জল যদি বেরিয়ে মাঠের দিকে চলে যায়, প্রথমটা খুব তোড়ে কিছু দূর যাবে, তারপর একটা জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে। জলের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

অস্তিত্বের সব সময় দুটি রূপ। শেষ অস্তিত্ব হল একত্ব, যে অস্তিত্বের কথা কঠোপনিষদ প্রথম থেকে বলে যাচ্ছেন। পুরো সমান একত্ব হল সমুদ্র, কিন্তু একত্বের উপর নানাত্ব নৃত্য করছে। বহুত্ব যেখানে নৃত্য করে সেই বহুত্বের তলায় একটা একত্ব থাকে। একত্ব যদি না থাকত তাহলে বহুত্ব কোন দিন হত না। উদ্দেশ্য হল সেই একত্বের দিকে যাওয়া। একত্বের দিকে যাওয়ার প্রচেষ্টা যদি না থাকে, বহুত্বের শক্তিটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গিয়ে অপচয় হয়ে যায়, তারপর পুরোটাই হারিয়ে যায়। ব্যাণ্ডে অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র বাজছে, এখানেও বহুত্বের খেলা চলছে। কিন্তু ওর নিজস্ব একটা ঐকতান রয়েছে, ঐ একটি তানের উপরই তারা নৃত্য করছে। যদি কোন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বণি ঐ তানের সাথে না মেলে, বাদ্যযন্ত্রের ঐ বাদক ব্যাণ্ড থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। এরপর ব্যাণ্ডের লোকেরা ওকে আর ডাকবেও না। আমাদের জীবনে ঠিক তাই হয়। আমরা সবাই সেই একত্বেরই এক একটা রূপ, এটাই নানাত্ব বা বহুত্ব। এই যে সবাই নানান রকমের প্রবৃত্তি নিয়ে চলেছে, নানান রকমের জীবন নিয়ে চলেছে, জীবনে নানা রকমের ধর্ম, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কেউ স্ত্রী ধর্মে চলছে, কেউ গৃহস্থ ধর্মে চলছে, কেউ সন্ন্যাস ধর্মে চলছে, এই ধর্ম চলুক, তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু সব প্রবৃত্তি, সব ধর্মের উদ্দেশ্য হল ধীরে ধীরে একত্বের দিকে যাওয়া। একত্বের অস্তিত্বের দিকে যদি না যায় তাহলে ধীরে ধীরে জীবনের মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এই জিনিষটাকেই মন্ত্রে উপমার সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। সেই এক সত্তা, যে এক অস্তিত্ব, তিনিই নিজেকে নানান রূপে দেখাচ্ছেন। যেমন সমুদ্র এক, সমুদ্র থেকে মেঘ হয়ে যখন উঠছে তখন বহু দেখাচ্ছে। *যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং, যথা উদকম্, উদকম্* মানে জল, *দুর্গে* মানে দুর্গম, মা দুর্গার নামও সেখান থেকেই এসেছে যাঁর কাছে পৌঁছান খুব কঠিন। বলছেন সেই মেঘ হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে যখন জলবর্ষণ করে সেই জল সেখানে স্থির ভাবে থাকতে পারে না, ওখান থেকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায়। ছড়িয়ে যাওয়ার পর সেই জল ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। মূল ধারার সাথে সে আর মিশে যেতে পারল না, দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে কোথায় হারিয়ে যাবে কেউ বলতে পারবে না, কোথায় কোন জলাশয়ে গিয়ে আটকে আছে, নাকি মাটির তলায় চলে গেছে কেউ জানে না। সমুদ্রের জল যেমন সমুদ্রেরই জল, সেই সমুদ্রের জল উঠে আকাশে গেল, আকাশ থেকে যখন নামল, তখন তার অস্তিত্বকে যেন চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। জীবন মানেই তাই। সেই এক সত্তা তিনি বহু হয়ে জগতে যেন ছড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ছড়িয়ে গেলে কি হয়, ধীরে ধীরে এগুলো সব নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যাওয়াটা কি রকম? *এবং ধর্মান্ পৃথক্*, ধর্ম মানে আত্মা, ঠিক সেই রকম যারা আত্মার পৃথকত্ব দেখে, অর্থাৎ আমার আত্মা আলাদা, তোমার আত্মা আলাদা, আমি তুমি সবাই আলাদা আলাদা এই রকম যারা দেখছে, এই যে স্বতন্ত্র দেখছে, নানাত্ব যারা দেখছে, এটাও অস্তিত্ব বটেই কোন সন্দেহ নেই, মানুষ যে নানা

রকমের কর্ম আর কর্মফলের পেছনে যেতে থাকে, দুর্গম পাহাড়ে সমুদ্রের জল যেমন হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনি এই ধরণের মানুষ অস্তিত্বের যে দুর্গ তার মধ্যে হারিয়ে যায়। কর্ম, কর্ম প্রবাহ, কর্মের ফল এসবের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে, এর থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না।

মানুষ যখন দেখে আমি আলাদা, তুমি আলাদা, সে আলাদা তখন সে ধীরে ধীরে নিজের নিজের ধর্মের অনুসরণ করতে শুরু করে। তখন ভাবে আমি শরীর, আমার শরীর মানে আমারই শরীর, আমার মন আমারই মন, তোমার খেলে আমার পেট ভরবে না। তোমার দুটি টাকা হলে আমার অভাব মোচন হবে না। তার মানে সে নানাত্ব দেখছে। শরীর সবাইকেই চালাতে হবে সেখানে কেউ আপত্তি করছে না, কারণ শরীর যদি না চলে কোন দিন একত্বে পৌঁছাতে পারবে নে। কিন্তু তাই বলে শরীর চালনাটাই সত্য বলে মনে করা যাবে না, শরীর চালাতে গিয়ে মনে করছে আমার প্রয়োজন মিটে গেলেই হল, এরা তখন পর্বতের জলের মত হারিয়ে যাবে। এখানে যাদের ভেদদৃষ্টি আছে তাদের নিন্দা করা হচ্ছে। কিন্তু অভেদ দৃষ্টি তো কারুর এক দিনে আসে না, অনেক লড়াই অনেক তপস্যা করতে হয়। কেউ বলছেন ধ্যানের মাধ্যমে আমি পবিত্র হতে চাই, কেউ বলছেন ধ্যানের মাধ্যমে আমি মনকে একাগ্র করতে চাই, কেউ বলছেন ধ্যান করে আমি সুখ-দুঃখের পারে যেতে চাই, এগুলো সবই বিভিন্ন ধর্মকে অনুসরণ করা। তার কারণ সবাই দুটো জিনিষকে আলাদা দেখছে, সাংসারিক জীবন একটা আর আধ্যাত্মিক জীবন আরেকটা। অপরের জীবনের কথা ছেড়ে দিন, এদের নিজেদের জীবনেই নানাত্ব এসে যাচ্ছে। সকালে জীবন এক রকম, বিকেলে অন্য রকম জীবন, মন্দিরের বাইরে জীবন এক রকম আর মন্দিরের ভেতরে জীবন অন্য রকম। ঠাকুরঘরে বসে যখন ধ্যান করছি তখন আমার জীবন এক রকম, ঠাকুরঘরের বাইরে এসে জীবনটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। এরাই নানাত্ব দর্শি। এই নানাত্বকে যারা অনুসরণ করে তাদের জীবন ঠিক সেভাবেই নষ্ট হয় যেভাবে দুর্গম পাহাড়ে বৃষ্টির জল নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু যেদিন সে তার অস্তিত্বকে মাথায় রেখে চিন্তা করতে শুরু করল, জগতে নানাত্বই আছে কিন্তু শাস্ত্র অন্য কথা বলছে, গুরুজন অন্য রকম বলছেন এবার আমি একত্বের দিকে যাব। এর প্রথম যে লড়াইটা শুরু হয় সেই লড়াই খুবই কঠিন ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে মূল স্রোতের দিকে সে চলতে শুরু করে। মূল স্রোতের সাথে যেতে যেতে যখন সে সমুদ্রের কাছে চলে আসে তখন সেই অস্তিত্ব, একমাত্র যে সত্তা, সেই সত্তার সাথে এক হয়ে যায়। তখন তার সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়ে যায়, কারণ সে বৃহতের সাথে এক হয়ে গেছে। এতদিন সে অণুর সাথে এক ছিল। যে লঘুর সাথে নিজেকে এক দেখে সে নানাত্ব দেখে, নানাত্বকে দেখতে দেখতে তার জীবন কাহিনী বিয়োগান্তক কাহিনীতে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু নানাত্ব থেকে সরে এসে যদি সে একত্বের দিকে মুখ ফেরায় তবেই তার জীবনের সার্থকতা আসে। এই জিনিষগুলোকে একটু গভীর ভাবে ধারণা করা আর এখন যেভাবে জীবন চলছে, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে মন দিয়ে একটু পর্যবেক্ষণ করতে পারলে আমাদের জীবন অনেকটাই পাল্টাতে শুরু করবে। কারণ মানুষের জীবনে যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, শোক-মোহ সব কিছুর মূলে এই নানাত্ব দর্শন। উপনিষদের ঋষিরাও মানছেন মানুষের মধ্যে নানাত্ব বোধ আছে, মানুষ অসহায় তারা এই নানাত্ব বোধ নিয়েই জন্ম নিয়েছে। কিন্তু ঋষিরা বলছেন, ওখান থেকেই তোমার সত্তাকে ধরে ধীরে ধীরে সর্বব্যাপী যে একত্ব রয়েছে সেদিকে এগিয়ে নিয়ে যাও। যদি না যাও তোমার কাহিনী শেষ। কাহিনী শেষ মানে, ওর মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকবে, জন্মাবে মরবে, *মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি*।

ভগবানের নাম সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দের সৎ মানে অস্তিত্ব, অস্তিত্ব মানে যেটা আছে। এই অস্তিত্বের দুটি রূপ – একটি একত্ব আরেকটি নানাত্ব। Unified Existence এটাই বাস্তব। নানাত্বই আমাদের চোখে পড়ে। যারাই নানাত্ব ধর্মের অনুসরণ করে তাদেরই ভোগ বৃত্তি থাকে, ভোগ বৃত্তি থাকলে কর্মে প্রবৃত্তিও থাকবে। যাদেরই একত্ব এসে যায় তাদের আর ভোগ বৃত্তি থাকে না, কর্মে প্রবৃত্তিও থাকে না। প্রতিবেশী একটা নতুন বাড়ি বানাচ্ছে, প্রতিবেশীর নতুন বাড়ি দেখে আমার মনে হল আমি কিসের কম, আমিও টাকা আয় করতে পারলে আমারও নতুন বাড়ি হবে। এবার আমি টাকা আয় করতে নেমে গেলাম। আমি আলাদা আমার প্রতিবেশী আলাদা। আমার ছেলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছে। কই আমি তো বলছি না, আমিও যদি ভালো করে পড়াশোনা করি আমিও ওর থেকে বেশি নম্বর পাব। কেন বলছি না? কারণ আমি আর আমার ছেলের মধ্যে একত্ব আছে, যে একত্ব আমি আর আমার প্রতিবেশীর মধ্যে নেই। ছেলের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে

হবে, ছেলের উপর আমাকে জয়ী হতে হবে, এই ভাব একত্বে থাকবে না। নানাত্বর ভাব যেমনি এসে যায় তখন মনে হবে ওর আছে আমাকেও পেতে হবে। ওর সব কিছু ভালো যাচ্ছে, মা কালীর কাছে একটা পূজো দিতে হবে যাতে ওর ভালো সব কিছু নাশ হয়ে যায়। শুধু এই নানাত্বের জন্য কত কষ্ট! আমরা কেউই এমন কিছু মহাপুরুষ হয়ে যাইনি যে একদিনেই নানাত্বের ভাব পুরোপুরি চলে যাবে। কিন্তু কোথাও তো চেষ্টাটা শুরু করতে হবে। যখন বলছেন *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ*, ধারাকে এবার বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে হবে, তার মানে কোন একটা দিন থেকে আমাকে এই শুরুটা করতে হবে। নানাত্ব যত বাড়ছে ঝামেলাও তত বাড়ছে। বাড়ছে তো কি করা যাবে! কোথাও একটা শুরু করতে হয়। আমাদের কাছে সাংসারিক জীবন একটা, আধ্যাত্মিক জীবন আরেকটা, এভাবে শুরু হয় না। *যদেবেহ তদমুত্র*, বলতে চাইছেন কার্য ব্রহ্ম আর কারণ ব্রহ্মে কোন তফাৎ নেই। সংসার কোন ভাবেই তাঁর থেকে আলাদা নয়, সংসার তাঁরই বিস্তার, তাঁরই রূপ, আর তাঁর যে শুদ্ধ বিষ্ণু রূপ সেটাও তাঁর। সংসার আলাদা তিনি আলাদা, এই ভুল ধারণা আমাদের জন্মজাত, জন্মজাত না হলে উপনিষদে কেন বলতে যেতেন! আরও ভুল ধারণা এসে গেছে ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে। এদের ধর্মে ভগবান আলাদা তাঁর সৃষ্টি আলাদা। আমাদের তা নয়, আমাদের হল একত্ব। যিনি একত্ব পেতে চান তাঁকে এখান থেকেই শুরু করতে হয়। যদি এদিকে না হয় তাহলে ওদিকেও কোন দিন হবে না।

যারা শুধু নানাত্বকেই দেখে, আমি আলাদা তুমি আলাদা, আলাদা দেখতে দেখতে মন তার এমনই সংকীর্ণ হয়ে যায়, যাকে খুব আপন মনে করছে, দুদিন পরে তাকেও আলাদা মনে করে দূরে ঠেলে দেয়। হিটলারের তাই হল, প্রথমে তারা নিজেদের শুদ্ধ আর্য মনে করতে শুরু করল, তারপর বলল জুহুদিরা আলাদা আমরা আলাদা। তারপর জুহুদিদের শেষ করতে শুরু করল। সেখান থেকে শুরু হল আমরা আলাদা কম্যুনিস্টরা আলাদা, এবার কম্যুনিস্টদের মারতে শুরু করল। এই করে করে তারপর এই দেশ সেই দেশকে আক্রমণ করতে শুরু করল। তারপর হিটলার নিজেই নাশ হয়ে গেল। নানাত্ব ধর্মকে যারা অনুসরণ করে তারা এভাবেই নাশ হয়, নানাত্বের অনুশীলনে নাশ হতেই হবে। এগুলোকে ধারণা করতে হবে, একটু যদি জীবনে নামানোর চেষ্টা না থাকে, তাহলে তার পাত্রতা কোন দিন বাড়বে না। পাত্রতা না বাড়লে এসব কথা শব্দ হয়েই থেকে যাবে। যখনই কোন জিনিষ আমরা পড়ছি বা শুনছি তখনও দুটো সত্তা চলে, একটা নানাত্বের ধর্ম চলে আরেকটা একত্বের ধর্ম চলে। যে কোন পরিস্থিতিতে, যেখানে আমরা কথাবার্তা বলছি সেখানেও দুটো সত্তা চলে, একটা সূক্ষ্ম সত্তা আরেকটা স্থূল সত্তা। সূক্ষ্ম সত্তাটাই একত্ব, স্থূল সত্তাই নানাত্বের সৃষ্টি করে। তাহলে কথা বলার সময় একত্ব আর নানাত্বটা কি? কথার মধ্যে যে শব্দগুলি রয়েছে এগুলো নানাত্ব আর শব্দের পেছনে যে ভাব বা বিচার রয়েছে সেটাই একত্ব। ভাব চলে সূক্ষ্ম স্তরে আর শব্দ চলে স্থূলে। আমাদের দুর্ভাগ্য হল আমরা সব সময়ই স্থূল জিনিষটাকেই ধরি। এই জিনিষটা ভালো বোঝা যায় দুজন বক্তা যখন ভাষণ দিচ্ছেন, একজন বক্তা গলার স্বর খুব চড়িয়ে প্রচুর দ্রুততার সাথে বলে যাচ্ছেন, আরেকজন বক্তা খুব নীচু স্বরে ধীরে ধীরে ভাষণ দিচ্ছেন। হাততালি সব সময় বেশি পড়বে প্রথম বক্তার বক্তৃতা দেওয়ার সময়। আমরা স্বভাবতই মুর্খদের দলে, মুর্খরা শব্দের দিকেই বেশি যায়, কিন্তু শব্দের পেছনে যে ভাব সমূহ রয়েছে সেই ভাবের পেছনে মুর্খরা কখনই যাবে না। উপনিষদ এখানে কতকগুলি ভাব আমাদের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, এই ভাবগুলিকে জীবনে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমাদের জীবন কেন গতানুগতিক ভাবে চলছে? কারণ আমরা ভাবগুলিকে নিচ্ছি না, সূক্ষ্মকে ছেড়ে স্থূলকেই গ্রহণ করি।

মন হল একটা জাল। জালের ফুটোগুলো যদি বড় হয় জালে বড় বড় মাছ ধরা পড়বে। কিন্তু চুনোপুটি ধরতে হলে জালের ছিদ্রগুলো আরও ক্ষুদ্র হতে হবে, মশারির নেটের মত হতে হবে। আমাদের ভেতরে মনের জালের ছিদ্র যদি সূক্ষ্ম না হয় তাহলে যে সূক্ষ্ম ভাবগুলি আমাদের ভেতরে আসছে সেগুলোকে আমরা ধরতে পারব না। বহির্জগতের শব্দরাশি, বড় বড় কথা ধরে নেব, সূক্ষ্ম জিনিষগুলি কোন দিন ধরতে পারব না। প্রচুর সাধন-ভজনের দ্বারা, অনুশীলন করে করে মনকে সূক্ষ্ম করতে হয়। দুটো জিনিষ একসাথে চলে, যেমন যেমন অনুশীলন করা হবে তেমন তেমন এগুলো ধরা পড়বে, যেমন যেমন ধরা পড়বে তেমন তেমন মন সূক্ষ্ম হতে থাকবে। উপনিষদ পড়া মানেই মনকে আগে সূক্ষ্ম করতে হবে। আগে বুঝতে হবে উপনিষদ আমাদের কি বলতে চাইছে। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে বিচার আনতে হয়, আমি যে এই কাজটা করলাম এই কাজের দ্বারা কি আমি নানাত্ব ধর্মকে অনুসরণ করলাম নাকি একত্বের অনুশীলন করলাম। প্রত্যেক পদে পদে আমাদের এই

বিচার করতে হবে। এইভাবে বিচার করতে করতে আমাদের ধারণা করার ক্ষমতাটাও বাড়বে। জীবনে যা কিছু শান্তি আসে, যা কিছু শক্তি আসে সব এই ভাব থেকেই আসে। যত এই ভাব আমাদের ভেতরে ঢুকবে আর যত এগুলোকে নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করব ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু হবে। তার আগে পর্যন্ত এগুলো সব শব্দ মাত্র হয়ে থেকে যাবে।

কঠোপনিষদ এই বল্লীতে নানাত্বের নিন্দা করছেন, নানাত্ব ধর্মের অনুসরণ করা মানে বারবার জন্মগ্রহণ করা। নানাত্ব মানে ভোগের দিকে যাওয়া। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো নানাত্ব ধর্মের অনুশীলন যারা করে তাদেরই হয়। চোখের জল পড়াটাও নানাত্ব। যেখানে একত্ব, *নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন*, সেখানে নানা বলে কিছু নেই। একত্বের অনুশীলন করার জন্য আমাদের ধ্যানও করতে হবে না। নদী, জল, পাহাড়ের উপমা আনা হয়েছে শুধু একত্ব জিনিষটাকে বোঝানর জন্য। বাড়িতে একটা ভালো জিনিষ নিয়ে এলে মা তার সন্তানকে দিয়ে দেয়, স্বামীকে যদি ভালোবাসে স্বামীকে দিয়ে দেয়। তখন তার এই বোধ হয় না যে, ওকে কেন দিয়ে দিলাম, আমি কেন খেলাম না, আমি কেন নিজের জন্য রাখলাম না। এই জিনিষটাই আবার পাড়াপ্রতিবেশী কাউকে দিতে যাবে না। তাও অনেকে দেয়, দেয় না তা নয়। আগেকার দিনে দিদিমা, ঠাকুরমারা এ আমার নাতি, ও আমার নাতি নয় অত বেশি তফাৎ করতেন না, গ্রামের সব বাচ্চাকেই নাতি মনে করতেন। বয়স হলে তাদের মধ্যে মাতৃত্বের ভাব বেড়ে যায়। একটা বাচ্চা ছেলে যদি কয়েকটা আম কুড়িয়ে পায় ওর কাছে চাইলে একটাও দেবে না। কিন্তু দিদিমা আম নিয়ে যাচ্ছে, হয়ত নিজের নাতির জন্যই নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ গ্রামের কোন বাচ্চা এসে বলল, দিদিমা আমাকে একটা আম দাও না, দিদিমা দিয়ে দেবে। তাতে তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে না। বাড়িতে গিয়েও বলবে, ওর জন্য আম নিয়ে আসছিলাম, অমুকের ছেলে চাইল আমি দিয়ে দিলাম। একত্বের দিকে যত যাবে তত শান্তি আসবে, ঈর্ষার ভাব, মদ, মোহের ভাব তত কমে যায়।

একত্ব ভাবের উপর কত কাহিনী ও সিনেমা আছে। একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে, ছেলেটির একটা খুব সুন্দর ঘড়ি আছে কিন্তু চেন নেই আর মেয়েটির চুল খুব সুন্দর কিন্তু চিরুনি নেই। ছেলেটি মেয়েটির জন্য একটা চিরুনি কিনছে আর মেয়েটি একটা চেন কিনছে। এদিকে ছেলেটি ঘড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে আর মেয়েটি চুল কাটিয়ে দিচ্ছে। এখানে এত ভালোবাসা যে নিজেকে সমর্পণ করে দিচ্ছে। যে মেয়েটি নিজের চুলকে এত বেশি ভালোবাসত সেই চুলই ত্যাগ করে দিল। এটাই একত্ব, এই একত্বই যখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে যায় তখন তাঁকে আমরা পরমহংস বলি। এটাই যখন নানাত্বে থেকে যায় তখন তার জীবনটা নানাত্বের জালে ছড়িয়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। নানাত্ব ধর্মের অনুসরণকারীদের দ্বারা কখনই জপ-ধ্যান করা কোন মতেই সম্ভব নয়। কারণ এদের মনের মধ্যে সব সময় চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্য মানেই নানাত্ব ধর্ম। নিজের সন্তান, নিজের পরিবারের বাইরে জগৎকে দেখতেই পায় না। এরাই যখন ভক্ত সম্মেলনে বা কোন ধ্যানের ক্লাশে যাচ্ছে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য নানাত্বটা থেমে যায়। অত লোকের মাঝখানে নানাত্বের নাশ মানে একটা ভালো অনুভব এসে গেছে, তখন তার মনে হচ্ছে কিছু একটা হল। এগুলো ধ্যানের জন্য হয় না, ধ্যানের জন্য বিরাট প্রস্তুতির দরকার, এই সংসারে থেকে সেই প্রস্তুতি আসা খুব কঠিন। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য নানাত্ব ভাবটা, সব কিছু আমার জীবনের জন্যই হবে এই ভাবটা থেমে যায়, এটাই তাকে একটা আনন্দের আভাস দেয়। ভক্ত সম্মেলন থেকে বেরিয়ে এসে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। উদ্দেশ্য হল নানাত্ব ধর্ম থেকে সরে আসা। আমাদের বিচিত্র যেসব ধারণা আছে, এই ধারণা দিয়েও চলে না। নানাত্বের নাশ না হলে, জ্ঞানযোগ হবে না, কর্মযোগ হবে না, রাজযোগ, ভক্তিযোগ কোন যোগই হবে না, বিয়োগ ছাড়া কিছুই হবে না। জীবনে একটা কিছু ডান দিক থেকে বাম দিক হয়ে গেলেই, ভালোবাসার একটা কিছু চলে গেলে আমরা চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি। কাম-বাসনার পুর্তির জন্য, নিজের অপূর্ণতার পুর্তির জন্য যে কর্ম করছে, সেই কর্মের জন্য এই কষ্ট। এই ধরণের মানসিকতার লোকেদের দ্বারা কখনই ধ্যান করা সম্ভব নয়। এদের দ্বারা পূজা-অর্চনা হবে, কারণ পূজা অর্চনার মধ্যে নানাত্বের ধর্ম আছে, সেখানে আমি আলাদা ঠাকুর আলাদা, ফুল আলাদা, চন্দন আলাদা, ঠকুরের ভোগ আলাদা। যে জায়গাতে নানাত্বের বেশি প্রকাশ সেই জায়গাতেই শিশু থেকে বয়স্ক সবারই ভোগের আনন্দ সব সময় বেশি হবে। উপনিষদের যে অধ্যায়গুলি যাচ্ছে, একটা জিনিষকে আঘাত করে যাচ্ছে। নানাত্ব যদি থাকে, আমি তুমির ভেদ যদি থাকে তাহলে তুমি শেষ।

শেষ মানে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যে স্থূল মৃত্যুকে জানি এখানে মৃত্যুকে সেই অর্থ বলছেন না, মৃত্যু মানে ঘোরতম অজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। সেখান থেকে সরে এসে তুমি যদি একত্বের দিকে যাও, তবেই তোমার বাঁচবার সম্ভবনা, এটাই এখানে বলতে চাইছেন। এই একত্ব জিনিষটা কি? এটাকে এবার পরের মন্ত্রে বলছেন –

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।।২/১/১৫।।

(হে গৌতম! নির্মল জল যদ্রূপ নির্মল জলে প্রক্ষিপ্ত হয়ে এক রসত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মননশীল ও একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মাও একত্ব প্রাপ্ত হন।)

এই মন্ত্রটি কঠোপনিষদের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। আধ্যাত্মিক জীবনের সত্যকে খুব সুন্দর ভাবে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গৌতম বংশের তাই গৌতম নামে সম্বোধন করে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, হে গৌতম! এর আগে বলা হল পৃথক ধর্মের অনুসরণ যারা করে, অস্তিত্বের নানাত্বকে নিয়ে যারা পড়ে আছে এদের জীবন অজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে থাকে। জীবনের যা কিছুকে শুভ গুণ বলা হয়, যে মূল্যবোধ ও শুভ গুণকে অনুসরণ করে মানুষ মহৎ হয়, গান্ধীজী যেমন বললেন আমি অহিংসাকে অনুসরণ করব। গান্ধীজী নতুন কিছু কথা বলছেন না, অহিংসা ভাব হিন্দুদের মানসিকতায় প্রথম দিন থেকে চলে আসছে। আমরা কেন হিংসা করি না? আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ করেছে। অন্যান্য ধর্মে বলছে আমাদের ঈশ্বরের সাথে যারা আছে তারা আমার ভাই, আমাদের ঈশ্বরের সাথে যারা নেই তারা আমার দুষমন তাদের গলা কেটে দাও। তাদের ধর্মগ্রন্থও বলছে তুমি হিংসা কর। আমেরিকাতে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বললেন, either you are with us or against us, এই লড়াইয়ে হয় তুমি আমার সাথে আছে আর তা নাহলে তুমি আমার বিরুদ্ধে আছ। কিন্তু এর একটা তৃতীয়ও তো হতে পারে, হতে পারে তুমি আমার সাথে নেই কিন্তু তুমি আমার বিরুদ্ধেও নও, আমরা এক। অহিংসা মানেই তাই। আমার একটা একত্ব বোধ, যেখানে আমার নিজেরও একটা স্থান আছে আর তোমারও একটা নিজের স্থান আছে, আমি সেইজন্য হিংসা করব না।

এত যে মূল্যবোধের কথা বলা হয়, এগুলোকে নিয়ে আমরা কখন ভাবি না বা বিচার করি না। আমরা শব্দ দিয়ে যাই আমরা কখন বিচার দিয়ে যাই না। যেমন বলা হয় সন্ন্যাসী বিয়েথা করবে না। কেন বলা হচ্ছে সন্ন্যাসী বিয়েথা করবে না? প্রথম অধ্যায়ে কঠোপনিষদেই একটি মন্ত্রে বলছেন *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, যেটাকে পাওয়ার ইচ্ছা করে মানুষ ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে। মানুষ যে বিয়ে করে সে কেন বিয়ে করছে? বলে, আমি একত্ব পালন করতে চাইছি কিন্তু সবাইকে নিয়ে একত্ব পালন করার মত আমার দম নেই, একটা জায়গায় আমি মেনে নিচ্ছি, তার বাইরে যারা আছে সবাই আমার মাতৃবৎ ভগিনীবৎ। সে বলেই দিচ্ছে একটা জায়গায় আমি দুর্বল, আমি পারছি না, আমার দুর্বলতা এই একটি মেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এর বাইরে সব মেয়েই আমার মাতৃবৎ, ভগিনীবৎ, কন্যাবৎ। কিন্তু সন্ন্যাসীকে বলে দেওয়া হচ্ছে তুমি একত্বকেই শুধু দেখবে। সেইজন্য কেবলমাত্র নিজের জন্য কিছু থাকবে এটা তোমার চলবে না। শুধু নারীই নয়, কোন ব্যাপারেই সন্ন্যাসীর নিজের বলতে কিছু থাকবে না, সম্পত্তিও তার থাকবে না। দেহ ধারণ করতে গিয়ে দেহ এসে গেছে কিন্তু দেহের প্রতি তাঁর কোন মমতা থাকবে না। জীবনের প্রতিও সন্ন্যাসীর কোন মমতা থাকে না আর আমি মরে গেলে ভালো হয় এই মানসিকতাও থাকে না। সন্ন্যাসীর কি থাকে? একত্বই থাকে। সেইজন্য সন্ন্যাসী বিয়ে করবে না, একত্ব তাঁকে বিয়ের অনুমতি দেবে না। ঠাকুর কৌপিন কে ওয়াস্তের গল্প বলছেন, একটা কৌপিনের জন্য সাধু কিভাবে শেষ হয়ে গেল। এগুলো কাহিনী, জীবন এভাবে চলে না, বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। এখানে সন্ন্যাসী জিনিষগুলিকে নিজের জন্য নিতে শুরু করেছেন। ইঁদুর কৌপিন কেটে দিচ্ছিল, ইঁদুরকে মারবার জন্য বেড়াল রাখলেন। বেড়ালকে নিজের জন্য রেখেছে বলে বেড়ালের দায়ীত্বও তার কাঁধে চেপে গেল, এবার গরু রাখতে হবে, মেয়েও রাখতে হবে।

আমাদের যত রকম মূল্যবোধ আছে, সত্য, অহিংসাদি সব মূল্যবোধের পেছনে একটা নীতি অবশ্যই থাকতে হবে। আমি কেন সত্য কথা বলব? এখানেও সেই একই নীতি, একত্ব। মিথ্যে কথা বলা মানেই নানাত্ব। আমি আলাদা তুমি আলাদা, আমাকে তোমার থেকে বাঁচতে হবে। আমি যদি সত্য গোপন না করি

তুমি আমাকে শেষ করে দেবে বা তোমাকে ভালোবাসি সত্য কথা বললে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পার। এই যে নানাত্বের ধর্মকে অনুসরণ করছি সেইজন্য আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে। কিন্তু একত্ব হলে কি হয়? ঈশাবাস্যোপনিষদে আর কঠোপনিষদেও কয়েকবার বলা হয়েছে *ন ততো বিজুগুপ্সতে*, গোপন করার ইচ্ছা চলে যায়। যার একত্ব বোধ হয়ে গেছে সে কার থেকে কি লুকাতে যাবে। আমরা লুকাই কেন? কারণ আমার কাছে আমার জীবনের দাম সব থেকে বেশি। আর আমি জানি আমি আলাদা আপনি আলাদা, এখানেই তো নানাত্ব এসে গেল। এই নানাত্ব এসে যাচ্ছে বলে আমাকে অনেক কিছু লুকোতে হচ্ছে। লুকোনর মধ্যে সত্যকে গোপন করাও এসে যায়, টাকা গোপন করা সেটাও এসে যায়, নিজের স্ত্রী নিজের তাই জগৎ থেকে তাকে আড়াল করা সেটাও এসে যায়। যত রকম গোলমাল করছে, সেগুলোকেও গোপন রাখতে হচ্ছে। কারণ সে জানে আমার অস্তিত্ব তোমার থেকে আলাদা। কিন্তু যেখানে একত্ব, মা ছেলেকে বলে তোমার থেকে আমার লুকোবার কিছু নেই, কারণ আমি আর তুমি এক। স্বামী স্ত্রীকে বলে আমরা দুজন এক, আমাদের মধ্যে লুকোবার কিছু নেই। তাও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক লুকোচুরি চলে, কারণ সে জানে আমার আর তোমার আলাদা অস্তিত্ব।

যিনি ঠিক ঠিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনি ভগবান। ঠাকুর বলছেন সত্যই কলির তপস্যা, কারণ যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত সে নানাত্বকে ছেড়ে দিয়েছে। যে নানাত্বকে ছেড়ে দিয়েছে তার একত্ব এসে গেছে, একত্বই ভগবান। অন্য দিকে কলিযুগ এমনই দুর্বিষহ যে এখানে নানাত্বের অনুশীলন না করলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। কলিযুগে সত্যি কথা বললে কেউই সম্মান দেবে না। কিন্তু তাকে রক্ষা করবেন ঠাকুর নিজে। কারণ তিনি সত্য স্বরূপ। সেইজন্য সত্যই কলির তপস্যা। মানুষ যখন বলে তোমার উপর আমি আর নির্ভর করব না, ঠাকুরের উপরেই আমি নির্ভর করব, তখনই তার তপস্যা শুরু হয়ে গেল। সত্য কথা বললে সমাজ তাকে পিষতে শুরু করবে। আগেকার দিনে এই পরিস্থিতি ছিল না, রাজা বলে দিলেন তুমি সত্য কথা বললে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই যুগে সত্য কথা বললে ফাঁসি হয়ে যাবে। সেইজন্য সবাই মিথ্যা কথাই বলে যাচ্ছে। মানুষ কোন পরিস্থিতিতে বলে আমি সত্য কথা বলব? যখন দেখে কোন বিপদের সম্ভবনা নেই তখনই সে সত্যি কথা বলে। আর দ্বিতীয়, অপরের দিকে আঙুল তোলার সময় আমরা সত্যি কথা বলি, কাউকে ছোট করতে হলে সত্যি কথা বলি। কিন্তু যখন বলছে আমি সর্ব অবস্থায় সত্যি কথা বলব তখন সে একত্বের অনুশীলন করতে আরম্ভ করল। অথচ মহাভারতে বলছেন, কারুর প্রাণ রক্ষা করতে হলে তোমাকে অবশ্যই মিথ্যা কথা বলতে হবে। কেন বলছেন? এখানেও সেই একত্বের ভাব, একজনের জীবন নাশ হতে যাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন অমূল্য, অহিংসাকে এখানে সত্যের থেকে বেশি মূল্য দেওয়া হচ্ছে। অহিংসাও একত্ব, ঘুরে ফিরে সেই একত্বে আসছে। কিন্তু একত্বের কোথাও কোথাও সংঘাত হওয়ার সম্ভবনা থাকে, কারণ নানাত্ব অনেক বেশি কিনা। ওখানে নিজেকেই ঠিক করে নিতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত বা কোন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তাঁকে ঈশ্বর সাহায্য করেন। কোন কিছুতে প্রতিষ্ঠিত থাকা মানেই একত্বে প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের নাম সচ্চিদানন্দ, এটাই তাঁর স্বরূপ। সচ্চিদানন্দ বলতে সৎ চিৎ আর আনন্দ, এই তিনটের একটাকে নিয়ে যদি কেউ থাকেন ভগবান তাঁকে কখনই ছেড়ে যাবেন না, কারণ এটাই ভগবানের স্বরূপ।

সৎ মানে অস্তিত্ব, সব রকম সত্তাকে আমাদের সম্মান দিতে হবে। একটা পিঁপড়ের যে সত্তা, সেই সত্তাকেও সম্মান দিতে হবে। সৎ থেকেই সত্য হয়, জীবনের যেমন একটা সত্তা আছে তেমনি শব্দেরও একটা সত্তা আছে, তাই মিথ্যা কথা বলা চলবে না, কারণ শব্দের সত্তা হল সত্য। চিৎ মানে চৈতন্য। আমি যদি বলি আমি আমার বুদ্ধির বিকাশে, জ্ঞানের বিকাশে নিজেকে সমর্পিত করলাম, জ্ঞান ছাড়া জীবনে আমার আর কিছু চাই না, এটাই ভগবানেরই রূপ। গরম হোক, বর্ষা হোক, শীত হোক জ্ঞান সাধনা আমি ছাড়ব না। আর আনন্দ, কোন পরিস্থিতিতেই আমার ভেতরে কোন ধরণের শোক আসতে দেব না, আমার নিরানন্দের ভাব কখন আসবে না, কারণ এটাই ভগবানের স্বরূপ। সত্যি কথা ছাড়ব না, জ্ঞান সাধনা ছাড়ব না আর আমার আনন্দ স্বরূপকে ছাড়ব না, এই তিনটের মধ্যে কোন একটাকে আমি ধরে রাখব, এটাই সাধনা, এছাড়া অন্য কোন কিছুর সাধনা হয় না। জ্ঞান সাধনা করছে তার মানে সে অদ্বৈত বেদান্তের সাধনা করছে, কারণ তার অজ্ঞান খসে পড়ে যাবে। আনন্দের সাধনা যখন করছে তখন সে ভক্তির সাধনা করছে। কারণ ভক্ত কখনই নিরানন্দ হয় না। আর সত্য সাধন যখন করছে তখন কর্মযোগের সাধন করছে। কারণ কর্ম মানেই পাঁচজনকে নিয়ে চলা, পাঁচজন থাকলে সেখানে সত্যি মিথ্যা সবই হবে। এই তিনটের একটাকে যে ধরে নেবে, আমি

এটাকে নিয়েই চলছি, এবার বুঝে নিতে হবে সে ভগবানের সাথে এক হতে চলেছে। ভগবান সর্বত্র সমান ভাবে বিরাজ করে আছেন, তিনিই আছেন। এই নানাত্ব থেকে যখন একত্বের দিকে যাত্রা শুরু করল তখন সে কি পথ অবলম্বন করবে? ভগবানের পথই অবলম্বন করতে হবে। ভগবান সেই সৎ, সেই চিৎ, সেই আনন্দ, এই তিনটের কোন একটাকে যদি ধরে নেয়, এবার তাকে নানাত্ব থেকে ধীরে ধীরে একত্বের দিকে নিয়ে যাবে। ছেলের ভালো হলে মায়ের আনন্দ। পাড়া প্রতিবেশীর কিছু ভালো হলে আপনার আমার কখনই আনন্দ হয় না, কারণ সে আলাদা আমি আলাদা। আনন্দ তখনই হতে পারে যখন কেউ একত্বের অস্তিত্বকে অনুশীলন করছে। তখন জগতে যার যেখানে যাতে আনন্দ হবে তারও তাতে আনন্দ হবে। কিন্তু যার মধ্যে বহুত্ব বা নানাত্ব থাকে তার কোন দিন আনন্দ হবে না। গোমড়া মুখ কার থাকে? যে জানছে আমি আলাদা সে আলাদা। তার ভালো হলে আমার কষ্ট তার মন্দ হলে আমার আনন্দ।

সত্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে মনে করছি নিজেকে বাঁচাতে হবে, অপরের থেকে নিজেকে বড় করে তুলে ধরতে হবে। এর বিপরীত যারা চলে, যারা একত্বের দিকে যেতে শুরু করে তখন *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ*, যেখানে তার অস্তিত্ব, যেটা তার উৎস, সেদিকে যেতে শুরু করে। উৎসের দিকে যেতে শুরু হলে কি হয়? ঠাকুর বলছেন যোগীরা বলে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন, যোগীরা দেখেন সে এক আর তিনি বিরাট, সেই বিরাটের সাথে এক হয়ে গেল। ভক্তিতে বলে ভক্ত আর ভগবানের মিলন। বেদান্তে বলে জীবব্রহ্মৈক্য, সব একই কথা। তিনটেতে সেই একই জিনিষ হয়, নানাত্ব থেকে একত্বে চলে যায়। একত্বে চলে গিয়ে কি হয়? ঠাকুর বলছেন আমিত্বের নাশ, কাঁচা আমি পাকা আমি হয়ে যায়। বহুত্বটাই কাঁচা আমি। যতক্ষণ এই বোধ আমি আছি তিনি আছেন তখনও কিন্তু নানাত্ব আছ। উপনিষদে নানাত্বের কোন অনুমতি নেই। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এই ধরণের মুক্তিকে বেদান্ত মানে না। বেদান্ত একটাই মুক্তি মানে, যেখানে আমিত্বের সম্পূর্ণ নাশ।

সেইজন্য বলছেন *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, এই গ্লাশে শুদ্ধ জল আছে, আরেকটি গ্লাশে ঠিক একই শুদ্ধ জল আছে। দুটো জলকে এবার মিশিয়ে দেওয়া হল। এখন কি হবে? দুটো গ্লাশের আলাদা আলাদা যে দুটো সত্তা ছিল, সেই সত্তা শেষ হয়ে গেল। আমরা যেন এক একটা পাথরের মুর্তি, এমনি পাথর নয়, একেবারে গ্রানাইট পাথরের। এই পাথরের মুর্তিকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হল। তাতে কি হবে? যেমন পাথর ছিল তেমনই থাকবে। হাজার বছর হোক, দশ হাজার বছর হোক যেমন পাথরের মুর্তি ছিল তেমন পাথরের মুর্তিই থাকবে। এবার প্রার্থনা করে সাধনা করে যে করেই হোক ঐ পাথরের মুর্তিটা আরেকটু নরম পাথর, বেলে পাথরের মুর্তিতে এসে গেল, তখন জল যেন একটু একটু ঢুকছে। সেখান থেকে আরও সাধনা করে করে ওটাকে কাঠের মুর্তি বানিয়ে দেওয়া হল, জল এবার আরও বেশি ঢুকবে। সেই অবস্থা থেকে প্রার্থনা করে করে ঐ মুর্তিটা এবার স্পঞ্জের মুর্তি হয়ে গেল। স্পঞ্জ আলাদা জল আলাদা, কিন্তু স্পঞ্জকে সমুদ্র থেকে তুলে একটু ঝাড়া দিলে ঝর ঝর করে জল ঝরতে থাকবে। যেমন স্বামীজী, স্পঞ্জের মুর্তি সমুদ্রে ডুবে আছেন, একবার করে একটু উঠে নিজেকে ঝাড়া দিচ্ছেন আর Complete Works আমাদের কাছে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তারপরে আরেকটা ধাপ আছে, যেখানে মুর্তিটা নুনের মুর্তি হয়ে গেছে। এবার সমুদ্রে নেমে গেলে কি হবে? সমুদ্রের জলে মিশে গেল। ঠাকুর বলছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, কিন্তু আর খপর দিতে পারল না। সমুদ্রে মিশে এক হয়ে গেল।

এটা যেমন একটা উপমা, *শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং* এটাও আরেকটি উপমা, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশিয়ে দেওয়া হল। যে জলটা মেশান হল সেই জলটা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি জলের সাথে জলের একাত্ম হয়ে গেল। আগের উপমাতে যেমন বলা হল, পাহাড়ের দুর্গম জায়গায় একটু জল ছিল, সেই জল এখন প্রার্থনা করছে আমি যেন বৃহতের দিকে যেতে পারি। তখন সে একটা ধারা হয়ে নেমে এই ধারা সেই ধারার সাথে মিশে একটা নদীকে ধরে এবার সমুদ্রে মিশে গেল, তারা অস্তিত্ব সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল। অস্তিত্ব কোথাও বিলীন হয়ে যায়নি, যে জল থেকে বাষ্প হয়ে পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়েছিল, সে এখন সেই জলের সাথে একাত্ম বোধে চলে গেল। গ্লাশের শুদ্ধ জলে একটা লোহার টুকরো ফেলে দিলে আলাদা হয়েই থাকবে।

ঘোলা জল দিলে ঘোলাটে ভাব দেখাবে, নীল রঙের, হলুদ রঙের জল দিলে সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তার অস্তিত্ব যেমন ছিল তেমনই থাকবে। কিন্তু শুদ্ধ জল দিলে এক হয়ে যাবে।

এবং মুনের্বিজানতা আত্মা ভবতি গৌতম, মননশীল পুরুষ, যাঁরা চিন্তন করেন এখানে তাঁদের কথা বলছেন। শুধু ধ্যান করলে কি হবে, ধ্যান করার জন্য মনন দরকার। চিন্তন করে করে এখনও মন শুদ্ধ হয়নি, এখনও পাথরের মুর্তি হয়ে আছে। পাথরের মুর্তি সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকলেও কিছুই হবে না, যেমন পাথর তেমন পাথরই থাকবে। কাঠের মুর্তি যদি হয়ে যায়, এবার সচ্চিদানন্দ সাগেরর জল তাতে একটু ধরেছে। ঠিক ঠিক ভক্ত যখন ঈশ্বরের ভক্তি সাগরে ডুবে যান তাঁরা অনেক নরম হয়ে যান। যাঁরা আচার্য পুরুষ তাঁরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী বিতরণ করেন। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক মননশীল, জগতের ভালো কিছু করার দরকার তাঁর নেই, তিনি সব সময় মনন রাজ্যে ডুবে থাকতে চান। যেমন স্বামীজীকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন তুই কি চাস, স্বামীজী বলছেন আমি সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকতে চাই। ঠাকুর স্বামীজীকে আদেশ দিচ্ছেন, তোকে এই কাজ করতে হবে। কিন্তু যিনি নুনের পুত্তলিকা হয়ে গেছেন, তিনি ওখানেই শেষ।

আচার্য এখানে নিজের তরফ থেকে শুধু যাঁরা ভক্ত, যাঁরা উপনিষদের অনুগামী তাঁদের জন্য বলছেন, *তস্মাৎ কুতার্কিক-ভেদদৃষ্টিং নাস্তিককুদৃষ্টিঞ্চ উজ্ঝিত্বা*। কুতর্কি যারা তাদের ভেদ দৃষ্টি। আর নাস্তিক, এদের কুদৃষ্টি, কুদৃষ্টি মানে জিনিষটাকে সঠিক ভাবে জানে না। বুদ্ধিতে অল্প অল্প যা চিন্তা-ভাবনা এসেছে সেটাকেই এরা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। আচার্য বলছেন, এখানে এদের সব কথাকে খণ্ডন করে দেওয়া হয়েছে। খণ্ডন করে দেওয়ার পর আচার্য এবার নিজে বলছেন, বেদ, উপনিষদ হল *মাতাপিতৃ-সহস্রেভ্যোহপি হিতৈষিণা*। সন্তানের সব থেকে বড় হিতৈষী বাবা-মা, বাবা হিতৈষী, মা আরও বেশি হিতৈষী। বাবা-মা হিতৈষী, কিন্তু শাস্ত্র হাজার জন বাবা-মার থেকে বেশি হিতৈষী। মনুস্মৃতিতে বলছেন, মা সবার থেকে গৌরবশালিনী, যে আচার্য উপদেশ দেন, যে বাবা উপদেশ দেন মা এদের থেকেও অনেক উপরে। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক উপদেশ দিচ্ছেন তিনি মায়ের থেকে হাজার গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ। ঠাকুরও বলছেন, ধর্ম পথে যেতে যে মা বাধা দেয় সেই মাকে ত্যাগ করে দিতে হয়। অধ্যাত্মই একমাত্র স্থান যেখানে কোন নিয়ম চলে না। মনু বলছেন, পরিবারের স্বার্থে একজনকে ত্যাগ কর, গ্রামের স্বার্থে একটা পরিবারকে ত্যাগ করবে আর একটা জেলার স্বার্থে একটা গ্রামকে ত্যাগ করতে হবে, এই করে করে শেষে বলছেন, আত্মার স্বার্থে সব কিছুকে ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগের প্রশ্নে ছোট থেকে বড়তে যেতে যেতে শেষে বলছেন, আত্মার্থে, আত্মজ্ঞানের জন্য, নিজের জন্য না, আত্মজ্ঞানের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করতে হয়। আত্মজ্ঞান সবার উপরে, মা, বাবা, আচার্য সবার উপরে, আত্মজ্ঞানের সাথে কারও তুলনা করা চলবে না। আচার্য শঙ্কর বলছেন সহস্র মা-বাবা, মানে এই জগতে কোন কিছু নেই যেটাকে হাজার হাজার গুণ যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাও উপনিষদ বা শাস্ত্রের সমকক্ষ হবে না। মা-বাবা সন্তানের জীবন দিচ্ছে, তার রক্ষণা-বেক্ষণ করছে কিন্তু উপনিষদ তাকে জন্মমৃত্যুর পারে নিয়ে চলে যাচ্ছে, চিরদিনের জন্য তার মঙ্গল সাধন করে দিচ্ছে। একদিনের জন্য কেউ আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। এক মাসের জন্য করলে আরও বেশি কৃতজ্ঞ থাকব, বছরের জন্য করলে আরও বেশি, সারা জীবনের জন্য করে দিলে আরও বেশি কৃতজ্ঞ থাকব। যে অস্তিত্বের জন্য এই খাওয়া-পড়া উপনিষদ আমাদের সেই অস্তিত্বের পারেই নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যারা নাস্তিক তারা বলছে এই জগতের বাইরে কিছু নেই। যারা কুতার্কিক, যারা বুদ্ধি দিয়ে নানান রকম তর্ক করে যাচ্ছে, বলছেন, এরা যা বলছে এগুলো কিছু না, এদের সব কথার উত্তর বিভিন্ন শাস্ত্রে দেওয়া হয়ে গেছে। এদের কথায় তুমি বিভ্রান্ত হবে না, যেটা গুরুত্ব সেটাকে ধরে থাক। গুরুত্ব কার, আমার যে হিতৈষী আমি তার কথাই শুনব। জগতে আমরা যাদের দেখছি, মন্ত্রি, নেতা যেই হোক এরা কি আমার হিতৈষী? তাহলে এদের কথা আমি কেন শুনতে যাব! বিজ্ঞান মঞ্চের যারা বলছে ধর্মের সব কথা ভুল। তুমি যা বলছ ঠিক বলছ মানছি। কিন্তু তার আগে বলতো তুমি কি আমার হিতৈষী, তুমি কি আমার হিত চাও? কিন্তু আমার হিতৈষী কে? আমার মা। কেন মা আমার হিতৈষী? যদি কাল এমন কোন পরিস্থিতি হয়ে যায়, মা একটাই রুটি কোন রকমে জোগার করতে পারল, সেই রুটি মা আমাকেই খাইয়ে নিজে অভুক্ত হয়ে শুয়ে পড়বে। একেই বলে হিতৈষী। ঋষিরা আমাদের হিতৈষী, ঋষিরা আমাদের জানেন না, চেনেন না। কিন্তু তাঁরা আমাদের জন্য সাধনা করে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেনও না দেড়শ বছর পর কে আসবে। কিন্তু তিনি নিজেকে সাধনার মধ্যে ঢেলে দিলেন। স্বামীজী জানেনও না ভারতবর্ষে কে আছে কে নেই, কিন্তু

ঘরবাড়ি সব কিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্য। সেখানে স্বামীজীর এই উদ্দেশ্য ছিল না যে রামকৃষ্ণ মিশনের মঙ্গল হোক, তাঁর নামযশ হোক, ঠাকুরের নাম হোক। দেশের নেতারাও দেশবাসীকে বলে যাচ্ছে তোমরা দেশের স্বার্থে কাজ কর, কিন্তু লাভের গুড় পুরোটাই নিজেরা খাচ্ছে।

ঠাকুর গল্প বলছেন, একজন রোগী বৈদ্যের কাছে গেছে। রোগীকে দেখার পর দুদিন পরে আসতে বলল। দুদিন পরে রোগী যাওয়ার পর বৈদ্য তাকে বলে দিল, দেখো ভাই তুমি কিন্তু গুড় খেও না। রোগী চলে যাওয়ার পর একজন জিজ্ঞেস করছে, আপনি সেদিনই বলে দিলে পারতেন, আজ আর এত দূর কষ্ট করে আসতে হত না। তখন বৈদ্য বলছে, সেদিন আমার ঘরে গুড়ের কিছু নাগড়ি রাখা ছিল। আমি যদি সেদিন বলে দিতাম তুমি গুড় খেও না, সে ভাবত বৈদ্য মশাই যখন নিজে গুড় রেখেছেন তাহলে গুড় খেলে খারাপ কিছু হবে না। ঠাকুর এটাই বলছেন, সাধুকে দিনে দেখবে রাতে দেখবে। যে আমার হিতৈষী তাকে আমি আগে ভালো করে দেখব তার গুড়ের নাগড়িটা কোথায় রাখা আছে। তোমার টাকা ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কে রাখা আছে নাকি সুইস ব্যাঙ্কে রাখা আছে, তোমার সন্তানের জন্য কত টাকা কত জায়গায় লুকিয়ে রাখছ। যদি দেখি তুমি সত্যিই ত্যাগী তবেই আমি তোমার কথা শুনব। তুমি যদি আমার হিতৈষীই না হও তোমার কথা কেন শুনতে যাব? মায়ের কথা সবাই শোনে কারণ মা সত্যিকারের হিতৈষী। সেটাই আচার্য বলছেন, আমাদের ঋষিরা যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই তোমার হিতৈষী। ঋষিদের কোথাও কোন রকম স্বার্থ ছিল না। এমন কি নিজের খাওয়া-পড়ার জন্যও কোন স্বার্থ নেই। উচ্চ চিন্তনের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিচ্ছেন। সেখান থেকে তিনি সমস্ত মানুষের কষ্ট দেখে করুণায় আপ্লুত হয়ে যাচ্ছেন। করুণায় আর্দ্র হয়ে অকাতরে তিনি সবাইকে বলছেন তোমাদের জন্য এই জ্ঞান রইল, এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে তোমরা দুঃখ-কষ্টের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে অমৃতের দিকে চলে এস। ঋষিরা নিজের জন্য কোন গুড়ের নাগড়ি রাখছেন না। পওহারি বাবার কাহিনী আছে, কুকুর রুটি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, পওহারি বাবা কুকুরের পেছনে ছুটে যাচ্ছেন আর চিৎকার বলছেন, দাঁড়াও! দাঁড়াও প্রভু! রুটিতে ঘি লাগানো নেই, একটু ঘি লাগিয়ে দিতে দাও। তাঁদের কাছে গুড়ের নাগড়ি বলে কিছু নেই। নিজের জন্য কিছুই রাখেন না, সেইজন্য সন্দেহ করার কিছু নেই। এনারাই প্রকৃত হিতৈষী। আচার্য বলছেন, যাঁরা তোমার হিতৈষী তাঁদের কথা শুনতে হয়। শাস্ত্রের কোন স্বার্থ নেই, আর শাস্ত্রের কথা শুদ্ধ পবিত্র মন থেকে এসেছে। জীবনে যদি শান্তি চাও, শক্তি চাও, যাই চাও, সেটা তবেই হবে যদি তুমি মননশীল হও। মননশীল হওয়া মানে, তোমার মধ্যে যে নানাত্ব রয়েছে এই নানাত্বকে নাশ কর। তখন তুমি দেখবে সেই পরম সত্তার সাথে তুমি এক হয়ে গেছ। অস্তিত্বের সাথে এক হয়ে যাওয়া মানে জীব, জগৎ যা কিছু আছে সব কিছুর সাথে তুমি এক। তখন তোমার কাছে জীবনও যা মৃত্যুও তাই। এর আগে যা কিছু বলা হয়েছে, *ন ততো বিজুগুপ্সতে* বা *মত্বা ধীরে ন শোচতি*, এর সব কিছুর পারে তুমি চলে যাবে। সেইজন্য অহং বোধ না রেখে, মাথা নত করে ঋষিরা বেদ, উপনিষদ বা অন্যান্য শাস্ত্রে যা যা বলছেন সব শুনতে হয়, শুনে সেটাকে পালন করতে হয়। তুমি তোমার নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেও না, তোমার যে বুদ্ধিতে যে নানাত্বের বোধ খেলা করছে, জীবন চালাতে গিয়ে এই বুদ্ধির আশ্রয় নিও না। *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং*, সব সময় এই জিনিষটাকে মাথায় রাখতে হবে। আমি নিজে যদি অশুদ্ধ হই কখনই আমি শুদ্ধের সাথে মিশে যেতে পারব না। অশুদ্ধিটা কি? অশুদ্ধি হল নানাত্ব, নানাত্ব ছাড়া কোন অশুদ্ধি হয় না। মিথ্যা কথা বলা, অপরের জিনিষ চুরি করা, পরস্ত্রীর দিকে তাকানো এগুলোকে আমরা পাপকর্ম বলছি। কিন্তু উপনিষদের কাছে এগুলো কিছু নয়, এর সব কিছুর মূলে নানাত্ব, সব কটির জন্ম ভেদ দৃষ্টি থেকে, নানাত্বই পাপ। ভেদ দৃষ্টিটাই মূল, ভেদ দৃষ্টিকে নাশ করে দিলে সবটাই খসে পড়ে যাবে। তখন তুমি নিজেকে শুদ্ধ দেখবে, শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলের সাথে এক, শুদ্ধ জল মানে সেই পরমাত্মার সাথে এক। এটাই জ্ঞান, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ যে যোগই বলুন সব যোগের এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এ ছাড়া কিছু নেই। এরপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী শুরু করছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

আচার্য দ্বিতীয় বল্লী শুরু করার আগে বলছেন *পুনরপি প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মতত্ত্বনির্ধারণ্যর্থ্যোহয়মারমভঃ – দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্ব্রহ্মণঃ*। ব্রহ্ম দুর্বিজ্ঞেয়, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বরের তত্ত্ব ধারণা করা যায় না, অসম্ভব। সেইজন্য পুরো জিনিষটাকে এই বল্লীতে আবার নতুন ভাবে উপস্থাপিত করছেন। ঠাকুরকে হৃদয়রাম বলছেন, মামা! তুমি একই কথা বারবার বল কেন? সত্যিই ঠাকুর কি একই কথা বারবার বলছেন? মূল কথা একই থাকছে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বলছেন। প্রকারটা পাল্টে যাচ্ছে, বলার ঢঙ পাল্টে যাচ্ছে, আচার্য সেইজন্য বলছেন প্রকারান্তর, একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলছেন। প্রকারান্তরে না বললে ধারণা করা যাবে না, সেইজন্য একবার এভাবে বলছেন আরেকবার অন্য ভাবে বলছেন, এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে নানা দিক দিয়ে বারবার না বললে এই দুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্বকে ধারণা করা যাবে না। প্রথম বল্লীতে যোগ দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। সেইজন্য প্রথমে শুরু করলেন *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু*, সেখান থেকে আসতে আসতে শেষের দিকে বলছেন *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং* বা তারও আগে বলছেন *জ্যোতিরিবাধুমকঃ*। যোগীরা সাধনা করে জিনিষটাকে তাঁরা কিভাবে দেখেন, সেটাই এতক্ষণ বর্ণনা করলেন। এই অধ্যায়েরও মূল বিষয় সেই আত্মতত্ত্বই, কিন্তু এখন আত্মতত্ত্বকে রীতিমত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছেন। যুক্তি দিয়ে বলছেন ঠিকই কিন্তু যুক্তি এতই গভীর ও সূক্ষ্ম স্তরে চলে যে ধরাই যাবে না যে এখানে একটা যুক্তি চলছে। যুক্তি দিয়ে বলা মানে দর্শনের যে লজিক সেই অর্থে নয়। কথামৃতে ঠাকুর অনেক সময় বলছেন, ঠিক আছে তুমি বিচার কর। এরপর ঠাকুর একটা যুক্তি নিয়ে আসছেন, ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ঠাকুরের যুক্তি লজিশিয়ানদের যুক্তি নয়। তাহলে এই যুক্তিটা কি? যিনি তত্ত্বকে জেনেছেন তিনি জানেন এই তত্ত্ব সাধারণ লোককে বোঝান যাবে না।

আত্মতত্ত্ব হল স্বসংবেদ্য, যিনি জানেন তিনিই জানেন। যেমন একটা বিশেষ ধরণের মিষ্টি আস্বাদ করার পর আমিই জানব এই মিষ্টির স্বাদ কেমন, অন্য কেউ জানতে পারবে না। স্বসংবেদ্য আবার আস্বাদ করার মতও নয়, এখানে মন বুদ্ধির পারে শুদ্ধ আত্মাই বোধ করেন। যে জিনিষটা মন বুদ্ধির পারে সেই জিনিষটাকে এবার মন বুদ্ধির এলাকায় বোঝানর চেষ্টা করছেন। কিন্তু যেভাবেই বোঝান হোক তার মধ্যে ফাঁক থাকবে। কিন্তু এই ফাঁক থাকলেও যতটা সাধ্য যুক্তি দিয়ে আকার ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যুক্তি মানে বিচারশক্তি rationality, নৈয়ায়িকদের লজিক বা পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র যেভাবে চলে সেই অর্থে নয়, rationality জিনিষটাকে নিচ্ছেন। তত্ত্বকে যতটা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায়। ঈশ্বরীয় তত্ত্ব যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না। যুক্তি দিয়ে যদি প্রমাণিত করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা বুদ্ধির এলাকা হয়ে যাবে। যেটাই বুদ্ধির এলাকা সেটাকেই ধর্মতত্ত্ব সন্দেহ করবে। আমরা এর উল্টোটা করি, আমরা বলি 'আপনার ধর্মটা কি যুক্তি সঙ্গত'? আমরা ধর্মকে যুক্তি দিয়ে, ধর্মকে বিজ্ঞান দিয়ে মেলাতে চেষ্টা করি। কিন্তু ঠিক ঠিক ধর্মের মানুষরা এর উল্টোটা বলবেন, তাঁরা বলবেন 'যে ধর্ম যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ধর্ম আদৌ ধর্ম কিনা সন্দেহ করতে হবে'। তুমি যে কথাগুলো বলছ এগুলো যদি যুক্তিসম্মত হয় তার মানে এটা আধ্যাত্মিকতা হতে পারে না। তাহলে আধ্যাত্মিকতা কি অযৌক্তিক? না তা কখনই বলা যাবে না, আধ্যাত্মিকতা হল যুক্তির পারে, বোধে বোধ করা। বুদ্ধি ওখান থেকে অনেক নীচে অবস্থিত।

পিএইচডি করা একজন মহারাজ তাঁর কলেজ জীবনের একটা মজার ঘটনা বলছিলেন। উনি কোন আদিবাসীদের এলাকায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। ওখানে একজন আদিবাসী মহারাজকে জিজ্ঞেস করছে, কেয়া তুম সাতি পাশ হো, মানে তুমি ক্লাশ সেভেন পাশ করেছ? মহারাজ বললেন, নহি, ম্যায় পিএইচডি কর রহা হুঁ। আদিবাসী লোকটি শুনে বলছে, ক্যায়সা আদমি তুম, খেটেখুটে কোন রকমে সেভেন পাশ করে গেলে অন্তত একটা পোস্টমাস্টারের চাকরি পেয়ে যেতে। লোকটি ধারণাই করতে পারছে না পিএইচডি জিনিষটা কি। ওখানকার যে পোস্টমাস্টার সে সেভেন পাশ, তাই ওদের কাছে সেভেন পাশের উপর আর কিছু নেই। ক্লাশ সেভেন পাশ আর পিএইচডি পাশে যা তফাৎ ধর্ম আর যুক্তির মধ্যে একই তফাৎ। যুক্তি মানে সে ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত যাচ্ছে, এরপর আর যেতে পারবে না। যদি বলে আমার ধর্ম পুরো যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে হবে আসলে ওটা কোন ধর্মই নয়, মস্তিষ্ক থেকে ঐ ধর্ম বেরিয়েছে। সেইজন্য ধর্মকে যতটা সম্ভব যুক্তিসঙ্গত

ভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা যেভাবে যুক্তিসঙ্গত করে থাকি, একটা থেকে আরেকটাতে নিয়ে গিয়ে যুক্তিতে দাঁড় করান হয়, ধর্মের ক্ষেত্রে এই জিনিষ কোন দিন হবে না। ঠিক তেমনি আবেগজনিত জিনিষগুলিকে আমরা যেভাবে বুঝি, ধর্মে কোন দিন ঐভাবে আবেগ চলবে না। বুদ্ধির প্রথম সৃষ্ট পদার্থ হল লজিক, ধর্মে লজিক চলবে না। বুদ্ধির দ্বিতীয় প্রধান সৃষ্ট পদার্থ হল আবেগ, এটাও চলবে না। যখন আমরা প্রশ্ন করছি, বিজ্ঞান কি ধর্মকে মানে? আসলে আমরা বলতে চাইছি ধর্ম লজিক কিনা, ধর্ম যুক্তিসঙ্গত কিনা। যে ধর্ম লজিকের উপর দাঁড়িয়ে আছে ঐ ধর্ম কোন দিন চলবে না, ঐ ধর্ম কোন ধর্মই নয়। যে ধর্মে আবেগ আছে, বুঝতে হবে ঐ ধর্ম ধর্মই নয়।

যতটা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বললে আমরা বুঝতে পারি, ঠিক ততটাই পুরো জিনিষটাকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ও লেখকরা ইদানিং দুটো বিচারকে খুব গুরুত্ব দেন। একটা বিচারকে বলে Holism, দ্বিতীয় Reductionism। যে কোন জিনিষকে দেখার যে পদ্ধতি মোটামুটি এই দুটো পদ্ধতিতে দেখা হয়। Reductionismএর অর্থ হল Whole = Sum of its parts, (টুকরোর যোগ = পূর্ণ)। যেমন একটা গাড়ি, গাড়িতে চাকা, স্টিয়ারিং, ইঞ্জিন, হর্ন, বডি আরও অনেক কিছু আছে। গাড়ি মানে, গাড়ির যতগুলো টুকরো সবটা মিলিয়ে গাড়ি। যদি বলা হয় সব টুকরোকে মিলিয়ে দিলে কি গাড়ি কাজ করতে পারবে? Reductionism বলবে ওভাবে হবে না, ওর একটা প্যাটার্ন আছে তোমাকে ঐ প্যাটার্নে যেতে হবে। Holism বলে whole is more than sum of its parts, টুকরোর যোগফল থেকে পূর্ণ বেশি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোগ করে যা হবে তার থেকে মূল বস্তু যদি বেশি হয় তখন তাকে বলে Holism।

Reductionism যখন আরেকটু degenerate করে যায়, তখন তার নাম হয়ে যায় Randomness। জীবনকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা এই তিন ভাবে দেখে – একটা Holism, মানুষ মানে তার মাথা আছে, হৃদয় আছে, শরীর ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব মিলিয়ে মানুষ। কিন্তু জীবন বলতে যেটা সেটা শরীর ও মন থেকে অনেক বেশি, life is more than body mind। দ্বিতীয় Reductionism, টুকরো বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি এসে জুড়ে গেলেই মানুষ রূপে দাঁড়িয়ে যাবে। ওদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তো হল, তাহলে এর মধ্যে জীবন কোথা থেকে আসছে? কারণ টুকরোগুলো তো জীবন নয়। ওরা তখন অনেক উপমা দিতে শুরু করে দেবে। খণ্ডিতবাদীরা (Reductionalist) অনেকটা আমাদের সাংখ্যবাদী এমনকি চার্বাকদের কাছাকাছি। এরা বলে যেমন পান পাতা, চুন, খয়ের প্রত্যেকটি দ্রব্য আলাদা আর কোনটাই লাল রঙের নয় কিন্তু তিনটেকে মিশিয়ে দিলে একটা বিচিত্র জিনিষ বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি এই জিনিষগুলো যখন মেশে তখন একটা নতুন জিনিষ বেরিয়ে আসে। এটাই যখন আরও degenerate করে অর্থাৎ আরও নীচে চলে যায় তখন তাকে বলে Random, মানে কিভাবে কিভাবে একটা জিনিষ হয়ে গেছে, গোলামালের বাজারে জীবন নামে একটা জিনিষ এসে গেছে। এই নিয়ে এদের মধ্যে অনেক তর্কাতর্কি চলে। এদের তর্কাতর্কিকে আধার করে অনেক মজার মজার কাহিনীও বাজারে ছেয়ে গেছে। যেমন একটা মজার কাহিনীতে বলছে, এক নির্জন দ্বীপে যেখানে এর আগে কোন মানুষই যায়নি, সেখানে কয়েকজন লোক কি করে পৌঁছে গেছে। সেখানে বালির উপর তারা একটা রোলেক্স কোম্পানির হাতঘড়ি দেখতে পেল। একজন জিজ্ঞেস করছে এই ঘড়ি কোথা থেকে এখানে এল। সেখানে একজন কট্টর Reductionalist ছিল, সে দেখে বলছে এটা হল random combination of molecules। দুনিয়ার যত পদার্থ আছে, যদি তাতে random combination হতে থাকে তাহলে একটা পজিশানে গিয়ে ঘড়ি হয়ে যাবে।

মাঝখানে একটা আইডিয়া খুব নাম করেছিল, একটা বানরকে যদি একটা টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়, আর বানরটা দুমদাম টাইপ যদি করতে থাকে, দেখা যাবে শত কোটি পাতার পরে কোথাও একটা প্যাটার্ন বেরিয়ে এসে সেখানে সেক্সপিয়ারের মত একটা কাব্য দাঁড়িয়ে গেল। আমি আপনি থিওরিটিক্যালি বলে দেব এই জিনিষ কোন দিনই হবে না, কিন্তু এরা অনেক রকম ক্যালকুলেশান করে আপনাকে দেখিয়ে দেবে কি করে হতে পারে। এই তর্কাতর্কির কোন শেষ নেই। আমাদের সাধারণ অনুভূতি বলছে এটা সম্ভব নয়। ওরাও বলবে তোমার কমন সেন্স বলতে পারে সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি যখন প্রবাবেল

থিয়োরীতে যাবে তখন ক্যালকুলাশানে মোটামুটি বলে দেওয়া যায় এই জায়গায় এই হতে পারে। কিন্তু থিওরিটিক্যালি এই জিনিষ কখনই সম্ভব নয়। আপনি লোহা ছুঁড়তে থাকুন, কোটি কোটি বছর ধরে ছুঁড়তে থাকুন, একটা আলাদা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ত দাঁড়িয়ে যাবে কিন্তু কোন দিন একটা হাওড়া ব্রীজ নিজে থেকে দাঁড়িয়ে যাবে না। ওরা কিন্তু বলে যাবে, তাও হতে পারে।

তাহলে জীবন জিনিষটা কি? জীবন কি random নাকি reductionism নাকি holism? কেন চিকিৎসা বিদ্যাটাই তো reductionism, যার মাথা ব্যাথা হবে তাকে ঠুকে দেবে একটা প্যারাসিটামল। কেন দিচ্ছে? মাথা একটা পার্ট, চাকা জ্যাম হয়ে গেলে যেমন গ্রিজ দিতে হয় তেমন মাথায় একটা গ্রিজ দিয়ে দিল, যার নাম প্যারাসিটামল। যারা Holismকে মানে, তাদের কাছে মাথার রোগ আর জীবনের রোগ দুটো পুরো আলাদা। সেদিক থেকে হোমিওপ্যাথি অনেক ভালো, পার্টের থেকে মানুষের দিকে বেশি যায়। আমরা যে শুধু reductionismএর দিকেই যাই না তা নয় randomnessএর দিকেও যাই, যারাই লটারি কেনে তারাই randomnessএর দিকে চলে গেল, হয়তো লটারি না কিনে থাকতে পারে, লুডোও খেলে থাকবে, তাস খেলে থাকবে, লুডো, তাস মানেই randomoness। এখানে এসেই আমাদের সমস্যা হয়ে যায়, আমার আপনার জীবন এই মুহূর্তে চলছে random, পরের মুহূর্তে চলছে reductionlist আর মুখে বলছি আমি হলাম Holistic। তাহলে আমরা কোনটা? আসলে আমরা কোনটাই না।

এরপর আসছে বেদান্ত। বেদান্তের খুব সহজ যুক্তি, দুটো জড় পদার্থ কখনই নিজে থেকে মিশতে পারবে না। যদি দুটো জড় পদার্থের মিলন হয় বা মেশানো হয় তখন তাকে একটা তৃতীয় জিনিষ বা পদার্থ সাহায্য করে। আসলে কি তাই হয়? এর বিরুদ্ধেও প্রচুর যুক্তি দেওয়া হয়। সব থেকে বড় যুক্তি সাংখ্যবাদীরা নিয়ে আসে, তাদের খুব নামকরা যুক্তি হল অন্ধখঞ্জবৎ। একজন চোখে দেখতে পায় না, আরেকজন চলতে পারে না। এবার এরা দুজন যাবে কি করে? তখন অন্ধ খঞ্জকে বলছে 'এস, তুমি আমার কাঁধে উঠে বস, তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল আর আমি তোমাকে বহন করে সেই দিকে এগিয়ে যাব'। দুজন দুজনকে সাহায্য করছে। দুজন যদি মেশে তখন এক অপরের ভালোও করতে পারে। তাহলে তৃতীয় জনের ব্যাপারটা যুক্তিতে কোথায় আসছে? বেদান্তের সিদ্ধান্ত হল, দুটো জিনিষ আছে, দুটো যদি মিশে যায় তাহলে সেই মেশাটা সব সময় একটা তৃতীয় জিনিষের জন্য মেশে। কারণ এই দুটো জিনিষ পরস্পর এক অপরের কাজে লাগতে পারে না। সাংখ্যবাদী বলবে কেন, অন্ধখঞ্জবৎ! বেদান্ত বলবে অন্ধখঞ্জবৎ উপমা চলবে না। কেন চলবে না? কারণ অন্ধ আর খঞ্জ দুজনই চেতন, দুটোই চেতন হওয়াতে ঐ উপমা এখানে আনা যাবে না। তুমি যখন প্রকৃতি আর পুরুষের মিলন ঘটাচ্ছ তখন প্রকৃতিকে তুমি অন্ধ বলছ আর পুরুষ হল খঞ্জ, পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য বলে কোন কাজ করতে পারেন না। অন্য দিকে প্রকৃতি কাজ করে কিন্তু তার মধ্যে চেতনা নেই। দুটোকে যে তুমি মেলাচ্ছ তখন দুটোরই কাজ হচ্ছে, সেইজন্য তোমার ঐ অন্ধখঞ্জবৎ উপমা এখানে আনা যাবে না।

বেদান্তের মতে, দুটো জিনিষের স্বভাব যদি একেবারে এক না থাকে তাহলে দুটো জিনিষ কোন দিন মিশবে না। যদি মেশে তাহলে একটা তৃতীয় শক্তির জন্যই মিশছে। আগের মন্ত্রে যেমন বললেন শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশে গেলে একই রকম থেকে যায়। কিন্তু দুটো আলাদা ধর্মীকে আনতে গেলে, তৃতীয় একটা জিনিষকে অবশ্যই আনতে হবে, তা নাহলে দুটো কখন এক অপরের সাথে মিশবে না। এই যুক্তি এর আগে আচার্যও এনেছিলেন, যেখানে তিনি বলছেন ইন্দ্রিয়ের যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে এক অপরকে জেনে যেত, অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করতে পারত অর্থাৎ বস্তু বস্তুর উপর কাজ করতে পারত। কিন্তু এরা তা পারে না, কারণ এরা সবাই জড়। কোন জড় আসা মানে ঐ জড় পদার্থ কারও কাজে লাগছে। যুক্তিটা খুব সূক্ষ্ম স্তরে চলছে। এই যুক্তিকেই ভাগবতে একটা কাহিনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ভগবান যখন ঠিক করলেন তিনি এবার সৃষ্টি করবেন, প্রথমে তিনি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করে দিলেন। পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব এসে গেছে, সৃষ্টির কাজে নেমে পড়তে প্রস্তুত। কিন্তু সৃষ্টির কাজে নেমে দেখছে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারছে না। সবাই আবার ভগবানের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বলছে 'হে প্রভু! আপনি তো আমাদের সৃষ্টি করে দিলেন কিন্তু সৃষ্টির কাজে আমরা এগোতে পারছি না'। কেন তারা সৃষ্টি করতে পারছে না? কারণ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল আর পৃথিবী এরা সবাই জড়। জড় পদার্থ কখনই এক অপরের উপর কাজ করতে পারবে না। ইট, বালি,

সিমেন্ট এরা এক অপরের উপরের কাজ করতে পারবে না। এদেরকে যদি একসাথে কাজ করাতে হয় তাহলে একটা চেতন জিনিষকে বা একটা তৃতীয় শক্তিকে আসতে হবে। যেমন একটা কাপড় আর একটা কাগজ আছে, কাগজকে যদি কাপড়ের উপর সাঁটতে হয় তাহলে এমনিতে সাঁটা যাবে না, তার জন্য একটা তৃতীয় শক্তি আঠা দরকার, যেটা দুটোকে জুড়ে দিচ্ছে। এদের স্বভাব পৃথক, জলে জল মিশে যাবে কারণ দুটোই সমান ধর্মী। কিন্তু দুটো আলাদা ধর্মী কখনই মিশবে না যতক্ষণ না একটা তৃতীয় শক্তি আসছে। তখন ভগবান সব কটি তত্ত্বের মধ্যে নিজে প্রবেশ করে গেলেন। ভগবান প্রবেশ করে যাওয়ার পর সৃষ্টি কার্য আরামসে চলতে লাগল। তার মানে চৈতন্য সত্তা না থাকলে কোন কাজই হবে না।

বলা হয় সব কিছুর মধ্যেই চৈতন্য সত্তা বিদ্যমান, কিন্তু কোন কোন জায়গায় চৈতন্য সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করছে। যেমন পাথরের মধ্যে যে চৈতন্য তাকে বলছেন sleeping consciousness, চেতনা ওর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। গাছপালাতে standing consciousness চৈতন্য দাঁড়িয়ে আছে। পশু পাখির মধ্যে walking consciousness চেতনা সেখানে হাঁটে। আর মানুষের মধ্যে thinking consciousness চেতনা চেতনা রূপে আসে। যেখানে চৈতন্য শুয়ে আছে সেখানে কোন কাজ হয় না। কিন্তু তাও কাজ করতে পারে। যেমন ঠাকুর বলছেন, আমার এগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে এই পাথর তিনবার লাফাবে। ঠাকুর দেখছেন পাথর তিনবার লাফাচ্ছে। পাথর নিজে থেকে কি করে লাফাবে? কিন্তু ঠাকুর ভাবরাজ্যে দেখছেন পাথর লাফাচ্ছে। কারণ ওর ভেতরেও চেতনা আছে, ঠাকুরের এমনই শক্তি যে সেটাতেই পাথর লাফাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে পাথর নিজে থেকে লাফাতে পারবে না। কিন্তু চেতনা সব কিছুর মধ্যেই আছে। Holism, Reductionism, Randomoness এদের সবার সব যুক্তির বাইরে বেদান্ত একটা স্বতন্ত্র যুক্তি দিচ্ছে। যখন কোন কিছু তৈরী হয়ে আছে, এমনি পড়ে নেই, সবটার একটা প্যাটার্ন আছে, বলছেন ঐ প্যাটার্নের পেছনে কোন না কোন একটা উদ্দেশ্য থাকে। একটা বাড়ি তৈরী হয়ে আছে, বাড়িতে ইট, বালি, সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে, উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে কিছু তৈরী করা হয়নি, মানুষ থাকবে বলে করা হয়েছে। বেদান্তের এটাই যুক্তির ভিত্তি। এর আরও ভিত্তি হল, একটা বাড়ি তৈরী হয়ে গেলেই হয় না, বাড়িতে বসবাস করার জন্য আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। সেই জিনিষগুলোর এক অপরের সাথে কোন যোগ নেই, কারণ সবটাই আলাদা। কিন্তু সব কটি জিনিষকে যখন এক জায়গায় জড়ো করা হল তখন দেখলেই বোঝা যায় এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হল বসবাস করা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, সেমেটিক ধর্মে সৃষ্টি ভগবান করেছেন। ভগবান একটা বাড়ি বানিয়েছেন, এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকবে। আর বলছেন আপনি মরে গেলে শেষ। সেমেটিক ধর্মে সৃষ্টি হল one time affair, সৃষ্টি একবারই হয়েছে, দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি হবে না। ভগবান তো এমনি এমনি কিছু করবেন না, তাঁর একটা উদ্দেশ্য থাকবে। ভগবান কোথাও বলে দেননি কি উদ্দেশ্যে জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা আমাদেরই বুঝে নিতে হবে। আমাদেরই যখন বুঝতে হবে তখন আমরা নিজেদের মত এক একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। ঈশ্বরের ইচ্ছা মত কাজ করাটাই ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরকে যাতে ভালোবাসতে পারি এটাই উদ্দেশ্য, আমরা যাতে সৎ হতে পারি এটাই উদ্দেশ্য, এইভাবে একের পর এক থিয়োরী আসছে, থিয়োরীর কোন শেষ নেই। হিন্দু ধর্ম এভাবে চলবে না, হিন্দু ধর্মে কোন উদ্দেশ্য নেই। কেন? কারণ সৃষ্টি one time affair নয়, একবার সৃষ্টি হয়ে গেছে তা নয়, আবার সৃষ্টি হবে। এখানে উদ্দেশ্য কি? তুমি নিজেই উদ্দেশ্য। তোমাকে কেন্দ্র করে তোমার অস্তিত্ব নৃত্য করছে, এর বাইরে কোন উদ্দেশ্য নেই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে শুরু করে যাবতীয় যা কিছু আছে এর সব কিছু তোমার জন্য।

এই তুমি কে? শরীর, মন, ইন্দ্রিয় তুমি নও। কারণ শরীর মনও সৃষ্টিরই অঙ্গ। তুমি যে আসল তুমি তার জন্য এই সৃষ্টি। আসল তুমির দুটি রূপ – একটা অণু রূপ আরেকটি বৃহৎ রূপ। প্রথমে অণু রূপকে বলছেন পরে বৃহৎ রূপকে নিয়ে বলছেন, প্রথমে ব্যষ্টি রূপকে বলছেন পরে সমষ্টি রূপকে বলছেন। তবে এখানে ব্যষ্টি রূপ ও সমষ্টি রূপ ঠিক ঠিক শব্দ নয়, একটা সামান্য রূপ আরেকটি বৃহৎ রূপ এটাই ঠিক ঠিক শব্দ। তবে এর আগেও আলোচনা হয়েছে, পরেও আবার আলোচনায় আসবে, তা হল এই সামান্য অর্থাৎ ছোট আর বৃহতের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, দুটোই এক। কিন্তু দেখার সময় মনে হয় একটা সীমিত আরেকটি অসীম। প্রথম মন্ত্রে আমাদের সীমিত রূপকে নিয়ে বলছেন, দ্বিতীয় মন্ত্রে আমাদের অসীম রূপকে নিয়ে বলবেন। সৃষ্টি তোমার জন্য, তুমিই সৃষ্টির কেন্দ্র। প্রথম কেন্দ্র হল তোমার শরীর আর দ্বিতীয় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। স্বামীজী

বলছেন, Soul আর God এই দুটোর তফাৎ কি, Soul হল যার কেন্দ্র শরীর, যার সীমা এই শরীর আর ঈশ্বর হলেন যাঁর কেন্দ্র সব জায়গায়, যাঁর সীমা সর্বত্র, এটাই তফাৎ। পরমাত্মা আর আত্মার তফাৎ কোথায়? আত্মার কেন্দ্র এই শরীর, কেন্দ্রের যে বৃত্ত সেটা এই শরীর। আর ঈশ্বর কে? যাঁর কেন্দ্র সব জায়গায় আর যার সীমা সবটাই, অসীম। সেইজন্য আত্মা আর পরমাত্মার কোন তফাৎ নেই। কিন্তু যখন শরীরের মধ্যে কেন্দ্রিত করে দেওয়া হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে আত্মা। যখন কেন্দ্রকে ভেঙে দিল তখন বলছেন পরমাত্মা বা ঈশ্বর। কিন্তু এই জায়গায় প্রথম আর দ্বিতীয় মন্ত্রে এটাকেই দু ভাবে বলছেন। প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ।।২/২/১।।

(অপরিবর্তনশীল, নিত্য প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যের একাদশ দ্বারযুক্ত একটি নগর আছে। সেই পুরস্বামীর ধ্যান করে লোক শোকাতীত হয় এবং এই দেহেই মুক্ত হয়ে পুনরায় আর শরীর গ্রহণ করে না। ইনিই সেই আত্মা।)

নচিকেতা যমরাজের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আত্মা আছে কি নেই। যমরাজ বলছেন, আত্মা অবশ্যই আছে। কোথায় আছেন? তোমার দেহের মধ্যেই আছেন। *পুরম্* মানে এই দেহ, দেহটা যেন একটা নগরী। আগেকার দিনে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নগরকে কেল্লার ধাঁচে তৈরী করা হত। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবেশদ্বার থাকত। ইদানিং এভাবে তৈরী করা না হলেও শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের চেকপোস্ট থাকে, চেকপোস্ট গুলি যেন শহরের প্রবেশদ্বার। *পুরমেকাদশদ্বারম্*, এই শরীরটাও যেন একটা নগরী। শরীরকে কোথাও বাড়ি, কখন কেল্লার সাথে এখানে পুর অর্থাৎ নগরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই দেহনগরীতে একাদশ দ্বার আছে, তিনটে নীচের দিকে আট খানা উপরের দিকে। শহরে যেমন অনেক রকম লোকজন থাকে, সেখানে ক্ষমতার আধিপত্য পরম্পরা থাকে, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে নীচে পুলিশের কনস্টেবলরা আছে, বিভিন্ন ধরণের লোকজন কাজ করছে, ঠিক তেমনি কাব্যিক দৃষ্টিতে দেখলে এই শরীরটাও যেন একটা শহর, যেখানে বিভিন্ন ধরণের লোক কাজ করছে। লোক মানে বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী সত্তাগুলি যেন কাজ করছে। নগর আর শরীরের মূল সাদৃশ্যকে নিয়ে আচার্য বলছেন *দ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাদ্যনেক*, দ্বারপাল রয়েছে আর অধিষ্ঠাতা রয়েছে। দ্বারপাল, যারা দ্বারগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে আর অধিষ্ঠাতা, যিনি এর ভেতরে রয়েছেন। অধিষ্ঠাতা হলেন শহরের যিনি রাজা বা ম্যাজিস্ট্রেট। খুব বড়লোকদের বাড়িতেও দেখা যায়, বাড়ির বাইরে কয়েকটা প্রবেশদ্বার আছে যেখানে দারোয়ানরা পাহাড়া দিচ্ছে আর বাড়ির ভেতরে বাড়ির মালিক আছেন। এই শরীরের সাথে নগরের অনেক মিল রয়েছে, সেইজন্য শরীরকে বলা হয় পুর, আর পুরে যিনি বাস করেন বা শয়ন করেন তাঁকে পুরুষ বলা হয়, পুরুষ মানে আত্মা, এই দেহের যিনি মালিক। এই দেহরূপী নগরীতে যিনি বাস করেন তিনি হলেন পুরুষ।

আচার্য বলছেন *পুরঞ্চ সোপকরণং স্বাত্মনা অসংহতস্বতন্ত্রস্বাম্যর্থং*, অসংহত মানে যার সমান ভাব নেই। যেমন, জল আর জল একই, দুটো সংহত। কিংবা জলের সাথে চিনি বা লবণ মিশিয়ে দিলে সেখানেও চিনি ও লবণের সাথে জলের কিছুটা সংহত স্বভাব আছে, যার জন্য চিনি আর লবণ জলের সাথে মিশে যায়। কিন্তু শরীরের দিকে তাকালে দেখা যাবে এর অঙ্গগুলি অসংহত স্বভাবের। হাত এক রকম পা অন্য রকম, এই দুটো থেকে বিলক্ষণ চোখ, তিনটে থেকে বিলক্ষণ কান। কান আর চোখের কোন সাদৃশ্য নেই, কান আর হাত বা পায়ের মধ্যে কোন মিল নেই। সব কিছুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে আমরা বলি এখানে সব কিছুর মধ্যে মিল আছে। শরীরের কোন অঙ্গের সাথে কোন অঙ্গের মিল নেই। ভেতরে হার্ট কাজ করছে, হার্টের বাইরে তার অন্য অঙ্গগুলির মধ্যে কোন মিল নেই। হার্টের আবার ফুসফুস সাথেও কোন মিল নেই। আর যত ইন্দ্রিয় আছে, তা সে জ্ঞানেন্দ্রিয়ই হোক আর কর্মেন্দ্রিয়ই হোক, কারুর সাথে কোন মিল নেই। হাত ধরার কাজে লাগছে, পা চলার কাজে লাগছে। এতগুলো অসংহত জিনিষ যখন এক সঙ্গে কাজ করছে তখন অবশ্যই এর মালিক কেউ একজন আছেন, যিনি শরীরের সব কিছু থেকে বিলক্ষণ। এটাই বেদান্তের প্রধান যুক্তি।

বেদান্তের এই যুক্তিকে যে মানবে না তাহলে হয় সে reductionism হয়ে যাবে আর তা নাহলে randomoness theoryতে চলে যাবে। Holisticএ এটাই বলছে, বিভিন্ন টুকরো গুলোর কারুর সাথে কোন মিল নেই। গাড়ির চাকা গোল, স্টিয়ারিংও গোল, কিছুটা মিল আছে, শরীরের সেই মিলটাও নেই। গাড়ির

ব্যাপারটা মজা করে বলা হল, মূল কথা হল অসংহত স্বভাব। স্বাভাবিক ভাবে তাই এই শরীরে যত অঙ্গ আছে এরা কেউই কারুর মালিক নয়। এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও কাউকে মালিক বলে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সব সময় বলবে হার্ট আর ব্রেন, ব্রেন ডেড আর হার্ট ডেড। অনেক সময় দেখা যায় ব্রেন ডেড কিন্তু হার্ট কাজ করছে। আবার কিছু কিছু ঘটনা আছে যেখানে হার্ট ডেড হয়ে যায় কিন্তু ব্রেন কাজ করতে থাকে। আবার মানুষ মরে গেলে তার চোখের রেটিনা খুলে নিয়ে কোন অন্ধ লোকের চোখে বসিয়ে চোখ কাজ করতে থাকে। তাহলে মালিকটা কে? তখন বলবে স্বামী স্ত্রীর মত ব্রেন আর হার্ট মালিক। এগুলোই বোকা বোকা কথা, এই কারণে reductionistদের অনেক ধরণের সমস্যা এসে যায়। তাহলে কি Holisticদের বক্তব্য পরিষ্কার? না, তাদেরও সব কথা পরিষ্কার নেই। তার কারণ তাদেরকেও বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করা হয়। তবে বেদান্তের দৃষ্টিতে যখন সামগ্রিক চিত্রটা দেখা হবে তখন holistic approach বা বেদান্ত যে দৃষ্টিভঙ্গী নিচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীটাই ঠিক। বেদান্তের খুবই সহজ যুক্তি, আহামরি কিছু যুক্তি নয়। এরা সবাই অসংহত, কারুর সাথে কারুর মিল নেই, অথচ এরা কাজ করছে। তাহলে নিশ্চয় একটা স্বাধীন সত্তা আছে, যে সত্তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, জানতে পাচ্ছি না, তার জন্যই এরা সবাই কাজ করছে। অঙ্গগুলির যদি কেউ মালিক হত তাহলে সেই অঙ্গ না থাকলে বাকি সব অঙ্গের কাজ করার ক্ষমতা চলে যাবে। যদি বলা হয় সবাই মালিক, তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন, আপনার পায়ের যত গুরুত্ব আপনার ব্রেনের ঠিক ততটাই গুরুত্ব? তাই বলে কি ব্রেনের গুরুত্বই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাও নয়, এমনকি অর্গানের নিরিখে ব্রেনের কোন কাজ নেই, তার মানে ব্রেনেরও এমন কিছু গুরুত্ব নেই। তারপরে আসছে মন, মনকে আবার reductionistরা ধরতেই পারে না।

এখানে গুরুত্ব হল অসংহত, কারুর সাথে কারুর কোন মিল নেই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এরা কেউই লীডার নয়। লীডার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ এরা কর্মক্ষম, লীডার চলে গেলে সব লম্ফঝম্প শেষ। জীববিজ্ঞানও বলছে, শরীরের এমন কোন অঙ্গ নেই যে অঙ্গ চলে গেলে বাকি সব অঙ্গ বসে যাবে। বৃহদারণ্যকে খুব সুন্দর একটা উপমা নিয়ে আসা হয়েছে। একবার সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে, আমাদের মধ্যে কে মহৎ। সবাই বলছে আমিই মহৎ। তাহলে এবার বিচার করা হোক। প্রথমে চক্ষু ইন্দ্রিয় চলে গেল। কিছু দিন বাদে ফিরে এসে চক্ষু ইন্দ্রিয় সবাইকে জিজ্ঞেস করছে তোমরা সবাই কেমন ছিলে? বলছে, অন্ধ যেমন থাকে। এরপর কর্ণেন্দ্রিয় চলে গেল। সে ফিরে এলে বলছে, বধির যেমন থাকে তেমন ছিলাম। এই করে করে সবার যখন পরীক্ষা হয়ে গেল তখন মুখ্যপ্রাণ এসে বলছে, এবার আমার পালা, আমি তাহলে যাই। মুখ্যপ্রাণ যেমনি শরীর থেকে বেরোতে শুরু করেছে তখন সৈন্ধব ঘোড়া, সিন্ধু দেশের শক্তিশালী ঘোড়া যেমন তার লাগাম শুদ্ধু সব কিছু টানতে থাকে, তেমনি বাকি ইন্দ্রিয়গুলিকে সৈন্ধব ঘোড়া টেনে যেন শরীর থেকে উপড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সব ইন্দ্রিয় তখন হাতজোড় করে বলছে, আর তর্কাতর্কি করার কোন দরকার নেই, তুমিই আমাদের সবার মালিক। কে মালিক? বিচার করে বলতে হবে না যে এই হল মালিক। যেমনি মালিক বলল আমি চললাম সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু উপড়ে ফেলে দিচ্ছে। বেদান্তের ঠিক এই যুক্তি, পরেও আবার এই যুক্তি নিয়ে আসবেন। এই প্রাণ মানে যে কোন প্রাণ নয়, বলছেন মুখ্যপ্রাণ। আত্মা যখন কাজ করেন তখন তিনি এই মুখ্যপ্রাণকে দিয়েই সব কাজ করান। মুখ্যপ্রাণ হল pure energy। শরীরের সব অঙ্গ অসংহত, কিন্তু সবাই একসাথে রয়েছে, এরা কেউই মালিক নয় অথচ একটা ব্যবস্থা কাজ করে যাচ্ছে, তার মানে এদের মালিকানা অন্য একজনের কাছে আছে। আত্মাই সেই মালিক। তাঁর স্বভাব কি, লক্ষণ কি? সেটাই এখন বলছেন।

যিনি এই শরীরের মালিক, তাঁর প্রথম লক্ষণ হল *রাজস্থানীয়স্য পুরধর্মবিলক্ষণস্য*, পুরধর্ম, শরীরের সমস্ত ধর্ম থেকে তিনি পুরো আলাদা। আমাদের একই কথা বারবার বলতে হচ্ছে, কারণ এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই পয়েন্টটা না বুঝলে কঠোপনিষদ বা অন্যান্য উপনিষদ দেহ, আত্মাকে নিয়ে কি বলতে চাইছে কোন দিন বোঝা যাবে না। প্রথমে reductionism আর randomness থিয়োরী নিয়ে আলোচনা করে দেখান হল বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে এদের কেন কোথাও মিল নেই। তোমরা বলছ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা টুকরো গুলো একত্র হয়ে গেলেই এরা কাজ করে দিতে শুরু করে। বেদান্ত বলছে শরীরের কোন অঙ্গের সাথে কোন অঙ্গের মিল নেই, যেমন গাছের সাথে পাতার, পাতার সাথে গাছের ফলের কোন মিল নেই। জেনেটিক একটা যোগসূত্র আছে ঠিকই, পাতা আর ফলকে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে দুটো জেনেটিক্যালি এক। এখানে কিন্তু বাইরের হাত, পা, চোখ নিয়ে বলছেন না, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে বলছেন। আমাদের শরীরও

পুরোটাই জেনেটিক, অধ্যাত্মের কাছে এই শরীরের কোন দামই নেই। এই দেহের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, দেহের ভেতরে যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে তাদের ব্যাপারে বলছেন, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে। আর আমরা যদি বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকেও দেখি, জেনেটিক্যালিও যদি দেখি তাতেও দেখা যাচ্ছে এদের সবার কাজ সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা আলাদা আর সবাই অসংহত, কারুর সাথে কোন মিল নেই। কিন্তু এরা সবাই মিলে কাজ করছে, তাহলে কিছু একটা আছে যার প্রথম লক্ষণ হল তিনি *রাজস্থানীয়স্য*, রাজার মত আর *পুরধর্মবিলক্ষণস্য*। Holismএর এটাই প্রধান যুক্তি, নগরীর ধর্ম থেকে এর ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। দেহের বা ইন্দ্রিয়ের বা মনের বা বুদ্ধির কোন ধর্মই এনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যদি কোন একটা স্পর্শ করে তাহলে সে প্রাধান্য পেয়ে যাবে। কারণ সেটা তাঁর সাথে এক হয়ে গেল। যদি বলা হয় আত্মা বুদ্ধির স্বরূপ, যদি বুদ্ধির স্বরূপ হন তাহলে তো বিলক্ষণ হল না, তাহলে বুদ্ধি দেহের রাজা হয়ে গেল। কিন্তু আগেই বলে দেওয়া হয়েছে বুদ্ধি রাজা নয়। তাহলে এমন একজনকে রাজা হতে হবে যিনি এদের সবার থেকে বিলক্ষণ।

প্রথমেই বলে দিলেন তিনি দেহের সব কিছু থেকে বিলক্ষণ। বিলক্ষণ হওয়ার জন্য তাঁকে দেহের সব ধর্মের বাইরে হতে হবে। জেনেটিক্যালি যা যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে সব কিছুর থেকে তাঁকে বিলক্ষণ হতে হবে। দেহের যত কটি ইন্দ্রিয় আছে সবারই জন্ম আছে। তাই প্রথমেই বলছেন আত্মা *অজঃ*। জন্ম না হওয়া মানে, তিনি সব সময়ই আছেন। অজ বলে দেওয়ার সাথে সাথে এটাও বলা হয়ে গেল যে তাঁর মধ্যে কোন ধরণের ষড়বিকার হয় না। কিন্তু তারপরেই বলছেন *অবক্রচেতসঃ*, অবক্র চিত্ত, চিত্ত মানে এখানে স্বভাব। বক্র মানে বেঁকা, আত্মা বেঁকা নন, তিনি অবক্র। বক্র মানে বেঁকা ঠিকই কিন্তু এখানে বক্র মানে কুটিল বা কলুষিত। আত্মার মধ্যে কোন ধরণের কলুষতা নেই, একেবারে পরিষ্কার, কোন কিছুর মিশ্রণ নেই। মানুষ মাত্রই বেঁকা, কুটিল, কলুষিত সেইজন্য আত্মাকে বলছেন অবক্র। আমরা যে অর্থে কুটিল বলতে বদমাইশ লোক বুঝি সেই অর্থে বলছেন না। কুটিল মানে পরিবর্তনশীল, তার থেকেও বেশি সমানতা নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার দিকে তাকাব, যাকে ভালোবাসি না তার দিকে তাকাব না, মুখটা বেঁকিয়ে নেব। যার গান পছন্দ তার গানের দিকে কান দৌড়ে যাচ্ছে, যে বেসুরো তার থেকে কান সরে আসছে। আমাদের সবারই কিছু পছন্দ আছে কিছু অপছন্দ আছে, এটাই কুটিল। আমরা কিন্তু আরেক ধাপ এগিয়ে যাই। যে পছন্দের নয়, কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার জন্য ভালো ভালো বলতে হয়। অফিসের বস যদি বেসুরো গান গায় তাও আমাকে বলতে হব, স্যার আপনি যে এত ভালো গান করেন আমার জানা ছিল না। এখানে বিষয়টা তা নয়, এখানে বিষয়টা আরও নীচে। কাউকে আমার খুব ভালো, কাউকে ভালো আর কাউকে কম ভালো মনে হয়, মন্দ, মধ্যম আর উত্তম মনে হয়। এটাকেই বলছেন কুটিল। আত্মা কারও প্রতি কুটিল নন, তাই অবক্র। আচার্য এখানে উপমা নিচ্ছেন *আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতম্*, একেবারে নিত্য, নিত্য মানে দৃঢ়, অটল, অনড়। কি রকম দৃঢ়, অটল? *আদিত্যপ্রকাশবৎ*, সূর্যের আলোর মত নিত্য। সূর্যের আলো সবার উপর সমান ভাবে বিকিরণ দেয়। ঠাকুর বলছেন প্রদীপের আলোতে কেউ নোট জাল করছে কেউ ভাগবত পড়ছে, প্রদীপের আলো নির্বিকার। সূর্যও তাই, ভালো মানুষ, মন্দ মানুষ কোন বাছবিচার নেই, সবার উপরই নির্বিকার ভাবে কিরণ দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা নির্বিকার হতে পারি না। আমরা বলি ভগবান তাঁর ভক্তদের ভালোবাসেন, যারা ভালো মানুষ তাদের ভালোবাসেন। ঠাকুর বলছেন এদের বেনে বুদ্ধি। আমরা যেমন গোলমেলে তেমনি ভগবানকেও গোলমেলে দেখছি। আমাদের যেমন দৃষ্টিদোষ, তেমনি ভগবানেরও দৃষ্টিদোষ, আমাদের বৈষম্য দোষ তেমনি ভগবানেরও বৈষম্য দোষ আছে ভাবছি। তুমি অন্যায় করেছিলে বলে ভগবান তোমাকে সাজা দিয়েছেন। যে ভালো কাজ করবে তাকে ভালোবাসবেন, যে খারাপ কাজ করবে ভগবান তাকে সাজা দেবেন, তাহলে তো ভগবানের মধ্যে বৈষম্য দোষ এসে গেল, তাঁর মধ্যে তো বিচার এসে গেল, তার মধ্যে বক্রতা এসে গেল। এর দিকে বেঁকা দৃষ্টি ওর দিকে সোজা দৃষ্টি, কি ধরণের ভগবান তিনি! এই ভগবানকে পূজো করে কি হবে! এসবে ভগবানের কিছু আসে যায় না। বদমাইশি করলে তার কর্মই তাকে ধরবে, কর্মই তাকে শেষ করবে, ভগবান কিছু করেন না। ভগবানের বুদ্ধি অবক্র, কখন এদিকে সেদিক হবেন না। স্বর্গটাও তাঁর নরকটাও তাঁর, ভালোটাও তাঁর মন্দটাও তাঁর, পূর্ণটাও তাঁর অপূর্ণটাও তাঁর। যুক্তি দিয়ে গেলে কোথাও এই ধারণাগুলি দাঁড়াবে না, শাস্ত্রের দিকে গেলে কোথাও এই ধরণের জিনিষ দাঁড়ায় না। বলছেন তিনি *অবক্রচেতসঃ* আত্মার কখনই কুটিল দৃষ্টি হয় না।

গীতায় ভগবান বলছেন *যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ*, এই ধরণের ভক্ত আমার প্রিয়, এখানে আচার্য অনেকবার ব্যাখ্যা করে বলছেন এই ধরণের ভক্তরা ভগবানের আত্মা সেইজন্য প্রিয় বলছেন। কিন্তু আমরা যে অর্থে প্রিয় ভাবি সেই অর্থে নয়। সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য সাধারণ ভাষায় অনেক কিছুই বলা হয়। আত্মা কাকে ভালোবাসেন? যে শুদ্ধ মন, সেখানে আত্মার প্রকাশ বেশি। যার শুদ্ধ মন সে আত্মাকে ভালোবাসে। ভালোবাসা এখানে ঠিকই হচ্ছে, কিন্তু কুটিল দৃষ্টির জন্য হচ্ছে না, এই ভালোবাসা সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে। পরে একটা মন্ত্রে বলবেন, শুদ্ধ মনে আত্মার প্রতিবিম্ব অন্য জিনিষের থেকে ভালো হয়। কিন্তু তাই বলে তিনি পক্ষপাত করছেন, তাঁর মধ্যে বৈষম্য দোষ আছে, তা নয়। তিনি সব সময় *অবক্রচেতসঃ*। দক্ষিণেশ্বরে গয়না চুরি হয়েছে, মথুরবাবু বলছেন 'ঠাকুর তুমি গয়না রক্ষা করতে পারলে না'? ঠাকুর বলছেন, লক্ষ্মী যাঁর দাসী তোমার কটি সোনার গয়না তাঁর কাছে মাটির ডেলাও নয়। তিনি *অবক্রচেতসঃ* তিনি পূর্ণ। দু পয়সার ভালো কিছু করলে কি দু পয়সার মন্দ করলে আমাদের মনে হতে পারে বিরাট কিছু করেছি, তাঁর দৃষ্টিতে এগুলো কিছুই না। শুদ্ধ আত্মার মধ্যে কখনই কুটিল ভাব আসবে না। কুটিল ভাব না থাকা মানে কোন বৈষম্য দোষ নেই। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে পুরো বৈষম্যে দোষে ভর্তি, চোখ ভালো জিনিষ দেখতে চায়, কান ভালো জিনিষ শুনতে চায়, জিহ্বা ভালো জিনিষ আস্বাদ করতে চায়। ইন্দ্রিয়ের এটাই স্বভাব। আত্মার স্বভাব তার ঠিক বিপরীত। তাহলে মালিক কে হবেন? যিনি এগুলোর বিপরীত ধর্মী, তাঁর লক্ষণই হল তিনি *অবক্রচেতসঃ*। ফলস্বরূপ আত্মার রূপ সব সময় এক রকম থাকে, কখনই তাঁর রূপ পাল্টায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের রূপ সব সময় পাল্টাচ্ছে, মনের সব সময় পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হবে না।

এই পুরস্বামী কে? বলছেন *পরমেশ্বরং পুরস্বামিনম্ অনুষ্ঠায় ধ্যাত্বা*, পুরস্বামী হলেন আত্মা, অন্তর্যামী, তাঁর আরেকটি নাম পরমেশ্বর। আচার্য এখানে আত্মা না বলে পরমেশ্বর বলছেন। তাঁকে কিভাবে জানা যাবে? *অনুষ্ঠায়*, অনুষ্ঠানের দ্বারা। উপনিষদ অনেক হাজার বছর আগেকার, তখনকার দিনে যে শব্দের ব্যবহার হত আজকের দিনে এসে সেই শব্দগুলো পাল্টে গেছে। অনুষ্ঠান বলতে কর্মের অনুষ্ঠান নয়, আচার্য এখানে পরিষ্কার বলছেন *সম্যগ্ ধ্যান*, ঠিক ঠিক ভাবে পরমেশ্বরের ধ্যান করা, চিন্তন করাটাই অনুষ্ঠান। ঈশ্বরকে জানার একটাই অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠান মানে যে কর্মের দ্বারা তাঁকে জানা যায়। কি সেই অনুষ্ঠান? সম্যগ্ ধ্যান, ঠিক ঠিক ধ্যান। আমাদের জন্য সাধনা একটাই শুধু জপ, জপ মানে তাঁর চিন্তন করতে করতে মন লয় হয়ে যাচ্ছে, এটাই ধ্যান। ধ্যান মানে তাই, মন ঈশ্বরে লয় হয়ে যাওয়া, ধ্যাতার সত্তা বলে কিছু থাকছে না, ইন্দ্রিয়ের যত রকম সত্তা সব সত্তাই চলে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের সত্তা কি কি? প্রথমেই হল বেঁকাপনা, ইন্দ্রিয়গুলি কুটিল, তার অবস্থার সব সময় পরিবর্তন হয়ে চলেছে। ঈশ্বরের যখন ধ্যান হবে তখন অবস্থার আর কোন পরিবর্তন হবে না। আর ধ্যানের গভীরতা সব সময় সমান থাকবে।

এই রকম ধ্যানে যাওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হল *সর্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ*, সমস্ত রকমের এষণার ত্যাগ। মনের সমস্ত রকম বাসনা, সমস্ত রকমের এষণা যদি না চলে গিয়ে থাকে সে কখনই ধ্যান করতে পারবে না। ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিয়ে বলছেন, সুতোর সামান্য একটু আঁশ বেরিয়ে থাকলে সুতো ছুঁচের মধ্যে ঢোকান যাবে না। সুতোর আঁশ হল কামনা-বাসনা, এষণা। সবাই বলে ধ্যান হয় না, কী করে ধ্যান হবে! মনের মধ্যে কত রকমের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, ধ্যান হবে কোথা থেকে! বহির্জগতকে যদি থামিয়েও দেওয়া হয় তখন নিজের দেহকে নিয়ে পড়ে যায়, দেহবোধকেও যদি থামিয়ে দেওয়া হয় তখন মনকে নিয়ে পড়ে যায়। এত কিছুর উপর আবার এর প্রতি ভালোবাসা, এর প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা, লোভ এরাও আছে। অনুষ্ঠান মানে বিরাট পূজার আয়োজন, ছাগবলি, কীর্তনাদি এগুলোকে বলছেন না, এষণা থেকে মুক্ত হওয়াটাই অনুষ্ঠান।

ইন্দ্রিয়ের স্বভাব হল নিজের মধ্যে অবস্থিত থাকা। অনুষ্ঠান হল সবাইকে নিজের মধ্যে নিয়ে নেওয়া, সমস্ত জগৎ জুড়ে সেই ব্রহ্মই বিরাজ করছেন, এই ধ্যান করা। উপনিষদ এখানে সাধনা জিনিষটাকে বলে দিচ্ছেন, *পুরমেকাদশদ্বারম্*, একাদশ দ্বার বিশিষ্ট শরীরে যিনি বাস করেন, যিনি এর মালিক তাঁকে কিভাবে তুমি দেখবে – সমস্ত প্রাণীতে, সমস্ত ভূতে তিনিই আছেন। তাঁর স্বভাব কি রকম? আমার শরীরের যা যা ধর্ম, তাঁর স্বভাব ঠিক তার বিপরীত। সেইজন্য তিনি *অজস্যাবক্রচেতসঃ*, তাঁকে অনুষ্ঠান কর, তোমার এষণা গুলো ত্যাগ

কর আর তাঁর স্বরূপের ধ্যান করে তাঁতে ডুবে যাও। ধ্যান মানেই চিন্তন। কিসের চিন্তন? এই শরীরে যিনি আছেন তিনিই সব কিছুতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন।

অনুষ্ঠান করলে কি হবে? *ন শোচতি*, শোক মোহ থাকবে না, শোক মোহ আর আসবেও না। এরপর সেই বৃহতের সাথে এক হয়ে গিয়ে বৃহতই হয়ে যাবে। লক্ষ্মী যাঁর দাসী তাঁর দু-পাঁচ টাকাতে কি আর আসে যায়, তুমিও যখন বৃহৎ হয়ে গেলে তখন আর ছোটখাটো জিনিষ থেকে তোমার ভেতর কোন হেলদোল হবে না। সেটাই বলছেন, *অনুষ্ঠায় ন শোচতি*, যখন পরমেশ্বরের ধ্যান হবে, সেই ধ্যানের পরিণতি স্বরূপ তোমার এই জ্ঞান হবে তিনিই সব কিছুতে বিরাজিত, তখন তোমার আর শোক আসবে না। এটাকেই এর আগে বললেন *ন বিজুগুপ্সতে*, তার গোপন করার ইচ্ছে থাকবে না। ঠিক তেমনি এখানে বলছেন তোমার আর শোক হবে না। শোক হওয়া মানে আমার কাছে ছিল, এখন আমার কাছে নেই। তোমার প্রিয়জন মারা গেছে। মরে কোথায় যাবে? স্বর্গেই না হয় গেছে। তুমি নিজেকে এই দেহের মধ্যে বেঁধে রেখেছ বলেই তোমার যত শোক দুঃখ। কিন্তু বৃহতের সাথে এক হয়ে যাওয়ার পর দেখছ দেহটাও তোমার, পাড়াটাও তোমার, পুরো দেশটাও তোমার আর স্বর্গটাও তোমার, তাহলে তোমার প্রিয়জন তোমাকে ছেড়ে এবার যাবেটা কোথায়! দেখছ সে তোমার কাছেই আছে। এরপর আর কিসের শোক হবে! এই ঘর আর সেই ঘর। এগুলো তাত্ত্বিক কিছু নয়, যোগীরা বাস্তবিক এটাই দেখেন। শোক নেই বলে তার কোন ভয়ও নেই।

বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে, এই ধরণের পুরুষই জীবনমুক্ত হয়ে যান। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াটাই তো মুক্তি, এছাড়া আর কোন মুক্তি নেই, এটাই বিদেহ মুক্তি। গীতায় ভগবান বলছেন *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, যাঁর মন সাম্য অবস্থায় চলে গেছে তিনি এই দেহেই সব কিছুকে জয় করে নেন। যিনি শোক মোহের পারে চলে গেলেন তিনি শরীর থাকতেও মুক্ত, দেহ আছে কিন্তু জীবনমুক্ত, এটাই বিদেহ মুক্ত। এরপর আর কোন কিছুই তাঁকে বাঁধতে পারবে না। দেহটা এখন আছে ঠিকই কিন্তু পরে আর তাঁকে শরীর ধারণ করতে হবে না। এর আগে শরীর ধারণের অর্থকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, নতুন করে আর এর মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। সেখানে বলা হয়েছিল, চৈতন্যের সামনে কিভাবে ভাবগুলো দৃশ্য রূপে উঠছে। পুনর্জন্ম থেকে কেউ যদি বাঁচতে চায়, পুনর্জন্মকে যদি কারুর আতঙ্ক মনে হয়, তাহলে তাঁকে এই সাধনার অনুষ্ঠান করতে হবে। এই অনুষ্ঠানের তিনি ফল পেয়েছেন কিনা জানা যাবে, যদি তাঁর শোক করা, ভয় পাওয়া বন্ধ হয়। মনে শোক আছে, ভয় আছে তাহলে বুঝতে হবে তাঁর এখনও সেই একত্ব বোধ আসেনি। হিন্দু ধর্মে ঠিক ঠিক মুক্তি হল জীবনমুক্তি, এই শরীরে বেঁচে থাকা অবস্থাতেই মুক্তি। মুক্তি মানেই সমাপ্ত, সমাপ্ত মানে কোন কিছুকে নিয়ে তার আর শোকও হয় না, মোহও হয় না। শোক মোহের পারে যাওয়াটাই মুক্তি। যাদের এখানেই মুক্তি তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। এই মন্ত্রে যিনি দেহকে আশ্রয় করে আছেন তাঁর কথা বলা হল, পরের মন্ত্রে তিনিই যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যপ্ত হয়ে থাকেন তখন তিনি কত ভাবে থাকেন তার বর্ণনা করছেন।

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোনসৎ।
নৃষদ্বরোসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।।২/২/২।।

(সেই আত্মা সর্বত্রগামী সূর্যরূপে দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত, সকলের স্থিতিবিধায়ক বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, তিনিই অগ্নিরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ও সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত, তিনি মনুষ্য মধ্যে সংস্থিত, দেবতাদের মধ্যে অবস্থিত, সত্যেই প্রতিষ্ঠিত, আকাশে অবস্থিত, জলে শঙ্খাদিরূপে উদ্ভূত, পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদি রূপে জাত, যজ্ঞাঙ্গরূপে সমুৎপন্ন এবং পর্বত হতে নদ্যাদি রূপে প্রবাহিত হন। এই রকম সর্বস্বরূপ হলেও তিনি কিন্তু স্বীয় পারমার্থিকরূপেই বর্তমান আছেন, কেন না তিনি মহান।)

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ খুবই সহজ, কিন্তু মন্ত্রের ভূমিকা খুব কঠিন। বেদান্ত মতে মানুষের ভেতরে চৈতন্য রূপে যিনি বিরাজ করছেন তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। প্রথমে ব্যষ্টি রূপে ব্যাখ্যা করা হল। দ্বিতীয় মন্ত্রে সমষ্টি রূপে আত্মাকে ব্যাখ্যা করছেন। সমস্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সেটাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, আমাদের প্রচলিত ভাষায় বলি ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। একদিন ঠাকুরের উপস্থিতিতে নরেন আর গিরিশ ঘোষ তর্ক করছেন। ঠাকুরও শুনছেন আবার বলছেন তোমরা একটু ইংলিশে তর্ক কর। ইংলিশে অবশ্য তর্ক করা হয়নি। গিরিশ ঘোষ বারবার বলে যাচ্ছেন, ভগবান নিজেই মানুষের দেহ ধারণ করে আসেন। নরেন গিরিশ ঘোষের কথা মানছেন না। নরেনের বক্তব্য হল, তিনি সব কিছুতেই আছেন, তিনি যদি সব কিছুতেই থাকেন তাহলে শুধু মানুষের মধ্যেই কেন আসবেন! অনেকক্ষণ বিচার চলার পর ঠাকুর বলছেন, নরেন ঠিকই বলছে তবে শক্তি

বিশেষ, কোথাও শক্তির প্রকাশ কম আবার কোথাও শক্তির প্রকাশ বেশি। ঈশ্বরকে আমরা যে নামেই বলি, ব্রহ্ম বলি, আত্মা বলি, পরমাত্মা বলি, সেই ঈশ্বরের ব্যাপারে অবধারণা মানুষের মধ্যে আসে তার বুদ্ধি থেকে। মানুষ যতই শাস্ত্র পড়ুক আর যাই করে থাকুক ঈশ্বরের ধারণা সব সময় তার নিজের বুদ্ধি থেকেই আসে।

শিক্ষিত যারা তারাও অনেক সময় আত্মার ব্যাপারে এমন এমন উদ্ভট মন্তব্য করে বসে যার কোন অর্থই হয় না। যেমন একজন এসে বলছে গীতায় ভগবান আত্মার ব্যাপারে যে বলছেন *নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ* এটাই বেদান্তের মূল। তারপর বলছে 'অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম আত্মা হলেন খুব high level of fine energy। এতই সূক্ষ্ম আর এতই উচ্চস্তরের এনার্জি যে যার জন্য ছোট এনার্জি আগুন, বাতাস এরা আত্মার উপর কোন কাজ করতে পারে না'। এখানে সে নিজের বুদ্ধি দিয়ে আত্মার ব্যাখ্যা করছে। বেদান্তের প্রথম কথাই হল আত্মা বা চৈতন্যেরর সাথে এনার্জির কোন সম্পর্কই নেই। এনার্জি সব সময় প্রকৃতির এলাকার, প্রকৃতির সাথে পুরুষের কোন সম্পর্কই নেই। সাধারণ মানুষরা কিন্তু ভুল কিছু করছে না, কারণ আত্মা, ঈশ্বর, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এই শব্দগুলো তারা অনবরত শুনছে, এরপর কোথাও শাস্ত্রের কিছু কথা পড়ে বা শুনে নিজের বুদ্ধি দিয়ে শব্দগুলিকে বোঝার চেষ্টা করে। যতটুকু সে জানে ততটুকু দিয়েই সে বুঝবে। ঠাকুর বলছেন, কাকেই বা বলি আর কেই বা বুঝবে। শব্দটা বলছেন 'বুঝবে'। ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন তাঁরা কেউই মুর্খ, বোকা ছিলেন না, তাঁরা তাঁদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ। কিন্তু আমরা আমাদের knowledge bankএর বাইরে কিছুতেই যেতে পারি না। যার জন্য কোন পাশ্চাত্য লেখকের ঈশ্বরের উপর কোন লেখা বই তিন-চার পাতা পড়তে পড়তেই মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দেবে। কারণ এরা সবাই নিজের বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করছে। বাইবেলে যিশু ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা বলছেন সেটাকেও নিজের বুদ্ধি দিয়ে এরা ব্যাখ্যা করছে আইডিয়া অফ গড জিনিষটা কি এবং কিভাবে মানুষের মধ্যে এসেছে।

ঈশ্বরের ব্যাপারে ভারতীয় অবধারণাকে ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন। প্রথম ধারণা আকাশে একজন ঈশ্বর বসে আছেন, সেখান থেকে তিনি আমাদের ভালো মন্দ দেখছেন, এদেরকে ঠাকুর অধম ভক্ত বলছেন। দ্বিতীয় ধারণা, তিনি আমাদের ভেতরে অন্তর্যামী রূপে রয়েছেন, এরা মধ্যম ভক্ত আর উত্তম ভক্ত দেখে তিনিই সব কিছু হয়েছেন। এটাও আমাদের বুদ্ধির ধারণা, ঠাকুরের কাছে নয় আমার আপনার কাছে। ধর্মের ইতিহাস ঘাঁটাঘাটি করতে গিয়ে বিদেশীরা প্রথমেই অনুসন্ধান করে ঈশ্বেরর ভাব প্রথম কোথা থেকে কিভাবে মানুষের মধ্যে এসেছে। চীনের সভ্যতা, অন্য দিকে গ্রীক ও ইজিপ্সিয়ান সভ্যতা থেকে এদের অনুসন্ধান শুরু হয়। এইসব প্রাচীন সভ্যতার মানুষরা প্রথমে মনে করত এই শরীরের মধ্যে জ্যোতির্ময় কিছু একটা আছে, মৃত্যুর পর যে এই শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এটাই আসল জিনিষ। প্রিয়জন কেউ মারা গেলে তারা ভাবত আমার প্রিয়জন কোথাও কোন না কোন ভাবে আছে, হয়ত সে আবার ফিরেও আসতে পারে বা এই শরীরকেই আবার গ্রহণ করতে পারে। সেই থেকে মমি, পিরামিড করে মৃতদেহ সংরক্ষণের প্রথা শুরু হল। সেখান থেকে তাদের একটা ধারণা আসতে শুরু করল, আমাদের পূর্বপুরুষরা মৃত্যুর পর কোথায় যান, এইভাবে স্বর্গের ধারণার জন্ম হল। জগতে সবাই সমান নয়, স্বর্গেও তাই সবাই সমান হবে না। বিদেশীরা ধারণা করতে শুরু করল আমাদের পিতৃপুরুষরা যাঁরা স্বর্গে গেছেন সেখানে তাঁদের থেকেও আরও বড় ক্ষমতাশালীরা কেউ আছেন। ইতিমধ্যে কিছু কিছু মহাত্মাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বাণীগুলি আসতে শুরু হয়েছে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের ধারণার জন্ম হল। এগুলো সব বিদেশীদের ধারণা। বিদেশীদের ঈশ্বরের ধারণায় সব সময় দুটো কি তিনটে জিনিষ চলে। প্রথম God the Father, এটাই সব থেকে প্রচলিত ঈশ্বরের ব্যাপারে ধারণা, জুহুদের এই ধারণা, যে ধারণাকে যিশুও কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু যিশু যখন God the Father বলছেন তখন তার অর্থ আলাদা। খ্রীষ্টানরা যখন God the Father বলে তখন সেখানে তাদেরও ঈশ্বরের ধারণা আলাদা। দ্বিতীয় ধারণা, God the Loving তিনি ভালোবাসেন, যেটাকে খ্রীষ্টানরা বেশি প্রচার করল। তৃতীয় God the Just। আমাদের ভাষায় এই তিনটেকে অনুবাদ করলে হবে ভগবান বাবার মত, ভগবান মায়ের মত আর ভগবান রাজার মত।

সাধারণ মানুষের কাছে এই তিনজন খুব শক্তিশালী, মা, বাবা আর রাজা। বাবা রূপে ভগবানের মধ্যে ভালোবাসাও আছে আবার ন্যায়পরায়ণতাও আছে। God the Just, এই ধারণা সব থেকে বেশি এসেছে মুসলমানদের মধ্যে। আদি অবস্থায় আরবিয়ানদের মধ্যে নিয়ম-কানুন আইন-শৃঙ্খলা কিছুই ছিল না, সেইজন্য

একজন কড়া ভগবানের দরকার যিনি কড়া হাতে সবাইকে সোজা করে দেন। মোজেস, মহম্মদ আর যিশু এই তিনজনই আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছিল না। এনারা যে কথা বলছেন, সাধারণ মানুষ সেই কথাকে খুব সহজ ভাবে নিজের মত বুঝে নিয়ে মনে করছে, বাবা এই রকম, মা এই রকম। এরপর ইতিহাসবিদরা এগুলোকে নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু তারা নিজেদের মন দিয়ে বিশ্লেষণ করে লিখে গেছেন। এমনকি মোজেস, মহম্মদ বা যিশুর আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে তাঁদের মনের কল্পনা বলে ব্যাখ্যা করছেন। হিন্দুদের ব্যাপারে বিশেষ করে বেদের সব কিছুকেও তাঁরা ঐ ভাবেই দেখেছেন। যে কোন হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কাছে পরিষ্কার বেদ মানেই ভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছে, এখানে কোন বিবর্তনবাদের থিয়োরী চলবে না। পুরো জিনিষটাকে আরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করা হলে দেখা যাবে বেদের মূল বক্তব্য হল, সব কিছুর পেছনে এবং প্রকৃতিতেও যা কিছু হচ্ছে সবের পেছনে একটা ঈশ্বরীয় সত্তা আছে, ঝড়-বৃষ্টি, সূর্যের আলো সব কিছু দিয়ে সেই ঈশ্বরীয় সত্তা প্রকাশিত হচ্ছেন। পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক জগৎ আর ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের মূল তফাৎ হল একটাতে প্রকৃতিকে সরাসরি উপাসনা করা হয় আরেকটিতে প্রকৃতির পেছনে যে দিব্য সত্তা আছেন তাঁর উপাসনা করা হয়। পাশ্চাত্যের লোকেদের বদ্ধমূল ধারণ হল ভারতীয়রা প্রকৃতির উপাসক। তারা বলে ভারতে গাছ, পাখি, সাপ, পশু, পাথর সবারই পূজা করা হয়। কিন্তু ভারতে তা কখনই করা হয় না। এদের সবার পেছনে যে দিব্য সত্তা আছেন এখানে তাঁরই পূজা করা হয়। বেদই ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ, আর বেদকে আধার করেই ভারতে পরবর্তি কালে সমস্ত রকম শাস্ত্র বেরিয়ে এসেছে। আমরা মনে করছি বেদে শুধু দেবতাদের স্তুতিই করা হয়েছে, ঠিকই দেবতা, দেবী সবারই পূজা করা হচ্ছে, কিন্তু একটা সাধারণ জিনিষ সব ক্ষেত্রে থেকে যায় তা হল, আমি তোমাকে এই রূপে পূজা বা স্তুতি করছি ঠিকই, কিন্তু সব রূপেতে তুমিই আছ। যদিও বেদের প্রত্যেক মন্ত্রে তুমিই আছ নেই। স্বামীজীর রচিত ঠাকুরে গানে দুটো ভাবই পাওয়া যাবে। কোথাও শুধু ঠাকুরকে নিয়েই গান রচনা করছেন আবার কোথাও ঠাকুরই সব কিছুতে আছেন এই ভাবটাও আছে। যখন বলছেন সর্বদেবদেবীস্বরূপায়, তখন সেখানে ঠাকুরের বিরাট রূপকে তুলে ধরা হচ্ছে। হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্যান্য ধর্মে এই জিনিষ হতে পারে, আর খ্রীষ্টান ধর্মে বাস্তবিকই তাই হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মের বড় বড় মরমীয়া সাধু মহাত্মারাও তাঁদের নিজেদের অনুভূতি, উপলব্ধির কথা লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের লেখাগুলো বেশি প্রচার হতে দেওয়া হয়নি, থিয়োলজিয়ানরা যা লিখেছে সেগুলোকে বেশি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামেও সুফি সাধকরা আল্লার স্বরূপকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করে তাঁদের শিষ্যদের বলেছেন বা লিখে গেছেন সেগুলোকে ইসলাম ধর্মের মৌলবীরা সেভাবে সামনে আসতে দিল না, বদলে মৌলবীরা বুদ্ধি দিয়ে আল্লার ব্যাপারে যা ব্যাখ্যা করেছে সেটাকেই সবাইকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। হিন্দু ধর্মে এই জিনিষ কোন দিন হতে দেয়নি। এর দুটো কারণ, হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো খুবই প্রাচীন আর অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করতেন, তার সাথে এত রকমের উপলব্ধির কথা এসেছে যে, যার জন্য কোন শাস্ত্রকেই ডানদিক বামদিক যেতে দেননি। দ্বিতীয় কারণ, ঋষি, মহাত্মারা একের পরে এক আসতেই থেকেছেন, সবাই একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলতে থাকলেন যে জিনিষটা এই রকম, যার জন্য অন্যান্য ধর্ম থেকে ঈশ্বরের ভাব হিন্দু ধর্মে পুরো আলাদা।

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, মন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে ঈশ্বরকে এক রকম জানা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের বাস্তবিক রূপকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের কথানুসারেই আমাদের যেতে হবে। যে কোন লোক এসে বলতে পারে ঈশ্বরকে আমি অনুভব করেছি। এটাকে আটকবার জন্য বলে দিচ্ছেন তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করে থাকতে পার কিন্তু বেদ উপনিষদের বাইরে নতুন কোন কথা কখনই আমরা গ্রাহ্য করব না। সেইজন্য ঠাকুর যা যা বলেছেন তাঁর সব কথাই বেদ উপনিষদের সাথে মিলে যাচ্ছে। আচার্য শঙ্কর গীতা উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সব কিছুকে যখন এক জায়গায় নিয়ে আসছেন তখনও বেদ উপনিষদের মূল বক্তব্যের বাইরে নিজেতো যাচ্ছেনই না অন্য কাউকেও যেতে দিচ্ছেন না।

অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরের অবধারণা আর হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে একটা মূল তফাৎ সব সময় ধরা পড়বে। ঋষিরা পরমসত্তা বা ঈশ্বরকে বিভিন্ন ভাবে দেখছেন ঠিকই কিন্তু প্রত্যেকের উপলব্ধির মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত ভাব সব সময় থাকছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বর ধারণার বর্ণনা করতে গিয়ে সবাই ঈশ্বরকে সীমিত করে দেয়। এমনকি জ্যোতি দেখার সময়ও ওরা সীমিত রূপে দেখে। অনেক কিছুই বলবে কিন্তু কোথাও

গিয়ে ঈশ্বরকে সীমিত করে দিচ্ছে। যদি সীমিত নাও করে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে সীমিত করবেই তা হল শুভ জিনিষের সাথে ঈশ্বরকে সীমিত করা। কোন অবস্থাতেই তারা অসীমের সাথে কখনই ঈশ্বরকে মেলাতে যাবে না। এই জায়গাতে হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। বেদান্তের দৃষ্টিতে যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি কোন এক অজানা কারণে নিজেকে অজ্ঞানে আচ্ছাদিত করে নিজেকে অপূর্ণ মনে করেন। কিন্তু পূর্ণত্বই তাঁর স্বভাব। পূর্ণত্ব স্বভাবের জন্য তিনি মনে করেন আমাকে পূর্ণ হতে হবে। এবার পূর্ণ হওয়ার জন্য মানুষ নানা রকম জিনিষ করতে শুরু করে। যার স্ত্রী নেই সে মনে করছে আমার স্ত্রী হয়ে গেলে আমি পূর্ণ হয়ে যাব। সে বিবাহ করে নেয়। আরেকজন এর উল্টো ভাবছে, আমার যদি বিবাহ হয়ে যায় আমি শেষ হয়ে যাব, আমি আর কোন দিন পূর্ণ হতে পারব না। তারপর সে বাড়ি থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। যার টাকা নেই সে বলছে, টাকা হলে আমি পূর্ণ হয়ে যাব। তারপর সে টাকা রোজগারের পথে নেমে পড়ে। আরেকজন বলছে টাকাই সমস্ত অনর্থের মূল, টাকা মানুষকে শেষ করে দেয়, সে পালিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। একজন বলছে সৎ ভাবেই হোক আর অসৎ ভাবেই হোক আমাকে প্রচুর সম্পদের মালিক হতে হবে। আরেকজন বলছে আমি যদি অসৎ পথে যাই তাহলে আমি অপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাব, সেইজন্য সে সৎ হওয়ার চেষ্টা করে। যে সৎ ভাবে জীবন চালায় সেও পূর্ণত্বের দিকে এগোচ্ছে, যে অসৎ ভাবে জীবন চালাচ্ছে সেও পূর্ণত্বের দিকেই যাচ্ছে, কিন্তু তার সময়টা অনেক বেশি লাগবে। যে অলস, অপদার্থ সেও পূর্ণত্বের দিকে চলেছে আর যে কাজের লোক, কর্মঠ সেও পূর্ণত্বের দিকে এগোচ্ছে। বেদান্ত যদি বুঝতে হয় তাকে প্রথমেই বুঝতে হবে শুধু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই নয় যত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে সব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। যখন প্রার্থনা করা হচ্ছে *অসতো ম সদ্গময় তমসো জ্যোতির্গময়*, এখানে যদিও বলা নেই, কিন্তু প্রার্থনার মূল ভাব হল অপূর্ণতা থেকে আমাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চল। জীবন মানেই তাই, অজান্তায় বা জান্তায় আমরা যা কিছু করছি সবই অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। আপনার, আমার সবারই পথ আলাদা হতে পারে কিন্তু আমরা সবাই, এখানে কোন ব্যতিক্রম নেই, যে চুরি করছে, ডাকাতি করছে, যে পুলিশগিরি করছে, যে মিলিটারির কাজ করছে সবাই অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মূলে রয়েছে ঈশ্বর তত্ত্ব।

ইরান, ইরাকে জুহুদি, পার্সি, খ্রীষ্টান আর ইসলাম এই চারটে ধর্মের জন্ম, যে ধর্মকে আমরা সেমেটিক ধর্ম বলছি। যদিও পার্সি ধর্ম ইরান থেকে বেরিয়েছে, পার্সি ধর্ম পুরোপুরি সেমেটিক ধর্ম নয়, কারণ এদের মাটিটা আলাদা হয়ে গেল। ইস্রায়ালের আশেপাশের লোকেদের সেমাইট বলা হত। সেখান থেকে যে ধর্মগুলি বেরিয়েছে সেই ধর্মগুলিকে বলা হয় সেমেটিক। সেমেটিকে ভাষার সাথে একটা সম্পর্ক আছে। সেইজন্য অনেক সময় এ্যব্রাহামিক বলা হয়। এ্যব্রাহাম ছিলেন ওদের ফাদার, এ্যব্রাহাম থেকে হল জিউস, সেখান থেকেই খ্রীষ্টান আর ইসলাম ধর্ম বেরিয়েছে। এই তিনটে ধর্মকে অনেক সময় সেমেটিকও বলে আবার এ্যাব্রাহামিকও বলে। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আর শিখ ধর্মের জন্ম, আর চীনে তাও ধর্মের জন্ম হয়েছে, এশিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও ধর্মের জন্ম হয়নি। বাকি সব ম্লেচ্ছদের দেশ। ধর্ম মানেই এশিয়া। এশিয়াতেও মূলতঃ মধ্যপ্রাচ্য আর ভারত, চীনকে সেভাবে বলা যায় না কারণ তাও ধর্মের অনুগামী সেভাবে হয়নি। এই চারটে ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল, যতই যিশু অনেক কিছু করে থাকুন বা বলে থাকুন, এদের ভগবান সব সময় আকাশে বসে আছেন, যেখান থেকে তিনি ভালো লোকদের পুরস্কৃত করছেন আর দুষ্ট লোকদের শাস্তি দিচ্ছেন। হিন্দুদের মধ্যেও এই ধারণা রয়েছে কিন্তু যারা খুব সাধারণ মস্তিষ্কের লোক। এদের ঠাকুর অধম ভক্ত বলছেন।

ধর্ম দর্শনের সূক্ষ্ম জিনিষগুলি সবাই ধরতে পারে না, সূক্ষ্ম জিনিষগুলিকে ধরার জন্য একটা আলাদা বুদ্ধির দরকার। তপস্যা করতে করতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম হতে শুরু করে। ঠাকুর যে বলছেন সর্বভূতে তিনিই আছেন, হিন্দুদের পরমাত্মার ব্যাপারে যে ভাব এটাই সেই ভাব। সব কিছু তিনিই হয়েছেন, এই ভাব অন্যান্য ধর্মেও আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এদের বুদ্ধি এতই স্থূল যে তারা এই ভাব ধরতে পারে না। আগের মন্ত্রে পরমাত্মার ব্যষ্টি রূপ বা প্রভু রূপকে নিয়ে বলা হয়েছে। পরের মন্ত্রে সর্বভূতে, সব কিছুতে, সর্বব্যাপী রূপে বা সমষ্টি রূপে বা বিভু রূপে পরমাত্মা কিভাবে আছেন বলছেন। দুটো মন্ত্রে দুভাবে বলা হয়েছে, একটা দেহ কেন্দ্রিত আরেকটি সর্বব্যাপিত্ব। দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অনেক জায়গায় বলা হয় তাঁর আত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে গেল, যোগশাস্ত্রেই আছে। কিন্তু বেদান্তে এই জিনিষ নেই। কারণ দেহস্থিত আত্মা আর সর্বব্যাপী রূপে যে আত্মা, এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কঠোপনিষদেই পরে বলবেন *বায়ুর্যথৈকো ভুবনং*

প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। বায়ু সর্বত্রই আছে, কিন্তু বিভিন্ন পাত্রে বায়ু প্রবেশ করে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। পাত্রকে ভেঙে দিলে বায়ু যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। কিন্তু নচিকেতাকে বোঝানর জন্য যমরাজ বলছেন সেই পরমাত্মা তিনি যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন? সব কিছুর মধ্যে যাচ্ছেন, যেন সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছেন। তিনি প্রবেশ না করলে বস্তু বস্তুই হয়ে থাকবে। এই পেন আমার কাছে একটি জড় বস্তু, কিন্তু বেদান্তীরা বলবেন, না, এর মধ্যেও ঈশ্বর প্রবেশ করে আছেন। আমরা বলতে পারব না যে পেন ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর এই পেনের মধ্যেও আছেন, এটাই ঠিক ঠিক বেদান্ত। তার মানে ঈশ্বর এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ঈশ্বর এর মধ্যে গমন করেছেন, যদিও ঈশ্বরের কোথাও গমন হয় না। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে ঈশ্বর আমার মধ্যেও প্রবেশ করেছেন, আপনার মধ্যেও প্রবেশ করেছেন, পেনের মধ্যেও প্রবেশ করছেন, মানে ঈশ্বর গমন করেন। এই গমন করাকেই দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন *হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোনসৎ*। ঈশ্বরের বিরাট রূপ, বিশ্বরূপ কি রকম হতে পারে দেখাচ্ছেন, তিনি গমন করছেন।

পরে যাঁকে বর্ণনা করবেন তাঁকেই খুব সংক্ষেপে বলছেন *হংসঃ*, ভগবানের একটা নাম হংস। বাংলায় হংস মানে পাখির নাম, কিন্তু সংস্কৃতে হংস মানে যিনি চলেন। ঈশ্বরই একমাত্র যিনি গমন করেন। কোথায় গমন করেন? সব কিছুতে গমন করেন। সেইজন্য বলছেন *তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ*, ভগবানের একটা নাম হংস। যদিও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকে হংসের ব্যবহার করা হয়েছে পরমহংসের প্রতীক রূপে, আসলে তা নয়। হংস বলতে যে পরমহংস বলা হয়, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই অর্থেও নয়। হংস মানে যিনি গমন করেন। হাঁস আকাশের অনেক উপর দিয়ে চলাচল করে, হংসের ঐ যে গতি, ঐ গতি থেকে হংস মানে গতিমান। যিনি গতিমান তাঁকেই হংস বলছেন। ঠিক ঠিক গতিমান ঈশ্বর। ঈশ্বর গতিমান বললে মনে হবে তিনি হুশ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যান, এই অর্থেও হংস বলছেন না। যাবতীয় যা কিছু আছে সবের মধ্যে তিনি প্রবেশ করে আছেন, সেইজন্য তিনি গতিমান। আগেও বলেছেন আর পরেও বলবেন, তিনি অনন্ত, অনন্তের তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কোন জায়গার বাইরে এলে তবেই তো সেখানে যাওয়া যাবে, ঈশ্বরের বাইরে তো কোন জায়গাই নেই, তিনি যাবেন কি করে! তাহলে হংস বলছেন কেন? কারণ আমাদের আপাত দৃষ্টিতে এই যে নানাত্ব ভাব রয়েছে, এই নানাত্বের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন, প্রবেশ করেছেন মানে তাঁর গতি হয়েছে, গতি হয়েছে মানে তিনি যাচ্ছেন। আসলে কোথাও যাওয়া আসা নেই, কিন্তু বোঝানর জন্য এভাবে বলছেন। আত্মতত্ত্বকে বিভিন্ন ভাবে বোঝানর চেষ্টা চলছে।

তাঁর সবচেয়ে বড় উপমা *হংসঃ শুচিষদ্*, সূর্য যা কিনা শেষ বস্তু, যে বস্তু সব কিছুকে পবিত্র করে, এই যে সূর্য গতিমান হয়েছে তাতে তিনিই আছেন। সেইজন্য ভগবানের একটা নাম *শুচি-সৎ*, সূর্য রূপে তিনি গতিমান। হংস মূল গতিমান, ঈশ্বরের যে গতি ঐ গতি আর কারুর হতে পারে না, কারণ তিনি সব কিছুতেই প্রবেশ করেন। আকাশে সূর্য গতিমান, আমরা বলতে পারি, সূর্য নয় পৃথিবী যাচ্ছে। এটা আলাদা তর্ক। এই তর্কে গিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আপাতদৃষ্টিতে দেখছি সূর্য আকাশ দিয়ে যাচ্ছে, সেইজন্য তাঁর নাম হল *শুচি-সৎ*। বসু মানে যিনি সব কিছুকে ব্যপ্ত করেন। যদিও পরের দিকে অষ্টবসুর কথা এসেছে। বসু মানে যিনি সম্পত্তির মালিক। ভগবানের বিভিন্ন নামের মধ্যে একটা নাম বসু। বসু কেন বলছেন, তিনি সব কিছুতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন। *অন্তরীক্ষ-সৎ*, স্বর্গলোক আর পিতৃলোকের মাঝখানে যে অন্তরীক্ষ সেখানে তিনি বায়ু রূপে চলছেন, সেইজন্য তাঁর একটা নাম *অন্তরীক্ষ-সৎ*। সূর্য যেমন ভগবানের রূপ তেমনি বায়ুও ভগবানেরই আরেকটা রূপ। সব কিছুতে ব্যপ্ত, এই ব্যপ্তি জিনিষটাও ভগবানেরই রূপ।

হোতা, বেদের যজ্ঞে আহুতি প্রদানকারী পুরোহিতকে বলা হয় হোতা। বেদে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হয়, অগ্নির আরেক নাম তাই হোতা। অগ্নি রূপে যিনি তিনি ভগবান, সেইজন্য ভগবানের আরেকটা নাম হোতা। অগ্নি রূপে তিনিই আছেন। আচার্যও বেদের একটা মন্ত্র '*অগ্নির্বৈ হোতা*' উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন অগ্নিই হোতা। *বেদি-সৎ*, যেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় বেদি। কিন্তু ঋগ্বেদে এক জায়গায় আসে '*ইদং বেদিঃ পরোহন্তঃ পৃথিব্যাঃ*', এই পৃথিবী হল বেদির উৎকৃষ্ঠ মধ্য ভাগ। যদিও আমরা পূজা, পাঠ, যজ্ঞ, প্রার্থনা পঞ্চাশ রকমের জিনিষের কথা বলি, কিন্তু ঋষিদের কাছে ঈশ্বরের বিরাট রূপ, সর্বব্যাপী রূপই ছিল প্রধান। বিরাট রূপে ঈশ্বরের যে পূজা চলছে তাতে ঋষিরা পৃথিবীকে খুব ছোট্ট দেখছেন। শুধু ছোটই দেখছেন না, পুরো

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বেদি, সেই বেদির মধ্যভাগ যেন এই পৃথিবী। সেইজন্য পৃথিবীকেই বেদি বলা হয়। *বেদি-সৎ*, ভগবান পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে আছেন। গীতাতেও ভগবান বলছেন *গামাবিশ্য*, এই পৃথিবীর মধ্যে তিনি ঢুকে আছেন যাতে পৃথিবীটা ফেটে না যায়। কিন্তু এখানে অন্য রূপে বলছেন। *অতিথির্দুরোনসৎ*, *দুরোন* মানে কলস, যজ্ঞে যে সোমরস ব্যবহৃত হত সেই সোমরসকে কলসে রাখা হত, সোমরসের আরেকটা নাম অতিথি। সোমরসকে আবার সাক্ষাৎ ভগবান বলা হয়। তাই বলছেন যজ্ঞের সোমরস ভগবান নিজে। এটাকেই গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান আরও সহজ করে বলছেন, এর মধ্যে আমি এটা, ওর মধ্যে আমি সেটা। এখানে সেই বিরাট রূপকে অন্য ভাবে বলছেন। আচার্য আবার বলছেন *দুরোন* শব্দের আরেকটি অর্থ বাড়ি। দুরোন মানে যার মধ্যে জিনিষ থাকে। দ্রোণাচার্যের জন্ম কলসের মধ্যে হয়েছিল, সেখান থেকে দ্রোণ নাম হয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতে অতিথি হলেন ভগবান। তুমি যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও, তোমার গৃহে যে অতিথি এসেছেন তিনিই সেই ঈশ্বর। পরের দিকে *অতিথিদেবো* ধারণা এখান থেকেই এসেছে। আচার্যও বলছেন *ব্রাহ্মণোঽতিথিরূপেণ বা দুরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি*, দুটো অর্থেই বলা হচ্ছে, যজ্ঞের সময় কলসের মধ্যে যে সোমরস থাকে সেই সোমরস ভগবান, তার সাথে এটাও বলছেন তোমার বাড়িতে যে অতিথি এসেছেন তিনি ভগবান।

মানুষের মধ্যেও তিনিই বাস করেন, *নৃষৎ*। যত বার সৎ আসছে তার মানে ওর মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন, প্রবেশ করেছেন মানে তিনি ওখানে গমন করেছেন। এত কিছু বলার পর এবার আরও সুনির্দিষ্ট করে বলছেন *নৃষৎ*, মানুষের মধ্যে তিনি ঢুকে আছেন। ঠাকুরও কতবার বলছেন, মুর্তিতে পূজো হতে পারে আর জ্যান্ত মানুষে পূজা হবে না! আমরা বলছি স্বামীজী মানুষের পূজার কথা বলছেন, মানুষের পূজার কথা স্বামীজীই বলছেন না, উপনিষদেই বলছে *নৃষৎ*। ভগবানের একটা নামই *নৃষৎ*, যিনি মানুষের মধ্যে গমন করেছেন। ভারত নতুন কোন কথা নেবে না। স্বামীজী যদি বলতেন ঠাকুর দেবতার পূজা ছেড়ে তুমি শুধু মানুষের পূজাই কর, ভারতবর্ষ কখনই নিত না। বেদ উপনিষদের যে জিনিষটাকে এর আগে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে আসা হয়নি, নতুন অবতার বা যুগপুরুষ যখন আসেন, তখন তিনি সেই জিনিষটার উপর বেশি জোর দেন। এর আগে এত কিছু বলা হল *শুচিষৎ*, *বেদিষৎ*, *দুরোণষৎ* সব কটাকে সরিয়ে *নৃষৎ* এটাকে ধর। এটাই স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য। সোমরাজার পূজা করতে বলছেন, সূর্যের পূজা করতে বলছেন, সব পূজো এখন বন্ধ থাক এখন তোমরা *নৃষৎ* এটার উপর তোমাদের সব কিছুকে কেন্দ্রিত কর। এতেই তোমাদের সবার মঙ্গল হবে, ভগবান একেবারে সাক্ষাৎ তোমার সামনে রয়েছেন। তুমি অদৃশ্য দেবতার পূজা করতে পার আর সাক্ষাৎ দেবতার পূজা করতে পারবে না! যে পরমেশ্বর সূর্য রূপে আকাশে গমন করছেন, যে পরমেশ্বর বায়ু রূপে অন্তরীক্ষে গমন করছেন, যে পরমেশ্বর পৃথিবী রূপে আছেন সেই পরমেশ্বরই মানুষ রূপে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। *বরসৎ* দেবতাদের মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রবেশ করেছেন। ঠাকুর বলছেন ভগবান কত রূপে লীলা করেন, তিনি মানবলীলা করেন, দেবলীলা করেন, জগৎলীলা করেন। ইন্দ্রাদি যত দেবতা সব ভগবনাই হয়েছেন। *বরসৎ*, বর মানে যিনি বরেণ্য, যিনি শ্রেষ্ঠ, প্রাণী জগতে দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়। *ঋতসৎ*, ঋতম্ মানে সত্য, ঋতমের অন্য অর্থ যজ্ঞ। যজ্ঞের যে এত মাহাত্ম্য কারণ যজ্ঞের মধ্যে তিনিই প্রবেশ করে আছেন।

বেদে ঋতম্ শব্দকে অনেক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও ঋতমের অর্থ হয় সত্য, কোথাও ঋতমের অর্থ ধর্ম। ঋতমের ধর্ম অর্থকে ইংরাজীতে অনুবাদ করলে সহজে বোঝা যায়, বরঞ্চ আমাদের ভাষায় অনুবাদ করে বোঝালে কঠিন মনে হবে, ইংরাজীতে বলে inviolable law, যে নিয়মকে অতিক্রম করা যায় না। জগতে কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মকে অতিক্রম করা যায় না। জগতের যে নিয়মগুলি আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, পরিস্থিতি অনুযায়ী তার অনেক নিয়ম পাল্টে যেতে পারে। যেমন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুযায়ী উপর থেকে সব কিছু নীচের দিকে যায়, কিন্তু ধুয়ো আবার উপরের দিকে যায়, সেখানে Law of buoyancy কাজ করে। কিন্তু যারা Law of buoyancy জানে না তার মনে করবে নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। প্রকৃতিতে যেমন অনেক নিয়ম আছে যে নিয়মগুলো সব সময় এক ভাবে চলে না, কোন এক সময় নিয়মগুলো পাল্টে যায়, তেমনি অনেক ধর্ম বা নিয়ম আছে যা কোন সময়েই পাল্টায় না, যেমন অগ্নির সঙ্গে দাহিকা শক্তি। অগ্নি শীতল হয়ে গেলে তাকে আর অগ্নি বলা যাবে না, তখন তার অন্য কিছু নাম হয়ে যাবে। কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মের উপর আধার করে ভগবান এই সৃষ্টির রচনা করেন। ভগবানের তাই একটা নাম ঋতম্। কারণ তিনি নিয়মকে আধার করে এই সৃষ্টি করেছেন, ঐ নিয়মকে আশ্রয় করেই জগৎ চলে। এই নিয়মগুলিকেও ঋতম্ বলা

হয়। ঋতমকে কেউ কোন দিন অতিক্রম করতে পারবে না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সেটাই ঠিক ঠিক নিয়ম যে নিয়মের কোন অবস্থাতেই ব্যতিক্রম হবে না। পৃথিবী যে নিয়মে চলছে, চন্দ্রমা বা অন্য কোন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি সেই নিয়ম পাল্টে যায় তাহলে তাকে ঋতম্ বলা যাবে না। স্বামীজী যখন এই কথা বলছেন তখন তিনি ঋতম্ জিনিষটাকে মাথায় রেখেই বলছেন। কারণ নিয়ম সচরাচর পাল্টায় কিন্তু ঋতম্, যার উপর আধার করে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, সেটা কখনই পাল্টে যাবে না। সমস্যা হল, আমাদের স্থূল মানসিকতার জন্য আইন বা নিয়ম বলতে আমরা মনে করি দেশের সংবিধানের মত কিছু জিনিষের কথা বলা হচ্ছে। আরেকটু উন্নত মনের হলে পদার্থ বিজ্ঞানের, রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মগুলিকে সূক্ষ্ম নিয়ম বলে মনে করবে। কিন্তু তার থেকেও যে সূক্ষ্ম নিয়ম আছে আমরা সেগুলোকে ধারণাই করতে পারি না। যেমন একটা নিয়মের কথা আচার্য শঙ্করও বারবার বলছেন, যেটাই যৌগিক পদার্থ সেটাই আজ হোক বা কাল হোক তার মিশ্রণগুলি ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যদি না ভাঙে তাহলে ওটা মিশ্রণ নয়। এটাও একটা ঋতম্। কিন্তু ঋতম্ বলতে বোঝায় যে জিনিষটা কোন পরিস্থিতিতেই পাল্টাবে না। এটাই ভগবানের বিধান। স্বামীজী সেইজন্য ঠাকুরের আরাত্রিক বন্দনায় বলছেন *ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্য*, ওঁ ঠাকুরেরই নাম, হ্রীং ঠাকুরেরই নাম তেমনি ঋতমও ঠাকুরের একটি নাম। একদিকে তিনি গুণের অতীত আবার অন্য দিকে তিনি গুণে পরিপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধের একটা নাম ধর্ম, তিনি ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেছিলেন। ধর্ম মানেই ঋতম্, ভগবান বুদ্ধ নিজেই সেটা। বিদেশী ধর্মের মধ্যে জহুদি ধর্মে নিয়মের আধিক্য সব থেকে বেশি, ওদের ধর্ম মানেই নিয়ম। কিন্তু জুহুদিদের নিয়ম ঋতম্ অর্থে আসে না, ধর্মের বিধি অর্থেই আসছে। এই বিধিকে তারা মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলে দিচ্ছে তুমি কিভাবে চলবে। জহুদিদের ধর্ম হল ঠিক ঠিক বিধির উপর আধারিত ধর্ম।

ঋতম্ জগতে তার সূক্ষ্মতম রূপেই আসে কিন্তু তার বাকি জিনিষগুলিকে আমরা স্থূল রূপেই দেখি। স্থূল রূপ হওয়া মানেই সেখানে মিশ্রণ হয়ে যাচ্ছে। যেমন আগুনে জল ঢাললে আগুন নিভে যায়, কিন্তু পেট্রলে আগুন লাগলে জল দিলে আগুন আরও ছড়িয়ে যায়। সেইজন্য পেট্রল পাম্পে বালতিতে বালি রাখা হয়। এখানে দুটো নিয়ম লাগছে, জল আগুন নিভিয়ে দিচ্ছে কারণ জল গিয়ে দাহ্য পদার্থকে ঢেকে দিয়ে অক্সিজেন সরবরাহটা বন্ধ করে দেয়। তাহলে পেট্রল কেন জ্বলবে? কারণ পেট্রল জলের থেকেও হাল্কা বলে জলের উপর ভাসবে, সেইজন্য আরও জোর জ্বলবে। এখানে দুটো নিয়ম এসে যাচ্ছে, তাহলে ঋতম্ আর হল না। ঋতম্ কিন্তু থাকছে, জল যে দাহ্য পদার্থের অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে দেবে এই নিয়মটা সব সময়ই থাকছে, কিন্তু পেট্রলে এসে নিয়ম থাকছে না। এটাই বলা হচ্ছে, আমরা যখন দেখছি তখন সব কিছুকে স্থূল ভাবে দেখছি। কিন্তু সূক্ষ্ম রূপে দেখার ক্ষমতা যখন আসবে তখন বোঝা যাবে নিয়ম কোন ভাবেই অতিক্রমণ হবে না।

ঋতমের সূক্ষ্ম রূপ হল যজ্ঞ। যজ্ঞে আহুতি দিলে ফল পাবেই পাবে। যজ্ঞের ফল হল ঋতমের সন্তান। সেইজন্য বলছেন, *ঋতজা*, ঋতম্ থেকে যার জন্ম। যজ্ঞ ভগবানেরই রূপ, যজ্ঞকেই পরে মানুষের জীবনে কর্মের উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন যজ্ঞ করলে ফল পাওয়া যাবে তেমনি ভালো কর্ম করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। সেইজন্য কর্ম আর ঋতম্ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। কিন্তু আচার্য ঋতজা যজ্ঞকেই বলছেন। কারণ বেদের সময় যজ্ঞই ছিল প্রধান, কর্মের তত প্রাধান্য ছিল না। আর ঋতজা যজ্ঞই হয়, কারণ ঐ জায়গাতে ঋতম্ সূক্ষ্মতম থাকে। আমাদের জীবনে আসতে আসতে এমন মিশ্রণ হয়ে যায় যে, যার ফলে আর আলাদা করে দেখা যায় না। ঋতমের বিপরীত অনৃতম্। যে জিনিষকে আমরা অতিক্রম করতে পারব সেই জিনিষটাই অনৃতম্। যজ্ঞ কখনই অনৃতম্ হতে পারবে না, যজ্ঞ সব সময় ঋতম্ থাকবে, যজ্ঞ করল আর যজ্ঞের ফল পেল না, এই জিনিষ কখন হবে না। অনৃতম্ অর্থাৎ যখন মিশ্রণ হয়ে যায় তখন মানুষ তাকে অতিক্রম করত পারে।

ব্যোমসৎ, আকাশে যারা বিচরণ করে, এখানে পাখি অর্থেই বলা হচ্ছে। আকাশে যে জিনিষগুলি চলে সেখানেও তিনি প্রবেশ করে আছেন তাই তাঁর আরেকটি নাম *ব্যোমসৎ*। *অব্জা* মানে জলে যার জন্ম, আচার্য অব্জার অর্থ করে বলছেন *অপ্সু শঙ্খ-শুক্তি-মকরাদিরূপেণ জায়ত ইতি*, জলে শাঁখ, ঝিনুক, মাছ, কুমির রূপে ভগবান নিজেই হয়েছেন। অবতারদের মধ্যেও অব্জা আছে, মৎস্যাবতার, কুর্মাবতার ইত্যাদি। জলে যা কিছুর জন্ম তাতে ভগবান নিজে গমন করেছেন। *গোজা*, গো মানে পৃথিবী বা পৃথিবীকে দিয়ে, পৃথিবীতে যা কিছু জন্ম

নেয়, তার মানে ধান, গম, যবাদির যা কিছু জন্মাচ্ছে সব সাক্ষাৎ ভগবান। *ঋতজা*, যজ্ঞ থেকে যা কিছুর জন্ম হয় যেমন বৃষ্টি আদি, এটাও তিনি। আর *অদ্রিজা*, পাহাড়ে যাদের জন্ম, তার মানে নদ-নদী, এগুলোও তিনি।

হংসঃ, শুচিষৎ, অন্তরীক্ষসৎ, হোতা, বেদিষৎ, অতিথি দুরোণসৎ, নৃষৎ, বরসৎ, ঋতসৎ, ব্যোমসৎ, অব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা এত ভাবে তিনি জন্মেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঋতম্। কেন? *সর্বাত্মাপি সন্*, সর্বভূতে তিনিই রয়েছেন আর তিনি সত্যস্বরূপ, সত্যস্বরূপ মানে তাঁর ভাবের কখন পরিবর্তন হয় না। ভাব পরিবর্তন না হওয়ার অর্থ কি? আত্মার মূল সংজ্ঞা হল ঋতম্। যদিও আত্মাকে আমরা অনেক পরিভাষায় ব্যক্ত করি কিন্তু আত্মার খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হল ঋতম্। ঋতম্ মানে যা কখনই পাল্টায় না। আমাদের সব কিছুই পাল্টায়, মানুষ, বন্ধুত্ব, শরীর পাল্টে যায়, মন, বুদ্ধি সব পাল্টে যায় কিন্তু আত্মা কখনই পাল্টাবে না। এই আত্মা যাঁকে হংস বলছেন, তিনি সব কিছুতে গমন করছেন। যিনি গমন করেন তাঁর তো পরিবর্তন হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না, এটাই আশ্চর্যের। যত কিছু বলা হল সব কিছুতে তিনি গমন করছেন কিন্তু তাঁর কোন পরিবর্তন নেই, সেইজন্য তিনি ঋতম্। এতক্ষণ অব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা বললেন, আমরা যাতে ভুল না বুঝি সেইজন্য আবার বলে দিচ্ছেন তিনি ঋতম্, তিনি অপরিবর্তনশীল।

তার সাথে বলছেন সব কিছুর তিনিই কারণ। অন্তরীক্ষ, আকাশ, দেবতা, মানুষ, অব্জা, গোজা সব কিছুর তিনিই কারণ। তিনিই সব কিছুকে জন্ম দিয়েছেন, সেইজন্য তাঁর আরেকটা নাম বৃহৎ, সব কিছুর থেকে তিনি বড়। মূল বক্তব্য হল, আত্মা সেই এক, সেই একই সর্বব্যাপী, তিনি অনন্ত। সর্বব্যাপী হওয়ার জন্য ছোট থেকেও ছোট যা কিছু আছে তার মধ্যেও তিনিই ঢুকে আছেন। এই যে তিনি ঢুকছেন, সেই জন্য সেই জিনিষটার ঐ বিশেষ নাম। যদিও সব নাম নেওয়া সম্ভব নয়, সেইজন্য মোটামুটি এই কটি নাম দিয়ে সব কিছুকেই বুঝিয়ে দেওয়া হল। ভগবানের যে বিরাট স্বরূপ, তিনি সর্বব্যাপী, কোন কিছু এমন নেই যেখানে তিনি নেই, এই জিনিষটাকেই দ্বিতীয় মন্ত্রে বোঝাচ্ছেন। প্রথম মন্ত্রে দেখাচ্ছেন *পুরমেকাদশদ্বারম*, সবার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন তিনিই সে আত্মা। পরের মন্ত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিষের নাম উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন, এসবের মধ্যেও তিনিই আছেন। সেইজন্য পাশ্চাত্যের প্রচলিত ঈশ্বর ধারণার সাথে এই ধারণা কখনই মিলবে না। সাপের মধ্যেও তিনি আছেন, বিছার মধ্যেও তিনিই আছেন। মাথার উকুন থেকে শুরু করে বিছানার ছারপোকা সবেতে তিনিই আছেন। ভগবানের এই ধারণা কোন ধর্মই মানবে না। এখানে মানামানির কোন ব্যাপার নেই, হিন্দু ধর্মে এই ধারণাকে মূলধন করেই আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়। তাই বলে ছারপোকা, মশা কেউ মারবে না! অবশ্যই মারবে, কারণ জীবনটাও তাঁর মৃত্যুটাও তাঁর। বিছানায় ছারপোকা থাকলে সে বেচারী শুতে পারবে না বসতেও পারবে না। সেইজন্য ধর্মের গতিকে অত্যন্ত কঠিন বলছেন। এসব শুনতে খুবই ভালো লাগে কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। একদিকে আমি জানি যিনি নারায়ণ তিনিই সাপ হয়েছেন, তিনিই বিছে হয়েছেন, কিন্তু আমাকেও বাঁচতে হবে। ঠাকুর হাতি নারায়ণ আর মাহুত নারায়ণের কথা বলছেন, ঠাকুর অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে বলছেন। তোতাপুরী ঠাকুরকে একদিন বলছেন ওনাদের আশ্রমে এক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তিনি সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে চলতেন। তিনি ঈশ্বরের সেই বিরাট রূপ দেখছেন। সব কিছুকে গ্রহণ করার ক্ষমতা যদি কারুর মধ্যে চলে আসে, ঠাকুরের অশেষ কৃপা যদি হয়, তাহলে সে বুঝতে পারবে দ্বিতীয় মন্ত্র কি গভীর তাৎপর্য বহন করছে। এই মন্ত্র এখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে আসেনি, এই ধরণের মন্ত্র পরেও এসেছে, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি* এখানেও একই কথা বলছেন। অন্যান্য অনেক মন্ত্রেও একই কথা পাওয়া যাবে। কিন্তু এই মন্ত্রে কাব্যিক সৌন্দর্য এবং দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার চরম সত্যকে একসাথে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা অনেকগুলো শব্দকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেন যেমন transcendent reality, immanent reality, monotheism, pantheism, ইত্যাদি শব্দ। হিন্দু ধর্মকে পরিভাষিত করতে গিয়ে এনারা সব সময় বলবেন হিন্দু ধর্ম হল pantheism, ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং যে অর্থে বলতে চাইছেন আমাদের এখানে ঠিক সেই অর্থে নেওয়া হয় না। বেদান্তে হওয়া বলে কিছু নেই, তিনি হয়েছেন নয়, তিনিই আছেন। যা কিছু দেখছি এটাই মায়া। উপনিষদ বিভিন্ন ভাবে আমাদের এই মায়ার বোধটা ভাঙার চেষ্টা করছেন। প্রথমে শরীরকে দিয়ে, তুমি নিজেকে যে শরীর মনে করছ এটাকে ভাঙছেন। এরপর শরীরের বাইরে যে জগৎকে দেখছি সেই জগৎকেও একটা একটা করে ভাঙছেন।

সেটাই এখানে এক এক করে বললেন *হংসঃ শুচিষদ্ বসুঃ অন্তরিক্ষসৎ হোতা বেদিষৎ*। এরপর আবার শরীরের উপর নিয়ে আসছেন। ঋষিদের মূল উদ্দেশ্য হল আত্মার স্বরূপ জ্ঞান মানুষকে ধারণা করানো। আচার্য বলছেন *লিঙ্গমুচ্যতে*, লিঙ্গ মানে স্বাতন্ত্রসূচক চিহ্ন। হাওড়া স্টেশনে আমি একজনকে রিসিভ করতে গেছি। আমি তাকে চিনি না, ঐ ভিড়ের মধ্যে আমি বুঝব কি করে যে ইনিই সেই ব্যক্তি যাকে আমি রিসিভ করতে এসেছি। যে জিনিষটাকে দিয়ে আমি তাকে চিনব সেটাকে বলা হয় লিঙ্গ। লিঙ্গ মানে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ নয়, লিঙ্গ মানে distinctive mark। তখন আমাকে বলে দেওয়া হল, ট্রেন থেকে নামার পর দেখবে একজন আনন্দবাজার পত্রিকা নাড়াতে নাড়াতে আসছে। ঐ ভিড়ের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা নাড়া দেখেই আমি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলব আপনিই তো অমুক। এটা না হয় শালগ্রাম শিলা কিন্তু শিবের শিলার distinctive mark কি? তখন বলে দেওয়া হল শিবলিঙ্গ এই রকম হবে। এখানে এবার আত্মার distinctive markকে আরও সংহত করা হচ্ছে। প্রথম আর দ্বিতীয় মন্ত্রে যে বলা হল এর মধ্যে লিঙ্গ কি করে বুঝব? তখন বলছেন –

উর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।।২/২/৩।।

(যিনি প্রাণবায়ুকে উর্ধ্বে সঞ্চালিত করেন এবং অপানবায়ুকে অধোদিকে নিক্ষেপ করেন, হৃদয়মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই উপাস্য আত্মাকে ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করে।)

আত্মাকে প্রাণ রূপে সংশয় করা খুব স্বাভাবিক, কারণ প্রাণের সূক্ষ্মতম অবস্থার পরেই আত্মা। কিন্তু দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। অন্যান্য সব কিছুর সাথে প্রাণ বা শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। জড় আর শক্তি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। জড়ের যে আকার হয়েছে সেটাও শক্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। কিন্তু শক্তি বা প্রাণের পরেই যে সূক্ষ্মতম অবস্থা সেটাই আত্মা, যদিও প্রাণের সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। এই শরীরে এবং সমগ্র সংসার জুড়ে যত রকম কার্য চলছে সবটাই সেই প্রাণনক্রিয়াতেই চলছে। প্রাণ মানেই শক্তি, সজীব প্রাণীর মধ্যে যে প্রাণনক্রিয়া চলছে তাকে প্রাণ বলা হয় আর এর বাইরে অন্যান্য জায়গায় প্রাণনক্রিয়া না বলে শুধু শক্তি বা এনার্জিই বলে, শরীরের সাথে অন্য জিনিষের প্রাণনক্রিয়ার পার্থক্য করার জন্য প্রাণ বলছেন। কিন্তু উচ্চ তত্ত্বে সব সময় প্রাণই বলা হয়, স্বামীজীও সব সময় আকাশ ও প্রাণ শব্দ ব্যবহার করছেন। কিন্তু আমরা সাধারণত প্রাণ বলতে মনে করি যে কোন প্রাণীর মধ্যে যে শক্তির সঞ্চালন হয় সেটাই প্রাণ।

মধ্যে বামনমাসীনং, শরীরের মধ্যে আত্মা রাজার মত বসে আছেন। যেমন একটা নগরীর মধ্যে সব রকম লোক কাজ করছে, সেই নগরীতে একজন রাজাও বসে আছেন। ঠিক তেমনি এই শরীরের মধ্যে একজন রাজা বসে আছেন। সেই রাজার বৈশিষ্ট্য কি? *উর্ধ্বং প্রাণম্ উন্নয়তি*, হৃদয়ের উপরে প্রাণ কাজ করছে, *অপানং প্রত্যগস্যতি*, হৃদয়ের নীচে অপান কাজ করছে। আর হৃদয়ের মাঝখানে আত্মা রাজা হয়ে বসে আছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমাদের প্রাণ সম্বন্ধে জেনে নেওয়া দরকার। প্রাণ পাঁচ রকমের, পাঁচটাকে মিলিয়ে পঞ্চপ্রাণ বলা হয়। প্রথমটাকেও প্রাণ বলা হয়। প্রাণ উপরের দিকে যায়, প্রাণের ক্রিয়া আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে ভালো বোঝা যায়। প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া মানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। হৃদয়ের উপরে যে প্রাণনক্রিয়া হয় তাকে বলছেন প্রাণ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণের প্রকাশ। স্বামীজী প্রাণকে flying wheelএর সাথে তুলনা করছেন। দ্বিতীয় প্রাণের নাম অপান, হৃদয়ের নীচে যে প্রাণশক্তি কাজ করছে, যে ভুক্তদ্রব্যগুলি হজম করা যাচ্ছে না, সেগুলোকে শরীর থেকে বার করে দেওয়া অপানের কাজ। আমাদের শরীরের যে মল-মুত্র-বায়ু বিসর্জন হয় এটাই অপান ক্রিয়া। প্রাণ বাইরে থেকে বাতাস নিচ্ছে, ঐ বাতাস থেকে প্রাণ শরীরে শক্তি সরবারহ করছে। প্রাণ মানেই শক্তি সরবরাহ করছে, কিন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। অপান ক্রিয়া যদি বন্ধ হয়ে যায়, মল-মুত্র বিসর্জন যদি বন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরে রোগ সংক্রমণ হতে শুরু করে দেবে। অপানও তার শক্তি প্রাণ থেকেই পায়। তৃতীয় ব্যান, সমস্ত শরীরে যত স্নায়ু নাড়ি ছড়িয়ে আছে, ব্যান সেই স্নায়ুতে শক্তি সঞ্চালন করে। একটুতেই ভয় পাওয়া, একটুতেই রেগে যাওয়া, হাত, ঠোঁট কাঁপা, বুঝতে হবে ব্যান ঠিক মত কাজ করছে না, ব্যানের প্রাণন ক্রিয়ার দুর্বলতাকে আমাদের ভাষায় বলি স্নায়ু দৌর্বল্য। আমরা যা কিছু খাদ্যদ্রব্য আহার করছি, খাদ্যদ্রব্য হজম করার পর রক্তের সাথে খাদ্যের শক্তি শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই কাজ যে প্রাণশক্তিতে সম্পন্ন হয় তাকে সমান বলছেন। সমান আর ব্যান দুটোই শরীরে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু ব্যান

কাজ করে স্নায়ুতে আর সমান কাজ করে রক্তের মধ্য। উদান কণ্ঠদেশে থাকে আর মৃত্যুর সময় উদানের সাহায্যে জীবের প্রাণশক্তিটা বেরিয়ে যায়। জীবের মৃত্যুকেও প্রাণনক্রিয়া বলছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্টোটাই বলে, শরীরের কোন system কাজ করছে না তাই মারা গেছে। বেদান্ত কিন্তু তা বলছে না, শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া মানে একটা বিশেষ ধরণের প্রাণশক্তি সেখানে কাজ করছে, তার নাম উদান। উদান যদি ঠিক ভাবে কাজ না করতে পারে মানুষের প্রাণ বেরতে পারবে না, ছটফট করবে। উদান মানুষকে মরতে সাহায্য করে। সবটাই প্রাণনক্রিয়া, অপান যেমন প্রাণনক্রিয়া প্রাণও প্রাণনক্রিয়া, উদানাও প্রাণনক্রিয়া। খাওয়া দাওয়া করছে কিন্তু স্বাস্থ্য ঠিক নেই, তার মানে সমান ঠিকমত কাজ করছে না। উদানকেও বায়ু বলছেন, বায়ু মানে শক্তি, যে শক্তির সাহায্যে এক বিশেষ ধরণের প্রাণন ক্রিয়া চলে। আসলে বেদান্তের কাছে শরীরের কোন দান নেই, জীবাত্মা যিনি ভেতরে আছেন মূল্য তাঁরই। ঠেলে ভেতরে ঢোকার জন্য যেমন একটা শক্তি লাগে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যও একটা শক্তি লাগে। ভিড় ট্রেনে ঠেলে ঢোকার জন্য একটা শক্তি লাগে, ভিড় ট্রেন থেকে নামার সময়ও সহজে নামা যাবে না, অনেক ধাক্কাধাক্কি দিয়ে নামতে হবে। এখানে শরীর থেকে কে বেরিয়ে যাচ্ছেন? জীবাত্মা বেরিয়ে যাচ্ছেন। ঢোকা আর বেরনো এটা কোন ব্যাপার নয়, মূল হল action, action মানে শক্তি, শক্তি মানে প্রাণন। মরার সময়েও প্রাণশক্তি লাগে, এই প্রাণশক্তির বিশেষ নাম উদান। উদান যদি ঠিক না থাকে, দিনের পর দিন বিছানায় পড়ে আছে মরার সময় হয়ে গেছে কিন্তু মরছেই না। অনেকের মস্তিষ্ক মৃত হয়ে যাওয়ার পরেও দশ বছর ধরে পড়ে আছে, তার মানে উদান কাজ করছে না। যার উদান খুব শক্তিশালী তার প্রাণ ঠাক্ করে বেরিয়ে যাবে, কেউ টেরই পাবে না। যোগীরা যখন শরীর ছাড়েন তখন পুরো সজাগ, কারণ উদানের উপর তাঁদের পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে। আমরা বলছি প্রাণ বেরিয়ে যায় কিন্তু প্রাণ বেরোয় না, বেরোয় জীবাত্মা। জীবাত্মা, যিনি মালিক ভেতরে বসে আছেন, তিনি যে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন তার জন্য জীবাত্মার একটা শক্তি দরকার। সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিলে পাঁচটা প্রাণই ঠিক হয়ে যায়। প্রাণায়াম মানেই তাই, বিশেষ পদ্ধতিতে সচেতন ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে পাঁচটা প্রাণই সতেজ থাকে, তাতে শরীরে রোগব্যাধির আক্রমণও অনেক কমে যায়। তবে উপযুক্ত গুরুর কাছে প্রাণায়ামের প্রশিক্ষণ না নিয়ে নিজে থেকে কখনই প্রাণায়াম করতে নেই।

উর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি, এখানে দুটি প্রাণ, প্রাণ আর অপানের কথা বলছেন, কিন্তু দুটিকে দিয়ে পুরো পঞ্চপ্রাণের কথাই বলা হচ্ছে। *মধ্যে বামনমাসীনং*, বামন মানে যাঁকে পূজো করা হয়, ভজনীয় যিনি। পাঁচটি প্রাণ মিলিটারি কমাণ্ডারদের মত কাজ করছে আর মাঝখানে তিনি রাজার মত বসে আছেন। তিনি কে? সেই অন্তর্যামী আত্মা, তাঁর চারিদিকে সবাই দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে যাচ্ছে। শুধু কাজ করছে না, *বিশ্বে দেবা উপাসতে*। আচার্য এখানে নিজের তরফ থেকে বলছেন *তং মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তং*, হৃদয়াকাশে যে আত্মা আসীন, এই আত্মার অভিব্যক্তি বুদ্ধিতে, বুদ্ধির ক্রিয়াতে তাঁর প্রকাশটা বোঝা যায়। '*বিশ্বে দেবা*' এটাকে ভালো করে বোঝা দরকার। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পেছনে যে দেবতারা আছেন তাঁরা কাজ করেন। বেদান্তের একটা মত যে, আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে তাদের সবার পেছনে একজন করে দেবতা রয়েছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে বিভিন্ন কার্য চলছে সেখানেও এই দেবতারা আছেন। যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দেবতা হলেন আদিত্য অর্থাৎ সূর্য দেবতা। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সেই দেবতা আমাদের হয়ে কাজ করছেন। শুধু চোখ নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর পেছনেও একজন করে দেবতা আছেন, সেই দেবতারাও আমাদের হয়ে কাজ করছেন। কি ধরণের কাজ করছেন, চোখ দেখছে দেখার পর আমাদের তথ্য দিচ্ছে। চক্ষুর অধিষ্ঠান দেবতা হলেন সূর্য। সূর্যের মত একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা আমাদের মত অপদার্থের জন্য কি কখন কাজ করবেন? কোন মন্ত্রীকে তার পিওন যদি তার বাড়িতে ঝাঁটা দিতে বলে মন্ত্রী কি পিওনের বাড়িতে গিয়ে ঝাঁটা দেবে কখন? কোন দিন মন্ত্রী ঝাঁটা দেবে না, কারণ মন্ত্রী উপরওয়ালা আর পিওন তাঁর অধস্তন। তেমনি ইন্দ্রিয়গুলির পেছনে যে দেবতার আছেন তাঁরা কি কখন আমাদের মত অতি নগণ্যদের জন্য কাজ করবেন? কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দেবতারা, যাঁরা বিশ্বে দেবা, তাঁরা আমাদের শরীরে কাজ করে যাচ্ছেন। তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের থেকে কোন উচ্চতর পদমর্যাদার পুরুষের জন্যই কাজ করছেন। সেই যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তিনি কে? তিনিই সেই আত্মা। তিনি কোথায়? শরীরের ভেতরে তিনি রাজার মত বসে আছেন, তিনি আছেন বলে সবাই দৌড়াচ্ছে, চোখ, কান, নাক সবাই কাজ করছে। তাঁর জন্য এই পঞ্চ প্রাণ দৌড়াচ্ছে। আচার্য এখানে উপমা দিচ্ছেন, একটা রাজ্যের বৈশ্যরা

যেমন রাজাকে কর প্রদান করে ঠিক তেমনি পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয় এরা রাজাকে সেবা করে যাচ্ছে। চোখ এসে বলছে হুজুর অমুককে দেখলাম, কান এসে বলছে হুজুর অমুক খবর শুনলাম, নাক এসে বলছে হুজুর একটা গন্ধ পেলাম। কাকে সব খবর দিচ্ছে? রাজাকে। রাজা কে? সেই আত্মা। রাজা কোথায় বসে আছেন? ঠিক সেই মধ্য ভাগে যাঁর উপরে প্রাণ কাজ করছে যাঁর নীচে অপান কাজ করছে। মাঝখানে হৃদয়াকাশ, ওটাই রাজার স্থান, ওখানে কেউ যেতে পারবে না। এটাই এখানে বলছেন *ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি*। মাঝখানে একটা space আছে যেটা untouched, যেখানে প্রাণন ক্রিয়া হয় না, যেটা চৈতন্যের জায়গা। যাঁকে কর দেওয়ার জন্য সমস্ত দেবতারা ছুটোছুটি করে যাচ্ছেন।

এখানে ইন্দ্রিয় না বলে *বিশ্বে দেবা* বলছেন, কারণ ইন্দ্রিয়গুলো কিছুই না। একজন থানায় গিয়েছিল, সে বলছে – দেখলাম হঠাৎ একজন এসে বলল এসপি সাহেব এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা লাঠি আর রাইফেল দৌড়ে গেল। লাঠি রাইফেল কখন কি দৌড়ায়? লাঠি হাতে কনস্টেবল দৌড়াচ্ছে, রাইফেল হাতে ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর দৌড়াচ্ছে। আমরা বলব লাঠি নিয়ে দৌড়াচ্ছিল তাহলে কনস্টেবল হবে, রাইফেল নিয়ে দৌড়াচ্ছিল তাহলে আর্মড ফোরসেস হবে, রিভলবার নিয়ে যাচ্ছিল তাহলে ইন্সপেক্টর হবে। ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি যখন কাজ করে আমরা বলি চোখ কাজ করছে, ইনি তাহলে আদিত্য দেবতা, ইনি চন্দ্র দেবতা, ইনি বরুণ দেবতা। চোখ, কান, নাক এগুলো হল লাঠি, রাইফেল, পিস্তল কিন্তু এগুলিকে নিয়ে দেবতারা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে যাচ্ছে। সবাই এসে বলছেন Sir! I am at your service। আমাদের মত দু পয়সা লোকের জন্য দেবতারা দৌড়াবেন ভাবাটাই অন্যায়। ভেতরে অন্তর্যামী যিনি বসে আছেন তাঁর ভয়েই সবাই দৌড়াচ্ছে। পরে বলবেন *ভয়দাস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*। সমস্ত বিশ্বে দেবা সেই আত্মার হুকুমে দৌড়াচ্ছে আর আমাদের শরীরের মধ্যে সব কাজ করছে। আত্মা যিনি আছেন তাঁর অভিব্যক্তি ধরা পড়ে বুদ্ধিতে। বলছেন যাঁর জন্য এই কাজ করা, যাঁর প্রেরণাতে এই কাজ হয় তিনিই সেই আত্মা। আমি কাউকে বললাম, তুমি নিজের মায়ের সেবাটুকু করতে পারছ না! তখন সে মায়ের সেবা করতে শুরু করে দিল। প্রেরণা আমার কিন্তু কাজ করছে সে মায়ের। অনেক সময় কাজ করছে আমার কিন্তু প্রেরণা অন্য কারুর, শক্তি অন্য কেউ যোগান দিচ্ছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়দের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়রা কাজ করছে সেই কাজের প্রেরণা আসছে আত্মার কাছ থেকে আর কাজও আত্মার জন্যই করে। প্রেরণা মানে যাঁর আদেশ বা কথা মত কাজ হয়।

অধ্যাত্ম বিদ্যার মত কঠিন বিদ্যা হয় না। অধ্যাত্ম বিদ্যা ধারণা করার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার। আমাদের মন প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত। প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত মানে বস্তুর জগৎ। মন হল জড় পদার্থ, জড় পদার্থ একমাত্র জড় পদার্থকেই ধরতে পারে, ধারণাও করতে পারে। আত্মার আলোচনা করতে গিয়ে যমরাজ যে এত দিক থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আত্মার ব্যাপারে বলছেন তার কারণ তিনি জানেন নচিকেতা সহজে আত্মার ব্যাপারে ধারণা করতে পারবে না। আর যে ঋষি বলছেন তিনি নচিকেতাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন না, আমাদের উদ্দেশ্য করেই বলছেন। বলছেন *মধ্যে বামনমাসীনং*, মাঝখানে একটা আকাশ বা স্থান আছে। পদার্থ বিজ্ঞানের দিক থেকে স্থান মানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। এখানে কি তাই বলতে চাইছেন? মাঝখানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট একটা জায়গা আছে? এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আত্মা মানেই দেশ ও কালের বাইরে। দেশ ও কাল দিয়ে আত্মাকে কখনই বাঁধা যায় না। তাহলে এখানে কি বলতে চাইছেন? প্রাণ আর অপান যেখানে কাজ করছে সেখানে কি কখন কোন ফাঁকা জায়গা থাকতে পারে যেখানে প্রাণ আর অপান কাজ করবে না? তাহলে তো শরীরটাই শেষ হয়ে যাবে, কারণ শরীরটা পদার্থ দিয়ে তৈরী। শরীরের কোথাও যদি একটা space থাকে যেখানে কোন প্রাণন ক্রিয়া চলছে না, তাহলে তো ঐ জায়গাতে পচন ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। আসলে বলতে চাইছেন তুমি এটা ধারণা করে নাও, তোমার নিঃশ্বাস যত দূর যেতে পারে আর অপান ক্রিয়া যে জায়গা থেকে শুরু হয় সেই জায়গাতে তোমার মনকে কেন্দ্রিত কর।

দীক্ষার সময় গুরু বলে দেন হৃদয়ে ইষ্টের ধ্যান করবে। ঠাকুরও বলছেন হৃদয় হল ডঙ্কা মারা জায়গা। হৃদয়ে বলতে কোন জায়গাতে ধ্যান করতে বলছেন? আমরা জানি হৃদয় মানে আমাদের শরীরের ভেতরে যে হার্ট রয়েছে, যেখান থেকে আর্টারি, ভেইন বেরিয়ে আসছে, ঐ রক্তমাখা একটা মাংস পিণ্ডে আমরা ঠাকুরের ধ্যান করব! তা কি কখন হয়। একটা জায়গায় আমাদের মনকে একাগ্র করতে বলা হচ্ছে। গুরু বলে দিয়েছেন

হৃদয়ে ধ্যান করতে, এরপর তোমার যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হবে তখন নিজে থেকেই তুমি বুঝে নেবে যে গুরু যে হৃদয়ের কথা বলছেন এই হৃদয় তোমার শরীরের ভৌতিক হৃদয় নয়, এটা একটা আধ্যাত্মিক space। Space যখন আমরা বলছি তখন এটাও একটা পুরোপুরি ভুল পরিভাষা। কারণ space মানেই ওখানে কিছু না কিছু পদার্থ থাকবে। ইলেক্ট্রন প্রোটন যদি না থাকে তাহলে বেদান্তের আকাশ পার্টিকেলস থাকবে। আকাশ মানে space আবার আকাশ মানে আকাশ পার্টিকেলস। এখানে বলতে চাইছেন যে জায়গাতে কিছু নেই। জগতে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে কিছু নেই? যদি কিছুই না থাকে আকাশ পার্টিকেলস অবশ্যই থাকবে। তাহলে আত্মা কোথায় থাকবেন? এই ব্যাপারটা কখনই বোঝান যাবে না। গুরু শিষ্যকে তাই বোঝানর জন্য বলছেন প্রাণ আর অপানের মাঝখানে যে জায়গা, ঐ জায়গাতে তোমার মনকে কেন্দ্রিত কর। এবার *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ* আর এটাকে যদি মেলান হয় তাহলে প্রাণ আর অপানের মাঝখানে এক আংঠার গ্যাপ হয়ে যাবে। তাহলে হৃদয়ের কোথাও এক আংঠা প্রমান একটা জায়গা আছে যেখানে কোন প্রাণন ক্রিয়া হচ্ছে না, যেখানে রক্ত সরবরাহ হচ্ছে না, বাতাস যাচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। প্রাণন ক্রিয়া না হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা পচে নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে কি বলতে চাইছেন? বলছেন হৃদয়ে ধ্যান কর, ঐ হৃদয়েই তুমি দেখতে পারবে। হৃদয়ের কোন জায়গাতে ধ্যান করব? নিঃশ্বাস নেওয়ার পর তোমার মনে হয় নিঃশ্বাস যত দূর যাচ্ছে ঠিক তার পরে ধ্যান করবে। সেটা কেউ বুকের কাছে হৃদয়ে করতে পারে, কেউ কপালে করতে পারে, কেউ কণ্ঠে করতে পারে, কেউ ভ্রুর মাঝখানে ধ্যান করতে পারে, কেউ বলছেন নাকের ডগায় করতে। এতজন এত জায়গায়তে ধ্যান করতে বলছেন, তাহলে সবারই এক রকম কি করে হয়? ধ্যানের জায়গা নিয়ে কখনই জ্ঞান হয় না। মনকে একাগ্র করার জন্য একটা জায়গার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। একটা স্থূল জিনিষকে অবলম্বন করে আমরা যেন আরও সূক্ষ্মের দিকে এগোতে পারি। এই যে জগতের অস্তিত্ব আর তার সাথে পদার্থ, শক্তি, দেশ, কাল এগুলিকে যে জায়গায় মন transcend করবে ঐ জায়গাতে দিব্যজ্যোতিকে দেখতে পাবে। এই দিব্যজ্যোতি মোমবাতির মত কোথাও জ্বলছে না, এই দিব্যজ্যোতি সব জায়গাতেই আছে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর তারও বাইরে সব জায়গায় এই দিব্যজ্যোতি রয়েছে। যে জায়গাতে মনকে একাগ্র করবে সেই জায়গাতেই এই দিব্যোজ্যোতিকে দেখতে পাবে। ঋষি ঐ জায়গার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর বলে দিচ্ছেন তুমি ঐ জায়গাতে তোমার মনকে কেন্দ্রিত কর। তাহলে তন্ত্র বা যোগশাস্ত্রে মূলাধার বা নীচের দিকে যে চক্রের কথা বলা হয়েছে সেখানেও তো মনকে একাগ্র করা যেতে পারে। করা যেতে পারে কিন্তু এগুলো অপবিত্র জায়গা হওয়ার জন্য মন ওখানে একাগ্র হতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ এগুলোকে অপবিত্র না দেখে তাহলে কি তার মন একাগ্র হবে? ঠাকুর বলছেন, কুকুর-কুকুরীর যে মৈথুন সেখানেও আমি দেখছি ব্রহ্মজ্যোতি লকলক করছে। যোগীরা ধ্যানের গভীরে হৃদয়ের মধ্যে যে জ্যোতি দর্শন করেন, একই জিনিষ ঠাকুর ওখানে দেখছেন। ওখানে যে হবে না তা নয়, ওখানেও হবে। কিন্তু আমাদের মন এত সাধারণ স্তরে পড়ে আছে, ঐ নোংরা জিনিষগুলিকে ভাবা শুরু করলে মন ওখানেই পড়ে থেকে যাবে। কিন্তু তাই বলে যে সেখানে ব্রহ্মজ্যোতি নেই তা নয়, সেখানেও ব্রহ্মজ্যোতি আছে।

ব্রহ্মজ্যোতি, চৈতন্য হল দেশ কালের পারে, চৈতন্য সব সময় অখণ্ডিত, চৈতন্যের কোন খণ্ডিত জায়গা হয় না। আমাদের অস্তিত্ব খণ্ডিত বলে মনকে যখন একাগ্র করছি তখন আমরা খণ্ডিত চৈতন্য রূপেই দেখছি। কিন্তু একাগ্র অবস্থাই শেষ কথা নয়, ওখান থেকে আরও উপরে যাওয়ার পর অখণ্ড জ্যোতি, অখণ্ড চৈতন্যের দর্শন পায়। কোন জায়গাতে একাগ্র করা শুরু করবে বোঝাবার জন্য বলছেন, তুমি যে জায়গাতে বুঝতে পারছ তোমার প্রাণ শেষ হচ্ছে আর অপান শুরু হচ্ছে ঐ জায়গাতে তোমার মনকে কেন্দ্রিত কর। কিন্তু আমরা যেন মনে না করি ওখানে আত্মা বসে আছেন, আর ওখানে কোন প্রাণন ক্রিয়া হচ্ছে না। এটাকেই ঠাকুর বলছেন ডঙ্কা মারা জায়গা। মানুষের যত রকম আবেগ, ভালোবাসা, রাগ, অনুরাগ সব হৃদয় থেকেই হয়। আমরাও বুকে হাত রেখে বোঝাতে চাই তোমার কথা আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছি। ঋষিরাও যে চৈতন্য জ্যোতি দর্শনের কথা বলেছেন তাঁরাও হৃদয়ের কথাই বলেছেন। কিন্তু তাই বলে যে অন্য জায়গায় চৈতন্য জ্যোতি দর্শন হবে না তা নয়, যে কোন জায়গাতেই হতে পারে। তবে হৃদয়ের স্থান খুব সহজ স্থান। আমরা যতই শাস্ত্র কথা শুনি না কেন, যতই শাস্ত্র পড়ি, দেশ ও কালের বাইরে কিছুতেই যেতে পারব না, আমাদের মস্তিষ্ক সেভাবেই তৈরী। যখনই ভগবানের কথা, আত্মার কথা, ব্রহ্মের কথা আসে সব আমাদের দেশ ও কালের মধ্যে ঢুকে

যায়। ঠিক তেমনি জ্যোতি দর্শনের কথা এলেই আমরা ভৌতিক আলোর কথা ভাবব। ভৌতিক আলোর ব্যাপারে ঠাকুর কিছু বলতে পারবেন না, পদার্থ বিজ্ঞানীরাই বলতে পারবেন। তবে শাস্ত্র কথা শুনে যাওয়া, জপ-ধ্যান করা এগুলোই সাধনা, সাধনা করে করেই মানুষ একদিন বুঝতে পারে হৃদয় জিনিষটা কি, ধ্যান কি, জ্যোতি কি। যখন বুঝতে পারে তখন সেখান থেকেই তার আসল সাধনা শুরু হয়। এটাকেই পরের মন্ত্রে বলছেন –

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ।।২/২/৪।।

(এই দেহে যিনি দেহস্বামীরূপে অবস্থিত তিনি এই দেহ থেকে বিমুক্ত হলে, দেহের আর কি অবশিষ্ট থাকে? ইনিই সেই আত্মা।)

কঠোপনিষদের এই ধরণের মন্ত্রের আলোচনা প্রথম যারা শুনবে তাদের পক্ষে মন্ত্রের ভাব ধারণা করা খুব কঠিন হবে। সাধারণ মানুষ জীবাত্মাকেও একটা ভৌতিক শরীর বলে মনে করে। চৈতন্য বা আত্মা কোন ভৌতিক জিনিষ নন। আমি এই দেহ ব্যতিরেকে আরেকটা কিছু এই জিনিষটার যতক্ষণ না একটা স্পষ্ট বোধ হবে ততক্ষণ কারুরই আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হবে না। স্বামীজী একজনকে বলছেন, ঈশ্বর দর্শন করতে এসেছিস অন্ততঃ একটা ভূতও দেখ। ভূত দেখার কথা স্বামীজী এই জন্যই বলছেন, তাহলে বিশ্বাস হবে যে এই দেহের বাইরেও কিছু একটা আছে। কিছু দিন আগে ইন্টারনেটে একটা লেখা এসেছিল যেখানে লেখক একটা লম্বা তালিকা দিয়ে বলছেন, মৃত্যুর পর একটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এক করে শরীর থেকে নখ আর চুল খসে যায়, তারপর রক্ত জল হয়ে নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, এক বছর পর হাড় ছাড়া আর কিছু থাকে না ইত্যাদি। পোস্টমর্টেমে এভাবেই হিসেব করে বলে দেওয়া হয় লোকটি কতক্ষণ আগে মারা গেছে। লেখক দেখাতে চাইছেন, যে শরীর এভাবে বিনাশ হয়ে যাচ্ছে সেই শরীর নিয়ে আমাদের এত অহঙ্কার। যে নিজেকে মহা সুন্দরী মনে করে, যে নিজেকে মহা বুদ্ধিমান মনে করে, যে নিজেকে মহা ক্ষমতাশালী মনে করে তারও শরীর এভাবেই পচে পচে শেষ হয়ে যাবে। বাংলায় বলে মরে গেলে দেড় সের ছাই, কিসের এত অহঙ্কার!

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ, কিন্তু এর অর্থটা আলাদা। সবাই জানে আমার শরীরের এই পরিণতি হবে, তাও তার অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই বলে দিচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই বোধ আছে সে শরীর নয়। সে শরীর নয় বলেই অহঙ্কার করছে, যদি জানত আমি এই শরীর, কোন দিন আর অহঙ্কার করত না। আমাদের সবারই ভেতরে অজানা একটা বোধ আছে, অজানা মানে আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আমরা সবাই জানি আমি মরলে আমাকে ক্রিমি খাবে, মরলে শেয়াল কুকুর, পাখিরা খাবে, আমি মরলে দেড় সের ছাই। অথচ সবাই কত গর্ব করে। যার বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধির গর্ব করে, যে দেখতে ভালো সে রূপের গর্ব করে। কারণ সে জানে আমি এই দেহ নই, আমি আত্মা, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। সে কিন্তু নিজেও জানে না ওর কিসের অহঙ্কার। কিন্তু জানে আমাকে নাশ করা যাবে না। শরীরটা খাঁচা, খাঁচাতে পাখি আসছে যাচ্ছে। ও জানে আমি খাঁচা নই আমি পাখি। কিন্তু এই জানাটা সচেতন ভাবে জানা নেই। যখন সচেতন ভাবে জেনে যাবে আমি খাঁচা নই আমি পাখি, সেখান থেকেই তখন তার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়।

আমি খাঁচা নই আমি পাখি জেনে যাওয়ার পর তার আর খাঁচার ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে হয় না ঠিকই, কিন্তু ওখান থেকেই তার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়। পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চা মেয়ে নিজেকে সব সময় বিশাল সুন্দরী মনে করে, সব সময় সাজতেই থাকে। কোথাও তার মনে একটা চিন্তা কাজ করছে আমি সাধারণ কেউ নই, আমার ভেতরে অসীম সত্তা। ভুল কিছু ভাবছে না, এটাই বাস্তব। তার মধ্যে পূর্ণ চৈতন্যের শক্তি বাস্তবিক রয়েছে। কিন্তু সে জানে না, কিন্তু অবচেতন ভাবে মনে করছে আমি সবার থেকে আলাদা। সবাই যখন বলে আমি একটু অন্য ধরণের, সত্যিই সে অন্য ধরণের। কিন্তু অন্যটাও অন্য ধরণের, আর সবারই মিল ঐ একটা জায়গাতেই। সবাই ঈশ্বরের সন্তান, সবাই ব্রহ্ম, সবাই আত্মা, সবাই চৈতন্য। কিন্তু অপরকে দেখার সময় কোথাও তার এই বোধ হতে থাকে আমি আলাদা। এই বোধ কেন আসে? কারণ চৈতন্যের জ্যোতির উপর আবরণের পর আবরণ পড়ে আছে, সব আবরণকে ভেদে করে সেখান থেকে যে চৈতন্যের একটা ক্ষীণ আলোর রেখা বিকৃত হয়ে একটা আকার নিয়ে আসছে, সেই আকারটাই অহঙ্কার রূপে আসে। ঐ ক্ষীণ আলোর আকারটা যখন আসে তখন ঈর্ষা আসে, আমার থেকে কেউ শ্রেষ্ঠ কি করে হতে পারে! তুমি যে তোমার দেহকে নিয়ে এত গর্ব করছ, তোমার গর্ব করারই তো কথা। কারণ তুমি মুক্ত বিহঙ্গ, এই খাঁচাটা তোমার বাসা, নিজের

বাসাকে কে না ভালোবাসে! নিজের বাসাকে নিয়ে সব্বাই গর্ব করে, গরীব তার কুঁড়ে ঘর নিয়ে গর্ব আর রাজার রাজপ্রাসাদ নিয়ে গর্ব।

কিন্তু সাধারণত আমরা যেভাবে গর্ব, অহঙ্কার করি, ঐ ভাবে করতে থাকলে আমরা আরও বেশি খাঁচায় বদ্ধ হয়ে ফেঁসে থাকব। কিন্তু যেভাবে দেখা উচিৎ সেভাবে দেখলে আমরা সবাই রাজার ব্যাটা। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর কারুরই কোন হুঁশ থাকে না। সকালে ঘুম ভাঙার পর আমি দেখছি আমি সেই লোক, কিন্তু মাঝখানে রাত্রে আমার সাথে কি হয়েছে, আমার পাশে তখন কে ছিল, কে এসেছিল কোন কিছুরই হুঁশ নেই, আমার যে শরীর আছে এই বোধটাও তখন ছিল না। আমি গতকাল ছিলাম, এখন আছি কিন্তু মাঝখানে কয়েক ঘন্টা আমার কোন অস্তিত্বের বোধ ছিল না, তাও আমার অস্তিত্বের বোধ আছে, এই যে আমার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা চলছে এটাই দেখাচ্ছে কোথাও আমি মৃত্যুর মত জিনিষের থেকেও বড়। আমাদের শরীরের কোশিকাগুলো প্রতি নিয়ত পাল্টাচ্ছে, বারো বছরে পুরোটাই পাল্টে যায়। মৃত্যু মানে একদিন হঠাৎ পুরোটাই পাল্টে গেল, মৃত্যু মানে এছাড়া কিছু নয়। আমি সেই সচ্চিদানন্দের যে সৎ সেই সৎ এর সাথে এক, সেইজন্য আমার শরীর থাকুক আর নাই থাকুক, আমার বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, আমি আছি। আর আমি শ্রেষ্ঠতম, আমাদের কাছে এটাই খুব অজানা, অত্যন্ত অজানা।

যেসব ছেলেমেয়েরা খুব শান্ত-শিষ্ট, বিনয়ী, মিষ্টি করে কথা বলে, কোন অহঙ্কার নেই বুঝে নিন এদের দ্বারা কোন মহৎ কাজ হবে না। কিন্তু যে ছেলে খুব বদমাইশি করে বেড়াচ্ছে, অহঙ্কারের বড়াই করে, এরাই পরবর্তি জীবনে গিয়ে সাফল্য পায়। ঠাকুরও বলছেন যে গরুর ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে ঐ গরু কেউ কিনবে না, কিন্তু যে গরুর ল্যাজে হাত দিলেই তিড়িং বিড়িং করে লাফায় ঐ গরুই লোকে কেনে। কারণ ওদের মধ্যেই অহঙ্কার আছে, তেজ আছে। কিসের তেজ? তেজ তিনটে জিনিষেরই থাকে, সৎ, চিৎ আর আনন্দের, তিনটে আবার এক। যেখানে চৈতন্য শক্তির প্রকাশ, সেখানেই তেজ থাকবে। যারাই মৃদু ভাষী, মধুর ভাষী, মিষ্ট ভাষী, গুটি গুটি চলে এরাই অপরের সর্বনাশ করে। চৈতন্য সত্তাকে ভুলে সব কুটিল হয়ে গেছে, কুটিল হয়ে এখন শুধু প্যাঁচ কষে যাচ্ছে। যার মধ্যে তেজ আছে তার দ্বারাই হবে। অহঙ্কার ষড় রিপুর একটি ঠিকই, ষড় রিপু আমাদের এগোতে দেবে না এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যার মধ্যে ষড় রিপুর মদ, মাৎসর্য আছে বুঝতে হবে এর মধ্যে জোর আছে, এই জোরটাও সেই চৈতন্য শক্তিরই প্রকাশ কিন্তু বিকৃত রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। আগে বিকৃতটা ঠিক করতে হবে। এর ভালো দৃষ্টান্ত নরেন্দ্র নাথ দত্ত। প্রথম জীবনে নরেন কিসব কিসব কাণ্ড করে বেড়াত। কলেজের এক বন্ধু পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারছে না, কেরানী পরীক্ষায় বসতে দেবে না। সবাই গিয়ে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেরানী রাজী হচ্ছে না। নরেন খোঁজ নিতে শুরু করল কেরানী কোথায় কোথায় যায়। ঠিক একদিন ঐ গোলমেলে জায়গায় গিয়ে তাকে হাতেনাতে ধরেছে। ভদ্রলোককে ব্ল্যাকমেল করে তাকে দিয়ে কাজ আদায় করে ছেড়েছে। আমরা যদি শুনি পাড়ার কোন ছেলে এই রকম কিছু করেছে আমরা তার মুখ দেখা বন্ধ করে দেব আর সবার কাছে নিন্দা করে বেড়াব। আর আমরা যদি শুনি বাড়ির ছেলে অমুক লোককে ব্ল্যাকমেল করেছে, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে! স্বামীজীর কোন স্বার্থ নেই, আমার বন্ধুকে বাঁচাতে হবে। একমাত্র ঠাকুরই নরেনকে ধরতে পেরেছিলেন, এর মধ্যে শক্তি আছে। এই শক্তিকে সবাই সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে পারবে না। স্বামী তুরীয়ানন্দজী, হরি মহারাজ উনি জন্মজাত সন্ন্যাসী ছিলেন, ঠাকুর না থাকলেও উনি সন্ন্যাসীই হতেন। কিন্তু ঠাকুর ছাড়া নরেনকে কেউ সন্ন্যাসী বানাতে পারতেন না। আমরা বলতে পারি স্বামীজী যুগপুরুষ এই কাজের জন্যই তিনি এসেছেন, সেটা আলাদা। কিন্তু সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এই কথাই বলতে হবে, ঐ দুর্দান্ত শক্তি, ঐ রকম তেজিয়াল ঘোড়ায় লাগাম লাগানো একমাত্র ঠাকুরের দ্বারাই সম্ভব। তাইতো তিনি জগতে আলোড়ন এনে দিলেন, আর আমরা ঢেঁড়স সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে ঢেঁড়স হয়ে আছি। মানুষের মধ্যে যে তেজ, কোন সন্দেহ নেই এই তেজ সেই সচ্চিদানন্দের তেজেরই বিকৃত রূপ, তাই তার মধ্যে অহঙ্কার, তাই তার মধ্যে ক্রোধ। একটা জায়গা পর্যন্ত এগুলোকে নিন্দা করা হয় ঠিকই, কেউ এসে এই তেজকে সঠিক পথে পরিচালিত না করে দিলে সে ফেঁসে যাবে। যাদের সুবোধ বালক বলে জানি তাদের মধ্যে সচ্চিদানন্দের তেজের যে বিকৃত রূপটা বেরোবে সেটাও বন্ধ, সেইজন্য বিয়ের পর স্ত্রীর ফরমাস খাটতে খাটতে জীবন শেষ হয়ে যায়। কিসের গরব? আমি এই শরীর

নই, এই শরীরের আমি মালিক। আর তাই না, এই শরীর অকেজো হয়ে গেলে আমি আরেকটা শরীর নেব, এর থেকে আরও ভালো শরীর নেব। এই আত্মবিশ্বাস না আসা পর্যন্ত তার দ্বারা জীবনে কিছু হবে না।

এটাই এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে, *অস্য বিস্রংসমানস্য*, এর ভেতরে যিনি আসল তিনি যদি বেরিয়ে চলে যান, *বিস্রংস* মানে শরীরকে ছেড়ে চলে যাওয়া, *শরীরস্থস্য দেহিনঃ*, এই শরীরের যিনি আসল মালিক, যাঁকে *পুরমেকাদ্বশদ্বারম্* বলছেন, *দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য*, তিনি যখন এই শরীরকে ছেড়ে বেরিয়ে যান, *কিমত্র পরিশিষ্যতে*, কি পড়ে থাকে? কিছুই পড়ে থাকে না। কিন্তু কে ছেড়ে যান? এই দেহী, এই দেহের মধ্যে যিনি আছেন তিনিই শরীর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান। আমরা জানি মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরকে ত্যাগ করে চলে যায়। সূক্ষ্ম শরীর মানে পঞ্চ প্রাণ, দশটি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই সতেরটি অবজব নিয়ে আত্মা বেরিয়ে যান। এই সপ্তদশকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বলে। হিন্দু মতে মৃত্যুর সময় জীবাত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যান। জীবাত্মা মানে সেই শুদ্ধ আত্মা যিনি নিজেকে এই সতেরটি জিনিষের সঙ্গে ভুলবশতঃ জড়িয়ে রেখেছেন।

বলতে চাইছেন জীবাত্মা আমাদের সংস্কারগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এর বর্ণনা করা হয়েছে, এখানেও পরে বর্ণনা আসবে। আমরা যে কাজই করি না কেন, সব কাজই মনের উপর একটা ছাপ ফেলে। স্মৃতিও হারিয়ে যাবে, দৈনন্দিন অনেক কিছুই মানুষ এমনিই ভুলে যায়, অঘটন কিছু ঘটে গেলে আগের অনেক স্মৃতি তলিয়ে যায়। মৃত্যুর মত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতায় শরীর সম্পর্কিত স্মৃতিগুলো খসে পড়ে যায়। কিন্তু কর্মজনিত সংস্কার কোন দিন খসে যাবে না। এখানে গুরুত্ব হল দশটি ইন্দ্রিয় আর পঞ্চ প্রাণের, এরা সঙ্গে যাবেই। তার ফলস্বরূপ কি হবে? কেউ যদি এই জন্মে হাঁদারাম হয়ে থাকে পরের জন্মে সে আইনস্টাইন হয়ে কখনই জন্ম নেবে না, ঐ ভোঁতা বুদ্ধি নিয়েই জন্মাবে। কেউ প্রেমে মার খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে দিল। এরপর কি হবে? কিছুই হবে না, ঐ দুর্বল মন নিয়েই জন্মাবে, আগামী জন্মে আবার কোন ছেলে বা মেয়ের কাছে প্রেমে মার খাবে। আগামী জন্মে কেউ নতুন কিছু হয় না, একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। কিসের পুনরাবৃত্তি? পঞ্চ প্রাণ, এই জন্মে যে পেটরোগা আগামী জন্মেও সে পেটরোগা হয়ে জন্মাবে। শ্রীমাও বলছেন প্রায়শ্চিত্ত না করে মরলে আগামী জন্মে রোগটা থেকে যায়। পঞ্চ প্রাণ, যেটা দিয়ে শরীর চলে, এই জন্মে যেভাবে চলছে পরের জন্ম সেই ভাবেই চলতে থাকবে। দশটি ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও তাই, এই জন্মে চোখের সমস্যা আছে, প্রায়শ্চিত্ত না করলে পরের জন্মেও চোখের সমস্যা থেকে যাবে। এ জন্মে আমি যেমনটি আছি আগামী জন্মে তেমনটিই হব, আপনিও আপনার মত হবেন। শচীন তেণ্ডুলকার ছোটবেলায় টেনিস খেলত, ওর একজন আইডল ছিল তাকে কপি করত। পরে যখন ক্রিকেট খেলতে শুরু করল তখন সে কারুরই নকল করত না, পুরো নিজের মত খেলত। শচীন তেণ্ডুলকার এক জন্মেই শচীন হয়েছে নাকি! ওর পঞ্চ প্রাণ আর ইন্দ্রিয় আগেই তৈরী হয়ে আছে, গত জন্মে হয়ত কোন বড় ক্রিকেটার ছিল। এই জন্মে এসে কিছু চাপা পড়ে গেছে, কিন্তু যেমনি পরিবেশ পেয়ে গেল আস্তে আস্তে ওর আসল শক্তিটা খুলতে শুরু করে দিয়েছে।

সেইজন্য বলা হয় এই সপ্তদশ অবজব, পঞ্চ প্রাণ, দশটি ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধিকে ঠিক করতে। কিন্তু সবাই কি নিয়ে ব্যস্ত? সবাই শরীরকে নিয়ে ব্যস্ত, শরীরের কিছু না কিছু হতেই ডাক্তারের কাছে ছুটছে। আগে পঞ্চ প্রাণকে ঠিক করুন, দশটি ইন্দ্রিয়কে ঠিক করুন, মন বুদ্ধিকে ঠিক করুন, এগুলো ঠিক হলে এই জন্মেই জীবন পাল্টে যাবে। যে শরীরকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত, যেমনি জীবাত্মা বেরিয়ে যাবে সেই শরীর এখানেই শেষ, এই শরীর আর কোন কাজে লাগবে না। অথচ পুরো চিকিৎসা বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য দর্শন সব এই শরীরকে নিয়েই ব্যস্ত। যে কোন দোকানে, শরীর তুষ্টির সামগ্রী ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না, কত রকম পাউডার, কত রকম ক্রীম, কত রকম শ্যাম্পু, শুধু শরীর আর শরীর। যতক্ষণ এই সপ্তদশ অবয়বকে ঠিক করা না হবে ততক্ষণ আমাদের পরবর্তি জীবনও বিনাশের দিকে চলে যাওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। এই কথা যে কঠোপনিষদেই বলছে তা নয়, হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্র এক কথা বলে যাচ্ছে। আসন, ব্যায়াম করলে শুধু শরীরই ঠিক হয় না, পঞ্চ প্রাণকেও ঠিক করে। যোগ করলে শুধু শরীরের নিরাময় হয় না, পঞ্চ প্রাণ, ইন্দ্রিয় এগুলোও ঠিক হয়। পড়াশোনাতে শুধু মনোরঞ্জনই হয় না, বুদ্ধির ব্যায়ামও হয়। এমন এমন কাজ করতে হবে যাতে এই সতেরটি জিনিষ ঠিক থাকে, অন্তত এই জন্মটা তাহলে ঠিক হবে। ঈশ্বরে ভক্তি করলে, আসনে বসে ধ্যান করলে বা মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করলে, সতেরটা জিনিষ তো ঠিক হবেই সাথে সাথে পঞ্চ প্রাণের

উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে আসে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত জীবনের সম্ভাবনাকে তৈরী করে দেয়। যে কোন কাজই আমরা করি না কেন, হাঁটছি, বসে আছি, কথা বলছি, বই পড়ছি যাই করি সব সময় এই সতেরটিকে মাথায় রেখে করে যেতে হবে। এই সতেরটির অন্তত কোন একটি আমার ঠিক হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখা চাই। কথা বলারও দরকার আছে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমি যে কথাই বলি না কেন তাতে আমার মন আর বুদ্ধিটা যেন ঠিক হয়। ভক্তি করছে, গরীবের সেবা করছে, রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, তার মানে কোথাও একটা নিঃস্বার্থপরতা এসেছে, নিঃস্বার্থপরতা আসা মানে মন বুদ্ধির শুদ্ধিকরণ হয়েছে, তার মানে পরের জন্মকে আরও ভালো করে দিল। বলে কর্মটা ভালো কর, কর্ম ভালো হয় না, ভালো হওয়া মানে মন বুদ্ধি বিস্তার লাভ করল, আরও শুদ্ধ হয়ে গেল। এই যে বলা হয় walk for health, *অস্য বিস্রংসমানস্য*, কাল মারা গেলে সব খেলা শেষ। অত walking করে কি হল! কিন্তু যদি বলে আমি walking করছি যাতে আমার পঞ্চ প্রাণ ভালো থাকে, তাহলে ঠিক কাজ করছে। বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে আর হিসেব করছে, ও আমার ছেলের বিয়েতে কত টাকার জিনিষ দিয়েছিল, এখানেই তার মনের সঙ্কীর্ণতা উৎকট ভাবে বেরিয়ে আসছে, এর থেকে উপহার না দেওয়া অনেক ভাল। কিন্তু কেন দিচ্ছে? আমি তোমাকে ভালোবাসি, আজকের দিনটা তোমার কাছে একটা শুভ দিন, এই দিনে আমি তোমার মঙ্গল কামনা করে এই উপহার দিলাম। তার মানে, তার মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা ভাব এসেছে, নিঃস্বার্থপরতা আসা মানে তার মন বুদ্ধি খুলে গেছে, একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত তার খুলে গেল।

উপনিষদের সময়ই এই প্রশ্ন উঠছে, যদি মনে করা হয় প্রাণ আর অপানই শরীরের মূল ক্রিয়া তাহলে প্রাণ অপানের কার্য যদি বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলেই যদি শরীরের মৃত্যু হয় এছাড়া শরীরের মৃত্যুর অন্য কোন কারণ নেই। অধ্যায়ের শুরুতে Holism আর Reductionism নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। Reductionism আর Holism পাশ্চাত্য দর্শনে এই শব্দগুলি যেভাবে এসেছে ঠিক সেইভাবে ভারতীয় দর্শনে আসেনি, ভারতীয় দর্শন অন্য ভাবে চলে। এদেরকেই আমরা চার্বাক বলি। কিন্তু আমাদের যে ভৌতিক দর্শন যেখানে পঞ্চভূতের কথা বলছে, পঞ্চভূতকে নিয়ে ভারতে কোন specialized philosophy নেই। কিন্তু বিদেশীরা এর উপর অনেক কাজ করেছে যার জন্য এই জিনিষগুলিকে নিয়ে তারা সুন্দর সুন্দর system দাঁড় করিয়েছে। আলোচনার সময় বলা হয়েছিল Reductionism মানে sum of parts = whole আর Holism মানে হয় sum of parts is less than the whole। সমস্যা হল Reductionistরা এটাকে মানুষের জীবনের সব জায়গাতে লাগিয়ে দেয়। ডাক্তাররা হলেন ঠিক ঠিক Reductionist। Reductionistরা বলবে হাত কেটে গেছে একটা হাত লাগিয়ে দাও, হার্টফেল করে গেছে হার্ট রিপ্লেস করে দাও। খ্রিশ্চিয়ান বার্ণার্ড নামকরা সার্জেন ছিলেন। বিশ্বে তিনি প্রথম হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছেন। একটা লোকের হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করবে ওরা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। ওরা এখন খুঁজছে কেউ যদি দুর্ঘটনায় মারা যায় তার হার্টকে তুলে আনবে। বারো চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে খবর এসেছে কিন্তু ওর হার্ট এখনও কাজ করছে। মেয়েটির বাবার সাথে কথা বলে রাজী করানো হয়েছে, সই সাবুদ হয়ে গেল। বার্ণার্ড হার্টটা বার করে আনলেন, তখনও ধুক্ ধুক্ করে চলছে। খ্রিশ্চিয়ান বার্ণার্ড অবাক হয়ে ভাবছে এটা কী জিনিষ! তাঁর বন্ধুর মজা করে তাঁকে বলছে, তুমি এতদিন শুধু রুগ্ন হার্ট দেখে এসেছ সেইজন্য আসল হার্ট কেমন হয় তুমি চিনতেই পারছ না। খুব মজার কাহিনী। ঠিক একই কথা ফ্রয়েডের উপরেও বলা হয়। মনের উপর ফ্রয়েড এত কিছু লিখেছেন, কিন্তু ফ্রয়েডের কাছে যত লোক যেত সবাই মানসিক রোগী ছিল। সেইজন্য ফ্রয়েড মানব জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জীবনকেও একটা মানসিক রোগ রূপে লিখে গেছেন। Reductionistদের ঠিক এই সমস্যা হয়, জড় বস্তুকে দেখে দেখে এরাও সেই রকম হয়ে যায়। গাড়ির মেকানিক যদি ফিলজফার হয়ে যায় তখন সে কি করবে? দর্শনকেও একটা গাড়ির মতই দেখবে।

Reductionistদের থিয়োরী বা চার্বাকদের মতবাদকে যদি নেওয়া হয় তখন খুব সহজ ব্যাপার হয়ে যাবে, এই শরীরে তিনটে জিনিষ কাজ করছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, হার্ট আর ব্রেন। এনারাও মানছেন হার্ট আর ব্রেন যেমন কাজ করছে ঠিক সেই রকম প্রাণও কাজ করছে। নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে সে মরে যাবে। তাহলে মানুষের মৃত্যু কি? যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, অর্থাৎ প্রাণন ক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। সেইজন্য অনেক সময় রুগীকে ভেন্টিলেশানে রাখা হয় যাতে প্রাণন ক্রিয়াটা চলতে থাকে। হার্ট কাজ না করতে পারে, ব্রেন স্টপ হয়ে যেতে পারে কিন্তু প্রাণন ক্রিয়া যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সেও আছে। প্রাণ মূলতঃ কাজ করে

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে। তাহলে যে কেউ বলতে পারে, এর আগে যে জীবাত্মার এত কথা বলা হল, আসলে এই জীবাত্মা কিছুই না, প্রাণই আসল। প্রাণ যতক্ষণ কাজ করছে, প্রাণ কাজ করলে অপানও কাজ করবে, প্রাণ অপান কাজ করলে শরীর আরমসে চলতে থাকবে। শরীরটা একটা এনার্জি সিস্টেম, শরীরে এনার্জি সিস্টেম কাজ করছে মানে তুমিও আছ। এনার্জি সিস্টেম কাজ করা বন্ধ করে দিল, তুমিও শেষ। এটাই Reductionistদের থিয়োরী, চার্বাকদেরও এই থিয়োরী আর বর্তমান বিজ্ঞানীদেরও এই থিয়োরী। যমরাজ কিন্তু নচিকেতাকে সাবধান করে দিচ্ছেন, তুমি কিন্তু এই ভুল করতে যেও না –

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ।।২/২/৫।।

(কোন প্রাণীই প্রাণের দ্বারা বা অপানের দ্বারা জীবন ধারণ করে না, কিন্তু প্রাণাদি থেকে বিলক্ষণ এমন কোনও বস্তুর দ্বারা জীবিত থাকে যাঁতে এই প্রাণ ও অপান আশ্রিত হয়ে আছে।)

এই মন্ত্রের দুটি তাৎপর্য। প্রথম হল শ্রুতি আর দ্বিতীয় যুক্তি। সাধারণতঃ মন্ত্রে দুটো জিনিষ এক সঙ্গে চলে না, একটা তাৎপর্যকে নিয়েই চলে। কিন্তু এখানে দুটো জিনিষ চলছে। শ্রুতি কেন? আমি ঠিক কে, আমার এই আমিটা কি, এটাকে ঠিক ঠিক বিচার করে জানা যায় না। এটাকে জানার জন্য আমাদের শ্রুতি প্রমাণ মানে বেদ প্রমাণ নিতে হবে। একদিন ঠাকুর নরেনের উপর খুব রেগে গিয়ে বলছেন, আমার কথা যদি নাই মানিস তাহলে এখানে আসিস কেন? কারণ ঠাকুরের কথা হল শ্রুতি বাক্য। শ্রুতি বাক্যকে যদি কেউ খণ্ডন করে দেয় তাহলে তার আর দাঁড়ানোর জন্য কিছুই থাকবে না। শ্রুতিকে আধার করে যত খুশী যুক্তি আনতে পারি কিন্তু যে জায়গাতে শ্রুতি জিনিষটা রয়েছে ঐ জায়গাতে কোন যুক্তি, কোন তর্কাতর্কি চলবে না। ঋষিরা বলে দেবেন যদি তর্কাতর্কি করতে ইচ্ছে হয় তুমি অন্য জায়গায় যাও, আমার কাছে আসার দরকার নেই। ঋষিরা বলেই দেন, আগে বল তোমার সব কিছু দেখা হয়ে গেছে, সব জায়গার খেলা তোমার শেষ হয়েছে? নচিকেতার যা কিছু শেখার বাবার কাছে বা অন্যান্য আচার্যদের কাছে শেখা হয়ে গেছে। এরপর আর কোন কিছুর উত্তর পাচ্ছে না। এবার এসেছে যমরাজের কাছে। ঋষিরা আসলে বলতে চাইছেন, তোমার যত বুদ্ধির দৌড় ছিল সব শেষ হয়ে গেছে এবার আমি যা বলছি সেটা ভালো করে শুনতে থাক। যদি তুমি বল আমি যুক্তি চাই, তখন ঋষিরা বলে দেবেন, তাহলে ভাই তুমি বিজ্ঞানীদের কাছে যাও, উকিলদের কাছে যাও, বুদ্ধিজীবিদের কাছে যাও, আমার কাছে এসো না। যদি তত্ত্ব জানতে চাও তাহলে আমার কাছে এসো। তত্ত্বটা কি?

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবন্তি কশ্চন, জীবনটা প্রাণ অপান দিয়ে চলে না। যদিও পরে অনেক সাধক কবিরা কবিতায় বিচিত্র ধরণের উপমা নিয়ে এসেছেন, যেমন বলছে শুধু বাতাস দিয়ে যদি চলত তাহলে কামারশালার হাপরও জীবন্ত হত। এখানে জিনিষটা ঠিক তাও নয়। প্রথমে শ্রুতি অর্থে বলে দিচ্ছেন, তোমরা Reductionistদের বা চার্বাকদের পাল্লায় পড়তে যেও না। এরপর আবার যুক্তি নিয়ে আসছেন। এখানে এসে আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন, খণ্ডিত যে জিনিষগুলো রয়েছে, যাদের এক অপরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, এরা কখন এক সঙ্গে কাজ করে না, কিন্তু এরাই যখন সবাই সংহত হয়ে যায় তখন তারা এমন একটি জিনিষের সঙ্গে কাজ করে যে জিনিষটা ওদের থেকে আলাদা। খুব সহজ যুক্তি। কিন্তু যে জিনিষ যত গভীর সেই জিনিষ গুলো তত সহজ সরল হয়। আর এতই সরল যে যার ফলে ওর গাম্ভীর্য, ওর গভীরতা ধরা যায় না। যেমন ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। ঠাকুরের এই কথা না বোঝার কিছু নেই। বস্তু কি জিনিষ আমরা সবাই জানি, গ্লাশ, চক, বোতল, সব বস্তু। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলে দিলেন ঈশ্বরই বস্তু, চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঈশ্বরই বস্তু রূপে থাকবেন আর বাকি সব কিছু অবস্তু হয়ে যাবে, মানে এদের কোন অস্তিত্বই নেই। এখানেও যে বলছেন খণ্ডিত বস্তুগুলি কখন এক হয়ে নিজের জন্য কাজ করে না, কত সহজ কথা, কিন্তু কী গভীর এক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব একবার যদি কেউ বুঝে নিতে পারে তার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ইতরেণ তু জীবন্তি, মানুষ অন্য জিনিষকে দিয়ে বেঁচে আছে। কাকে দিয়ে বেঁচে আছে? *যস্মিন এতৌ উপাশ্রিতৌ*, যাঁর উপর প্রাণ আর অপান এই দুটো আশ্রয় করে আছে। প্রাণ আর অপান বলে দিলে পঞ্চ প্রাণকেই বলা হয়ে যায়, যদিও এনারা শুধু প্রাণ আর অপানকে নিয়েই চলেন। পঞ্চ প্রাণ যেটার উপর আশ্রয় করে আছে সেটা দিয়েই এই জীবন চলে। ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিচ্ছেন, হাড়িতে আলু পটল লাফাচ্ছে,

আমরা মনে করছি আলু পটল লাফাচ্ছে, কিন্তু হাড়ির নীচে আগুন আছে বলে এরা লাফাচ্ছে। ঠিক তেমনি প্রাণ আর অপান এত লাফালাফি করছে, উপর থেকে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এরাই সব। কলকাতার একটি ছেলে প্রথম গ্রামে গেছে। সেখানে দেখছে সব আনাজ মাঠের মধ্যে পড়ে আছে। অবাক হয়ে সে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, বাবা! সব্জীগুলোকে মাঠে কেন রেখেছে? বাবা বলছে, সব্জী তো এভাবেই জন্মায়। সে এতদিন দেখে এসেছে নিউমার্কেটের শো কেসে সব সব্জী সাজান থাকে, ওর ধারণা হয়ে গেছে দোকানের শো কেসেই সব্জীর জন্ম। ফুলকপি কোথায় হয়? নিউমার্কেটের শো কেসে। মটর, টমেটো, লঙ্কা কোথায় হয়? সুপার মার্কেটে। রাজস্থানের একটা গ্রামে বারো বছর বৃষ্টি হয়নি। গ্রামের দশ বারো বছরের বাচ্চারা জানে অনেক দূর হেঁটে গিয়ে কুয়ো থেকে জল আনা হয়। বারো বছর পর যেদিন বৃষ্টি হয়েছে সেদিন সব বাচ্চারা ভয় পেয়ে বাবা গো মা গো বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে। কারণ ওরা জানে জল মানে মাটির তলা থেকে আসে, হঠাৎ দেখছে আকাশ থেকে জল পড়ছে। ভয় পাওয়ারই কথা, ওরা বৃষ্টি জিনিষটাই জানে না। আমাদেরও এই সমস্যা, আমরা জানি না পেছনে যিনি আছেন তিনি আছেন বলেই সব কিছু চলছে। এটাই শ্রুতি বাক্য। আচার্য এখানে বলছেন আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে এরা সবাই আলাদা ধরনের কাজ করে, চক্ষু ইন্দ্রিয় এক ধরণের কাজ করে, কর্ণেন্দ্রিয় আরেক রকমের কাজ করে, এদের কারুর সাথে কোন যোগ নেই। এরা কখন জীবনের কারণ হতে পারে না। কোন একটা ইন্দ্রিয়ের জন্য জীবন চলছে না। জীবনকে নিয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক সবাই কত রকমের কথা বলে যাচ্ছেন। কবি বলছেন দেখার জন্য জীবন হল সুন্দর দৃশ্য। কবি কি কিছু ভুল কথা বলছেন? মস্তিষ্কের শতকরা আশি ভাগ শক্তি চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দখলে। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু জগতের দৃশ্যই দেখে যাচ্ছে। জীবন মানে সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য বলে কবি ভুল কিছু তো বলছেন না। কিন্তু উপনিষদ বলছে এর মত মুর্খামি আর কিছু হতে পারে না। বঙ্কিম বাবু যখন বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য আহার, নিদ্রা, মৈথুন তখন আপাতদৃষ্টিতে তিনি তো ভুল কিছু বলছেন না। কিন্তু এর থেকে বড় মুর্খামি আর কিছু হতে পারে! বঙ্কিম বাবুর কথার সাথে জীবনের উদ্দেশ্য সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখা বলাতে কোন অমিল নেই। যে গান করে সে বলবে জীবনের উদ্দেশ্য সুন্দর গান শোনা। সুন্দর দৃশ্য দেখা, ভালো গান শোনা যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, এরা তাও অনেক উপরে, কারণ তারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপরেই জোর দিচ্ছে কিন্তু আহার, নিদ্রা, মৈথুন আরও অনেক নীচের ইন্দ্রিয়, এতে কর্মেন্দ্রিয় জড়িয়ে আছে। শূকরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় জীবনের উদ্দেশ্য কি, সে বলবে জীবনের উদ্দেশ্য হলে শুঁকে শুঁকে দুনিয়ার নোংরা আবর্জনা খুঁজে বার করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে খাওয়া। শূকর নাসিকা ইন্দ্রিয় দিয়েই কাজ করছে। গুবরে পোকাকে নারদ যখন বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে চাইছেন গুবরে পোকা জিজ্ঞেস করছে, বৈকুণ্ঠে ভালো গোবর পাওয়া যাবে তো? গুবরে পোকার জীবনের উদ্দেশ্য ভালো গোবর পাওয়া।

কিন্তু যাঁর একটু চেতনা জেগেছে, তিনি বলবেন এই তো এতটুকু জীবন যতটুকু পার অপরের ভালো করার চেষ্টা কর। আবার অনেকে বলবেন, এই মানব শরীর পেয়েছ জীবনে দুটো ভালো কথা শিখে যাও। আবার অনেকে বলবে, এই তো দুদিনের জীবন একটু আনন্দ করে নাও, তার কাছে এই জগৎটাই বৈকুণ্ঠ, এখানেও গোবর খুঁজে বেড়াচ্ছে, তুমি যে গোবর খাচ্ছ সেটা এক রকমের আর সে যে গোবর খাচ্ছে সেটা আরেক রকমের। ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে সবাই দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। ঠাকুর শম্ভুনাথ মল্লিককে বলছেন, ভগবান যদি এসে বলেন তুমি কি চাও, তখন কি তুমি কটা হাসপাতাল আর ডিসপেন্সারি চাইবে? প্রথম যে কথামৃতে পড়বে তারও মনে হবে আমিও তো ভগবানের কাছে এটাই চাইব, লোকেদের কত মঙ্গল হবে। মন্দির বা হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়ে যাওয়ার পর সবাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থন করেন, ঠাকুর কিছু ডোনেশান যেন পাওয়া যায়। ঠাকুরের কাছে নিজের সন্তানের ভালোর জন্য, নিজের ভালোর জন্য প্রার্থনা করছে তখন সবাই এটাই করছে। শম্ভু মল্লিকের উপর হাসাহাসি করার কি আছে! গুবরে পোকার কথা শুনে আমরা হাসছি, কিন্তু বিচার করে দেখলে আমরা সবাই তাই করছি।

এখানে এই তর্কটা নিয়ে আসছেন। যতক্ষণ একটা স্বাধীন চেতা কাজে না নামছে ততক্ষণ এই ছড়ানো জিনিষগুলিকে এক সঙ্গে নিয়ে আসা যায় না, কারণ কোন একটার জন্য জীবন হতে পারে না। চোখ কখনই কানের রাজা হতে পারে না, কান কখনই চোখের রাজা হতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখছি চোখ, কান, নাক সবই কাজ করছে, তার মানেই হল কোন এক স্বাধীন স্বতন্ত্র চেতা কাজ করছে। আমরা আবার তর্ক করতে

গিয়ে reductionistদের দলে চলে যাব, এগুলো কোন ভাবে জুটে গেছে, আর তারপর থেকে জীবন চলে যাচ্ছে। এই ভুলটা ভাঙাতে চাইছেন, তুমি একটু বিচার করলে বুঝতে পারবে এরা স্বাধীন ভাবে কখনই কাজ করতে পারে না। যে জিনিষগুলিকে সংহত করা হয়েছে, এরা সবাই নিজেদের থেকে আলাদা, কারুর সাথে কারুর মিল নেই। তাই এটা পরিষ্কার যে এরা কখনই নিজের জন্য পুরো systemটাকে চালাচ্ছে না। এটাই বলার উদ্দেশ্য যে, চোখই রাজা আর সেই বাকিদের চালাচ্ছে, এটা যেমন মুর্খামি, ঠিক তেমনি এটাও সেই একই মুর্খের মত কথা যে বলে পেটের দায়ে মানুষ সব কিছু করে। মানুষ যদি সব কিছু পেটের দায়ে করত তাহলে জগতে কেউ আর সন্ন্যাসী হত না। মানুষ বুদ্ধির জন্য সব কিছু করে, এই ধরণের কথা বলাও একই ধরণের মুর্খামি। কারণ, যে কোন একটি ইন্দ্রিয় সব কটি ইন্দ্রিয়ের রাজা হতে পারে না। একটু বিচার করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। যার জন্য বলছেন, একটু চিন্তা করলে দেখতে পারবে যতগুলো ইন্দ্রিয় কাজ করছে এরা কেউ নিজেদের জন্য কাজ করছে না। কোন একটা এমন জিনিষ আছে যে জিনিষটা এগুলো থেকে আলাদা অথচ এদের সবাইকে সে নিয়ন্ত্রিত করছে। যেমন বলা হয়, এই বোমাবাজি, গুণ্ডাবাজির পেছনে কোন নেতা আছে। ঠাকুর গল্প বলছেন, গ্রামের একজন সাধারণ লোক জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দেখে সবাই বলাবলি করছে, এই লোক মামলা করতে পারে না, নিশ্চয় এর পেছনে অন্য কোন জমিদার আছে। ঠিক তেমনি এই ইন্দ্রিয়গুলি, চোখ, নাক, কান এরা কাজ করছে এদের নিজের থেকে কাজ করার কোন ক্ষমতা নেই, কারুরই রাজা হওয়ার ক্ষমতা নেই, নিশ্চয়ই এদের পেছনে কোন রাজা আছেন। এখানে দুটো জিনিষ, শ্রুতি একটা বিবৃতি দিয়ে দিল, কিন্তু বিবৃতির মধ্যে একটা যুক্তি জড়িয়ে আছে, যেটাকে বিচার করলে বোঝা যায়, *যস্মিন এতৌ উপাশ্রিতৌ*, যাঁর উপর এরা আশ্রিত তিনিই এদের রাজা।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম।।২/২/৬।।

(হে নচিকেতা! আমি এখন তোমায় এই গুহ্য শাশ্বত ব্রহ্ম উপদেশ দেব, এবং ব্রহ্মকে না জানলে মৃত্যুর পর আত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হন তাও বলব।)

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি, গৌতম বলতে নচিকেতাকে বলছেন, হে নচিকেতা তোমাকে আবার বলছি। *হন্ত* মানে আবার। বেদের অর্থ নিরুপণের জন্য অর্থাৎ এই জিনিষটাকে বেদ বলা যাবে কিনা ঠিক করার জন্য কতকগুলি নিয়ম করে দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা নিয়ম হল, শুরুতে যা বক্তব্য থাকবে শেষেও তাই বক্তব্য থাকবে, এই নিয়মকে বলছেন উপক্রম-উপসংহার। তার সাথে আরেকটা নিয়ম হল অভ্যাস। যদি বক্তব্যের গুরুত্ব থাকে তাহলে সেই কথাকে বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলা হবে। আমরা অনেক সময় বলি, তোমাকে কতবার বলছি বুঝতে পারছ না! বারবার বলা মানে এর বক্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বক্তব্য যদি বেদের বিষয়বস্তু হয় তাহলে সেই কথা বারবার বলা হবে। এই বারবার বলাকে বলা হয় অভ্যাস। অথচ এর অর্থ বার করার সময় বলা হয় পুনরুক্তি দোষ, একই কথাকে দ্বিতীয়বার বলা। অভ্যাস আর পুনরুক্তি দোষ দুটো আলাদা। পুনরুক্তি দোষে মনে হবে একই কথা আবার বলছে। অভ্যাস হল একই জিনিষকে অন্য ভাবে বলা। অভ্যাসে বক্তব্য একই থাকছে কিন্তু তার উপস্থাপনাটা অন্য রকম হয়ে যায়। ঠাকুরও হৃদয়রামকে বলছেন, একই কথা আমি যদি একশবার বলি তাতে তোর কি! এখানেও ঠাকুর অভ্যাসের কথাই বলছেন। ঠাকুরের একটি কথা যেমন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু এই কথাকেই ঠাকুর অনেক ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন, যাতে ভালো ভাবে আমাদের ভেতরে ঢোকে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও যখন তত্ত্বমসিকে বোঝাতে যাচ্ছেন তখন ঋষি অনেক ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন, যাতে শিষ্য ধারণা করতে পারে কি বলতে চাইছেন। কারণ আমরা হলাম মধ্যম বুদ্ধির, যাদের মধ্যম বুদ্ধি তাদের এভাবে সেভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে হয়। কিন্তু উত্তম বুদ্ধিকে একবার বললেই তার জ্ঞান হয়ে যাবে, বোঝাবুঝির অপেক্ষায় থাকতে হয় না। যারা মন্দ বুদ্ধির তাদের যেটা বলবে তার উল্টোটাই বুঝবে। *হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি*, তোমাকে আবার বলছি। কি বলছেন?

গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্, তোমাকে যেটা বলছি এটা অত্যন্ত গুহ্য। গুহ্য বলতে এখানে বোঝায় যে বিদ্যা গুরু-শিষ্য পরম্পরাতেই চলে। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *পরম গুহ্যং*। ধর্মের কিছু কিছু এমন তত্ত্ব কথা আছে যেগুলো সবার সামনে আলোচনা করা যায় না। সেইজন্য এনারা এই বিদ্যাকে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যে রেখে

দিয়েছেন। শিষ্যকে গুরু অনেক ভাবে পরীক্ষা করে দেখতেন শিষ্যের পাত্রতা আছে কিনা, তারপর তাকে বিদ্যা দিতেন। এসব কথা সহজে ধারণা করা যায় না, সেইজন্য বলছেন *গুহ্যম্*। এই গুহ্যম্ ব্যাপারটাকেই আবার অনেক গুরু নিজের স্বার্থে লোকেদের বোকা বানায়। যদি কেউ বলে 'দেখো ভাই এটা কিন্তু খুব গুহ্য জিনিষ', তখনই তাকে সন্দেহ করতে হবে। যদি সেই ব্যক্তি আমার অপরিচিত হয়, তাকে সব দিক থেকে না দেখে কখনই তাকে বিশ্বাস করতে নেই। গুহ্য বিদ্যা নিয়ে একটা ঘটনা আছে। একবার এক ড্রাইভার তার লোকদের নামিয়ে ফিরে আসার সময় এক সাধুবাবা তাকে একটা জায়গায় নামিয়ে দিতে বলে। সাধুবাবাকে ড্রাইভার গাড়িতে তুলে নিয়েছে। অনেক দূরেই নামাতে হবে। যেতে যেতে সাধুবাবা তাকে বলছে, আমি তোমাকে একটা গুহ্য বিদ্যা শিখিয়ে দিচ্ছি, এই বিদ্যাতে তোমার মনের যত কামনা আছে তার একটি কামনা তোমার পূর্ণ হয়ে যাবে। ড্রাইভার শুনে খুব খুশী। সাধুবাবা একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাতে বলল, ড্রাইভারকে বললে আমি একটা পাতা নিয়ে আসছি। নেমে একটা পাতা নিয়ে এসেছে। পাতাটা হাতে খুব করে রগড়ে ড্রাইভারকে বলল তুমি এটা শুঁকে নাও। ড্রাইভার শুঁকে নিয়েছে, এবার তোমার কি ইচ্ছে পূর্ণ করতে চাও বল, তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। ড্রাইভার পরে সবাইকে বলছিল, তারপর আমার মনটা পুরো অবশ হয়ে গেল। গাড়ী চালাতে কোন সমস্যা হচ্ছিল না। এবার ঐ সাধুবাবা ওর সামনেই ওর ব্যাগ থেকে সব টাকা-পয়সা বার করে নিল, হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিল, গলায় একটা সোনার চেন ছিল সেটাও খুলে নিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ সিগন্যালে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে, সাধুবাবা জিজ্ঞেস করছে তুমি ঠিক আছ? আমি বললাম ঠিক আছি। তারপর বলল, এখানে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দাও, আমি নেমে যাব। সাধুবাবা নেমে গেল, তারপর কোন রকমে গাড়ি নিয়ে মালিকের বাড়িতে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে। মালিক ড্রাইভারকে দেখেই বুঝতে পেরেছে কিছু গোলমাল হয়েছে। জিজ্ঞেস করাতে কিছু বলতেই পারছে না। ড্রাইভার তারপর থেকে রাস্থা থেকে লোক তোলা বন্ধ করে দিয়েছে। এ্যানাস্থেসিয়াতে এমন অনেক ধরনের ড্রাগস ব্যবহার করা হয় যার ফলে শরীর কাজ করবে কিন্তু মস্তিষ্কের চিন্তা করার শক্তিটা শূন্যে নেমে যাবে। যখনই কেউ বলছে এটা গুহ্য বিদ্যা শুধু তোমাকেই দিচ্ছি, তখনই সন্দেহ করতে হয় আর খুব সাবধান হয়ে যেতে হয়।

দীক্ষার সময় যে মন্ত্রাদি দেওয়া হয়, সেখানে গুরুর ভাব সবাই জানে, যে মন্ত্র দিচ্ছেন তা সম্প্রদায় বিদ্যাতে বা গুহ্য বিদ্যাতে দিচ্ছেন। এরপর বাকি জিনিষগুলো খোলাখুলি, তুমি এতবার জপ করবে, দিনে এতবার আসনে বসবে এই কথাগুলো সবার জন্যই বলা হচ্ছে। এখানে যে গুহ্য বলছেন খারাপ অর্থে বলছেন না, এটাই পরম গুহ্য। কারণ এই পরম তত্ত্ব সবাই ধারণা করতে পারে না। *ব্রহ্ম সনাতনম্*, আত্মাকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল, এখান থেকে ব্রহ্ম শব্দটা নিয়ে আসছেন, আত্মা আর ব্রহ্ম এক। *সনাতনম্*, তিনি সনাতন, তাঁর কোথাও কোন পরিবর্তন হয় না। এই সনাতন ব্রহ্মের ব্যাপারে যা বলা হবে এটা অত্যন্ত গুহ্য। ভগবানের কথা সবাইকে বলা যায় না। এই অত্যন্ত গুহ্য বিদ্যাকে জেনে আমার কি লাভ হবে?

বলছেন *যথা চ মরণং প্রাপ্য*, মৃত্যুর সময় তোমার এই জ্ঞান যদি হয়ে যায়, *আত্মা ভবতি গৌতম*, হে নচিকেতা! সাধনা করে যে এই সনাতন বিদ্যার জ্ঞান লাভ করে নেবে মৃত্যুর পর তার মুক্তি হয়ে যাবে, তার কাছে আর সংসার থাকবে না। মৃত্যুর আগে যদি তার এই জ্ঞান না হয় তাহলে তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হবে। জগতে অনেক জ্ঞান মানুষ সখের জন্য পেতে চায়, যেমন ছবি আঁকা, সঙ্গীত বিদ্যা, খেলাধূলা। কিন্তু আত্মবিদ্যা সখ করে কিছু পাওয়ার জন্য পেতে চায় না, অর্থাৎ যে অর্থে আমরা পাওয়া বলি সেই অর্থে নয়। যে এটাকে জেনে যায় তার সংসার নিবৃত্তি হয়ে যায়। যে জানতে পারে না তাকে এই সংসারে বারে বারে আসতে হবে আর শুধু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। সংসারে থেকে কোন দিন মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে না। তোমাকে আমি সেই সনাতন ব্রহ্মের কথাই বলব। সনাতন ব্রহ্মকে জেনে গেলে তোমাকে আর সংসারে ঘুর ঘুর করতে হবে না, আর যদি সনাতন ব্রহ্মেকে না জান তাহলে কি হবে সেটা পরের মন্ত্রে বলছেন –

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেহনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্।।২/২/৭।।

(অর্জিত কর্মফলানুযায়ী এবং অর্জিত বিজ্ঞান ও চিন্তানুযায়ী কোন কোন জীব শরীরগ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং অপর কোন কোন জীব স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।)

এই জ্ঞানপ্রাপ্তি না হলে বিভিন্ন যোনিতে মানুষ, কুকুর, গরু, বেড়াল এই সব যোনিতে গিয়ে দেহ ধারণ করতে হয়। যারা আরও মূঢ় তারা আরও স্থাণু হয়ে জন্ম নেয়, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পাথর এসব হয়ে জন্ম নেয়। জন্ম দুটি জিনিষের উপর নির্ভর করে, *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, কর্ম আর জ্ঞান। এখানে তিনটি জিনিষ আসছে, প্রথম আত্মজ্ঞান, দ্বিতীয় শ্রুতিজ্ঞান আর তৃতীয় কর্ম। জন্ম, পুনর্জন্ম আর মুক্তি তিনটে জিনিষের দ্বারা নির্ধারিত হয় – আত্মজ্ঞান, শ্রুতিজ্ঞান আর কর্ম। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে মুক্তি, শ্রুতিজ্ঞান যদি থাকে তাহলে উচ্চ যোনিতে জন্ম হয় আর শুভ কর্ম যদি থাকে তাহলেও ভালো যোনিতে জন্ম হবে। কিন্তু কর্ম যদি খুব খারাপ হয় আর শ্রুতিজ্ঞান যদি খুব কম থাকে তাহলে স্থাণু পর্যন্ত চলে যেতে পারে।

এর আগে ঋতমের ব্যাখ্যা করার সময় ঋতমের অর্থ বলা হয়েছিল যজ্ঞ। যজ্ঞই সব কিছুকে ধারণ করে আছে। গীতাতেও ভগবান বলছেন *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্*, যজ্ঞ ব্রহ্ম থেকেই জন্ম। ভগবান থেকে ঋতম্, ঋতম্ থেকে যজ্ঞ। বেদের ঋষিরা যজ্ঞের উপর খুব বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তোমরা যজ্ঞ কর, যজ্ঞ করা মানে কর্ম করা, শুভ কর্ম করা। যদি তোমার শুভ কর্ম করা থাকে তাহলে তুমি স্বর্গে যাবে। সেখান থেকে আবার ভালো যোনিতে জন্ম নেবে, আবার শুভ কর্ম করলে আরও ভালো যোনিতে যাবে, এটাই চলতে থাকবে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞান যখন আসতে শুরু হল তখন তাঁদের মনে হল এই সংসার চক্র অবিরাম ভাবে চলছে তো চলছেই, থামার কোন লক্ষণ নেই, এটা কি করে সম্ভব! এই জিনিষতো কখনই সম্ভব নয়। ওনারা তখন মুক্তির ধারণা নিয়ে এলেন। বেদেরই কিছু কিছু মন্ত্রে যেখানে বিরাটের কথা বলা হয়েছে, সেখান থেকে তাঁদের মুক্তির ধারণা এল। আরও বিচার করতে করতে দেখছেন বেদে যেখানে কর্মের কথা বলছেন সেখানে কিছু কিছু ফাঁক এসে যাচ্ছে। যজ্ঞের প্রাধান্য যখন তুঙ্গে সেই সময় ওনারা একটা শব্দ নিয়ে এলেন, যাকে বলছেন অপূর্বতা। অপূর্বতা মানে, মানুষ যত শুভ কর্ম করছে, সব শুভ কর্মের ফল একটা পাত্রে যেন ধরে রাখা হয়েছে। উপযুক্ত সময় মানুষ সেই কর্মের ফল পাবে। তার মানে, আমাদের চেনা গণ্ডীর বাইরে একটা আলাদা system নিয়ে আসা হল, যেখানে ফলগুলি রাখা থাকে, যেমন আমাদের টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকে। কিন্তু এই যুক্তি শক্ত ভাবে দাঁড়াতে পারে না। কারণ এতে আবার অন্য কিছু সমস্যা এসে যায়, যেমন অপূর্বতাতে যে ফলগুলো রাখা আছে এগুলো দেখাশোনার জন্য একজন তৃতীয় কাউকে নিয়ে আসা হচ্ছে। ভগবান আমাদের সবার কর্মের কর্মাধ্যক্ষ, ভগবান দেখছেন যার যার কর্মফল যেন তার তার কাছেই যায়। এতে অনেক জটিলতা এসে যায়। পরে বৌদ্ধ ধর্ম যখন কর্মবাদকে নিল তখন তারা এত বেশি গভীরে নিয়ে গেলেন, কোন কর্মে কি হয়, সেই থেকে আবার কি হয়, পড়তে গেলে মাথা গুলিয়ে যায়। এর আগে সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে সূক্ষ্ম শরীরে পঞ্চ প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি সতেরটি অবয়ব থাকে। এই সতেরটি অবয়বকে নিয়ে যদি কর্মবাদকে দেখা হয় তখন জিনিষটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। কর্ম আর কর্মের ফল সব সময় কাজ করে স্থূল শরীর দিয়ে। গীতাতে ভগবান বলছেন *ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে*, এই দেহ হল ক্ষেত, ক্ষেতে যেমন বীজ বপন করলে ফসল হয়, ঠিক তেমনি এই শরীরটা হল ক্ষেত। তার মানে যে কর্ম আমরা করেছি সেই কর্মের বীজ বপন হবে এই শরীরে। কিন্তু ক্ষেতে বপন করার জন্য বীজ দরকার, এই বীজটা কোথায় আছে? আগে বলা হল বীজ একটা কোথাও জমা আছে। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে যখন সংস্কার ব্যাপারটা এসে গেল তখন পুরো জিনিষটাই পাল্টে গেল।

এর আগেও আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, কোন জিনিষের সমস্যার সমাধান যদি খুঁজতে হয় তাহলে সেই বস্তুর মধ্যেই তার সমাধান খুঁজতে হবে, বস্তুর বাইরে খুঁজলে কখনই ভালো সমাধান হবে না। আমাদের দুঃখ-কষ্টের সমস্যা সবারই আছে। এই সমস্যার সব থেকে সহজ সমাধান হল, ঠাকুর দুঃখ-কষ্ট দিয়েছেন আমার আর কি করার আছে! তার মানে সমস্যায় একজন বাইরের লোক নিয়ে আসা হল, আমি আছি আর বাইরের একজন আছে। এই সমাধান কখনই ভালো হবে না। ঠাকুর বলছেন, সব মায়ের ইচ্ছা। ঠাকুরও তাহলে ভুল করছেন। কিন্তু না, ঠাকুরের কাছে মা বাইরে নেই, মা ঠাকুরের ভেতরে আছেন। সেইজন্য ঠাকুরও ভেতরেই সমাধান খুঁজছেন। সব ঠাকুরের ইচ্ছা বলা মানে আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসছি। ঠিক তেমনি কর্মের ফল কোথায় রাখা আছে এই প্রশ্নে তৃতীয় একটা কিছুকে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাহলে কি এটা ভালো সমাধান হবে? ভালো সমাধান হবে, যদি অন্য কোন সমাধান না থাকে। যতক্ষণ অন্য কোন সমাধান না থাকে ততক্ষণ অপূর্বতা ঠিক আছে, কিন্তু অন্য কোন সমাধান এসে গেলে ওটা আর রাখা যাবে না। তাহলে অন্য

সমাধান কি? স্বামীজী তাঁর রচনাতে বারবার অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছেন, যখনই আমরা কোন কাজ করছি তখনই আমাদের মনের মধ্যে সেই কাজের একটা ছাপ পড়ছে, এটাই সংস্কার। এর পরে যা কাজ হবে বা যা কিছু হবে সব ঐ সংস্কারের মাধ্যমেই হবে। কিন্তু এই জায়গাতে এসেও অনেক কিছু গোলমেলে হয়ে যায়। সেইজন্য কর্মবাদ জিনিষটা কারুর কাছেই পরিষ্কার নয়।

এই মন্ত্রে দুটো জিনিষকে নিয়ে আসা হয়েছে, একটা কর্ম আর দ্বিতীয় হল শ্রুতম্, শ্রুতম্ মানে জ্ঞান। এই জ্ঞান মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানে যে জ্ঞানে মানুষ সাংসারিক ভাব থেকে বেরিয়ে আসে। যিনি যত বেশি সাংসারিক ভাব থেকে উঠে এসেছেন তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান তত বেশি। যিনি যত বেশি নিঃস্বার্থ তিনি তত ভালো লোক, যার মধ্যে স্বার্থপরতা যত বেশি সে তত সাধারণ লোক। ঈশ্বরের প্রতি যাঁর নির্ভরতা যত বেশি সে তত ভালো লোক। যে সংসারে যত বেশি সব কিছু নিংড়ে ভোগ করতে চায় সে তত সাধারণ লোক। এগুলো হল সব শ্রুতি। শ্রুতি জ্ঞান মানে বেদ জ্ঞান, বেদ জ্ঞান মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আমাদের আগামী জন্ম কেমন হবে নির্ভর করে কর্ম আর শ্রুতি জ্ঞানের উপর ।

আগামী জন্ম ঠিক করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্ম আর শ্রুতি জ্ঞান এই দুটোর মধ্যে কার প্রাধান্য বেশি? শ্রুতি জ্ঞানের প্রাধান্য অনেক বেশি। কারণ শ্রুতি জ্ঞান কর্মকে পরাভূত করে যায়। অন্য দিকে কর্মও কাউকে ছাড়বে না। এই কারণেই বলা হয় কর্মবাদ খুব গোলমেল, কোনটাই পরিষ্কার ভাবে কিছু বলা যায় না। শ্রীমাও বলছেন ঈশ্বরে শরণাগতী নিলে যেখানে তলোয়ারের কোপ পরার কথা সেখানে ছুঁচ হয়ে বিঁধবে, কর্ম ছাড়বে না, একটু না একটু লাগবেই। কর্ম তাকে মারছে তলোয়ার আর শ্রুতি জ্ঞান সেই কর্মকে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে। শ্রুতি জ্ঞান কর্ম থেকে খুব শক্তিশালী কারণ কর্ম কাজ করে দেহের উপর দিয়ে, দেহ খুবই স্থূল। কিন্তু শ্রুতি জ্ঞান খুব সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য তার শক্তিটাও অনেক বেশি। যাদের বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম তারা অনেক ভালো কাজ করতে পারে, মোটা বুদ্ধির লোকেরা ভালো কাজ করতে পারে না। পরের দিকে একটা দর্শন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় দর্শন। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর থেকে থেকে জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়কে নিন্দা করেছেন। এই মন্ত্রে কিছুটা জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়কে আধার করে বলা হয়েছে। কারণ এখানে বলছেন *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, কর্মের যেমন মাহাত্ম্য রয়েছে তেমনি জ্ঞানেরও মাহাত্ম্য রয়েছে। সেখান থেকে আমাদের কিছু দার্শনিক জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় ধারণাটা নিয়ে এলেন, যেখানে বলা হয় জ্ঞান অর্জন করবে তার সাথে কর্মও করবে। আচার্য কিন্তু এর নিন্দা করছেন, আত্মজ্ঞান হল সর্বোপরি, *যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ*, স্তুপিকৃত কাঠে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মুহুর্তে ভস্ম করে দেয়, ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞান সব কর্মবীজকে ভস্ম করে দেয়।

রাজা ভরত শেষ বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যায় চলে গেলেন। জঙ্গলে তপস্যা করছেন। একদিন এক বাঘ শিকার করতে গিয়ে একটা গর্ভিণী হরিণীকে তাড়া করেছে। হরিণটা পালিয়ে যাওয়ার সময় তার বাচ্চা প্রসব হয়ে যায়, হরিণী সেখানেই মারা যায়। রাজা ভরত দেখতে পেলেন। তিনি হরিণ শাবককে আশ্রমে নিয়ে এসেছেন। স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে লালন পালন করে বড় করছেন। রাজা ভরতের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে কিন্তু অন্য দিকে তাঁর কর্মটা গোলমেলে হয়ে গেল, হরিণ শাবকের প্রতি ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে বন্ধনে পড়ে গেছেন। মৃত্যু যখন এসেছে তখন তাঁর দুটো জিনিষ কাজ করছে। কর্ম নাশ হয়ে যেতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান কখনই নাশ হবে না। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন, যাদের জ্ঞান হল না তাদের সব কিছু কি ছিন্ন মেঘের মত নষ্ট হয়ে যাবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কখনই ঐ জ্ঞান নাশ হয়ে যাবে না, এর আগের আগের জন্মের অশুভ কর্মের জন্য তার যে জ্ঞান আবৃত হয়ে গিয়েছিল সেই কর্ম শেষ হয়ে গেলে আবার সে বেরিয়ে আসবে। রাজা ভরত মৃত্যুর সময় হরিণের কথা ভাবছিলেন ফলে হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান চলে যায়নি। আমরা কি কর্ম করছি সেটা কখনই গুরুত্ব নয় কিন্তু কর্মের পেছনে আমাদের কি চিন্তা ভাবনা আছে সেটারই গুরুত্ব বেশি। আমাদের চিন্তনগুলিই সব কর্মকে কেটে দেয়। এর উপর অনেক কাহিনী আছে।

এক জায়গায় এক ফকির থাকত, সেখানে এক নষ্টা মেয়েও ছিল। মেয়েটি পরিস্থিতিতে পড়ে নষ্টা হয়ে গেছে, বেচারী এখন কি করবে, তাকে তো পেট চালাতে হবে। মেয়েটির কাছে প্রতিদিন কত গ্রাহক আসে পাথর রেখে রেখে ফকির তার হিসেব রাখত। আর মাঝে মাঝেই মেয়েটিকে বলতে থাকে এত দিনে তোমার তো নরকে স্থান বাঁধা হয়ে গেছে, এই দেখ পাথরের ঢিপি হয়ে গেছে। মেয়েটি রোজ আল্লার কাছে প্রার্থনা করে

আর চোখের জল ফেলে, আমার কি দুর্গতি হবে কে জানে, বাধ্য হয়ে আমাকে এই কাজ করতে হচ্ছে। কপাল ক্রমে ফকির আর মেয়েটি একই দিনে মারা গেছে। নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা এসেছে তারা ফকিরের কাছে গেছে আর যারা স্বর্গে নিয়ে যাবে তারা মেয়েটির কাছে গেছে। ফকির বলছে, আপনাদের কোন গোলমাল হয়ে গেছে। নরকের লোকরা বলছে, আমাদের কোন গোলমাল হয়নি, মেয়েটি কাজ খারাপ করছিল কিন্তু আল্লাকে মনে রেখেছিল, তুমি আল্লার নাম নিচ্ছিলে কিন্তু মনটা তোমার সব সময় পাঁকের মধ্যে ছিল। দশকুমার চরিতে মরীচি ঋষির যে কাহিনী সেখানেও এই ভাব। এক গণিকার সাথে আরেক গণিকার বাজি হয়েছে যে আমি মরীচির মত ঋষিকেও ফাঁসিয়ে দিতে পারি। গণিকাটি মরীচি ঋষিকে কায়দা করে ফাঁসিয়েছে। সাধু সন্ন্যাসীদের সাংসারিক বুদ্ধি থাকে না, কি করবে আর, সেও ফেঁসে গেছে। তারপর দেখা গেলে সবটাই ধাপ্পা। সবার সামনেই মরীচিকে বেইজ্জত হয়ে যেতে হল। এই মরীচি সপ্তর্ষি মণ্ডলের মরীচি নন, অন্য এক কাহিনী। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। যে কুমারকে মরীচি মুনির কাছে পাঠান হয়েছিল তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে মরীচি মুনি একজন সর্বদ্রষ্টা। কুমার মরীচির সাথে দেখা করতে গেলে মরীচি বলছেন, আমার সবই ছিল কিন্তু মেয়েটির পাল্লায় পরে সব শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তখন সেই কুমার তাঁকে বলছে, আপনি তপস্যা শুরু করে দিন আবার সব শক্তি ফিরে পাবেন। ঠিক তাই হল, তপস্যায় নামতেই তার যত কর্ম খারাপ হয়ে গিয়েছিল সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এখানে যদিও বলছেন *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, কর্মের একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু বৈদিক কালে যজ্ঞের যে প্রাধান্য ছিল, উপনিষদে এসে যজ্ঞের প্রাধান্য অনেক খর্ব হয়ে যায়। শ্রুতি জ্ঞান অর্থাৎ আমি কে, আমার মনের কি ভাব, উপনিষদ এর উপর বেশি জোর দিতে শুরু করে। আমরা জীবনে অনেক কিছুই করছি কিন্তু কোনটাই মন থেকে যেন হচ্ছে না। আসলে আমরা অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, মনে করছি আমি ঠাকুরের উপর নির্ভর করে আছি, কিন্তু ঠাকুরের উপর আমরা ঠিক ঠিক নির্ভর নই, ঠাকুরের উপর নির্ভর হলে আমাদের আচরণও পাল্টে যাবে। গীতার ভাষ্যে আচার্য এক জায়গায় বলছেন, যাঁর শ্রুতি জ্ঞান হয় তিনি তখন বুঝতে পারেন জীবনের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের দিকে যাওয়া। আমার এমন কোন অশুভ সংস্কার আছে যার জন্য মন বারবার অশুভ কর্মের দিকে চলে যাচ্ছে বা বাজে পরিস্থিতি আমার চারিদিকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই ভাব যাঁর মধ্যে এসে গেছে তিনি মহাপুরুষ, এরপর তাঁকে আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। এই ভাবটাই আলোচ্য মন্ত্রের সাথে সরাসরি জড়িয়ে আছে। যারা অনেক কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু মুখে বলছে আমি নির্লিপ্ত, এটাই শঠতা। আবার অনেকে বাজে করছে, কিছু বললে বলছে, আমি কী করব! পরিস্থিতির জন্য আমাকে করতে হচ্ছে। এটাও শঠতা। যে মেয়েটির গল্প বলা হল, তার পেট চালানোর কোন আলম্বন নেই, একটা বাজে কাজ করতে হচ্ছে, কিন্তু রোজ সে আল্লার কাছে অনুতাপ করে কাঁদছে, হে আল্লা! আমাকে রক্ষা কর। ভগবান কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাকে রক্ষা করতে পারছেন না বা করতে চাইছেন না। কারণ মেয়েটির কিছু একটা কর্ম আছে যা তাকে একেবারে ঢেকে রেখেছে, কোন শুভ কিছু যে করবে, তার ভালো কিছু যে হবে, কিছুই হতে দিচ্ছেন না, ঐ অশুভ কর্ম তাকে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু মাঝখানে সে ঠাকুরকেও ধরে আছে। এই জিনিষগুলো শুধু শাস্ত্র পড়ে, দুটো লোকের সাথে কথা বলে শোধরাবে না। যতক্ষণ গভীর ধ্যানে না যাবে, ধ্যানে গভীর ভাবে নিজের মনকে যতক্ষণ বিচার না করবে, ততক্ষণ অনুতাপ আসবে না। নিজের মনকে যখন গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, যখন গভীর ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করা হয়, তখন ঈশ্বরের উপর ঠিক ঠিক নির্ভরতা আসতে শুরু করে। তখনই আত্মজ্ঞানের দিকে যাওয়ার স্পৃহা আসতে শুরু হয়।

যখনই কোন বাজে কাজ করছি, সাংসারিক কাজ বা আত্মকেন্দ্রিক কাজ করছি, তখনই নিজেকে দেখতে হয়, এই কাজ করতে আমার ভালো লাগছে নাকি খারাপ লাগছে। নিজের মনকে খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয় – এই কাজ করার জন্য প্রাণ ছটফট করছে কি করছে না বা আমার ভালো লাগছে না কিন্তু করতে হচ্ছে। মানুষ কোন কাজ করতে ভালোবাসে? রান্নাবান্না করা একটা কাজ, মানুষ এই কাজ করতে পছন্দ করে না, ঘরবাড়ি ঝাঁটা দিতে হবে, পছন্দ করে না। এখানে এসব কাজ নিয়ে কথা হচ্ছে না, এগুলো কর্তব্য। বাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি গভীর আকর্ষণ, এদের সাথে আমি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। জড়িয়ে থাকার জন্য এদের খুশি করতে ইচ্ছে হয়। খুশী রাখতে গেলে আমার নিজের সময়টা তাদের জন্য খরচ করতে হয়, অর্থব্যয় করতে হয়। এবার দেখতে হবে আমার সময়, সম্পদ আর আবেগ এগুলো অপরের জন্য খরচ

করছি কি করছি না। অপরের জন্য খরচ না করে পুরোটা নিজের উপর খরচ করছি কিনা অর্থাৎ আমি আত্মকেন্দ্রিক কিনা। যাদের দরকার আছে তাদের সাহায্য করছি কিনা। এরপর দেখতে হবে আমি যা কিছু করছি এগুলো দায়ীত্বে এসে গেছে বলে করছি কিনা, এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি কিনা, নাকি আমার ভালো লাগছে বলে করছি। এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের ভালো লাগে বলেই করছি। কিন্তু আমরা এমন ভাণ করি মনে হবে যেন আমার ভালো লাগছে না কিন্তু করতে হচ্ছে। আমাদের সমস্যার মূল কেন্দ্র হল এই জায়গাটা। কিন্তু কিছু বাজে অভ্যাস আছে, বেরিয়ে আসতে চাইছে কিন্তু বেরতে পারছে না, তখন সে যদি ঠাকুরের কাছে মনে প্রাণে প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর! আমি এই কাজ করতে চাই না, কিন্তু আমার কোন জন্মের কোন সংস্কার আমাকে টেনে নিয়ে এইসব করাচ্ছে। ঠাকুর কিন্তু এবার ধীরে ধীরে তাকে ওখান থেকে টেনে তুলে আনবেন। ভরতের কাহিনী, মরীচির কাহিনী বা এই ফকিরের কাহিনী, এই কাহিনীগুলো একটা জিনিষকেই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, কর্ম আর জ্ঞান দুটোই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শ্রুতি জ্ঞানের গুরুত্ব অনেক বেশি, শ্রুতি জ্ঞানের কোন তুলনাই হয় না। একটা এমন কর্ম হয়ে গেছে যার ফল আমাকে ভুগতে হবে বা ভুগতে হচ্ছে, কিন্তু শ্রুতি জ্ঞান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কোন তুলনাই হয় না।

কঠোপনিষদের এই মন্ত্রটি খুবই মূল্যবান মন্ত্র, এই মন্ত্রকে মাথায় রাখলে সব সময় হুঁশ থাকবে যে, মানুষের যেমনটি জ্ঞান, ভেতরের ভাব যেমনটি সেই অনুসারেই সে তার কর্ম করে, আর তার কথাবার্তাও সেই অনুসারেই হয়। যে কোন মানুষের কথাবার্তাকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তার ভেতরের ভাব কি। যারা বলছে আমি মুখে এই রকম বলছি বটে কিন্তু আমার ভেতরটা অন্য রকম, এসব কথার কোন দাম নেই। হয়ত থাকতেও পারে, কিন্তু তার ক্রিয়াকলাপ দেখলেই বোঝা যাবে মনটা তার কোথায় আছে। হয়ত সে বাজে কিছু কর্ম করছে, কিন্তু ভেতরে যদি জ্ঞানের একটা পরিপক্ক অবস্থা এসে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে আত্মজ্ঞানের দিকে এগোবার জন্য এই কর্মগুলো বন্ধন স্বরূপ, আমাকে এই কর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বক্তব্য হল কর্ম অত্যন্ত স্থূল, কিন্তু সংস্কার রূপে ছাপ রেখে দেয়, আর শাস্ত্র পাঠ, সাধুসঙ্গ যখন হয় তখন বুদ্ধিতে যে সংস্কারগুলি তৈরী হয়, যাকে শ্রুতি জ্ঞান বলছেন, সেটা অনেক বেশি শক্তিশালী। শ্রুতি জ্ঞান কর্মের উপর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু কর্মকে যে একেবারে পুরোটাই কেটে দেবে তা হবে না। আবার কাটিয়ে দিতেও পারে আবার নাও পারে, কারণ শাস্ত্রে আমরা সব রকম কাহিনীই পাই। পরিষ্কার করে বলা যায় না যে কি হবে, কিন্তু শ্রুতি জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোথাও কোন সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি এটাও জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, আমি কে এই ভাব, সবটাই জ্ঞান। এই জ্ঞান কারুর সাথে কোথাও কোন আপোষ করবে না। কখন কখন কর্ম চন্দ্রগ্রহণের মত কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানের সামনে এসে যায় ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানকে কর্ম কোন দিন পুরোপুরি চাপা দিতে পারবে না। কিন্তু কর্মকে জ্ঞান পুরোপুরি চাপা দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে যাবে।

গুরুমুখে শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করার পর সেখান থেকে আসে শ্রদ্ধা। কঠোপনিষদ প্রথমেই বলছেন নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধা জন্মাল। শ্রদ্ধা মানে আস্তিক্য বুদ্ধি, এটাই সত্য, এটাই আছে এই বুদ্ধি হওয়া। পরে মানুষ তার মা-বাবা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করছে, মানে তার মধ্যে আস্তিক্য বুদ্ধি আছে। নাস্তিক মানে *ন অস্তি*, সে মানছে যে ঈশ্বর নেই। শাস্ত্র কথাতে যাদের আস্তিক্য বুদ্ধি তাদের শ্রদ্ধা হয়। গীতায় ভগবান বলছেন *যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ*, যার যেমনটি শ্রদ্ধা তার তেমনটিই হবে। সাধারণ লোকের আস্তিক্য বুদ্ধি টাকা-পয়সাতে, তারা জানে বল বুদ্ধি ভরসা টাকা ফুরলে ফর্সা। জগতে এই দুজনই আছেন, উপরে বিষ্ণু নীচে লক্ষ্মী, হয় আপনি লক্ষ্মীর উপাসনা করবেন আর না হয় বিষ্ণুর উপাসনা করবেন। দেখতে হবে আপনার আস্তিক্য বুদ্ধি লক্ষ্মীর দিকে নাকি বিষ্ণুর দিকে। শুধু তফাৎ হল ভগবান বিষ্ণু স্থির, অশেষের উপর তিনি শয়ন করে আছেন, আর লক্ষ্মী চঞ্চলা কারণ তিনি পেঁচার উপর বসে আছেন। পেঁচা মানে পেঁচাই, কোথায় কোথায় উড়িয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে চলে যাবেন কোন ঠিক নেই। শ্রদ্ধাই প্রধান, শাস্ত্রের কথা গুরুমুখে শুনলেই যে সবার রাতারাতি বিশ্বাস হয়ে যাবে তা নয়। ঠাকুরের উপর ভরসা এটাই সাধু সন্ন্যাসীদের জীবন, আস্তিক্য বুদ্ধি সব সময় ঠাকুরের উপর। কিন্তু যৌবনে যখন তেজ থাকে তখন সাধু সন্ন্যাসীদেরও আস্তিক্য বুদ্ধিটা বেশি থাকে নিজের উপর। কিন্তু একটা অবস্থার পর থেকে সবাই ঠাকুরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে যান।

দক্ষিণ ভারতে একজন খুব নামকরা মিষ্টভাষী সাধু ছিলেন। শাস্ত্রের উপর প্রচুর ক্লাশ নিতেন, খুব ভালো বক্তৃতা দিতেন, প্রচুর বক্তৃতাও দিতেন। সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সবাই তাঁকে খুব ভালোবাসত। শেষ বয়সে তিনি সাধুদের বৃদ্ধাশ্রমে থাকতেন, সব সময় হাসতেন। অন্যান্য সাধুদের তিনি বলতেন, কত ক্লাশ আমাকে নিতে হয়েছে, কত লোককে ঠাকুর, মায়ের কাছে নিয়ে গেছি। কত লোককে উপদেশ দিয়েছি মায়ের উপর নির্ভর করতে। এখন আমি যখন আমার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখছি আমি নিজেই মায়ের উপর নির্ভর ছিলাম না। মনে হচ্ছে, তাহলে আমি কি সারা জীবনে সবাইকে বোকা বানিয়ে গেলাম। এরপর তিনি বলছেন, কিন্তু আজকে আমি যে অবস্থায় এসেছি, এসে দেখছি সত্যিই মা ছাড়া আমাদের আর কে আছেন! সত্যিই দেখছি মা ছাড়া কোথাও আর কিছু নেই। একবার ভাবছি সারা জীবন যে এত দৌড়াদৌড়ি করলাম সবই বৃথা করেছি, যতটা মায়ের উপর ভরসা করার দরকার ছিল ততটা করতে পারেনি। এই ধরণের অনেক কথা বলে গেছেন। মূল কথা হল আস্তিক্য বুদ্ধি। একজন লোক গুরুমুখে শাস্ত্রের কথা শুনছে বলেই যে তার আস্তিক্য বুদ্ধি এসে যাবে তা নয়। অনেক দিন ধরে শুধু শুনেই যাচ্ছে, শুনতে শুনতে এই আস্তিক্য বুদ্ধি তৈরী হয়। আস্তিক্য বুদ্ধি তৈরী তো হয়ে গেল কিন্তু এখনও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়নি, সেইজন্য যখন সঙ্কট আসবে তখন এই আস্তিক্য বুদ্ধিটাই ভেঙে যেতে পারে। তাই বলে যে তার পতন হয়ে যাবে, আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না তা নয়। একটা দুটো অবস্থায় ঐ আস্তিক্য বুদ্ধিটা ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু যার মধ্যে এই আস্তিক্য বুদ্ধি একবার এসে গেছে সে আজ হোক কাল হোক, দু চারবার মিস ফায়ারিং হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তারপর সে একেবারে পাকা ভাবে ধরে নেবে। সেখান থেকে আরেকটা অবস্থায় গিয়ে বলবে, আমার আর কিছু লাগবে না।

ঠাকুর বারবার বলছেন ভাব পাকা কর। ভাব পাকা মানে, হিমালয়ে মেঘের সৃষ্টি হয়েছে, হাল্কা হাল্কা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, এরপর সেই হাল্কা মেঘ ধীরে ধীরে ঘন হচ্ছে, ঘন হতে হতে বৃষ্টি জল হয়ে নেমে এল, এরপর আরও ঘন হতে হতে কঠিন বরফের আকার ধারণ করে নিল। তখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই লোকটা এই। ভাব পাকা করতে হয়। শুনতে শুনতে একটা ভাব তৈরী হচ্ছে। এই ভাবটাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার আবার তারতম্য আছে, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, রাজসিক শ্রদ্ধা আর তামসিক শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার আবার তরলতা আছে, কারুর আবার পাকা শ্রদ্ধা, কারুর একটু কম শ্রদ্ধা। এই করে করে যে শ্রদ্ধা তৈরী হল, এবার দেখতে হবে একটা কোন বিষম বা আনন্দের পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া কি রকম হচ্ছে। শাস্ত্রের কথা গুরুমুখে অনেক দিন শুনতে শুনতে নতুন যে জ্ঞান বা সংস্কার তৈরী হয়েছে আর তার আগে যে কর্মগুলো করা হয়েছে, দুটো মিলে তারপর একটা কাজ হয়, এই কাজ যখন হয় তখন সেখান থেকে আবার আরেকটা সংস্কার তৈরী হয়। একটা কাহিনীতে একবার এক সাধুবাবা আশ্রমে এক চোর ধরেছেন। ধরে চোরকে সাধুবাবা বলছেন তুই কেন চুরি করিস। সাধুর মুখে কয়েকটা ভালো কথা শুনে চোরটাও সাধু হয়ে গেছে। মন্দিরে ভক্তরা আসে, মন্দিরের সামনে অত চটি, জুতো পড়ে আছে দেখে এরও হাতটা নিশপিশ করতে থাকে। কিন্তু এখন সাধু হয়ে গেছে চুরি আর করবে না, সে চুরি না করে চটি জুতো সব এলেমেলো করে দেয়, এর একপাটি ওখানে তার একপাটি সেখানে, এর সাথে তারটা তার সাথে ওরটা মিশিয়ে গোলমাল করে দিত। হিন্দী প্রবাদই আছে চোর সাধু হয়ে যেতে পারে কিন্তু হেরাফেরি করা ছাড়বে না। কথাগুলো শুনে শুনে তার একটা ভাব তৈরী হয়েছে, সে আর চুরি করছে না। কিন্তু এতদিনের যে অভ্যাস, সেই কর্ম তাকে আবার ছাড়ছে না, আরেকটা সংস্কার রূপে দাঁড়িয়ে গেছে।

শ্রদ্ধাই মানুষের জীবনধারা। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা রোজ সকাল বেলা উঠবেন, ঠাণ্ডা জলে স্নান করে পূজো অর্চনা করবেন, কিছু পাওয়ার জন্য এসব করছেন না, এটাই তাঁর দৈনন্দীন জীবন চর্চা। কারণ ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে জন্মাবার পর তাঁর বাবা-মাকে করতে দেখে এসেছেন, বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধা এসেছে, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এসেছে, এর অন্যথা এনারা করবেনই না। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এসব করে আপনি কি স্বর্গে যাবেন? হয়তো যাব। কিন্তু অন্য রকম কিছু সে করতেই পারবে না, এটাই তার way of life হয়ে যায়।

আচার্যও একই কথা বলছেন, ব্রহ্মবিদ্যাকে যদি না জানে, সাধনা করে যদি জানতে না পারে ব্রহ্মের সঙ্গে আমি এক, তখন তারা মৃত্যুর পর বিভিন্ন যোনিতে, দেবযোনি, মনুষ্য যোনি, পশু যোনি, এই ধরণের বিভিন্ন যোনিতে প্রবেশ করে। যাদের কর্ম খুবই খারাপ, অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে আছে, তারা স্থাণু হয়ে, অর্থাৎ গাছাপালা বৃক্ষাদি রূপে জন্মায়। শ্রুতমকে আচার্য অনুবাদ করছেন *বিজ্ঞানমুপার্জিতম্*, উপার্জিত বিজ্ঞান। তার

মানে, কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নিয়েছে বলেই যে তার বিরাট কিছু আছে তা নয়। নিজে সাধনা করে, অনেক খেটে যে বিদ্যাকে আপন করা হয়েছে সেটাই উপার্জিত বিজ্ঞান। সমাজে সবাই বলে ভালোবাসাই জীবনের সব কিছু। এবার জিজ্ঞেস করুন, তুমি কি চিন্তন মনন করে, গুরুর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এই জিনিষটাকে অর্জন করেছ? সবাই বলবে, না। তাহলে এই কথা শ্রুতি জ্ঞান নয়, তোমার মস্তিষ্ক থেকে মনের মধ্যে একটা ঢেউ উঠেছে। আমরা প্রায়ই একটা কথা শুনতে পাই তা হল, ঈশ্বর এক। লোকেরা প্রায়ই বলে ঈশ্বর এক। তাকেও জিজ্ঞেস করুন, এটা কি আপনি খেটেখুটে চিন্তা করে বার করেছেন? এই বিজ্ঞান কি আপনার উপার্জিত? নাকি এটাও আপনার মস্তিষ্কের ঢেউ। মস্তিষ্কে একটা ঢেউ উঠল, তাকে শ্রুতি জ্ঞান বলে না। শ্রুতি জ্ঞান, যেটাকে এখানে *যথাশ্রুতম্* বলছেন, খুবই সহজ কথা, যে জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রচুর খাটতে হয়েছে। আমরা খুব সহজ একটা মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করছি, যেমনটি তুমি কর্ম করবে আর যেমনটি তোমার জ্ঞান তেমনটি তোমার পরের জন্ম হবে। খুবই সহজ অর্থ, কিন্তু এই সহজ জিনিষটা বোঝার জন্য তখন থেকে আমরা এক নাগাড়ে আলোচনা করে যাচ্ছি। আলোচনা করা মানে এই জিনিষটাকে উপার্জন করা হচ্ছে।

একটা খুব সুন্দর লম্বা কাহিনী আছে। এক যুবক কোন এক রাজকুমারীকে বিবাহ করবে। রাজকুমারী খুব বিরাট সঙ্গীতজ্ঞা। যুবকটি সঙ্গীতের কিছুই জানে না। সে সরস্বতী দেবীর আরাধনা করেছে। আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মা তাকে একটা বীণা দিলেন। বীণা দিয়ে বললেন, এই বীণার উপর তুমি যা বাজাতে চাইবে সেটাই বাজবে। যেখানেই সে বীণা বাজায় সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। রাজকুমারীর সাথে তার বিবাহ মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। একদিন রাজকুমারী তার হবু স্বামীর কাছে বীণা বাদন শেখার আগ্রহ প্রকাশ করল। সে তো কাউকে শেখাতে পারবে না, বীণা তো নিজেই বাজছে। কিন্তু তত দিনে যুবকটির মন পরিবর্তন হয়ে গেছে। একদিন বীণাটা নিয়ে নদীতে ফেলে দিল। কারণ এই বীণবাদন তার উপার্জিত বিদ্যা নয়। ঠাকুর বলছেন বড়লোকের ছেলেরা বাবার উপার্জিত টাকা মদ, জুয়ায় উড়িয়ে দিয়ে যেমনটি ছিল তেমনটি হয়ে যায়, কারণ এই টাকা ছেলের উপার্জিত নয়। মানুষ যখন খেটে কিছু অর্জন করে, তখন ঐ খাটনিতেই তার ভেতরের কাম, ক্রোধ, লোভ পুড়ে যায়। একজন রিক্সাওয়ালা হয়ত সারাদিন খেটেখুটে একশ টাকা পেল, আরেকজন সেই খাটনিতে একশ কুড়ি টাকা পেল, এই নিয়ে তারা কেউ এক অপরকে হিংসা করে না। একশ কুড়ি টাকা পেয়েছে বলে তার যে অহঙ্কার হবে তাও হয় না। কারণ সে খেটে উপার্জন করেছে। খেটে যে জিনিষটা মানুষ অর্জন করে সেই জিনিষের জন্য তার মদ, মাৎসর্য আসবে না। এগুলোই মনের দুর্বলতা, পরিশ্রম করলে, খাটাখাটনি করলে এগুলো পুড়ে যায়। কিন্তু যখন নিজে থেকে কিছু পেয়ে যায়, বা কম খাটনিতে কিছু পেয়ে যায় তখন মানুষ অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ওঠে। রূপসী মেয়ের যে রূপ ঐ রূপে তার কোন অবদান নেই, উপার্জন করে সে তার রূপ পায়নি, সেইজন্য রূপসী হলে মেয়েদের অহঙ্কার আর থামতে চায় না। আইনস্টাইন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন, সেখানে এক ছাত্রকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলা হল, এই ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব মেধাবী ও জ্ঞানী ছাত্র কিন্তু খুব বিনয়ী। আইনস্টাইন খুব অবাক হয়ে বলছেন What! He has no achievement to his credit how can he be humble। এখনও তার কোন উপলব্ধিই নেই বিনয় কোথা থেকে আসবে! কি করে সে বিনয়ী হয়ে যাবে! যার উপলব্ধি নেই তার অহঙ্কার থাকবেই, *বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্*। মানুষ যখন বিদ্যাকে উপার্জিত করে তখন সে বিনয়ী হয়ে যায়। এখানে এটাই আচার্য বলছেন *বিজ্ঞানমুপার্জিতম্*, শ্রুতি জ্ঞান মানে উপার্জিত জ্ঞান। আমরা এখানে কিছু শুনেছি, দু একটা বই নাড়াচাড়া করে একটু জেনে নিচ্ছি, তারপর মস্তিষ্কে একটা ঢেউ উঠছে আর মনে করছি বিরাট জ্ঞানী হয়ে গেছি। যে জিনিষকে নিয়েই আমাদের অহঙ্কার হবে বুঝতে হবে ঐ জিনিষটা আমার নয়। ঠাকুর বলছেন সাধুর সব যায় কিন্তু সাধুত্বের অহঙ্কার যায় না, আবার নিজের নামে বলছেন, মাইরি বলছি আমি আমার আমি খুঁজে পাই না। কারণ অর্জন করে পেয়েছেন তিনি। যে অর্জন করে কখনই তার অহঙ্কার হবে না। শুধু অহঙ্কারই নয়, অহঙ্কারের সাথে বাকি যে জিনিষগুলো রয়েছে, মদ, মাৎসর্য এগুলো কোনটাই থাকে না, সবটাই পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

সব কিছুর পেছনে রয়েছে অপূর্ণতা। আমি অপূর্ণ তাই পাঁচটা জিনিষ আমার আয়ত্তে নিয়ে আসতে হচ্ছে। সংস্কারকে পাল্টাবার সহজ পথ হল কর্ম। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল, স্থূল জিনিষকে পাল্টানোর জন্য স্থূল পদ্ধতি দরকার। মনুস্মৃতিতে মনু বলছেন একজন শূদ্র যদি কোন গর্হিত কাজ করে তার জন্য তাকে কঠোর দণ্ড দিতে হবে। সে অন্য জিনিষ বোঝে না। একজন সংস্কৃতবান লোককে সামান্য একটু ধমক দিলেই

আঁৎকে উঠবে। মনু সবার জন্য সমান বিচার মানতেন না। কারণ মানুষের মন আলাদা আলাদা। সমস্যা হল আমি আলাদা আলাদা মনকে ধরব কি করে। মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এদের শ্রেনী বিভাগ করেছেন তাদের মনের অনুভূতি সম্পন্নতাকে আধার করে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি দোষ করে তখন তাকে এক ধাপ করে নামিয়ে দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ যদি চতুর্থবার দোষ করে তাহলে তার সাথে শূদ্রের মত আচরণ করবে। তার মানে সে ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য নয়। শূদ্র প্রথমবার দোষ করলেই কড়া শাস্তি দিতে হবে, কারণ ধরেই নিচ্ছেন ওর স্থূল বুদ্ধি। আমরা সবাই হলাম অপূর্ণ আর নানা রকম দুর্বলতার পুটলি। এটাকে পাল্টাতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? *যথাশ্রুতম্*, কিন্তু শ্রুতি আমরা ধারণা করতে পারব না, তাই আমাদের কর্ম করতে হবে। কাজ করার জন্য শরীর মনের একটা পরিশ্রমের ধকল হয়, এই ধকল হওয়ার জন্য একটা আগুন জ্বলে, এই আগুন আমাদের অনেক স্থূল ভাবনাকে পোড়াতে শুরু করে। এরপর শ্রুতির জ্ঞান গ্রহণ করার ক্ষমতাটা বাড়বে।

লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এর ভালো প্রয়োগ করা যায়। যেসব বাচ্চারা সারাক্ষণ স্কুলের পাঠ্য বই পড়ে যায় তারা বেশি ধারণা করতে পারে না। আসলে এরা কেউই শ্রুতিধর নয়। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা সত্যিকারের শ্রুতিধর ছিলেন, বড় বড় বিজ্ঞানীরাও একবার পড়ে নিলেই বুঝে নেয়। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার থাকলে একবার দেখলেই জিনিষটাকে আয়ত্ত করে নেয়। সবাই তা পারে না। বেশির ভাগ বাবা-মা বলে আমার ছেলে কিছুই পারে না। কিছু করতে হবে না, যেটাই পড়বে সেটাকেই লিখতে বলুন। লিখতে গিয়ে কিছু মনে পড়ছে না? ঠিক আছে, বইয়ে যা আছে সেটাকে দেখে দেখে কপি করুক। এরপর যেটা এক পাতা লিখেছে সেটাকে একটা প্যারাগ্রাফে লিখতে বলুন। একটা প্যারাগ্রামে যেটা লিখেছে সেটাকে এবার একটা বাক্যে লিখতে বলুন। এবার ওর মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করবে। মস্তিষ্ক যত কাজ করবে তত মস্তিষ্ক রিফাইন হতে থাকবে। দু-তিন বছর, পাঁচ বছর সব সাবজেক্টের উপর লেখার পদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছে, এরপর মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ হতে শুরু করবে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়াটা কিছুই না, মস্তিষ্কের passivity এটা, active করা মানেই ওকে দিয়ে লেখার অভ্যাস করা। লেখা হল গরুর দুধ দেওয়ার মত, মস্তিষ্কের মধ্যে মন্থন কার্য শুরু করবে। বেশি লেখালেখি করালে ওটাই আবার প্রথমের দিকে মেকানিক্যাল হয়ে যায়, কিন্তু কদিন পরেই এগোতে শুরু করবে।

বুদ্ধির বিকাশ না হলে শ্রুতি জ্ঞান ধারণা হবে না, সেইজন্য আগে প্রচুর কর্ম করতে বলা হয়। কর্ম করতে করতে বুদ্ধি বিকশিত হয়, তখনই শাস্ত্রের কথা ধারণা করতে পারে। ঠাকুরকে একজন বলছে, মশাই ও আমার জানা আছে। ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন, শুধু জানলে হবে না, ধারণা করা চাই। কেন ধারণা করতে পারছে না? খাটনি নেই। খাটনির পর আসে *যথাশ্রুতম্*, আচার্য আবার এর অনুবাদ করছেন *বিজ্ঞানমুপার্জিতম্*। শ্রুতি কি? বিজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান, সাংসারিক জ্ঞান নয়, এই বিজ্ঞানকে উপার্জন করছেন। উপার্জন না করে যা আসছে তা আমাদের কোন কাজে লাগবে না, সংস্কার তৈরী করেনি কিনা। আমাদের কি সংস্কার তৈরী হচ্ছে? repeatitive একটা idea। ভারতে এত লক্ষ লক্ষ ডাক্তার, কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে কারুর একটা কোন single contribution নেই যেটাকে দেখে সারা বিশ্ব বলবে এটা ভারত আমাদের শিখিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ডাক্তাররা তাহলে কি করছে? কিছুই না। একটা repeatitive বিদ্যাকে শুধু উপার্জন করছে, বিজ্ঞান উপার্জন করছে না। আমরা শুধু বিদেশীদের নকল করতে থাকি। এখানে বলছেন, মুক্তির পথে যদি যেতে হয় তাহলে কিন্তু আত্মজ্ঞান চাই, আর মুক্তির পথে যদি এগোতে না পার তাহলে কিছু শ্রুতি জ্ঞান তোমাকে অর্জন করে রাখতে হবে যার ফলে তোমার জীবন শৈলীটা একটু উন্নত হতে পারে।

হিন্দুরা অল্প বয়স থেকেই পুনর্জন্মের ব্যাপারটা জানে। পুনর্জন্মের ধারণাই পাশ্চাত্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মকে আলাদা করে। আর হিন্দু ধর্মের প্রভাবেই বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মেও পুনর্জন্মবাদ এসেছে। পুনর্জন্মকে আরও গভীরে চিন্তা ভাবনা করলে মানুষ আরও সৎ হওয়ার চেষ্টা করে। ভর্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের অধ্যাপক ইয়ান স্টিভেনসনের ইচ্ছে হল পুনর্জন্মের উপর রিসার্চ করার। রিসার্চ করার জন্য উনি একটা বিরাট টিম তৈরী করলেন। দেশে বিদেশে যেখানেই শুনতেন কোন শিশুর মধ্যে পূর্বজন্মের স্মৃতি রয়েছে সেখানেই তাঁর টিম পৌঁছে যেত। পুনর্জন্মের উপর রিসার্চ করে একটা বিরাট মোটা বই লিখলেন, পরে ঐ বইয়ের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণও ছাপা হয়েছিল। মারা যাওয়ার আগে উনি খুব দুঃখ করে বলতেন, আমার বিজ্ঞানী বন্ধুরা একবার উল্টেও বইটাকে দেখলেন না। এটা কি ধরণের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা? বিজ্ঞানমনস্কতা

মানে, সব তথ্যই নিতে হবে, সব তথ্য দেওয়া হয়েছে এবার তাঁরা সেগুলো দেখুন। এমন কি বেশ কিছু জিনিষ যেখানে এমন কোন সন্দেহ আছে যে অন্য কোন কারণে হয়ে থাকতে পারে, সেই তথ্যগুলিকে তিনি বাদ দিয়ে গেছেন। যেমন কোন অন্তঃসত্ত্বা মা যদি কোন বিশেষ চিন্তা করে তার ছাপ শিশুর উপর পড়ে। তিনি এর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, মদের বোতল ভেঙে মেঝেতে মদ ছড়িয়ে গেছে, সেটা দেখে মায়ের মনে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বাচ্চা যখন জন্ম নিয়েছে দেখা গেল ঐ দাগটা বাচ্চার পিঠে এসে গেছে। এই ধরণের ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে গেছেন। সারা বিশ্ব থেকে তিনি অনেক case সংগ্রহ করেছেন, তারমধ্যে নব্বুই শতাংশ ভারত থেকে সংগ্রহিত। উনি নিজেই প্রশ্ন করছেন ভারতে এই জিনিষগুলো কেন বেশি দেখা যায়? নিজেই বলছেন, ভারতে কোন বাচ্চা পূর্বজন্মের কথা বললে মা-বাবা বা বাড়ির লোকরা চেপে যায় না। বাচ্চার কথা মন দিয়ে শোনে, অপরকে বলতেও কোন আড়ষ্ট বোধ করে না। কিন্তু অন্যান্য দেশে বিশেষ করে মুসলিম বা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রাধান্য যেখানে বেশি সেখানে পুনর্জন্মকে মানে না বলে বাবা-মা চেপে যায়। তার মধ্যেও তুর্কিদের কিছু ঘটনা, মুসলিমদের দেশেরও কিছু ঘটনা তুলে এনেছেন। সব case গুলি খুবই interesting।

ঠাকুর বলছেন এক ধোপা মরে রাজকুমার হয়েছে। খেলার সময় সে তার বন্ধুদের বলছে, আমি উপুড় হয়ে শুই তোরা আমার পিঠে হুশহুশ করে কাপড় কাচ। সত্যিকারের এই ঘটনা আছে। এক ব্রাহ্মণ বংশে একজন জন্ম নিয়েছে। ছেলেটি তিন চার বয়স থেকেই মাকে বলে, মা তোমার যত কাপড় আছে আমাকে দিয়ে দাও আমি কেচে দিচ্ছি। আর বলে আমার তিনটে গাধা আছে, আমার স্ত্রী আছে ইত্যাদি। ওর বাবা ছিল খুব আচারী ব্রাহ্মণ। বাবার খুব আগ্রহ হয়েছে। তিনি খোঁজ নিতে শুরু করলেন, খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলেন শহরের অন্য দিকে এক ধোপা ছিল, তারও তিনটে গাধা ছিল। একদিন গাধার জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা যায়। সাপ তার পায়ের বুড়ো আঙুলে ছোবল দিয়েছিল, বাচ্চারও ঐ বুড়ো আঙুলটা কালো। ধোপা ব্রাহ্মণ হয়ে বাড়িতে জন্ম নিয়েছে এখন কি আর করার আছে! এই ধরণের প্রচুর ঘটনা তিনি বইটিতে উল্লেখ করেছেন। কেউ হয় গুলি লেগে মারা গেছে পরের জন্মে তার পিঠে ঐ গুলির দাগটা এসে গেছে। সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাখ্যা জানা থাকলে এগুলোর খুব সহজেই ব্যাখ্যা হয়ে যায়। শরীর পুরোপুরি চলে মনের ছাপের উপর। মৃত্যুর সময় এমন কোন গভীর ছাপ মনে যদি এসে যায়, যেমন যে লোকটির পিঠে গুলি লেগেছে সে খুব গভীর ভাবে গুলি লাগাটা পিঠে অনুভব করেছে, ঐ অনুভূতিকে ভাবতে ভাবতে যখন মারা গেল তখন মনের ঐ ছাপটা শরীরের উপর এসে যাচ্ছে।

যথাকর্ম যথাশ্রুতম্, সারা জীবন তুমি যেমনটি কর্ম করেছ তোমার জন্মও সেই কর্মের অনুরূপ হবে। গীতাতে আবার অন্তিম কালের চিন্তার কথা বলছেন, মৃত্যুর সময় মনে যে চিন্তা আসবে সেই অনুযায়ী তার পরের জন্ম হবে। উপনিষদ এখানে সারা জীবনের কর্মকে নিয়ে আসছেন। বলতে চাইছেন তার সংস্কার অনুযায়ীই জন্ম হয়। কিন্তু স্টিভেনসন যে ঘটনাগুলো দিয়েছেন বা জড় ভরতের যে কাহিনী আমরা বললাম এর সাথে উপনিষদের এই মন্ত্রের তফাৎ হল, উপনিষদ এখানে একটা তত্ত্বকে বলছেন। তত্ত্ব বলতে গিয়ে উপনিষদ *যথাশ্রুতম্* অর্থাৎ খুব শক্তিশালী চিন্তনকে নিয়ে আসছেন, অন্য দিকে স্টিভেনসন যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করছেন সেগুলো অতি সাধারণ মানুষদের নিয়ে বলছেন, যাদের কথা নচিকেতা তাঁর বাবাকে বলছেন *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*। সবটাকে মিলিয়ে দেখলে তিন ধরণের লোক এসে যাবে। প্রথম হল স্টিভেনসন যাদের কথা বলছেন, এরা মরছে জন্মাচ্ছে আবার মরছে। এই জন্মক্রমের মধ্যেও কিন্তু দুটো হেতু কাজ করবে। যদি বিদ্যা বুদ্ধির চর্চা থাকে পরের জন্মে সেটাই আবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু খুব গভীর শক্তিশালী যে চিন্তা ছাপ পড়ে, একটা হল দুর্ঘটনাজনিত আরেকটা হল উপার্জিত জ্ঞান, এর ছাপ চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। যেটা উপার্জিত নয় সেটা চিরস্থায়ী হবে না। যেমন স্টিভেনসন যে ধোপার ঘটনা বললেন, এই ধোপা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়েছে ঠিকই কিন্তু ওর সংস্কারগুলোকে যদি না পাল্টায় তাহলে আবার সে নিজের জায়গায় ফেরত চলে যাবে। যেমনটি তার শ্রুতি, যেমনটি তার জ্ঞান সেটা তেমনটিই থাকবে।

যারা কোন বিদ্যাতে, তা ক্রিকেট খেলার বিদ্যাই হোক আর সঙ্গীত বিদ্যাই হোক, নিজেকে সচেতন ভাবে উন্নত করার চেষ্টা করছে, একটা জন্মে চাপা পড়ে থাকলেও পরের জন্মে তার সেই বিদ্যা বেরিয়ে আসবে। বেশির ভাগ মানুষ গতানুগতিক ভাবে জীবন চালিয়ে যাচ্ছে, এমন কোন বিদ্যা বা কর্ম জীবনে পাওয়া

যাবে না যার জন্য তারা সচেতন ভাবে অর্জন করার চেষ্টা করছে। এদেরেই নচিকেতা বলছেন *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ,* এরাই ধান-গমের মত জন্মাচ্ছে ধান-গমের মত মরছে। কিন্তু যমরাজ যখন *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্* বলছেন তখন তিনি সাধনাকে নিয়ে বলছেন। সাধনা রূপে যখন কিছু করা হয় তখন সেটাই সচেতন ভাবে করা হয়, এবার সে উপরে যাবে। চিন্তন যদি কারুর জেনে বুঝে খারাপ হয়, একজন ঠিক করে নিল আমি ওকে শেষ না করে ছাড়ব না, এই ক্রোধ নিয়েই যদি সে থেকে যায় তাহলে পরের জন্মে ওর বাড়ির আশপাশে কোন সাপ হয়ে জন্ম নেবে, আর তাকে ছোবল মারার চেষ্টা করে যাবে। অপরের নিন্দা না করলে যার খাওয়া হজম হয় না, পরের জন্মে সে ছারপোকা হয়ে জন্মাবে আর সবার পিঠে কামড়াতে থাকবে। সচেতন ভাবে বাজে কাজ কিংবা ভালো কাজ করা, এটাই এখানে বলা হয়েছে। গীতাতে বলছেন মৃত্যুর সময় কিছু একটা ভালো মন্দ হয়ে গেছে যার ফলে তার জন্মটা একটু নীচে বা উপরে হয়ে গেল। এটাও যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বাকি সবাই ধান-গমের মত ঘুরছে, এদের একটুও ডান দিক বাম দিক হবে না। আর দৈবক্রমে যদি অন্য রকম জন্ম হয় তাহলে এরা বেশি দিন বাঁচে না। শেষমেশ সবাই যে যার উপযুক্ত জায়গাতেই যাবে, ওর নীচেও যাব না, ওর উপরেও যাব না। কোন কারণে যদি একটু উপর নীচ হয়ে যায় সে কিন্তু ওখানে থাকতে পারবে না, ছিটকে বার করে দেবে। এগুলো খুব জটিল, পুনর্জন্মবাদও খুব জটিল, যার জন্য আমরা পরিষ্কার কিছু জানি না। কিন্তু উপনিষদ কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক জিনিষকে নিয়ে আলোচনা করবেন না। উপনিষদ এখানে একটা মূল সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন। তুমি যদি শান্তি পেতে চাও, দুঃখ-কষ্ট থেকে বেরোতে চাও, তাহলে তুমি জানবে তোমার পরের জন্ম ঠিক হবে তোমার কর্ম আর তোমার বুদ্ধির বিকাশের দ্বারা। তোমার কর্ম যদি বেশি আত্মকেন্দ্রিক থেকে আত্মকেন্দ্রিত হয়ে যায় তাহলে তুমি পাথর হয়ে জন্মাবে, কারণ পাথর আর কোন কাজে লাগে না, বুদ্ধি যদি খল প্রকৃতির হয় তাহলে শেয়াল হয়ে জন্মাবে, এগুলো হল যাদের কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। সাধারণত মানুষ মনুষ্য যোনির মধ্যেই ঘুরতে থাকে। স্টিভেনসন তাঁর বইতে যে ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছেন সেখানে কোন সাধারণ মৃত্যুর ব্যাপার নেই। সাধারণ মৃত্যুতে মানুষ নিজের মৃত্যুর একটা প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, সেইজন্য strong emotion বলে তখন কিছু থাকে না। Strong emotion থাকলে পরের জন্মে সেটাই স্মৃতিতে চলতে থাকে। Strong emotion চলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে তার নতুন জন্মের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে থাকে, খাপ খাওয়াতে গিয়ে যদি দেখে সে এখানকার জন্য উপযুক্ত তাহলে সে থাকবে তা নাহলে ওখান থেকে বেরিয়ে যাবে। উপনিষদ এই আলোচনাতেও যাচ্ছেন না, উপনিষদ বলে দিচ্ছেন, সচেতন ভাবে তুমি তোমার কর্ম আর জ্ঞানকে ঠিক কর। যদি কেউ বলে আমার আত্মজ্ঞান লাগবে না, তাতে দোষের কিছু নেই, আত্মজ্ঞান না চাইতে পারো কিন্তু একটা কিছু উপলব্ধি করো। স্বামীজী বলছেন, এই জীবন পেয়েছিস জীবনে একটা দাগ রেখে যা। কিছু দাগ রাখার ক্ষমতা হয়ত তোমার নেই, কিন্তু একটা কোন কাজকে সুন্দর ভাবে করার চেষ্টা কর, নিজের জীবনকেই সংগঠিত কর, অন্তত বিছানার চাদরটাই সমান ভাবে পাতার চেষ্টা কর, এটাকেই সাধনা রূপে নিয়ে একটুতো এগোতে চেষ্টা কর। চিন্তাভাবনা ভালো আর তার অভিপ্রায়ও ভালো কিন্তু কাজটা ভুল হয়ে গিয়ে ক্ষতি হয়ে গেলে তাতে কর্ম খারাপ হবে না। রাজা ভরতের অভিপ্রায় ভালো ছিল কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল, কিন্তু সেইজন্য তাঁর এতদিনের সাধনার উপলব্ধ জ্ঞান নাশ হয়ে যাচ্ছে না। নিজের জীবনকে সংগঠিত করার জন্য সচেতন ভাবে নামতে হবে। অনেকে ঠিক করে নেয় যে দিনে কোন একটা ভালো কাজ করবে। আমাদের এভাবেও করতে হবে না, আত্মজ্ঞানে পৌঁছানর জন্য আমার এই আত্মকেন্দ্রিত জীবন থেকে বেরোতে হবে। দান করা ভালো কাজ ঠিকই, কিন্তু যদি সচেতন ভাবে বলে আমার উদ্দেশ্য হল এই আত্মকেন্দ্রিত জীবন থেকে বেরিয়ে আসা, তখনই ঠিক ঠিক শুভ সংস্কার তৈরী হয়। সচেতন ভাবে না করলে কখনই ভালো লোক হতে পারবে না। আমি হয়ত আত্মজ্ঞানে পৌঁছতে পারব না, কিন্তু কিছুতো আমার উন্নতির দরকার। উন্নতি সব সময় হয় চিন্তন মননের দ্বারা। যে কোন একটা কাজকে নিষ্ঠার সাথে করতে হবে, তা সে বিছানার চাদর পাতাই হোক, নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরী করাই হোক। এই নিষ্ঠার দ্বারা নিজেকে উন্নত করার সচেতন প্রচেষ্টা সারাটা জীবন ধরে চালিয়ে যেতে হবে। বুদ্ধি যেমনটি হবে সেটা দিয়েই পরের জন্ম নির্ধারিত হয়, সেইজন্য বুদ্ধির বিকাশ দরকার। কর্ম ও চিন্তন থেকে যে সংস্কার তৈরী হয়, উন্নত বুদ্ধি সেই সংস্কারকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরের মন্ত্রে বলছেন –

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।।২/২/৮।।

(ইন্দ্রিয়সমূহ নিদ্রিত হলে এই যে পুরুষ জাগ্রত থেকে অভিপ্রেত বিষয় নির্মাণ করতে থাকেন, তিনি শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত রূপে বর্ণিত হন। পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক তাঁতেই আশ্রিত। কেবল তাঁকেই কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ইনিই সেই [নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা])।

একই ভাবের মন্ত্র আমরা এর আগেও আলোচনা করে এসেছি যেখানে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। *সুপ্তেষু* এর অর্থ নিদ্রার অবস্থা। কিন্তু আচার্য অর্থ করছেন প্রাণাদির প্রাণনক্রিয়া। প্রাণনক্রিয়া শব্দটা কেন আচার্য ব্যবহার করেছেন ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন, কারণ নিদ্রাতেও প্রাণ কোন না কোন ভাবে কার্য করতে থেকে, বা হতে পারে প্রাণ জাগ্রত অবস্থায় যতটা সক্রিয় ভাবে কাজ করে, নিদ্রায় সেভাবে করছে না, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় পুরোপুরি কাজ বন্ধ করে দেয়, এই অর্থে হয়ত প্রাণনক্রিয়া বলছেন। আরেকটা অর্থও হতে পারে, জগতে যত ভোগ হয় সব ভোগ প্রাণকে আশ্রয় করেই হয়। নিদ্রাবস্থায় প্রাণ সক্রিয় ভাবে কিছু করছে না, হাত, পা, চোখ, কান সব অবশ হয়ে আছে, মস্তিষ্কও সেই ভাবে সক্রিয় নেই।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি, আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সে জেগে থাকে। সুষুপ্তিতে সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, ইন্দ্রিয়াদির কার্যকলাপ বন্ধ, প্রাণ সক্রিয় ভাবে কিছু করছে না, কিন্তু তখনও সেই পুরুষ, যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি কি করেন? *কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ*, আমাদের যত রকমের ঈপ্সিত বস্তু আছে, যে জিনিষ সবাই ভোগ করতে চায়, সব ঈপ্সতি বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করে দেন আমাদের ভোগের জন্য। আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করছেন নারী আদির কল্পনা, মানুষ যে জিনিষগুলো পছন্দ করে সেগুলো নির্মাণ করে দেন। ঋষিরা তিনটি অবস্থার কথা বলছেন, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটেকে একত্রে বলছেন অবস্থাত্রয়। জাগ্রত অবস্থায় মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ পুরোপুরি সক্রিয়, নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় কিন্তু মন তখনও জেগে থাকে, সুষুপ্তিতে মনটাও ঘুমিয়ে পড়ে, অবিদ্যাটুকু থাকে। ফলে সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা যেন অবিদ্যার আবরণ দিয়ে নিজেকে দেখে। এর ফলে দুটো বোধ হয়, একটা হল অভাব বোধ, আমার কিছু মনে নেই আর দ্বিতীয় বোধ আমি সুখে ছিলাম। জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা কিছু করতে চাই বা পেতে চাই আমরা তাই করে নিতে পারি। হাতের শক্তি, বুকের পাটা, মনের শক্তি এগুলো দিয়ে আমরা সব করে নিচ্ছি। মাঝখানে যে স্বপ্নাবস্থা এটাই খুব মজার ব্যাপার। স্বপ্নাবস্থায় মন পুরোদমে কাজ করছে কিন্তু ইন্দ্রিয় কোন কাজ করছে না। তার মানে এটাই দাঁড়ায়, যে জিনিষটার জন্য জাগ্রত অবস্থায় আত্মা মনকে জড়িয়ে ভোগ করছে, নিদ্রাবস্থায় ঐ জিনিষটা থেকে যাচ্ছে। তার জন্য বাহ্য বস্তুর আর দরকার হয় না, ভেতর থেকেই কাম্য বস্তুগুলিকে দাঁড় করিয়ে দেয়। পাগলদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যায়, তাদের চিন্তার জগতের সাথে বাহ্য জগতের সংযোগ সব সময় ছিন্ন থাকে। নিউরো বিজ্ঞানী ভি এস রামচন্দ্রন এর উপর প্রচুর ঘটনার বর্ণনা করেছেন। মানুষ চিন্তা ভাবনা করতে করতে একটা অন্য জগৎ তৈরী করে নেয়, সেই জগতে সে যে বস্তু গুলিকে সৃষ্টি করছে, সেই বস্তুর জন্য তার শরীরেও পরিবর্তন সূচীত হয়। একজন মানসিক রুগী ডাক্তারকে এসে বলছে, আমি একটা বিশাল একতলার মহল তৈরী করেছি। এর পেছনে আমি কত টাকাই না খরচ করলাম। ডাক্তার বলছে, এত বড় বাড়ি একটা লিফট লাগালে না কেন? সে বলছে, হ্যাঁ, এখানে টেকনিশিয়ানরা একটা ভুল করে দিয়েছে। ওর কিন্তু স্থির বিশ্বাস যে আমি বাড়ি তৈরী করেছি। এক মহিলাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তার সন্তান হবে না। সন্তান সন্তান করে মহিলাটি পরে মানসিক রোগী হয়ে গেছে। মানসিক রোগীতে পরিণত হওয়ার পর দেখা গেল গর্ভে সন্তান আসার পর নারী শরীরে যা যা লক্ষণ হয় মহিলাটিরও শরীরে সব লক্ষণ এসে গেছে। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, ডাক্তাররাও সব উপসর্গ পাচ্ছেন। কিন্তু প্রসব হওয়ার সময় হয়ে গেছে, দেখছেন সন্তান হচ্ছে না। ডাক্তার বলল তাহলে তো অপারেশন করতে হবে, কিন্তু ডাক্তারের প্রথম থেকে একটা সন্দেহ হচ্ছিল, কিছু একটা গোলমাল আছে। পরে দেখলেন এতো পুরো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, সন্তানের কথা ভেবে ভেবে তার পেটটাই ঐ রকম হয়ে গেছে। এরপর মহিলাটিকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এ্যনাস্থেসিয়া করা হয়েছে, সব করা হয়ে গেছে। মহিলাটির জ্ঞান ফিরে আসার পর ডাক্তার বলছে, তোমার সন্তান তো হল, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা তুমি এক মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছ। সাথে সাথে ওর পেট আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। দুদিন পরে মহিলাটি এসে বলছে,

ডাক্তারবাবু আপনি ওর টুইনটা বার করতে ভুলে গেছেন। আবার ওর পেটটা বড় হয়ে গেছে। রামচন্দ্রের এটাই বিশেষত্ব, এমন একটা জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দেন আমাদের মনে হবে এরপর কি হল। উনি অনেকগুলো ঘটনাকে নিয়ে দেখাচ্ছেন কিভাবে চিন্তা করে করে তার মধ্যে শারীরিক পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। এগুলো হলা যারা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করছেন ভি এস রামচন্দ্রন, যিনি বিশ্বের সেরা নিউরো বিজ্ঞানী। এর উপর উনি প্রচুর গবেষণা করেছেন।

উপনিষদের ঋষিরা, আচার্য শঙ্কর এসব ঘটনা নিচ্ছেন না, মানসিক বিপর্যয় বলে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। এনারা তাদেরকেই নিয়ে আসছেন, যারা সুস্থ, নিয়মিত ধ্যান-জপ করে, চরিত্রও খুব ভালো। এদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, জাগ্রত অবস্থায় তার বাসনার পুর্তি সংসার থেকেই হয়ে যায়, তখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণ তাকে সাহায্য করে। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখন অনেক কিছুই হয়, যাকে সে ভালোবাসে তাকে স্বপ্নে নিয়ে আসে। ভালোবাসার লোক অনেক দিন আগে মারা গেছে, স্বপ্নে সে এসে বলবে আমি তো কোথাও যাইনি, আমি তো তোমার পাশেই আছি। এই দৃশ্যগুলো কোথা থেকে আসছে? বলছেন, এগুলো মনের মধ্যেই ঘুরছে ঠিকই কিন্তু কাম্য বস্তুকে আত্মাই তৈরী করেন। কারণ মন তো সৃষ্টি করতে পারবে না, মন তো জড়।

আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের দার্শনিকদের বিবাদ নিয়ে অনেক মজার কাহিনী আছে। বৌদ্ধদেরও একটা মতে বলে জগৎ বলে যা কিছু আছে সব মনের মধ্যেই আছে। একজন দার্শনিক এই মতের একজনকে জিজ্ঞেস করছে, এই যে বড় পাথরটা দেখছ এই পাথর বাইরে আছে, নাকি মনের ভেতরে আছে? বলছে, মনের ভেতরে আছে। তাহলে তুমি মাথায় একটা বড় পাথর নিয়ে ঘুরছ, তোমার মাথাটা পাথরেই ভর্তি। বলতে চাইছে তুমি একটা মাথা মোটা লোক। গল্পটা মজার কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ঋষিরা যে কথাগুলো বলছেন, এই কথাগুলোকে যখন বিরাট বুদ্ধিমানরা বুঝে ফেলেন, এই বুঝে ফেলার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক থেকে যায়। বেশির ভাগ ধর্মেই সম্প্রদায় বিদ্যা নেই। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, আচার্য শঙ্কর, ঠাকুর, স্বামীজীর মত মহাপুরুষদের আমরা পেয়েছি, এনারা আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে এত সুন্দর ভাবে গুছিয়ে দিয়ে গেছেন যে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। যখন আমরা যেটাকে নিয়ে থাকি আমাদের কাছে তখন সেটাই সত্য। আমাদের কাছে যেটা সত্য সেটাই যে পরম সত্য হবে তা নয়। জগৎকে আমি যেভাবে দেখছি সেটাই আমার কাছে সত্য, তাই বলে সেটা পরম সত্য হতে পারে না। এই গ্লাশ বাইরে আছে কিন্তু আমার গ্লাশের বোধ কি করে হচ্ছে? এগুলোকে নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হয়, বিচার করলে তখন জিনিষগুলো আরও পরিষ্কার হয়। কিন্তু আমরা কেউ বিচার করতে চাই না। ঠাকুর বলছেন, কাক খুব সেয়ানা কিন্তু নোংরা খেয়ে মরে। আমরাও সবাই নিজেদের খুব সেয়ানা মনে করি। সারা জীবন তাই আবর্জনা খেয়ে মরছি। আবর্জনা কি? এদিক সেদিক দুচারটে কথা পড়ে বা শুনে সেগুলিকেই মাথায় নিয়ে ঘুরছি, যার মধ্যে একটা নতুন কথা নেই, একটু কোন স্বাধীন চিন্তা ভাবনা নেই। স্বামীজী বললেন all knowledge within you তোমার ভেতরেই সব জ্ঞান। কিন্তু একটা কোন কথা কি আছে যে কথাটা আমি স্বাধীন ভাবে চিন্তা ভাবনা করে বার করেছি? এটাই হল আবর্জনা খাওয়া, কোনটা বাজে আবর্জনা আবার কোনটা ভালো আবর্জনা। শাস্ত্র শুনে যখন বলছি তখনও অপরের কথা, আর অপরের কথা শুনে যখন কিছু বলছি বা করছি তখনও সেই একই কথা। এমন কোন কিছু নেই যেটাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি স্বাধীন ভাবে কাজ করছে। একটা জিনিষ তা সে খারাপই হোক, সেটাকে নিয়েই যদি স্বাধীন ভাবে চিন্তা ভাবনা করে তার মানে তার বুদ্ধি তখন কাজ করছে। সাধারণত বুদ্ধি কাজ করতে চায় না। পাখা ঘুরছে, এটাকে নিয়েই যদি আমরা বিচার করি, পাখা ঘুরছে দেখছি কিন্তু কি করে আমার বোধ হচ্ছে যে পাখা ঘুরছে। জিনিষটা বাইরে কিন্তু আমার বোধ মাথার ভেতরে হচ্ছে। এগুলোকে ব্যাখ্যা করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। প্রত্যেকটি পদ্ধতির একটা নিজস্ব নীতি আছে, বেদান্তেরও তার নিজস্ব একটা নীতি আছে। স্বামীজীও বলছেন, বাইরের জগৎ আমাদের একটা ইঙ্গিত ইশারা করে, সেখান থেকে আমাদের ভেতরে একটা জিনিষ দাঁড়িয়ে যায়। আমরা কিন্তু এখানে জ্ঞান বা উপলব্ধি নিয়ে আলোচনা করছি না। নিউরো বিজ্ঞানীরা এর উপর অনেক কথা বলেন, তাঁরা বলেন নিউরোন্সে নানা রকমের তথ্য রেকর্ডেড আছে ইত্যাদি। কিন্তু মন, স্নায়ু, বুদ্ধি যত যা কিছু আছে সবই জড় পদার্থ। কিন্তু আমি জানছি। এই বোধ, এই সচেতনতা কিভাবে হয়? ব্যাপারটা

ঋষিদের কাছে খুব সহজ। তোমার যা কিছু বোধ হয় সব আত্মার বোধ হয় বা আত্মার যে চৈতন্য যে জিনিষে প্রতিবিম্বিত হয় তার বোধ হয়, যেমন মন।

বিজ্ঞানীদের যুক্তিতে ঠাকুরের অনেক ভাবকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। স্বামীজী এগুলোর বিচারের জন্য একটাই মাপকাঠি আনছেন, তা হল চরিত্র। ধর্ম বা ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষদেরকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা যা যুক্তি ও ব্যাখ্যা দেন আমরা তা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মেনে নেওয়ার সময় আমরা মহাপুরুষদের চরিত্রকে ভুলে যাচ্ছি, ঠাকুরের যে চরিত্র বা স্বামীজীর যে চরিত্র, অপরের জন্য সব কিছু দিয়ে দিচ্ছেন এই জিনিষটাকে আমরা ভুলে যাচ্ছি। বিজ্ঞানীরা যদি বলেন এগুলো তোমার মনের ভুল। আমরাও উল্টোটা বলতে পারি বিজ্ঞানীরা যা বলছে সবটাই মনের ভুল। এই তর্কাতর্কিতে গিয়ে আমাদের কোন লাভ নেই। তার কারণ ওরা যে কথাগুলো বলে ঐ একই কথাগুলো ঘুরিয়ে তাদের বিরুদ্ধেও বলা যায়। কিন্তু সমাধির পর যে জ্ঞান আর ঐ জ্ঞানের প্রভাবে যে প্রতিভা, আর ঐ জ্ঞানের প্রভাবে তাঁর চরিত্রে যে পরিবর্তন হয়, এই জিনিষটাকে কখনই নাকচ করা যাবে না। আর এই জ্ঞান, প্রতিভা, চরিত্রের পরিবর্তন ক্ষণিকের জন্য হচ্ছে না, এটাই নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যিনি চৈতন্য তিনি নিজেকে দু ভাবে প্রকট করেন, একটা সমষ্টি রূপে বা বৃহৎ রূপে আরেকটি ব্যষ্টি রূপে বা অণু রূপে। ব্যষ্টি রূপকেই বলছেন জীব, সমষ্টি রূপকে ঈশ্বর বলছেন। দুটোতেই অজ্ঞান কাজ করে, চৈতন্যের উপর একটা অবিজ্ঞানের আবরণ এসে যায়। এই আবরণও ভগবানেরই শক্তি। এই আবরণের জন্যই সমষ্টিকে এক রকম দেখায় আর ব্যষ্টিকে আরেক রকম দেখায়, এটাই হল সুষুপ্তি, গভীর নিদ্রায় এক রকম দেখায়। সমষ্টিরও স্বপ্নাবস্থা আছে আর ব্যষ্টিরও স্বপ্নাবস্থা আছে, সমষ্টিরও জাগ্রত অবস্থা আছে আর ব্যষ্টিরও জাগ্রত অবস্থা আছে। সমষ্টির জাগ্রত অবস্থাকে বলে বিশ্ব বা সংসার আর তারই যে ব্যষ্টি রূপ সেটাই জীব।

মনে করা যাক একটা বিরাট আলো আছে, সেই আলোর উপর একটা পর্দা দেওয়া, পর্দায় ছোট ছোট অনেক রঙিন কাঁচ লাগানো। এক একটা রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে আলো যাচ্ছে, প্রত্যেকটি আলোর নিজস্ব একটা অস্তিত্ব আছে সেগুলো যেন এক একটা জীব। আর পুরো পর্দাকে সমষ্টি রূপে যদি দেখি, তাহলে পর্দার ভেতর দিয়ে যে সমষ্টি আলো আসছে তারও একটা সামগ্রিক অস্তিত্ব আছে, সেটাই আমাদের ঈশ্বর। এই দুটোর বাইরে তৃতীয় একটা অস্তিত্ব আছে তা হল সেই বিশুদ্ধ আলো, যেখানে কোন কিছুর আবরণ নেই। বোঝানর জন্য একটা উপমা নেওয়া হল। আমাদের উপনিষদের ঋষিরা বারবার ঐ বিশুদ্ধ আলোকে নিয়েই আলোচনা করছেন। যেমন সিনেমাতে প্রজেক্টরের সামনে একটা রীল রেখে দিলে পর্দায় ছবিগুলো দেখা যেতে থাকে। আলাদা আলাদ দৃশ্য আছে আর সব দৃশ্য মিলিয়ে একটা কাহিনী আছে। এটা অন্য উপমা। এখন যদি চিন্তা করে দেখি, ঐ আলো যদি চৈতন্যের আলো হয়, তখন চৈতন্যের চলাফেরা সবই হবে কিন্তু এক একটা ছিদ্রের মাঝখান দিয়েই হবে। আর সব ছিদ্র দিয়ে যে একটা সমষ্টি আলো বেরোচ্ছে, এই সমষ্টি আলোকেই বলে ঈশ্বর। একক আলোকে বলে জীব। আর ফিল্মের রীলটা সরিয়ে দিলে যে আলো আসে সেটাই ব্রহ্ম।

এখানে খুব সহজ উপমা নিয়ে আসা হয়েছে। উপমা দিয়ে এই জটিল জিনিষকে স্পষ্ট করা যাবে না। স্বপ্নের বস্তুকে কে নির্মাণ করছেন? *কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ,* বলছেন পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই সব নির্মাণ করেন। কাম বলতে এখানে প্রিয় অপ্রিয় সবটাকে মিলিয়েই বলছেন। স্বপ্নে দেখছি বাঘ আমাকে তাড়া করেছে আর আমি দৌড়াচ্ছি, ঐ বাঘকে আমিই নির্মাণ করেছি আবার আমাকেও আমিই নির্মাণ করেছি। তারপর হঠাৎ একটা শিকারী এসে বাঘটাকে গুলি করল। শিকারীকেও আমিই নির্মাণ করেছি, বন্দুকটাও আমিই তৈরী করেছি, বন্দুকের গুলিও আমিই তৈরী করেছি। বাঘও আমি, শিকারীও আমি আর তার শিকারটাও আমি। সমষ্টির দিক থেকে দেখলেও ঠিক একই জিনিষ হয়। আমি চৈতন্যের আবরণ দিয়ে যদি দেখি তাহলে দেখব যিনি ঈশ্বর বা সমষ্টি তিনিই ঐ বাঘ, তিনিই আমি হয়েছেন, তিনিই শিকারী, তিনিই বন্দুক, তিনিই সব। তাহলে এখন সত্য কোনটা? আমাদের মন যখন যেটাকে নিয়ে থাকবে তখন সেটাই সত্য। যখন ব্যষ্টি রূপে দেখছি তখন বাঘও সত্য, আমি নিজেও সত্য, শিকারীও সত্য, শিকারী গুলি চালাচ্ছে সেটাও সত্য। সমষ্টি রূপে যখন দেখছি তখন দেখছি বাঘও তিনি, শিকারীও তিনি হয়েছেন আর বন্দুক আর তার গুলি সব তিনিই হয়েছেন। আর যখন বলছি কোথাও কিছু নেই, না আছে বাঘ, না আছে শিকারী, সেটাও সত্য। এখানে সেই কথাই বলছেন, যদি বাঘ, শিকারী, বন্দুক তোমার কাছে মনে হয় তাহলে সারা জীবন তোমাকে চোখের জলে ভাসতে হবে। ওটাও

সত্য, ওটাকে কেউ প্রশ্ন করছে না। জাগ্রত অবস্থায় সবই সত্য। স্বপ্নাবস্থার সত্যকে কেন্দ্র করে বোঝানর চেষ্টা করছেন, যেটাকে আমরা উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ব্যষ্টির দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখা হবে তখন প্রত্যেকটি ছিদ্র দিয়ে যে আলো আসছে সব কটি আলোই সত্য, সমষ্টির দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখব তখন দেখছি সবটা তো সেই একই আলো, আর সামনের পর্দাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এতক্ষণ যা কিছু দেখা যাচ্ছিল এগুলো আদপেই নেই। তাহলে জন্ম-মৃত্যু? এটাও সত্য আবার জন্ম-মৃত্যু সবটাই ভগবানের আর জন্ম নেই মৃত্যু নেই, সেটাও সত্য। আমাকে এখন ঠিক করতে হবে এর মধ্যে আমি কোনটা নেব।

নচিকেতার প্রশ্ন ছিল আত্মা আছে কি নেই, যমরাজ দেখাচ্ছেন আত্মাই আছেন। এখন দেখ কোনটাকে তুমি নেবে। যমরাজ বোঝানর জন্য বলছেন স্বপ্নে সব কিছু তোমার মনই নির্মাণ করছে। একটা একক স্বতন্ত্র মন যদি এত কিছু তৈরী করতে পারে, যেটাকে দেখে তুমি মোহিত হয়ে যাচ্ছ, তাহলে সমষ্টি মন, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি কী করতে পারেন ভেবে দেখ। তাহলে জীবাত্মা কে, পরমাত্মা কে আর ঈশ্বরই বা কে? তুমি যাকে ভাববে সেই জীবাত্মা হবে বা পরমাত্মা হবে বা ঈশ্বর হবে? তুমি যদি একক রূপে দেখ সেটাই তখন জীবাত্মা, সমষ্টি রূপে যদি দেখ তখন ঈশ্বর আর যদি কোন কিছু রূপে না দেখ তখন সেই শুদ্ধ আত্মা। ঐ যে এককের খেলা বা ছবি তার পেছনে কি আছে? আলোর কিরণ, সমস্ত জীবের সমষ্টির পেছনে যে খেলা তার পেছনেও ঐ আলোই। আলো জিনিষটা কি? তাতে কোন ছায়া নেই। চৈতন্য ঠিক এভাবেই চলে। শুদ্ধ চৈতন্যের কোন কিছু নেই, কিন্তু যখন মায়ার আবরণ এসে যায় তখন তিনটে রঙ, সত্ত্ব, রজো আর তমো তাঁর সামনে এসে যায়। চৈতন্যের আলো ভৌতিক আলো নয়, কিন্তু সত্ত্ব, রজো আর তমো যেই এসে গেল তখন তিনটে গুণের সংমিশ্রণে আলো ছায়ার খেলা শুরু হয়ে যায়। এই জিনিষতো আমার আপনার তৈরী করা নয়, এটা শুদ্ধ চৈতন্যের দ্বারা নির্মিত, সেইজন্য ভাবটাও তাঁর সেই রকম হবে, বোধটাও তাঁর সেই রকম হবে। এই জিনিষটাকে বোঝানর জন্য এখানে স্বপ্নের উপমা নিচ্ছেন। স্বপ্নে যা কিছু দেখছ সবটাই তুমি নির্মাণ করছ, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর দেখছ কিছুই নেই। তোমারই যদি নির্মাণ করার ক্ষমতা থাকে তাহলে যিনি বিশ্বচেতনা, যিনি চৈতন্য স্বরূপ তিনি কী নির্মাণ করতে পারেন ধারণা করে নাও! পুরো জগৎ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন।

এককই জীব, সমষ্টিই ঈশ্বর, অজ্ঞানের আবরণ সরিয়ে দিলে জীব, ঈশ্বর কিছুই থাকে না, তখন শুধু শুদ্ধ চৈতন্যই থাকেন। কিন্তু একক কখনই ঈশ্বর হতে পারবে না, যখনই একক থাকবে তখন সমষ্টিও থাকবে। একক মানেই জীব, জীব মানেই ঈশ্বর, তিনিই অজ্ঞানের এদিককার সব কিছুর রাজা। যেমনি অজ্ঞান সরে গেল তখন একও নেই সমস্তও নেই, কিছুই নেই, যিনি আছেন তিনিই আছেন। এই আলোচনা এর আগেও অনেকবার হয়েছে, আবারও এই আলোচনা আসবে। কিন্তু নিজে এটাকে নিয়ে চিন্তন না করলে কখনই এই জিনিষ স্পষ্ট হবে না। যেভাবে আমরা স্বপ্নে অনেক কিছু সৃষ্টি করি সেভাবে তিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করছেন। যে জিনিষটা তোমার স্বপ্নে সব কিছুকে নির্মাণ করে সেই জিনিষটাই শুদ্ধ আত্মা। কারণ একক যে জীব সেই জীবের পেছনে চৈতন্য আছেন বলেই সে একক জীব।

তদেব শুক্রং, শুক্র মানে শুদ্ধ, সেই চৈতন্য একেবারে শুদ্ধ সেখানে কোন কিছুর মিশ্রণ নেই, কোন মলিনতা নেই, এর সাথে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই, ঈশ্বর মানে সমষ্টি। তাঁর পেছনে যিনি আছেন তিনি শুভ্র, সেখানে সত্ত্ব, রজো ও তমো কেউ নেই, কোন ধরণের ধর্ম অধর্ম নেই। আমরা এই শুদ্ধ চৈতন্যকে শুদ্ধ আলো রূপে কল্পনাই করতে পারি, কল্পনা করা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। সেই শুদ্ধ আলোর উপর মায়ার আবরণ এসে গেলে ধর্ম-অধর্ম, ভালো-মন্দ, পূণ্য-পাপ সব চলে আসে।

এই যে যিনি শুভ্র, যেখানে কোন মদ নেই, পুরো নির্মল, *তদ্ব্রহ্ম*, এটাকেই ব্রহ্ম বলে, এটাকেই আত্মা বলে। *তদেবামৃতমুচ্যতে*, যত শাস্ত্র আছে সবাই তাঁকেই অমৃত বলছে। এই জগতে অমর কেউ নেই, মায়ার আবরণ ভেদ করে যে আলো বেরিয়ে আসছে ওটাই জীবন-মৃত্যুর খেলা, এখানে কেউ অমর হতে পারবে না। মনে করুন একটা অসংখ্য ছিদ্র যুক্ত বিরাট চাকা, চাকা আলোর সামনে ঘুরছে। কখন আলো আসা বন্ধ হচ্ছে কখন আলো আসতে থাকে, আলো আলোর মতই আছে, কিন্তু তার সামনের আবরণটা অবিরত পাল্টে যাচ্ছে। এটাই প্রকৃতি, প্রকৃতির আবার সত্ত্ব, রজো আর তমো ছাড়া কিছুই নেই। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির নানা রকমের মিশ্রণ সংমিশ্রণের খেলা চলছে। ঐ মিশ্রণ সংমিশ্রণের ভেতর দিয়ে চৈতন্যের আলো বাইরে আসছে, বাইরে

এসে আলোর রূপটা পাল্টে যাচ্ছে। প্রকৃতির পারে চলে গেলে তখন দেখবে *শুক্রম্*, তাঁর কোন রঙ নেই, শুদ্ধ আলো। সেখানে জন্ম-মৃত্যু নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই, আলো-আঁধার নেই, পাপ-পূণ্য নেই, ধর্ম-অধর্ম নেই, ঐ অবস্থাই ঠিক ঠিক অমরত্ব, *তদেবামৃতমুচ্যতে*।

তস্মিঁন্নলোকাশ্রিতাঃ সর্বে, সমস্ত লোক, ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব তাঁর উপর আশ্রিত। *তদু নাত্যেতি কশ্চন*, শুধু আশ্রয় করেই নেই সবাইকে তিনিই জন্ম দিয়েছেন, সেইজন্য কেউ কোন দিন তাঁকে অতিক্রম করতে পারবে না। জন্ম শব্দটা আমরা বলছি ঠিকই কিন্তু আচার্য বলছেন সব কিছুর পেছনে তিনিই কারণ। তিনি আছেন বলেই সব কিছু আছে। ঠাকুর আলু-পটলের উপমা দিচ্ছেন, হাড়িতে আলু-পটল লাফাচ্ছে, তলায় আগুন আছে বলে ওরা লাফাচ্ছে। নীচে আগুন আছে বলে হাড়ির জল গরম হচ্ছে, কিন্তু পাত্রের তাপ কোন দিন নীচের আগুনকে অতিক্রম করতে পারবে না। কারণ পাত্রের তাপ নীচের আগুনকে আশ্রয় করে আছে। এটাকেই স্বপ্নের উপমা দিয়ে সহজ করে বোঝাচ্ছেন, স্বপ্নে তুমিই সব কিছু নির্মাণ করছ, এখানে বাইরের কোন কারণ নেই। ঠিক তেমনি ঈশ্বর এই সংসারের সব কিছু নির্মাণ করছেন। ঈশ্বর কে? ঐ ব্রহ্মের উপর অজ্ঞানের আবরণ এসে যাওয়াতে এবার যাঁকে দেখা যাচ্ছে তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্ম নির্বিকার তিনি কোন কিছুর নির্মাণ করেন না। তিনি শুধু ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, ইচ্ছা করতেই মায়ার আবরণ এসে গেল। মায়ার আবরণ এসে যাওয়াতে যিনি চৈতন্য তিনিই এখন অসংখ্য রূপে সামনে এসে গেলেন। আসলে কিন্তু কিছুই সামনে আসছে না, কোন রকমে মায়ার এই দেওয়ালকে যদি টপকে ওপারে চলে যাওয়া যায় তখন দেখবে কোথাও কিছু নেই। কিন্তু এই মায়াকে অতিক্রম করা যায় না। জন্ম আছে, মৃত্যু আছে তাহলে কি আত্মাও আছেন? নচিকেতার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন হ্যাঁ আছে। যেমন তোমার মন নানা রকম জিনিষ সৃষ্টি করছে, তার মধ্যে চৈতন্য সত্তাকে থাকতে হবে, যিনি তোমার মনকে বোধ করাচ্ছেন। যিনি বোধ করাচ্ছেন তিনিই কিন্তু সৃষ্টি করেন। ঠিক তেমনি এই জগৎকে, এই সংসারকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জগৎকে বোধ করেন, তিনিই একক, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই বিভু, তিনিই প্রভু। তাঁরই সৃষ্টি আবার সৃষ্টি নেই। তুমি কি চাইছ? ঠাকুর বলছেন একজনের একটা রঙের গামলা ছিল, যে রঙ তুমি চাইবে সে সেই রঙে কাপড় ছুপিয়ে দেবে। সে বলছে, তোমার ভাই কোন রঙ লাগবে সেটা বল। তুমি যদি বল আমি বেশ আছি, তাহলে বেশ থাক, এই প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না। নচিকেতা যদি বলে আমি বেশ আছি, আমার বাবা পণ্ডিত, আমার বাবা যজ্ঞ করে এসেছেন, আমিও যজ্ঞ করছি, আমি যজ্ঞের মন্ত্র জানি। বেশ তো, তাতে তো কোন অসুবিধা নেই, তুমি ঐ ভাবেই থাক, কারুর কিছু বলার নেই। কিন্তু নচিকেতার মনে প্রশ্ন এসেছে, আমি জানতে চাই এসবের পেছনে কি আছে। এটাকে জানলে তোমার কি হবে? তুমি শোক মোহের পারে চলে যাবে।

এসব কথা একদিন শুনলে কিছুই ধারণা হয় না, অনেক দিন ধরে শুনতে শুনতে ধারণা হতে শুরু হয়। এরপর জীবনে পঞ্চাশ রকমের যে দুঃখ-কষ্ট আসছিল তখন হঠাৎ মনে হবে আসলে এই দুঃখ-কষ্ট কিছু না, ছিদ্রে যে কাঁচটা লাগানো আছে সেটা যেন একটু পাল্টে গিয়ে চৈতন্যের কিরণটা অন্য রকম হয়ে গেছে। প্রজেক্টরে যে ফিল্ম লাগানো আছে ওটাই নাম-রূপ, ফিল্মটাই মায়া। এরপর যা আছে সেটাই সংসার, আমি তুমি যা আছে সবই সত্য, ঠাকুরও সত্য। যখন এই মায়ার রূপ চলে যাবে তখন শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন, তুমি তাঁকে ব্রহ্ম বল, আত্মাই বল আর যাই বল তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি আছেন, তিনিই অবস্থান করছেন। তাহলে যে মাটি দিয়ে আমরা তৈরী হয়েছি সেই মাটি তিনি কোথা থেকে আনলেন? কোথা থেকেও আনছেন না, তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সব হয়ে যায়। ইচ্ছা মাত্রে কি কখন সৃষ্টি হতে পারে, সে কি কখন সম্ভব? এটাই মন্ত্রে বলছেন, কেন হবে না, তুমি তো রোজ স্বপ্নে কত কিছু সৃষ্টি করে যাচ্ছ, সেখানে তুমি তো ইচ্ছা মাত্রই সৃষ্টি করছ। আর কি সৃষ্টি করছ? যা তুমি চাও ইচ্ছা মাত্রেই সৃষ্টি করে দিচ্ছ। আচার্য নারীর উপমা দিচ্ছেন, নারী চাই নারীকে সৃষ্টি করে দিচ্ছ, আমি রাজা হয়ে গেছি সেটাও তুমি সৃষ্টি করছ। আমি মারা গেছি, সেটাও তুমিই সৃষ্টি করছ। কে করছে? তোমার মনই করছে। ঠিক তেমনি তিনিও ইচ্ছা মাত্রই সংসার সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। *কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ*, যা যা পুরুষের কাম্য বস্তু, যেমন যেমন চাইছেন সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। ওখানে যেমন একটা কার্য কারণ সম্পর্ক আছে স্বপ্নেও কার্য কারণ সম্পর্ক আছে। স্বপ্নে কখন মনে হবে না তুমি কালা, স্বপ্নে মনে হবে সবটাই ঠিক চলছে। স্বপ্নে দেখছ তুমি দেওয়ালে দিয়ে হাটছ, তখন তোমার মনে সন্দেহ হবে না, কেন এভাবে হাটছি। ঘুম ভাঙার পর মনে হবে ব্যাপারটা উদ্ভট ছিল। ঠিক তেমনি আমাদের এই জীবনে যা কিছু

হচ্ছে, মনে করছি সবটাই বাস্তব, আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর মনে হবে সবটাই উদ্ভট ছিল। কার্য-কারণ সম্পর্ক কোথাও নেই, না আছে এদিকে না আছে মাঝখানে আর ওখানে তো কার্যই নেই তার আবার কারণ কোথা থেকে আসবে। এগুলো অত্যন্ত গুহ্য কথা। বারবার যমরাজ বলছেন *পরমং গুহ্যম্*, গুহ্য মানে এইসব তত্ত্ব কথা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য। একটু চিন্তা ভাবনা করলে, একটু বিচার করলে যদিও এগুলো ধারণা হবে না কিন্তু জীবনে যে এত সমস্যা, সমস্যার কারণগুলোর অন্তত সন্ধান পেতে পারি। জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট কেন? কারণ দুঃখ-কষ্টের সাথে সবাই নিজেকে জুড়ে রেখেছে। শুদ্ধ আত্মা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-দেহের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নানা রকম কামনা করে করে তাঁর একটা নিজস্ব জগৎ দাঁড় করিয়েছেন। সেই জগতে আমি, আপনি সবাই আছি, শরীর, মন, বুদ্ধি সবই আছে। এই জগৎ কে সৃষ্টি করছেন? আমারই আত্মা। সেই শুদ্ধ আত্মাই সৃষ্টি করছেন, তিনি বললেন আমি এক আমি বহু হব। সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন আমি বহু হব, এটাই মায়া। এই মায়ার দরুণ ঐ এক যিনি তিনি এখন বহু রূপে দেখাচ্ছেন। মূল হল, যিনি আছেন তিনি নিজেই বহু হয়ে যান। কিভাবে হন? নিজের মায়ার শক্তিতে। এটা কি সম্ভব? কেন সম্ভব নয়, তুমি তো রোজই স্বপ্নে কত কি সৃষ্টি করছ, তখন তো তোমার এগুলোকে খ্যাপামো বলে মনে হয় না। তুমি যদি করতে পার তাহলে তিনি কেন করতে পারবেন না! তুমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব হয়ে যদি রোজ রাত্রিবেলা ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টি করতে পার, তিনি বৃহৎ হয়ে কেন করতে পারবেন না! এটাই মন্ত্রের মূল বক্তব্য। বলছেন, যখন এটা বুঝবে তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করছেন, তখন বুঝবে তাঁর চরিত্র কি রকম, *শুক্রম্, অমৃতম্* আর তিনিই এই সংসারের সব কিছুর কারণ, তাঁকেই সব কিছু আশ্রয় করে আছে। সেই শুদ্ধ আত্মাকে সব কিছুকে কিভাবে আশ্রয় করে থাকে সেটাকেই পরের দুটি মন্ত্রে অগ্নি আর বায়ুর উপমা নিয়ে বোঝাচ্ছেন –

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।।২/২/৯।।

(যেমন একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করে দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেই রকম অদ্বিতীয় সর্বান্তরযামীও জীবদেহসমূহে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের সদৃশ হয়েছেন, অথচ তদতিরিক্ত রূপে বর্তমান রয়েছেন।)

অগ্নি এক, সেই অগ্নি যখন বিভিন্ন পদার্থে প্রবেশ করে, যেমন পেট্রলে ঢুকছে, ডিজেলে ঢুকছে, কাঠের মধ্যে, কয়লার মধ্যে প্রবেশ করছে তখন সেটা সুপ্ত আগুন, আগুন কিন্তু সেই এক। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থে প্রবেশের পর তার রূপ ও প্রকাশ আলাদা হয়ে যায়। অগ্নি এখানে আত্মার উপমা।

সৃষ্টিকে মোটামুটি দু ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটা হল যেটা ভারতবর্ষে বেশি প্রচলিত, ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করেছেন, সাংখ্য মত বা বেদান্ত মতেও তাই বলছে। আরেকটা মত হল বিদেশী ধর্মের মত, জুহুদি, খ্রীষ্টান, ইসলাম যে মতকে মেনে চলে। পার্সিদের মতও কতকটা তাই কিন্তু তাঁরা এর মধ্যে বেশি যান না। জহুদিরা সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষ করে ওল্ড টেস্টামেন্টে যেভাবে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, খ্রীষ্টান আর ইসলাম ধর্মও মোটামুটি সেই মতে চলে, যদিও সামান্য তফাৎ আছে। এদের মতে, ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি ঠিক করলেন সৃষ্টি করবেন। সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি অব্যক্ত ভাবে যা কিছু আছে সব আলাদা করে দিলেন, আলোকে অন্ধকার থেকে, অন্তরীক্ষকে পৃথিবী থেকে, জলকে আবার মাটি থেকে ইত্যাদি। এরপর তিনি একটা একটা করে সৃষ্টি করলেন। মানুষ সৃষ্টি করার সময় মাটি নিয়ে মানুষ তৈরী করে মানুষের মধ্যে তিনি আত্মা ফুঁকে দিলেন। আত্মাকে মানুষের মধ্যে ফুঁকে দেওয়ার পর মানুষ মানুষ হয়ে গেল। সব কিছুকে সৃষ্টি করে তিনি সবেতেই কিছু না কিছু ভরে দিলেন, যেমন জলে মাছ ভরে দিলেন, আকাশে পাখিদের, মাটিতে জীবজন্তু, অন্য দিকে অন্তরীক্ষে সূর্য, চন্দ্র, তারা দিয়ে ভরে দিলেন। মানুষকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে আত্মাকে ফুঁকে দিলেন, যদিও আত্মা ঠিক নয়, ওদের ভাষায় শব্দটা হল Soul। সৃষ্টির এই মতের সাথে ভারতের সৃষ্টির মতের বিরাট একটা তফাৎ হয়ে যায়। বিদেশী ধর্মগুলি বলছে সৃষ্টি করতে গিয়ে ভগবান সবটাই সৃষ্টি করে দিলেন, তারা, চন্দ্র, সূর্য, পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদি। কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করার পর তিনি তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিলেন, ওদের ভাষায় Breath of Soul। এর অর্থ, মানুষ ছাড়া আর কোন পশু, পাখি, গাছাপালার মধ্যে

আত্মা নেই। এটাই পুরো জুডিও, খ্রীষ্টান আর মুসলিমদের দৃঢ় বিশ্বাস। গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, বাঘ, সিংহ, পোকামাকড়, পাখি, গাছাপালা সবই ভগবানের সৃষ্টি এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের কারুর মধ্যে আত্মা নেই। হিন্দু ধর্ম আর জহুদি, খ্রীষ্টান আর ইসলাম ধর্মের এটি একটি বড় তফাৎ।

পশুপাখি গাছপালার মধ্যে আত্মা নেই, এই বিশ্বাস থেকে আরেক ধাপ এগোলে অনেক সমস্যা এসে যায়। তাহলে চেতনা জিনিষটা কার? চেতনার ব্যাপারে আমরা সাধারণ ভাবে যা বুঝি সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বেড়ালেরও চেতনা আছে, কুকুরেরও চেতনা আছে। কিন্তু বাইবেলে বলছে একমাত্র মানুষের মধ্যেই soulকে ভগবান ফুঁকে দিয়েছেন। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আত্মা যদি না থাকে তাহলে চেতনা জিনিষটা আত্মাতে থাকতে পারে না, চেতনা অন্য জায়গায় থাকতে হবে। ইদানিং বিদেশীরা চেতনাকে নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করছে। মানুষ যেমন চেতন তেমনি কুকুর, বেড়াল, হাতি এরাও চেতন প্রাণী। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস যখন বললেন গাছেরও চেতনা আছে তখন এই নিয়ে খ্রীষ্টান দুনিয়ায় খুব সমস্যা হয়ে গেল।

ঈশিগুরো একজন নামকরা জাপানী বংশোদ্ভব বৃটিশ ঔপন্যাসিক তাঁর একটি উপন্যাসে ক্লোনিং করা মানুষদের নিয়ে কাহিনী বলছেন। সেখানে দেখাচ্ছেন বিভিন অপরাধী যাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেছে বা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত, এদের ক্লোনিং করা হয়েছে। ক্লোনিং করার একটাই উদ্দেশ্য, সাধরণ মানুষের খারাপ হয়ে যাওয়া অর্গানগুলো পাল্টে ক্লোনিং করা মানুষের অর্গানগুলো বসিয়ে দেওয়া। যেমন যাদের হার্ট খারাপ তাদের ক্লোনিং করা মানুষের হার্ট কেটে লাগিয়ে দিচ্ছে। ওরা যেন অর্গান সরবরাহের ফ্যাক্টরি। ওদের মধ্যে আবার দুটো গ্রুপ, একটা গ্রুপের ক্লোনিং করা মানুষরা অর্গান সরবরাহ করে আর আরেকটা গ্রুপ ওদেরকে কাউনসেলিং করে। ওরা জন্ম থেকে জানে যে আমরা মানবজাতির জন্য বলি প্রদত্ত। এদের সাধারণ মানুষদের সাথে মিশতে দেওয়া হয় না। একজন মহিলা ক্লোনিং করা বাচ্চাদের ছবি আঁকা, গানবাজনা শেখাতে শুরু করলেন। এদের আঁকা ছবিগুলোকে নিয়ে মহিলাটি বিভিন্ন শহরে গিয়ে ডিসপ্লে করতে শুরু করলেন। সমাজ বলছে ক্লোনিং করা মানুষের মধ্যে সোল নেই, কারণ এরা তো ভগবানের সৃষ্টি নয়, ক্লোনিং করে এসেছে। তাই এদের মধ্যে সোল নেই। কিন্তু মহিলাটি বলছেন, আমি এদের কাজ দেখিয়ে প্রমাণিত করতে চাইছি এদের মধ্যেও সোল আছে। যিনি এই কাহিনী লিখছেন তাঁর বিচারবুদ্ধিতেও একটা গোলমাল ধরা পড়ছে। প্রথম গোলমাল হল ধর্মীয় কুসংস্কারের জন্য ক্লোনিং করা মানুষগুলিকে অর্গান সরবরাহের মেশিন মনে করছেন। কিন্তু তার থেকেও বেশি হল, লেখককে প্রমাণিত করতে হচ্ছে যে এদের মধ্যেও সোল আছে। সেইজন্য তাদের দিয়ে ছবি আঁকার মত অন্যান্য সূক্ষ্ম কাজ করাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে যে সোল আছে এর বিশেষত্ব কোথায়? লেখকের মতে এর বিশেষত্ব হল সে ছবি আঁকতে পারছে, সূক্ষ্ম কাজ করতে পারছে। পশুরা পারে না, তাই তাদের মধ্যে সোল নেই। পুরো পাশ্চাত্য সভ্যতা এই নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমরা তাই অনেক সময় বুঝতে পারি না, ওরা কি বলতে চাইছে। ওরাও একই কারণে আমাদের বুঝতে পারে না। স্বামীজী এদের এই জিনিষগুলিকে নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন। যার জন্য ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে বলেছিলেন, পঞ্চাশ বছর আগে আপনি এখানে এলে আপনাকে এরা পুড়িয়ে মেরে ফেলত। আমরা এসব ব্যাপারে গোঁড়া নই, কিন্তু পুরো পাশ্চাত্য সভ্যতা, যাদের মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান, জহুদির প্রভাব, এরা সবাই অত্যন্ত গোঁড়া। ওরা মানবেই না যে কুকুর বেড়ালেরও সোল আছে। ইদানিং কালে আমাদের পুনর্জন্মবাদের ধারণা যেতে যেতে এদের অনেকেই এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। একশ বছর আগে কল্পনাই করা যেত না। এখনও সর্বসাধারণরা যে প্রকাশ্যে মানবেন তাও নয়। আমাদের কাছে আত্মা মানে চেতনা, ওদের কাছে আত্মা মানে যে কি ভগবানই জানেন। মানুষ যা পারে একটা হাতিও পারে, কুকুরও পারে। তাহলে মানুষের মধ্যে ভগবান যদি আত্মা ফুঁকে দিয়ে থাকেন তাহলে তার কিছু বৈশিষ্ট্য হবে। মানবজাতি শ্রেষ্ঠ মানলাম, কিন্তু মানুষ যদি সত্য হয় তাহলে কুকুরও সত্য নয় কেন!

ভগবান আমাদের মধ্যে সোল দিয়েছেন। কিন্তু ওরা সোল বলতে যা বোঝে সেই সোল কি করে? ওদের কাছে কোন উত্তর নেই। উত্তর নেই বলে ছবি আঁকা, অন্যান্য সূক্ষ্ম কাজগুলোকে সোলের সাথে জুড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে গরিলা, শিম্পাজীদের নিয়ে কোন খবর হলে সেটাকে নিয়ে এরা তাই খুব হৈ চৈ শুরু করে দেয়, আসলে বলতে চাইছে, আমরা যে জিনিষটাকে আমাদের বৈশিষ্ট্য মনে করছি সেটা পশুরাও পারে।

আমাদের কাছে এগুলো কোন আলোড়ন সৃষ্টি করে না। কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হয় চেতনাকে নিয়ে, ওরা যেটাকে সোল বলছে সেই সোলের সাথে চেতনার কোন সম্পর্ক নেই বলতে হয়, কারণ কুকুর, বেড়াল সবারই চেতনা রয়েছে। সেইজন্য ওদের কাছে চেতনা মানে মনের তৈরী কোন জিনিষ। তখন ওরা নির্ধারণ করবে মন আছে কিনা। কুকুরের মস্তিষ্ক আছে, তাহলে মনও আছে, মন থাকা মানে তার মধ্যে চেতনা আছে। যখনই চেতনাকে নিয়ে কোন সেমিনারাদি হয় তখন তারা চেতনাকে বুদ্ধির সঙ্গে এক করে ব্যাখ্যা করবে।

তাহলে সোল বলতে বোঝায় ভগবান আর এদিকে মানুষ। কারণ মানুষের মধ্যে তিনি প্রাণ, প্রাণ আমরা যে অর্থে বুঝি সেই অর্থে নয়, সোলের অর্থে বলছে, সেই প্রাণকে তিনি ফুঁকে দিলেন। সেইজন্য মানুষই শ্রেষ্ঠ, মানুষই স্বর্গে যেতে পারে, মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী যেতে পারবে না। যুধিষ্ঠির কুকুরকেও সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে যেতে চাইছেন। ওদের কাছে এই জিনিষ হতেই পারে না। পশুর মধ্যে কোন সোল নেই, সেইজন্য এদের পুনর্জন্মাদিও হয় না। তাহলে এরা কি? যেমন মৃত পদার্থ, মাটি, পাথর রয়েছে ঠিক তেমনি কুকুর বেড়ালও রয়েছে। এরা মরে গেলে পঞ্চতত্ত্বেই মিশে যাবে। কিন্তু মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তার কিছু একটা থেকে যাবে, যেটা স্বর্গ নরক কোথাও যায়।

মানুষের মধ্যে ভগবান আত্মা ফুঁকে দেওয়াতে বিভিন্ন মানুষের আত্মা আবার আলাদা আলাদা। বিভিন্ন মানুষের আত্মা কি আলাদা আলাদা হতে পারে? কিন্তু জৈন ধর্মে প্রত্যেকটি আত্মা আলাদা। আলাদাই শুধু নয়, যার শরীর যত বড় তার আত্মাও তেমন। তাহলে হাতির আত্মা বিরাট আর পিঁপড়ের আত্মা ছোট। যদিও এরা চৈতন্য চৈতন্য বলে যাচ্ছে কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে আসলে এরা সোলকে সূক্ষ্ম শরীরের সাথে এক করে ফেলছে। কিন্তু আমরা সূক্ষ্ম শরীর বলতে যে সতেরটি অবজবের কথা এর আগে বলেছি, এদের সূক্ষ্ম শরীর তাও নয়, ওদের কাছে এটা চেতনাই। জৈনদের মতে আত্মা পুরো শরীর জুড়ে। পুরো শরীর জুড়ে যদি না হত তাহলে আঙুলে ব্যাথা হলে আমার ব্যাথা বোধ হত না। চেতনা মানে বোধ, আত্মা শরীরে এত দূর পর্যন্ত আছেন। এগুলো জৈনদের যুক্তি। জৈনদের দর্শন পড়তে গেলে এগুলোকে কখনই ভুল মনে হবে না, মনে হবে ঠিকই বলছে। কিন্তু বেদান্তের কাছে সব কটিরই উত্তর আছে। কিন্তু এই ধরণের ধারণা এদের মধ্যে আছে। মুসলমানদের সমস্যা হল মুসলমান ধর্মের নিজস্ব কোন সৃষ্টিবাদ নেই, তারা জহুদিদের সৃষ্টিবাদকে নিয়েছে, খ্রীষ্টানরাও সৃষ্টিবাদ জহুদিদের থেকে নিয়েছে। জহুদিরা যখন ওদের দিয়েছে তখন এরা আদিম জাতি ছিল, এতটা তখন উন্নত ছিল না। ফলে আধ্যাত্মিক জিনিষের সাথে সাথে কিছু কিছু বুদ্ধির খেলাও তার মধ্যে এসে গেছে, আলাদা ভাবে এটাকে ধরা খুব মুশকিল।

প্রথমে আমরা একটা মত পেলাম, যে মতে শুধু মানুষের মধ্যেই সোল আছে অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে সোল নেই। এরপর আসছে জৈনদের মত, তারা বলছে পিঁপড়ের মধ্যেও সোল আছে কিন্তু পিঁপড়ের সাইজের সোল। হাতির সোল আবার হাতির সাইজের মত বড়। জৈনদের আবার মত হল, হাতির সোল বড় হতে পারে কিন্তু এই সোল ভৌতিক পদার্থের সাথে মিলেমিশে আছে। আর যাঁরা ঋষিদের মত উন্নত তাঁদের সোল থেকে সাংসারিকতা সরে গেছে। হাতির সোল যতই বড় হোক সেটা শুদ্ধ নয়, শুদ্ধতাই গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্টানদের সোল আবার যে কর্মগুলো করা হয়েছে কোথাও না কোথাও তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, শুভ কর্ম, অশুভ কর্ম তার উপর প্রভাব ফেলছে। এই প্রভাবের জন্য মৃত্যুর পর তাকে কিছুদিন শুদ্ধিকরণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মে শুদ্ধিকরণের পদ্ধতিগুলো অনেক বড় বড়। এরপর তারা একটা মুক্তির প্রকারে চলে যায়। বেদান্তের আত্মা যা আছেন তাই, বা আমাদের ভাষায় বলতে গেলে শুধু আত্মাই আছেন। আরও ভালো করে বুঝতে হলে বলতে হয় আত্মা এক, আত্মার বহুত্ব নেই। দ্বিতীয়ত, যেমন মাটি একটি একক বস্তু কিন্তু মাটি থেকেই অনেক কিছু হয়েছে। কুমোর মাটি থেকে থালা বানাচ্ছে, হাড়ি, ঘটি কত কিছু তৈরী করছে, ঐ একই বহু হয়েছে। এটাকে বলে বহুবাদ। হিন্দু ধর্ম বহুবাদ নয়, সেই আত্মাই অনেক কিছু হয়েছেন তাও নয়। আবার অন্য দিকে আলাদা আলদা অনেক সোল আছে, জিনিষটা তাই আলাদা তাও নয়। আবার Holismএ বলা হয় একই আত্মা আছেন যার উপর বাকি সব কিছু আছে, ঠিক ঠিক বেদান্ত তাও নয়। বেদান্ত একটাই, শুধু অদ্বৈত। অদ্বৈত মানে আত্মা ছাড়া কিছু নেই, আত্মাই আছেন। আত্মা ছাড়া কিছু নেই তাই তাঁর কোন শুভও হয় না,

অশুভও হয় না। কিন্তু আমরা বহু দেখছি, এই বহু হল আপাতপ্রতীয়মান, এটাই মায়া। যিনি এক তাঁকেই বহু রূপে দেখাচ্ছে। আমরা যে বহু দেখছি এটা কল্পনা, এটাই মায়া। এই জিনিষটাকেই দুটো মন্ত্রে বলতে যাচ্ছেন।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, অগ্নি যখন বিভিন্ন পদার্থে প্রবেশ করে তখন অগ্নি সেই পদার্থের রূপ ধারণ করে নেয়। কাঠের মধ্যে যাচ্ছে কাঠের রূপ ধারণ করে নিচ্ছে, কয়লার মধ্যে যাচ্ছে কয়লার মত হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে একটা দাহ্য ভেদ আছে, কাঠকে পোড়ালে একভাবে পুড়বে আবার কয়লাকে পোড়ালে আরেক ভাবে পুড়বে। কিন্তু সবটাই সেই অগ্নি। আমি বলতে পারি কেমেস্ট্রির দিক থেকে দেখতে গেলে বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন রকম compound আছে। কিন্তু ঋষিরা ওর মধ্যে যাবেনই না, তাঁরা বলবেন দাহিকা শক্তি বা দাহ্য ক্ষমতা তার মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে সেইজন্য অগ্নি উৎপন্ন হচ্ছে। অগ্নি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে জ্বালানির ক্ষমতা। এই ক্ষমতা এক কিন্তু বিভিন্ন জিনিষে প্রবেশ করে আছে।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা, অগ্নি যেমন বিভিন্ন পদার্থে প্রবেশ করে আছে, আত্মা সবারই ভেতরে প্রবেশ করে আছেন। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যিনি অন্তরাত্মা তিনি সেই এক, কিন্তু বিভিন্ন রূপে দেখাচ্ছেন। হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রীষ্টান ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম এখানে এসে আলাদা হয়ে যায়। তিনি বহু রূপে দেখাচ্ছেন, সে গাছপালা, কুকুর বেড়াল, মানুষ যাই হোক, বহু দেখাচ্ছেন অথচ তিনি এক। *প্রতিরূপো বহিশ্চ*, একই জিনিষের বহু রূপ হয়ে গেছে। সবার ভেতরে তিনিই বিরাজিত আবার তাদের বাইরেও তিনিই আছেন। আকাশ যেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, গ্লাশের ভেতরেও আকাশ, গ্লাশের বাইরেও আকাশ। এখানে যদি বিভিন্ন ধরণের পাত্র রেখে দেওয়া হয় তাতে আকাশের আকার গুলো পাত্র ভেদে পাল্টে যাবে, কিন্তু আকাশ সেই এক। পাত্রগুলিকে যদি ভেঙে দেওয়া, যে জিনিষগুলো আকাশকে সীমিত করছে সেই সীমিতকে যদি মিটিয়ে দেওয়া হয় তখন দেখবে সেই আকাশই আছে। আকাশের কি কখন কোন পরিবর্তন হয়েছিল, কখন কি বাধিত হয়েছিল? কখনই হয়নি। বেদান্তের এই একমাত্র সত্যকে নিয়ে আমরা যতই আলোচনা করি না কেন, এই সত্যকে ধারণা অত্যন্ত কঠিন, ধারণা করলে পালন করা আরও বেশি কঠিন, পালনকে উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। ঠিক সেইজন্য জহুদি, ইসলামের উচ্চ আধারের লোকেদের কাছে যখন এই ধর্ম গেল তখন তারা ধর্মকে সেই স্তরে নিয়ে যেতে পারল না। স্বামীজী তাই বেদান্তের ধর্মকে সব থেকে শক্তিশালী ধর্ম বলছেন। কারণ এই বেদান্তকে বুঝে নিয়ে জীবনে যে প্রয়োগ করতে পারবে তার শক্তি অনেক বেড়ে যায়, সবটাই তখন অন্য রকম হয়ে যায়।

বেদান্ত মতে আত্মা সেই এক, আত্মার কখন কোন কিছু হয় না। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে পূণ্যাত্মা, পাপাত্মা, ধর্মাত্মা এই শব্দগুলো কোথা থেকে আসছে? আত্মা তো অনেক রকমের হয়ে যাচ্ছেন। হিন্দু শাস্ত্রে আত্মা শব্দ কখনই একটা অর্থে আসে না। আত্মার অর্থ কখন শরীর, আত্মা মানে কখন মন, আত্মা মানে কখন বুদ্ধি, আত্মা মানে জীবাত্মা আবার আত্মা মানে শুদ্ধ আত্মা। আমি আত্মাকে কোন অর্থে নিচ্ছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। আচার্য শঙ্করও আত্মা শব্দকে কোথাও বুদ্ধি অর্থে নিচ্ছেন, কোথাও মন, কোথাও দেহ অর্থে নিচ্ছেন। যখন পূণ্যাত্মা, পাপাত্মা বলছে তখন বুদ্ধির অর্থেই বলা হয়। সমস্যা হল শাস্ত্র যখন পাপাত্মা, শুদ্ধাত্মা বা পূণ্যাত্মাকে বুদ্ধির অর্থে বলছেন, আমরা শাস্ত্রের অর্থকে তখন জীবাত্মা রূপে নিচ্ছি। আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, সবারই মনে আত্মার ব্যাপারে অবধারণা আছে। মানুষ নিজের সন্তানকে নিজের আত্মা মনে করে, মানুষ নিজের দেহকে নিজের আত্মা বলে মনে করে আবার লোকে নিজের বুদ্ধিকে নিজের আত্মা মনে করে। সেখানে আচার্য এক তুড়িতেই যুক্তি দিয়ে সব উড়িয়ে দিচ্ছেন। এরপর আসছে জীবাত্মা, আমাদের ভেতরে যিনি আত্মা আছেন তাঁকে নিয়ে এবার তর্ক শুরু হয়ে যায়। নৈয়ায়িকরা ধর্ম অধর্ম মানেন। তাঁরাও বেদকে ব্যাখ্যা করেন, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পূণ্য এগুলো আত্মার স্বাভাবিক গুণ। আত্মার শুদ্ধিকরণ করা মানে এগুলোকে বার করে দেওয়া। আমরা যত শাস্ত্র পড়ছি সবই গীতা প্রেসের, গীতা প্রেস মোটামুটি আচার্য শঙ্করকে অনুসরণ করে চলে আর পড়ছি স্বামীজীর রচনাবলী, স্বামীজীও ঘোর বেদান্তী। ফলে আমরা কয়েকটা জিনিষকে ধারণা করে নিয়েছি, আত্মার পাপ নেই, পূণ্য নেই, জীবন নেই, মৃত্যু নেই। আমরা কিন্তু ভুলে যাচ্ছি জিনিষটা তা নয়। ঠিক ঠিক বেদান্তী বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা ভারতে খুবই কম। বিশ্বে তো কিছুই নেই। বাকিদের কাছে আত্মার ধারণা অন্য রকম। আর তাদের ধারণা ভুল নয়, পুরো যুক্তির উপর তারা তাদের আত্মার ধারণাকে দাঁড় করিয়েছে। আচার্য শঙ্কর তাদের সবারই মতকে যুক্ত দিয়ে কেটে

শেষ করে দিয়েছেন। যুক্তিতে কেটে শেষ করে দিলেই মিটে যায় না। মানুষ সহজে এই ধারণাগুলিকে ধরতে পারে বলেই, এই ধারণার অনুগামীরা এখনও পুরোদমে টিকে আছে।

ঘোর বেদান্তীর দৃষ্টিতে আত্মা মানে বুদ্ধি। তাহলে পাপাত্মা হবে, পূণ্যাত্মাও হবে। নৈয়ায়িক ও বৈশাষিক দর্শন ষড়দর্শনের খুব নামকরা দর্শন, এক সময় এদেরও খুব প্রাধান্য ছিল। তাদের মতে পাপ, পূণ্য, ধর্ম, অধর্ম এগুলো আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম, আমাদের কাজ হল এই অশুদ্ধিকে দূর করা, এগুলোকে পরিষ্কার করাটাই সাধনা। এই মতটাই ধীরে ধীরে জৈন ধর্মে ঢুকে গেছে। পূণ্যাত্মা পাপাত্মা, এটাই জৈন ধর্মের মত। সাধনার উদ্দেশ্য হল আত্মার মধ্যে যে অশুদ্ধি ঢুকেছে ভালো কাজ করে অশুদ্ধিকে বার করা। বেদান্ত মতে আত্মার মধ্যে কোন অশুদ্ধি আসে না। একটা মন্ত্রের পরেই বলবেন আত্মার মধ্যে কোন দোষ আসে না। তাহলে আমরা কেন পাপাত্মা, পূণ্যাত্মা বলি? এই কারণেই বলি যে, বেদান্তের দৃষ্টিতে আত্মার একটা অর্থ বুদ্ধি। অদ্বৈত বেদান্ত ছাড়া বাকি সব দর্শন কিন্তু পুরোদমে মানছে যে, অশুদ্ধতা আত্মার। অর্থাৎ জহুদিদের দর্শন, খ্রীষ্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম আর আমাদের ছটি দর্শনের পাঁচটি দর্শন এই জিনিষটাই মানছে। আচার্য শঙ্কর আর স্বামীজীকে ছেড়ে সবাই মানছে আত্মা অশুদ্ধ। জগতে আমরা এসেছি শুদ্ধ রাখতে বা শুদ্ধ করতে। তবে যোগদর্শন এটাকে বৃত্তিতে নিয়ে চলে যায়। যোগের উপর বেদান্তের প্রভাব থাকাতে তাঁরা আত্মাকে সেভাবে অশুদ্ধ মনে করে না। আবার পরিষ্কার ভাবে বেদান্তের মতকেও যোগদর্শন পুরোপুরি নেয় না। ন্যায়, বৈশাষিক আর ভারতবর্ষের প্রায় নিরানব্বুই শতাংশ কর্মের প্রভাবে আত্মার বন্ধনকে মানছে। আত্মার যদি বন্ধন না হয়ে যায়, আত্মা যদি পূণ্যাত্মা পাপাত্মা না হয় তাহলে সে স্বর্গ নরক যাবে কেন! এরাও বেদ উপনিষদকে মানছে, কিন্তু মনে করছে আত্মাও অশুদ্ধ হয়ে যায়, নিজেকে শুদ্ধ করতে পারলে আবার সে ঈশ্বরের কাছে ফেরত যেতে পারবে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁর যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন বেদ বা উপনিষদের এই মত নয়। আর যাঁদের নির্বিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁরাও বলছেন শাস্ত্রের এই মত নয়। কিন্তু তাদেরও আবার পাল্টা যুক্তি আছে। আচার্য শঙ্করের ছশ বছর পর মাধ্বাচার্য তাঁর ভাষ্য লিখেছেন, আর তিনিও বিরাট বড় পণ্ডিত। আচার্য শঙ্করের মত কি তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না? কিন্তু তিনিও বলছেন আচার্য শঙ্কর যা বলছেন সব ভুল বলছেন। মূল আত্মাকে তিনি শুদ্ধ মানছেন ঠিকই কিন্তু কোথাও আত্মার মধ্যে অশুদ্ধির ভাব নিয়ে আসছেন। বেদান্তের দৃষ্টিতে কখন দুষ্টাত্মা হয় না, বেদান্তের দৃষ্টিতে দুষ্ট বুদ্ধি হবে, কিন্তু যেহেতু বুদ্ধির আরেক নাম আত্মা সেইজন্য দুষ্টাত্মাও হবে। আমরা অনেক সময় বলি, আত্মাকে কষ্ট দেবেন না, এখানে আত্মা বলতে শরীরকে বোঝান হচ্ছে। অনেক জায়গায় শরীরকে তাই দেহাত্মাও বলে, সেখানে আত্মাকে দেহের অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। একই জিনিষ আবার পরের মন্ত্রে অন্য উপমার সাহায্যে বলছেন –

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।।২/২/১০।।

(যেমন একই বায়ু পৃথিবীতে প্রাণরূপে প্রবেশ করে বিভিন্ন দেহ অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, ঠিক তেমন অদ্বিতীয় সর্বান্তরবর্তী আত্মাও জীবদেহে জীবদেহসমূহের সদৃশ হয়েছেন, অথচ তদতিরিক্ত স্বীয় অবিকৃতস্বরূপে বর্তমান রয়েছেন।)

আগের মন্ত্রে অগ্নির উপমা দিয়ে বলার পরে মনে হতে পারে আমাদের কাছে পুরো জিনিষটা হয়ত পরিষ্কার না হতে পারে, তাই এবার বায়ুকে নিয়ে বলছেন। বায়ু সর্বত্র বিচরণ করছে কিন্তু বিভিন্ন পদার্থে গিয়ে তার মত আকার ধারণ করে নিচ্ছে। এই পাখাতে এক রকম বায়ু, অন্য পাখাতে আরেক রকম বায়ু তৈরী হচ্ছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছি সেখানে আরেক রকম, একটা পাত্রে বায়ু পরিপূর্ণ হয়ে আছে সেখানে আরেক রকম। অথচ বায়ু ভেতরেও আছে বাইরেও আছে। আমাদের ভেতরেও বাতাস বাইরেও বাতাস। আমার ফুসফুসে যে বাতাস, তোমার ফুসফুসে সেই বাতাস আলাদা ভাবে আছে। অথচ বাইরে ভেতরে বাতাস রূপে এক। ভেতরে যেটা আছে সেটা বাইরেও আছে। সেইজন্য আমাদের মধ্যে দ্বৈতভাব, সব সময় দুই দেখছি, এই দেখাটা আপাত, দেখাচ্ছে দুই কিন্তু বাস্তবিক দুই নয়, বায়ু সেই এক। আমি যে নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়লাম, আমার ছাড়া বায়ুই অন্যের নাসিকা দিয়ে তার ভেতরে যাবে, তার থেকে বেরিয়ে অন্যের নাকে যাবে, বায়ু সেই এক।

আমরা এর মধ্যে মলিক্যুলস ইত্যাদি পঞ্চাশ রকমের উপাদানে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু এখানে বায়ু মানে বায়ুর সমষ্টি রূপকে বলছেন। সমষ্টি বায়ু কখনই আলাদা হয় না। ঠিক সেই রকম আত্মা এক। পাঁচটি পাত্রে সমুদ্রের জল ভরে সমুদ্রের ভেতরেই রেখে দেওয়া হল। আমরা পাঁচটি পাত্রের জলকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখছি। ভুল কিছু দেখছি না। তারপর একটা পাত্র উল্টে গিয়ে সব জল মিশে গেল, আবার পাত্রটা সোজা হয়ে গেল আবার জলে ভরে গেল। একবার এই পাত্র উল্ট গেল, আরেকবার আরেকটা পাত্র উল্টে গেল। পাত্রের মধ্যে জল ঢুকছে বেরোচ্ছে সবটাই সেই সমুদ্রেরই জল। এই জিনিষটাই এখানে বলতে চাইছেন।

বায়ু, জল এগুলোকে নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের কোথাও একটা ধারণা হয় যে, আত্মা যেন প্রবেশ করছেন, মানুষের ভেতরে আত্মা প্রবেশ করলেন, মানুষ যা ভালো মন্দ করে সব আত্মাই করান, কারণ তিনিই চৈতন্য। সেইজন্য পাপ-পূণ্য যা কিছু তাঁরই হয়, খুব সাধারণ বুদ্ধিতে তাই মনে হবে। এখান থেকেই পাপাত্মা, পূণ্যাত্মার ধারণার জন্ম। যিনি চালনা করছেন দোষ, ত্রুটি তাঁরই হওয়ার কথা। গাড়ি কাউকে চাপা দিলে পুলিশ ড্রাইভারকেই ধরে। পাব্লিক গাড়ি ভেঙে দিতে পারে কিন্তু পুলিশ গাড়ির ড্রাইভারকে ধরে নিয়ে চলে যাবে। আমাকে চালাচ্ছে আমার আত্মা, আমি ভালোমন্দ যা কিছু করছি তার দায় আত্মার। এখানেও বলছেন আত্মা বহু নয়, তিনি এক, তাই তিনি পরমাত্মা, সুতরাং সব দোষ পরমাত্মার। ঠাকুর খুব মজার কাহিনী বলছেন, এক ব্রাহ্মণ খুব সুন্দর বাগান করেছে। একটা গরু বাগানে ঢুকে বাগানের গাছ খেয়ে নিচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণ লাঠি দিয়ে এমন বেকায়দায় মারল যে গরুটাই মরে গেল। ব্রাহ্মণের গোহত্যার পাপ লেগেছে। গোহত্যার জন্য ব্রাহ্মণকে ধরতে এসেছে। ব্রাহ্মণ খুব বুদ্ধিমান 'ভাই! গরু আমি মারিনি, আমার হাত মেরেছে, হাতের দেবতা ইন্দ্র, সেইজন্য গোহত্যার পাপ ইন্দ্রের লাগবে'। ইন্দ্রকে এবার ধরতে এসেছে। ইন্দ্র শুনে বলল বেশ ভালো কথা। ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সেই বাগানে এসে ঘুরছে। বাগানের মালিককে দেখে বলছে, হে ব্রাহ্মণ! বাগানটা খুব সুন্দর, এই বাগান কার? ব্রাহ্মণ বলছে, আমারই বাগান। এই গাছগুলো কে লাগিয়েছে, আমিই লাগিয়েছি। এই ফুলগুলো কি সুন্দর দেখতে, গাছের পরিচর্যা কে করে? আমিই পরিচর্যা করি। ইন্দ্র এবার নিজের রূপ ধারণ করে নিয়েছে, বাগান করার সময় তুমি, গাছ লাগাবার সময় তুমি, পরিচর্যা করার সময় তুমি আর গোহত্যার পাপ নেওয়ার সময় ইন্দ্র! সঙ্গে সঙ্গে গোহত্যার পাপ ব্রাহ্মণকে খপ্ করে ধরে নিয়েছে।

ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটিও নড়ে না। প্রত্যেক কথায় ঠাকুর বলছেন মায়ের ইচ্ছা। এই কথা কার জন্য ঠাকুর বলছেন? যিনি দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই। শ্রীমাও নিন্দা করে বলছেন, সব গোলমাল নিজে করে, কিন্তু দোষ চাপায় অদৃষ্টের উপর। কিন্তু ভালো কিছু হলে সবটাই নিজের কৃতিত্ব মনে করছে। যদি ছাড়তে হয় দুটোই তাঁর উপর ছাড়। এতদিন আমার যত গোলমাল সব ভগবানকে দিচ্ছিলাম, এবার থেকে ভালোটাও দিতে শুরু করলাম। এরপর একজন এসে আমাকে বলছে 'আপনার গান কী সুন্দর! কি করে করেন'? তাকে বলছি সব ঠাকুরের কৃপায়। আমি কিছু গোলমাল করেছি, সে এসে বলছে 'আপনার এই গোলমালটা কেন হল'? ঠাকুরের কৃপা। তাহলে ঠাকুর এখন এই ভালো করছেন আবার পর মুহুর্তেই মন্দ করছেন। যিনি চৈতন্য স্বরূপ তিনি ঠিক করতে পারছেন না, তিনি ভালো করবেন নাকি মন্দ করবেন। যে ভগবান সংশায়াচ্ছন্ন, সেই ভগবান কিসের ভগবান, এই ভগবানকে নিয়ে আমরা কি করব!

এক গ্রামে একজন মাত্র ডাক্তার, তাও আবার হোমিওপ্যাথিক। একজনের ছেলের খুব জ্বর হয়েছে। দশ কিলোমিটার হেটে বৃষ্টির রাত্রে কোন রকমে ডাক্তারের কাছে পৌঁছেছে। ডাক্তারকে বলছে, আমার ছেলের খুব জ্বর, জ্বর কিছুতেই নামছে না, আপনি বাঁচান। ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিল 'পচা! একে সাত নম্বর ওষুধটা দিয়ে দে'। সাত নম্বর ওষুধ নিয়ে চলে গেছে। ভোর রাত্রে লোকটি আবার কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তারের কাছে এসে বলছে 'ডাক্তারবাবু! আমার ছেলেকে আর বাঁচাতে পারলাম না'। 'কেন কি হয়েছে'? 'এতক্ষণ তো জ্বরের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এখন খালি বাথরুমে দৌড়ে যাচ্ছে আর কিছু না করেই দৌড়ে বাথরুম থেকে ফেরত চলে আসছে'। ডাক্তারবাবুর কিছু সন্দেহ হয়েছে। আবার গলা খাঁকিয়ে হাঁক দিয়েছে 'পচা! কি ওষুধ দিয়েছিস'? 'সাত নম্বর ছিল না, তাই তিন নম্বর আর চার নম্বর মিলিয়ে দিয়েছি'। তিন নম্বর ওষুধে বাথরুম পায় আর চার নম্বর ওষুধে বাথরুম বন্ধ করে। ছেলেটির একবার করে বেগ আসছে, দৌড়ে যেতে যেতেই বেগ চলে যাচ্ছে বলে আবার ফেরত চলে আসছে। সারারাত এখন বাথরুমে দৌড়ে যাচ্ছে আর দৌড়ে ফেরত আসছে। ভগবান যেন এই তিন নম্বর চার নম্বর ওষুধের মত। এই আমাদের একবার ভালো করছেন আর

তারপরেই মন্দ করছেন। আমাদের নিয়ে ভগবান কি করবেন বেচারী ঠিকই করতে পারছেন না। এই আমার মেয়ের পাত্র জোগাড় করে দিলেন, বিয়ে হয়ে গেল, এই আবার জামাই বেচারাকে মেরে দিলেন। একটা তো ঠিক করবেন, না হয় মেয়েটার বিয়েই দিতেন না। ভগবান দেখলেন মেরে ফেলাটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আরেকজনের মেয়ের বিয়ে হল 'ঠাকুরের কি কৃপা! ধুমধাম করে আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল'। দুদিন বাদেই ডিভোর্স হয়ে গেল। ঠাকুর তিন নম্বর আর চার নম্বর ওষুধের মত, ঠিকই করতে পারছেন না, কী করবেন! ভালো করবেন, না মন্দ করবেন।

উপনিষদ এই জিনিষটাকে আটকাচ্ছেন। মানুষ প্রথমে শুধু মন্দগুলোই ঠাকুরকে দেয়, যারা নিজেকে খুব চালাক দেখায় তারা ভালো হলে মুখে বলে সব ঠাকুরের কৃপা। আর যারা ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেছে, তারা ভালো আর মন্দ দুটোই ভগবানকে দিতে শুরু করেন। কিন্তু তাতে ঠাকুর তিন নম্বর চার নম্বর ওষুধের মত হয়ে যান। এবার উপনিষদ পরের মন্ত্রে এটাকে আটকাচ্ছেন। বলছেন, ঠাকুর তোমার ভালোতেও নেই, ঠাকুর তোমার মন্দতেও নেই। কি বলছেন?

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।।২/২/১১।।

(সূর্য যেমন জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হয়েও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি দর্শনাদি রূপ বাহ্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, তেমনি নিখিল জীবের আত্মা এক হয়েও জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না, কেন না তিনি তদতীত।)

সূর্য যেন সমস্ত জগতের চোখ। বস্তুর যদি কোন দোষ থাকে তাতে সূর্যের যেমন কোন কিছুই আসে যায় না, ঠিক সেই রকম মানুষ যা কিছু কর্ম করে, তা দোষযুক্তই হোক আর দোষমুক্তই হোক তার সাথে সবার ভেতরে যিনি অন্তরাত্মা, তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। মনুষ্যকৃত অশুদ্ধ কর্ম তাঁকে কোন ভাবেই স্পর্শ করতে পারে না। এই জিনিষটাকে বোঝাবার জন্য এনারা দুটো উপমা প্রায়ই ব্যবহার করেন। তোমার চোখের ক্রটির জন্য তুমি আকাশে একটার জায়গায় দুটো চাঁদ দেখছ। তাতে চাঁদের কিছুই এসে যায় না। সেতো তোমার চোখের দোষ। ঠিক তেমনি চোখ যদি কোন বাজে দৃশ্য দেখে থাকে তাতে চোখের কোন দোষ হয় না। চোখের সামনে ভালো-মন্দ যা দৃশ্যই ঘটুক চোখ সব সময় নির্লিপ্ত। ঠিক তেমনি আমার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন সংসারে যাবতীয় যা কিছু করে বেড়াচ্ছে তাতে আমার অন্তরাত্মার কিছুই আসে যায় না, তিনি নির্লিপ্ত। সেই রকম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু হয়ে যাক, ভালো মন্দ যাই হোক না কেন, কোন কিছুতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মা, সেই ভগবানের লিপ্ততা নেই। কথামৃতেই বর্ণনা আছে, চেঙ্গিস খাঁ নির্বিচারে কত নিরীহ লোককে নির্বিচারে মেরেছে ঈশ্বর কিছু করতে পারলেন না। ইতিহাসে এই ধরণের প্রচুর ঘটনা আছে, হিটলারও কত লোককে মেরেছে। ভগবান তখন কি করলেন? ভগবানকে যখন আমরা একেশ্বরবাদীর ভগবান রূপে মনে করছি, ভগবান আকাশে কোথাও বসে আছেন আর তিনি মানুষের মঙ্গল চাইছেন। মানুষের মঙ্গল চাওয়া মানে, জীবনের মঙ্গলের ব্যাপারে আমরা নিজস্ব একটা সংজ্ঞা তৈরী করে রেখেছি, যেমন মানুষ একশ বছর বাঁচবে, তার দুটো ছেলে দুটো মেয়ে হবে, তারা বড় হয়ে ভালো চাকরি করবে, তাদের আবার বিয়ে হয়ে সন্তানাদি হবে, সবাই সুস্থ থাকবে, কোন কিছুর অভাব হবে না, এইভাবে একশ বছর বেঁচে থেকে মারা যাবে। এটাই আমাদের আদর্শ জীবনের মাপকাঠি। এর থেকে একটু চুন খসে পড়লে আমরা হা হুতাশ করি, হে ঠাকুর! আমার একি হয়ে গেল! মন্ত্রে এটাই বলছেন, যা গোলমালই হোক, সে তুমিই গোলমাল কর বা তোমার উপর গোলমাল হয়ে থাকুক তাতে আত্মার কোন কিছু আসে যায় না, আত্মা সব সময় নির্লিপ্ত। ঠাকুর প্রদীপের আলোর উপমা দিচ্ছেন। দীপের আলোতে একজন ভাগবত পড়ছে আরেকজন নোট জাল করছে, তাতে দীপের আলোর কিছুই আসে যায় না, সে নির্লিপ্ত। কেউ কি কোথাও দেখেছে বা শুনেছে যে পুলিশ এসে প্রদীপকে ধরে নিয়ে গেছে? প্রদীপ সব সময় নির্বিকার, ঠিক তেমনি সূর্য নির্বিকার, ঠিক তেমনি আমাদের অন্তর্যামী আত্মাও নির্বিকার, ঠিক তেমনি ভগবানও নির্বিকার।

বেলুড় মঠের সাধুদের পরম্পরাতে বলা হয় কঠোপনিষদ পড়ার পর যদি জ্ঞান লাভ না হয় তাহলে কঠোপনিষদ পড়া বৃথা। ঠাকুর যেমন গীতাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন গীতা হল মোক্ষ শাস্ত্র, ঠিক তেমনি এই

ধরণের মন্ত্রগুলির জন্য কঠোপনিষদ সম্পূর্ণ মোক্ষ শাস্ত্র। বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রথম আচার্য যিনি ছিলেন তিনি কঠোপনিষদকে বলতেন আত্মারামের কৌটা। ঠাকুরের যে সার, সেই সারটুকু নিয়ে কঠোপনিষদ। উপনিষদের যে কোন দু-চারটে মন্ত্রকে নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করলেই আমাদের মন, প্রাণ, জীবন অন্য ধরণের হয়ে যাবে। গীতাতে অনেকগুলো দর্শনকে সমন্বয় করা হয়েছে, ফলে এতটা ঘনীভূত নয়। কঠোপনিষদ পুরোটাই প্রচণ্ড ঘনীভূত। এতটা ঘনীভূত কোন শাস্ত্রই সচরাচর হয় না।

সন্ত্রাসবাদীরা ধর্মের নামে বিধর্মীদের বোমা মারছে। শুধু যে বিধর্মীদের মারছে তাই না, যে সুফি অনলহক্ বলছে, মানে আমিই সেই আল্লা বলছে, আমাদের ভাষায় অহং ব্রহ্মাস্মি, তারও গলা কেটে দিচ্ছে, নিজেকে আল্লা বলা ইসলামে জঘন্যতম পাপ। উপনিষদ যে *বায়ুর্যৈথকো ভুবনং প্রবিষ্টো* বলছেন, এখানে তাহলে কে কাকে বোমা মারছে বা কে কার গলা কাটছে? আধ্যাত্মিক জিনিষগুলোকে ধারণা করা এতই কঠিন যে আমরা যতই শুনে নিই না কেন, ঈশ্বরের অবধারণা আমাদের সব সময় শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্ক থেকেই আসে। শাস্ত্র আগাগোড়া বলে যাচ্ছে সচ্চিদানন্দই আছেন, মায়ার আবরণের ভেতর দিয়ে যখন সচ্চিদানন্দকে দেখছি তখন তাঁকেই ঈশ্বর রূপে, অবতার রূপে দেখায়। অনেকেই তা মানতে চাইবে না, কারণ তাহলে শ্রীকৃষ্ণ বা ঠাকুরও মায়া। আসলে এদের যতই মায়ার ব্যাপারে বোঝানর চেষ্টা কর হোক, কিছুতেই বোঝান যাবে না।

একটা কথা আমরা বহুবার বহু বক্তৃতায় শুনেছি আর এখনও শুনছি, প্রবন্ধে পড়ছি, বইয়ে পড়ছি। কথাটি হল, শ্রীমা বলছেন, আমি শরতেরও মা আবার আমজাদেরও মা। বক্তারা বলতে গিয়ে আপ্লুত হয়ে যান, শ্রোতারা বিগলিত হয়ে যান, আহা! মায়ের কি করুণা! এখানেই একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে হয় আমরা কি ধারণা নিয়ে চলছি। প্রথমত ভগবান বলতে একজন ব্যক্তি ঈশ্বর শ্রীমা এসে গেলেন। ব্যক্তি আমজাদ এসে গেল, আর মায়ের কৃপা আমজাদের উপর। এটাই আমাদের সবার ধারণা, একজন ঈশ্বর আছেন, মানুষ আছে আর তিনি কৃপা করেন, এই তিনটে জিনিষের বাইরে কোন মানুষই যেতে পারবে না।

শ্রীমা বলছেন, যদি শান্তি পেতে চাও মা, কারুর দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের, জগতে কেউই পর নয়, সব আপনার। এটাই মূল কথা জগতে কেউ পর নয়। কিন্তু বেদান্তের শেষ কথা হল জগতে পর বলে কিছু নেইই। সন্ন্যাসী কেন বিয়ে করবে না? কারণ তাঁর যে আদর্শ সেখানে পর বলে কেউ নেই। বিবাহ করা মানেই আমি অন্য কাউকে গ্রহণ করছি। তোমাকে আমি গ্রহণ করছি, তুমি পর। সেইজন্য ঠাকুরের কথা, শ্রীমায়ের কথা এগুলো কোন উপদেশ নয়, এগুলো হল সেই আধ্যাত্মিক সত্য যাকে আধার করে একটা সিদ্ধান্ত বেরুচ্ছে। যে কোন ধর্মের লোককে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, ভাই তুমি এই রকম কেন কর না? বৌদ্ধদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি হিংসা কেন কর না? তারা বলবে, আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে। কোন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি অমুক পশুর মাংস খাও না কেন? আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ, তাই খাই না। তোমার শাস্ত্র ঠিক বলছে কিনা তুমি কি করে জানলে? এই প্রশ্ন আর করা যাবে না।

এই ধর্ম প্রথম শুরু হয় দুটি জায়গায়, একদিকে শুরু হয় জুহুদিদের আর অন্য দিকে জরাথ্রুষ্টদের ধর্ম অর্থাৎ পার্সিদের ধর্ম। এনারা সবাইকে বললেন এটা ঈশ্বরের আদেশ, তোমাকে এই রকমটি করতে হবে। এটাই পরে কোরানে খুব তীব্র আকারে এসে গেল। মহম্মদ বলছেন, আল্লা তাঁকে আদেশ করছেন তুমি এ রকমটি করবে বা এ রকমটি কর। ঠিক একই ব্যাপার হয়েছে যেখানে মোজেসকে ভগবান আদেশ দিচ্ছেন তুমি এই এই কর। মোজেস জেহোবার মানে ঈশ্বরের ধ্যান করছিলেন। ধ্যান করতে গিয়ে দেখছেন একটা ঝোপে আগুন লেগে গেছে। কিন্তু ঐ আগুনের কোন তাপ নেই, ওর নাম হল Burning Bush। কঠোপনিষদে যেমন বলছেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ,* হৃদয়ের মধ্যে দেখছেন অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতি। ঐ জ্যোতিকেই মোজেস দেখছেন বাইরে। কিন্তু মোজেসের কোন সম্প্রদায় ছিল না। কিন্তু সমাধির অবস্থায় দেখছেন Burning Bush, সেখান থেকে একটা গম্ভীর আওয়াজ আসছে – মোজেস! তোমার লোকেদের বল তারা যেন এই এই করে। মোজেস জিজ্ঞেস করছেন, ওরা আমাকে কেন মানবে? তখন ভগবান আরও অনেক কিছু বললেন। এটাই জুহুদিদের কাহিনী।

মহম্মদের জীবনেও একই কাহিনী। মহম্মদ হীরা পর্বতে ধ্যান করছেন আর তাঁকে একজন ঘোড়ায় করে আল্লার কাছে নিয়ে গেল। আল্লা বললেন, মহম্মদ! তুমি এই রকমটি কর। এইভাবে আল্লা মহম্মদকে এক

এক করে প্রচুর কথা বলে দিলেন। এখন এর মধ্যে কোনটা আল্লার কথা আর কোন কথা মহম্মদের আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। ঠাকুর যত কথা বলছেন সবই যে মা কালী তাঁর মুখ দিয়ে বলছেন তা তো হতে পারে না। ঠাকুর যখন বলছেন আমি জল খাব, তখন এই কথা মা কালী নিশ্চয় তাঁর মুখ দিয়ে বলছেন না। যিশুকে যখন ক্রুশিফাই করা হচ্ছে তখন এক জায়গায় তিনি বলছেন আমি তৃষ্ণার্ত, এটাও ফাদারের কথা নয়। যখনই আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, বিশেষ করে যাঁরা একটা জাতিকে তৈরী করেন, তখন বোঝা খুব মুশকিল এটা তাঁর নিজের কথা, নাকি ভগবানের কথা। ভগবান কি কথা কন? অবশ্যই কথা বলেন, ঠাকুর তো কথায় কথায় মা কালীর মন্দিরে ছুটে যাচ্ছেন, মা তাঁকে বলছেন, তুই ভাবমুখে থাক। ভাবমুখ মানে আধ্যাত্মিক জগৎ আর পার্থিব জগৎকে যে জায়গায় বিভাজিত করছে সেই জায়গাতে অবস্থিত থাকা। নরেনকে নিয়ে মা কালীর কাছে যাচ্ছেন, মা বলছেন, নরেন কালী মানবে। বিদেশীরা, এমন কি আমাদের দেশের যারা পাশ্চাত্য ধর্মকেই ধর্ম বলে মানে, তারা বলবে ঠাকুর মনের ভুলে সব বলছেন। হ্যাঁ মনের ভুলেই বলছেন মানছি। কিন্তু তাহলে তোমার ধর্মশাস্ত্রেও তো একই ভাবে বলা হয়েছে, তাহলে তাঁরাও মনের ভুলে সব বলেছেন। এইসব ক্ষেত্রে সত্যিই খুব সমস্যা, কোনটা মহম্মদের কথা বা মোজেসের কথা আর কোনটা আল্লা বা জেহোবার কথা বোঝা খুবই মুশকিল। যেদিন Rationalismএর জন্ম হল সেদিন থেকে সত্যিই এই সমস্যা তীব্র ভাবে আসতে শুরু হয়ে গেল। মোজেসের কথা আমি কেন নেব? আদপেই ভগবান একটাও কথা মোজেসের মুখ দিয়ে বলেছেন কিনা আমরা জানি না। দ্বিতীয়, যদি বলে থাকেন, তাহলে কোনটা মোজেসের কথা আর কোনটা ভগবানের কথা আমরা কি করে জানব?

মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলার সময়েও ঠিক এই সমস্যাগুলো আসতে শুরু করে। আমি চুরি করব না কেন, আমি মিথ্যা কথা বলব না কেন? বলবে আল্লা বলেছেন বা মোজেস বলেছেন। যদি কেউ বলে আমি তোমার আল্লাকে মানি না। তখন কি হবে? পরের ধাপে যিশু মূল্যবোধকে পুরো অমূর্ত বানিয়ে দিচ্ছেন। যেমন বলছেন, Love your Father in Heaven। তোমরা তাঁকে ভালোবাসো। ভাববার কথায় স্বামীজী বলছেন, মন্দিরে এক ভক্ত এসে দেখছে সামনে তানপুরা রাখা আছে, তানপুরা দেখেই ঐ সকালবেলায় বেসুরো গলায় ভজন করতে শুরু করেছে। মন্দিরের চৌবেজী ভাঙ খেয়ে আরাম করে শেষ ঘুমটা দিচ্ছেন, আর বেসুরো গলায় উৎকট ভজন গানে তার ঘুমের ধফা রফা। চৌবেজী বলছে 'সকালবেলা তুই এভাবে চেঁচাচ্ছিস কেন'? ভক্তটি বলছে 'আমি ভগবানের মন ভজাচ্ছি'। চৌবেজী রেগে গিয়ে বলছে 'ওরে আহাম্মক! তুই আমারই মন ভজাতে পারছিস না, আর বলছিস ভগবানের মন ভজাবি'! যিশু যখন ethics দিচ্ছেন তখন তিনি ঠিক এই পয়েন্ট থেকে তার ব্যাখ্যা করছেন, বলছেন ঈশ্বরকে ভালোবাসো। ঈশ্বরকে যে তুমি ভালোবাসবে, কিন্তু তার আগে তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদের ভালোবাসতে হবে। তার সাথে বলছেন, আগেকার বিধান ছিল, যে তোমার এক চোখ নেবে তুমিও তার এক চোখ নেবে, কিন্তু আমি বলছি তোমাকে এক গালে চড় মারলে তুমি অন্য গাল বাড়িয়ে দেবে। কেন দেব? তুমি বলছ আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি কিন্তু পাড়াপড়শিদের ভালোবাসছ না। Ethicsকে যিশু পুরো নতুন পরিভাষা দিচ্ছেন। যদি খুব বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যিশু বলছেন তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাস, কিন্তু ঈশ্বরের কোন পরিভাষা নেই, শুধু বলছেন God in Heaven লোকেরা এটাই বুঝত যে ভগবান স্বর্গে আছেন। তুমি তাকে ভালোবাস, কিন্তু তার জন্য তোমাকে কিছু জিনিষ করতে হবে। সাধারণ লোকেদের কাছে সেটাই ethics হয়ে গেল।

এটারই একটা শেষ ধাপ, যেমন মোজেস দেখলেন Burning Bush, বা আরও যত দর্শন হচ্ছিল, সেখানে থেকে ঈশ্বরের উপর তাঁরা সেই বিশ্বাসটা এসেছিল। কিছু কিছু মরমীয়া সাধকরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করছেন নিজের ভেতরে, কিন্তু মোজেস বলছে, I saw God in Burning Bush। তারপর মোজেস আবার মাউন্ট সিনাই নামে একটা জায়গায় ছিলেন সেখানে ভগবান ধুয়োর মত হয়ে দেখা দিলেন। উপরের দিকে ওঠার সময় সেটাই একটা মেঘের মত হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে মোজেস দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু অন্যরা দেখতেও পাচ্ছে না, বুঝতেও পারছে না। যেমন ঠাকুর দেখলেন একটা বেড়াল আসছে, তিনি বললেন এর মুখ দিয়ে হয়ত মা কিছু বলবেন, বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আধ্যাত্মিক জগতের এই জিনিষগুলিকে যদি বুঝতে হয় তাহলে ঠাকুরকে দিয়ে বোঝা যায়, তা নাহলে কোন দিন বোঝা যাবে না। মোজেস যে বাইরে দেখছেন, মহম্মদ যে বাইরে দেখছেন, এতে কোন দোষ নেই। দোষ হওয়ার কোন কারণও নেই, কারণ যিনি অনন্ত তিনি

ভেতরেও আছেন বাইরেও আছেন। এনারা বাইরে দেখেছেন, ভেতরে দেখেছিলেন কিনা বলছেন না। এই কারণেই বলছেন না, যাদের বলবেন তারা ছিল আদিবাসী, তারা এর কিছুই বুঝবে না। অথবা ভেতরে নাও দেখে থাকতে পারেন। কারণ ভগবানের ইচ্ছা, তিনি কাকে কিভাবে দর্শন দেবেন আমরা জানি না। কিন্তু কিছু কিছু ঋষিরা নিজের ভেতরে দেখছেন। তখন তাঁরা দেখেন, আরে তাই তো তিনিই তো আমার স্বরূপ, তিনিই তো সব কিছুর মূল। তখনও তিনি মোজেসের মতই বলবেন, ঈশ্বর আমাকে এই রকম বলেছেন। এরপর আরেকটা ধাপে গিয়ে দেখেন, যিনি আমার ভেতরে আছেন তিনিই সবার ভেতরে আছেন। তখন তিনি সুফিদের মত বলবেন অনলহক্। এটা বলবেন না যে আমি রামকৃষ্ণ। যখন বলছেন আমিই সেই আত্মা, তখন বলতে চাইছেন না যে আমি আত্মা। বলতে চাইছেন, এই শরীর, মনকেই এতদিন আমি মনে করে এসেছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমি বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু আমি তো শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পারি না, তাই তিনিই আছেন। কিন্তু আত্মজ্ঞানী দেখেন, আমার আমি বলতে যেটা, সেটাই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত ভাবে ছেয়ে আছেন, তিনি নির্গুণ নিরাকার। ঠাকুরের ক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যখন বলতে চাইছেন তখন তিনি দেখছেন আমি তো অতি সাধারণ লোক আমি কি করে সর্বশক্তিমান হব। তখন 'আমার ভেতরে যিনি আছেন', এই ভাষাটা ব্যবহার করছেন। কিন্তু আত্মজ্ঞানীর ভাষাটা পাল্টে যায়। তাঁরা বলেন, আমিই সেই। কে সেই? যিনি আছেন। এটাকেই বলছেন *তত্ত্বমসি* বা *অহং ব্রহ্মাস্মি*, এটাকেই সুফিরা বলছেন অনলহক্। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও আছে, যিশু বলছেন I and my Father in Heave one, তুমি যাঁকে ঈশ্বর বলছ আর আমি, আমরা দুজন এক। কিন্তু খ্রীষ্টানদের বেদের ঋষিদের মত পরম্পরা নেই, পরম্পরা নেই বলে ওরা এটাক পরিভাষিত করে দিল, ভগবান আছেন, ভগবান থাকলে তাঁর ছেলেও থাকবে, যিশু তাঁর পুত্র। ওদের বোঝানই যাবে না যে, অদ্বৈত বেদান্ত দিয়ে দেখলে যিশুই তাঁর একমাত্র সন্তান নন, তুমিও তাঁর সন্তান, তুমি মানবে না, বুঝবে না, কিন্তু যিশু বুঝেছেন তিনি তাঁর সন্তান, তিনি আর ঈশ্বর এক। এছাড়া আর কোন তফাৎ নেই।

যিশু বলছেন, তোমাদের জন্য স্বর্গদ্বার খোলা, তোমরা কি করছ! তোমরা মাটিতে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ, সবাই এসো স্বর্গের দরজা খোলা রয়েছে। আমাদের কি করতে হবে? কিছু করতে হবে না, শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাস। কিন্তু তুমি ঈশ্বরকে সহজে ভালোবাসতে পারবে না, তাঁকে ভালোবাসতে গেলে দশটা কাজ করতে হবে। তুমি যে মন্দিরে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছ তার আগে তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়াটা মিটিয়ে নাও। তুমি নিজের ভাইকে ভালোবাসতে পারছ না, ঈশ্বরকে কি করে ভালোবাসবে? এটা কোন practical বা ethical কথা নয়, এটাই ভক্তির উচ্ছ্বাস। একেবারে ঠিক এই একই জিনিষ হয় যখন সুফিরা বলছেন অনলহক্, আমি সেই আত্মা। আমি যদি সেই আত্মা হই তাহলে তোমার ভাই কে? আমার ভাইও সেই আত্মা। ভাইকে ঠকান মানে নিজেকে ঠকান, অপরের নিন্দা করা মানে নিজের নিন্দা করা, অপরকে বোকা বানানো মানে নিজেকেই বোকা বানাচ্ছি। উপনিষদের অনেক মন্ত্রে যে উক্তি করছেন, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক* বা বলছেন *ততো ন বিজিগুপ্সতে*। জগতের সমস্ত মানবিক নীতিবোধ, সমস্ত রকম মূল্যবোধের জন্ম একটি সত্য থেকে, আত্মাই আছেন। খ্রীষ্টান ধর্মে নীতিবোধ প্রবাহিত হয় যিশুর একটি অত্যন্ত সহজ কথা থেকে, ঈশ্বরকে ভালোবাস। ভগবান বুদ্ধের নীতিবোধ আরও মজার, তিনি ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন না, তিনি বলছেন, জগতে দুঃখ আছে মানছ তো? হ্যাঁ মানছি, দুঃখে আমরা মরছি। যার বিয়ে হচ্ছে না সেও কাঁদছে, যে বিয়ে করেছে সেও কাঁদছে। তুমি যদি মানো দুঃখ আছে তাহলে জেনে নাও দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ও আছে। তুমি যদি এভাবে সব কিছু দেখ তাহলে বুঝতে পারবে কেন তোমার দুঃখ এসেছে। কিভাবে এসেছে আর কিভাবে বেরনো যায়? ভগবান বুদ্ধ নিয়ে এলেন অষ্টাঙ্গমার্গ, পুরো অষ্টাঙ্গমার্গকে তিনি বলছেন ধর্ম। নীতিবোধ এই কারণে যে, তুমি মানছ তোমার দুঃখ আছে, তোমাকে দুঃখ থেকে বেরোতে হবে। নীতিবোধের এই তিনটে কারণ, প্রথম কারণ, ঈশ্বর আছেন তুমি তাঁকে ভালোবাসো, দ্বিতীয় আত্মাই আছেন কিন্তু ভগবান বুদ্ধ আরও ব্যবহারিকে নিয়ে এলেন, দুঃখ আছে তুমি মানছ তো, দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছ তো, তাহলে তুমি এই এই কর। এটাই হল logical outlook, logical outlook তিনটেতেই হয়। সেইজন্য এই তিনটে হল impersonal ethics, বাকি সব personalized ethics। আমাদের এটা কেন করতে হবে কারণ গীতা বলছে, এটা কেন করতে হবে কারণ কোরাণ বলছে। আসলে তা নয়, এই জন্যই করতে হবে কারণ আত্মাই আছেন, আমি তুমি হয়ে আছি। এটা কেন করতে হবে, কারণ আমি ঈশ্বরের সন্তান আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি।

ঈশ্বরের ভালোবাসা যদি আমি পেতে চাই তাহলে আগে আমার জগৎটা ঠিক করতে হবে। সেইজন্য নিউ টেস্টামেন্ট, যেখানে শুধু যিশুর কথা, একেবারে গভীর দর্শন। সেখানে তিনি কোন উপদেশ দিচ্ছেন না, শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাসার উপর জোর দিয়ে গেছেন। বেদান্ত একই কথা বলছেন, কিন্তু অন্য ভাবে নিয়ে গেছেন, আত্মাই আছেন, এই সত্যকে নিয়ে চলছেন। সুফিরা যখন বলছেন অনলহক্ তখন তাঁর গলা কেটে দিচ্ছে, তখনও তিনি বলে যাচ্ছেন, আরে ভাই আমার গলা কেটে দিলে কি হবে, আমি তো এই শরীর নই। অফিসের কর্তা রেগে গিয়ে আপনাকে বলছে 'তোমাকে আমি শেষ করে দেব, তুমি জান না আমি তোমাকে কি করতে পারি'! আপনি বললেন 'আমার কি করবেন আপনি'! 'তোমার জামাটা ছিড়ে ফেলব'। 'খুলে নিন, আমি আবার একটা জামা বানিয়ে নেব'। ঋষিদের কাছে শরীরটা সত্যিকারের ঠিক তাই। শরীর নিতে চাইছ! নিয়ে নাও, আমি তো সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। সত্যিকারের এই বোধই হয়। কিন্তু সমস্যা হল যতই বেদান্ত পড়ি আর যাই করি, শরীর আর মনের বাইরে আমরা কিছুতেই যেতে পারি না।

জহুদিদের ভগবান ন্যায়প্রিয় আর যিশুর ভগবান হলেন ভালোবাসার ভগবান। ইসলামে দুটোকে মিলিয়ে আর তার সাথে আরবিক চিন্তা ভাবনার সংমিশ্রণে ভগবানের ধারণার জন্ম নিয়েছে। হিন্দুদের ভগবান এই তিনটে ধর্ম থেকে পুরো আলাদা, তিনি আমাদের ব্যাপারে কখন নাক গলান না। হিন্দুরা সব কিছু কর্মফলের উপর ছেড়ে দেয়। আমরা কথায় কথায় বলি ঠিকই যে, তিনিই করাচ্ছেন, কিন্তু অল্প একটু ধর্মের ব্যাপার যাঁরা বোঝেন তাঁরাও মানেন যে, আমি যা কিছু পাই আমার কর্মফলের জন্যই পাই। খারাপ কর্ম করলে সেই কর্মের ফল আমাকেই ভুগতে হবে, ওখানে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তা সত্ত্বেও হিন্দু ধর্ম এমনই এক চিত্তাকর্ষক ধর্ম এইজন্য যে, দেশে বিদেশে যত ধর্ম আছে, সব ধর্মে ঈশ্বরের ব্যাপারে যত বিচিত্র ধারণা আছে সবটাই হিন্দু ধর্মে এসে মিলেমিশে রয়েছে। তাই বলা যাবে না যে, জহুদিদের মত, খ্রীষ্টান মত বা ইসলামের মত আমাদের মধ্যে নেই, সব মতই হিন্দু ধর্মে পাওয়া যাবে। মুসলমান ধর্ম বলছে আল্লা ছাড়া গতি নেই, বৈষ্ণবরাও বলছে কৃষ্ণ ছাড়া কভু গতি নাই। অন্যান্য ধর্মে যারা তাদের শাস্ত্রকে জানে তারা এই কথাগুলোই খুব জোরের সাথে বলে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রজ্ঞ বা জ্ঞানী পুরুষরা কখনই বলবেন না যে, কৃষ্ণ ছাড়া কোন গতি নাই। কিন্তু একেবারে সাধারণ স্তরের লোকেরা মনে করছে, খারাপ কিছু যখন হয় তখন ভগবান রেগেমেগে আমার খারাপ করছেন আর ভালো কিছু হলে, প্রমোশন হল, মাইনে বাড়ল ভগবানকে তখন একটা থ্যাঙ্কস জানাই, তুমি আমার এই ভালো করেছ। আবার ভগবানকে কিছু উপহারও দিতে যাই। এরও আবার একটা পশ্চাৎপট আছে।

জহুদিদের ভগবান খুব মজার, তাঁর যাঁরা ভক্ত, এ্যব্রাহাম, মোজেস বা ডেভিড আর পুরো ইজরায়েল জাতির সাথে তিনি চুক্তি করেন। কাল্পনিক কিছু নয়, সত্যিকারের তিনি এগ্রিমেন্ট করেন, যার ইংলিশ শব্দ হল covenant, কিন্তু কমন শব্দ হল agreement বা pact। যেমন ভগবান এ্যব্রাহামকে বলছেন, তুমি যদি বাকি দেবী-দেবতাদের ছেড়ে শুধু আমার পূজা কর তাহলে আমি তোমাদের একটা বিরাট দেশ বানিয়ে দেব। এ্যব্রাহাম এরপর বাকি সব দেবী-দেবতাদের পূজা করা বন্ধ করে দিলেন। তাতে বিরাট অশান্তি ছড়িয়ে গেল, শেষে এ্যব্রাহামকে দেশ ছাড়া হতে হল। আবার তিনি মোজেসকে বললেন, তুমি যদি এই রকমটি কর আমি তাহলে তোমার এই এই করব। এখানেই ভগবান থামলেন না, এরপর তিনি একবার বর্তমান যে ইজরায়েল রাষ্ট্র, তাদের সাথে তিনি pact করলেন, তোমরা যদি অন্য দেবতাদের পূজো না দাও, তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর তাহলে আমি তোমাদের একটা দেশ বানিয়ে দেব, তোমরা আমার বিশেষ লোক হবে ইত্যাদি। ওরাও তাই মেনে নিয়েছে। আজ পর্যন্ত ইজরায়েলের লোকেরা ঐ প্যাক্ট অনুসারেই নিজেদের জীবন চালাচ্ছে। সেইজন্য তারা নিজেদের বলে, আমরা হলাম chosen of God, ভগবানের আমরা বিশেষ। ওদের কাছে ভগবান প্যাক্ট। লিগাল ডকুমেন্টকে আইনসিদ্ধ করার জন্য যেমন দু পক্ষকে সই করতে হয়, এখানেও সই করতে হয়, সইটা হয় বলি দিয়ে। ওদের মধ্যে তাই বিভিন্ন বলির প্রথা আছে। এরপর ভগবানও ভাঙবেন না, মানুষও ভাঙবে না। সেই তিন হাজার বছর ধরে সবাই এসে ইজরায়েলীদের মেরেই যাচ্ছে, ইদানিং তারা একটু লড়াই করা শুরু করেছে। কিন্তু তিন হাজার বছরের ইতিহাসে সবাই তাদের মেরেই গেছে, তবুও তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা হলাম ভগবানের বিশেষ। শুধু এই বিশ্বাসের উপর ওরা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা মনে করতে পারি ওদের ঈশ্বর আমাদের ঈশ্বর থেকে আলাদা। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে ওরা ঈশ্বরকে নিয়ে যা

যা করছে আমরা রোজই একই জিনিষ করছি। ওদের সাথে ঈশ্বরের যেমন চুক্তি হয়, আমাদের সাথেও ঈশ্বরের সব সময়ই চুক্তি হচ্ছে। তবে জহুদিদের ক্ষেত্রে ভগবান নিজে চুক্তি করেন, আমাদের ক্ষেত্রে আমরা ভগবানের সাথে চুক্তি করছি। কি রকম চুক্তি করছি? যেমন বলছি, হে ঠাকুর! আমার ছেলে যদি চাকরি পায় তাহলে কালীঘাটে আমি পাঠাবলি দেব। হে ঠাকুর! আমার মেয়ের বিয়ে যদি হয়ে যায় আমি তাহলে বাড়িত সত্যনারায়ণের পূজো দেব। ওখানে ভগবান প্যাক্ট করে আর এখানে মানুষ প্যাক্ট করে। বিদেশী ধর্মে যা যা আছে এখানে সাধারণ স্তরে তা সবই আছে, হয়ত একটু অন্য ভাবে।

এর আগে আমরা বলছিলাম, সাধারণ লোকেরা মনে করে খারাপ কিছু হলে ভগবানই করেন। সত্ত্বগুণী মনে করে ভালো যা কিছু হয় সব ভগবানের জন্যই হয়। যদি ঠাকুরের ইচ্ছায় ভালো কিংবা মন্দ হয়ে থাকে তাহলে দর্শনের দিক থেকে একটা বিরাট সমস্যা দাঁড়িয়ে যাবে। যেমন একটা সমস্যা হবে, যে সমস্যার কথা আমরা প্রায়ই বলি, তা হল ঈশ্বরের উপর পক্ষপাত দোষ এসে যাবে। কিন্তু পক্ষপাতের থেকে আরও মারাত্মাক সমস্যা হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি ভালো মন্দ সব হয় তাহলে ঈশ্বর কামপ্রেরিত হয়ে যাবেন। কর্মফলদায়ক ভগবান মানেই তিনি সংসারী হয়ে গেলেন। সংসারী মানে গৃহস্থ সংসারী নয়, যিনি কর্ম আর কর্মফলের অধীন। তাহলে কি ভগবান কর্মফল দেন না? ভগবানই দেন। আচার্যও বলছেন ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনিই পূর্ণ করেন।

জহুদিরা যখন ভগবানের সাথে প্যাক্টের কথা বলছে তখন তারা ভুল কিছুই বলছে না, ঠিক কথাই বলছে। আমরা যখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন, আচার্য শঙ্করও মানছেন। অন্যদের কথা ছেড়ে দিন, যিনি ঘোর বেদান্তী তিনিও বলছেন ভগবান প্রার্থনা শোনেন। ঠাকুর, শ্রীমা পদে পদে বলছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। আচার্যরা বলছেন তিনি শোনেন। সত্যিই তো আমার দুঃখ-কষ্টে আমি কার কাছে যাব? আমি একজনকে ভালোবাসি, মাঝ পথে সে আমাকে ছেড়ে এই জগৎ থেকে চলে গেল, বা কিছু হয়ে গেল। জগতে আর কেউ নেই যার কাছে আমি যাব। কিন্তু আমাকে তো একটা আশ্রয় নিতে হবে, তখন ভগবানের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তার ফলে আমার কিছু হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এই জিনিষটাই আমরা ভুলে যাই। যদি বলেন তিনি ফল দেনই দেন, তাহলে অবশ্যই আপনি ফল পাবেন। কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে দেখতে গেলে প্রার্থনা কারণ আর কার্য প্রার্থনার ফল। কিন্তু সব সময় তো ফল হয় না। কিন্তু এমন এক অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে, তার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। মনের মধ্যে তীব্র বেদনা, চোখ দিয়ে জল বেরিয়েই যাচ্ছে, সে কোথায় যাবে! ঠাকুরের কাছেই সে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদবে। এটাকেই ঠাকুর বলছেন ভক্তের ভগবান আছে। এর ফল সে পাবে কি পাবে না নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না। জহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান সবাই তাই করে যাচ্ছে আর হিন্দুরাও তাই করে। তবে খ্রীষ্টান ভগবান আর হিন্দু ভগবানে কিছু তফাৎ এসে যায়। ওরা বলবে আমাদের ভগবান ছাড়া আর কোন ভগবান নেই। হিন্দুরা কিন্তু মানে শ্রীকৃষ্ণও ভগবান আবার শিবও ভগবান, হিন্দু কৃষ্ণের কাছেও মাথা ঠুকছে আবার শিবের দুয়ারে গিয়েও মাথা ঠুকছে, এখানে একটা বিরাট তফাৎ হয়ে গেল। এই যে ভক্তির পরাকাষ্ঠা, আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই, হে ঠাকুর! আমি তোমার দরজায় এলাম। উপনিষদ ঠিক এখান থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। সেইজন্য স্বামীজী বারবার বলছেন, বিশ্বে কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যে ধর্মগ্রন্থ উপনিষদের কাছে আসতে পারে। কেন কোন ধর্মগ্রন্থ উপনিষদের কাছে আসতে পারবে না? শুধুমাত্র একটি কারণে আসতে পারবে না, আর ঐ কারণটা যদি খ্রীষ্টান, ইসলাম ধর্ম নিয়ে নেয় তাহলে ওদের ধর্মটাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্ম হল স্তুপীকৃত ধর্ম, হিন্দু ধর্মে সব কিছুই আছে। হিন্দুর ভগবান সবাইকে মারেন আবার সবাইকে রক্ষাও করেন। এগুলো অন্য ধর্মেও আছে। কিন্তু উপনিষদ আমাদের বাকি সব ধর্ম থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। উপনিষদের ভগবানের বিশেষ যে বৈশিষ্ট্য তা হল, তিনি সাক্ষী। উনি আমাদের ভালোতেও নেই, মন্দতেও নেই। এই ভাব মানুষ কখনই নিতে পারবে না, এটা সম্ভবই নয়। এমনকি সন্ন্যাসীরা, যাঁদের সংসার নেই, ঘরবাড়ি নেই তাঁরাও সব সময় এই ভাবকে ধরে রাখতে পারেন না। উপনিষদের ঈশ্বর কারুর ভালোও দেন না, কারুর মন্দও দেন না, তিনি কোন কিছুই দেন না। আমার যখন দুঃখ অনুতাপ হয় তখন মনে করছি ঠাকুরই আমাকে দুঃখ দিলেন, হে ঠাকুর! তুমি কেন আমায় এত কষ্ট দিচ্ছ। ভালোর কৃতিত্ব নিজে নিচ্ছি, আমার ছেলে কি দারণ রেজাল্ট করেছে, আর ছেলে মরে গেলে বলছি, হে ঠাকুর! তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে নিলে! ছেলের সাফল্য নিজের আর ছেলে মরে যাওয়াটা ভগবানের। এটা হল একটা ধাপ। যারা একটু সাত্ত্বিক তারা বলবে, ভালোটা

ভগবান দিচ্ছেন, খারাপটা আমার অদৃষ্ট, কর্মফল। আর যারা আধ্যাত্মিকতায় একটু উন্নত তারা বলবে আমার যা কিছু হচ্ছে সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। উপনিষদ বলবে তিনি সাক্ষী, যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সবেতে তিনি নিরপেক্ষ। কিন্তু তিনি আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে, তিনি না থাকলে কিছুই হবে না।

এবার আমরা অন্য ভাবে দেখতে পারি। জয়রামবাটীতে শ্রীমা আছেন। চৈত্র মাসের দুপুরবেলা বারান্দায় ভক্তদের ভোজনের ব্যবস্থা হচ্ছে, আসন, জল, পাতা দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড গরম। একটা তৃষ্ণার্ত বেড়াল জল খাবে বলে গ্লাশের জলে মুখ দিয়েছে। জলটা পাল্টে দিতে হল। আবার বেড়ালটি এসে গ্লাশে মুখ দিয়েছে, আবার পাল্টাতে হল। দুবার তিনবার পাল্টে দেওয়ার পর আবার যখন বেড়াল মুখ দিতে এসেছে নলিনী দিদি বেড়ালটাকে মারতে গেছে। মা এসে নলিনী দিদিকে আটকে দিচ্ছেন। নলিনী দিদি রেগে গিয়ে বলছে 'তোমার যত ভালোবাসা শুধু বেড়ালের প্রতি'। শোনার পর মা খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। মা খুব ধীর স্বরে বলছেন 'যার প্রতি আমার ভালোবাসা নেই সে তো অভাগা, তবে এই জগতে আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যার প্রতি আমার ভালোবাসা নেই'। এটাই হল, আমি শরতেরও মা, আমি আমজাদেরও মা। এটাই নিরপেক্ষতা। যিশুও ঠিক একই জিনিষ করছেন। যখন ক্রুশিফাই করা হচ্ছে তখন তিনি বলছেন, প্রভু তুমি এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না এরা কি করছে। তাঁর কাছে কেউ অপ্রিয় নয়, কেউ শত্রুও নয়। আধ্যাত্মিকতার এক চরম উচ্চস্তরে এই নিরপক্ষতার ভাব এসে যায়। আধ্যাত্মিকতার খুব উচ্চ অবস্থায় একটা উপলব্ধির স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত এই নিরপেক্ষতা হয় না। সেইজন্য ভগবানের নিরপেক্ষতাকেও ধারণা করা যায় না, ধারণা যদিও বা একটু করে নেওয়া যায় কিন্তু অনুশীলন করা আরও অসম্ভব। কারণ শরীর, মন, ইন্দ্রিয়কে নিয়ে আমরা এমন ভাবে জড়িয়ে আছি যে, জীবন চালাতে আমাদের একটু শক্তির দরকার হয়। ঐ শক্তির যোগান কিভাবে আসে? হে ঠাকুর আমাকে রক্ষা করো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার দ্বারা। সেইজন্য ধর্ম দুটো স্তরে চলে। আচার্য শঙ্করও ভাষ্য রচনার শুরুতে প্রথমেই তিনি দুটি স্তরকে আলাদা করে রেখে দিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন তত্ত্ব এই, জীবন কিন্তু এভাবে চলে না, জীবন চলে এভাবে। জীবনে যেভাবে চলে আপনি তো সেভাবেই বলবেন, সেখানেও আচার্য দৃঢ়, কখনই বলা যাবে না, কারণ সত্যের সঙ্গে কোন ভাবেই আপোশ করা যাবে না। আমাদের কাছে জগতের বাস্তবিকতা হল ঠাকুর আছেন, ঠাকুর কৃপা করেন, ঠাকুর কষ্ট দেন। কিন্তু সত্য হল তিনি আছেন এইটুকুই, তিনি আমাদের সুখও দেন না, দুঃখও দেন না – *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ*। এটাই গীতায় ভগবান বলছেন, তিনি আমাদের পাপও দেন না, পূণ্যও দেন না। আবার বলছেন *ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, তিনি কাউকে দিয়ে কর্মও করান না, কর্মফলের সংযোগও করান না, সব কিছু নিজের স্বভাবে চলছে।

আমরা তখন থেকে জহুদি, খ্রীষ্টান, ইসলাম, জুরাথ্রিষ্ট সব ধর্মকে নিয়ে দেখাচ্ছি ভগবানের ব্যাপারে তাদের কত রকমের ধারণা। কিন্তু একবারও ভাবা ঠিক হবে না যে এরা ভুল বলছে। সবাই একেবারে ঠিক কথা বলছে। কিভাবে ঠিক বলছে? সংসারের দৃষ্টি থেকে। আমরাও তাই করছি। উপনিষদ বলছে তুমি যদি এই ধারণা নিয়েই থাক তাতে দোষের কিছু হবে না, কিন্তু তোমার চোখের জল ফেলা কোন দিন বন্ধ হবে না। কিন্তু যাঁরা উপনিষদের ধারণাকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন, তিনি জানেন ভগবান সুখও দেন না, দুঃখও দেন না। আলেকজাণ্ডার ব্রাহ্মণকে বলছে তুমি যদি আমার সাথে না যাও তোমাকে আমি শেষ করে দেব। ব্রাহ্মণ বলছেন তুমি জীবনে এর থেকে বড় মিথ্যা কথা বলোনি। সেই ব্রাহ্মণ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, তিনি জানেন আত্মার উপর কোন ক্রিয়া হয় না। কিন্তু আত্মজ্ঞানের এই বিশেষ জ্ঞানকে প্রাপ্ত করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য যে প্রস্তুতি, যে যোগান দরকার তার আকৃতির পরিমাপ সাংঘাতিক। কিন্তু একবার যিনি এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন তিনি আর কোন সুখ-দুঃখে বিচলিত হন না। এই যে আত্মার নিরপেক্ষতা, ভগবানের যে নিরপেক্ষতা, এটাকেই আলোচ্য মন্ত্রে বলছেন – *সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ*।

ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটাও নড়ে না। এখানে আমাদের অনেক প্রশ্ন এসে যায়। একটু ভালো করে চিন্তন করলে কোন প্রশ্ন থাকবে না। প্রথমে দেখুন গাছের পাতা কে নাড়াচ্ছে? প্রত্যক্ষ ভাবে দেখছি বাতাসের জন্য গাছের পাতা নড়ছে। খুব ভালো কথা। বাতাসকে কে নাড়াচ্ছে? বলবেন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী যে ঘুরছে তার জন্য বাতাসেরও গতি আসছে। এবার দেখুন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে কেন

ঘুরছে। আমরা সবাই জানি মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের জন্য সূর্যের চারিপাশে পৃথিবী ঘুরছে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানে, এক ধরণের এনার্জি কাজ করছে। এবার ভাবুন, এই এনার্জি কোথা থেকে এল, আমরা বলব প্রকৃতি থেকে আসছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলবে বিগ ব্যাঙ থেকে সব কিছু এসেছে, বিগ ব্যাঙে প্রকৃতি বলে কিছু নেই। শেষে গিয়ে দাঁড়াল এনার্জিই গাছের পাতাকে নাড়াচ্ছে। এনার্জিকে আমাদের শাস্ত্রকাররা, মুনি ঋষিরা বিভিন্ন নাম দিলেন। কেউ কোন নাম নাও দিতে পারে। এবার আমরা এই পাখার উপমা নিয়ে বিচার করছি। পাখাকে কে ঘোরাচ্ছে? শেষমেশ মাইথন ড্যাম ঘোরাচ্ছে। সুইচ পাখাকে ঘোরায় না, সুইচ একটা ভূমিকা নিচ্ছে কোন সন্দেহ নেই। লোকাল ট্রান্সফর্মার বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু আসল যা করার করছে মাইথন ড্যাম। আরও পেছনে যদি যাওয়া হয় তাহলে দেখছি মাইথন ড্যাম এই পাখাকে ঘোরাচ্ছে না, মাইথনের বরাকর নদী ঘোরাচ্ছে। বরাকর নদীকে কে নাড়াচ্ছে? কোথাও হিমালয়ে নাড়াচ্ছে। হিমালয়ে বরফ কোথা থেকে এসেছে? সুর্য আছে বলে বরফ এসেছে। তাহলে শেষ আসছে সূর্য। এই সূর্যকে কে নাড়াচ্ছে? পুর সৌর মণ্ডলকে জুড়ে নিয়ে যে গ্যালাক্সি আছে সে নাড়াচ্ছে। সেই গ্যালাক্সিকে কে নাড়াচ্ছে? শেষে বলবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে শক্তি রয়েছে। আমরা শক্তিতে মানে এনার্জিতে পৌঁছে গেলাম। ঠিক এই জায়গাতে এসে বেদান্ত আর পদার্থ বিজ্ঞান আলাদা হয়ে যাবে। পদার্থ বিজ্ঞান বলবে এনার্জিই শেষ কথা, আপনি তাকে যে নামই দিয়ে দিন, তাকে প্রকৃতিই বলুন, কসমিক ফোর্স বলুন, এনার্জি বলুন, যে কোন একটা নাম দিয়ে দিতে পারেন। এই এনার্জিই সেই পাতাকে নাড়াচ্ছে, সেই পাখাকে নাড়াচ্ছে। আধ্যাত্মিক পুরুষ আরেক ধাপ পিছিয়ে যান, তিনি বলবেন এই এনার্জির নিজস্ব কোন সত্তা নেই। এর পেছনে চৈতন্য সত্তা আছে বলেই এই এনার্জি এনার্জি রূপে আছে। পদার্থ বিজ্ঞানী এটা মানবেন না। এই জায়গাতে এসেই বেদান্ত আর বিজ্ঞানের মধ্যে ঝামেলা লাগে। বিজ্ঞানের লড়াইটা অবশ্য আরও অন্যান্য দিকেও যায়, যেমন মানুষের মন, বুদ্ধি, চৈতন্য, জড় এগুলোকে নিয়ে তাদের অনেক লড়াই হয়। পাতা নড়ছে, পাখা ঘুরছে ছেড়ে দিন, আমরা যে কাজ করছি, এই কাজ কি সেই কসমিক এনার্জির জন্য করতে পারছি, নাকি কোন শ্রেষ্ঠ মন আছে যিনি এই সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন? স্বামীজী বলছেন এই লড়াইটাই চিরন্তন, এ যেন একটা অনন্ত শৃঙ্খল। মন থেকে পদার্থের জন্ম আবার পদার্থ থেকে মনের জন্ম। পদার্থ থেকে মনের জন্ম কেন? আমরা তো দিনরাতই দেখছি, মা-বাবার সংযোগ হল, সেখান থেকে সন্তানের জন্ম হল, সন্তানের মন, বুদ্ধি তৈরী হচ্ছে। পরিষ্কার দেখছি ম্যাটার থেকে জন্ম হচ্ছে। দুদিন খাওয়া-দাওয়া না করলে আমাদের বুদ্ধি কাজ করবে না। তার মানে ম্যাটারের জন্যই বুদ্ধি কাজ করে। ঋষিরা দেখছেন সেই চৈতন্য সত্তাই আছেন, সেখান থেকে ম্যাটারের জন্ম। বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে ম্যাটারকে ধরছে, ম্যাটারকে ধরে বুদ্ধিতে যাচ্ছে। ঋষিরা প্রথমে বুদ্ধিকে ধরে তারপর ম্যাটারে যাচ্ছেন।

আইনস্টাইন আর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটা কাল্পনিক সাক্ষাৎকার চলছে। আলোচনার বিষয় পাতা নড়া। আলোচনার শুরুতে, আমরা যেভাবে পেছনের দিকে গিয়েছিলাম ঠিক সেই ভাবে গিয়ে আইনস্টাইন বলছেন বিগ ব্যাঙ থেকে এনার্জি রিলিজ হচ্ছে সেই এনার্জি থেকে গাছের পাতা নড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনে বললেন 'না গো তা নয়, ওর পেছনে মা আছেন, সেইজন্য পাতা নড়ছে'। আইনস্টাইন বলছেন 'আমার বিজ্ঞানে আপনার কথা মেলে না, ইক্যুয়েশানে ফিট করছে না'। ঠাকুর তখন বলবেন 'না গো! আমি তোমার কথা কী শুনব! আমি যে প্রত্যক্ষ এই রকমটিই দেখেছি'। আইনস্টাইন যেটা নিজের বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যক্ষ করছেন, ঐ জিনিষটাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ এক ধাপ পেছনে গিয়ে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তাই উপনিষদের যত মন্ত্র আছে, যত কথা আছে এর একটাও কোন ধারণাপ্রসুত নয়। ঋষিরা বলছেন 'আমরা এটাই প্রত্যক্ষ করেছি'। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, আমিও এটাকে প্রত্যক্ষ করেছি, আমি আমার বুদ্ধি লাগিয়ে, ইক্যুয়েশান দিয়ে এই কথাগুলো বলতে পারছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 'আমি তো একবারও না করছি না বাপু এটা তাই, কিন্তু এরও পেছনে আরেকটা জিনিষ আছে যেটাকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি'। ঋষিও বলছেন *বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*। ঠাকুর আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন 'যে শক্তিতে সূর্য, চন্দ্র, তারা চলছে, সেই শক্তির পেছনে যে আরেকটা জিনিষ আছে সেটাকে আমি শুধু প্রত্যক্ষই করিনি, তাঁর সাথে আমি কথা কয়েছি'। বৈজ্ঞানিক বলবে তোমার মাথাটা খারাপ। আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি বলাতে তোমার মনে হচ্ছে আমার মাথাটা খারাপ। কিন্তু বাপু তোমাদের ধর্মের মোজেসের সাথে ভগবান কথা বলতে পারেন, তোমার

ধর্মের যিশু তাঁর স্বর্গের পিতার সাথে কথা বললে আপত্তি নেই, আল্লা মহম্মদকে কথা বললে আপত্তি নেই, আর আমাদের ঋষিরা কথা বললেই বলবে ঋষিদের সব মাথা খারাপ ছিল।

বিজ্ঞানের সমস্ত যুক্তি, সমস্ত বিচার এই জায়গাকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে। আইনস্টাইন কিছু জিনিষ দেখলেন, নিউটনও সূর্যোদয়, চন্দ্রোদয় দেখলেন, গাছ থেকে আপেল পড়া দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগ বিয়োগ করে, বুদ্ধি লাগিয়ে কতগুলি নিয়ম বার করলেন। সত্যিই খুব মহৎ কাজ, কারুর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠাকুর এটাকেই ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে শেষে বলবেন তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে শক্তির কথা বলছ এই শক্তিকেই বলে সমষ্টি শক্তি, এটাই আমার মা কালীর একটি কণা মাত্র। ঠাকুর বলছেন, মা সরস্বতীর জ্ঞানের একটা কণা কারুর মধ্যে এসে গেলে সে বিরাট প্রতিভাবান হয়ে জগতে তার নাম হয়ে যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা ছোট্ট কণা, গীতায় ভগবান বলছেন *একাংশেন স্থিতো জগৎ*। ভগবানের ছোট্ট একটা অংশে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থির। মা শক্তিরূপিণী, যাঁর শক্তি তিনিই ভগবান। বৈজ্ঞানিক বলবে, আচ্ছা তাই, এটাকে আপনি ইক্যুয়েশানে ফেলতে পারবেন? ইক্যুয়েশানে ফেলব কিরে, আমি সাক্ষাৎ দেখছি, কথা বলেছি, তোকেও দেখাতে পারি। এরপর এরা মানবে কি মানবে না সেটা তাদের মাথা ব্যাথা। তুমি যদি মান তাহলে উপনিষদ তোমার জন্য, আর যদি না মান বিজ্ঞানের শেষ কথা বিগ ব্যাঙ, ব্ল্যাকহোলে গিয়ে থেমে থাকো।

এবার উনি বলবেন, সমষ্টি শক্তি দিয়েই পাতা নড়ছে আপনি বলছেন তো? ঠিক তাই, আর এও জেনে রাখ এই সমষ্টি শক্তি মায়ের খুব ছোট্ট একটি অঙ্গ। সেই ছোট্ট অঙ্গের যিনি মালিক তিনি ভগবান, সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটিও নড়বে না। তিনি আছেন বলেই পাতা নড়ছে, তিনি আছেন বলে পাতা স্থির, স্থির থাকাটাও তাঁরই জন্য। কয়েকটা মন্ত্র পরেই কঠোপনিষদে বলবেন, *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর ধাবতি পঞ্চমঃ*। আমরা বলছি বায়ুর জন্য গাছের পাতা নড়ছে। কিন্তু বায়ু কার শক্তিতে চলছে? সেই আত্মা আছেন বলেই বায়ু চলছে। মানুষ কেন মারা যায়? মৃত্যু তাকে মারছে। মৃত্যু কি করে মারছে? তিনি আছেন বলে। জগতে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে কেন হচ্ছে? তিনি আছেন বলে। আগের একটি মন্ত্রে বললেন *বিশ্ব দেবা উপাসতে*, শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো আত্মার কাছে সব খবরাখবর দিচ্ছে বলে আমাদের শরীর, মন চলছে, ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অগ্নি আদি যত দেবতারা আছেন তাঁরা সবাই ভৃত্যের মত তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁর দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। এই ধরণের কথা শুনলে আমাদের অনেক কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার যুক্তি দিয়ে যদি বিচার করলে ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ মনে হবে। যাঁরা উপনিষদ নিয়ে সব সময় গভীর ধ্যান-ধারণা করছেন তাঁরা দেখেন এটাকে এই রকমই হতে হবে, এর বাইরে অন্য কিছু হতেই পারে না। যিশু যখন তাঁর ফাদারের কথা বলছেন, মহম্মদ যখন আল্লার কথা বলছেন, তখন সেটা ঐভাবেই হতে হবে, এর অন্যথা হতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, সব ধর্মেই গোল আছে। কিন্তু আবার সব ধর্মই ঠিক কথা বলছে। কারণ যিনি অনন্ত তিনি যে কোন রূপে আমাদের কাছে আসতে পারেন, তাঁর ব্যবহারও যে রকম খুশী হতে পারে। এমনকি তিনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দুজনের সাথে দু রকমের ব্যবহার করতে পারেন। চণ্ডীতেই মায়ের দু রকম ব্যবহারের কথা বলছেন, *চিত্তে কৃপা সমরে নিষ্ঠুরতা*। অনন্তকে কখন কোন কিছু দিয়ে সীমিত করে দেওয়া যায় না। জহুদি, খ্রীষ্টান আর মুসলমানদের যে ভগবান আর আমাদের ভগবান কি এক? ভগবান এক, কিন্তু আমরা যে অর্থে এক ভাবি সেই অর্থে এক নয়। এই কলম এক, এই কলম যেভাবে এক ভগবান সেভাবে এক নন। তিনি এক এইজন্য যে তিনি অনন্ত, তিনি এক এইজন্য যে তিনিই আছেন, তিনি এক এইজন্য যে তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তিনি এক এইজন্য যে তিনি আনন্দ স্বরূপ।

ঠাকুরকে দেখছি মুখে দাড়ি, আদুল গায়ে আছেন, শ্রীরামচন্দ্র তীর ধনুক নিয়ে রাজকীয় ভাবে আছেন, শ্রীকৃষ্ণ চক্র নিয়ে আছেন, সেই একই তো ভগবান। নাটকে যেমন একই অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্রের রূপ ধারণ করছেন, তিনিও কি অভিনেতার মত বিভিন্ন চরিত্রের রূপ ধারণ করছেন? না, কখনই তা নয়। আমরা যখনই ঈশ্বরের ব্যাপারে চিন্তা করি তখনই মনে করি তিনি একজন মানুষ। আর সেই মানুষ নানা রকম রূপ ধারণ করছেন। কিন্তু তিনি তা নন, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তিনি অনন্ত। ভক্তের কাছে তিনি ভগবান, ভক্তকে তিনি করুণা করছেন, কৃপা করছেন, কষ্ট দিচ্ছেন, আনন্দ দিচ্ছেন সবই করছেন। কিন্তু তাঁর যে আসল রূপ সেই রূপকে এই মন্ত্রে বর্ণনা করছেন।

এই মন্ত্রের আলোচনা করতে গিয়ে বিষয় থেকে সরে গিয়ে শুধু একটা জিনিষকে বোঝানর জন্য এই বিরাট আলোচনা করতে হল। মূল কথা, ভগবানের মধ্যে কখন সংসারীপন আসতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ভগবান যেন সংসারের সুখ-দুঃখের সাথে জড়িয়ে আছেন। এই ভুল যাতে না হয় সেইজন্য আগের দুটি মন্ত্রে অগ্নি আর বায়ুর কথা বললেন। কিন্তু তাতেও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না। সেইজন্য আরও পরিষ্কার করে বোঝানর জন্য একটা বড় উপমা আনছেন। জীবনে প্রতিনিয়ত মানুষকে নানা রকম দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে, মানুষের যা কিছু সব এই লড়াইকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। শাস্ত্র বলছে, ভগবানই আছেন। তাতে এই সংশয়ই উঁকি দেয়, ভগবানই সব কিছু করছেন। উপনিষদ সাবধান করে দিচ্ছেন, এই ভুল যেন তোমার কখন না হয়। ভগবানের উপর কোন মানবীয় গুণ আরোপ করতে যেও না। জহুদিদের ভগবান বলছেন তোমরা যদি এ রকমটি না কর তাহলে আমি এ রকমটি করব। আল্লাও এই ধরণের অনেক কথা বলছেন। গীতাতেও ভগবান বলছেন *তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্*, আমি এই ধরণের ক্রূর, অশুভকারী নিকৃষ্টদের অশুভ যোনিতে নিক্ষেপ করি। গীতার ষোড়শ অধ্যায়কে ভালো করে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, মানুষ একের পর এক গর্হিত কর্ম করতে থাকে, তার ফলে যোনি থেকে যোনিতে ঘুরে চলে, এটাকেই বলছেন *তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্*, আমি তাদের অশুভ যোনিতে নিক্ষেপ করি। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না, ঠিক তেমনি জগতে যা কিছু হচ্ছে একদিক দিয়ে দেখলে মনে হবে সব কর্মের গতিতে হচ্ছে, আরেকদিক দিয়ে দেখলে মনে হয় ঈশ্বরই সব করছেন। কিন্তু তাতে যেন মানুষ ভুলে মনে না করে যে ঈশ্বর এগুলোতে লিপ্ত। ঈশ্বরের নির্লিপ্ততাকে দেখাবার জন্যই এই মন্ত্রকে নিয়ে এসেছেন। ঈশ্বরের নির্লিপ্ত ভাবের জন্যই পরের দিকে সাংখ্য দর্শনের এত প্রসার হল। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ, যিনি চৈতন্য আর প্রকৃতি, যিনি ক্রিয়াশক্তি। সাংখ্যের পুরুষের উপমা দিতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, অনুষ্ঠান বাড়িতে গিন্নী সব কিছু করে যাচ্ছে আর বাড়ির কর্তা একটা জায়গায় বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক টেনে যাচ্ছে। গিন্নী মাঝে মাঝে আচঁলে হাত মুছতে মুছতে এসে কর্তাকে সব খবর দিয়ে যাচ্ছে, কর্তা শুধু ঘাড়টা নেড়ে অনুমোদন করে যাচ্ছে। সেইজন্য ভগবানের একটা নাম অনুমন্তা, তিনি অনুমোদন করছেন, তিনি কর্মাধ্যাক্ষ, তিনি আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে। আমরা যেভাবে একটা মানুষকে খুব সহজে বিচার করে ফেলি, এ ভালো, এ খারাপ, এ ভালো মন্দ মিশিয়ে, ভগবানকে এভাবে পরিভাষিত করা যায় না। আকার ইঙ্গিতে ভগবানের কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝান হয়। কিন্তু তাঁর নির্লিপ্ততাকে সাংখ্যে খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার ফলে যোগে আরও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যোগের ঈশ্বর হলেন *স পূর্বেষামপি গুরুঃ*, তিনি সমস্ত গুরুর গুরু, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কোন ক্রিয়াকার্যে তিনি নেই। কেন নেই? এই মন্ত্রগুলির জন্য।

বর্তমান যুগে এসে ঠাকুরের কথামৃত আর স্বামীজীর রচনাবলী হিন্দু ধর্মের মৌলিক জিনিষগুলিকে বোধগম্য করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সব কিছু যত সহজে আমরা এখানে বলে যাচ্ছি, আর আমরাও ধারণা করে নিচ্ছি, কিন্তু পণ্ডিত সমাজের যাঁরা দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তাঁরা অত সহজে ছেড়ে দেবেন না, তর্কের নিয়ম মেনে এনারাও ঈশ্বরের নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে এমন অনেক অকাট্য যুক্তি নিয়ে আসবে যে যুক্তিকে আমরা কোন ভাবেই খণ্ডন করতে পারব না। আচার্য শঙ্কর অবশ্য এর বিরুদ্ধে অনেক উত্তর দিয়ে গেছেন যাতে এনাদের অনেক যুক্তিকে আগেই কেটে রেখে দেওয়া হয়েছে। এত কিছুর পরেও আমরা যদি খুব শান্ত মনে ঈশ্বরের নিরপেক্ষতা, নির্লিপ্ততাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি আমাদের মনেও কোথাও যেন অন্য ধরণের অনেক ভাবনা উঁকি দিতে থাকে। তিনি নির্লিপ্ত কিন্তু তাঁরও রাগ আছে। জুদাইজিমে খুব নামকরা কথা যেখানে ভগবান বলছেন, I am a jealous God। অন্য কোন দেবীদেবতার পূজা করবে না, because I am a jealous God। জহুদিদের কাছে এটাই মূল মন্ত্র। তারাও জেহবা ছাড়া অন্য কোন ভগবানের দিকে তাকাবে না। আমরা বলতে পারি, যে ভগবানের মধ্যে মানবীয় গুণ আছে, তিনি যদি আমাদের মতই হিংসুটে হন তাহলে আমি কেন তাঁর কথা শুনতে যাব! ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। স্বামীজী আবার অন্য ভাবে বলছেন, God is always jealous, উনি কখনই worldliness সহ্য করেন না। যার মধ্যে একটু কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি আছে সে কোন দিন ভগবানের দিকে যেতে পারবে না। ভগবান তো হিংসুটে বটেই, আপনি আমি যতটা হিংসুটে ভগবান তার থেকেও বেশি হিংসুটে। আজ পর্যন্ত তিনি কোন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত মানুষকে তাঁর কাছে আসতে দেননি। ঠাকুর আবার বলছেন, সুতোর একটু আঁশ বেরিয়ে থাকলে ছুঁচের মধ্যে যাবে না। স্বামীর মধ্যে কিছু

গোলমাল থাকলে স্ত্রীও মেনে নেবে কিন্তু ভগবানকে যে ভালোবাসতে চাইছে তার মধ্যে একটু গোলমাল থাকলে তাকে কাছে আসতে দেবেন না। তিনি তো হিংসুটে বটেই। আবার বলছেন যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ, এমনই হিংসুটে যে বলছেন, তুই আমাকে ভালোবেসে আবার অন্যের দিকে তাকাচ্ছিস, দাঁড়া আমি তোর সর্বনাশ করছি।

যিনি চৈতন্য স্বরূপ তাঁর কাছে জড়ের কোন কিছুই চলবে না। জহুদিদের ভগবান যে বলছেন I am jealous God, কিছু ভুল বলছেন না। ভগবান কখনই তাঁর প্রতি কোন ধরণের অবহেলা, উপেক্ষা সহ্য করবেন না। জীবনে কেউ খুব কষ্টে পড়লে, এটাকেই অবলম্বন করে সান্ত্বনার ছলে আমরা তাকে বলি, ঈশ্বর যাকে ভালোবাসেন তাকে কষ্ট দেন। ভগবানের নিকুচি করেছে কাউকে কষ্ট দিতে। জিনিষটা তা নয়, এটা অন্য রকমের। মানুষ যেগুলিকে তার সম্বল মনে করছে, সম্বলগুলি যখন একটা একটা করে ভাঙতে শুরু হয় তখন সে ঈশ্বরের দিকে পা বাড়ায়। সব সম্বল ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত সে ঈশ্বরে প্রবেশ করতে পারবে না। যোগের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার বোঝা যাবে। মনে অনবরত অসংখ্য বৃত্তির ঢেউ উঠেই চলেছে, যতক্ষণ সমস্ত বৃত্তি শান্ত হয়ে থেমে না যাবে ততক্ষণ বস্তু জ্ঞান হবে না। হয় আমাদের বৃত্তি জ্ঞান হবে আর তা নাহলে বস্তু জ্ঞান হবে, দুটো জ্ঞান একসাথে হবে না। একটা পাত্রে হয় তেল থাকবে নয়তো জল থাকবে, জল আর তেল একসাথে থাকতে পারবে না। যিশু এটাই খুব সহজ করে বলছেন, এক খাপে দুটো তলোয়ার থাকতে পারে না। ভগবানকে রাখতে হলে জগৎকে বাদ দিতে হবে। এটাকেই অন্য ভাষায় বলছেন, You cannot serve God and a mammon at the same time।

যে ধারণাগুলো নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হল এগুলো অতি সাধারণ স্তরের ধারণা। কিন্তু শেষ সত্য হল ঋষিদের মত। ঠাকুর বলছেন ঋষিদের সনাতন ধর্মই থাকবে। কি সেই সনাতন ধর্ম? *সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।* দিবারাত্র জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে আমরা যে অনেক রকম কর্ম করছি তাতে অনেক রকম দোষ হয়। মনুস্মৃতি বা অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রে যেভাবে দোষের তালিকা দেওয়া হয়েছে, সব দেখতে গেলে আমাদের বেঁচে থাকাটাই দুরূহ হয়ে যাবে। যেদিকে যাব সেদিকেই একটা দোষ হবে, যে কাজই করব তাতে একটা দোষ হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক দোষ, আধিভৌতিক দোষ, ভৌতিক দোষ, চিন্তন দোষ, স্পর্শ দোষ, জাতি দোষ, সবেতেই দোষ। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সামাজিক বিধি আমাদের এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে হিন্দু ধর্মের পতন হওয়া ছাড়া আর কোন কিছু বাকি ছিল না।

এখানে একটা আধ্যাত্মিক পাপকে উল্লেখ করছেন। রাগের মাথায় অনেককে বলতে শোনা যায়, ওর দিকে তাকানও পাপ। স্মৃতিশাস্ত্রে যত বিধান দেওয়া হয়েছে তাতে সত্যিই এই রকম একটি বিধান আছে। যদি কারুর মলমুত্রের দিকে দৃষ্টি চলে যায়, সে সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিকে ওদিক থেকে সরিয়ে আনে। কিন্তু আচারী ব্রাহ্মণকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, কারণ এতে তাঁর দৃষ্টি দোষ হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে তাতে একজনের দৃষ্টি পড়ে গেছে, খাদ্যের দৃষ্টি দোষ হয়ে গেল। খাবারে দৃষ্টি পড়ল বলে খাবারটা অশুদ্ধ হয়ে গেল। ঠিক তেমনি চোখে যদি কোন নোংরা দৃশ্যে বা বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে যায়, আমরা মুখে বলি এই দৃশ্য আমার কাছে খারাপ লাগছে। কিন্ত শাস্ত্রে বলবে এতে তোমার আধ্যাত্মিক দোষ হয়ে গেছে, তোমাকে এরজন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই জিনিষটাকেই এখানে নিয়ে এসেছেন। জগতে দেখা যায় মানুষ চোখ দিয়ে যদি কোন নিষিদ্ধ জিনিষকে দেখে নেয় তখন সেটা পাপকর্ম হয়ে যায়। কিন্তু সূর্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চোখ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন জিনিষ নেই যেটা সূর্যের দৃষ্টিগোচর হবে না। জগতে যত অশুভ কাজ হচ্ছে সবই সূর্য দেখছে, জগতে যত অশুভ বস্তু, অশুভ দৃশ্য আছে সবটাই সূর্য দেখছে, কিন্তু আমরা তো কখন বলি না তাতে সূর্যের দোষ হচ্ছে, সূর্যকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সূর্যের যে নিজের প্রকাশ তাতে সবারই মঙ্গল হচ্ছে। কিন্তু প্রকাশিত করতে গিয়ে সূর্য অশুভ জিনিষগুলিকেও সামনে নিয়ে আসছে, যেমন মলমুত্রাদি। কিন্তু তাই বলে মানুষের যেমন আধ্যাত্মিক পাপ হয় সূর্যের কোন পাপ হয় না। এর থেকে আরও বেশি, নোংরা জিনিষ স্পর্শ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধিকরণ করতে হয়। এখনও অনেকে মাঠে-ঘাটে গেলে, রাস্তা দিয়ে এসে বাড়িতে ঢোকার সময় পা ধুয়ে ঢোকে। সূর্যের রশ্মি কত রকম নোংরা জিনিষকে সরাসরি গিয়ে একেবারে স্থূল ভাবে

স্পর্শ করছে, কিন্তু আমরা তো বলি না সূর্যের দোষ হয়ে গেছে, সূর্যের রশ্মিকে শুদ্ধিকরণ করতে হবে। কারণ সূর্য নির্লিপ্ত, স্থুল সূর্যের পেছনে যিনি দেবতা আছেন তিনিও নির্লিপ্ত।

যত রকম বাহ্য দোষ, মানুষের জন্য যেগুলোকে পাপ বলে গণ্য করা হয়, যে জিনিষকে স্পর্শ করলে অশুদ্ধ হয় আর দৃষ্টিপাত হলেও দোষ হয়, দোষ স্খালন করার জন্য লোকেরা স্বস্তি বচন করেন। কিন্তু সূর্যের এসব কিছুই হয় না। আমরা বলছি বলেই কি সূর্যের দোষ হয় না? তা নয়, শাস্ত্রও কোথাও বলছেন না। শাস্ত্র যদি বলতেন, সূর্য এই নোংরা, অশুভ জিনিষগুলিকে প্রকাশিত করছে বলে তারও পাপ হয়, তাহলে আমরা মানতাম, কিন্তু শাস্ত্র কোথাও বলছেন না। ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি জীবের ভেতর সেই আত্মা রয়েছেন, তিনি সব কিছু দেখছেন, সব কিছুকে জানছেন, কিন্তু তার জন্য কোন কিছুর দোষ বা পাপ বা দুঃখে তিনি লিপ্ত হন না। গীতায় এই কথাই ভগবান বলছেন *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং*, তিনি আমাদের পাপও নেন না, আমাদের পূণ্যও দেন না। তিনি কাউকে দিয়ে পাপও করান না, পূণ্যও করান না। তাহলে পাপ-পূণ্য কে করছে? *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, স্বভাব মানে প্রকৃতিই যা করার করে যাচ্ছে। বস্তুর উপর ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করছে, এটাই বেদান্তের শেষ কথা, এর আগে আর কিছু নেই। এ ব্যাপারে বেদান্তের একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু বেদান্ত সবাই নিতে পারে না। অনেক বছর ধরে যারা বেদান্তের কথা শুনে যাচ্ছে কিন্তু ঈশ্বর কাউকে পাপও দেন না, পূণ্যও দেন না, তিনি কাউকে দিয়ে পাপ কাজও করান না, পূণ্য কাজও করান না, বস্তুর উপর ইন্দ্রিয় কাজ করে যাচ্ছে, এটাকে ধারণা করতে গিয়ে বা ধারণা করে সেই অনুসারে জীবনকে সংগঠিত করতে গিয়ে তাদেরও কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। তাহলে এবার সাধারণ লোকেদের কথা ভাবুন! তারা এই বেদান্তের কী বুঝবে! আর সাধারণ লোক এই ঠুঁটো জগন্নাথকে নিয়ে কি করবে! নাড়ুগোপাল, সে বেচারীর নিজেকেই সামলাবার ক্ষমতা নেই, তিনি অন্যকে কি রক্ষা করবেন! তাহলে কেন জগন্নাথকে দর্শন করতে লক্ষ লক্ষ লোক দৌড়ে যাচ্ছে? কেনই বা নাড়ুগোপালের পূজো করছে? কারণ এটাই ঠিক ঠিক বেদান্ত। বেদান্তের ধর্ম এটাই, যাঁর আমি পূজা করবো তিন আমাকে কখনই রক্ষা করতে যাবেন না, আর ভালোও করবেন না। এটাই ভগবানের আসল স্বরূপ।

আমাদের যত রকম ভগবান আছেন, রাম বলুন, কৃষ্ণ বলুন, শিব বলুন, হনুমান বলুন, ঈশ্বরের ঠিক ঠিক স্বরূপকে যিনি প্রতীকায়িত করছেন তিনি হলেন নাড়ুগোপাল। নাড়ুগোপাল ছাড়া আর কোন ভগবান বেদান্তের ঈশ্বর বা আত্মার এত কাছাকাছি যায় না। বস্তুগত দৃষ্টিতে দেখলে, তিনি নাড়ুগোপালই হন আর যেই হন, তিনি তো ভগবান, সর্বশক্তিমান, তিনি সব সময়ই সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কিন্তু এনারা মনের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছেন ভগবান হলেন ভালোবাসার জিনিষ। ভগবানকে তুমি শুধু ভালোবেসে যাও, আর কিছু করতে হবে না। বদলে তুমি কিছুই পাবে না। ভালোবাসা মানে ভালোবাসা, ভালোবাসলে তুমি ভালোবাসা পাবে, আর কিছুই পাবে না। স্বামীজী উপমা দিচ্ছেন, হিমালয়কে আমি ভালোবাসি তাই বলে আমি তার কিছু চাই না। এই ভালোবাসা অত্যন্ত উচ্চমানের ভালোবাসা। ঠিক তেমনি উপনিষদের বা বেদান্তের যে আত্মার ধারণা খুব উচ্চমানের, সাধারণ লোকের পক্ষে এই ভাব নেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য সাধারণের মধ্যে উপনিষদ কখনই আলোচনা করা হত না। কারণ সাধারণ মানুষ বলবে এই ভগবানকে নিয়ে আমি কী করব! আমার হাজার দুঃখ আছে, হাজার চাহিদা আছে, যিনি আমার সুখ-দুঃখের সাথী হবেন, আমার চাহিদা পূর্ণ করবেন, আমার সেই ভগবান চাই। সেই ভগবান সব ধর্মেই আছে, হিন্দু ধর্মেও প্রচুর আছে। তাই মানুষ দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরে যায়, সাধুবাবাদের কাছে যায়। তার ইচ্ছা, চাহিদার পূর্ণ হলে বলবে, হে ঠাকুর! তোমার কি করুণা। যদি পূর্ণ না হয় তখন বলে, ঠাকুর তুমি আমার দিকে তাকালে না! কিন্তু বেদান্ত যে দৃষ্টিতে ভগবান দেখেন, সেই দৃষ্টিতে দেখলে ভগবান কোনটাই করছেন না। বলবে যা কিছু হচ্ছে *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*। এই ভাবকে ধরে রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে বেদান্তের দৃষ্টিতে সুখ-দুঃখ এগুলো কি? এগুলো অধ্যারোপ। এর সব থেকে ভালো উপমা হল, স্ফটিকের কোন রঙ নেই, কিন্তু স্ফটিকের পাশে লাল রঙের ফুল রেখে দিলে স্ফটিককে লাল রঙের দেখাবে। আত্মা চৈতন্যময়, তিনি চিন্তন করতে পারেন। যত ক্রিয়া হচ্ছে, ক্রিয়ার ভাবকে নিজের মত করে নিজের উপর আরোপিত করে নেন। আরোপিত করে নেওয়ার ফলে আত্মা কখন সুখে হাসছে আবার কখন দুঃখে কাঁদছে। আত্মা শরীরের মধ্যে এসে গেছেন, তিনি বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করছেন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িত,

ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের বস্তুর পেছনে ছুটছে। বুদ্ধির মধ্যে অপূর্ণতার ভাব আছে, বুদ্ধি যখন মনের মত জিনিষ পায় তখন খুশী হয়, মনের মত জিনিষ না পেলে অখুশী হয়, অখুশী হওয়ার জন্য তার দুঃখ বোধ হয়। এই দুঃখকে সে আত্মার উপর আরোপিত করে দেয়। আমার সাথে কারুর পরিচয় হল, পরিচিতি থেকে বন্ধুত্ব হল, এবার হঠাৎ সে একদিন তার ঝামেলা গুলো আমার ঘাড়ে ফেলে দিল। এরপর একটু সাহায্য করতে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে একটার পর একটা তার ঝামেলা গুলো আমার হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কেউ আমাকে মনে করিয়ে দিল, আপনি এর মধ্যে কেন জড়িয়ে আছেন। তখন মনে হবে, তাইতো আমি কি করে এর মধ্যে জড়ালাম! এরপর আমি চাইলেও ঝামেলাগুলো ফেলে দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। সব সময় আমরা এই জিনিষ দেখছি। প্রকৃতিও ঠিক এভাবেই কাজ করে। কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে সে আত্মাকেও জড়িয়ে নেয়। এবার সে বেরোতে চাইলেও আর বেরোতে পারবে না। স্বামীজী খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন। এক সাধু নদীতে স্নান করছিল। দেখছেন নদী দিয়ে একটা কম্বল ভেসে যাচ্ছে। সাধুর একটা কম্বলের দরকার ছিল, তিনি সাঁতরে গিয়ে কম্বলটাকে নিতে গেছেন। কম্বলটাকে ধরতেই সাধুও এবার কম্বলের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে গেছেন। সবাই চেঁচিয়ে বলছে, মহারাজ কম্বলটা ছেড়ে দিয়ে পারে চলে আসুন। সাধু ওখান থেকে প্রাণপন চিৎকার করে বলছেন, আমি তো কম্বলকে ছেড়ে দিতে চাইছে কিন্তু কম্বল আমাকে ছাড়ছে না। আসলে ওটা একটা ভাল্লুক ছিল।

আপনার স্ত্রী কি করে আপনার স্ত্রী হল? বাবা-মা বললেন এই মেয়েটি দেখা হয়েছে, তোমার সাথে এর বিয়ে ঠিক হয়েছে। আপনিও তাকে বিয়ে করে নিলেন। এরপর আপনি যতই তাকে ছেড়ে আসতে চান আর তাকে ছাড়তে পারবেন না, কম্বল হয়ে সে আপনাকে ধরে নিয়েছে। স্ত্রীও আপনাকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না, কারণ আপনিও কম্বল হয়ে তাকে ধরে রেখেছেন। এই জগতে সবাই এক অপরের কম্বল হয়ে জড়িয়ে আছি। আমি যত বলছি আমি তো তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি তুমি এবার আমার কাছ থেকে বিদায় হও। সে আমাকে কোন কথাই বলবে না, আসলে সেতো কম্বল নয়, ভাল্লুক। এখানে ঠিক এই কথাই বলছেন। কিন্তু এখানে কম্বলকে বাস্তবিক ধরে রেখেছে। আত্মার ক্ষেত্রে হয় অধ্যারোপিত। অধ্যারোপ মানে, যেটা তাঁর নয় মিছিমিছি সে চিন্তা করে নিচ্ছে এটা আমার। ঠাকুর বলছেন, লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা কেঁদে আকুল হলো। লোকেরা খবরের কাগজ পড়ে ঠিক আছে, একটা খবর জানার আগ্রহ হয়েছে খুব ভালো, নতুন কোন কিছু আবিষ্কারের খবর জানা গেল। কিন্তু এরপর কোথায় কোন গ্রাম কোন দল দখল করেছে, কোন নেতা, কোন মন্ত্রী কি বলছে এই নিয়ে অকারণে নিজের উপর সব চাপিয়ে মনের মধ্যে অশান্তি তৈরী করে নিচ্ছে। এটাকেই বলে অধ্যারোপ। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, প্লেয়াররা টাকা পাবে, বেটিং করে দাউদ ইব্রাহিম টাকা পাবে, আমার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই নেই, কিন্তু আমরা লাফালাফি করে মরছি। আত্মা কোন কিছুর সাথে সরাসরি যুক্ত নন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয় যায় যে আত্মা মনে করেন যে এগুলো সব আমারই হচ্ছে। আচার্য বলছেন এটাই মায়া। মায়া বলতে কি বোঝায়? একটা জিনিষের উপর আরেকটা জিনিষের আভাস, যেমন সুক্তিকাতে রূপোর আভাস, রজ্জুতে সর্পের আভাস বা মরীচিকায় জলের আভাস। মরীচিকাতে যে জল দেখছি ঐ জল দিয়ে তৃষ্ণা কখনই মিটবে না, মরুভূমির একটি বালি কণাও ভিজবে না, অথচ দেখছি জল। ঠিক এই সমস্যাই দেখা যায় যখন আত্মার উপর অধ্যারোপ এসে যায়, তখন সে ভুলভাল ভাবতে শুরু করে। কি রকম ভুলভাল? এই দেখ জল, কাল থেকে আজ জল অনেক বেশী, জলের উপর কি সুন্দর ঢেউ খেলছে, ঢেউয়ের উপর নৌকা ভেসে যাচ্ছে। বড় বড় মরুভূমিতে যে মরীচিকা হয় তাতে একটা শহরকেই প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। শহরের ঘরবাড়ি, লোকজন, গাড়িঘোড়া সবটাই দেখা যায়। মরীচিকায় জলটা প্রতিবিম্ব দিয়ে হয় আর শহরের ছবিটা আসে আলোর প্রতিসরণ দিয়ে। ঋষিরা তখন এত কিছু জানতেন না, এনারা তাই বলছেন আকাশনগরী, আকাশনগরী মানে এই মরীচিকার নগরী, পুরো শহরকেই দেখা যায়। কিন্তু না আছে কোথাও জল, না আছে শহর। আত্মাতে ঠিক এইভাবে সংসারের ভাব আরোপিত হয়ে যায়।

রজ্জুকে সাপ কল্পনা যে কেউ করতে পারে, কিন্তু সেই সাপ ছোবল দিয়ে বিষ ঢালতে পারবে না। ঠিক তেমনি এই জগৎ চলছে ক্রিয়া, কারক আর কর্মফলের জন্য। ক্রিয়া, সাতটি কারক আর ক্রিয়ার ফল, এই নটি জগতের স্বভাব, অথচ আত্মা এই স্বভাবকে নিজের উপর আরোপিত করে নেয়। আরোপিত করে নিয়ে যা কিছু ভাবছে তা বাস্তবিক নয়। তিনি চৈতন্যবান বলেই তিনি ভাবতে পারছেন, এবং সত্যি সত্যিই ভাবছেন, তবে

ভাবাটা বাস্তব নয়। সেইজন্য আমরা যে ভাবছি, ভগবান কৃপা করছেন, ভগবান দুঃখ দিচ্ছেন এগুলোও সত্য। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখলে, বেদান্তের অদ্বৈত উপলব্ধি দিয়ে দেখলে, তিনি এসব কিছুই করেন না। কিছুই করেন না কেন? কারণ অন্য কিছু নেই কিনা। অন্য কিছু থাকলে তবে তো তিনি কিছু করবেন। কাউকে মরীচিকা থেকে জল নিয়ে আসতে বলা হল। সে জল আনবে কি আনবে না পরের কথা, জলই তো নেই, জল থাকলে তবে তো সে আনবে। এত ক্রিয়া কারকাদি যা কিছু হচ্ছে এগুলো আত্মার উপর অধ্যাস, আত্মার উপর একটা মরীচিকা। আত্মা লিপ্ত তো পরে হবেন, তার আগে ঠিক করতে হবে আত্মা লিপ্ত হবেন কিসে। কিছু থাকলে তবে তো লিপ্ত হওয়া বা লিপ্ত না হওয়ার প্রশ্ন আসবে। অন্ধকারে একটা দড়ি দেখে বলছি, সাপটা কি ঢ্যামনা না কেউটে। যেখানে সাপই নেই সেখানে ঢ্যামনা বা কেউটে হওয়ার প্রশ্ন কি করে উঠবে! বেদান্ত এই কথাই বলছেন, আত্মার দৃষ্টিতে দেখলে এখানে পর বলে কিছু নেই, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আত্মা লিপ্ত হবেন কোথায়? আমরা ভাবছি, কারণ আমাদের কাছে দেহ সত্য, সংসার সত্য, ইন্দ্রিয়গুলি সত্য আর দুটো বই পড়ে, দুটো কথা শুনে আত্মাও সত্য বলে মনে হয়, ভগবানও সত্য মনে হয়। আত্মাও ঠিক সেই রকম জগৎকে সত্য বলে মনে করছে। কিন্তু জগৎই নেই তিনি লিপ্ত হবেন কোথায়! এটাই বেদান্তের শেষ কথা। শ্রীমা বলছেন, জগতে কারও দোষ দেখ না, জগতে কেউ পর নয়। কিন্তু জগতে কেউ নেই, তুমিই আছ, পর অপর তো পরের কথা। লিপ্ত, নির্লিপ্ত কখন হবে? একটা জিনিষ যখন আছে তখন এই প্রশ্নগুলো আসবে। আচার্য বলছেন, মরুভূমি যেমন মরীচিকার যে জল তার বাইরে, ঠিক তেমনি আত্মা সব কিছুর বাইরে। সেইজন্য এখানে যা কিছু দোষ ত্রুটি হচ্ছে তাতে আত্মার কিছু আসে যায় না। একই কারণে ভগবানেরও কিছু আসে যায় না। আর বাস্তবিক যদি তুমি ভগবানকে মেনে চল, ভগবান কখন কোন জিনিষে নিজেকে জড়ান না। কিন্তু মনে হয় আত্মা বা ভগবান জড়িয়ে আছেন। এতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু এগুলো সাধারণের জন্য। যাঁরা সত্যি সত্যি খুব উচ্চস্তরে চলে গেছেন তাঁদের কাছে এগুলো কিছু নেই, তাঁদের জীবন-মৃত্যু বলেই কিছু বোধ হয় না।

উপনিষদ ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে আমাদের কিছু কিছু জিনিষ মাথায় রাখা দরকার। যিনি অনন্ত তাঁকে কখনই ইতি করা যায় না। ইতি করা না যাওয়ার ফলে যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমনি তার কিছু অসুবিধাও আছে। যে কোন লোক যে কোন ভাবে অনন্তের ব্যাপারে বলে দিতে পারে, আর শাস্ত্রে অনন্তের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে সেটাকে যে কোন ভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। আরও অসুবিধা হল, উপনিষদ এতই প্রাচীন যে এর শব্দের ব্যবহারও এখন অনেক পাল্টে গেছে। তার সাথে আরও সমস্যা হল, উপনিষদ কোন একজন ঋষি একই পদ্ধতিতে লেখেননি। যেমন কোন একজন ঋষির অনেক শিষ্য ছিল, যাঁদের অনেকই পরে অনেক নাম করেছেন। সবাই একই গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। আরও মজার ব্যাপার, এনারা আবার বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা। কিন্তু গুরুর কাছে কিছু কিছু শব্দ ওনারা যে শিখেছিলেন সেই শব্দগুলো পরে একই থেকে যাবে। মনে করা যাক উপমন্যু আর সত্যকাম একই ঋষির কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। পরে উপমন্যু যে মন্ত্র রচনা করবেন আর সত্যকাম যে মন্ত্র রচনা করবেন, দুজনের রচনার মধ্যে অনেক কিছু জিনিষ এক থাকবে। কিন্তু দুজনের মধ্যে কোন আদানপ্রদান নেই, ফলে শব্দ এক থাকলেও অর্থটা পাল্টে যেতে পারে। ধরুন একই গুরুর কাছে শিখেছিলেন এনার্জি হল প্রাণ। শরীরের যে এনার্জি কাজ করে একজন সেটাকে প্রাণ শব্দ রূপে ব্যবহার করতেই পারেন, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে এনার্জি কাজ করছে সেটাকেও একজন প্রাণ বলতেই পারেন। আর সক্রিয় ব্রহ্ম যেটা দিয়ে তাঁর ক্রিয়া হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, সেটাকেও প্রাণ বলতেই পারেন। বর্তমান কালে আমরা ব্রহ্মের যিনি শক্তি তাঁকে আমরা শক্তি বলছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে শক্তি কাজ করছে তার আবার আলাদা নাম হয়ে গেছে। শরীরের যে শক্তি কাজ করছে তারও আরেকটা নাম হয়ে গেছে। এখন প্রাণ বলতে আমরা শুধু শরীরের এনার্জি বুঝি। উপনিষদে প্রাণ বলতে শরীরের এনার্জি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এনার্জি আর যিনি ব্রহ্ম তাঁরও নাম প্রাণ।

পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে উপনিষদের সময়ে একজন শিষ্য প্রশ্ন করলেন, আচার্য আমাকে বলুন সব কিছুর পেছনে কে আছেন? আচার্য বলে দিলেন প্রাণ। শিষ্য নিজের মত বুঝে নিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে সে অন্য একজন আরেকজন আচার্যের কাছে গেছেন যিনি প্রাণ বলতে এই শরীরের মধ্যে যে এনার্জি কাজ করছে সেটাকে ব্যবহার করছেন। ওর মধ্যে এখন সংশয় এসে যাবে, তখন বলবে যা কিছু আছে সব এই শরীরকে কেন্দ্র করেই হবে, এর বাইরে আর কিছু ভাবতে হবে না। ইন্দ্র আর বিরোচনের কাহিনীতেও তাই হয়েছে। ইন্দ্র আর বিরোচন দুজনে প্রজাপতির কাছে আত্মার ব্যাপারে জানতে চাইলেন। প্রজাপতি দুজনকেই বলে দিলেন

তুমিই সেই। এখানে না বোঝার কিছু নেই। অসুরদের রাজা বিরোচন অসুরদের গিয়ে বলে দিল আমি আত্মার রহস্য জেনে এসেছি। শরীরই আত্মা, চল আমরা সবাই খুব করে খাওয়া-দাওয়া করি, শরীরকেই আমাদের ঠিক রাখতে হবে। বিরোচন কোন ভুল কিছু বলছে না। কারণ উপনিষদে দেহকেও আত্মা বলা হয়। কিন্তু ইন্দ্রের সংশয় হয়ে গেল, কারণ আত্মার বৈশিষ্ট্যে বলা হয় আত্মার পরিবর্তন হয় না, কিন্তু শরীরের পরিবর্তন হয়। ইন্দ্র অনেক কিছুই শরীরকে আত্মার পরিভাষার সঙ্গে মেলাতে পারছেন না। আবার প্রজাপতির কাছে গেছেন, প্রজাপতি সেই একই কথার পুনরুক্তি করে বললেন তুমিই সেই। ইন্দ্র তখন ভাবলেন তাহলে মনই আত্মা হবে। এই করে করে কয়েকবার যাওয়ার পর শেষে বুঝলেন আত্মা ঠিক কি। কিন্তু এর আগে যা যা জিনিষকে ইন্দ্র আত্মা ভেবেছিলেন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আত্মা শব্দের ব্যবহার করা হয়।

হিন্দু ধর্ম হল inclusive ধর্ম, হিন্দু ধর্ম সব কিছুকেই নেয়, কোন কিছুকেই সে অস্বীকার করে না। ধর্মের যে জায়গাতেই আমরা স্পর্শ করি না কেন সবটাই হিন্দু ধর্মে পাওয়া যাবে। গরুর লেজে হাত রাখলে গরুকেই ধরা হবে, গরুর শিং ধরলে গরুকেই ধরবে। ঠাকুর বলছেন যেখানেই ধরুক গরুকেই ধরছে কিন্তু দুধ আসে গরুর বাঁট থেকে। গরুকে ঘাস খাওয়াতে হলে গরুর বাঁটের কাছে ধরলে গরু খেতে পারবে না, গরুর মুখেই ধরতে হবে। উপনিষদে সেইজন্য সব রকমের কথা আছে। ফিজিক্সই শুধু এনার্জি থেকে সৃষ্টির কথা বলে না, উপনিষদেও বলছে। আচার্য শঙ্কর উপনিষদের সব কিছুকে সমন্বয় করে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আচার্যের বক্তব্য হল উপনিষদে যেভাবে শব্দের ব্যবহার হয়েছে, সমন্বয় না করা হলে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এসে যাবে, ফলে লোকেদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা ও সংশয় এসে যাবে। যুক্তি-তর্ক করার তৎকালীন নিয়ম ও পদ্ধতির নিয়মানুসারেই তিনি শব্দের অর্থগুলিকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। শাস্ত্রে কোথাও বলছেন মা কালী সৃষ্টি করছেন, কোথাও বলছেন ব্রহ্মাই সৃষ্টি করেন, আবার বলছেন নারায়ণই সৃষ্টি করছেন বা সগুণ ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হচ্ছে কিংবা এনার্জি থেকে সৃষ্টি হয়, এর একটাও ভুল নয়, সবটাই ঠিক। আচার্য শঙ্কর যে শাস্ত্রে যে সৃষ্টির বর্ণনা পাবেন উনি সেটাকেই বলবেন। যেখানে বলছে নারায়ণই সৃষ্টি করেন, উনিও বলবেন নারায়ণই সৃষ্টি করেন, যেখানে বলবে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্তা উনিও বলবেন ব্রহ্মাই সৃষ্টি কর্তা, যে যে শাস্ত্রে যেমন ভাবে বলা হয়েছে সেই শাস্ত্রের ভাষ্য লেখার সময় ওটাকেই সঠিক বলছেন, সেইজন্য আচার্যের কথার মধ্যে কোথাও uniformity পাওয়া যাবে না। এটাই আচার্য শঙ্করের অনুপম বৈশিষ্ট্য। গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন সৃষ্টি বলে আদৌ কিছু নেই। গীতার ভাষ্যে বলছেন নারায়ণ থেকে সৃষ্টি। অন্য শাস্ত্রে বলছেন ব্রহ্মা থেকে সৃষ্টি। উপনিষদের কথা ছেড়ে দিন, উপনিষদের বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, তখনকার সংস্কৃতও অনেক পাল্টে গেছে, সেই কারণে উপনিষদের অনেক কিছুই আমাদের পরস্পর বিরোধী মনে হবে, কিন্তু আচার্য শঙ্করকে পড়লেও আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এই বলছেন সৃষ্টি নেই আবার বলছেন ব্রহ্মা থেকে সৃষ্টি, তারপরেই আবার বলছেন নারায়ণ থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে আচার্য এভাবে কেন বলছেন? একটা খুব সাধারণ উত্তর হল শাস্ত্রের সবটাই সত্য, সেইজন্য আচার্য কখনই বিষ্ণুকে সরিয়ে সেখানে ব্রহ্মাকে বা ব্রহ্মাকে সরিয়ে বিষ্ণুকে স্থাপন করবেন না। আচার্য শঙ্কর কখনই কাউকে না করবেন না, এটাই আচার্যের central theme, তিনি একবারও বলবেন না যে পুরাণ ভুল, উনি সবটাই ঠিক বলছেন। অথচ আমরা আচার্য শঙ্করকে বলছি greatest philosopher। শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তো বটেই। কিন্তু তিনি কি বলতে চাইছেন? ঠাকুর বলছেন, তুমি কি রঙে নিজেকে ছুপিয়েছ, আমাকে সেই রঙটা দাও। আচার্য শঙ্কর তাহলে কি রঙে নিজেকে ছুপিয়েছেন? উনি কি বলতে চাইছেন? আচার্য শঙ্করের একটাই সহজ বক্তব্য, আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই আর তুমিই সেই আত্মা। স্বামীজীও ঠিক একই কথা বলছেন each soul is potentially divine প্রত্যেক জীব সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। আচার্যও একই কথা বলছেন। ছোট্ট ধূলিকণা থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত সবের মধ্যে সেই অনন্ত ব্রহ্ম। এরপর তুমি রাজযোগ কর, জ্ঞানযোগ কর, কর্মযোগ কর তাতে কিছু আসে যায় না, আগে তুমি কোন রকমে ওটা হও। আচার্য শঙ্কর বলছেন আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মা বলতে তুমি, তুমিই সেই ব্রহ্ম। এবার তুমি সৃষ্টিকে মেনে নিয়ে কর, সৃষ্টিকে না মেনে কর, সৃষ্টিকে ব্রহ্মা দিয়ে আন, কালী দিয়ে আন তাতে আচার্যের কিছু আসে যায় না। আচার্য আর স্বামীজীর একটাই বক্তব্য দিব্যত্বই সত্য বাকি সব ফালতু। ঐ ফালতুতে কে কি করছে তাতে কিছু যায় আসে না। মুসলমানদের বিয়ে একটা হওয়া ভালো নাকি চারটে হওয়া ভালো, বিয়ে করাটা

ঠিক নাকি না করাটা ঠিক, ছেলে হলে ভালো না মেয়ে হলে ভালো, এই সমস্যা স্বামী বিবেকানন্দ বা আচার্যের নয়। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট বলে দিল gay marriage করা যাবে। এই নিয়ে প্রচুর অশান্তি লেগে গেছে, কিছু লোক এর বিরুদ্ধে, কেউ এর সপক্ষে। শঙ্করাচার্যকে যদি এই নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি বলবেন, আমি ম্যারেজও জানি না, গে কাকে বলে তাও জানি না, ওটা করলে তুমি যদি ঈশ্বরের দিকে যেতে পার কর, না করলেও যদি যাও তাহলে নাই কর। আচার্য বা স্বামীজীর কাছে এগুলো কোন সমস্যাই নয়। সমস্যা হয় জহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমানদের, যারা written law নিয়ে চলে। আচার্যের একটাই বক্তব্য, তুমিই সেই শুদ্ধ আত্মা, যিনি পরমাত্মা, যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম তিনিই সগুণ সাকার ব্রহ্ম, তিনিই অন্তর্যামী রূপে তোমার মধ্যে বিদ্যমান আর তুমিই সেই। যিনি এটাকে মেনে নিলেন এবার তিনি যাই বলুন সেটাতেই আচার্য হ্যাঁ বলে যাবেন, তিনি যদি বলেন সৃষ্টি নেই উনিও বলবেন সৃষ্টি নেই, আত্মাই তো আছেন। তিনি যদি বলেন সৃষ্টি আছে উনিও বলবেন সৃষ্টি আছে, আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। যদি বলেন আল্লা সৃষ্টি করেছেন, আল্লা করেছেন তো খুব ভালো, তাতে আমার কি আসে যায়! তার আগে বল তোমার সাথে আল্লার কি সম্পর্ক? বলল আমি আল্লার চাকর। আচার্য বলবেন, তা কি করে হবে! যে জেনে গেল আমি মালিকের সাথে এক, সে মালিকের হুকুম মত কাজ করবে কি করে! আমি তোমার সাথে এক মত হতে পারছি না। যেমনি কেউ বলে দেবেন আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আচার্য তাঁর সঙ্গে একমত। এখান থেকে এক চুল নড়লে শঙ্করাচার্য আর তাকে মানবেন না। স্বামী বিবেকানন্দেরও ঠিক তাই, মানুষের দিব্যত্বকে মেনে নেওয়ার পর আপনি যাই করুন তখন উনি কোন কিছুতেই আপত্তি করবেন না। শুধু দিব্যত্বই নয়, আপনি নিজেকে যদি ঈশ্বরের সেবক মনে করুন, ঈশ্বরের সন্তান রূপে ভাবেন সেখানেও তিনি একমত হবেন না, আমি ঈশ্বরের সাথে এক। স্বামীজী নিজেই বিভিন্ন জায়গায় বলছেন, আমি ততদিন কাজ করে যাব যতদিন আমি এই বিশ্বকে ঈশ্বরের সাথে এক না করতে পারছি। স্বামীজীও সবই বলছেন, সেবার কথা বলছেন, সঙ্ঘ সেবা বলছেন, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ সবই বলছেন, কোথাও পূজা করতে বলছেন, কোথাও পূজার নিন্দা করছে কিন্তু একটা জিনিষকে তিনি ছাড়বেন না, তা হল মানুষের দিব্যত্ব, বাকি সব কিছু ফালতু। তিনি সব শাস্ত্রকেই মানবেন, ফিজিক্স সেটাও শাস্ত্র, মেডিক্যাল সাইন্স সেটাও শাস্ত্র। নিউরোলজি বলবে, ব্রেন থেকেই চেতনা হয়, স্বামীজী বলবেন, তুমি ঠিকই বলছ ব্রেন থেকে চেতনা আসছে। সেই চেতনাই আত্মা, ঠিকই বলছ কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি বলে ঐ আত্মাই শেষ, স্বামীজী এবার বলবেন, না। কারণ তোমার যে আমিত্ব এটা শুদ্ধ চৈতন্যের আমিত্ব, এই আমিত্ব সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্য সত্তার সাথে একে। আচার্যও এই একই কথা বলছেন, সব কিছু বলে শেষ করছেন, ব্রহ্মাই সত্য আর তুমিই সেই ব্রহ্ম। পরের মন্ত্রে এই ভাবকেই অন্য ভাবে বলছেন –

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শ্বাশতং নেতরেষাম্।২/২/১২।।

সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপে সকলের নিয়ন্তা হয়ে যে অদ্বিতীয় আত্মার এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করেন, তাঁকে যে বিবেকী ব্যক্তি আচার্যোপদেশানুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে দর্শন করেন তাঁদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কারও হয় না।)

আত্মাকে আবার আগের মতই পরিভাষিত করে দেখাচ্ছেন যিনি আত্মদর্শি অর্থাৎ যিনি আত্মাকে জানেন তাঁর কি হয়। বিশ্বের প্রায় সব ধর্মই একটা ভালো জীবনের কথা বলে কিন্তু সেই ভালো জীবনটা তারা মৃত্যুর পরের জীবনকে নিয়ে বলে। জেহাদীরা নির্বিচারে মানুষ মারছে কেন? কারণ তার ধর্ম তাকে বলছে বিধর্মীদের মারলে তুমি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। খ্রীষ্টানরাও আগে একই কারণে বিধর্মীদের মারত, মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে যাব। জহুদিরা ভাবছে আমি যদি আমার জীবনকে আমার ধর্মের মধ্যে বেঁধে রাখি মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে যেতে পারব। হিন্দুরাও বলছে আমি যদি ভালো কাজ করি মৃত্যুর পর আমি ভালো জায়গায় জন্ম নেব। বেদান্ত কিন্তু এই ধরণের কোন কথা বলে না। মৃত্যুর পর কি হয় কেউ জানে না। বেদান্ত বলছে যা কিছু হবার এখানে এই শরীরেই হবে। কি হবে? শান্তি পাবে। যারা গাঁজা, ভাঙ খায় তারাও শান্তি পায়। কিন্তু এই শান্তি সেই শান্তি নয়। সুখে দুঃখে অবিচলত থাকাটাই সুখ। সুখে দুঃখে অবিচল কখন থাকে? যখন আত্মদর্শি হয়। আত্মার দর্শন যদি তোমার হয়ে যায়, দর্শন মানে জানা, আত্মাকে যদি জেনে যাও তবেই তুমি অবিচল থাকতে পারবে, তা নাহলে

পারবে না। এই জীবনের সাথেই আত্মজ্ঞানের সরাসরি সম্পর্ক। তাহলে পরের জীবনে আমার কি হবে? পরের জীবন বলে তোমার কিছু থাকবে না। যে বলে মৃত্যুর পর আমার মুক্তি হবে বা আমি বৈকুণ্ঠে যাবে বা রামকৃষ্ণলোকে যাব, সে কিন্তু বেদান্তী নয়। বেদান্তী বলবে, এখানে এই শরীরেই আমার যা হবার হবে।

নচিকেতাকে যমরাজ এই কথাই বলছেন, তুমি আত্মার ব্যাপারে যে প্রশ্ন করেছিলে, সেই আত্মাকে জেনে গেলে, আত্মজ্ঞানী হয়ে গেলে তোমার কি হবে? *সুখং শ্বাশতং*, শ্বাশত সুখ মানে অনন্ত বা চিরস্থায়ী সুখ। শ্বাশত সুখ eternal Heavenএর অর্থে নয়। শ্বাশত সুখ মানে, জাগতিক কারণে, জাগতিক ঘাত-প্রতিঘাতে, সম-বিষম পরিস্থিতিতে তোমার সুখ কখনই মলিন হবে না। শ্বাশত সুখ ব্রহ্মলোকের অনন্ত সুখের অর্থেও নয়। *ন ইতেরেষাম্* অপরের এটা হয় না। নেশা ভাঙ করেও সুখ হয়, কিন্তু নেশার জিনিষ না পেলে পাগলের মত ছটফট করতে থাকবে। কোথায় গেল তার সুখ? কিন্তু যিনি আত্মস্থ, সুখের জন্য তাঁকে জগতের কোন কিছুকে অবলম্বন করতে হয় না। পরের জীবনে যা হবার পরে দেখা যাবে, পরের জীবন আদৌ আছে কিনা তাই জানি না, আগে এই জীবনটাকে তুমি দেখ। এই জীবন ঠিক থাকলে পরের জীবনও ঠিক থাকবে। মানুষ বাচ্চাদের মত, মায়ের কোলে গেলে সে হাসতে থাকে, দুটো মনের মত খেলনা দিয়ে দিলে আনন্দে হাসে, দুটো লজেন্স দিলে হাসে। তার হাতের খেলনা কেড়ে নিলে চেঁচিয়ে কাঁদে, মাকে ঘুষি মারতে থাকে। বড় হয়ে যাওয়ার পরেও মানুষ একই থাকে, শুধু তার খেলনাগুলো পাল্টে যায়। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, টাকা, বাড়ি এগুলোই এখন তার খেলনা। মেয়েদের কাছে শাড়ি, গয়না খেলনা, ছেলেদের কাছে চাকরি, প্রমোশন খেলনা। যেমনি একটা খেলনাকে একটু টেনেছে, নিয়েও নেয়নি, তাতেই ফোঁস করে উঠছে। এখনতো মায়ের কোলে নেই, কিন্তু যার উপর ভালোবাসা আছে তার উপরই রাগ, ক্ষোভ সব উগড়ে দেয়। বাচ্চা যেমন ভাঙচুর শুরু করে দেয়, আমরাও ভাঙচুর শুরু করে দিই, এই হাইকোর্টে যাচ্ছি, এই রাস্তা অবরোধ করছি, ইনক্লাব জিন্দাবাদ করছি। মানুষ কখনই বড় হতে পারে না, সারা জীবন বাচ্চাই থেকে যায়। তার মানে বিকাশ নেই। যে উন্নত হতে থাকবে সুখ-দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সেইজন্য এই সুখকে বলছেন শ্বাশত সুখ।

শ্বাশত সুখ কার হয়? *যেহনুপশ্যন্তি*, যিনি দেখেন। কে দেখেন? *ধীরাঃ*, যিনি ধীর পুরুষ। ধীর পুরুষ কি রকম? *আত্মস্থম্*, বাইরের জগৎ থেকে মনকে গুটিয়ে ভেতরে নিয়ে এসেছেন। সেই ধীর পুরুষ দেখেন। কাকে দেখেন? সেই আত্মাকে। সেই আত্মার বৈশিষ্ট্য কি? *একঃ*, তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, তিনি এক দুইয়ের পারে। এক দুইয়ের পারে বললে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় হতে পারে যে তিনি শূন্য, সেইজন্য বলছেন *একঃ*, *একঃ* ভগবানের একটা নাম। *একম্* বা *একঃ* বলতে এক, দুইকে বলছেন না, *একঃ* ভগবানেরই নাম। ঐ *একঃ* যিনি তিনি *স্বতন্ত্র সর্বগতঃ*। যদি একও নেই দুইও নেই বলে তাহলে তাঁকে পরমার্থ কে বলবে? আর একের জায়গায় যখন দুই নেই তাহলে তাঁকে সীমিত কে করবে? বাড়িতে আমরা গেস্ট এলে দেখাই, এটা আমার মেয়ের ঘর, এটা আমার ছেলের ঘর, এটা আমার ঘর, কারণ বাড়িতে অনেকেই আছে। আর যদি একা থাকে তখন বললে সব ঘরই আমার। তিনি এক, তিনিই আছেন, এটা ঈশ্বর, এটা জগৎ, এটা স্বর্গ, তা নয়। সবটাই তিনি। সেইজন্য বলছেন তিনি স্বতন্ত্র। সেইজন্য তিনি *সর্বগতঃ*। অন্য কিছু থাকলে সর্বগত হবে না। এটা পুরুষ, এটা প্রকৃতি, এটা চৈতন্য, এটা জড় এভাবে বললে তাঁর উপর সীমাবদ্ধতার দোষ এসে যাবে। তিনি ছাড়া তো কিছুই নেই। সেইজন্য তিনি *সর্বগতঃ*, কারণ তিনি এক, *একম্*।

একো বশী, বশী মানে নিয়ন্তা বা অধীন। জগৎ আর জগতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সবটাই তাঁর অধীনে, তাঁর নিয়ন্ত্রেণ, তিনিই সব কিছুর মালিক। একদিকে *একঃ* আরেক দিকে *বশী*। ব্রহ্মের দৃষ্টিতে দেখলে তিনিই আছেন, সেখানে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু জগতের দৃষ্টিতে যদি দেখি, জগৎকে যদি মেনে চলি, তখন বলছেন তিনিই সব কিছুর মালিক। আর তিনি *একম্* তাই তাঁর সমান বা বড় আর কিছু নেই। ঈশ্বর থেকে কেউ বড় হতে পারবে না আর ঈশ্বরের সমানও কেউ হতে পারবে না। কারণ তিনি *বশী*, রাজার মত সবাইকে তিনি ধরে রেখেছেন। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *কুতঃ? সর্বভূতান্তরাত্মা যতঃ*। বশী কেন? কারণ তিনি *সর্বভূতান্তরাত্মা*, জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুর যে সার, সব কিছুর যে অন্তরাত্মা সেটা তিনি।

আর বলছেন, *একমেব সদেকরসমাত্মানং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনরূপং নামরূপাদ্যশুদ্ধোপাধিভেদবশেন বহুধা অনেকেপ্রকারং যঃ করোতি*, তিনি অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন। অচিন্ত্যশক্তি বলছেন কারণ ঐ শক্তির কথা কেউ চিন্তা

করতে পারবে না। আর তাই না, *স্বাত্মসত্তামাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ*, তিনি নিত্য, একরস, একরস মানে তিনি সব জায়গায় সমানে ভাবে আছেন, কোথাও উপর নিচু কিছু নেই। তাঁর স্বরূপ হল তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপের বিপরীত হল জড়স্বরূপ, তিনি কখনই জড়স্বরূপ নন। *সত্তামাত্রেণ*, তিনিই আছেন, শুধু এই থাকার শক্তিতে নামরূপ উপাধি ভেদে অনেক কিছুকে দাঁড় করিয়ে দেন। আত্মাই আছেন, ঠাকুরও বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই এক কথা আমরাও কতবার বলে আসছি। কিন্তু আমি আলাদা আপনি আলাদা এই সত্যই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। উপনিষদও এই বহু দৃষ্টিকে নাকচ করছেন না, আচার্য শঙ্করও নাকচ করছেন না। কিন্তু তার সাথে বলছেন, এগুলো সব নাম আর রূপের খেলা। নাম আর রূপ আছে ঠিকই। কিন্তু নাম আর রূপ কোথা থেকে আসছে? *সত্তামাত্রম্*, তিনি আছেন তাতেই সব নাম আর রূপ এসে যাচ্ছে, এরজন্য তাঁকে আর ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে না। আমাদের যেমন কোন কিছু করার আগে সঙ্কল্প করতে হবে, সঙ্কল্প করার পর সেটাকে কার্যকর করতে হয়, তাঁর ক্ষেত্রে এসব কিছুই করতে হয় না। তিনি আছেন তাতেই সব কিছু হয়ে যাচ্ছে, এরজন্য তাঁকে কোন ক্রিয়া করতে হচ্ছে না, কোন পরিশ্রমও করতে হচ্ছে না।

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি, প্রথমে বললেন *একঃ*, এখন বলছেন *একং রূপং বহুধা যঃ করোতি*, তিনি একরস, কিন্তু সেই একরসকে বহু প্রকার করে দিচ্ছেন। কিভাবে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি এক কিন্তু নিজেকে বহু হয়ে দেখাচ্ছেন। বহু যা কিছু হচ্ছে এই বহু কিন্তু বাস্তবিক সৃষ্টি হচ্ছে না, এটা শুধু নাম আর রূপের উপাধি।

এই আত্মাকে কে দেখতে পান? সেই বিবেকী পুরুষই আত্মাকে দেখতে পান, যিনি *তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি*। আত্মস্থ মানে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে হৃদয়াকাশে অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহাতে যে চৈতন্যস্বরূপের অভিব্যক্ত হয় সেখানে তাঁকে দেখেন। ঈশ্বর দর্শনের কথা বললেই আমরা মনে করি ঈশ্বর যেন মানুষের মত সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, নিজের বুদ্ধিতেই প্রকাশিত হন। আচার্য শঙ্করকে যদি জিজ্ঞেস করা শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীকে যে দেখলেন, তিনি ঠিক কী দেখলেন? আচার্য শঙ্কর বলবেন, তিনি আর কী দেখবেন, চৈতন্যস্বরূপকেই দেখলেন। কোন ম্যাজিক্যাল কিছু বস্তু এসে গেছে দেখছেন তা নয়, নিজের বুদ্ধিতেই দেখছেন। তাহলে বাইরে কেন দেখছেন? বাইরেটাও তো নিজের বুদ্ধিতেই আছে। কখন বোধ হয় বাইরে আছে, কখন বোধ হয় ভেতরে আছে। আমি যে মনে করছি এই গ্লাশ একটা জিনিষ আর আমার বুদ্ধি আরেকটা জিনিষ, ব্যাপারটা তা নয়, সবটাই বুদ্ধিতে হচ্ছে। কিন্তু যখন জগৎ থেকে মন কুড়িয়ে আসে তখন নিজের ভেতরেই অভিব্যক্ত হয়। বেদান্ত এই জিনিষটার উপর খুব বেশি জোর দিচ্ছে, আত্মজ্ঞান বা আত্মার জ্ঞান নিজের ভেতরেই হয় বাইরে হয় না।

আচার্য আবার বলছেন, *ন হি শরীরস্য আধারত্বমাত্মনঃ আকাশবদমূর্তত্বাৎ*, আকাশের মত অমূর্তমান, তাই শরীর কখনই আত্মার আধার হতে পারে না। আত্মার ব্যাপারে এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। আত্মার উপমা রূপে আকাশ সব থেকে কাছাকাছি। সেইজন্য আকাশকে দিয়ে আত্মাকে খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। আকাশকে বিভাজিত করা যায় না, আকাশকে আর্দ্র করা যায় না, ঠিক তেমনি আত্মাকেও কোন কিছু করা যায় না। জল, পৃথিবী সব মূর্তমান কিন্তু আকাশ অমূর্তমান, আত্মাও অমূর্তমান। কারণ আত্মা আকাশের থেকেও সূক্ষ্ম। গ্লাশে জল আছে, জল ফেলে দিলে গ্লাশে যে আকাশ সেটাই গ্লাশের আকাশ, ঘটের মধ্যে আকাশ তাকে বলছেন ঘটাকাশ। আকাশ কি ঘটকে আশ্রয় করে আছে নাকি ঘট আকাশে আশ্রিত? এর উত্তর নির্ভর করবে আপনি কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখছেন। ঘটাকাশ বললেও ভুল কিছু বলা হবে না। এটাই আমাদের সাধারণ বুদ্ধি। এই সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই আমরা বোধ করছি এই শরীর আছে আর এই শরীরের মধ্যে আত্মা আছেন, মৃত্যুর সময় আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যান। আত্মা যদি মৃত্যুর পর শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে আত্মা কোথায় ছিল? শরীরেই ছিল। তাহলে শরীরকে আধার করে আত্মা ছিল। কিন্তু আচার্য বলছেন শরীর আত্মার আধার নয়। সাধারণ বুদ্ধিতে বলবে আত্মা শরীরকে আধার করে আছেন। কিন্তু ভারতীয় ভাষাকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শরীরকে কেন্দ্র করে এখানে আত্মাকে দেখা হয় না। কেউ মারা গেলে আমরা বলি তিনি দেহত্যাগ করলেন। ভারতের প্রত্যেকটি ভাষাতে এভাবেই বলা হয়। তাহলে কে দেহত্যাগ করছেন? যিনি দেহকে ত্যাগ করছেন তিনি কি দেহকে আশ্রয় করে ছিলেন? না, তিনিই মালিক। এবার শরীরের আর

কোন গুরুত্ব থাকছে না, আত্মার গুরুত্ব এসে গেল। আবার কোথাও বলবে তিনি পরলোকগামী হয়ে গেলেন। তিনিই আসল ছিলেন। দেহের কোন গুরুত্বই থাকছে না, মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হয়ে গেল। খ্রীষ্টানদের পরম্পরাতে বলে He gave up the holy host, ওদের কাছে শরীরটাই আসল সেইজন্য বলে আত্মাকে উনি ছেড়ে দিয়েছেন। আবার বলা হয় may his soul rest in peace, কারণ ওদের আত্মা একবারই এসেছে, আর কখন আসবে না।

শরীর আত্মার আধার না হলেও আত্মা কোথাও এসে বাস তো করছে? এই প্রশ্নে এসে অদ্বৈত বেদান্ত পাল্টে যায়। বেদান্ত বলবে, সূক্ষ্ম শরীর এই দেহকে আশ্রয় করে আছে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু তুমি যদি বল সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করে আত্মা আছেন, তাহলে তুমি সেই একই ভুল করবে। আপাতদৃষ্টিতে তোমার মনে হবে ঠিক, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। কেন হবে না? কারণ আত্মার একক অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব কিসের রয়েছে? আকাশবৎ। আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে দেখছি আকাশ, গ্লাশের মধ্যেও আকাশ রয়েছে, গ্লাশকে আশ্রয় করে আছে। কিন্তু তাতো নয়, গ্লাশই আকাশে আশ্রিত হয়ে আছে, আকাশে গ্লাশ অবস্থিত, গ্লাশে আকাশ অবস্থিত নয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ কিন্তু ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। আমি নিজেকে যখন বলছি আমি, যখন ভাবছি আমি আত্মা তখন মনে করছি এই শরীরের মধ্যে একটা আত্মা আছে। কিন্তু তা নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে আত্মা তার মধ্যে এই শরীর ভাসছে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, দেখলাম সেই সচ্চিদানন্দ সাগর, সেখানে বালিশ গুলো যেন উপরে নীচে ভাসছে। গঙ্গার ঢেউয়ে যদি কয়েকটা বালিশ ছেড়ে দেওয়া হয় তখন ঢেউয়ের সাথে বালিশ গুলো উপর নীচ করতে থাকবে। বালিশ উপরে গেল মানে জীবন, নীচে চলে গেল মানে জীবন শেষ। কিন্তু বালিশের সাথে গঙ্গার কোন সম্পর্কই নেই, গঙ্গা গঙ্গা, বালিশ বালিশ। ঠিক তেমনি আত্মাকে আশ্রয় করে এই দেহ রয়েছে, দেহ এক রকম খেলা করতে করতে একটা সময় সব বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা তাই দেখে আহা আহা করছি, কান্নাকাটি করছি। কিন্তু যা কিছু হচ্ছে সব আত্মাকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ আত্মার উপরে অবস্থিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা মনে করি আমি শরীর, এই শরীরে এক আত্মা আছেন, সেই আত্মা এই শরীরকে ছেড়ে চলে যায়। আচার্য শঙ্কর এটাই বলছেন, তুমি এই ভুলটা করো না, যখন তোমার জ্ঞান হবে তখন তুমি জানবে আত্মা তোমার শরীরকে কেন্দ্র করে নেই বরঞ্চ আত্মার উপরে এই শরীর অবস্থিত।

জহুদিদের ধর্মকে নিয়ে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, বাইবেলে বলছেন, ভগবান মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে সোলকে ফুঁকে দিয়েছেন। তাতে এটাই দাঁড়ায় যে আত্মা শরীরকে আশ্রয় করে আছেন। চারটে ধর্মেই বলা হয় শরীরকে আশ্রয় করে আছে, সেইজন্য ওরা বলে তিনি আত্মাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমরাও আমাদের সাধারণ ধারণা থেকে তাই বলি, কিন্তু যখন আত্মার ব্যাপারটা বলি আসলে তখন আমরা সূক্ষ্ম শরীরের কথাই বলছি। কিন্তু দ্বৈতবাদীদের কাছে আত্মা শরীরকে আশ্রয় করে থাকাই হয়, আশ্রয় করে না থাকলেও আত্মার বহুত্ব আছে। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে যখন আত্মার কথা বলা হয় তখন আত্মা সর্বব্যাপী, একরসঃ, নিত্য এই জিনিষগুলিই বলেন। এগুলো বলতে গিয়ে যাতে অন্য রকম কিছু ধারণা না হয়ে যায় সেইজন্য আচার্য পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ, যিনি বিবেকী পুরুষ তিনি সব কিছু থেকে গুটিয়ে মনকে ভেতরে নিয়ে এসেছেন তখন তিনি দেখছেন আত্মজ্যোতি বা চৈতন্যজ্যোতি। আমাদের মত লোকেরা এই কথা শুনে যেন না ভাবে যে এই দেহকে কেন্দ্র করে সেই জ্যোতি আছে। তুমি জানো চৈতন্যজ্যোতিই আছেন, গঙ্গায় যেমন সব কিছু ভেসে যায়, ঠিক তেমনি এই দেহটা সেই চৈতন্যজ্যোতির মধ্যেই ভাসছে আর ওর মধ্যেই একটা জ্যোতির কণা ঢুকে আছে। আসলে যে ঢুকে গেছে তা নয়, দেহকে আশ্রয় করে আছে তা নয়, ঐটাই আছে। পুলিশ চারিদিক থেকে অপরাধীদের আড্ডার জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। তারপর একজন পুলিশকে তাদের ডেরাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অপরাধীদের নেতা যদি বুদ্ধিমান হয় সে বলবে এখানে একা যদি ঢুকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে, তার মানে আমাদের চারিদিকে ঘিরে রেখেছে। আর যদি বোকা হয় তাহলে বলবে, এই ব্যাটা একা আছে একে শেষ করে দাও। রাবণের দরবারে অঙ্গদ দূত হয়ে গেলেন, রাবণকে বলছেন তুমি এই যুদ্ধ বন্ধ করে সীতাকে ফেরত দিয়ে দাও, শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তোমার দেহের ভেতরে সেই চৈতন্যজ্যোতি যেন দূত রূপে ঢুকেছে দেখাচ্ছে। আসলে তুমি কিন্তু তা

নও, তুমি তার থেকেও অনেক বেশি। চোখ মেলে দেখ তোমার চারিদিকে যে চৈতন্যজ্যোতির মহাসমুদ্র, এটাই ব্রহ্ম, তুমিই সেই। কিন্তু দূতের মত আসছেন। কার দূত? যাঁর শক্তি পুরোটা ঘিরে রেখেছে। যাঁরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাঁদের জন্যই এই কথা বলা হচ্ছে। আচার্য তাই এখানে বলছেন, তুমি যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হও তাহলে এটা বোঝ, এই শরীরটা আশ্রয় নয়। আচার্য উপমা দিচ্ছেন, *আদর্শস্থং মুখামিতি যদ্বৎ*, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখ দেখছি, আয়নাতে আমার মুখ দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমার মুখের আধার কি আয়না? তা কি করে হবে, আয়না প্রতিবিম্বের আধার। আমার শরীর আমার মুখের আধার। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি আয়না আছে বলে আমার এই মুখ আছে। কিন্তু তা কি কখন হয়? আয়না ভেঙে গেলেও আমার মুখটা থাকবে। শরীর ভেঙে যাক, আত্মা থাকবে, শুধু আত্মাই থাকবে না, আত্মা সর্বব্যাপী রূপেই থাকবেন, দেহের সাথে তার কিছু আসে যায় না। আমি ভাবছি আমার দেহের পতন হয়ে গেলে আমিও চলে যাব। কিন্তু তা নয়। আমি ভাবছি পঞ্চভূত দিয়ে নির্মিত এই শরীরটাই আমি, এই শরীরটা পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলে আমি শেষ। কি করে শেষ হবে? যারা বিষয়ীলোক, যারা ইন্দ্রিয় জগতে বাস করে, তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে, তুমি তোমার আমিত্বকে দেহ কেন্দ্রিক করে রেখেছে, জিনিষটা তা নয়। আয়নাতে যাকে দেখা যাচ্ছে আয়না কিন্তু তার আধার নয়, আয়না না থাকলেও সে থাকবে। আয়না ভেঙে গেলে আরেকটা আয়না নিয়ে এলে তাতে আবার মুখ দেখা যাবে। মুখের অস্তিত্ব আয়নার তুলনায় অনেক সলিড, ঠিক তেমনি শরীর সাপেক্ষে আত্মার অস্তিত্ব নয়, শরীরকে কেন্দ্র করে আত্মার কোন সম্পর্কই নেই।

যাদের বাহ্য বৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে গেছে, বাহ্য বৃত্তি শান্ত হওয়া মানে জগতের সমস্ত কামনা-বাসনার নিবৃত্তি হয়ে যাওয়া, তখন বিবেকী পুরুষ সাক্ষাৎ আত্মাকে দেখেন। কিভাবে দেখেন? *আচার্যোগমোপদেশম্ অনু সাক্ষাদনুভবন্তি*, শাস্ত্রের কথা আচার্যের মুখে শুনছেন, শোনার পর সাধনা করে তিনি সাক্ষাৎ সেটা অনুভব করেন। তাঁর মধ্যে আচার্য আর শাস্ত্রের উপদেশ থাকতে হবে। শাস্ত্র আর আচার্যের যে মত তার বাইরে যান না। এই ধীর পুরুষের কি হয়? *তেষাং পরমেশ্বরভূতানাং*, পরমাত্মার সাথে নিজেকে একত্ব বোধ করেন। যদি নিজেকে পরমাত্মার সন্তান মনে করেন, তাও সেই একই হবে, একাত্ম বোধ হয়ে যাবে। আচার্য বলছেন এই ধরণের ধীর পুরুষরাই আত্মার আনন্দ পান। আত্মার আনন্দ পাওয়ার জন্য *নিত্যং সুখম্ আত্মানন্দং-লক্ষণং ভবতি*, তাঁর আর ওঠা-নামা, উপর-নীচ বলে কিছু থাকে না। আর অন্য দিকে যারা জগতের সুখ পাওয়ার চেষ্টা করে, বাহ্য বস্তুতে যারা সুখ পেতে চায়, তার সবাই আসক্ত চিত্ত, এরাই অবিবেকী পুরুষ। সেই সুখ তাদের ভেতরেই স্বাত্মভূত রূপে বিদ্যমান, কিন্তু তারা সেই সুখের নাগাল পায় না। ঠাকুর বলছেন, সাপের মাথায় মণি কিন্তু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে। ঠাকুর আবার বলছেন, ভেতরে সোনা চাপা আছে কিন্তু তার খবর নেই। সেইজন্য সে সুখের সন্ধানে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, চোখের জল ফেলছে। অবিবেকী আর বিবেকীর এটাই তফাৎ। বিবেকী পুরুষ আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা শুনবেন, শুনে বুঝলেন শাস্ত্রে আত্মাকে এই ভাবে পরিভাষিত করা হয়েছে। এরপর সব কিছু ছেড়ে সাধনা করতে নেমে গেলেন, তারপর তাঁর পরমাত্মার জ্ঞান হয়ে গেল। পরমাত্মার জ্ঞান মানে তাঁর সাথে একত্ব ভাব। আমিও আছি তুমিও আছ এই ভাব নয়, আচার্য শঙ্কর আগাগোড়া যার নিন্দা করে গেছেন। কারণ যদি তিনি আলাদা থাকেন, তাহলে তাঁর সুখ কখন নিত্য হবে না। যদি তাঁর মনে হয় আমি পরমাত্মা থেকে দূরে চলে যাচ্ছি, আবার তাহলে তাঁর দুঃখ এসে যাবে। যদি পরমাত্মা এক আর আত্মা আরেকটা, আত্মা এক সময় বন্ধনে ছিল আর পরমাত্মা যদি মালিক হন তাহলে আজ বন্ধন চলে গেলে আগামীকাল আবার তাঁকে বন্ধনে দিয়ে দেবেন। তাহলে নিত্য সুখ কোথা থেকে হবে? নিত্য সুখ তখনই হবে যখন পরমাত্মার সাথে তার একাত্ম বোধ হবে। ছেলের মায়ের সাথে একাত্ম বোধ থাকলে মা তাকে যতই মারুক বা বকুক তাতে ছেলের কিছুই মনে হবে না।

আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে কি হয়? জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য হয়ে যায়। শ্রীমা বলছেন, ঈশ্বর দর্শন হলে কি দুটো শিং বেরোয়! জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য মানে নিত্য সুখ, জগতের কোন কিছুই তাঁকে বিরক্ত করতে পারবে না। কিন্তু এটা কারা দেখতে পান? একমাত্র যিনি আত্মস্থ, *আত্মস্থম্* এর একটাই শর্ত, বাইরের সমস্ত বৃত্তিকে থামিয়ে দাও। ধীর পুরুষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা শুনেছেন, তখন তিনি দেখেন একাত্ম ভাব। তার আগে যতই কিচিরমিচির করুক, ঠাকুরের দোরগড়ায় যতই পড়ে থাকুক, যতই বলুক, শেষ সময় ঠাকুরই দেখবেন, কাউকেই দেখেননি তোমাকেও দেখবেন না। কিসের সাথে একাত্ম ভাব, আত্মভাব কার

সঙ্গে? বলছেন, *একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি*, যিনি সর্বব্যাপী, সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, সবারই যিনি আত্মা আর যিনি এক হয়েও বহু রূপে ভাসিত, তাঁর সাথে একাত্ম ভাব হয়ে যায়। এই একাত্ম ভাব হলে তবেই শ্বাশত সুখ। আমরা বলি চিতায় উঠলেই শান্তি। চিতায় উঠেও শান্তি হয় না, আত্মহত্যা করে চিতায় উঠলে ভূত হয়ে প্রেতযোনিতে গিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে কোন ঠিক নেই, পাপ করে চিতায় উঠলে নরকে যাবে, না হয় তির্যক যোনিতে যাবে, আর ভালো কিছু করে চিতায় উঠলে ঘুরে মনুষ্য যোনিতে জন্ম নিয়ে আবার প্রথম থেকে এবিসিডি শিখতে হবে। *পুনরপি জননং পুনরমি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্*, সবটাই অশান্তি। শান্তি এক জায়গা থেকেই আসবে, যখন নিজেকে আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। যত দুঃখ-কষ্ট আসুক, অশান্তির তোড় আসুক শুধু এক চিন্তন, আমি সেই আত্মা, যিনি সর্বভূতান্তরাত্মা, সব কিছুর রাজা। ভালো লোকের আত্মাও আমি, দুষ্ট লোকের আত্মাও আমি, আবার কুকুর, বেড়াল, গরুর আত্মাও আমি, সাপ বিছের আত্মাও আমি। এটাই সত্য, এরপর কাকে আমি মারতে যাব আর কাকেই বা ভালোবাসতে যাব! Assisi র সেন্ট ফ্রান্সিস একবার চার্চে সারমন প্রীচ করছিলেন আর সেই সময় চড়ুই পাখিগুলি ভীষন রকমের কিচিরমিচির করছিল, তখন সেন্ট ফ্রান্সিস চড়ুই পাখিদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলছেন, Sister sparrows, I am going to talk about God let me have my say and then you can talk, now please be quite, নিমেষের মধ্যে সব পাখিগুলি চুপ করে গেল। তারপর তিনি বক্তৃতা দিয়ে চললেন, এক ঘন্টা বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি বলছেন ‘Sister sparrows! My talks are over, now you can talk বলতেই চড়ুই পাখিগুলি সঙ্গে সঙ্গে আবার কিচিরমিচির শুরু করে দিয়েছে। এগুলো একটা যৌগিক শক্তি। তিনিও বোধ করছেন চড়ুই পাখিরাও আমার বোন, কারণ তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান রূপে দেখছেন। এখানে তা বলছেন না, তুমিই ওটা। সাপকে দেখে কিংবা একটা ঘেয়ো কুকুরকে দেখে বলবেন এটা আমারই প্রতিরূপ আবার নরেন্দ্র মোদিকেও দেখে বলবেন এতো আমারই প্রতিরূপ।

সবাইকে বলা হয়, ভালো হওয়াটাই উদ্দেশ্য। কিসের উদ্দেশ্যে ভালো হওয়া! বেদান্তের দৃষ্টিতে ভালোও নেই মন্দও নেই, বেদান্ত সবাইকে এমন এক উচ্চাবস্থায় নিয়ে চলে যায় যেখানে দেখছে জগতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সেখানে ভালো কে, আর মন্দই বা কে! ভালো আর মন্দ আসে যেখানে একটা তুলনা থাকে। অপর বলে যেখানে কিছু নেই সেখানে কার সাথে কার তুলনা হবে! যেখানে দুই বোধ সেখানেই ভালোবাসা আর মন্দবাসা থাকে, কিন্তু যেখানে দুই নেই সেখানে কে কাকে ভালোবাসবে আর কাকেই বা মন্দ ভাববে! এটাই বাস্তব। আপনার আদরের নাতি যদি আপনার চুল ধরে টানে, আপনি সবাইকে বলবেন, দেখো আমার চুল টানছে। সবাই বুঝতে পারছে আপনি নাতির কথা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। কিন্তু বাচ্চারা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি করে তখন বড় ভাই মাকে বলবে, মা দেখো ভাই আমার চুল টানছে বা ছোটভাই চেঁচাবে, দেখো দাদা আমাকে মারছে। জগৎ থেকে আমরা যদি কষ্ট পাই আমরা সেই কষ্ট নিতে পারি না। কিন্তু যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে তিনি তখন বলছেন, প্রভু তুমি এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না এরা কি করছে। এটাই একাত্ম বোধ, তিনিও ভগবানের সন্তান, এরাও ভগবানের সন্তান। কিন্তু এরা অবোধ, এরা বুঝতে পারছে না কি করছে। বেদান্ত এভাবেও দেখছে না, বেদান্তে আত্মা ছাড়া কিছু নেই, আর তুমিই সেই আত্মা, সেইজন্য জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব তুমি। কিন্তু এই ভাবকে সংসারীদের পক্ষে জীবনে নিয়ে আসা খুব কঠিন। সংসারীদের এসব কথা বললে তারা অন্য রকম মনে করতে পারে, তাই সব জায়গায় সব কথা বলা হয় না। আচার্য শঙ্কর বলছেন সন্ন্যাস ছাড়া এই জিনিষ হয় না, স্বামীজী অবশ্য আচার্যের কথাকে সমর্থন করছেন না। সন্ন্যাসীরাও একটা অবস্থায় জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা হওয়ার পর মনে করেন, সত্যিই তাই সন্ন্যাস ছাড়া *আত্মস্থম্* হওয়া সম্ভবই নয়। সন্ন্যাস বলতে সর্বত্যাগ, ত্যাগ ছাড়া সম্ভই নয়। কিন্তু এই ত্যাগ স্বাভাবিক ত্যাগ হতে হয়, জোর করে ত্যাগ করলে হয় না। ঠাকুরও বলছেন, যার যখন সময় আসে ঠাকুর নিজে সেটা করিয়ে নেন। মূল কথা হল অবিদ্যার ব্যবধান মানে একটা পর্দা যেন টেনে দেওয়া হয়েছে, মানুষ তাই নিজের স্বরূপ দেখতে পায় না, বুঝতেও পারে না। যিনি ধীর পুরুষ, বিবেকী, তাঁর কাছে ঐ পর্দাটা সরে গেছে।

আমাদের বলা হয় শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণকে জীবনে অনুসরণ কর। সংসারীরা সন্ন্যাসীদের চোখের সামনে দেখতে পায়, আর সন্ন্যাসীদেরই তারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এতক্ষণ বেদান্তের যে উচ্চতম আদর্শের কথা বলা হল, সেই আদর্শের দৃষ্টান্ত একমাত্র সন্ন্যাসীরাই হতে পারেন, কিন্তু বেশির ভাগ সন্ন্যাসীদের আচরণের

মধ্যে আমরা সেই একাত্ম ভাব দেখতে পাই না। আমাদের কাছে যদি কোন দৃষ্টান্তই না থাকে তাহলে আমরা কার আচরণ জীবনে অনুসরণ করব? এই জিনিষটাকে আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার, যদিও এর আগে এই নিয়ে কয়েকবার আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের যা যা আচরণ ও ব্যবহার করতে বলা হয়, সেগুলোকেই বলা হয় ethics, সাধারণ ভাষায় বলা হয় conduct। প্রাথমিক ভাবে শাস্ত্র থেকেই ethics আসে। জহুদি ও মুসলমান এই দুটো পরম্পরা মধ্যপ্রাচ্য এশিয়াতে খুব শক্তিশালী। জহুদিদের মোজেস বলছেন, জেহবা (জহুদিদের ভগবান) তাঁকে written instructions দিয়েছেন, এটাকে বলে written law। তার সাথে তাঁকে কিছু মৌখিক আদেশ দিয়েছেন। সেই আদেশ বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমান জহুদি ধর্মে ৬৩১টি আদেশে এসে দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলিকে বলা হয় ভগবানের আদেশ, তার আবার ব্যাখ্যাও আছে। তার মানে সদাচারের পরিভাষা হল ভগবানের লিখিত আদেশ। একই জিনিষ ইসলামে অন্য ভাবে এসেছে। আল্লা মহম্মদকে বলেছেন, সেগুলোই কোরানে লিখিত আকারে দেওয়া হয়েছে। কোরান তাই আল্লার কথা, যদিও লিখিত দেননি কিন্তু আল্লা নিজে মহম্মদকে বলেছিলেন। এবার জহুদিদের জেহবার কথা আর মুসলমানদের আল্লার কথায় যদি বিপরীত কিছু থাকে তাহলে কে ঠিক করবে কোনটা ঠিক? তখন দুজনেই তলোয়ার বার করে নিয়ে বলবে, ফয়সালা হয়ে যাক তোমার জেহবা ঠিক বলছেন না আমার আল্লা ঠিক বলছেন। তাহলে ethics, personal habits, social habits এগুলো কোথা থেকে নির্ধারিত হচ্ছে? ভগবানের কথা থেকে। যিশু সেখানে একটা তৃতীয় জিনিষ নিয়ে এলেন, যিশুর কাছে ঈশ্বরকে ভালোবাসাটাই মূল। তিনি যখন Surmon on the mount দিলেন, যেটা খ্রীষ্টান ধর্মের মূল, পুরো জিনিষটাকে তিনি পরিভাষিত করলেন ঈশ্বরকে ভালোবাসা দিয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালোবাসতে গেলে মানুষকে কি রকম হতে হবে। হিন্দুদের আচার ব্যবহার যেভাবে পরিভাষিত হয় বৌদ্ধ ধর্মেও অনেকটা সেভাবেই হয়। মনুস্মৃতি যেটা বলছে সেটাই আমাদের আচরণ। কিন্তু মনু বাবা তো ভগবান নন, কিন্তু তিনি বলছেন এই কথাগুলো ব্রহ্মার কাছে তিনি শুনেছিলেন। ঘুরে ফিরে সেই ভগবানের কাছেই চলে গেল। মনু বাবার মত অন্যান্য স্মৃতিকাররাও বলছেন তাঁরাও ব্রহ্মার কাছে শুনেছেন। আমাদের এখানে ইদানিং চল্লিশটির উপর স্মৃতিশাস্ত্র আছে, বাংলায় খুব নামকরার স্মৃতি রঘুনন্দন স্মৃতি, একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছে। সব স্মৃতিশাস্ত্রকে যদি এক জায়গায় জড়ো করা হয় একটা ঘর ভর্তি হয়ে যাবে। এবার আমরা কিভাবে স্মৃতিকে পালন করব? আমরা সুবিধার্থে আমাদের আলোচনা মনুস্মৃতিতেই আবদ্ধ রাখছি।

মনুস্মৃতি, জহুদি ধর্ম, ইসলাম আর খ্রীষ্টান ধর্ম এই চারটেকে মেলাতে গেলে মনস্মৃতি তখন খুব মজার শাস্ত্র হয়ে যাবে। যিশু খ্রিষ্ট যেমন বলছেন ঈশ্বরকে ভালোবাস, সেখান থেকেই তিনি সব কিছুকে পরিভাষিত করছেন। ওদিকে জহুদিরা বলছে ভগবানের কাছে শোনা। মনুস্মৃতিতে এই দুটো জিনিষকে একসাথে মেলানো আছে। একদিকে তিনি নিচ্ছেন সিদ্ধান্ত অন্য দিকে তিনি বলছেন ব্রহ্মা থেকে আমি এই কথা শুনেছি। এখন মোজেস এই কথা ভগবান থেকে পেয়েছিলেন কিনা আমাদের জানার কথা নয়, মহম্মদকে আল্লা বলেছিলেন কিনা আমরা কোথা থেকে জানব, তিনি বলছেন আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। একই কথা মনুও বলছেন। আগামীকাল কোন সন্ন্যাসী যদি বলেন, আমাকে ঠাকুর এই কথা বলেছেন, আমরা মানতে বাধ্য হব।

এরপর আরেকটা পথ বেরোল। স্বামীজীর সময় কিছু দার্শনিক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল, এনারা একটা যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন, তাঁরা বলতে শুরু করলেন, আমাদের আচার ব্যবহার মানুষের ভালো হওয়া, মঙ্গল হওয়াকে কেন্দ্র করেই হবে। স্বামীজী এই মতকে তুলোধুনো করে বলছেন, মানুষের ভালো, অপরের ভালো আমি কেন দেখতে যাব? এটা আবার একটি পৃথক আলোচ্য বিষয়। খুব সংক্ষেপে হল, যদি কোন ethicsকে দাঁড় করাতে হয় তাহলে তার পেছনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসতে হবে। জহুদি ধর্ম আর ইসলামের ধর্মের সব থেকে বড় সীমাবদ্ধতা হল, এদের অনেক কিছু যুক্তি বা সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়ায় না। তাঁরা বলছেন ভগবান আমাকে এই রকমটি বলেছেন। প্রথম কথা আদৌ ভগবান আছেন কিনা তাতেই অনেকের সন্দেহ। দ্বিতীয় যদি থাকেনও তাহলে তিনি তোমাকে আদৌ বলেছেন কিনা তার উপরও আমাদের সন্দেহ। তৃতীয় তিনি তখনকার দিনে বলেছিলেন নাকি এখনকার দিনে বলেছেন তাতেও সন্দেহ। সন্দেহ করতে করতে সব কিছু গুলিয়ে গিয়ে বলছে, আমার এসব কিছুই লাগবে না। যখন একটা

সিদ্ধান্ত নিয়ে আসবেন, যে সিদ্ধান্তের উপর ethics চলবে তখন এই সমস্যা থাকবে না। সিদ্ধান্ত কিভাবে আসবে? যিশু যেমন বললেন, ঈশ্বরকে ভালোবাস। ঈশ্বরকে যদি ভালোবাসতে হয় তাহলে তাঁর যাবতীয় যা কিছু আছে তাকেও তোমাকে ভালোবাসতে হবে। এই সিদ্ধান্তের উপর খ্রীষ্টান ধর্মের ethics বেরিয়ে এল। খ্রিশ্চানিটিকে তাই best ethics বলা হয়। যার জন্য যিশু বলছেন, তুমি মন্দিরে ঈশ্বরের পূজো দিতে যাচ্ছ কিন্তু তার আগে তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়াটা মিটিয়ে এস, তবে তুমি মন্দিরে ভগবানের কাছে যেও। এর পেছনে একটা সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু ইসলাম বা জহুদিদের ধর্ম দিয়ে গেলে সেখানে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না। ঈশ্বর আমাকে এই রকমটি বলেছেন তোমাকে এই রকমটি করতে হবে।

কিন্তু বেদান্ত যেভাবে চলে তার পেছনে একটা সিদ্ধান্ত থাকে। আসলে হিন্দু ধর্মের ethicsএ এসে অন্য ধরণের সমস্যা এসে যায়। হিন্দুদের তিনটে মত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর দ্বৈত বা এই তিনটেকে যদি কমিয়ে দুটোতেও নিয়ে আসা হয় তখন ভগবানের সাথে আমাদের অনেক রকম সম্পর্ক এসে যায়, মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান রূপে দেখে, ঈশ্বরের দাস দেখে বা ঈশ্বরের সঙ্গে এক দেখে। কিন্তু পুরো জিনিষটাকে মেলালে একটা জিনিষই আসে, কোথাও আমাদের ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ আছে। যদি আমার একাত্ম বোধ থাকে, তাঁরও একাত্ম বোধ আছে। বিশিষ্টাদ্বৈত আর দ্বৈতে এসে সিদ্ধান্ত অনেকটা খ্রিশ্চানিটির দিকে যেতে শুরু করে। অদ্বৈতকে নিলে জিনিষটা আরও সহজ হয়ে যায়। দ্বৈত মতে ঈশ্বর আমার ভেতরেও আছেন আবার তার ভেতরেও আছেন, আমিও ঈশ্বরের সন্তান সেও ঈশ্বরের সন্তান। তখন আবার বলবে, আমরা যদি ঈশ্বরের সন্তান হই, বাড়িতে ভাইয়ে ভাইয়ে হামেশাই লড়াই হয়। এগুলো দুর্বুদ্ধিও নয়, একেবারে দুষ্ট বুদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত মতে বলবে, ভালো-মন্দ যা কিছু হয়ে আছে আমিই হয়ে আছি। সন্ন্যাসীদের একটা মন্ত্র আছে, *অভয়ং সর্বভূতেভ্য মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে,* সমস্ত প্রাণীকে আমি অভয়দান দিচ্ছি। এই মন্ত্রে প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে অঙ্গীকার করতে হয় যে, আজ থেকে আমি সবাইকে অভয় দান করলাম। কেন অভয় দিচ্ছেন? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার থেকেই বেরিয়েছে। তাহলে সন্ন্যাসীর ethics কি রকম হবে? ঠিক এই মন্ত্রকে কেন্দ্র করেই তাঁর ethics হবে। মায়ের যেমন সব সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, করুণা থাকে, সন্ন্যাসীরও সবারই প্রতি করুণা থাকবে। কিন্তু আমাদের বাস্তবিকতাটা কি? বাস্তবিকতা হল আমরা অতি সাধারণ মানুষ, ভালো-মন্দ অনেক রকম সংস্কার নিয়ে এসেছি, নিজের স্বার্থ ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না। এখানে এসে মানুষের তিনটে শ্রেণী হয়ে যাবে। একটা শ্রেণী হল, রাস্থায় যাদের দেখছি, তারা জানেও না, বোঝেও না, মানেও না। যতটুকুতে পুলিশ ধরে না নিয়ে যায় আর পাড়ায় সবাই ছ্যা ছ্যা না করে, বাকি সব কিছু নিজের মত করবে। দ্বিতীয় হল struggelers, যারা struggle করে যাচ্ছে। তৃতীয় হল যাঁরা প্রতিষ্ঠিত। আমরা হলাম struggelers, আমার বাস্তবিকতা হল আমি এই, আমার মধ্যে দুর্বলতা আছে, আমি রেগে যাই, অপরের জিনিষ দেখলে আমার লোভ হয়, অনেক কিছু দেখলে মনে হয় আহা আমারও যদি হত। অন্য দিকে রয়েছে আদর্শ, যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত তিনি কখন দুর্বলতার দৃষ্টি নিয়ে কারুর দিকে তাকাতে পারেন না। এরপর লড়াই চলতে থাকবে, একশবার চেষ্টা করবে নিরানব্বুই বার পড়ে যাবে কিন্তু একবার সফল হবে। আবার চেষ্টা করবে, আবার পড়বে আবার সফল হবে, এই করে করে শক্তি বৃদ্ধি হবে।

এবার যদি কেউ বলে একত্বের দৃষ্টান্ত বাস্তবে দেখা যায় না। তা কিন্তু নয়, একত্বের দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি রয়েছে, হয় তুমি দেখে দেখতে চাইছ না। যিশুকে ক্রুশিফাই করা হচ্ছে তিনি বলছেন, প্রভু! তুমি এদের ক্ষমা কর। এটাই তো একত্বের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। ভারত পরিক্রমার সময় স্বামীজী দেখছেন এক ভাঙ্গী তামাক খাচ্ছে, স্বামীজীর ইচ্ছে হল তামাক খাওয়ার। তার কাছে তামাক চাইলে সে বললে আমি নীচু জাতি। স্বামীজী সেখান থেকে চলে গেলেন। কিছ দূর গিয়ে তাঁর মনে পড়ল আমি তো সন্ন্যাসী। স্বামীজীর মত মানুষও গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই তাঁর চেতনা এল, আমি ভুল করছি। আবার তিনি পুরোটা পথ ফেরত গেলেন, ভাঙ্গীর হাত থেকে তামাকের ছিলিম নিয়ে টানতে লাগলেন। আগে আমাদের ঠিক করতে হবে আমাদের জীবনে কোন সিদ্ধান্ত আছে কি নেই, আমাকেই ঠিক করতে হবে আমার সিদ্ধান্ত কি। কেউ বলবে আমার পরিবারের যা সিদ্ধান্ত সেটাই আমার সিদ্ধান্ত। বাড়ির লোকেরা যদি মিথ্যে কথা বলে সেও মিথ্যা কথা বলবে, বাড়ির লোকেরা যদি পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া করে সেও ঝগড়া করবে। বেশির ভাগ লোকের জীবন এভাবেই চলছে। সিদ্ধান্তের উপর জীবন কখন এভাবে চলে না। আমাকেই ঠিক করতে হবে আমি

নিজেকে ঈশ্বরের সাথে কিভাবে দেখতে চাই। যদি দেখি আমি ঈশ্বরের সাথে এক, ব্রহ্মাত্মৈক্য, আমি সর্বভূতের আত্মা রূপে বিরাজমান, তখন দেখব আমার থেকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বেরিয়েছে। আমি তাই কারুর প্রতি লোভ করতে পারি না, কারুর প্রতি ক্রোধ করতে পারি না। অন্য দিকে আমি যদি দেখি আমি ঈশ্বরের সন্তান, তখন সবাইকেই ঈশ্বরের সন্তান রূপে দেখব। আমি তাই কারুর সাথে ঝগড়া, মারামারি করতে পারি না। কিন্তু তাও করব, কারণ জানার আগে পর্যন্ত আমার ভেতরটা তো স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষে গিজগিজ করছে। তাই লড়াই চলতে থাকবে, দশবার পড়ে যাব একবার উঠে দাঁড়াব। তাই বলে আদর্শকে কখনই ছেড়ে দেওয়া যাবে না। শুধু ভারতবর্ষেই নয় সারা বিশ্বে এই ধরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। বেশি দূর যেতে হবে না, চোখের সামনে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবন রয়েছে, ঠাকুরের পার্ষদের সবারই এই রকম জীবন, যে কোন মহাত্মা মুনি ঋষিদের এই রকমই জীবন। দু-চারজন সন্ন্যাসী আর বাবাজীকে দেখে তো পুরোটা বিচার করা যাবে না।

বাচ্চা বয়স থেকে সবাই মায়ের আঁচল ধরে বড় হয়েছে, কিন্তু এখনও মায়ের আঁচল ধরে চলার অভ্যাসটা যায়নি। স্বনির্ভরতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনে চলার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের লক্ষ্য খুব সামান্য, একটা ভালো জীবন চালাতে চাই, বলুন আমাকে কি করতে হবে। গুরু বলে দিলেন সকাল বিকাল একশ আট আর পারলে বেশি জপ করবে। কিন্তু আমরা একশ আটেই দাঁড়িয়ে থাকব, গুরু একশ আট বলে দিয়েছেন। একশ আট না বলে হাজার জপ করতে বললে হাজার জপই করত। হাজার বার না করে নশ নিরানব্বুই করলে গুরুর কাছে এসে কেঁদে কেঁদে বলবে, আমার একটা কম হয়ে যাচ্ছে আমি কি করব? গুরু বললেন, সকাল বিকেল ঠাকুরের সামনে পাঁচবার কান ধরে ওঠবোস করবে। তাতেই খুশীতে লাফাবে, এত বড় মহাত্মা হতেই পারে না, ঈশ্বরের কাছে পাঁচবার কান ধড়ে ওঠবোস করা কত সৌভাগ্যের! একটি নষ্টা মেয়েকে পাথর মারার জন্য চারিদিকে লোকেরা ঘিরে আছে। যিশু গিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জীবনে যে কোন পাপ করেনি সে আগে মেয়েটিকে পাথর মারবে। অর্থ হল, জগতে সবাই পাপী। সবাই এক এক করে চলে গেল। মেয়েটি তখন যিশুকে বলছে, আপনি তো কোন পাপ করেননি আপনিই আমাকে পাথরটা মারুন। এই হল মানসিকতা, এই মানসিকতা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। মেয়েটি বলছে না যে, আমি কৃতজ্ঞ আপনি আমাকে রক্ষা করলেন, কিন্তু বলছে, আপনি তো কখন পাপ করেননি তাহলে আপনিই আমাকে পাথরটা মারুন। আঁচল ধরে বড় হওয়া থেকে মানুষ বেরোতেই পারে না। যিশু বললেন, Go and sin no more, Father in Heaven has forgiven you। এরপর আর কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে মেয়েটির মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আমাকে তো পাথর মারল না। যিশু মেয়েটিকে একটা পাথরের টুকরোও যদি মেরে দিতেন মেয়েটির শান্তি হয়ে যেত। এটাই মানুষের স্বভাব, নির্দিষ্ট করে বলে দিতে হবে, তুমি এইটি করবে না। ব্যস, এরপর আর কিছু ভাবতে হবে না, কি সাংঘাতিক গুরু, সিদ্ধপুরুষ, তিনি করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু যদি বলে দিতেন, তুমি ঈশ্বরে মন দাও, তোমার সব পাপ ঘুচে যাব, আর সে মাথায় নিতে পারবে না।

ভগবান তোমাকে বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু যেমনটি তিনি দিয়েছেন তাঁকে তেমনটিই ফেরত দিয়ে বলছ, প্রভু! আপনি যেমনটি দিয়েছিলেন তেমনটিই আপনাকে ফেরত দিতে পেরে আমি সন্তুষ্ট, এর একটুও খরচ করিনি। প্রভু কি খুব খুশী হবেন? মোটেই না, পরের জন্ম গরু ছাগল করে পাঠাবেন, ওদের বুদ্ধির কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবানের দেওয়া বুদ্ধিটা তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। তোমার সাথে একমাত্র ভগবানের সম্পর্ক আর কারুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উপনিষদ কি বলতে চাইছে একটু বোঝার চেষ্টা কর। উপনিষদ বলছে সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে সেই এক চৈতন্য সত্তা বিরাজ করছেন। যিশু বলছেন, তুমি যেমন নিজেকে ভালোবাস ঠিক তেমনি অপরকেও ভালোবাস। কেন অপরকে ভালোবাসতে যাব? তোমরা দুজনেই ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু বেদান্ত বলছেন তুমিই সেটা হয়েছ। অপর কারুর যদি কষ্ট হয় সেটা তোমার নিজের কষ্ট। স্বামীজী বক্তৃতায় বারবার এই কথাই বলছেন, অপরের কষ্ট তোমার কষ্ট কারণ তুমিই সে হয়ে রয়েছ। এখান থেকেই ethics আসে। তুমি বাইরে দৃষ্টান্ত খুঁজতে যেও না, তুমি নিজেই বেদান্তের দৃষ্টান্ত হও। যত নেতা, শিক্ষক, যত মা-বাবারা আছেন এরা কেউই নেতা নয়, কেউই শিক্ষক নয়, কেউই মা-বাবা নয়, সবাই ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক পুলিশ যেমন একবার হাত বাঁ দিকে নিয়ে যায় আরেকবার ডান দিকে নিয়ে যায়, এরাও সবাই একবার হাত দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দেখাচ্ছে, আরেকবার হাত দিয়ে স্বামীজীর দিকে দেখাচ্ছে। তোমার আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, তোমার আদর্শ নেতাজী, গান্ধীজী। এটা কেউ বলছে না, তোমার

আদর্শ আমি, আমাকে তুমি অনুসরণ কর। কলকাতায় এত এত নেতা, এত সন্ন্যাসী, এত শিক্ষক, এত মা-বাবারা আছেন, কারুর বুকের পাটা আছে যে যিনি বলছেন আমি তোমাদের আদর্শ, তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, তোমরা আমার মত হও। একজনও নেই। কেন? সব পিনপিনে স্বভাবের।

দৃষ্টান্ত চান! কত দৃষ্টান্ত দেখবেন? শত শত দৃষ্টান্ত আছে। একজন বৃদ্ধ মহারাজের ক্যান্সার হয়েছে। ওনাকে বলা হল আপনাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হবে। উনি বলে দিলেন আমি এখানেই থাকব। না, আপনার এখানে কষ্ট হচ্ছে। উনি রীতিমত রেগে গিয়ে বলছেন, What! I am not this body; I am Atman! উনি একা নন, এখনও কত মহারাজরা সেবা প্রতিষ্ঠানে যেতে চান না। একজন সন্ন্যাসীকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই ওনার শরীর খারাপ হয়ে যেত। শরীরের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে চলে গেছে। ঠিক হল যে করেই হোক সকাল দশটার সময় ওনাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হবে। দশটার সময় গাড়ি লাগানো হবে আর সাড়ে নটার সময় তাঁর শরীর চলে গেল। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। উনি বলছেন, এবার আমার শরীর যাবে আমাকে বেলুড় মঠে ফেরত নিয়ে চল। বলা হল ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট চলছে। না, আর ট্রিটমেন্টের কিছু নেই, আমাকে এবার ফেরত নিয়ে চল। সহ সম্পাদক মহারাজ কিছু বলতে গেছেন, উনি তাঁকে সরাসরি বলছেন, তুমি কি চাও আমার শরীর হাসপাতালে যাক? বেলুড় মঠে ফেরত নিয়ে আসা হল, তারপরেই ওনার শরীর চলে গেল। কত দৃষ্টান্ত দেখতে চান? শত শত দৃষ্টান্ত আছে। এত দৃষ্টান্ত না দেখে আগে তুমি বল যে, আমি দৃষ্টান্ত হব, আমার ছেলের কাছে, আমার নাতির কাছে আমি দৃষ্টান্ত হব, পাড়ার লোকেদের কাছে আমি দৃষ্টান্ত হব। নকল করতে গিয়েই আমাদের সর্বনাশ বেশি হয়। স্বামীজীও বলছেন, মহাপুরুষরা জগতের বেশি ক্ষতি করেছেন। কারণ মানুষ তাঁদের মত নিজেকে ঢালতে যায়, ঢালতে পারে না, হতাশা আসে, হতাশা থেকে জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়। এটাই আমাদের সর্বনাশের কারণ। সেইজন্য দৃষ্টান্ত না খুঁজে নিজেই দৃষ্টান্ত হও। কোন শাশুড়ী নিজের পুত্রবধুকে বলতে পারবে, তোমাকে মা সারদার মত হতে হবে না, তুমি আমার মত হও? বেলুড় মঠে উপেন মহারাজ ছিলেন, একশ এক বছর বয়স হয়ে গেছে, সন্ন্যাসীরা তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন 'কি কেমন আছ'? 'ভালো আছি মহারাজ'। উনি সঙ্গে সঙ্গে জোর গলায় বলে উঠতেন 'কী ভালো আছ বলছ! এত বছর সন্ন্যাস জীবন কাটিয়ে এখনও তোমার আত্মজ্ঞান হল না, ঈশ্বর দর্শন হল না, জীবনমুক্ত হতে পারলে না আর তুমি বলছ ভালো আছ'। একশ এক বছর, কি রকম সজাগ! ভাবা যায়! অপরকে নকল করে কিছু হবে না, নিজেকে আগে দৃষ্টান্ত কর। গাধা যেমন মানুষের ভার বহন করে ঠিক তেমনি মানুষ দেবতাদের বোঝা বহন করে বেড়ায়। যাঁকে তুমি আদর্শ করবে সারাটা জীবন নিজের পিঠে তাঁর ছবি সাজিয়ে ঘুরতেই থাকবে আর যেমন গাধা ছিলে তেমন গাধাই থাকবে। স্বামীজী বলছেন, তোমাদের ঠাকুর মৌলিক ছিলেন তোমরাও মৌলিক হও। মৌলিক হওয়া মানে, এই এই সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তকে আমি নিলাম, নিয়ে নিজের জীবনকে গঠন কর এবং নিজের একটা স্বতন্ত্র জীবন দাঁড় করাও। এর মত হও, তার মত হও যারা বলে তাদের মত নিকৃষ্ট লোক আর কোথাও নেই। আমরা তাহলে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, যিশু, শ্রীকৃষ্ণ এদের কেন পূজা করছি? কারণ এনারা সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যের একত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অথচ কেউ কারুর মত ছিলেন না, কেউ কাউকে নকল করে মহৎ হননি। যে কোন দুজন মহাপুরুষকে নিয়ে আসুন যাঁদের বলতে পারবেন এই দুজন একই রকম, একটিও পাওয়া যাবে না। যারাই অপরকে নকল করতে গেছে তারাই গোত্তা খেয়েছে। যারাই নিজের স্বাতন্ত্রতাকে নিয়ে এগিয়ে গেছে তারা একটা সিদ্ধান্তকে নিয়ে নিজের মত এগিয়ে গেছে। আমরা এখানে উপনিষদ অধ্যয়ন করছি, আমাদেরও সিদ্ধান্তকে ধরতে হবে। সিদ্ধান্তকে যদি আমরা ধরি আমরাও মহৎ হব। আমরা এখানে যে মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করছি, এটাও একটা সিদ্ধান্ত বাক্য। কি বলছেন –

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।২/২/১৩।।

(সকল অনিত্য বস্তুর যিনি কারণশক্তি, সচেতনদেরও যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি অদ্বিতীয় হয়েও বহু জীবের কর্মফল বিধান করেন, তাঁকে যেসব ধীমান্ গুরুবাক্যানুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে দর্শন করে তাঁদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কারও হয় না।)

কঠোপনিষদের সব মন্ত্রই অতি উচ্চমানের, কিন্তু এই মন্ত্রটি বিশেষ ভাবে একটি অত্যন্ত উচ্চমানের মন্ত্র। অনিত্য যা কিছু আছে তার মধ্যে তিনি নিত্য। অনিত্যের মধ্যে নিত্য, উপনিষদ কি বলতে চাইছেন? আচার্য শঙ্কর যখনই পরমাত্মা বা ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি এই জিনিষটাকেই নিয়ে আসেন। যখন আমরা কোন জিনিষকে বলছি এটা আছে, তখন সব সময় দুটো বুদ্ধি দেখা যায়। একটা বুদ্ধি থাকে অনিত্য পদার্থকে নিয়ে এবং আরেকটা বুদ্ধি থাকে নিত্য পদার্থকে নিয়ে। যেমন, বলা হল টেবিলে গ্লাশ আছে। এবার টেবিলকে সরিয়ে দিয়ে গ্লাশ আছে বললে এই দুটো জিনিষ এসে যাবে। এর মধ্যে দুটি বুদ্ধি চলে, প্রথম বুদ্ধিকেই সবাই নেয় দ্বিতীয় বুদ্ধিকে কেউ নেয় না। প্রথম বুদ্ধি হল গ্লাশ, গ্লাশ অনিত্য, গ্লাশ এক সময় ভেঙে যাবে বা গ্লাশ হওয়ার আগে গ্লাশটা ছিল না আর গ্লাশ ভেঙে যাওয়ার পর গ্লাশ থাকবে না। কিন্তু গ্লাশ আছে যখন বলছি, এই আছে মানে অস্তি। অস্তি মানে যেটাকে অস্তিত্ব বলে, এই অস্তিত্ব বোধ আর গ্লাশের অস্তিত্ব বোধ এই দুটো বুদ্ধি একই সঙ্গে চলে। আমরা যখনই কোন কথা বলছি, কোন চিন্তা-ভাবনাকে স্পষ্ট করছি বা কোন চিন্তা করছি, তখন দেখা যাবে এই দুটি ভাব আমাদের মধ্যে সব সময় চলছে। একটাকে বলে অস্তি বুদ্ধি আরেকটাকে বলে বস্তু বুদ্ধি, এই দুটো সব সময় একসাথে চলে। যেমন ফুল আছে, একটা হল ফুল জিনিষটা আর তার মধ্যে আরেকটা হল অস্তিত্ব জিনিষটা। ফুলের নিজস্ব যে অস্তিত্ব, এই অস্তিত্ব অনিত্য, কিন্তু অস্তিত্ব জিনিষটা থাকবে। যেমন এখানে ক্লাশ চলছে, অনেকের রেকর্ডিং যন্ত্র টেবিলে আছে। ক্লাশ শেষ হয়ে গেলে টেবিল থেকে রেকর্ডিং যন্ত্রগুলো সব চলে যাবে, কিন্তু গ্লাশটা থেকে যাবে। কিছুক্ষণ পর গ্লাশটাও চলে যাবে কিন্তু টেবিলটা থেকে যাবে। তার মানে অস্তিত্ব, এই আছে ব্যাপারটা সব সময় থাকছে। এই অস্তি ভাবকে ধীরে ধীরে আমরা যদি সরাতে থাকি, যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবই অনিত্য, সব কিছুই এক এক করে একদিন নাশ হয়ে যাবে। নাশ হয়ে কি হবে? সব কসমিক এনার্জিতে চলে যাবে, তখন বলবে কসমিক এনার্জি আছে, তার মানে অস্তি তাও থেকে গেল। কসমিক এনার্জিও এক সময় চলে যাব। তাহলে ঐ এনার্জির নীচে কে আছে? এখানে এসে বিভিন্ন মতে পাল্টে যাবে। আচার্য শঙ্কর বলবেন, তার পেছনে যেটা আছে এটাই সেই পরম শুদ্ধ সত্তা, এটাই সেই পিওর সৎ, এই সৎ থেকেই বলা হয় সচ্চিদানন্দ। খ্রীষ্টানরা একেই গড্ বা অন্য ভাবে পরিভাষিত করবে। রামানুজাদিরা এটাকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করবে, তাঁরা বলছেন সৎ জিনিষটা ঈশ্বরের গুণ। আচার্য শঙ্কর বলবেন, এটা তাঁর গুণ নয়, তাঁর স্বরূপ, স্বরূপও নয় এটাই তিনি। আমাদের বুদ্ধিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে কোন বস্তুতে যে দুটো জিনিষ খেলা করছে, যেমন নদী আর তার ঢেউ, ঢেউ খেলা করছে, ঢেউই অনিত্য নদী নিত্য। কারণ একটা ঢেউ আসবে তারপর চলে যাবে, নদী কোথাও যাবে না, নদী যেমন আছে তেমনই থাকবে। সেই পিওর সৎ, যাঁকে বলছি সত্তামাত্রম্, এই সত্তামাত্রমের উপর ঢেউ উঠছে, এই ঢেউগুলোই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সেই ঢেউয়ের মধ্যে ছোট ছোট বুদবুদ, জলের কণিকা গুলোই আমি, আপনি, টেবিল, গ্লাশ, মাইক্রোফোন ইত্যাদি। পরম সত্তা যিনি তিনিই সেই সচ্চিদানন্দ সাগর।

আচার্য শঙ্কর আবার দেখিয়ে দিচ্ছেন, যেটাই সৎ সেটাই আবার চিৎ, যেটাই চিৎ সেটাই আনন্দ। সৎ, চিৎ আর আনন্দ তিনটে আলাদা বস্তু নয়। আমি বললাম, বাগানে একটা বড় লাল সুগন্ধী গোলাপ ফুটেছে। ফুল জিনিষটা সত্তা, কিন্তু তার সাথে তার তিনটি গুণ এসেছে, বড়, লাল আর সুগন্ধ। ঈশ্বরেও কি সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটে গুণ এসেছে। আচার্য বলছেন তা নয়, যেটাই সৎ সেটাই চিৎ, যেটাই চিৎ সেটাই আনন্দ, যেটাই আনন্দ সেটাই সৎ। এই তিনটে গুণকে এত স্বতন্ত্র মনে হয় যে যার জন্য বলা হয় সচ্চিদানন্দ। কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দ তিনটে আলাদা গুণ নয়। রামানুজাদিরা বলবেন, ভগবানের এই তিনটে গুণ। এর মধ্যে কোনটা ঠিক এই বিচারে আমরা যাচ্ছি না, আর রামানুজাচার্য উপনিষদের উপর ভাষ্যাদিও রচনা করেননি।

নিত্যোহনিত্যানাং, বস্তুর যে ঢেউয়ের খেলা, এর যিনি আধার তিনিই ব্রহ্ম, সেই আত্মা, সেই ঈশ্বর। যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমরা দেখছি এটা তাঁর উপর একটি ঢেউ। ঠাকুর বলছেন তাঁর উদরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদয় হচ্ছে লয় হচ্ছে। গঙ্গাতেই কত ঢেউ, সমুদ্রে এর থেকে আরও অনেক ঢেউ, আর যিনি সৎ রূপী চিৎসাগর সেই সাগরে কত কোটি কোটি ঢেউ। আর এই ঢেউ ওঠা কখন শান্ত হবে না, এক জায়গায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে যাচ্ছে আরেক জায়গায় কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কোথায় সব কিছু চলছে? Pure Existence এর উপরে। পদার্থ বিজ্ঞানী বলবেন, যা কিছু হচ্ছে সব pure energyর উপরেই হচ্ছে। বেদান্ত আরও এক

ধাপ পিছিয়ে যাচ্ছে, তাঁরা বলছেন এই pure energy কোথায় আছে? বেদান্ত বলবেন এটা মুখে বলা যাবে না, কিন্তু এটাই সেই বিশুদ্ধ সত্তা। কয়েকটা মন্ত্র আগে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, আমাদের মনকেই নিত্য মনে করুন। তাহলে এর মধ্যে অনিত্য কি? স্বপ্ন, স্বপ্নে কত কি হচ্ছে, ঘুম ভেঙে গেলে কিছুই নেই, মনই আছে, স্বপ্ন অনিত্য কিন্তু মন নিত্য। ঠিক তেমনি আমরা যা কিছু দেখছি, যা কিছু অনুভব করছি, যা কিছু চিন্তা ভাবনা করছি, এগুলোই অস্তিত্ব কিন্তু আসল যে সত্তা, যেটাকে বলছেন অস্তি মাত্রম্, সেটাই নিত্য। ঠাকুর যখন বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, তখন তিনি ঠিক এই কথাই বলছেন, বাকি সব অবস্তু মানে আজ আছে কাল থাকবে না। ঈশ্বরই বস্তু বলতে আমরা মনে করছি ঈশ্বর একটা কোন জিনিষ আর তাঁর উপর কিছু একটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা নয়, তিনিই আছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকুক আর নাই থাকুক, ঈশ্বরই থাকবেন।

তারপরেই বলছেন *চেতনশ্চেতনানাম্*, তিনি চৈতন্যময়। এই মন্ত্রে সৎ, চিৎ আর আনন্দ তিনটেকেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। *নিত্যোহনিত্যানাম্* বলে বলতে চাইছেন তিনি সৎ স্বরূপ। এরপর বলছেন তিনি চিৎ, যিনি সৎ তিনিই চিৎ। এটাকেই আচার্য আবার যুক্তি দিয়ে বলছেন, আমরা সেই জিনিষটাকেই বোধ করি যে জিনিষটা আছে। যে জিনিষটা নেই সেই জিনিষের চিন্তা আমরা মনেও নিয়ে আসতে পারি না। কল্পনাও যখন করছি তখন সেই জিনিষটা আমার কাছে সত্য। তাই যেটাই সৎ হয় সেটাই চিৎ হবে, মানুষ যেটা আছে সেটার ব্যাপারেই সচেতন বা সেটাকেই বোধ করে, যে বস্তু নেই সেটাকে কেউ চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু এখানে বলছেন *চেতনশ্চেতনানাম্*, তুমি যে জিনিষগুলিকে চৈতন্য বলে বোধ করছ, তাদেরও চেতনা তিনি। যেমন আমরা আইনস্টাইনকে মনে করছি তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু না, তাঁরও চেতনা হলেন ভগবান। আমি বলছি আমার বুদ্ধিই চৈতন্য, কিন্তু তা নয়, বুদ্ধির পেছনে যিনি আছেন তিনিই আসল চৈতন্য। আর সত্তার পেছনে যিনি সত্তা হয়ে আছেন তিনিই আসল সত্তা। আসলে এই জিনিষগুলিকে বোঝা যায় না।

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্, ঠিক এই জিনিষটাকেই ঠাকুর কথামৃতে মাস্টারমশাইকে বলছেন, 'আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ। আমি কি বিচার করব! আমি দেখছি তিনিই এই সব হয়েছেন, তিনিই জীব, জগৎ হয়েছেন'। ঠাকুর *নিত্যোহনিত্যানং* এই জিনিষটাকেই বলছেন। জীব, জগৎকে আমরা অনিত্য বলে জানি, কিন্তু তিনিই সব কিছু হয়েছেন, তিনিই অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েছেন, যিনি সৎ তিনিই জগৎ রূপে প্রতিভাসিত হচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন 'বিচার কি করব! আমি সাক্ষাৎ দেখছি'। সত্যিই তাই, এখানে বিচারের কিছু নেই। আচার্য শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে বলছেন, বিচার করলেও এটাই দাঁড়ায় কিন্তু অনুভূতি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এর কোন দাম নেই। তারপরেই ঠাকুর বলছেন –

'তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না'। আগে সত্তার কথা বললেন তিনি হয়েছেন, বলেই চৈতন্যের ব্যাপারে ঢুকে যাচ্ছেন। কারণ সৎ আর চৈতন্যের কোন তফাৎ নেই, যেটাই সৎ সেটাই চিৎ। তাই বলছেন, আমি দেখছি তিনিই এই সব হয়েছেন। বলেই পরে বলছেন 'তবে চৈতন্যকে লাভ না করলে চৈতন্যকে জানা যায় না'। তার মানে আত্মজ্ঞান যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ চৈতন্যকে ধারণা করতে পারবে না। আত্মজ্ঞান হয়নি তাই বলে কি এগুলোর দরকার নেই? ঠাকুরই বলে দিচ্ছেন, বিচার কতক্ষণ! যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। ঈশ্বর দর্শন হয়নি, শাস্ত্রের কথা আপনাকে শুনতে হবে, শাস্ত্রালোচনা আপনাকে করতে হবে, বিচার আপনাকে করতে হবে। কিন্তু যদি ঈশ্বর দর্শন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আর কিসের বিচারের দরকার!

ঠাকুর আবার বলছেন, 'শুধু মুখে বললে হবে না। এই আমি দেখছি তিনিই সব হয়েছেন'। বিচার করে করে যদিও কিছু হয় তাও কিন্তু পুরোটা হয় না। ঠাকুর বলছেন আমি এটাই দেখছি। কঠোপনিষদের ঋষিও দেখেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর বলছেন 'তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা যায়'। এই মন্ত্রেই বলবেন, *বিদধাতি কামান্*, আমাদের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন। যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি ভগবান তিনি যদি কৃপা করেন তবেই চৈতন্য লাভ হয়। কঠোপনিষদের ঋষিও তাই বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, তিনি যাঁকে বরণ করবেন অর্থাৎ তিনি যদি কৃপা করেন। কারণ তিনিই মালিক, তিনিই চৈতন্যময়, সেখানে বুদ্ধি, বিচার, কর্ম কোনটাই চলবে না।

ঠাকুর বলছেন 'চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়'। মুখে যতই বল, আমার জ্ঞান হয়ে গেছে, চৈতন্য লাভ হয়ে গেছে, মুখের কথায় হবে না। পরিষ্কার লক্ষণ আছে, চৈতন্য হওয়া বা জ্ঞান লাভ হওয়া মানে সমাধি হবে। সমাধি হলে জগৎ থেকে মন কুড়িয়ে চলে আসে, জগতে আর মন থাকে না। যাঁর সমাধি হয় সেই জানে

তাঁর চৈতন্য বোধ হয়েছে। আবার বলছেন, 'মাঝে মাঝে তার দেহ ভুল হয়ে যায়'। সমাধিবানের একটাই লক্ষণ দেহে তাঁর মন থাকে না, দেহবোধ চলে যাওয়ার কথা বলছেন না, দেহটাই ভুলে যায়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা নির্লজ্জের মত প্রেম করে, কোথায় আছে, আশেপাশে কারা আছে কোন বোধ নেই। এদেরও তো সমাধির মত মনে হয়। কিন্তু তা না, কামিনী-কাঞ্চনের উপর লেশ মাত্র আসক্তি থাকে না। আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছুই ভালো লাগবে না। 'আমি দেখছি তিনিই জীব জগৎ সব কিছু হয়েছেন' এই আলোচনাই চলছে। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় এই কথাগুলোই চলছে – তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ হবে, চৈতন্য লাভ হলে তখনই চৈতন্যকে বোঝা যায়, তা নাহলে চৈতন্যকে বোঝা যায় না। চৈতন্য কার হয়? যে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা শুনবে না, বিষয় কথা শুনলে তার কষ্ট হবে। ঠাকুর বলছেন 'চৈতন্যকে লাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়'। আমরা যতই শাস্ত্র পড়ি, যতই আলোচনা করি, বিচার করি চৈতন্য লাভ হবে না। ঠাকুর বলে দিচ্ছেন চৈতন্যকে লাভ করলে তবেই চৈতন্যকে জানতে পারা যায়। শুনে যে একটা ধারণা করব বা উপমান প্রমাণ দিয়ে জানতে পারব, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কোন কিছু দিয়েই তাঁকে জানা যাবে না। যার ফলে মন্ত্রে যা বলতে চাইছেন, এগুলো আমরা ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারব না। তবে বিচার করতে হয়, বিচার করতে করতে একটা স্বচ্ছ ধারণা করা যায়।

ঠাকুর আবার বলছেন 'দেখছি বিচার করে তাঁকে এক রকম জানা যায়, ধ্যান করে এক রকম জানা যায় আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন সে এক'। এখানে চৈতন্যের পুরো তিনটে আলাদা ধারণা এসে গেল। বিচার যখন করছেন তখন এক রকম, ধ্যানে যখন বোধ হচ্ছে তখন আরেক রকম আর তিনি যখন দেখিয়ে দেবেন তখন পুরো অন্য রকম। আমি আপনাকে খোলা চোখে এক রকম দেখছি, চোখ বন্ধ করে দেখলে আরেক রকম দেখব, আপনার ছবি দেখলে অন্য রকম দেখব, স্বপ্নে আপনাকে দেখলে আরেক রকম দেখাবে। ঠাকুরকে নিয়েও আমাদের তাই হয়, কিন্তু এগুলোর বাইরে ঠাকুরের ধ্যান করলে তাঁকে আরেক রকম দেখাবে। সমাধি হলে ঐ জ্ঞানটাও পুরো অন্য ধরণের, এগুলোর কারুর সাথে কোন মিল নেই। তাহলে এগুলো কি ভুল? কোন ভুল নয়, এই ভাবেই আমাদের এগোতে হবে, এই পদ্ধতিতে না গেলে যাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলে এটাই শেষ মনে করলে ভুল হয়ে যাবে।

ঠাকুর নিজের ব্যাপারে বলছেন 'তিনি যদি তাঁর মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন তাহলে আর বিচার করতে হয় না, তাকে আর বুঝিয়ে দিতে হয় না'। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে অবতার কে জানতে পারে? ঈশ্বর কাউকে যদি দেখিয়ে দেন এ অবতার, তবেই সে একমাত্র জানতে পারে। স্বামীজীও মানছেন ঠাকুর অবতার, কিন্তু আবার সন্দেহ এসে যাচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন, এখনও সন্দেহ! কিন্তু পরে স্বামীজী ঠাকুরকে সব সময় অবতার বলছেন, স্বামীজী বলার পরেই সব কিছু ঠিক ঠিক দাঁড়াতে শুরু করল। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি যদি দেখিয়ে দেন ইনি অবতার, তার মানে তিনিই এই হয়ে এসেছেন। এর আগে তিনি চৈতন্য রূপে, এবার সেই তিনিই হয়েছেন অবতার রূপে। ঠাকুর বলছেন 'কি রকমা জানো? অন্ধকার ঘরে দেশলাই জ্বাললে যেমন দপ্ করে আলো হয়ে যায়, সেই রকম তিনি যদি দপ্ করে আলো দেন তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়'। তার আগে যত যাই করে যাই না কেন কিছুই হবে না।

নরেন বলছেন 'কই কালীর ধ্যান তিন চারদিন করলাম কিছুই তো হল না'। আমরা মনে করছি আমাদেরই কিছু হয় না, নরেনরও একই অবস্থা ছিল। তিন চার দিনেই তিনি অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন। ঠাকুর বলছেন, 'ক্রমে হবে, কালী আর কেউ নন যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি, যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল তাঁকেই কালী বলছে'। শাস্ত্রে যে পর ও অপর ব্রহ্মের কথা বলা হয়, কার্য ব্রহ্ম কারণ ব্রহ্ম বলেন তাঁকেই ঠাকুর কালী বলছেন। তারপর বলছেন 'ব্রহ্ম আর কালী অভেদ'। কারণ যিনি কারণ ব্রহ্ম তিনিই কার্য ব্রহ্ম, দুটোতে কোন তফাৎ নেই। বলছেন, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি।

কথামৃতের এই অংশটা এই জন্যই আলোচনা করা হল, কারণ *নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* এগুলোকে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। যতক্ষণ তাঁর কৃপায় পরিষ্কার না হবে, জিনিষটা এই রকম, ততক্ষণ এগুলো কখনই পরিষ্কার হবে না। কিন্তু শুনে যেতে হয়, শুনতে শুনতে পরিষ্কার হয়। *নিত্যোহনিত্যানাম্* এর যে

আলোচনা চলছে, এতে অনেকে মনে করতে পারেন যে, এটাই বলতে চাইছেন যে এই দেহটা অনিত্য আর এর পেছনে আত্মা যিনি আছেন তিনিই নিত্য। কিন্তু এখানে একেবারেই এই কথা বলতে চাইছেন না। শুধু দেহকে নিয়ে বলছেন না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছুকে নিয়ে বলছেন।

চেতনশ্চেতনানাম্, যত কিছু চেতন আছে, যেমন আমরা মনে করছি ব্রহ্মা চেতন, কারণ তিনি সৃষ্টি করছেন বা আমাদের স্তরে আমরা মনে করছি আমাদের বুদ্ধি চেতন। বলছেন যত চেতয়িতা প্রাণী, যেখানেই প্রাণীর মধ্যে চেতনা দেখা যাবে, সে আইনস্টাইনই হন আর যেই হন, সবের পেছনে যে চেতনা সেটা হলেন তিনি। উপমা দিচ্ছেন, জলে হাত দিয়ে যদি অনুভব হয় হাত পুড়ে যাচ্ছে, তখন জানতে হবে যে ওর পেছনে গরমটা অন্য কিছুর। ঠাকুর বলছেন, তলায় আগুন আছে বলে হাড়িতে আলু পটল লাফায়। জলের যে গরম তার পেছনে যেমন আগুন থাকে, ঠিক তেমনি যে কোন প্রাণীর যে চৈতন্য, সেই চৈতন্য হল আত্মচৈতন্যের চৈতন্য। আত্মচৈতন্য খুব তাৎপর্য্য পূর্ণ শব্দ, আত্মচৈতন্যকে আত্মার চৈতন্যও বলা যায় আবার আত্মার চৈতন্য থেকে আমি বোধ আসে। যেমন পাথর, আমরা যে ভাবে জানি বা বুঝি, পাথরের আমি বোধ নেই। কিন্তু একটা অতি ক্ষুদ্র এ্যমিবা বা ব্যাকটেরিয়ার আমি বোধ আছে। যার জন্য তার মধ্যে মৃত্যু ভয় আছে, মৃত্যু ভয় এলে সে সেখান থেকে সরে আসে, আবার নিজের খাদ্য বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়। যে জায়গাতে আমরা বলছি চেতনা এসে গেছে, এর আসল চেতনাটা তিনি। চেতনার উপর রজার পেনরোজ তাঁর মোটা বই The Emperor's New Mindএ অনেক কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু কিছুই পরিষ্কার বোঝা যায় না। ওর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে, একটা কাহিনী দিয়ে শুরু করছেন। এক বৈজ্ঞানিক একটা মেশিন তৈরী করেছেন, সেই মেশিন সব কাজ করে দিতে পারে, চিন্তা ভাবনাও করে দিতে পারে। যখন মেশিনটাকে দেখান হচ্ছে সেখানে তখন একটা বাচ্চা বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞেস করছে Can it feel? শুনে সমস্ত শ্রোতারা হাসছে। বৈজ্ঞানিক তার উত্তর দিতে পারলেন না। সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাচ্চাটা শুধু ভাবছে সবাই আমার উপর হাসল কেন! পাশ্চাত্য চিন্তা জগৎ যখন চেতনাকে ব্যাখ্যা করে তখন নানান জিনিষকে নিয়ে আসে। তার মধ্যে চেতনার একটা অঙ্গ হল feel করা, does it feel। রজার পেনরোজ যেন চেতনার এই দিকটাকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন। রজার পেনরোজ ঠিক কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার নয়। যে বই যত কঠিন মনে হবে বুঝতে হবে এটা পাঠকের সমস্যা নয়, লেখকের সমস্যা। চেতনাকে নিয়ে রজার পেনরোজ যখন বলছেন পড়লেই বোঝা যায় উনি নিজেই বিভ্রান্ত। কারণ তিনি জুডিও খ্রীষ্টানে বড় হয়েছেন। জুডিও খ্রীষ্টান পরম্পরাতে বলে ভগবান মাটি দিয়ে মানুষ তৈরী করে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে আত্মাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাই তাদের কাছে আত্মার সাথে চৈতন্যের কোন সম্পর্ক নেই। আত্মা হল সেই আত্মা যে এখান থেকে স্বর্গে যাবে, শরীর আর মন এখানে থেকে যাবে। তাহলে চেতনা বলতে যেটা বোঝায় সেটা শরীর আর মনের। আর মন যে কাজ করতে পারে সেটা মেশিনও করতে পারে। তাহলে মেশিন আর মানুষের চিন্তার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তখন আসবে feel, চেতনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। বেদান্তের দৃষ্টিতে কোন গোলমাল নেই, চৈতন্য এক, যিনি চৈতন্য, তিনিই সত্তা, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই সব কিছুর ভেতরে আছেন বলে সব কিছুর চেতনা আছে।

চেতনশ্চেতনানাম্, যেখানেই চেতনা সেখানেই ঈশ্বর। মেশিনের ভেতরে কি ঈশ্বর আছেন? আমরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জানি নেই, সেইজন্য মেশিনের কোন দিন চেতনা হবে না। চৈতন্য চৈতন্যকে দেখলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জানতে পারে যে এর চেতনা আছে, এ মেশিন নয়। বলতে পারেন একশ বছর পর মেশিনও অনেক উন্নত হয়ে যাবে। একশ বছর পর মানুষের মনও অনেক উন্নত হয়ে যাবে। গুগুলে কোন প্রশ্ন দিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর বেরিয়ে আসছে। কোন ঋষি বা সাধুবাবা কম্প্যুটার নিয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে বসেছেন যেখানকার লোকেরা কম্প্যুটার কি জিনিষ, ইন্টারনেট, গুগুল কি জিনিষ জানেই না। লোকেরা সাধুবাবাকে যা যা প্রশ্ন করছে ইন্টারনেটে খট খট করে মেরে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন। লোকেরাও সাধুবাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলছে, আমাদের কি সৌভাগ্য একজন সত্যিকারের মহাত্মা এসে গেছেন, বাবা সব উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন। এখনকার বাচ্চা বলবে, ব্যাটা গুগুল সার্চ করে উত্তর দিচ্ছে। আগেকার প্রজন্মের কাছে এটা ম্যাজিক। গুগুল তো সর্বজ্ঞ, জগতের কোন জ্ঞান নেই যেটা তার কাছে নেই, ভূত, বর্তমান যতটা আছে ভবিষ্যতের ততটা হয়ত নেই। কিন্তু পরের প্রজন্মে যে মেশিন আসবে তারা ভবিষ্যতকেও বলে দেবে। আজকে যে কোন বাচ্চা উত্তর শুনলেই বলে দেবে এটা গুগুল থেকে মেরেছে। তখনও তারা বলে দেবে এটা মেশিনের

তৈরী। মানুষের ক্ষমতার এটাই বৈশিষ্ট্য, কারণ তার যে সত্তা সেটা পরমেশ্বরের সত্তা। সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিতে পারে এটা মানুষ না মেশিন।

আফগানিস্থানে যেদিন প্রথম রেল ইঞ্জিন চালান হয়েছে লোকেরা ইঞ্জিন দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে। ইসলামে ডেভিলের একটা রূপের বর্ণনা আছে তাতে বলছে তার মুখ থেকে ধুয়ো বেরোবে, তার একটি চোখ, শরীরটা কালো। সেই সময়ে ব্রডগেজের যে ইঞ্জিন হত তার একটা হেডলাইট, ধুয়ো বেরচ্ছে আর আগুন জ্বলছে। আওয়াজ করতে করতে যখন আসত তখন সবাই বলছে এটাই সেই ডেভিল, ডেভিল এসে গেছে, সবাই বসতি ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। এখনও কি মানুষ তাই ভাবে? দেখেই বুঝতে পারে যে এটা রেল ইঞ্জিন। প্রথম যখন ট্রানজিস্টার রেডিও এল তখন লোকেরা ভাবত রেডিওর পেছনে বসে কেউ গান করছে। কিভাবে রেডিও খারাপ হতে খুলে দেখে ওর মধ্যে দু-তিনটে পোকা-মাকড় মরে পড়ে আছে। লোকটি খুব দুঃখ করে বলছে, যত গাইয়ে বাজিয়ে ছিল সব মরে গেল, আর রেডিও রেখে কি হবে, বলে রেডিওটা ফেলে দিয়েছে। এখনকার বাচ্চারা কি তাই মনে করবে? একশ বছর পর কি হবে আমরা ভাবছি, মেশিন যত উন্নত হবে, মানুষও তত প্রস্তুত হয়ে যাবে আর দেখে বলে দেবে এটা মেশিন। এক প্রজন্ম পেছনে যেটা তার কাছে ম্যাজিক বা সুপার পাওয়ার মনে হচ্ছে, পরের প্রজন্মে তা মনে হবে না। সেইজন্য রজার পেনরোজ আর পাশ্চাত্য দুনিয়া যতই নতুন নতুন মেশিন নিয়ে আসুক আমাদের কাছে কোন সমস্যা নয়। এখানে চেতনাকে বলছেন আত্মচৈতন্য। আত্মচৈতন্য কিন্তু দুটো। আত্মার চৈতন্য যখন থাকে তখনই ঐ বোধটা আসে।

বলছেন *একঃ*, আত্মা হলেন *সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরঃ*, আত্মা সব কিছু জানেন আর সব কিছুর ঈশ্বর। *একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্*, বহুনাং মানে একাই তিনি অনেক লোকের সব ইচ্ছা পূর্ণ করে দেন। যেমন একটা নদী বহু লোকের জলপিপাসা নিবারণ করে, ঠিক তেমনি *একঃ* তিনি একা, বহু লোকের কামনার পুর্তি করে দেন। সেইজন্য তিনি সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর, ভগবানকে কোন চেষ্টা করে কিছু করতে হয় না। আমার কাছে কেউ যদি কিছু প্রার্থনা নিয়ে আসে, আমাকে তখন চেষ্টা করে দেখতে হবে তার প্রার্থনা পূরণ করাটা আমার সাধ্যের মধ্যে কিনা। কিন্তু ভগবানকে কোন চেষ্টা করতে হয় না। তিনি কি করেন? যারা সকাম, সংসারী পুরুষ, যাদের ভেতর অনেক কামনা-বাসনা আছে তাদেরকে তিনি, আচার্য বলছেন *কামান্ কর্মফলানি*, তাদের যা যা কর্মফল সেটা তাদের দিয়ে দেন। কারণ তিনি সব কিছুর বিধাতা। কিন্তু তার সাথে তিনি *স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্*। আচার্য খুব জোর দিয়ে বলছেন, মানুষ যে কর্ম করছে ভগবান সেই কর্মের ফল অনায়াসে দিয়ে দেন, তার সাথে তিনি অনুগ্রহ করেন, মানে তিনি কৃপা করেন।

এখানে মনে হবে কিছু পরস্পর বিরোধী কথা হয়ে গেল। একজন মানুষ যা কিছু পায়, সে কিভাবে পায়? কেউ বলে, সে যা কর্ম করেছে তার বাইরে সে কিছু পায় না, কেউ বলে মানুষ যা কিছু পায় তাঁর ইচ্ছাতেই পায়, কেউ আবার বলে কর্ম যেমন তেমনই আসে কিন্তু প্রার্থনা করলে তিনি আবার সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে অনেক কিছু করে দেন। কথামৃতে আমরা এই তিনটেই পাই। যেমন বলছেন, আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনেই শুনবেন। কথামৃতে ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন শাশুড়ি তার তিন বৌমাকে সরাতে মেপে মেপে চাল দেয়, তাতে বৌমাদের খাবার কম পড়ে। একদিন কি করে ঐ সরাটা ভেঙে গেছে, বৌমাদের খুব আনন্দ, এবার থেকে আর কম খেতে হবে না। শাশুড়ি বলছে, যতই নাচ, যতই লাফাও হাতের আটকেল আছে। মানে তোমার যা পাওনা তার বেশি তুমি পাবে না। আমাদের সমস্যা হল, আমরা ভগবানকে হয় মা, নয় বাবা, তা না হলে রাজার মত দেখি। ঠাকুর আবার বলছেন, ছেলে এসে মায়ের কাছে আবদার করছে, মা দুটি পয়সা দে ঘুড়ি কিনব। মা বলবে, কোন পয়সা দেওয়া হবে না, তিনি নিষেধ করে গেছেন, জানলে খুব রাগ করবেন। তারপর ছেলে অনেক করে বলতে থাকে, শেষ ছেলে মায়ের পায়ে পড়ে বলে, তোর পায়ে পড়ি মা, দুটি পয়সা দে। ঠাকুর বর্ণনা দিচ্ছেন, মা তখন চাবি নিয়ে আলমারিটা কড়াৎ করে খুলে দুটি পয়সা ফেলে দেয়। এখানে ভগবানকে মাতৃরূপে দেখা হচ্ছে, মায়েরা যেমন করেন সেটাই ঠাকুর বর্ণনা দিচ্ছেন। আবার অন্য দিকে শাশুড়ির কথা, আন্তরিক প্রার্থনার কথাও বলছেন। আমরা ঠিক জানি না জিনিষটা ঠিক কি হয়। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যখনই কর্মের কথা বলেন তখনই তিনি অনুগ্রহের কথা নিয়ে আসেন। তার কারণ সবটাই যদি কর্ম দিয়ে নিয়ে আসা হয় তাহলে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। সমস্যা এটাই হবে, তার মুক্তি হবে না। কারণ সবই

যদি কর্মের জন্যই হয় তাহলে মুক্তিটাও কর্মের জন্যই হবে। কর্মের জন্য মুক্তি বেদান্তের বিরোধী হয়ে যায়। বেদান্ত বারবার বলছে কর্ম দিয়ে কখনই মুক্তি হবে না, মুক্তি কখনই কর্মফল রূপে আসে না। বন্ধনটা অজ্ঞান থেকে, বন্ধন থেকে মুক্তি সব সময় আসবে জ্ঞান থেকে, কর্মের সাথে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্কই নেই। সেইজন্য কর্ম কখন অলঙ্ঘনীয় আইন হবে না। যে নিয়মকে ভাঙা যাবে না, সেই নিয়মকে বেদান্ত কখনই গ্রহণ করবে না। কিন্তু কর্মকাণ্ডীরা কর্মকেই শেষ কথা বলে মানে। যদি বলা হয় ঈশ্বর কৃপা করলেন, কর্মকাণ্ডীরা বলবে, তুমি যে প্রার্থনা করেছিলে ওটাও কর্ম। আর যদি ওটাকে ব্যাখ্যা না করতে পারে তখন বলবে আগের জন্মে করা ছিল। আসলে এগুলো সত্যিই আমাদের জানা নেই, তিনি কৃপা করেন কি করেন না, তিনি কর্মফল দেন কি দেন না, এগুলো আমরা জানি না। কিন্তু একটা জিনিষ আমরা জানি, কর্মের বিধান কখনই শেষ কথা হতে পারে না। যদি শেষ কথা হয় তাহলে বেদান্ত আর দাঁড়াবে না। পূর্ব মীমাংসকরা বলছে ভালো কর্ম করলে জীব স্বর্গে যায়, খারাপ কর্ম করলে নরকে যায়, ভালো-মন্দ মিশ্র কর্ম করলে পৃথিবীতে ঘুরতে থাকে, তাহলে মুক্তি তো কখনই হবে না। আমরা সবাই এই জঞ্জালে ঘুরছি, এই জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে আসা মানে কর্মকে কাটতে হবে। কিন্তু কর্ম কিভাবে কাটবে? যদি আমি নিজে চেষ্টা করি সেটাও তো কর্ম। সেইজন্য আচার্য বলছেন দেবানুগ্রহ, ঈশ্বরের কৃপা। ঠাকুরও বলছেন, তাঁর কৃপা হলে চৈতন্য লাভ হয় বা উপনিষদ বলছেন *যমৈবষ বৃণুতে*, একটা হস্তক্ষেপ আসতে হবে। এই হস্তক্ষেপ কিন্তু কর্ম সম্পর্কিত নয়। যেটা নিষ্কাম কর্মে হয় সেটা সকাম কর্মেও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আমরা জানি প্রার্থনা সব সময় পূরণ হয় না। কিন্তু তাও আমাদের কিছু করার থাকে না, প্রিয়জন মারা যেতে বসেছে, ডাক্তার সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। সে এখন কি করবে! কর্মবিধান অনুযায়ী সব শেষ। এখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকুক, তিনি শোনার হলে শুনবেন, না শোনার হলে শুনবেন না। ঠাকুর এখন কি করবে তা তিনিই জানেন! কিন্তু তার কাছে এছাড়া আর কোন পথ নেই। কোন পথ থাকলে আগে ঐ চেষ্টাটা করুক। এটাই যখন আর কয়েকটা ধাপ এগিয়ে যায় তখন বলতে থাকে সবটাই তাঁর ইচ্ছা, সবই তাঁর কৃপা। এখানে তা বলছেন না, *একো বহুনাং যো বিদধাতি কামন্*, একা তিনি সবারই ইচ্ছা পূর্ণ করে দেন, কাউকে কর্মফল রূপে আবার কাউকে অনুগ্রহ করে।

গীতায় ভগবান বলছেন, *তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*। আমার উপর সম্পূর্ণ ভাবে যে নির্ভর করে আছে তাকে কিছু করতে হয় না, তার যা দরকার আমি সরাসরি দিয়ে দিই। তখন ভাষ্যকার বলছেন, যোগীদের তো তিনি দিয়ে দেন, কিন্তু বাকীদের কে দেন? তাদেরও ভগবানই দেন, কিন্তু তাদের কর্ম করিয়ে কর্মফল রূপে দেন, যোগীদের কর্মফল রূপে দেন না, সরাসরি দিয়ে দেন। ঠাকুর বলছেন, ভক্ত হল রাজার ব্যাটা, মাসে মাসে তার মাসোয়ারা এসে যায়, তাকে চাকরি করতে হয় না, অন্যের কাছে হাত পাততে হয় না, নিজে থেকেই এসে যাবে। ভক্তের যা দরকার ভগবানের কাছ থেকে এসে যায়। ভক্তকে কারুর উপর নির্ভর করতে হয় না, অপেক্ষাও করতে হয় না। আরও ভেতরে যদি যাওয়া হয় তাহলে প্রশ্ন আসবে, তিনি কাউকে বেশি কাউকে কম কেন দেন? আত্মশক্তির তারতম্যের জন্য, যিনি আত্মা তিনিই ঠিক ঠিক শক্তিমান। যোগী মানে তাঁর মন পবিত্র হয়ে গেছে, তাঁর অজ্ঞান আবরণটা ক্ষীণ হতে শুরু হয়েছে, সেইজন্য শক্তি বেশি আসে। যাদের আত্মশক্তি কম তাদের খাটাখাটনিটা বেশি করতে হয়, তখন মনে হয় চেষ্টার ফলস্বরূপ আসছে। যাদের আত্মশক্তি বেশি তাদের এমনিই হয়ে যায়। আত্মশক্তি ইন্দ্রিয় দিয়ে এলে সেই শক্তিকে দুর্বল মনে হবে। আধ্যাত্মিকতায় দুর্বলদের কিছু চেষ্টা রূপে আসে, যাঁরা আধ্যাত্মিক রূপে সবল তাঁদের কাছে কৃপা রূপে আসে।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ, ধীর পুরুষ, যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা একেবারে *আত্মস্থম্*, নিজের ভেতরেই সেই পরমাত্মাকে দেখতে পান। যাঁরা পরমাত্মাকে দেখেন তাঁদের কি হয়? *তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী*, শাশ্বত অর্থাৎ স্বাত্মভূত, যেটা আমার স্বাভাবিক রূপ সেটা কোন দিন চলে যাবে না। যেমন অগ্নির স্বাভাবিক রূপ দহন করা, অগ্নির এই রূপ কোন দিন চলে যাবে না, যেখানেই অগ্নি সেখানেই দহন শক্তি থাকবে। যেমন জল, দ্রবণ করার গুণ জলের স্বাত্মভূত, এটা কোন দিন যাবে না। পাথরের স্বাভাবিক গুণ হল কাঠিণত্ব, পাথরের এই গুণ কোন দিন যাবে না। ঠিক তেমনি যিনি আত্মস্থ পুরুষ, যিনি নিজের স্বরূপকে ভেতরে দেখে নিয়েছেন, তাঁর স্বাভাবিক রূপ হয়ে যায় শান্তি। এর আগের মন্ত্র বললেন *সুখম্*, এখন বলছেন *শান্তিঃ*। সুখ মানে ঐ আনন্দের বোধ, শান্তি মানে বিঘ্নের অভাব। অশান্তি মানেই সাংসারিকতা। মানুষ প্রিয় জিনিষ পেলে সুখ বোধ করে, আত্মাই সব থেকে প্রিয়, আত্মাকে কাছে পেলে সুখ বোধ করে। কাছের লোক পাশে থাকলে মানুষ শান্তি বোধ

করে, আত্মা সব থেকে কাছের লোক, আত্মাতে রমণ করলে তাই শান্তি বোধ করেন। আচার্য বলছেন, *তেষাং শান্তিঃ উপরতি*, সব কিছু থেকে প্রত্যাহার হয়ে যায়। *ন ইতরেষাম্*, যারা শাশ্বতী নয় তাদের শান্তি হয় না। গীতায় ভগবান বলছেন *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, যার শান্তি হয়নি সে কোথা থেকে সুখ পাবে!

যে কোন ধর্মে দু ধরণের লোকের জন্য দু রকম ধর্ম চলে। যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে চলছেন, যাঁদের বুদ্ধি বিকশিত তাঁদের জন্য এক ধরণের ধর্ম। সাধারণ লোক ধর্মের সব কথা বুঝতে চায় না, আধ্যাত্মিক বিকাশ তাদের এতই কম যে নিজের ছোট্ট গণ্ডিটাই সব কিছু মনে করছে। ওরই ভেতর স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আহার, নিদ্র, ভয় ও মৈথুনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। জীবনকে কোন ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের কাছে প্রধান। এরা বলে আমাকে ধর্মের দু-চারটে কথা বলে দিন আমি সেগুলো পালন করে যাব, এটাই আমার ধর্ম। ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে এই ধরণের কয়েকটি সহজ উপদেশ বলে দেওয়া হয়, আল্লা আছেন, তিনি তোমাদের সবাইকে দেখছেন, আল্লা মহম্মদকে যা যা বলছেন তার থেকে তুমি এই পাঁচটি জিনিষ পালন করতে থাক তাহলেই তুমি এই জীবনে সুখ শান্তি পাবে আর মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারবে। খ্রীষ্টান ধর্ম বলছে, রোববার দিন চার্চে যাও, পাদরি যা বলছেন শোন, প্রার্থনা কর। হিন্দুদেরও আছে, তুমি পঞ্চ মহাযজ্ঞ কর, দুবেলা একশ আটবার জপ কর, ঠাকুর দেবতাদের প্রণাম কর। এগুলোই ধর্ম, এই ধর্ম মানুষকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখে, ভালো মানুষ করে দেয়, একটা স্তরের নীচে যেতে দেয় না। কিন্তু যখনই আধ্যাত্মিক হতে যায় তার পথটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক পথ সবার জন্য নয়, এই পথ খুব কঠিন পথ, *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া*।

ভগবানের পথ ত্যাগের পথ, ভগবান মানেই ত্যাগ। জগতে যা কিছুর সাথে মানুষ নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে, সব কিছুকে যখন মানুষ ছাড়তে শুরু করে তখন ঈশ্বরের ব্যাপারে কিছু কিছু কথা ভেসে উঠতে থাকে। এরপর মানুষ *নিত্যোহনিত্যানাং* এইসব মন্ত্রে ঠিক কি বলতে চাইছেন ধারণা করতে শুরু করে। দর্শনের অধ্যাপকদের শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্য, কিন্তু এক একটা মন্ত্র যে বলা হচ্ছে, প্রত্যেকটি মন্ত্রের অন্তর্নিহিত যে ভাব তার যে কত ব্যপ্তি, কত গভীরতা, কত বিশালত্ব, এই ব্যাপারটা তাঁরাও ধরতে পারেন না। উপনিষদ, গীতাদি শাস্ত্রকে দর্শনের আঙ্গিকে জানার জন্য যে জ্ঞানের দরকার, সেই জ্ঞান সব থেকে নীচের দিকের জ্ঞান। যাঁরা ধর্ম পালন করেন তাঁদেরও কিছু কিছু ভাব ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে চলতে শুরু করেন তাঁরা হয়ত ধর্মের অত কথা জানেন না, কিন্তু যেটা জানেন তার যে কি বিশাল রূপ, সেই রূপের কথা ভাবলেই তাঁরা হতবাক হয়ে যান। সেইজন্য এখন যে মন্ত্রগুলিকে নিয়ে আলোচনা চলছে আমাদের কাছে একটুতো কঠিণ মনে হবেই। মন্ত্রের শাব্দিক অর্থ খুব সহজ, কিন্তু এর অর্থকে নিয়ে যত চিন্তা করতে থাকবে ততই এইসব মন্ত্রের ভাব বিস্তার করতে করতে কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে ভাবাই যাবে না। আর অন্যান্য ধর্ম বা পথের নিরিখে এইসব মন্ত্রের ভাবের গভীরতাকে মাপাই যাবে না। এগুলোকে নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করলে বোঝা যায় এর ভাব কত গভীর যার নাগাল পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই মুশকিল। একটু শান্ত হয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করলে মন্ত্রের ভেতরের অর্থ কি বলতে চাইছে তার একটা ধারণা হয়।

এর আগে *নিত্যোহনিত্যানাং* ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, ঘট আছে যখন বলছি তখন আচার্য অন্য জায়গায় বলছেন, ঘট আছে বলার সময় দুটো বুদ্ধি সব সময় চলছে। প্রথম হল ঘট বুদ্ধি, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এই বুদ্ধির মধ্যে একটা অসৎ বোধ থাকে। অসৎ মানে চিরস্থায়ীত্বের অভাব, অস্থায়ীত্বের বোধ। যেমন টেবিলে গ্লাশ আছে, আর একটা মোবাইল ফোন রাখা আছে। আমরা বুঝতে পারছি এই মোবাইল ফোনের মধ্যে গ্লাশটা নেই বা যে টেবিলের উপর গ্লাশ রাখা আছে ঐ টেবিলের মধ্যে গ্লাশটা নেই। তার মানে সব কিছুর অস্তিত্ব আলাদা আলাদা, গ্লাশের অস্তিত্ব আলাদা, টেবিলের অস্তিত্ব আলাদা, ফোনের অস্তিত্ব আলাদা। কিন্তু যখনই বলছি আলাদা অস্তিত্ব তখন এদের সবার মধ্যে অস্তিত্ব জিনিষটা সমান ভাবে থাকছে। অস্তিত্বের বোধ, সত্তার বোধ, সৎ মানে চিরন্তন, চিরস্থায়ী, এই বোধ কিন্তু সব সময় থাকছে। গ্লাশ ভেঙে যেতে পারে, টেবিল নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ফোন খারাপ হয়ে যেতে পারে কিন্তু আছে, অস্তি বোধ, সৎ বোধ এই বোধটা থেকে যাবে। কোথায় থেকে যাবে? অন্য বস্তুতে থেকে যাবে। আর যখন সৃষ্টিও থাকবে না তখনও এই অস্তি বোধ ঈশ্বরের মধ্যে থাকবে। সৎ বোধ কখনই যাবে না। সৎ, আছে, অস্তি এটাই নিত্য।

খুব বিখ্যাত প্রার্থনা *অসতো ম সদগময় তমসো ম জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মহ্মৃতম্ গময়*, এর *তমসোকে* সরিয়ে নিলে, *অসতো ম* আর *মৃত্যোর্ম* এই দুটি কিন্তু একই কথা। আসলে তিনটে আলাদা প্রার্থনা নয়, তিনটে একই কথা। অসৎ থেকে আমাকে সৎএর দিকে নিয়ে যাও। গ্লাশটা অসৎ, তাহলে সৎ কি? এখানেই মুশকিল হয়ে যায়, সৎ বুদ্ধিকে কোথাও দেখান যাবে না, সৎ বুদ্ধিটা মনের ভেতরে বোধ হয়। বুদ্ধি যত সূক্ষ্ম হবে তত এই বোধটা দৃঢ় হবে। বুদ্ধি যত স্থূল হবে তত স্থূল জিনিষেরই বোধ হবে কিন্তু সেই স্থূল জিনিষের পেছনে যে সত্তা আছে, সেই সত্তার সৎ বোধ তত কম হবে। স্থূল আর সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে উপমা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে আর্থার এডিংটন বলছেন আমাদের বুদ্ধি এত স্থূল যেন বড় ছিদ্রের জাল। জালের ছিদ্র যদি বড় হয় বড় মাছ ধরা পড়বে কিন্তু ছোট ছোট মাছ ধরতে পারবে না, মাছের আসল স্বাদ তো ছোট মাছেই থাকে। স্থূল বুদ্ধি ভোদা ভোদা জিনিষগুলিকে ধরে নেবে কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিষগুলিকে ধরতে পারবে না। বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম করার জন্য খাটতে হয়। যারা ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করে বুঝবেন তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল। যখন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে তখন বুঝতে হবে বুদ্ধিটা ভোঁতা থেকে একটু সূক্ষ্ম হয়েছে। আর যখন কোন ভাবকে নিয়ে বিচার করবে তখন বুঝতে হবে বুদ্ধি এবার সূক্ষ্ম হয়েছে।

মাথার উপর পাখা আছে সবাই বুঝতে পারে, কিন্তু পাখা কোথায় আছে এই জিনিষটাকে কেউই খুঁজতে যায় না। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, সবাই বাবুর বাগানের প্রশংসা করে কিন্তু কেউ বাবুর খোঁজ নিতে যায় না। ঠিকই বলছেন, ট্রেনে চেপে কেউ কখন রেলমন্ত্রীর খোঁজ নিতে যায় না। কিন্তু একটা কাজের জন্য যাচ্ছি ট্রেনে চাপতে হয়েছে, আমার অত শত জেনে কি দরকার! ঠাকুরও আবার বলছেন, আম খেতে এসেছ আম খাও, কত গাছ, কত পাতা এসবের হিসেবের দরকার নেই। আমরা এখানে বলছি পাখা আছে, শুধু পাখার ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন না, ঐ যে আছে এটার ব্যাপারেও একটু জানার চেষ্টা করুন। তাহলে তো ঠাকুরের কথা মত চলা হচ্ছে না। কিন্তু তা নয়, ঠাকুর যখন বলছেন, আম খেতে এসেছ আম খাও, গাছ পাতার হিসেব করতে যেও না, তখন ঠাকুর সাংসারিক ব্যাপারে বলছেন। এই সংসার যাত্রা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে, সংসারের বেশি খবরাখবর নেওয়ার দরকার নেই। ঠাকুর বলতে চাইছেন জগৎ তোমাকে একটা দিকে যাত্রা করতে সাহায্য করছে মাত্র, কিন্তু জগতে তুমি বেশি জড়িয়ে যেও না। পাখা আর পাখার অস্তিত্বের জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান নয়। ঠাকুর একদিকে বলছেন, আম খেতে এসেছ আম খাও, ডালপালার হিসেবের দরকার নেই। কিন্তু আবার বলছেন বাবুর বাগান সবাই দেখে বাবুর কেউ খোঁজ করে না। যদি বলা হয় ঠাকুর পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন, তাহলে এর উত্তরে আমরা কি বলব? এই সূক্ষ্ম জিনিষগুলোর ভেতরে না ঢুকলে বুদ্ধি কোন দিন সূক্ষ্ম হবে না, বুদ্ধি সূক্ষ্ম না হলে শাস্ত্রও কোন দিন বুঝতে পারব না। মনে হবে ঠাকুর পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন। কিন্তু তা নয়, জাগতিক জ্ঞান আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এখানেই তফাৎ। জাগতিক জ্ঞানকে ঠাকুর আটকাচ্ছেন, ওদিকে যেতে নিষেধ করছেন। গাছের ডালপালার হিসেব করাটা জাগতিক জ্ঞান আর আম খাওয়াটা ঈশ্বরীয় জ্ঞান। আর বাগান আর বাবু, বাগানটা জাগতিক জ্ঞান কিন্তু বাবুকে জানাটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। ঠাকুর একটা সহজ উপমা দিয়ে বোঝানর চেষ্টা করছেন। উপমা সব সময় একদেশীয় হয়। যে জিনিষটাকে নিয়ে উপমা দেওয়া হচ্ছে ঠিক ততটুকুই উপমার ব্যবহার হবে, অন্য জায়গায় লাগাতে নেই। আর উপমাকে দিয়ে কখন তত্ত্বের দিকেও যেতে নেই। একটা তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা উপমা নেওয়া হয়েছে। এরপর উপমাকে নিয়ে আর টানাটানি করতে নেই। তত্ত্বকে নিয়ে যত খুশী আলোচনা করা যেতে পারে তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তত্ত্বকে বোঝাতে যতটুকু উপমা নেওয়া হয়েছে ততটুকুতেই উপমা শেষ। তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য আরও চারটে উপমা নিয়ে আসুন তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু ঐ উপমাকে দিয়ে চারটে তত্ত্ব বার করা যাবে না। এখানে আমের পেছনে যে জিনিষটা আছে সেটা হল জগৎ কিন্তু ঠাকুর যখন আমের ডালপালার হিসাবের কথা বলছেন তার পেছনে যিনি আছেন তিনি ঈশ্বর, দুটোকে মেশান যাবে না। দুটো উপমাতেই ঠাকুর জগৎকে বাদ দিতে বলছেন। ঠাকুরের কথার গভীরে গিয়ে না বুঝলে কোন দিন এর সারতত্ত্ব বোঝা যাবে না। প্রায়ই ভক্তরা বলে কই ঠাকুর তো কোন দিন বইটই পড়েননি আর পড়তেও বলেননি, ঠাকুর বলছেন পণ্ডিত হয়ে কোন কাজ নেই। ঠাকুর কি পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন সেটা না দেখে আমরা শুধু তাঁর মুখের কথাকে নিয়ে চলছি। প্রসঙ্গটা দেখতে হবে আর উপমাকে নিয়ে যদি তর্ক বিচার করতে যায় তাহলে বুঝে নিন আর কোন দিন সে শাস্ত্র বুঝতে পারবে না।

আমরা পাখা আছে, গ্লাশ আছে এই নিয়ে বিচার করছি। কঠোপনিষদের আলোচনার জন্য পাখা, গ্লাশ এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়, এখানে গুরুত্ব হল অস্তি বোধ, সৎ বোধ। আমরা অনিত্য জিনিষটাকে ধরে আছি। ধরে আছ ঠিক আছে, তোমার যতটুকু দরকার ততটুকু নাও কিন্তু তার বেশি আর অনিত্যের সাথে নিজেকে জড়িও না, ওখানেই শেষ। যদি একেবারেই জড়াতে না পারো তাহলে আরও ভালো, যদি জড়াতেই হয় তাহলে যত কমে জড়িয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এস। *নিত্যোঽনিত্যানাং* যে বলছেন, এনারা এই কথাটাই বলতে চাইছেন। যাবতীয় যা কিছু তুমি দেখছ সব একদিন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তুমি দেখছ নিত্য মানুষ মরছে, বস্তু নাশ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সব কিছুর পেছনে একটা জিনিষ কিন্তু সমান ভাবে চলছে, সেটা হল অস্তি বোধ, সৎ বোধ। মা নিজের সন্তানকে বেশি ভালোবাসে। সন্তানকে যখন ভালোবাসে তখন মায়ের ভালোবাসায় দুটো জিনিষ থাকে। একটা হল ভালোবাসা আরেকটা হল সন্তানকে ভালোবাসা। ভালোবাসা আর সন্তানকে ভালোবাসা দুটো আলাদা। ভালোবাসা জিনিষটা যে কোন লোকের প্রতি যেতে পারে। কিন্তু সন্তানকে ভালোবাসা মানে ভালোবাসা একটা জায়গাতেই সীমিত। শুধু নিজের সন্তানকে ভালোবাসা এটাই অনিত্য কিন্তু ভালোবাসা জিনিষটা নিত্য। ঠাকুরও বলছেন, সবাইকে ভালোবাসার নাম দয়া আর নিজের সন্তান বা নিজের লোকদের ভালোবাসার নাম মায়া। নিজের লোকদের বা নিজের সন্তানকে ভালোবাসা খারাপ কিছু নয়, কাউকে না ভালোবাসার চাইতে একজনকেও অন্তত ভালোবাসা অনেক ভালো। কিন্তু এখানে নৈর্ব্যক্তিক জিনিষটাই প্রধান, সেটা হল ভালোবাসা জিনিষটা। একটা ছেলে আজকে এই মেয়ে, দুদিন পর আরেকটা মেয়ে, পরের দিন তাকে ছেড়ে আরকটিকে ধরল, আমরা বলব লম্পট ছেলে। আসলে ছেলেটি কিন্তু লম্পট নয়, ওর মধ্যে ভালোবাসা জিনিষটা গিজগিজ করছে, ঐ ভালোবাসাটা নির্গমনের একটা পথ খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না, যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই ঐ ভালোবাসাটা বেরোচ্ছে। কিন্তু পুরোটাই সে অজান্তায় করে যাচ্ছে, একবার যদি ও বুঝে যায়, আমার ভেতরে যে ভালোবাসা এটা একটা আণবিক শক্তির মত, এই শক্তিকে আমি যে কোন দিকে লাগাতে পারি, একটা মেয়ের পেছনে দিয়ে এই শক্তিকে শেষ করে দিতে পারি, একটাকে দিয়ে না হলে চারটে মেয়ের পেছনে দৌড়াতে পারি আবার আমি সমগ্র মানবাজাতিকে ভালোবাসতে পারি, এই উদ্দেশ্যর দিকে শক্তিটা লাগালে আমি একজন বড় মহাত্মা হয়ে যেতে পারি। তখন তার পুরো জীবনধারাটাই পাল্টে গিয়ে অন্য একটা সদার্থক দিকে চলে যাবে। এরমধ্যে অনিত্য হল মেয়েদের প্রতি ভালোবাসা আর নিত্য হল ভালোবাসা।

নিত্যোঽনিত্যানাং, যাবতীয় যা কিছু আছে তাকে অনিত্য বলছি ঠিকই, কিন্তু একমাত্র অলীক বস্তু ছাড়া অনিত্য বলে কিছু হয় না। অলীক বস্তুর মধ্যেও কোথাও একটা অস্তি বোধ থাকে। থমাস এক্যুনাস একজন খ্রীষ্টান দার্শনিক ছিলেন। ছোটবেলায় তিনি খুব স্থূলকায় ছিলেন। এক সময় ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। সব সন্ন্যাসীরাই সমান নিষ্ঠাবান হন না। ওনার স্থূল শরীর ছিল বলে আশ্রমে সমবয়সী সন্ন্যাসীরা ওনার নাম দিয়েছিলেন মিস্টার বুল। তার জন্য উনি কাউকে কিছু বলতেন না। একদিন ওনার সাথী সন্ন্যাসীরা দৌড়ে এসে তাঁকে বলছেন 'দেখলাম আকাশ দিয়ে একটা ষাঁড় উড়ে যাচ্ছে, তুমিও দেখবে চল'। থমাস এক্যুনাস দৌড়ে দেখতে গেলেন। সব সন্ন্যাসী বন্ধুরা, যাঁরা আর কদিন পরেই বিভিন্ন চার্চে ফাদার হবেন, তাঁরা সবাই খুব জোর হাসাহাসি করছে। সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন, শরীরটা যেমন মোটাসোটা বুদ্ধিও সেই রকম মোটা। একজন তাঁকে গিয়ে বললেন, তোমার বুদ্ধিটা অত মোটা নয় যে ষাঁড় আকাশ দিয়ে উড়ে যাবে এটা তুমি বিশ্বাস করবে? থমাস এক্যুনাস তখন খুব বিখ্যাত একটা কথা বলেছিলেন, ষাঁড় আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এটা আমি বিশ্বাস করতে রাজী আছি কিন্তু একজন খ্রীষ্টান ফাদার মিথ্যা কথা বলতে পারেন এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। পরের দিকে উনি একজন বিরাট দার্শনিক হয়েছিলেন, খ্রীষ্টান বিশ্বে ওনাকে শ্রেষ্ঠ থিয়োলজিয়ান বলা হয়। আমরা মানছি থমাস এক্যুনাস একজন দার্শনিক ছিলেন, তখনকার দিনের লোকেরা তাঁকে জানত না। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলেকে যদি বলা হয়, খুব ভোরে উঠলে দেখতে পাবে পূব আকাশ দিয়ে রোজ একটা গাধা উড়ে যায়। বাচ্চা ছেলে যে রোজ সাতটার আগে বিছানা ছাড়তে চায় না, কিন্তু উড়ন্ত গাধাকে দেখার জন্য ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বে। বস্তুটা অলীক কিন্তু তাতেও তার পেছনে একটা অস্তি বোধ লেগে আছে। অলীক বস্তুতেই যদি অস্তি বোধ থাকে তাহলে বাকি জিনিষে কেন অস্তি বোধ থাকবে না।

যুধিষ্ঠির বলছেন, রোজ মানুষ মরছে কিন্তু যে বেঁচে আছে সে মনে করছে আমি মরব না। আমরা মনে করছি যুধিষ্ঠির কি দারুণ কথা বলেছেন। কিন্তু অস্তি বা সৎ এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে যুধিষ্ঠির আহামরি কিছু

বলছেন না। কারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই বোধ আছে যে আমি অনিত্য নই আমি হলাম নিত্য। অস্তি বোধের দিক থেকে প্রত্যেকটি মানুষ জানে আমি মরব না। যুধিষ্ঠির সাধারণ দৃষ্টিতে বলছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ এই দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখে না। কিন্তু এটাই অস্তি বোধের দৃষ্টান্ত, আমরা রোজ দেখছি মানুষ মরে যাচ্ছে, জানি যে আমরাও একদিন মরব, কিন্তু তাও আমরা যে কাজই করি, এমন ভাবে করি যেন সেটা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। আমরা সবাই জানি এই পৃথিবী, সূর্যমণ্ডল এগুলো কিছুই থাকবে না। তাও আমরা কত কিছু সঞ্চয় করে রাখছি আর ভাবছি আমার সাত পুরুষ যেন এটা ভোগ করতে পারে। কারণ আমাদের সবারই ভেতরে কোথাও একটা নিত্যের বোধ আছে। পাথরের স্তূপে একটা বটবৃক্ষের বীজ যদি পড়ে যায়, ধীরে ধীরে সেই বীজ থেকে চারা বেরিয়ে বড় হতে শুরু হয়। অনিত্য জিনিষটা যেন শৈল স্তূপের মত, আর সৎ বোধ, অস্তি বোধ ছোট্ট একটা বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যেন তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ যা কিছু করে ঐ অস্তি বোধ থেকেই করে। এমন এমন সাংঘাতিক কাজ করে, আমরা ভাবছি লোকটা এত কেন পরিশ্রম করছে, একদিন তো সে মরে যাবে, সবই তো পড়ে থাকবে। একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি শেষ বয়সে একদিন ব্যাকরণ পড়তে শুরু করে দিলেন। সবাই তাঁকে বলছেন, মহারাজ! আর কটা দিন বাঁচবেন, এখন সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে কী হবে! মহারাজ বলছেন, আগামী জন্মে কাজে লাগবে। তার মানে আমি নিত্য এই ভাবটা আছে।

স্বামীজীকে আমরা ঋষি ও ভবিষ্যত দ্রষ্টা মনে করি। যদি না মনে করি তাহলে অন্য রকম হবে। শরীর যাবার কয়েকদিন আগে স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে জায়গা দেখিয়ে বলছেন, আমার শরীর চলে গেলে এই জায়গাতে দাহ করবে। উনি আগে থেকেই ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছেন। ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর শরীর চলে গেল। তার পুরো বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সকালে উঠলেন, নিত্য যা করার সব করলেন। সন্ধ্যেবেলা আরতির পর তাঁর সেবককে দরজাটা খুলে দিতে বললেন। তারপর তিনি ধ্যানে বসে ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহটাকে ত্যাগ করে দিলেন। তার আগে বিকেলে দেড়-দু ঘন্টা সাধু ব্রহ্মচারীদের ব্যাকরণের ক্লাস নিয়েছেন। আমরা যদি ধরেই নিই স্বামীজীর ইচ্ছামৃত্যু ছিল, ঠাকুরও বারবার বলছেন, আর স্বামীজীর যে জীবন, আমরা যে পরম্পরাতে চলছি তাতে আমরা মানি যে তাঁর ইচ্ছামৃত্যু ছিল। যিনি জানেন চার ঘন্টা পর আমি শরীর ত্যাগ করতে যাচ্ছি আর তিনি ব্যাকরণ পড়াতে বসে গেলেন! কেন? কোথাও একটা নিত্যতার বোধ, অস্তি, আমি আছি এই বোধ সর্বদা থাকছে। মাঝখানের সব কিছুই অনিত্য, শরীরটাও অনিত্য, ব্যাকরণের জ্ঞানটাও অনিত্য, রামকৃষ্ণ মিশনও অনিত্য, কিন্তু তার মধ্যেই একটা নিত্য জিনিষ যে রয়েছে তার বোধ সব সময় থাকছে। ঠাকুর বলছেন কেরানী জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে কি রাস্তায় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে! আবার কেরানীগিরিই করবে। যিনি জেনে গেলেন আমি নিত্য, আমি সেই সচ্চিদানন্দের সাথে এক, এরপর তাঁর মৃত্যুও কি আর জীবনই বা কি! তখনও অমূর্ত বাণী রূপে জগতের মঙ্গল করবেন আর যখন দেহধারণ করে থাকবেন তখনও মানবের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে থাকবেন। এখানে ব্যাকরণ পড়াবেন সেখানে অন্য রকম শুভ চিন্তন দেবেন। যে কোন অনিত্য বস্তুর পেছনে একটা নিত্য বোধ আছে।

জগতের সব অনিত্য বস্তুর পেছনে কোন না কোন ভাবে নিত্যের খেলা চলছে। বাড়ির মায়েরা নাকি সব সময় টিভি সিরিয়ালে ডুবে থাকে। আমরা বলছি টিভি সিরিয়ালে নিত্য কিছু নেই। কিন্তু টিভি সিরিয়ালেও নিত্য আছে। টিভি সিরিয়ালটা অনিত্য, বিনোদন অনিত্য কিন্তু টিভি সিরিয়ালও একটা জ্ঞানের উপর আধারিত। সিরিয়াল মানুষের চরিত্রের চিত্রণ করছে, জীবন চিত্রণ করছে, যদিও বেশির ভাগই বিকৃত ভাবে করছে, কিন্তু সেখানেও একটা জ্ঞান লেগে আছে। জ্ঞান জিনিষটা নিজে নিত্য। ঐ নিত্যের উপর অনিত্য টিভি সিরিয়াল খেলা করছে। সমুদ্র নিত্য কিন্তু তার উর্মিমালা অনিত্য। যদি তিনটে নিত্য হয়, সৎ, চিৎ আর আনন্দ, আচার্য শঙ্কর বলছেন তিনটে একই জিনিষ, যেটা সৎ সেটাই চিৎ, যেটাই চিৎ সেটাই আনন্দ। আমরা যদি বোঝার জন্য তিনটেকে আলাদা নিই, তাহলে দেখা যাবে জগতে যাবতীয় যা কিছু করছি সবের পেছনে এই তিনটে লেগে আছে। শরীরের রূপ লাবণ্য নিত্য নয়, শরীর প্রতিদিন খাণ্ডাহারের দিকে এগোচ্ছে, তাও ছেলে মেয়ে সবাই বিউটিপার্লারে যাচ্ছে। কারণ তার পেছনেও একটা নিত্য ভাব আছে। বিউটিশিয়ানের কাছে যাওয়াটা কেন? সৌন্দর্যকে ধরে রাখার জন্য। সৌন্দর্যটা নিত্য নয়, কিন্তু সৌন্দর্যের জন্য যে আনন্দ হয় সেই আনন্দটা নিত্য। যখন আমাকে দেখতে সুন্দর লাগছে তখন এই সৌন্দর্য্য আমাকেও আনন্দ দিচ্ছে আমার বাড়ির লোককেও আনন্দ দিচ্ছে। আনন্দটাই নিত্য, কিন্তু তার উপরে যে সৌন্দর্যের খেলা সেটা অনিত্য, সেই সৌন্দর্যের উপর

বিউটিশিয়ানের যে খেলা সেটা আরও বেশি অনিত্য। অনিত্যকে ধরার সাথে সাথে কোন না কোন ভাবে সে নিত্যকেও ধরছে। ঠাকুর বলছেন, একবার যখন বুঝে গেলে তখন তুমি নিত্যটাকে ধর। এই জিনিষটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার। একটা মেয়ে বিউটিপার্লারে যাচ্ছে, খুবই অনিত্য। কিন্তু কেন যাচ্ছে? কারণ সে সৌন্দর্যকে ধরতে চাইছে, সৌন্দর্য্য অনিত্য। কিন্তু না, এই সৌন্দর্যের জন্য ভেতরে যে আনন্দ আসে, তার রূপে সবাই আকর্ষিত হবে, প্রশংসা করবে, বাড়ির লোকের আনন্দ হবে, ঐ জিনিষটাই একটা বিকৃত আকার নিয়ে আসছে। কিন্তু সে যদি বুঝে যায় আসলে আমি আনন্দের পেছনে দৌড়াচ্ছি তখন তার বিউটিপার্লারে যাওয়ার আগ্রহ অনেক কমে যাবে। আমরা যা কিছু করছি, টিভি দেখছি, সিনেমা দেখছি, হয় আমরা জ্ঞানের একটা বিকৃত রূপ দেখছি আর তা নাহলে আনন্দের একটা বিকৃত রূপের আস্বাদ করছি। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খোশ গল্প করছি সেটাও আনন্দেরই একটা বিকৃত রূপ। কিন্তু শাস্ত্রের কথা শুনছে সেটাও আনন্দেরই একটা রূপ, এটাও শুদ্ধ আনন্দ নয় তবে বিকৃত রূপও নয়, বলা যেতে পারে আনন্দের একটা শুভ রূপ। ঠাকুর বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দের কথা বলছেন, সেখান থেকে আরও পেছনে যেতে যেতে যখন ব্রহ্মানন্দে যাবে তখন সে অমর হয়ে যাবে, সবাই তার পূজো করবে। কিন্তু একবার যদি আমরা চিন্তা করে দেখি এই জিনিষটা করতে আমার কেন ভালো লাগছে? আনন্দের জন্য, আমরা আনন্দকে খুঁজছি, কারণ আনন্দই নিত্য। তখন নিজে থেকেই সিনেমা দেখা, আজেবাজে ম্যাগাজিন পড়া, টিভি সিরিয়াল দেখা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সে নিজেই জ্ঞানের যে আরও শুভ রূপ সেই দিকে চলে যাবে। এটাই এখানে বলছেন *নিত্যোঽনিত্যানাং*, কারণ ঐ যে নিত্য ওটাই ভগবানের রূপ আর অনিত্যটাই সংসারের রূপ। বিউটিপার্লার সংসারের রূপ, কিন্তু তার পেছনে যে আনন্দের আভাস সেটাই ভগবানের রূপ।

এরই আরেকটা রূপ *চেতনশ্চেতনানাম্*, যেখানে যা চৈতন্যের প্রকাশ, তা সে ব্রহ্মার মধ্যেই হোক বা আইনস্টাইনের মধ্যেই হোক আর একটা এ্যমিবিয়ার মধ্যেই হোক সব চৈতন্যের পেছনে রয়েছেন আত্মা। আর বলছেন *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*, স্বপ্নে যেমন আমি অনেক রকম চরিত্রের সৃষ্টি করছি, স্বপ্ন ভাঙলে সব চরিত্রের লয় হয়ে যাচ্ছে, আমি সেই এক কিন্তু বহুকে সৃষ্টি করছি, ঐ বহুর মধ্যে কাউকে আমিই আনন্দ দিচ্ছি, কাউকে দুঃখ দিচ্ছি। ভগবানও ঠিক সেই রকম, সব কিছুকে সৃষ্টি করে তিনিই আবার একে কিছু দিচ্ছেন তাকে কিছু দিচ্ছেন, একা বহুকে দিয়ে যাচ্ছেন। বহু মানে কত যে বহু কল্পনা করা যাবে না। আমিও তো স্বপ্নে তাই করছি, স্বপ্নে দেখছি বিশাল ভিড় ঠেলে আমি এগিয়ে যাচ্ছি, ঐ ভিড়ের মধ্যে যত লোক আছে সবাইকে আমিই সৃষ্টি করেছি। ভিড়ের মধ্যে দেখছি মারামারি শুরু হয়ে গেছে, মারামারিটাও আমিই সৃষ্টি করলাম। ভিড়টা আমার সৃষ্টি, ভিড়ের মধ্যে বোমাবাজিটাও আমার সৃষ্টি। আর ভিড়ের মধ্যে আমি ফেঁসে গেছি দেখে একজন ছুটে এসে আমাকে বার করতে আসছে, তাকেও আমিই সৃষ্টি করেছি; ভগবান ঠিক এটাই করেন। এভাবেই জগতের সৃষ্টি। তিনি এক তিনি বহুকে সৃষ্টি করেছেন। শুধু যে বহুকে সৃষ্টি করছেন তা নয়, তাদের সবার কামপুর্তি করছেন, *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*। যখন এই জিনিষটাকে জানবে তখন *তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি*, ধীর পুরুষ যখন ধ্যানের গভীরে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন তখনই তিনি শান্তি পান।

এত কথা বলছেন ঠিকই আর এসব কথা শুনতে খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু ঈশ্বর কি আদৌ আছেন, আর আত্মা, যাঁর কথা বলা হল তিনি কি সত্যিই আছেন? মানুষের মনে জিজ্ঞাসা ওঠে। ঠাকুরের কাছে নরেন এসেছেন, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয়! ঈশ্বর কি আছেন? আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? ঠাকুর অনেক কিছু বললেন, কিছু অনুভূতিও দিলেন, নরেন কিছু মানছেন কিন্তু পুরোপুরি মানছেন না। ঠাকুরের অন্তিম সময়, তখনও নরেনের সংশয় মিটছে না। স্বামীজীর মত উচ্চ আধার, সপ্তর্ষির একজন ঋষি, যিনি নর ঋষি তাঁরই যদি এই অবস্থা হয় সেখানে আমার আপনার মত মানুষ, যাদের কোন অনুভূতিই নেই, শাস্ত্রের কথা, ঠাকুরের কথা ধারণ করার ক্ষমতা নেই, তাদের কি অবস্থা হবে!। এটাকেই ব্যাখ্যা করার জন্য পরের মন্ত্রে বলছেন –

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা।।২/২/১৪।।

(সেই অনির্দেশ্য পরমানন্দকে নিষ্কাম ব্যক্তিগণ অপরোক্ষরূপে অনুভব করেন, হায়! আমি সেই আত্মতত্ত্বকে কিভাবে জানব? তিনি কি প্রকাশস্বরূপ, তিনি কি বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন অথবা হন না?)

আত্মবিজ্ঞান বা আত্মদর্শনকেই বিবেকী পুরুষরা পরম সুখ মনে করেন। গীতাতেও যখন সুখের কথা, শান্তির প্রসঙ্গ এসেছে তখনও ভগবান আত্মজ্ঞানের কথাই বলছেন। আত্মজ্ঞানের সুখকেই ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ বলছেন। *তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যম্*, এই পরম সুখ *অনির্দেশ্যম্*, অনির্দেশ্যর অর্থ হল যেটাকে নির্দেশ করা যায় না। আত্মজ্ঞানকে নির্দেশ করা যায় না। নির্দেশ করা মানে, যেমন এই গ্লাশ, আমরা এই গ্লাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে পারি এটা গ্লাশ, পাখাকে দেখিয়ে বলতে পারি এটা পাখা। কিন্তু আত্মবস্তুকে এভাবে ইঙ্গিত বা নির্দেশ করা যায় না। রাস্তা নির্দেশ করে দিয়ে গন্তব্যের দিকে যেতে বলা হয়। কোন বাড়িটা জিজ্ঞেস করলে নির্দেশ করে বলে দেয় ঐ লাল রঙের বাড়িটা। ঈশ্বরকে এভাবে নির্দেশ করে বলে দেওয়া যায় না।

এই আইডিয়াটা এর আগেও আলোচনায় এসেছিল, আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। মন দিয়েও তাঁকে জানা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না। পরের মন্ত্রে আরও বিস্তারিত ভাবে বলবেন। বস্তু বা বিষয়কে জানার জন্য বস্তুকে আলোকিত বা প্রকাশিত করতে হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয় যখন তাদের নিজেদের বস্তুকে ধরে তখন তাদেরকে প্রকাশিত করার একটা পদ্ধতি আছে। চোখ সেই বস্তুকেই ধরবে যার আলো আছে, কান সেই বস্তুকেই ধরবে যার ধ্বণি আছে, নাক সেটাই ধরবে যার গন্ধ আছে। কিন্তু আত্মার এই ধরণের কোন property নেই। যার কোন property নেই তাকে আপনি ধরবেন কি করে! কোন কিছু ধরার জন্য সেই বস্তুর property চাই। দ্রব্যের গুণ, যেটা দিয়ে দ্রব্যকে জানা যায়, যেমন আলোকিত হতে হবে, তা নাহলে আলো ওখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসবে, জিনিষটা যদি three dimensional হয়, আমরা তাকে স্পর্শ করতে পারব। দ্রব্যের কোন স্বাদ থাকলে তাকে আস্বাদ করতে পারব। মনও ঠিক ঐ কাজই করে যে কাজ ইন্দ্রিয় করে। পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু ভেতরে আসছে মন সেগুলোকে ধরে processing করে বা বলতে পারেন গুছিয়ে নেয়। অনেক সময় মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও বস্তুকে জানতে পারে, যাকে intuition বলছে। Intuition কে নিয়ে জিম করবেটের একটা সুন্দর বর্ণনা আছে।

কুমায়ন অঞ্চলে একটি প্রচণ্ড হিংস্র বাঘিনী গোটা এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে রেখেছিল। জিম করবেটকে দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছিল বাঘিনীকে মেরে ফেলার। দায়ীত্ব পাওয়ার পর বাঘিনীটাকে মারার জন্য তিনি হন্যে হয়ে লেগে ছিলেন। জঙ্গলে বাঘ শিকার করার আলাদা পদ্ধতি আছে। ওনারা জানেন বাঘ কোন কোন পথ দিয়ে যাতায়াত করে। জিম করবেটও খুব সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন। যেতে যেতে হঠাৎ জিম করবেটের মনে হল বাঘিনীটা খুব কাছে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে। তিনি বলছেন, আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে কোন ইঙ্গিত, কোন আভাস ছিল না, যে একটা পাখি ডেকেছে, কোন গাছপালা নড়ছে, কোন ইঙ্গিত নেই। আমার মন হঠাৎ বলল যে, বাঘিনী পাশেই আছে আর আমাকে দেখছে। চট করে উনি ঘুরে গেছেন, দেখছেন চার ফুট দুরত্বে একটা উঁচু জায়গায় বসে বাঘিনী ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আর এক সেকেণ্ড দেরী হলেই জিম করবেট শেষ। বাঘিনী দেখে নিয়েছে, এও দেখে নিয়েছে, ইনিও সতর্ক হয়ে গেছেন। ততক্ষণে বন্দুকটা বার করে গুলি চালিয়ে মেরে দিলেন। এটাই intuition। প্রথম কথা বাঘিনীর দিকে জিম করবেটের দৃষ্টি ছিল না, কারণ বাঘিনী ছিল তাঁর পেছনে। কোন শব্দ, কোন গন্ধ, কোন রকম সঙ্কেত, কিছুই নেই। কিন্তু জিম করবেটের ওখানে sixth sense কাজ করে দিয়েছে। Sixth sense হল, এর আগে একটা মন্ত্রে বলা হয়েছিল *মধ্যে বামনমাসিনং বিশ্বে দেবা উপাসতে*, ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে যাচ্ছে আর মাঝখানে আত্মা বসে আছেন। রাজার বিভিন্ন পদাধিকাররা এসে যেমন রাজাকে খবর দিয়ে যায়, এই হল, সেই হল। রাজাও তাদের আদেশ দিচ্ছেন। যে খবর দিচ্ছে তাই বলে রাজা তাকে দিয়েই কাজ করাবেন তার কোন মানে নেই। তিনি মালিক, হঠাৎ চারজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে বলবেন, তুমি এটা করে দাও তো। মালিক আত্মা, ইন্দ্রিয়গুলিকে দিয়ে কাজ হচ্ছিল, হঠাৎ তাদের কাজ বন্ধ করে দিলেন। কারণ আত্মা সর্বজ্ঞ, তিনি সব কিছুই জানেন, বাঘিনীটা যে ওখানে ওৎ পেতে আছে সেটাও তিনি জানেন, কারণ বাঘিনীও তিনিই হয়েছেন। বাঘিনী যে ওকে আক্রমণ করবে সেটাও তিনিই করছেন, আর তাকে যে আটকাবে সেটাও তিনিই করবেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো এখন সক্রিয় নয়, সেইজন্য মন সরাসরি গিয়ে খবর নিল, মন বুঝে নিল, বুঝে নেওয়ার পর ইন্দ্রিয় আর শরীরকে নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হল, কারণ আত্মা কখন নিজে কাউকে নির্দেশ দেবেন না। যখন কোন কারণে

ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ হবে না, তখন তিনি সরাসরি মনকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেন। এখানে তিনি মনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছেন, এটাকেই ইংরাজীতে বলছে intuition।

এখন কেউ যদি দারোয়ানকে বলে 'যাও তো রাজাকে এই খবরটা দিয়ে এসো'। দারোয়ান বলবে 'আপনি বলছেন কি! আমার গর্দান চলে যাবে। সাত দেউড়ির পারে রাজা বসে আছেন, আমি প্রথম দেউড়িটাই পার হতে পারি না'। দারোয়ানকে যদি জিজ্ঞেস করেন 'বলতো ভেতরের খবর কি রকম'। দারোয়ান বলবে 'আমি তো প্রথম দেউড়িটাই পার করতে পারি না'। 'না তাও একটু খবর নিয়ে এসো না'। 'আমি খবর আনার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয় দেউড়িতেই আমার গর্দান চলে যাবে'। ইন্দ্রিয়গুলির ঠিক এই অবস্থা। মন আরেকটু এগিয়ে যেতে পারে, দুই দেউড়ি কি তিন দেউড়ি, কিন্তু সেখানেই তার গতি শেষ। এর পরের কোন খবর সে আর দিতে পারবে না। ভেতরের খবর, ভেতরে কি হয় সেটা একমাত্র রাজাই বলতে পারবেন। কেউ যদি রাজা হয়ে যায় তাহলে সাত দেউড়ি পেরিয়ে ভেতরের অন্দরমহলে পৌঁছে যেতে পারবে। যারা অন্দরমহলে পাহারা দেয়, রাজার খোদ নিজের লোকরা আবার কখন বাইরে আসে না। যে ভেতরে আছে সে বাইরে খবর দিতে পারবে না, যে বাইরে আছে সে ভেতরে প্রবেশ করতেই পারবে না। রাজার অন্তঃপুরের খবর পাওয়ার কোন পথ নেই। কিন্তু একটাই পথ আছে, একমাত্র রাজাই ওখানকার সব খবর জানেন। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, চৈতন্যকে না জানলে চৈতন্যকে বোঝা যায় না। চৈতন্যকে জানে একমাত্র চৈতন্য। ভগবানকে জানতে হলে ভক্ত হতে হবে, আত্মাকে জানতে গেলে আত্মা হতে হবে। তুমি তো আত্মা আছই। কিন্তু তুমি সংসারে যত কিছুকে ধরে রেখেছে সব ফেলে দিতে হবে, তা নাহলে হবে না। এটাই মূল কথা। সাত দেউড়ির পারে যে রাজার কথা ঠাকুর বলছেন, সেই রাজার অন্তঃপুরের যারা প্রহরী তারা কোন দিন বাইরে আসতে পারবে না। বেরোবার চেষ্টা করলেই গলা কেটে দেওয়া হবে। বাইরে যারা আছে তারা কোন দিন ভেতরে আসতে পারবে না, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেই তারও গর্দান চলে যাবে। একমাত্র রাজাই বাইরেও আসতে পারেন ভেতরেও আসতে পারেন। রাজার যে ব্যাটা, রাজকুমার সেও বাইরে ভেতরে দুটোই করতে পারে। সেইজন্য পরমাত্মাকে বলছেন *অনির্দেশ্যম্*।

ইন্দ্রিয়, মন এরা সবাই দারোয়ানের মত, এরা কোন দিন ওখানকার কোন খবর দিতে পারবে না। *কথং নু তদ্বিজানীয়াম্* তাহলে আমি জানব কিভাবে? আচার্য তখন বলছেন, *প্রকৃষ্টং প্রাকৃতপুরুষবাঙ্মনসয়োঃ অগোচরম্*, প্রাকৃত অর্থাৎ যারা সংসারী, যাদের বুদ্ধি স্থূল এদের কাছে *অবাঙ্মনসয়োঃ অগোচরম্*, এরা আত্মাকে কোন দিন জানতে পারবে না। কিন্তু *অপি সৎ নিবৃত্তৈষণা যে ব্রাহ্মণাস্তে তদেতৎ প্রত্যক্ষম্*, যে ব্রাহ্মণরা, ব্রাহ্মণ বলতে এখানে ঋষি মুনিদের বলছেন, *সৎ নিবৃত্তৈষণা*, যাঁদের এষণা নিবৃত্ত হয়ে গেছে তাঁদের কাছে আত্মা অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ। ভগবানকে জানা মানে ত্যাগের পথ, ত্যাগ না হলে ভগবানকে জানা যায় না। যে ব্রাহ্মণরা, যে মুনিরা এষণা ত্যাগ করে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আত্মা প্রত্যক্ষ। এষণা মানে ইচ্ছা, যাদের সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ হয়ে গেছে তাঁদের কাছে আত্মা প্রত্যক্ষ। যাদের একটুও কামনা-বাসনা আছে তাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। বিরাট তফাৎ, হয় আপনি জানেন, নয় তো আপনি জানেন না। মাঝা মাঝারি কিছু নেই। যদি কেউ বলে, আমি প্রায় সবটাই জানি, অল্প একটু বাকি, আসলে সে কিছুই জানে না। যদি কেউ বলে একটু জানি কিন্তু বেশির ভাগই আমার অজানা, সেও কিছুই জানে না। হয় জানে, নয় জানে না। আগেকার দিনে টেলিফোন বুথে এক টাকার কয়েন দিলে ফোনের কানেকশান হত। কেউ যদি চার আনা, আট আনার যত কয়েনই ফেলে যাক কোন কানেকশান হবে না। হয় সে এক টাকার কয়েন নেবে, তা নাহলে কোনটাই নেবে না, মাঝা মাঝারির কোন ব্যাপারই নেই। আপনি আট আনার ছ খানা কয়েন ফেলে দিন, লজিক নিয়ে আসছেন, এক টাকায় কানেকশান হয় আমি তিন টাকা দিলুম, কেন কানেকশান হবে না? কিছুই হবে না, ওর ওটাই চাই। হয় আপনি এষণা ত্যাগ করেছেন নয় তো আপনি অতিপ্রাকৃত, দুটোর মধ্যে একটা। আপনার বুদ্ধি হয় স্থূল বুদ্ধি নয়তো সূক্ষ্ম বুদ্ধি, মাঝা মাঝারি কিছু নেই।

সূক্ষ্ম বুদ্ধি কার হয়েছে, যার এষণা ত্যাগ হয়েছে, যিনি ত্যাগী পুরুষ। তাঁদের কাছে আবার আত্মা প্রত্যক্ষ। রাজকুমারের কাছে যেমন রাজমহল প্রত্যক্ষ। অন্য দিকে বলছেন, ওখানে ঢোকা যায় না। এখানেই সংশয় তৈরী হয়, সাধারণ ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, একদিকে বলছেন জানা যায় না, অন্য দিকে বলছেন জানা যায়। তাহলে আমি এখন কিভাবে জানব? কয়েকজন ঋষি মুনিরা একেবারে স্পষ্ট করে বলছেন, *এতদ্বৈতৎ*, এটাই

সেটা। অন্য দিকে বেশির ভাগ লোক বলছে নেই। *কথং নু তদ্বিজানীয়াম্*, সেই জিনিষটাকে কিভাবে আমার বুদ্ধির বিষয় করব? আবার বলা হয় আত্মা প্রকাশস্বরূপ, অথচ বলছেন, বুদ্ধি দিয়ে কখন জানা যাবে না। *কিমু ভাতি বিভাতি বা*, সেটা কি গোচর না অগোচর, সেটা কি দৃশ্যমান নাকি অদৃশ্যমান। তখন বলছেন, আছে। কিন্তু তুমি যে ভাবে ইন্দ্রিয়ের গোচর করতে চাইছ বা বুদ্ধির বিষয় করতে চাইছ, সেভাবে এটা হবে না। তখন দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, জগতের যে কোন জিনিষকে যারা আলোকিত করছে, সূর্য হোক, চন্দ্র হোক, তারা হোক, এরা কেউই ঐ জিনিষটাকে প্রকাশিত করতে পারে না। এটাই দ্বিতীয় বল্লীর শেষ মন্ত্রে বলছেন –

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।২/২/১৫।।

(সেই ব্রহ্ম বা আত্মাকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ করে না, বিদ্যুৎও প্রকাশ করে না, সেখানে অগ্নি কি করে প্রকাশ করবে? তিনি প্রকাশমান বলেই সমস্ত বস্তু সেই অনুযায়ী দীপ্তিমান হয়, তাঁরই দীপ্তিতে এই সব কিছু বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়।)

এই মন্ত্রে আত্মলোকের কথা ও আত্মার অবস্থার কথা বলছেন। সূর্য সমস্ত লোককে প্রকাশিত করে, সূর্য যখন থাকে না তখন চন্দ্রমা প্রকাশিত করে, চন্দ্রমা যখন থাকে না তখন তারাগণ প্রকাশিত করে। কিন্তু আত্মাকে সূর্য, চন্দ্র, তারা এরা কেউই প্রকাশিত করতে পারে না। সূর্যের যতই আলো থাকুক ঐ আলো দিয়ে সে আত্মাকে কোন দিন প্রকাশিত করতে পারবে না। কেন পারবে না পরে বলা হচ্ছে। জগতে আলোর একমাত্র উৎস অগ্নি আর সূর্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ এরা প্রকৃতিতে নিজের মত চলে। এগুলো যখন চলে না তখন আমরা অগ্নি প্রজ্বলিত করি, ইদানিং কালে ইলেক্ট্রিসিটি অগ্নির এই কাজ করছে। বলছেন প্রকৃতিতে যাদের নিজস্ব এত শক্তিশালী আলো তারাই আত্মাকে প্রকাশিত করতে পারে না সেখানে অগ্নির আর কি কথা হতে পারে।

এখানে শুধু আলোর অর্থে আলোকিত করার কথা বলা হচ্ছে না। জগতের যে কোন বস্তুর যে গুণ সেই গুণ দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না। বস্তুকে দেখার জন্য আলো দরকার, বস্তুর উপর আলো প্রতিফলিত হয়ে বস্তুর প্রতিবিম্ব যখন আমাদের চোখে আসছে তখন সেই বস্তুর জ্ঞান হয়। কিন্তু আত্মা কোন বস্তু নন, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। কিন্তু আলোর প্রকাশ আর আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ দুটো এক নয়, দুটো পুরোপুরি আলাদা জিনিষ। আমরা মোটামুটি চার রকমের আলোর কথা জানি, সূর্য, চন্দ্র, তারা আর অগ্নি, এরা কেউই আত্মাকে প্রকাশিত করতে পারে না। এরা সবাই এই জগতের পার্থিব বস্তুকেই একমাত্র আলোকিত করতে পারে। আত্মা যেহেতু কোন বস্তু নন, তাই আত্মাকে এরা আলোকিত করতে পারে না। আলোকিত করতে পারে না বলে ইন্দ্রিয়গুলো আত্মাকে ধরতে পারে না। যত রকম আলো চলে, সব আলোকে আমাদের চোখ ধরতে পারে না, একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে আমাদের চোখ আলোকে ধরতে পারে। ওর থেকে হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে গেলে আলো আর কোন বস্তুকে আমাদের চোখে প্রতিবিম্বিত করতে পারবে না। এর সহজ উপমা, টেলিফোনের সিগন্যাল বা রেডিও বা টেলিভিশনের সিগন্যালকে আলো দিয়ে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পারব না। কোন গ্রামের লোককে যদি বলেন টেলিফোনের সিগন্যাল কাজ করছে না, সে জিজ্ঞেস করতে পারে সিগন্যাল কি জিনিষ আমাকে দেখান তো। তাকে যদি বলা হয় ফোনের সিগন্যালকে দেখান যাবে না। সে বলবে কেন দেখান যাবে না, আমরা তো ট্রেনের সিগন্যাল দেখতে পাই। আমি তখন তাকে আলো দিয়ে কি করে ফোনের সিগন্যাল বোঝাব! ফোন বা রেডিওর সিগন্যালের যে ছবি নেওয়া যায় না তা নয়, ছবি নেওয়া যায়, তার আলাদা পদ্ধতি আছে। মাইক্রোয়েভ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন এদের সবার সিগন্যাল মানুষ যদি দেখতে পেত তাহলে কেমন দেখাত তার সব কটা ছবি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমি যদি আলো নিয়ে দেখতে যাই কোন দিন দেখতে পারব না, অথচ সিগন্যালগুলি সব সময় কাজ করছে। এই সিগন্যাল আরও সূক্ষ্ম বলে চোখে দেখা যায় না। সূক্ষ্ম জিনিষকে কখন স্থূল দিয়ে জানা যাবে না। ওর থেকেও যদি সূক্ষ্ম হয় তবেই জানা যাবে। সিগন্যাল গুলিও স্থূল জিনিষ কিন্তু এই আলোও তাকে প্রকাশিত করতে পারছে না। আত্মা সবচেয়ে সূক্ষ্ম।

বিদেশে কুকুরকে ডাকার জন্য এক ধরণের হুইসেল বাজান হয়। ঐ হুইসেল দিলে কুকুরই শুনতে পারবে আমরা শুনতে পারব না। আমাদের কান এমন ভাবে তৈরী শব্দের একটা ছোট্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে ঐ

অতটুকুই কান ধরতে পারে। কুকুরের শ্রবণ শক্তি অনেক বেশি কারণ তাদের কান শব্দের আরও সূক্ষ্ম ফ্রিকোয়েন্সিকে ধরতে পারে। একটা নামকরা প্রচলিত প্রবাদ যে কুকুর নাকি ভূত দেখতে পায়, ভূতের শরীর আরও সূক্ষ্ম, কুকুর ঐ সূক্ষ্মটাও নাকি ধরতে পারে।

আত্মা এত সূক্ষ্ম যে কোন আলো তাঁকে কোন দিনই আলোকিত করতে পারবে না। ধ্বণি ধরার কোন যন্ত্রই আত্মাকে ধরতে পারবে না। সেইজন্য গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন *ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা*, তুমি আমার বিশ্বরূপকে তোমার স্থূল চোখ দিয়ে দেখতে পারবে না, *দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ*, সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি। ঠাকুরও কথামৃতে বর্ণনা করছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে চলে গেলে চোখ, কান সবটাই সূক্ষ্ম হয়ে যায়, এমনকি লিঙ্গ পর্যন্ত। ঠাকুরের কথা শুনে সবাই হাসছে। ঠাকুর আবার বলছেন, নাগো! সত্যি বলছি। তাঁদের পুরো শরীরটাই পাল্টে যায়। ঐ শরীর তখন দিব্য জিনিষ দেখতে পায়, শুনতে পায়। মহম্মদ আল্লার কথা শুনতে পেতেন, মোজেস শুনতেন, যিশু শুনতেন, ঠাকুর শুনতে পারতেন। স্বামীজী একদিন কাউকে বলছেন, মা কালীর আদেশ। শুনে স্বামীজীর গুরুভাই বলছেন, মা কালীর আদেশ নাকি তোমার নিজের আদেশ! স্বামীজী অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, তিনি বলছেন, সত্যি তিনি আমাকে আদেশ করেন। কারণ তাঁদের এই কান, এই চোখ ছাড়াও আরেকটা আলাদা চোখ, কান তৈরী হয়ে যায়। সেই চোখ কান দিয়ে তাঁরা ঈশ্বরীয় রূপ দেখতে পান, ঈশ্বরের কথা শুনতে পান। কথামৃতে ঠাকুর কত রকমের বর্ণনা করছেন। বলছেন তাঁর রূপের সৌন্দর্যের কাছে রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকার রূপ চিতার ভস্ম বলে মনে হয়।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্, তাই না, আত্মা আছেন বলেই সূর্য, চন্দ্র, তারা এদের সবার আলো আছে, জগতে যা কিছু চলছে তিনি আছেন বলেই চলছে। জল শীতল ধর্মী, কিন্তু তার নীচে আগুন দিলে জল গরম হয়ে যায়। জলের ধর্মই শীতল কিন্তু সে তার বিপরীত ধর্মকে নিয়ে নেয়। ঠাকুরও বলছেন, আলু পটল লাফাতে দেখে মনে করে ওরা নিজেরা লাফাচ্ছে কিন্তু তার নীচে যে আগুন আছে সেটা আর কেউ বুঝতে পারে না। বলছেন, যেমন অগ্নির সংযোগে যে জিনিষগুলোতে আগুন থাকার কথা নয় সেই জিনিষগুলোও উষ্ণতা পেয়ে যায়, যেমন জলের কথা বলা হল। ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র, তারা এদের যে আলো এই আলো তাদের নয়, সেই আত্মার আলোকেই তারা সবাই আলোকিত। যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পান।

বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, চেতনা কখন জড় পদার্থে নেই। এর আগে আমরা একটা যুক্তিকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যদি জড় পদার্থের জানার ক্ষমতা থাকত তাহলে তারা এক অপরকে জানতে পারত, যদি ইন্দ্রিয়গুলির সরাসরি জানার ক্ষমতা থাকত তাহলে তারা এক অপরকে জানতে পারত। যেমন কর্ণেন্দ্রিয় যে কাজ করে চোখ সেই কাজ দেখতে পারত, শব্দ তরঙ্গকে চোখ দেখতে পারত, নাক যে গন্ধকে আঘ্রাণ করছে, গন্ধের মধ্যে যে মলিক্যুলসের সিরিজ আছে চোখ তাদের দেখতে পারত। কিন্তু চোখ দেখতে পায় না, কারণ ঐ মলিক্যুলস বা তন্মাত্রা নাকের জন্যই তৈরী। তার মানে ইন্দ্রিয়গুলির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই তাহলে অন্য কারুর ক্ষমতা আছে, এই ধরণের যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় ইন্দ্রিয়গুলি জড় পদার্থ।

তাহলে কি করে বোঝা যায়? জগতে যত কার্য চলছে, এই কার্য দিয়ে বোঝা যায় এর পেছনে কেউ আছেন। কারণ যে কোন জিনিষ যদি স্বতঃপ্রকাশ হত তাহলে এক অপরকে দেখতে পারত। যেমন সূর্যের আলো যখন কোন কিছুতে পড়ে তখনই মানুষ সেই বস্তুকে দেখতে পায়। আলো যেমন অপর বস্তুকে আলোকিত করে, ঠিক তেমনি আত্মা আছেন বলে সব কিছু আলোকিত হয়ে আছে। তিনটে স্তরে আলো চলে, প্রথম হল সম্পূর্ণ জড় যেখানে কোন ধরণের আলো নেই, যেমন এই টেবিলের কাঠ, দ্বিতীয় এই টেবিলকে আলোকিত করছে সূর্য আর তৃতীয় সূর্যের পেছনে সেই আত্মার সত্তা আছেন, তিনি আছেন বলে সব কিছু আলোকিত। আত্মা না থাকলে জড় বস্তুতে কোন দিন আলো আসবে না। এখানে দুটো জিনিষ, এক, ঋষি মুনিরা ধ্যানের গভীরে দেখছেন যাবতীয় যা কিছু আছে, তাতে শুধু আলোর কথাই নয়, ধ্বণির কথা যেমন বজ্র, বজ্রের কি বিশাল আওয়াজ, বলছেন বজ্রের আবার কিসের ধ্বণি তিনি আছেন বলেই বজ্রের ধ্বণি। দুই, পৃথিবী কেন দাঁড়িয়ে আছে? তিনিই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হয়ে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। ভগবান সব কিছুর পেছনে আছেন, ভগবান সব কিছুকে ধারণ করে আছেন বলে জগতের সব কিছু নিজের নিজের মত কাজ করে চলেছে।

প্রশ্ন ছিল *কিমু ভাতি বিভাতি বা*, এটা কি প্রকাশিত? বলছেন হ্যাঁ প্রকাশিত। শুধু প্রকাশিতই নন, আরও এক ধাপ, জগৎকে তিনি প্রকাশিত করছেন। নরেন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি ঈশ্বর দেখেছেন? ঠাকুর বলছেন দেখেছি কিরে! তোকেও দেখিয়ে দিতে পারি। আত্মা শুধু ভাতি অর্থাৎ প্রকাশমানই নন তিনিই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করে রেখেছেন। এখানে আচার্য কিছু যুক্তি, কিছু উপমা দিয়ে জিনিষটাকে আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। কিন্তু এই সত্যের পেছনে রয়েছে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ঋষিরা মুনিরা পরিষ্কার দেখছেন। *নিত্যোঽনিত্যানাম্* আলোচনার সময় বলা হয়েছিল, অস্তি অর্থাৎ সত্তা যেটা রয়েছে, সৎ ভাব যেটা, তার উপর বাকি সব কিছু খেলা করছে। ঠিক তেমনি এই সূর্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, অগ্নি এদের আলোর কথা ছেড়ে দিন, তাদের অস্তিত্বই দাঁড়িয়ে আছে সেই নিত্যকে নিয়ে। তাদের যা কিছু গুণ, প্রকাশের গুণই হোক, চেতনার গুণই হোক, মেধা গুণ হোক বা শক্তি হোক, সব গুণ এই জন্যই আছে কারণ তাঁর নিজের আসল সত্তাটি আছে বলে। উপমা দিয়ে বলছেন, পাত্রের জলের নীচে আগুন থাকলে জলও গরম হয়ে যায়, ঠিক তেমনি তিনি আছেন বলে জগতের সব কিছু তাদের নিজের নিজের গুণ পেয়ে যায় আর সেই গুণের দ্বারা নিজের নিজের ধর্ম পালন করে। শিষ্যকে তাই আচার্য বলছেন, সেইজন্য তুমি একবারও মনে করতে যেও না যে তিনি আছেন কি নেই, এই প্রশ্ন কখনই করা যাবে না। আছেন, অবশ্যই আছেন, শুধু আছেনই না, তুমি যে জিনিষগুলিকে সম্মান দাও, তাদেরও পেছনে তিনিই তাদের সত্তা।

একটা ছোট্ট ঘটনা। একজন মহারাজ এক ফরেস্ট অফিসারের সাথে কোন এক ফরেস্ট অফিসে গেছেন। ফরেস্ট অফিসে যারা ছিল অফিসার তাদের জিজ্ঞেস করছেন, তোমাদের সাহেব কোথায়? বলল উনি বাজারে গেছেন। ফিরে যাওয়ার সময় উনি নিজের ভিজিটিং কার্ডটা রেখে দিয়ে বললেন, সাহেব এলে এই কার্ডটা দিও, আমরা কিছুক্ষণ পরে আসছি। মহারাজ আবার যখন ফরেস্ট অফিসারের সাথে ঐ অফিসে এসেছেন, দেখছেন অফিসের সবাই ইউনিফর্ম পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরে মহারাজ একজনকে জিজ্ঞেস করলেন। সে তখন বলছে আমাদের সাহেব কার্ডটা দেখার পর বললেন, ওরে শুধু তোর না আমারাও চাকরি চলে যাবে উনি এত বড় অফিসার। উনি ফরেস্ট সার্ভিসের বিরাট অফিসার, ফরেস্টের সাধারণ গার্ডরা বুঝতেও পারছে না যে তাদের সাহেবের থেকেও উঁচু কেউ হতে পারে। সাহেব বলছেন, শুধু তোর না, আমারও চাকরি চলে যাবে। শিষ্য যখন আচার্যকে জিজ্ঞেস করছে, ভগবান আছেন কিনা, তাঁকে জানা যায় কিনা, তিনি প্রকাশিত হন কিনা। আচার্য তখন বলছেন প্রকাশিত শুধু যে হন তা নয়, জগতে যা কিছু আছে তিনি প্রকাশিত করে রেখেছেন, শুধু প্রকাশিত করেই রাখেননি, যার যেটা বিশেষ ধর্ম বা গুণ সেটা ওনার জন্যই আছে। মেঘ কেন গর্জন করবে? কারণ ভগবানের গর্জন সেখানে রয়েছে। ফুল কেন সুগন্ধ দিতে পারে? কারণ ফুলের মধ্যে ভগবানের সত্তা রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্ক সব থেকে বেশি লক্ষ্য করে আলোকে, সেই কারণে চোখকে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হয়। সেইজন্য সূর্য, চন্দ্র, তারকার উপমা নিচ্ছেন আর প্রশ্নও ছিল *কিমু ভাতি বিভাতি বা*।

ঋষিরা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় দেখছেন *তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি*, সত্তা, অস্তির উপর সব কিছু খেলা করছে। শুধু বস্তুই খেলা করছে না, তার যত ধর্ম আছে সব খেলা করছে। আলোর ধর্ম সবচেয়ে বেশি কাজ করে চোখে, সেই আলোর উৎস সূর্য, চন্দ্র, তারা। এরা শুধু ভাতি বিভাতি নয়, তুমি যাদের মনে করছ সব থেকে বেশি আলো দেয় তারাও তাঁকে কোন দিন প্রকাশিত করতে পারবে না। কারণ তাঁর প্রকাশেই এরা প্রকাশিত। তিনি শুধু মালিকই নন, তিনিই সব কিছু। যাঁরা সমাধির অবস্থায় গেছেন তাঁরা দেখছেন এই আলো কিছুই না, চৈতন্যের আলোর সামনে এই আলোর কোন তাৎপর্যই পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় দেখছেন, চৈতন্য আছেন বলেই এই সূর্য, চন্দ্র, তারা এদের সত্তা আছে। স্বামীজী একই কথা বলছেন, সমাধিতে যে চৈতন্যের জ্যোতির্ময় আলো দেখা যায় তখন বোঝা যায় ঐ জ্যোতির সামনে এই জড় জ্যোতি কিছুই না। আমাদের কাছে সূর্যের আলো, চন্দ্রের আলোর বিরাট গুরুত্ব। যেমন সুউচ্চ পর্বত শিখর, কিন্তু মানুষ ঐ পর্বত শিখরকেও জয় করে নিতে পারে, শুধু মানুষই না, একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়েও ঐ পাহাড়ের থেকে বিরাট। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, এত বড় শক্তিশালী স্টীম ইঞ্জিন কিন্তু একটা পিঁপড়ের কাছেও সে তুচ্ছ। কারণ পিঁপড়ে জীবন্ত, স্টীম ইঞ্জিন জড়। ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এরাও জড়। তাঁর আলোটাই চৈতন্যের আলো। শুধু যে গুণগত ভাবে তফাৎ তা নয়, তিনি আছেন বলেই সব কিছু আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছুকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে, সবই তাঁর কাছে খড়কুটো। এটাই বলছেন, সূর্য, চন্দ্রের যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত

করার বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে এরা তাঁকে প্রকাশিত করতে পারবে না। প্রকাশিত করা মানেই তাকে ধরে নেওয়া। ছোট বাচ্চা কি ভাবছে মা জানে, কিন্তু মা কি ভাবছে ছোট বাচ্চা কোন দিন জানতে পারবে না। একটা জিনিষকে জানা মানে তাকে ধরে নেওয়া, প্রকাশিত করা মানে তাকে ধরে নেওয়া। কিন্তু চৈতন্য সব থেকে সূক্ষ্ম তাই কেউ কোন দিন চৈতন্যকে ধরতে পারবে না। এগুলো যত ভাবেই আমাদের ব্যাখ্যা করে বোঝান হোক না কেন আমরা ধারণা করতে পারব না, যখন বুঝব তখন নিজে থেকেই বুঝে যাব।

আগে আমরা একটা মন্ত্র পেরিয়ে এসেছে, *সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে*, জগতে দেহ, মন ও বাক্য দ্বারা আমরা যা কিছু করি তাতে শাস্ত্রে যে সব কর্মকে পাপকর্ম রূপে পরিভাষিত করা হয়েছে, সেই ধরণের অনেক পাপকর্ম করি। তাতে অনেক ধরণের পাপের কথা বলা হয়, যেমন কিছু জিনিষকে দেখা পাপ, কিছু জিনিষকে শোনা পাপ, কিছু জিনিষকে স্পর্শ করলে পাপ হয় আবার কিছু জিনিষের কথা ভাবাও পাপ। এমন এমন অশুদ্ধ বস্তু বা দৃশ্য আছে যেগুলোর দিকে তাকালে পাপ হয়। সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। উপনিষদ অধ্যয়ন করতে করতে আমাদের মনের মধ্যে বসে গেছে যে আত্মাই আছেন, আত্মাই সব কিছু, যা কিছু হয় সব আত্মার জন্যই হয়। আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, আত্মাই যদি সব কিছু হয়ে থাকেন, আত্মাই যদি আমাদের চালিত করেন, আত্মাই যদি মালিক হন তাহলে আত্মাই দোষী। এখানে এসেই যে কোন দ্বৈতবাদে বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মেও এই জায়গাতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। তখন এরা ঈশ্বরের ইচ্ছা আর স্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ে আসে, কিছুটা ঈশ্বরের ইচ্ছা আর কিছুটা তোমার ইচ্ছা। যদি বলা হয় সবটাই তাঁর ইচ্ছা, তাহলে আমাদের পাপকর্মও তাঁরই ইচ্ছাতে হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে দোষটাও তাঁরই হওয়ার কথা। তখন দ্বৈতবাদীরা বলবে আমরা সেরকম ভাবি না, এই ধরণের কিছু কিছু যুক্তি তর্ক নিয়ে আসবেন, যা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

একটা খুব উচ্চ অবস্থা থেকে এই আলোচনা চলছে, সেই জায়গা থেকে বলছেন, কোন পাপকর্ম কিংবা পূণ্যকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না, কারণ তিনি কোন কিছুতে লিপ্ত নন। দৃষ্টিতে অশুভ কিছু পড়ে গেলে যেমন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, সূর্য যখন জগতের এত অশুভ জিনিষ দেখছে, এখানে সূর্য বলতে ভৌতিক সূর্যকে বলা হচ্ছে না, তার পেছনে যিনি আদিত্য দেবতা আছেন তাঁকে বলছেন, মানুষ যেমন চোখ দিয়ে দেখার কাজ করে ঠিক তেমনি এই জগতের চোখ হল সূর্য, উনি এই চোখ দিয়ে জগতের এত অশুভ জিনিষ দেখছেন তাহলে তাঁরও প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। বলছেন সূর্যকে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না, কারণ সূর্য কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই। এনারা উপমা নেন, ঠাকুরও যে উপমা নিয়ে বলছেন দীপের আলোতে কেউ ভাগবত পড়ছে কেউ নোট জাল করছে, কিন্তু দীপের কোন কিছুই আসে যায় না, সে সাক্ষী। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হতে পারে সূর্য কি করে সাক্ষী হবে, আগেকার দিনে যাই হয়ে থাকুক আজকে আমরা জানি সূর্য যখন গাছের পাতায় পড়ে তখন ফটো সিনথেসিস হয়, তাহলে সূর্যের তো এখানে interact করা হয়ে গেল, সে আর সাক্ষী কি করে থাকল।

অন্য আরেকটা উপমা নিলে জিনিষটাকে আরও ভালো বোঝা যাবে। উপমা দিয়ে যখন আমরা কোন তত্ত্বকে বুঝতে যাব তখন এই গোলমাল হয়। একটা তত্ত্বকে বোঝাবার জন্য উপমা নেওয়া হয়, আর উপমাকে অতটুকু নিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। তার বাইরে গেলে অনেক কিছুই আর মেলাতে না পেরে তালগোল পাকিয়ে যাবে। ঠিক ঠিক উপযুক্ত প্রমাণ হল আয়নাতে প্রতিবিম্ব। আয়নাতে আমি আমার প্রতিবিম্ব দেখছি আর আমি জানি সব আয়নাতেই দোষ থাকে, কোনটা কনকেভ আয়না, কোনটা কনভেক্স আয়না, ম্যানুফাকচারিংএ কিছু দোষ থাকতে পারে, কিছু কিছু আয়নাতে খুব পরিষ্কার ছবি দেখা যায়। হাজারটা আয়নার হাজার রকমের দোষ। আয়নাতে আমি আমার যে প্রতিবিম্ব দেখছি এই প্রতিবিম্ব কিন্তু আয়নার দোষের জন্য একটু না একটু পাল্টে যাবে। আয়নার দোষে প্রতিবিম্বে আমার আকৃতিটা পাল্টে গেল, তাই বলে কি আমিও পাল্টে যাব? না, আকৃতি যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকছে। অন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালে প্রতিবিম্বে আমার আকৃতিটা আবার অন্য রকম দেখাবে, দোষহীন আয়নার সামনে গেলে আকৃতিটা সমান হয়ে যাবে। আত্মাকে যখন দেখা হয় তখন সমস্ত প্রাণীর মাধ্যমেই দেখা হয়। আত্মাকে দেখার জন্য আমরা সবাই এক একটা আয়না, আমি একটি আয়না, আপনি একটি আয়না, সে একটি আয়না। আমার মাধ্যমে আত্মার একটা প্রতিবিম্ব দেখছি আবার আপনার মাধ্যমে আত্মার আরেকটি প্রতিবিম্ব দেখছি। আমি যদি গোলমেলে হই আত্মার ছবিও গোলমেলে দেখাবে, তাতে

আত্মার কি আসে যায়! দোষটা কোথায়? আয়নাতে দোষ, আপনার চেহারায় কোন দোষ নেই। এই উপমা দিয়ে আলোচ্য মন্ত্রের তত্ত্বটা ভালো বোঝা যায়।

ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবেই হোক আর ঈশ্বরে পুরোপুরি সমর্পিত পুরুষের প্রভাবেই হোক, বেশির ভাগ মানুষ মনে করে এবং মুখেও বলে ভগবানই সব করছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে, আমার মঙ্গল যা হয়েছে সব ঠাকুরই করেছেন ইত্যাদি। দ্বৈতবাদেও তাই বলে, ভক্তের দৃষ্টিতে ঠাকুরই সব করছেন, তিনি যা করেন ভালোর জন্যই করেন। তাহলে আমি খারাপ কাজ যা করছি আর আমার খারাপ যা কিছু হচ্ছে তখন কি বলবে? খারাপ কিছু হলে বলবে, ঠাকুর তোমার ভালোর জন্যই করেছেন। একটা ধাপ্পাকে চাপা দেওয়ার জন্য আরেকটা ধাপ্পা নিয়ে এল, তারপর ঐ ধাপ্পাকে চাপা দেওয়ার জন্য আরেকটা ধাপ্পা নিয়ে এল। কেউ হয়ত কিছু একটা বাজে কাজ করে ফেঁসে গেছে। এরপর সে এক বাবাজীর কাছে গেল। বাবাজী সব শুনে তাকে একটা নিদান বলে দিলেন, তুমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে শিবের পূজা দেবে আর এত লোককে খাওয়াবে, ভগবান তোমাকে ঝামেলা থেকে বার করে আনবেনই, যদি না আনেন তাহলে বুঝবে তোমার বিশেষ ভালোর জন্যই হয়নি। হয়ে গেলে বাবাজীর ক্রেডিট আর না হলে তার ভালোর জন্যই হয়েছে। জগতে ভালো মন্দ সব সময়ই চলছে, কখন ভালো হয় আবার কখন মন্দ হয়। একমাত্র ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতেলে পড়ে আছে, বাঁচার কোন আশা নেই। এখন কোন সাধু ছেলের বাবাকে বলে দিল আজকেই আপনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটা সাধু ভাণ্ডারা দিন, ঐ পূণ্যে আপনার ছেলে বেঁচে যাবে। যদি না বাঁচে তাহলে বুঝবেন ঈশ্বরের একটা বিশেষ ইচ্ছা, ও হয়ত কিছু করতে যাচ্ছিল যার জন্য আপনার বিরাট একটা হানি হয়ে যেত। এবার সে কোন দিকে যাবে? ছেলে যদি বেঁচে যায় ঈশ্বরের কৃতিত্ব আর যদি না বাঁচে তাতেও ঈশ্বরের কৃতিত্ব। এই ধাপ্পাবাজ ঈশ্বরকে নিয়ে মানুষ কি করবে! তখন আবার বলবে, ঠাকুর তোমার ভালোই চাইছিলেন কিন্তু তোমার পাপের জন্য এই রকম হয়েছে। সবটাই যদি তিনি করেন তাহলে মাঝখানে পাপটা কোথা থেকে এসে গেল! এই এলেমেলো চিন্তা-ভাবনা, অন্ধ বিশ্বাস সব মিলেমিশে একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে গেছে।

ঠাকুর কথামৃতে কোথাও বলছেন না তোমার ভালোর জন্যই হয়েছে। আপদে বিপদে পড়ে কেউ এলে ঠাকুর তাকে বলতেন, ঈশ্বরের কার্য কি বোজা যায় গা! ঈশ্বর কোনটা করছেন, কোনটা করছেন না, আমরা এর কি বুঝব! ঠাকুর একবারও কারুর দুঃখকে মিথ্যা বলছেন না। নরেনের সংসারে একটার পর একটা ঝামেলা, ঠাকুর নরেনকে একবারও বলছেন না, মা তোকে দিয়ে তাঁর বিশেষ কাজ করাবার জন্য তৈরী করে নিচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাঁরাই আসতেন সবারই কিছু না কিছু কষ্ট ছিল। কিন্তু সবার মাঝখান থেকে নরেনই একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ হলেন। তাঁকেও ঠাকুর একবারের জন্য বলছেন না যে, তোকে ভবিষ্যতে অনেক কাজ করতে হবে তাই মা তোকে তৈরী করছেন। একদিকে নরেনকে তিনি মা কালীর কাছে প্রার্থনা করার জন্য পাঠাচ্ছেন, অন্য দিকে আবার একে তাকে ধরে নরেনের একটা চাকরীর ব্যবস্থা করার জন্য বলছেন। জানতে পেরে নরেন রেগে যাচ্ছেন দেখে ঠাকুর আবার বলছেন, ওরে! তোর জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি। নরেনের বিয়ের কথাবার্তা এগোচ্ছে, ঠাকুরে দৌড়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন, মা! কোন রকমে তুই এই বিয়েটা ভেঙে দে। ঠাকুর কি জানতেন না যে নরেনকে একটা বিরাট কাজের দায়ীত্ব নিতে হবে! ঠাকুর আমাদের কাছে ভগবান, ভগবান গীতায় বলছেন, *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন*। ঠাকুর ত্রিকালজ্ঞ, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সবটাই জানেন, তিনি জানেন নরেন বিরাটা একটা কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাহলে মা কালীর কাছে গিয়ে ঠাকুরের বলার কি দরকার, মা! নরেনের এই বিয়েটা যাতে না হয়। এটাই আশ্চর্যের, ঠাকুর নিজেই বলছেন মায়ার রাজ্যে এটা থেকে সেটা সেটা থেকে এটা হবে কিছুই বলা যায় না। চৈতন্য স্বরূপে যা কিছু হচ্ছে ঠাকুর তার সবটাই জানেন। কিন্তু মায়ার জগতে যখন আসছেন তখন সব কথা তিনিও জানেন না। মায়ার রাজ্যে তাঁরও মনের উপর একটা পর্দা পড়ে গেছে। ভক্তরা বলবে, এটাই ঠাকুরের লীলা। সবটাই যদি লীলা হয় তাহলে আমাদের আর শাস্ত্র পড়ে কি লাভ! সবটাতেই ঠাকুর যদি নাটক করেন তাহলে তিনি আমাদের আর কিসের আদর্শ! এগুলোর কোন উত্তরই নয়। উত্তর যদি খুঁজতে হয় সব সময় consistant উত্তর খুঁজতে হবে।

তাহলে যিনি জ্ঞানী তিনি কি ত্রিকালদর্শি হন, নাকি হন না! মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন তিনি *সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্*। সর্বজ্ঞর একটাই অর্থ, যিনি সোনাকে জানেন, আর তার যদি সোনার ব্যাপারেই আগ্রহ থাকে তিনি আর গয়নার দিকে মন দেবেন না। হাওড়া স্টেশনের কুলি মাথায় মাল বহন করছে, সে দেখতে যায় না মালের মধ্যে বই আছে নাকি সোনা আছে, নাকি জামা কাপড় আছে, তার কাছে একটা বোঝা মাত্র। ঠিক তেমনি যে স্বর্ণকার সে দেখতে যাবে না এটা আপনার মঙ্গলসূত্র, নাকি আপনি উপহার রূপে পেয়েছেন। স্বর্ণকার সোনাকে সোনা রূপেই দেখে। যত বড় স্বর্ণকারই হোক সে কিন্তু সব গয়নার ব্যাপারে জানতে নাও পারে, কিন্তু সোনা রূপে সে জানে। তাই বলে যে সে পাকা স্বর্ণকার নয় তা নয়। ঠাকুর বলছেন মা এখনও আমাকে নতুন নতুন অনুভূতির মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার মানে, জগৎটা হল সোনার গয়না, এখানে তিনি আরেকটা কি গয়না বানিয়ে দিয়েছেন তার ব্যাপারে জানা সম্ভব নয়। মায়ার রাজ্যে সোনা যতক্ষণ সোনা আছে ততক্ষণ জানতে পারা যাবে যে এটা সোনা, কিন্তু যেই সোনা দিয়ে গয়না তৈরী শুরু হয়ে গেল এরপর আর কিছু বলা যাবে না। অবতারও গয়নার ব্যাপারে পুরোপুরি জানবেন না, কিন্তু সুবর্ণ রূপে জানবেন। সুবর্ণ রূপে কি জানবেন? ঈশ্বরই আছেন, আর তাঁর ইচ্ছাতে সব হচ্ছে, তিনি নির্লিপ্ত, এই ধরণের যে কথাগুলো আমরা পড়ছি, এই জিনিষগুলো ঠাকুরের কাছে সব সময় পরিষ্কার। কিন্তু যত রকমের গয়না হয়েছে তার ব্যাপারে সবটাই যে ঠাকুর জানতে পারবেন তা নয়। কথামৃতে ঠাকুরের অনেক কথা আছে, যেখানে তাঁর কাছেও জাগতিক ব্যাপারে অনেক কিছুই যেন খুব পরিষ্কার নয়। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন আগামী বিপ্লব হয় চীন বা রাশিয়া থেকে আসবে, কিন্তু কার্ল মার্ক্স বললেন আগামী বিপ্লব ইংল্যাণ্ড আর জার্মানে আসবে। পরে দেখা গেল স্বামীজীর কথাই ঠিক হল। স্বামীজী human mindকে খুব ভালো জানতেন আর ঋষিদের intuitive power একটা থাকে। তাই বলে তাঁদের সব কথাই যে ঠিক হবে তা নয়। স্বামীজী তাঁর দুই বোনের ব্যাপারে বলতে গিয়ে এক বোনকে বলছেন, তোমার মধ্যে সৃজনী ক্ষমতা আছে, তুমি খুব বুদ্ধিমতী আর তোমার মধ্যে একটা বিশেষ শক্তি আছে, যার জন্য বিয়ে করে তুমি কখনই সুখী হতে পারবে না। আরেক বোন খুব শান্ত শিষ্ট, তাকে বললেন, তুমি বিয়ে কর তোমার খুব ভালো হবে। বাস্তব জীবনে তাঁদের দুজনের ক্ষেত্রে বিপরীত হয়েছিল। যে শান্ত শিষ্ট সে বিয়ে করল আর পরে ডিভোর্স হয়ে গেল, সারা জীবন ঐ ভাবেই থেকে গেল। আর যে খুব বুদ্ধিমতী সে বিয়ে করে মহা শান্তিতে ছিল। মেরি লুই বার্ক ঘটনাটা উল্লেখ করে আবার মন্তব্য করছেন, এটা দিয়ে স্বামীজীর দূরদৃষ্টিকে বিচার করা ঠিক হবে না, স্বামীজী সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বকে নিয়ে বলছেন। স্বামীজী জানেন এই ধরণের ব্যক্তিত্ব হলে তার জীবন এমনটি হবে, সেটাকে আধার করে তিনি বলছেন। কিন্তু মায়ার জগতে এটা এই রকমটিই হবে কখনই বলা যাবে না। ঠাকুর মানুষের ব্যক্তিত্বটা ধরতে পারতেন তার সাথে তিনি বলছেন আমি লক্ষণ দেখে বলে দিতে পারি লোকটি কেমন হবে। অনেক সময় কাউকে বলছেন তোমার জামাটা খোল দেখি, কারুর আবার হাতের ওজন দেখে বলছেন, এগুলোকে বলে Physiognomy। এনারা মানুষের ব্যক্তিত্ব, তার চারিত্রিক কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখে বলে দিতে পারেন যে তোমার এই রকমটি চলবে, কিন্তু এই রকমটিই চলবে এই কথা অবতারও বলতে পারেন না। ঠাকুর কেশব সেনকে বলছেন, তুমি লোক দেখে দল কর না বলে তোমার দল ভেঙে যায়। ঠাকুর একেবার বাজিয়ে সবাইকে দেখে নিচ্ছেন। যেখানেই বুঝে যেতেন এই লোকটি এখানকার ভাবের নয়, তিনি তাকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এনাদের মধ্যে একটা intuitive power থাকে, যে শক্তি ধ্যানের গভীরে যাওয়ার জন্য, মৌন অবস্থায় যাওয়ার জন্য সাহায্য করে। তার সাথে মানুষের মনের সব কিছু পড়ার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু intuitive powerটাই তাঁদের সাংঘাতিক।

ভগবান কতটা জানেন আর কতটা জানেন না আমরা বলতে পারব না। আমরা তো শাস্ত্রের বাইরে যেতে পারি না, কিন্তু অবতার পুরুষরা যে সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পান তা না। স্বামীজী যে বলছেন আমি পরিষ্কার সব দেখতে পাচ্ছি, এটা হল তাঁর intuitive insight, কিছু কিছু জিনিষ যেন তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে। কিন্তু সব কিছুই যে ভেসে উঠছে তা নয়, এই একটা তফাৎ থাকে। কিন্তু এখানে মূল আলোচনা চলছে ঈশ্বরের লিপ্ত হওয়া নিয়ে। প্রশ্ন হল ঈশ্বর কি আদৌ লিপ্ত হন, যদি হন কতটা লিপ্ত হন। দ্বৈতবাদীরা আর ভক্তরা বলছেন সবটাই তিনি করছেন। তাহলে গোলমাল যখন হয় তখন তিনিও গোলমাল করছেন, দোষ তো তাঁরও হবে। এটাই এক কঠিন সমস্যা। রামানুজা কিংবা মাধ্বাচার্যরা উত্তর দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের উত্তরে সব কিছু পরিষ্কার হয় না। সঠিক উত্তর একমাত্র বেদান্তই দেয়। প্রতিবিম্ব গোলমেলে হয় আয়নার

দোষে। আয়নার দোষে আমি দেখছি আমার নাকটা ব্যাঁকা। আমি যদি এখন নাকের প্লাস্টিক সার্জারি করতে যাই, এর থেকে বড় মুর্খামি আর কিছু হতে পারে? দোষ আয়নাতে নাকে আমার কোন দোষ নেই।

শাস্ত্রে কোথাও বলছে না যে সূর্যের দোষ হয় তাই সূর্যকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র কত গোলমাল করে বেড়াত, তাকে প্রতিনিয়ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। চন্দ্রমা আবার কি একটা গোলমাল করল তাতে তার আবার যক্ষ্মা রোগ হয়ে গেল। দেবতারাও অনেক গণ্ডগোল করত আর তাদের প্রায়শ্চিত্তও করতে হত। কিন্তু সূর্য যে জগৎকে আলোকিত করছেন, জগতের ভালো মন্দ সব কিছুকে প্রকাশিত করছেন তার জন্য শাস্ত্র কোথাও বলে না যে তাতে সূর্যের দোষ হয়। বোঝাবার জন্য ঋষিরা এই উপমা নিচ্ছেন। কিন্তু প্রতিবিম্ব উপমাতে আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। আয়নার দোষে আমার আকৃতি পাল্টালে আসল চেহারাতে কিছুই আসে যায় না, তেমনি আত্মা বা ভগবান তিনি যে জগতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন, জগতের কোন দোষ তাঁর উপর বর্তায় না। আরও সাধারণ বুদ্ধিতে বলা হয়, দীপের আলোতে কেউ ভাগবত পড়ছে আবার কেউ নোট জাল করছে তাতে দীপের কিছু হয় না। পুলিশ এসে যে নোট জাল করছিল তাকে ধরবে। দীপকে কি পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে? হ্যাঁ, কখন সখন পুলিশ সেটাকেও ধরে। রাত্রিবেলা টর্চ নিয়ে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পুলিশ টর্চকেও ধরবে। টর্চ তখন একটা witness itemএর কাজ করবে, কিন্তু টর্চকে কোন সাজা দেওয়া হয় না। এখানে ঋষিরা একটা সত্যকে বোঝাতে চাইছেন, সত্যটা হল আত্মা বা ঈশ্বর নির্লিপ্ত। যদি ঠিক ঠিক উপমা দিয়ে বুঝতে হয় তাহলে প্রতিবিম্বই সব থেকে ভালো উপমা। বস্তুর দোষে আকৃতি পাল্টাতে পারে কিন্তু আসল বস্তুর আকৃতি কখনই পাল্টাবে না। সেইজন্য আমরা যদি পাপ করি সেটা আমাদেরই পাপ, পূণ্য করলে সেটা আমাদেরই পূণ্য। গীতাতেও বারবার বলছেন, আত্মা কারও দোষ-ত্রুটি, ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য কোনটাই নেন না। এরপর আমরা তৃতীয় বল্লী শুরু করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্শাখা এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।।২/৩/১।।

(এই সংসাররূপ অনাদি অশ্বত্থের মূল উর্ধ্বে এবং শাখা-প্রশাখা নিম্নে অবস্থিত। সেই মূলই শুভ্রজ্যোতি, এটাই ব্রহ্ম এবং এটাই অবিনাশী বলে কথিত। তাঁতে সমস্ত লোক আশ্রিত হয়ে আছে, তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা।)

আত্মতত্ত্বের কথাই চলছে। এই সংসারবৃক্ষের মূল উপরে আর তার শাখা-প্রশাখা নীচের দিকে বিস্তৃত। *এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ*, এই অশ্বত্থ সনাতন, অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, কবে থেকে এসেছে বলা যাবে না। *তদেব শুক্রং*, এটাই জ্যোতির্ময়, এটাই ব্রহ্ম আর এটাই অমৃত। এটাতেই সমস্ত লোক আশ্রিত আর একে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। *এতদ্বৈ তৎ*, হে নচিকেতা! তুমি প্রশ্ন করেছিলে আত্মা আছে কি নেই, ইনিই সেই আত্মা। এই ভাব আগেও আমাদের আলোচনায় এসেছে।

আচার্য এই মন্ত্রের উপর খুব সুন্দর একটা ভাষ্য দিয়েছেন। আচার্য বলছেন, *তুলাবধারণেনৈব মূলাবধারণম্*, তুল জিনিষটা যদি জেনে যাওয়া যায় তাহলে এর মূলের ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়ে যাওয়া যাবে, অর্থাৎ তুল কোন ধরণের বৃক্ষ থেকে এসেছে বলে দেওয়া যাবে। এখানে তুল বলতে সমস্ত জগৎকে কার্য রূপে বলছেন। কার্যকে জানা হয়ে গেলে কার্যের পেছনে যে কারণ বা তার মূলের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় বা জানা যায়। ডাক্তারের কাছে রোগী যখন সমস্যার কথা বলে তখন ডাক্তার সমস্যাকে মানে কার্যকে জেনে গেলেন, এবার তিনি সমস্যার কারণে দিকে এগোবেন, কার্যতেই থেকে যান না। কারুর মাথা ব্যাথা হয়েছে, মাথা ব্যাথাতো কোন রোগ নয়, তাই মাথা ব্যাথার কারণটা খুঁজতে হবে। তুল জানা হয়ে গেল এবার মূল জানতে হবে। যারা জগৎ জেনে গেছে এবার তাদের জগতের মূলকে জানা দরকার।

প্রসঙ্গে থেকে সরে কয়েকটা কথা আলোচনা করে নিলে ভালো হয়। জীবন চালাবার জন্য আমাদের একটা জীবন-দর্শন প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষেরই জীবন-দর্শন থাকে, এমনকি ছোট্ট বাচ্চার, যার সামান্য বোধ

এসেছে তারও জীবন-দর্শন আছে। দর্শন বলতে আমরা জানি ষড়দর্শন, বেদান্ত দর্শন, রামকৃষ্ণ দর্শন আরও অনেক রকম দর্শন। কিন্তু এগুলোকে কখনই ঠিক ঠিক দর্শন বলা হয় না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে যে তার নিজস্ব জীবন-দর্শন, সেটাই ঠিক ঠিক দর্শন। এই দর্শন দিয়েই তার জীবন চলে, তা সে ভালো-মন্দ যাই চলুক। প্রত্যেকটি মানুষের জীবন-দর্শন কোথা থেকে নির্ধারিত হয়? জীবন দর্শন সব সময় নির্ধারিত হয় শুধু একটি মাত্র কথা থেকে, তা হল আত্মদর্শন, আত্মদর্শন মানে মানুষ নিজেকে কি ভাবছে। আমি নিজেকে কি ভাবছি, আমার নিজের ব্যাপারে আমার কি বোধ, কি ধারণা, এটাই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শনকে কেন্দ্র করেই মানুষ জগতের দিকে একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাকায়। আত্মদর্শন আর জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী মিলে তৈরী হয় জীবন-দর্শন। অর্থাৎ নিজেকে আমি কিভাবে দেখছি বা আমি নিজেকে কি ভাবছি আর জগৎকে কিভাবে দেখছি, এই দুটো মিলে জীবন-দর্শন। জীবন-দর্শন দিয়েই নির্ধারিত হয় আমার আপনার জীবন কেমন চলবে। যার যার জীবন-দর্শনকে আধারিত করেই তার তার জীবন চলে। পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চার জীবন-দর্শন কোথা থেকে আসছে? সে নিজেকে জানে এই জগতে আমার মত আর কেউ নেই। এমন কোন পাঁচ বছরের শিশু পাওয়া যাবে না, যে নিজেকে কারুর থেকে কম মনে করে। তার আত্মদর্শনের দ্বিতীয় গুরুত্ব হল তার মা, তার সাথে মনে করে তার বাবার মত জগতে কোন লোক হয় না, বাবা তার কাছে ভগবান। এখানেই আত্মদর্শন কিভাবে ধীরে ধীরে define হয়ে যাচ্ছে – ওর মত কেউ নেই, ওর মায়ের মত কেউ নেই আর ওর বাবার মত কেউ নেই। যার জন্য দেখা যায় বাবা-মা যদি সন্তানকে ভালো না বাসে বা বাবা-মার মধ্যে যদি ঝগড়া অশান্তি লেগে থাকে বা বাবা-মায়ের মধ্যে কেউ যদি মারা গিয়ে থাকে, সন্তানের ব্যক্তিত্ব নড়বড়ে হয়ে যায়। আমার আত্মদর্শন আর আপনার আত্মদর্শন কোন দিন এক হবে না। কিন্তু আত্মদর্শনে সবারই একটা জিনিষ খুব সাধারণ, তা হল এই জগতে সবাই নিজেকে রাজা ভাবে। একটা কাঙালী ভিখারীও কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিজেকে একজন রাজা ভাবে। এই জগতে কোন পুরুষ নেই যে নিজেকে রাজাধিরাজ মনে করছে না, কোন মহিলা নেই যে নিজেকে বিশ্বসুন্দরী মনে করে না। কোন ছেলে পাওয়া যাবে না যে বলবে না যে তার মায়ের মত মা হয় না, তার বাবার মত বাবা হয় না। ফলে সবাই জগৎটাকে খড়কুটো বোধ করে। গৃহী বলুন আর সন্ন্যাসীই বলুন এই জায়গাতে সবাই এক।

এই জায়গাতেই শাস্ত্র মায়ের মত আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি আপনি নিজেকে যেটা ভেবে রেখেছি আর জগৎকে যেটা ভাবছি শাস্ত্র প্রথমেই এই দুটোর alignment ঠিক করে দেয়। ঠিক করে দেওয়া মানে, শাস্ত্র আমাদের বারবার ধাক্কা মেরে মেরে বলবে, জিনিষটা এরকম নয়। তুমি যে নিজেকে রাজাধিরাজ মনে করছে, সবারই মধ্যে এই আমিত্বটা আছে। আমিত্বের পেছনে যে ভাবনা কাজ করছে, আমি রাজা, আমার মত কেউ নেন, একটা মাত্র জিনিষ থেকে এই ভাবনা আসে, নিজেকে দেহ রূপে ভেবে, আত্মা রূপে ভেবে আসবে না। আত্মা রূপে সবাই মহৎ, ঈশ্বরের সাথে তোমার চিরন্তন সম্পর্ক হওয়ার জন্য তুমি মহৎ এতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি নিজেকে দেহ ভাবছ, নিজেকে মন ভাবছ। তোমার সব অহঙ্কার দেহ ও মনকে কেন্দ্র করে। কাউকে জিজ্ঞেস করা তুমি জীবনে কি হতে চাও মানে এটাই জিজ্ঞেস করা তুমি যে নিজেকে রাজাধিরাজ মনে করছ তুমি এই জগৎকে কিভাবে জয় করতে চাও।

একমাত্র খ্রীষ্টান ধর্ম ছাড়া যে কোন ধর্মের যে কোন শাস্ত্র শুরু থেকে মানুষকে একটা উচ্চস্তরে নিয়ে যায়। খ্রীষ্টান ধর্ম শুরুই হয় 'তুমি জন্ম থেকে পাপী' বলা থেকে। আমেরিকাতে স্বামীজী খ্রীষ্টান ধর্মের নিন্দা করে বলছেন, অমৃতস্যপুত্রকে বলছে পাপী, এর থেকে পাপ কথা আর হতে পারে না। মানুষকে পাপী বলাই পাপ। মানুষকে যদি জন্ম পাপী না বলে তাহলে খ্রীষ্টান ধর্ম ভেঙে পড়বে। অন্যান্য ধর্ম বলে তুমি আল্লার সন্তান, তুমি সেই আত্মা, তুমি অমৃতের পুত্র। অন্য দিকে তারা জন্ম থেকেই পাপী বলছে আবার বলছে তুমি স্বর্গরাজ্যের অধিকারী।

আমরা যে আত্মদর্শনের কথা বলছি, বেদান্ত এই আত্মদর্শনকে একটু realignment করে দিচ্ছে। হাত পা মচকে গেলে ডাক্তার যেমন সেটিং করে দেয়, বেদান্ত আমাদের আত্মদর্শনকে সেটিং করে দেয়। শাস্ত্র দেখিয়ে দিচ্ছে তোমার আত্মদর্শন আর জগৎদর্শনে তুমি নিজেকে দেহ মনে করছ আর জগৎকে জড় মনে করছ, এই দুটোই তোমার সব গোলমালের কারণ, এর সেটিংকে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আত্মদর্শন ঠিক হলে

জীবনদর্শনও ঠিক হয়ে যাবে। জীবনদর্শন ঠিক হয়ে গেলে তোমার জীবনটাও ঠিক হয়ে যাবে। জীবনে দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণার একটাই কারণ, নিজেকে দেহ মন রূপে ভাবছ। বিষম পরিস্থিতি এসে গেলে আমরা বন্ধনে পড়ে যাই, ঐ বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরকার একটা জানালা। বন্ধন থেকে একটু মুক্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য যখন আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি তখন টাকা-পয়সা আমাদের জানালা হয়ে আসে। ভাবছিলাম দুটো টাকা হলে আমি মুক্তি পাব, শান্তি পাব। ভালোবাসাও কারুর জানালা হয়ে আসে, একটু ভালোবাসা জীবনে যদি পাই আমার শান্তি এসে যাবে। কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না, আমরা চাইছি সে যেন আমারই হয়, আমারই যেন একান্ত আপন হয়। কেন ভাবছি? আমার দেহবোধ আমাকে তাই ভাবাচ্ছে। যত সমস্যা এই দেহবোধকে কেন্দ্র করে। জগৎকেই আমার নিত্য বলে মনে হয়, তাই জগৎকে লুটপুটে খেতে হবে। শাস্ত্র এগুলিকে realign করে দিচ্ছে। শাস্ত্র আমাদের বন্ধুর মত দেখিয়ে দিচ্ছে, তুমি দেখ এই হল জগতের যথার্থতা, জগতের সত্য এই রকম। আর তোমার যথার্থতা এই রকম। যখন তুমি নিজেকে আর জগৎকে এভাবে দেখবে তখন তোমার জীবনের alignmentটা ঠিক হয়ে যাবে। রেললাইন দিয়ে আগেকার দিনে ট্রলি যেত, দুজন লাইনের উপর দিয়ে ট্রলিটাকে ঠেলতে থাকে আর একজন সাহেব ট্রলিতে বসে থাকে। ঠেলতে ঠেলতে একট স্পীড নিলে দুজন লাফিয়ে ট্রলিতে উঠে পড়ত, তারপর অন্য দুজন নেমে ঠেলতে থাকত। ট্রলি চালিয়ে দেখে নেওয়া হত রেল ট্র্যাকের alignmentটা ঠিক আছে কিনা। রেল ট্র্যাকের alignment যদি ঠিক না থাকে গাড়ি লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। শাস্ত্র আমাদের জীবনের যে ট্র্যাক তার alignmentটা চেকিং করিয়ে দেখিয়ে দেয় তোমার এই এই জায়গায় গোলমাল আছে, এই গোলমাল থাকলে তোমার জীবনের ট্রেন ছিটকে পড়বে, গন্তব্য স্টেশনে ট্রেন আর পৌঁছাতে পারবে না।

এই alignment ঠিক করতে গিয়ে বলছেন *ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখা এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ*। এই জগৎকে তুমি যে ভাবছ এটাই শেষ অস্তিত্ব, এর বাইরে আর কিছু নেই, কিন্তু তা নয়। এই জগতের মূল সেই ভগবানে, এই জগতের মূল সেই আত্মাতে, সেখান থেকেই গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, জীব, উদ্ভিদ সব কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে গেছে।

শাস্ত্রের বাইরেও অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের অনেক আদর্শের কথা বলা হয় যাতে আমরা অসুর স্বভাবের না হয়ে যাই। যখনই কোন আদর্শ দেওয়া হয় তখন আদর্শের মধ্যে কোন না কোন ভাবে ত্যাগের ভাব থাকে। যেমন বলা হয় নেতাজীর মত হও। নেতাজী কি করলেন? নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি দেশের জন্য দিয়ে দিলেন। আমরা যে নিজেদের ছোট্ট আত্মকেন্দ্রিক জীবনকেই সর্বস্ব মনে করছি, আদর্শ সেখান থেকে আমাদের একটা বৃহত্তর জীবনের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে কাঁচা আমিকে ত্যাগ করতে বলা হয়। শাস্ত্রও আদর্শের কথাই বলাছে, তবে অন্য ধরণের। শাস্ত্র সবার সামনে জগতের সত্যগুলিকে রেখে দিচ্ছেন। নিজেকে বিরাট কিছু মনে করা, সবাইকে তুচ্ছ মনে করা, শাস্ত্র আমাদের এই মানসিকতার মূলোচ্ছেদ করছে। কিন্তু পুরোপুরি উচ্ছেদ করা যায় না। প্রচুর পরিশ্রম না করলে আর সাধুবৃত্তি না এলে এই মানসিকতা যাবে না। ঠাকুর বলছেন সাধুর সব চলে যায় কিন্তু সাধুত্বের অহঙ্কার যায় না। যিনি জ্ঞানী তাঁরও অহঙ্কার থাকে, কিন্তু সেই অহঙ্কার আমি সেই আত্মা বা আমি ঈশ্বরের সন্তান এই রূপে থাকে। এই অহঙ্কারের জন্য জ্ঞানী জগতের কাউকেই তাচ্ছিল্য করেন না। আমি শ্রেষ্ঠ এই বোধ সব সময় থাকবে। গানে বলছেন, আমি দুর্গা বলেছি আমার আবার কিসের পাপ। সেখানেও একই জিনিষ, আমি শ্রেষ্ঠ কেন, আমি দূর্গার নাম করেছি। এতই অহঙ্কার যে পাপও আমাকে ছুঁতে পারবে না। এতক্ষণ মানুষ ছুঁতে পারছিল না, এবার পাপও ছুঁতে পারবে না। আমি শ্রেষ্ঠ, এই বোধ কখনই যেতে চায় না। ভক্তিগীতিতে বলছে, আমার মায়ের ছেলে, আমরা কি কম আসুক না যম। এতক্ষণ মানুষকে বলছিল, এসো তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এখন যমরাজকেই বলছে এসো তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। রাবণও তাই করেছিল, এসো তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এখানে আমি দেহ এই বোধ নিয়ে হচ্ছে না, আমি মায়ের সন্তান এই বোধ নিয়ে হচ্ছে, এখানে re-alignment করা হচ্ছে।

জগৎটা আসলে কি, এই জিনিষটাকেই ব্যাখ্যা করতে উপনিষদ বলছেন *ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখা এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ*, এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উপরের দিকে আর তার শাখাপ্রশাখা নীচের দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে, আর বলছেন সংসারবৃক্ষ *সনাতনঃ*, এর আদি নেই অন্ত নেই। আমাদের একটা বৃত্তের মধ্যে

ঘিরে দেওয়া হল, বৃত্ত কোথায় শুরু কোথায় শেষ আমরা কোন দিন খুঁজে পাব না। কিন্তু এই বৃত্তকে অতিক্রম করে যাওয়া যায়। বৃত্তের আদি অন্ত জানা যাবে না, কিন্তু এর বাইরে চলে যাওয়া যায়। গীতায় ভগবান বলছেন জগৎকে উচ্ছেদ করতে হবে। তাহলে কি এই সংসারবৃক্ষ উচ্ছেদ হয়? কিছুই উচ্ছেদ হয় না। আমাদের যে সংসারবৃক্ষ সেটার উচ্ছেদ হয়। কিন্তু উচ্ছেদ হলেও সেই সংসারেই থাকছি। তাহলে সংসার মানে কি?

সংসারের সমস্ত তন্মাত্রা অনবরত আমাদের আঘাত করে যাচ্ছে, আঘাতের সাথে আমরাও নিজেদের মন থেকে একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দিই। সমস্ত প্রতিক্রিয়ার যে সমষ্টি এটাই সংসার। এই সংসারের পুরোমাত্রায় অস্তিত্ব আছে। তাহলে সংসার বলতে বোঝাচ্ছে, আমাদের ভেতরের যে subjective reation to the external world এটাই সংসার। আপনি একজন মানুষ, আপনার একটা objective reality আছে, আপনাকে দেখে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া হবে। আপনি যদি ডাক্তার হন তাহলে একজন রোগী আপনাকে দেখে ভাববে উনি এসে গেছেন এবার আমি ভালো হয়ে যাব। অন্য রোগী ভাববে আমার থেকে এখন টাকা আদায় করবে। আপনার স্ত্রী দেখে ভাববে এবার আমাকে হুকুম দিতে শুরু করবে। বিভিন্ন লোকের যে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া এটাই তাদের এক একটা সংসার। এই ব্যাপারটা শুধু একজনকে নিয়েই হচ্ছে না। জগতে যত বস্তু আছে, যত লোক আছে, যত টাটকা বাসি স্মৃতি আছে, সব কিছুর প্রতি আমাদের যে প্রতিক্রিয়া, সমস্ত প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিটাই সংসার। বাইরের জগৎ যেমন আছে তেমনই থাকবে, যেমন চলছে তেমনই চলতে থাকবে, এর কোন দিন কোন পরিবর্তন হবে না। তাহলে কার পরিবর্তন হবে? আমার আপনার সংসারের পরিবর্তন হয়ে যাবে। এখন যাকে ভালোবাসি তাকে দেখলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে যাব, যাকে পছন্দ করি না তাকে দেখলেই চুপসে যাব, এই ধরণের নানান রকমের প্রতিক্রিয়া হয়ে চলেছে। শুধু একজন দুজনকে নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা তো নয়, হাজার হাজার বস্তুর সাথে আমার সংযোগ হয়ে আছে। তার বাইরে অপরিচিত যারা আছে তারা neutral, neutral যারা তাদের দেখলে মনে হয় কি জানি কি করবে। জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ একজনকে সেই জঙ্গলে দেখলাম। তখনই মনে একাধিক প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করে দিল, কি জানি বাপু ডাকাত কিনা, কি জানি আমাকে সাহায্য করবে কিনা। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলে সবাইকেই বিশ্বাস করে, এটাই তার সংসার। যে জীবনে প্রচুর মানুষের কাছে প্রতারিত হয়ে এসেছে, কেউ কাছে এলে সে ভাববে, এই রে! আবার আমাকে ছোবল দিতে এসেছে। এটাই তার সংসার। প্রত্যেকে মানুষের যে সংসার সেটা হল তার অন্তঃপ্রতিক্রিয়া। বাহ্য জগতের বস্তু থেকে মানুষের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং সেই চাঞ্চল্যের দরুণ তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আর সমস্ত প্রতিক্রিয়ার যে সমষ্টি, এটাই সংসার।

এখানে *ঊর্ধ্বমূলম্* মানে এই সংসারের কথা বলছেন, বহির্জগতের সংসার নিয়ে বলা হচ্ছে না। বহির্জগত যেমন চলছে তেমনই চলতে থাকবে, এর কোন পরিবর্তন হবে না কিন্তু আমার আপনার সংসারটা পাল্টে যাবে। কাউকে দেখে উচ্ছ্বসিত হওয়া, কাউকে দেখে চুপসে যাওয়া এই জিনিষগুলো আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি তখন neutral হয়ে যাবেন। গয়নার দোকানে একটু নতুন ডিজাইনের গয়না দেখে বলছেন, কী দারুণ গয়না! এটাই আমাকে নিতে হবে। অন্য একটা গয়না দেখে বলছেন, এটা ফালতু, আমার কাজের মেয়ের এই ডিজাইনের একটা গয়না আছে, আমি নেব না। কিন্তু আপনি যখন বলবেন আমার শুধু সোনা জিনিষটাই চাই, তখন ভালো গয়নারও কোন মূল্য থাকবে না, মন্দর গয়নারও কোন মূল্য থাকবে না। এবার আপনার সংসারটা পাল্টে গেল। উপনিষদে যখন সংসারের কথা বলা হয় তখন তাঁরা বাহ্য জগতের ব্যাপারে কিছু বলেন না, আমাদের যে subjective reation সেটাকে নিয়ে আলোচনা করছেন। যার কাছে আপনি প্রচুর কষ্ট পেয়েছিলেন, সে হয়ত অনেক দিন আগে মারা গেছে, মরে কোথাও অন্য কিছু হয়ে আছে, কিন্তু আপনার যে সংসার সেখানে সে এখনও কেল্লা সাজিয়ে বহাল তবিয়তে বসে আছে, রোজ আপনাকে বাক্যবাণ ছুঁড়ে যাচ্ছে আর আপনিও তিড়িংবিড়িং করে যাচ্ছেন, সংসার মানে এটাই।

আপনার এই সংসারের মূল কোথায়? বলছেন, এর মূল সেই ঊর্ধ্বে, আত্মাতে। বাইরের জগৎ যেমন চলার তেমনই চলতে থাকবে, এর সাথে আমার আপনার কোন সম্পর্ক নেই। একজন ভদ্রলোককে দেখে পাঁচ জনের পাঁচ রকম আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া মানে প্রত্যেকের সংসারের একটা ছোট্ট অঙ্গ। আমরা যদি বিচার করে দেখি, এই জগতে যেখানে যা কিছু আছে এর সব কিছুর উপর আমার

আপনার যে প্রতিক্রিয়া, এই প্রতিক্রিয়ার যে সমষ্টি এটাই আমার আপনার সংসার। এই সংসারের সব কিছু যখন ঈশ্বরের দিকে চলে যায় তখন সংসারের রূপটা পাল্টে যায়, আবার সব কিছু যখন জাগতিক দিকে চলে যায় তখন রূপটা অন্য রকম হয়ে যায়। সংসারের এই ধারণা যদি পরিষ্কার না হয়, সংসার বলতে এনারা ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন, এটাকে না ধরতে পারলে গীতাতে যে *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থম্* বলছেন বা এখানে যে *ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্শাখা এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ* বলছেন, এর অর্থ কোন দিন পরিষ্কার হবে না। যিনি সাধনা করছেন তাঁর কাছে বাইরের জগতের কোন দাম নেই। জগৎ জগতের মত থাকবে, ট্রেন চলবে, বাস চলবে, মানুষের জন্ম হবে, মারা যাবে সবই হবে কিন্তু তোমার ভেতরে subjective reation কি হবে সেটা দেখ।

কিন্তু আমাদের তা হয় না, আমরা সব সময় রাগ ও দ্বেষ প্রেরিত হয়ে আছি। অথচ মনের যে পাঁচ রকম বৃত্তি, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা আর স্মৃতি এগুলো বাইরে কোথাও নেই, সবটাই আমাদের মস্তিষ্কে বাসা বেঁধে আছে। শাস্ত্রে যা কিছু বলছেন, সংসারের কথা বলছেন, আত্মার কথা বলছেন, ব্রহ্ম যখন বলছেন, ভগবান যখন বলছে তখন সবটাই অন্তর্জগতের কথা বলছেন, বাইরের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। তাহলে বাইরেরটা কিসের জন্য? জীবনযাত্রা চালানোর জন্য। আমি যদি খাওয়া-দাওয়া না করি আমার শরীরের পতন হয়ে যাবে। শরীর না থাকলে যে জায়গাতে আমার পৌঁছানর কথা সেখানে পৌঁছাতে পারব না। খাওয়া-দাওয়ার করার জন্য দুটো টাকার দরকার, ঘর সামলাবার জন্য একজন মানুষ দরকার। এদের নিয়ে শাস্ত্র কিছু বলছেন না, কিন্তু যখনই আমরা ধীরে ধীরে এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে এর মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছি তখনই শাস্ত্র আমাদের আটকে দিচ্ছেন। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, যারা সাধন ভজনের জীবন বেছে নিয়েছে তাদের খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বর অনেক কমে যায়, সামান্য ঝোল-ভাত হলেই হয়ে যায়। ঠাকুরের কথা শোনার পর আমাদের মত ঠাকুরের ভক্তদের মন একটু হলেও মুষড়ে যাবে, শুধু ঝোল-ভাত খেয়ে কি জীবন চলে! একটু তেল, ঝাল, মশলা না থাকলে খাবার রুচবে কী করে! কিন্তু সত্যিই যদি বিচার করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সব রকম জাগতিক সুখ ভোগ সবটাই মনের ব্যাপার। এগুলো বাইরের ব্যাপার বলে যে ভাবছি আসলে তা নয়। বাইরে কোথাও কিছু নেই, যা আছে সব মনে। এটাই সংসার, সংসারের উচ্ছেদের কথা যখন বলছেন তখন এই সংসারের উচ্ছেদের কথাই বলছেন। সংসারকে অনাদি কেন বলছেন? কারণ যবে থেকে আমি সৃষ্টি হয়েছি তবে থেকেই আমি আছি আর আমার মন আছে। কত দিন থাকবে? অনন্ত কাল থাকবে, মানে যত দিন আমার জ্ঞান প্রাপ্তি না হবে। জ্ঞান প্রাপ্তিতে কিছুই হবে না, যে বৃত্তিগুলি এখন এক রকম চলছে, এই বৃত্তিগুলিই তখন অন্য রকম চলবে। সোনার গয়না না মনে হয়ে সব গয়নাকেই সোনা মনে হবে। বাইরের জগতের সাথে শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই, শাস্ত্রের যা কিছু সব ভেতরকে নিয়ে। আপনি যে আপনার সন্তানকে ভালোবাসছেন এটাই সংসার, আপনি যখন কাউকে অপছন্দ করছেন তখন সেটাই সংসার। একটা সময় আসবে যখন আপনার মনে হবে এরও কোন দাম নেই ওরও কোন দাম নেই। তাই বলে সংসারের যে অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে তা নয়, এটাও থাকবে ওটাও থাকবে। যা আছে তা আছে কিন্তু আপনার intensity কমে যাবে।

থিয়েটারওয়ালারা ঠাকুরের কাছে এসেছে, তার শুনেছে ঠাকুরের মা কালীর দর্শন হয়। ঠাকুরকে তারা জিজ্ঞেস করছে, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন কি রকম? ঠাকুর তাদের বোঝাচ্ছেন, থিয়েটার শুরু হওয়ার আগে সবাই এক অপরের সাথে গল্প করে, এর ওর খবর নেয়, থিয়েটারের পর্দা যেই উঠে গেল সব কথাবার্তা, আলাপ বন্ধ হয়ে যায় আর সবার দৃষ্টি একবারে থিয়েটারে চলে যায়। তাতে কি আশেপাশের সবার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে? একেবারেই না। হল ভর্তি লোক কিন্তু সব গুঞ্জন বন্ধ। যাঁদের ঈশ্বরের জ্ঞান হয় তাঁদের ঠিক তাই হয়। এই যে বলছেন ভালো-মন্দের পারে চলে যান। ভালো-মন্দের পারে মানে কি? ভালো-মন্দ সবটাই আছে কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পুরো থিয়েটারে, এদিকে কিছু নেই। হঠাৎ হয়ত সন্তান বলছে, বাবা বাথরুমে যাব, তখন সেটাও করিয়ে দিচ্ছেন। সেখান থেকে এসে আবার পুরো দৃষ্টি থিয়েটারে। দৃষ্টি সব সময় এদিকে, ওদিকের দৃষ্টিটা শেষ। জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যাওয়ার পর সবই থাকবে, জগৎও থাকবে। এই ব্যাপারটা ভালো করে না বুঝলে উপনিষদ কোন দিন বুঝতে পারা যাবে না। কিন্তু জগতের ব্যাপারে গুরুত্ব অনেক কমে যায়, কমতে কমতে একেবারে শূন্যে চলে যায়। নাটকে কোন উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য থাকলে তখন যেমন কোন বোধ থাকে না, ঠিক তেমনি মন পুরো ঈশ্বরে চলে গেলে জগতে যাই হয়ে যাক তখন জগতের কোন বোধই থাকে না।

এখানে এই জগৎকে নিয়েই বলছেন, কিন্তু বোঝার চেষ্টা যখন করতে হবে তখন সংসার দৃষ্টি দিয়েই বোঝার চেষ্টা করতে হবে, সংসার দৃষ্টি মানে আমার প্রতিক্রিয়াটা কি। সমুদ্রের তলায় ঝিনুকের ভেতরে একটা ছোট্ট বালির কণা চলে গেলে ঝিনুক তার শরীর থেকে একটা প্রতিক্রিয়া ছাড়ে, ঐ প্রতিক্রিয়াটাই ধীরে ধীরে একটা দামী মুক্তাতে পরিণত হয়ে যায়। মুক্তাটা বাইরে থেকে আসছে না, ঝিনুকের ভেতরেই তার সৃষ্টি। আমরা কত শুনছি মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। এটাই বলছেন, সংসার জিনিষটা আমাদের মনের ভেতরে। যোগশাস্ত্র দিয়ে জিনিষটাকে খুব সহজে বোঝা যায়। বাইরে থেকে যখনই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন উত্তেজনা ভেতরে আসছে তখনই মন সেটার দিকে একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেয়। সংসারের কথা, জগতের কথা, যা কিছু বলছেন এনাদের একটাই বক্তব্য, বাইরে যা কিছু আছে এর জন্য তোমার মন একটা প্রতিক্রিয়া ছাড়ে। তোমার ভেতরে যে স্মৃতি আছে, নিদ্রা আছে, স্বপ্ন আছে এগুলোও এক একটা উত্তেজনা, যার জন্য তোমার মন একটা প্রতিক্রিয়া ছাড়ছে, যত ধরণের প্রতিক্রিয়া আছে তার সমষ্টিটাই তোমার সংসার, যে সংসারের মূল দুটো জিনিষ – রাগ আর দ্বেষ। তার সাথে আরেকটা ব্যাপার চলে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা। কিন্তু রাগ আর দ্বেষই মূল। রাগ আর দ্বেষ মানে, কিছু জিনিষের দিকে আমরা এগিয়ে যাই আর কিছু জিনিষের থেকে আমরা পালিয়ে যেতে চাই। এগিয়ে যাওয়া আর পালিয়ে আসা এই দুটো থেকেই আমাদের যত রকমের ক্রিয়াকর্মাদি হয়। এনারা বলছেন তুল জানলে মূল জানা যায়। সব শক্তি তোমার ভেতরে, ভয় তোমার ভেতরে, রাগ তোমার ভেতরে, এই কথাগুলি যে বলছেন, তার মানে তুল জানা হয়ে গেল। এবারে মূল জানতে হবে। মূলকে জানার কথা বলতে গিয়ে শুরু করছেন *ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখা*।

বহির্জগৎ আর মনের যে সংসার দুটোরই মূল ঊর্ধ্বে, সেই ভগবানে। আচার্য বলছেন *ঊর্ধ্বমূলঃ ঊর্ধ্বং মূলং – যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*, ভগবান বিষ্ণুর যে পরম পদ, সেটাই মূল। অনেকে মনে করেন আচার্য শঙ্কর ভগবান মানতেন না। অথচ কথায় কথায় আচার্য ভগবানের কথা বলছেন। *পরমং পদম্*, ভগবানের অনেকগুলো পদ আছে, যখন তিনি দেবলীলা করছেন সেটাও তাঁর একটা অবস্থা, যখন নরলীলা করছেন সেটাও তাঁর আরেকটা অবস্থা আবার নরকলীলা সেটাও তাঁরই পদ। কিন্তু *পরমং পদম্*, ভগবানের *পরমং পদম্* মানে বিষ্ণুর যে নির্গুণ নিরাকারের অবস্থা, যেখানে কোন ধরণের বৃত্তি নেই, যেখানে সুখ নেই, দুঃখ নেই, আলো নেই, অন্ধকার নেই সেই পরমপদ। *ঊর্ধ্বং*, ভগবান বিষ্ণুর যে পরমপদ সেটাই মূল। কিসের মূল? জগতের, যেটা আপেক্ষিক জগৎ, যেখান থেকে দুই শুরু হয়, যেখানে সুখ-দুঃখের শুরু হয়, যেখানে আলো-অন্ধকারের শুরু হয়, যেখানে পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্মের শুরু। পরমপদ মানে শ্রেষ্ঠ অবস্থা, ভগবান বিষ্ণুর যেটা শ্রেষ্ঠ অবস্থা। তিনি নির্বিকার কোন কিছুতে তিনি জড়িয়ে নেই, তাঁরই ছায়া সব কিছুতে ছড়িয়ে আছে। অব্যক্ত থেকে স্থাবর পর্যন্ত, অব্যক্ত মানে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে স্থাবর পর্যন্ত যা কিছু আছে এটাই সংসারবৃক্ষ। জগতে তো কত কিছুই আছে তাতে আমাদের আর কি! কিন্তু ওখান থেকে যে উত্তেজনা গুলো আসছে, যেগুলো আমাদের টোকা মারছে আর তার ফলে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া গুলি বেরোচ্ছে, এই প্রতিক্রিয়াই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে ঐটা কোথা থেকে এসেছে? ভগবান থেকেই এসেছে। আর আমাদের যত বৃত্তি, বৃত্তি থেকে যা কিছু হচ্ছে, এগুলো এই জন্যই হচ্ছে এর পেছনে আত্মা আছেন। আত্মার জন্যই বুদ্ধিতে চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্যের মূল এই আত্মাতেই।

এর জন্য কি করতে হবে? *সংসারবৃক্ষ ঊর্ধ্বমূলঃ বৃক্ষশ্চ ব্রশ্চনাৎ*। বৃক্ষ কেন বলা হয়, *ব্রশ্চনাৎ* অর্থাৎ যে জিনিষকে ছেদন করা যেতে পারে। সংস্কৃতে বস্তুর নামকরণ বস্তুর গুণ আর কার্য দিয়ে করা হয়। বৃক্ষ নামও এভাবেই এসেছে, বৃক্ষকে কেটে দেওয়া যায়। আপনি বলবেন ছাগলকেও তো কেটে দেওয়া যায়, তখন ছাগলের নামকরণের পেছনে অন্য কারণ থাকে। গো মানে যে চলে, গমন থেকে গো বা গরু শব্দ এসেছে। এক একটা জিনিষে অনেকগুলো গুণ থাকে, তার একটা কোন গুণকে আধার করে জিনিষের নামকরণ করা হয়। বৃক্ষ যেমন ফল দেয়, কাঠ দেয় কিন্তু বৃক্ষকে আবার ছেদনও করা যায়। *ব্রশ্চনাৎ* অর্থাৎ উচ্ছেদন করা, যাকে উচ্ছেদন করা যায় তার নামকরণ করা হল বৃক্ষ। এই জায়গাতে আচার্য বৃক্ষকে *ব্রশ্চন* থেকে নিচ্ছেন, এটাই যদি ফল দেওয়ার অর্থে নেওয়া হত তখন আচার্য অন্য ধাতু দিয়ে সেটাকে ব্যাখ্যা করে দেখাবেন এর বৃক্ষ নাম এই কারণে। এই জায়গাতে উচ্ছেদনের গুরুত্ব বেশি বলে এই অর্থ করে ব্যাখ্যা করছেন।

এখানে আচার্য একটা বাক্যকে দু পাতা ধরে বলে যাচ্ছেন। সংস্কৃতের এটাই বৈশিষ্ট্য, শব্দকে আগে পরে করে দিলে তার অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। অন্যান্য ভাষায় অর্থ পাল্টে যাবে। আচার্য এই সংসারবৃক্ষ, আমাদের নানা রকম প্রতিক্রিয়াকে নিয়ে বলছেন, *অবিচ্ছিন্ন-জন-জরা-মরণ-শোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ*, এই সংসারবৃক্ষে জন্ম, জরা, মরণ, শোক, যত রকমের অনর্থ বিচ্ছিন্ন ভাবে লেগে আছে। যাকে ভালোবাসছি সে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, একদিন সে মরে গেল, আমি নিজেও বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একদিন দেখব মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছি। আচার্য এগুলোকে বলছেন অনর্থ। অনর্থ কেন বলছেন? বৃদ্ধ হওয়া কি খারাপ? মরে যাওয়া কি খারাপ? কিছুই খারাপ নয়, কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়া যে অন্য রকম। আমি চাইছি না আমার প্রিয়জন মারা যাক, আমি চাইছি না আমি বুড়ো হয়ে যাই, বুড়ো হয়ে গেলে আমাকে আর কেউ সম্মান করবে না, খাওয়া হজম হবে না, হাঁটাচলা করতে পারব না, কারুর সাথে দেখা করতে যেতে পারব না। এতদিন ধরে জীবনের ক্যানভাসে যে ছবি তৈরী করেছি সেই ছবিটা ভেঙে গেল। সেইজন্য বলছেন অনর্থ। কে না জানে যে মানুষ মরবে, কম বয়সী মানুষও তো কত মারা যাচ্ছে। কিন্তু অনর্থ কেন? কারণ আমার কাছে মৃত্যুটা গ্রহণীয় নয়।

আবার বলছেন, *প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবঃ*, প্রতিটি ক্ষণে এই সংসারবৃক্ষ পাল্টাচ্ছে, একটুও স্থির থাকতে পারে না, এটাই এর স্বভাব। গঙ্গার জল প্রতি মুহুর্তে পাল্টে যাচ্ছে, আমাদের জীবনেও কোন কিছুই স্থির থাকছে না। কেউ যদি এসে আমাকে বলে, চল্লিশ বছর আগে আপনি যেমন ছিলেন তেমনই আছেন, এর থেকে আমার কাছে আর লজ্জার জিনিষ আর কিছু নেই। পাথর যেমন পাল্টায় না, হাজার বছর আগে পাথর যেমন ছিল এখনও সেভাবেই পড়ে আছে, আমিও তাহলে একটা পাথর। যদি বলা হয়, তুমি কত পাল্টে গেছ, এটাই স্বাভাবিক। দশ বছর আগে যেমন মুর্খ ছিল আজও কি সেই রকম মুর্খ থাকবে! তার ব্যক্তিত্বের কোন বিকাশ হবে না, এটা কি কখন সম্ভব! বারো বছরে শরীরের সব কোশিকা পাল্টে যায়; আর আপনি বলছেন আমি চল্লিশ বছর আগে যেমনটি ছিলাম আজও তেমনটি আছি! হয় আমি পাথর আর নয়তো আপনার দৃষ্টিতে দোষ আছে। সংসারবৃক্ষ সতত পরিবর্তনশীল। কিন্তু আমরা পরিবর্তন চাই না। সকালের শিশিরসিক্ত সদ্যোপ্রস্ফুটিত গোলাপ কত সুন্দর, আহা রে! কাল এর সতেজতা ম্লান হয়ে যাবে, পরশু এর সব পাপড়ি ঝরে যাবে। আমরা ভাবি গোলাপ যদি চিরদিন এমনটিই থাকত। শিশু কত সরল, ওর আধো আধো কথা শুনতে কত মিষ্টি লাগছে, যদি এমনটি চিরদিন থাকত কত ভালো হত। কিন্তু সময়ের তালে তালে সবই পাল্টে যাচ্ছে।

বলছেন *মায়মরীচ্যুদক-গন্ধর্ব-নগরাদিবৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপতাদবসানে*, বৃক্ষকে ছেদন করে দিলে যেমন অভাব হয়ে যায়, ঠিক তেমনি যা কিছু আছে শেষে সব কিছুর অবসান হয়ে যায়। যাঁরা সাধনা করে সমাধির অবস্থায় চলে যান, ঐ সমাধি অবস্থায় তাঁরা দেখেন জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। *বৃক্ষশ্চ ব্রশ্চন্*, বৃক্ষকে কেটে দিলে যেমন বৃক্ষের অভাব হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সমাধিতে তাঁদের কাছে এই সংসারবৃক্ষের নাশ হয়ে যায়। সেইজন্য এই সংসারকে বৃক্ষ বলা হয়। এমনিতে এর নাশ হয় না। একদিকে আমাদের দৃষ্টিতে দেখছি ক্ষণভঙ্গুর, অন্য দিকে দেখছি এর মধ্যে অনেক রকম অনর্থ আবার ঈশ্বর দর্শন হলে বা সমাধিতে দেখছেন বৃক্ষের নাশ। কারণ ঈশ্বর ছাড়া তো কিছু নেই। আর অন্য দিকে *কদলী-স্তম্ভবৎ নিঃসারঃ*, কলাগাছের কোন সার নেই, অসার। কলাগাছ দিয়ে কোন আসবাব করা যায় না, জগৎটা কলাগাছের মতই নিঃসার। ঠাকুর বলছেন, সংসার হল আমড়া, শুধু আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল। আমাদের সমস্যা হল আমরা এত বেশি নিজেকে নিয়ে সম্মোহিত, আমি ভাবটা এত জোরাল, আমি শ্রেষ্ঠ, আমার মত কেউ নেই, শুধু আমি, আমি আর আমি, কিন্তু এই আমিটা পুরো দেহ মন কেন্দ্রিত, এই ভাবের জন্য আমাদের মনে হয় যে জগৎটা আমারই জন্য, যত লুটপুটে নিতে পারি। অথচ যাঁদের মধ্যে একটু আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে তাঁরা দেখেন সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর, জলের বুদ্বুদের মত সব আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, সবই অসার। অসার, নিঃসার কার বোধ হবে? যাঁরা সুখ চাইছেন, শান্তি চাইছেন, জ্ঞান চাইছেন। আর যারা এগুলো চাইছে না, তাদের কাছে মনে হবে পুরো সার ভর্তি, মালাই আর মাখনে ঠাসা, চিবিয়ে চিবিয়ে, চুষে চুষে, চেটেপুটে খাবে। খাওয়ার পর অম্লশূল, ডায়বেটিস, কোলোস্টোরাল, বাইপাস, মৃত্যু। জন্ম, মরণ, শোক এগুলো লেগেই আছে। ঠাকুর যে বলছেন আমড়া খেলে অম্লশূল, তার অর্থ এটাই। আর প্রতিক্ষণ পরিবর্তন, এটাই শূল, এটাই কষ্ট। যারা সংসারে সার আছে মনে করে দৌড়াচ্ছে তাদের এই দুরবস্থা। বাকিরা যারা দৌড়াচ্ছে না, তাদের কাছে সবটাই অসার মনে হয়। এই হল জগৎ। আচার্য একজন বড় কবি, কাব্যিক ভাবে একটা চরম সত্যকে ব্যাখ্যা করছেন।

তার আগে আচার্য এই জগৎ কি রকম বলতে গিয়ে বলছেন, মায়ামৃগতৃষ্ণার জলের মত। মরীচিকাতে যে জল দেখা যায়, ঐ জল দিয়ে যেমন কোন দিন বালির একটি কণাও ভিজবে না, তেমনি এই জগৎ দিয়ে কারুর কোন কাজ হয় না। আর বলছেন *দৃষ্টনষ্টস্বরূপ*, এই দেখা যাচ্ছে আবার এই দেখা যাচ্ছে না, কলাগাছের মত জগৎটা নিঃসার। যতক্ষণ আমরা এই কথাগুলো শুনছি ততক্ষণ মনে হবে খুব দারুণ কথা শুনছি, সবটাই সত্য মনে হয়। কিন্তু নিজের জীবনে লাগাতে গিয়ে দেখছি কিছুই হয় না। জার্মান দার্শনিক শ্যপেনহাওয়ার উপনিষদ পড়েছিলেন। ওনার দর্শনও খুব নামকরা। শ্যপেনহাওয়ারের দর্শনে উপনিষদের রীতিমত প্রভাব দেখা যায়। তিনি পুরো উপনিষদকে ব্যাখ্যা করছেন না, নিজের মত একটা দর্শন দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানেও জগতের নশ্বরতার উপর বেশি জোর দিয়ে গেছেন। ওনার শরীরটা খুব স্থূল ছিল, খেতে খুব ভালোবাসতেন। হোটেলে উনি একাই দু-তিন জনের খাবার অর্ডার দিয়ে খেতেন। লোকেরা তাঁর খাওয়া অবাক হয়ে দেখত। পার্টি করা তাঁর খুব পছন্দের ছিল। পার্টিতে সোসাইটির মেয়েরা শ্যপেনহাওয়ারকে ঘিরে রাখত। তাদের কাছে শ্যপেনহাওয়ারের কথাগুলো খুব মজার লাগত। শ্যপেনহাওয়ার খেতে খেতে নিজের দর্শনের কথা বলতেন, জগতের নশ্বরতার কথাই বেশি বলতেন। উনি খুব মজা করে বলতেন, জগৎকে আমার অনিত্য, অসার বলে বোধ হয় কিন্তু যখন খেতে বসি তখনই জগৎকে আমার সার বলে বোধ হয়। সারাটা দিন জগৎ ওনার কাছে অসার আর শুধু খাওয়ার সময় জগৎটা সারে পরিপূর্ণ বলে বোধ হত। যতক্ষণ উপনিষদের কথা শুনি ততক্ষণই জগৎকে অসার বলে বোধ হয়, যেমনি উপনিষদ ছেড়ে জগতে নামছি তখনই জগতের অসারত্বকে মিথ্যা বলে বোধ হয়। শ্যপেনহাওয়ারের দর্শনের সমালোচকরা ঠিক এই জিনিষটাকে নিয়েই শ্যপেনহাওয়ারকে আক্রমণ করতেন। শ্যপেনহাওয়ার বিবাহ করেননি। সমালোচকরা বলেন, তিনি বিয়েথা করেননি, সন্তান নেই, নিজের শিশুকে বুকে জড়িয়ে পিতার যে আনন্দ অনুভব হয়, তিনি কোন দিন জানলেন না এই আনন্দের অনুভব কেমন। সেইজন্য ওনার দর্শন এত শুষ্ক। কিন্তু শ্যপেনহাওয়ারের মধ্যে এই ভাবটা ছিল, জগৎকে আমরা যেভাবে মূল্য দিচ্ছি এতটা মূল্য দেওয়ার মত জগতে কিছু নেই।

এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, আমাদের জীবন চলে আমার আপনার জীবন-দর্শনের উপর, জীবন-দর্শন চলে আত্মদর্শনের উপর। আত্মদর্শন মানে, আমি নিজেকে কেমন দেখছি, নিজেকে কি ভাবছি। উপনিষদই পড়ি আর কথামৃতই পড়ি, ওখান থেকে আমাদের শুধু inputs আসছে, ঐ input দিয়ে কখন আমাদের জীবন চলে না। উপনিষদ, কথামৃত পড়তে ভালো লাগে, আদর্শ রূপেও ভালো লাগে, কিন্তু নিজের জীবনে কেউই লাগাতে চাইবে না। আমরা বলি, ক্ষুদিরাম বোস প্রত্যেক বাড়িতে আসুক, কিন্তু আমার বাড়িতে না। অপরের ছেলেকে উপদেশ দেবে, ক্ষুদিরামের মত হও, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখরের মত হও, দেশের জন্য বলিদান দিয়ে দাও, কিন্তু নিজের ছেলেকে দেশের জন্য বলিদান দেওয়ার কথা মুখেও উচ্চারণ করবে না। অনেকেই কথামৃত অনেকদিন ধরে পড়ছি, কথামৃতে ঠাকুর অনেক কথাই বলেছেন। আমরা কি কেউ বলতে পারব, কথামৃতে ঠাকুরের এই কথা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, এটাকেই আমি আমার জীবনে নামিয়েছি? বা এমন একটি কথা কি আছে যে কথা আমাদের থেকে থেকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে? আমরা ঠাকুরের ভক্ত, খুব ভালো কথা। আমরা মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছি, ঠাকুরের মন্ত্র জপ করি, খুব ভালো কথা। রোজ কথামৃত পড়ছি, খুব ভালো কথা। আর ঠাকুরকে ভালোবাসি, খুবই ভালো কথা। কিন্তু কাউকে যদি specific ভাবে জিজ্ঞেস করা হয়, ঠাকুরের কোন কথা আপনাকে স্পর্শ করেছে যে কথা থেকে থেকে আপনাকে ধাক্কা মারতে থাকে, আর আপনি ভাবছেন আমার জীবনকে এভাবেই সাজাতে হবে? সত্যি বলতে ঠাকুরের কোন কথাই এখনও আমাদের সেভাবে স্পর্শ করেনি। যদি স্পর্শ করত তাহলে জীবন অন্য রকম হয়ে যেত। কেউ যে নেই তা নয়, অনেকেই আছেন যাদের ঠাকুরের অনেক কথাই স্পর্শ করে আর অনেকেই তাদের জীবনকে সেভাবে সংগঠিত করে নিতে পেরেছেন। এখানে এটাই বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে যে, প্রত্যেকেই নিজের জীবনে যে একটা দর্শনকে নিয়েছে ঐ দর্শনকে দিয়েই তার জীবন চলে, সেখানে শাস্ত্রাদির কথা সহজে তাকে স্পর্শ করে না, যার জন্য জীবনও পাল্টায় না। বক্তব্য হল, আমরা যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি না কেন শেষমেশ শাস্ত্রের কথা আমাদের ভেতরে স্পর্শ করে না। উপনিষদ, শাস্ত্র, কথামৃতের সব কথা নেওয়ার দরকার নেই, এর একটি কথা আমাদের স্পর্শ করলেই আমরা ধন্য হয়ে যাব।

মূল্যবোধকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়, সেখানে এও বলা হয় যে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার মধ্যে কিছু কিছু সার্বজনীন মূল্যবোধ আছে। যেমন সত্য, অহিংসার মূল্যবোধকে সব সমাজেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু একটা কথা সাধারণত কোথাও বলা হয় না, তা হল, যে কোন একটি মূল্যবোধকে যদি ধরা হয় বাকি সব মূল্যবোধ নিজে থেকেই চলে আসবে। আমি যদি বলি, আজ থেকে আমি এই একটি মূল্যবোধকে আমার জীবনে নিয়ে এলাম, এবার দেখা যাবে জগতে যত মূল্যবোধ আছে সব মূল্যবোধ এক এক করে আমার মধ্যে চলে আসবে। অহিংসাতে যিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন তিনি সত্য কথা বলতে বাধ্য। কেন সত্য পালন? কারণ মিথ্যা কথা বলার অর্থ শব্দের হিংসা করা, শব্দের হিংসা করা মানে সত্যের প্রতি হিংসা করা। যিনি ঠিক ঠিক অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত তিনি জানেন মিথ্যা কথা বলাটাও হিংসা, সত্যিকারের মনে হয়। আমরা অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত নই বলে এই জিনিষ ধারণা করতে পারব না। অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাঁদের মন খুব সূক্ষ্ম হয়ে গেছে, তাঁরা জানেন যে মিথ্যা কথা বলা মানে সত্যকে হিংসা করা। নিজের স্ত্রীর বাইরে অপর নারীর প্রতি তাকানোটাও তাঁর পরিষ্কার হিংসা বলে মনে হবে। এর একটা ধাপ পরেই তাঁর কাছে নারীসঙ্গটাই একটা হিংসা বলে বোধ হয়, কারুর সম্পত্তি নিয়ে নেওয়াটা হিংসা বলে বোধ হয়। যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁরও অহিংসা, ব্রহ্মচর্য এগুলো আপনা-আপনি চলে আসবে। ব্রহ্মচর্য হল ইন্দ্রিয় সংযম, যেমনি কাম-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিল সে আর মিথ্যা কথা বলতেই পারবে না। কারণ মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজনই হবে না। জগতে যত মিথ্যা কথা আছে, সব মিথ্যা কথার পেছনে দুটো জিনিষ কাজ করে, কামিনী আর কাঞ্চন। কামিনী যদি না থাকে কাঞ্চনের দরকারই হবে না। যার কামিনীও নেই কাঞ্চনও নেই সে আর কিসের জন্য মিথ্যা কথা বলতে যাবে! ঠিক তেমনি যদি কেউ যে কোন একটা আধ্যাত্মিক আদর্শকে অবলম্বন করে নিতে পারে, তাহলে দেখা যাবে পুরো বাইবেলে, পুরো উপনিষদে, পুরো কথামৃতে যত কথা বলা আছে সব তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। যেমন এর আগেও আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি, যিনি ভগবান তিনি হলে সৎ, তিনি আছেন, যিনি সৎ তিনিই চিৎ, যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দ। ঠিক তেমনি ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ঈশ্বরই নিত্য বাকি সব অনিত্য, এই বোধকে যিনি সব সময় ধরে আছেন তাঁকে আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না যে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে, আলাদা করে ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য অনুশীলন করতে হবে না, এমনিতেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার উদয় হয়ে যাবে। ঈশ্বরের প্রতি এই ভালোবাসা যাঁর মধ্যে এসে যাবে তাঁর আর কোন বইও পড়তে হবে না।

আমাদের আলোচনাকে এত দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্য হল এই জিনিষটাকে বোঝান যে, আমাদের যে জীবন চলছে তার জন্য আমার আপনার একটা জীবন-দর্শন আছে। জীবন-দর্শন ছাড়া জীবন চলে না। যারা মনে করছে লুটেপুটে খাব, তাদের ঐটাই জীবন-দর্শন। আর সেখানে তাদের একটা আত্মদর্শন আছে, আত্মদর্শন শব্দটা আমরা এখানেই ব্যবহার করছি। এরা নিজেদের শরীরের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। কুকুর, বেড়ালের পেট ভরে গেলেই তাদের কাজ চলে যায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরণের লোকেদের পেট ভরলেও হয় না। আগামীকাল যাতে পেট ভরে তার যেমন ব্যবস্থা করে আর মরার পরেও যাতে পেট ভরতে পারে সেটারও ব্যবস্থা করে। সেইজন্য এদের কোন দিন পেটে ভরে না। শাস্ত্র আমাদের বারবার সূচনা দিয়ে যাচ্ছেন তোমার জীবন-দর্শনটাই গোলমেলে, সেইজন্যই তোমার এত দুঃখ-কষ্ট। তুমি জগৎকে সত্য বলে ধরে নিয়েছ, তুমি মনে করছ জগৎটা সারে ভর্তি, সেইজন্য তোমাকে শোক, মোহ, দুঃখ, যন্ত্রণা তাড়া করে চলেছে। এই জিনিষটাকেই আচার্য *দৃষ্টনষ্ট* বলছেন। এক একবার মনে হয় সত্যি এই জগতে কিছু নেই। কিন্তু জগতেরও গুরুত্ব রয়েছে, কারণ জগতের সাহায্যেই আমাদের শরীর চলছে, শরীর চলছে বলে মন ঠিক আছে, আর এই মনকে সঙ্গে নিয়েই আসল জায়গাতে পৌঁছাতে হবে, যেখানে সব কিছু খসে পড়ে যাবে। সেইজন্য জগতের যে একেবারেই গুরুত্ব নেই তা নয়। কিন্তু বুঝতে হবে, গুরুত্ব আছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে জগৎটা সার সমৃদ্ধ নয়, জগৎকেই সার বলে মনে করলে হবে না।

আচার্য আবার বলছেন, *অনেকশতপাষণ্ডবুদ্ধিবিকল্পাস্পদঃ*, যাদের বুদ্ধি পাখণ্ড, পাখণ্ড কিন্তু পাষণ্ড অর্থে এখানে বলছেন না, যারা ঈশ্বর বিরোধী কথা বলে, বেদ-বেদান্ত বিরোধী কথা বলে তাদেরকে পাখণ্ড বলছেন। যারা তত্ত্বদর্শি নয়, অথচ তারা এই জগৎকে আধার করে অনেক রকম দর্শন, অনেক রকম তত্ত্ব দিতে থাকে। এদের মধ্যে ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের তত্ত্ব খুবই আকর্ষণীয়। ডারউইন বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন

জিনিষকে নিয়ে একটা থিয়োরী দাঁড় করিয়েছেন। সেই সময় হার্বাট স্পেন্সার নামে একজন নামকরা দার্শনিক ছিলেন, তাঁর একটা স্বপ্ন ছিল দর্শনের যত রকম শাখা আছে সব শাখাকে একসঙ্গে নিয়ে এমন একটা থিয়োরী দিতে হবে, যে থিয়োরী দিয়ে জগতের সব কিছুর ব্যাখ্যা করা যাবে। ওনার কাছে ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের থিয়োরী দারুণ মনে হল। ক্রমবিবর্তনের থিয়োরীতে survival of the fittest খুব নামকরা কথা কিন্তু এই কথা ডারউইন আদপেই বলেননি, বলেছিলেন স্পেন্সার কিন্তু ডারউইনের উপর চেপে গেল। মার্ক্সিস্টরা জগতের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করল শ্রেনীসংগ্রাম দিয়ে, জগতের সব কিছু class struggleকে কেন্দ্র করে চলে। লোকেরা মনে করে আমি একটা থিয়োরী দিয়ে জগতে যা কিছু আছে, ফিজিক্স, বায়োলজি, ইকনমিক্স যা কিছু আছে সবটাকে ব্যাখ্যা করে দেব। মার্ক্সিস্টরা বলল ক্লাশ স্ট্রাগেল, ডারউইনিস্টরা বলল ক্রমবিবর্তনবাদ। আর ফ্রয়েড বললেন লিবিডো মর্টিডো, সেক্সের ইচ্ছা আর খুন করার ইচ্ছা। ফ্রয়েড সব কিছুকে এমনকি পূজা, অর্চনা, ধর্ম, অধ্যাত্ম সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দিলেন সেক্স আর ভায়োলেন্স দিয়ে। উপনিষদ কিভাবে এল? মার্ক্সিস্টরা বলে ক্লাশ স্ট্রাগেল থেকে এসেছে। প্রথম যারা পড়বে তাদের দারুণ লাগবে, ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছিল সেখান থেকে বেরিয়ে এল উপনিষদ, পুরাণ। প্রথম বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা না করা থাকলে এবং পরবর্তি জীবনে ঠিক ঠিক আচার্যের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করলে এই ধরণের চিত্তাকর্ষক চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। ঠিক তেমনি সব কিছু ক্রমবিবর্তনের পরিণতি। তাহলে পুরাণের আগে উপনিষদ কি করে এল? আর উপনিষদ যদি ক্লাস স্ট্রাগেল হয় তাহলে উপনিষদও ব্রাহ্মণরা লিখেছেন, পুরাণও ব্রাহ্মণরা লিখেছেন, সেখানে কে কার বিরুদ্ধে বিপ্লব করছে! এটাই আচার্য এখানে বলছেন, শত শত পাখণ্ড যারা তারা যে নানা রকমের বুদ্ধির খেলা করে, এই খেলাকে আশ্রয় করেই এই জগৎ। এই ধরণের দর্শন ও মতবাদ হল বুড়ির চুল বা হাওয়াই মিঠাই, এতটুকু চিনি আর তার থেকে এক বিশাল মিষ্টি বানিয়ে দিল, মাঝখানে ফাঁক্কা, মুখে দিলেই চুপসে যাবে। উপনিষদ পড়ার পর জগতের দিকে তাকিয়ে একটু ভালো করে ভাবতে থাকলে মনে হবে, পুরো জগৎ আর জগতে যত দর্শন সব হল ঐ হাওয়াই মিঠাই, যাতে কিছুই নেই সবটাই বাতাস। ডারউইন বলুন, ফ্রয়েড বলুন, মার্ক্স বলুন, সব ঐ বুড়ির চুল। এনারাই শেষ নয়, তারপর এল ফিজিক্স, কেউ ছাড়বে না, আইনস্টাইন সব কিছুকে রিলেটিভ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এমনকি নীতিবোধ, মূল্যবোধ সব কিছুকে রিলেটিভিটি দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিলেন। জগৎকে নিয়েই এই জিনিষ সম্ভব ঈশ্বরকে নিয়ে কখনই সম্ভব নয়।

এবার ধীরে ধীরে আত্মার দিকে এগোতে শুরু করছেন। প্রথমে জগৎ কি বললেন, আর জগতের মূল কোথায় বললেন, সেখান থেকে আত্মার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। আচার্য অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু *ইদম্* দিয়ে যাঁকে নির্ধারিত করতে পারবে না, পরব্রহ্ম যাঁর মূল ও সার, যে জিনিষটা অবিদ্যা, কাম ও কর্মের অব্যক্ত রূপ থেকে জন্ম নেয়, জ্ঞান আর ক্রিয়া এই দুটি যাঁর স্বরূপভূত আর অপরব্রহ্ম রূপ হিরণ্যগর্ভ যাঁর অঙ্কুর, সমস্ত প্রাণীর লিঙ্গ শরীর যাঁর স্কন্ধ, তৃষ্ণা রূপ জল সিঞ্চনে যাঁর তেজ বৃদ্ধি হয়, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় আর বিষয় অর্থাৎ বিষয় বাসনা দিয়ে তাঁর নতুন নতুন অঙ্কুরের উদ্‌গমন হয়, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, জ্ঞান এগুলো যাঁর পত্র, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ইত্যাদি অনেক রকম ক্রিয়া তাঁর সুন্দর পুষ্প। বৃক্ষের যেমন অনেক ধরণের রস থাকে, এই অশ্বত্থ বৃক্ষের রস হল *সুখদুঃখ-বেদনানেকরসঃ*, সুখ, দুঃখ, বেদনা এগুলোই সনাতন বৃক্ষের বিবিধ রস। সুখ আর দুঃখ বাইরে প্রকাশ পায়, বেদনা ভেতরেই থাকে। প্রাণীগনের যে বিভিন্ন রকম আজীবিকা এটাই এই বৃক্ষের অনন্ত ফল। আর ফলের যে তৃষ্ণা, আমার এই চাই সেই চাই, এই তৃষ্ণা জল রূপে বৃক্ষকে সিঞ্চন করে যাতে বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরস্পরে মিশ্রিত ও দৃঢ় হয়ে যে কর্ম বাসনাদি এটাই তার মূল। ব্রহ্মাদি দেবতারা পাখি রূপে এই বৃক্ষে সত্যলোকাদি সাতটি লোকের বাসা করেন। প্রাণীর যে সুখ, দুঃখ, জন্ম হর্ষ শোকে উৎপন্ন হয়, নৃত্য, গান, বাদ্য, ক্রীড়া থেকে যে নানান রকমের শব্দ হয়, কখন হাসির আওয়াজ, কখন কান্নার আওয়াজ শোনা যায় আর কখন গান-বাজনার শব্দ শোনা যায়, এই যে নানান রকমের শব্দ, এই শব্দেই বৃক্ষ সর্বদা গুঞ্জরিত। অশ্বত্থ বৃক্ষের মতই কামনা ও কর্ম রূপ বায়ু এই সংসারকে নিত্য চঞ্চল করে রাখে। স্বর্গ, নরক, তীর্যকাদি যোনি সব নীচের দিকে যায়, সনাতন, মানে আদি কাল থেকে চলে আসছে। বেদান্ত বাক্য চিন্তন করলে এই বৃক্ষের উচ্ছেদ হয়ে যায়। এই সংসারই অশ্বত্থ।

আচার্য সংসারকে নিয়ে একটা কাব্যিক বর্ণনা দিচ্ছেন। এখানে নতুন কিছু বলছেন না, যেমন একটা বটবৃক্ষে জল সিঞ্চনের দরকার, বৃক্ষের একটা মূল কাণ্ড থাকে, তার শাখা-প্রশাখা আছে। গাছের ছাল থাকে, পাতা থাকে, গাছে ফুল, ফল রয়েছে। বৃক্ষে নানান রকমের পাখি বাসা করে, পাখিরা নানা রকমের কলরব করছে। বৃক্ষের সাথে এই সংসারের তুলনা করা হয়েছে। জগতের সব কিছুকে মিলিয়ে এই সংসারবৃক্ষ। এই সংসারবৃক্ষের ভাব ক্রমাগত আমাদের ভেতরে ঢুকছে, ঢুকে আমাদের ভেতর বৃত্তি তৈরী করছে, যা দিয়ে এই জীবন চলছে। উপনিষদ বলছেন এই সংসার বৃক্ষ সেই ভগবান, সেই আত্মা থেকে বেরিয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে নীচের দিকে ছড়িয়ে গেছে। আচার্য শঙ্কর একটা বৃক্ষকে দেখতে যেমন হয় দেখাচ্ছেন, দেখিয়ে সেই বৃক্ষের সাথে আমাদের জীবন বা এই সংসারের কেমন কেমন মিল, এটাকেই কাব্যিক ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে দেখালেন। যেমন বলছেন, বৃক্ষে কত রকম পাখি বাসা করে, ঠিক তেমনি ব্রহ্মা, দেবতা, পিতৃগণ, মানুষ এরা সাতটি লোকের মধ্যে বাস করছে, ভূঃ, ভূব, স্বঃ ইত্যাদি সাতটি লোক যেন পাখির বাসা, সেই বাসাতে বিভিন্ন পাখিরা বাস করছে।

জগৎকে বৃক্ষের সাথে খুব সুন্দর তুলনা করা যায়। কবিরা জীবনকে অনেক কিছুর সাথে তুলনা করেন। যেমন জীবনকে কেউ নদীর সাথে তুলনা করেন, আবার কোন কবি রেলগাড়ির সঙ্গে তুলনা করছেন। জগৎকে অনেকেই অনেক কিছুর সাথে তুলনা করতে পারেন। ঠাকুর যেমন সংসারকে আমড়ার সাথে তুলনা করছেন। এটাও যেমন একটা তুলনা, আচার্য শঙ্করও আরেকটা তুলনা দিলেন। উপনিষদ সংসার বলতে যে জিনিষটাকে বোঝাতে চাইছেন, সেই জিনিষটাকে বোঝাবার জন্য অন্যান্য জিনিষের তুলনায় অশ্বত্থ বৃক্ষের তুলনাটা অনেক উৎকৃষ্ট। সংসারকে আবার সমুদ্রের সাথেও তুলনা করা যেতে পারে। ভাগবতে আবার সংসারকে জঙ্গলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পুরাণের একটা বৈশিষ্ট্য হল পুরাণ উপনিষদের মূল জিনিষটাকে ধরে তার উপর নতুন নতুন জিনিষ দাঁড় করিয়ে দেন। বৃক্ষের সাথে তুলনা করলে সংসারের ভয় জিনিষটাকে বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু সংসারের ভয়ের ব্যাপারটা জঙ্গলের সাথে সংসারের তুলনাতে ভালো বর্ণনা করা যায়, যেটা ভাগবতে করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে একটা খুব নামকরা তুলনা আছে, যেখানে বলা হয়, একজন মানুষ পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে, পড়তে পড়তে একটা লতাকে ধরে কোন রকমে জীবন রক্ষা করছে। দেখছে একটা সাদা ইঁদুর আর একটা কালো ইঁদুর লতার শেকড়টা কাটছে, আর সেখানেই দেখছে কিছু ফল ঝুলে আছে, ফল পেরে মুখে দিচ্ছে, ফলের স্বাদ খুব ভালো লাগছে, বলছে বাঃ কি সুন্দর। অথচ দুটো ইঁদুর লতার শেকড়টা কাটছে, যত কাটছে তত তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে, কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, সে ভোগ করে যাচ্ছে। এগুলো নানান রকমের উপমা। কিন্তু তুলনামূলক বিচার করলে সংসার বা জগতের সাথে বৃক্ষের তুলনাটাই সব থেকে ভালো তুলনা। গীতাতেও সংসারকে বৃক্ষের সাথেই তুলনা করা হয়েছে। উপমা যদিও একদেশীয় হয়, কিন্তু আচার্য এখানে একটা দুটো মিল দেখাচ্ছেন না, সংসারের সব কিছুকে বৃক্ষের সাথে মিল দেখাচ্ছেন। আচার্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিষের তুলনা নিয়ে আসেন। সব কিছুর তুলনা করে সব থেকে যে মূল তুলনাটা করছেন তা হল, বৃক্ষকে যেমন শেকড় শুদ্ধু উপড়ে ফেলা যায়, ঠিক তেমনি এই জগৎকে বা সংসারকে উপড়ে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। এই জগৎ মানে, বহির্জগৎকে কখনই উপড়ে ফেলা যায় না। বহির্জগৎ থেকে যে আপনার ভেতরে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়, যে প্রতিক্রিয়া দিয়ে আপনার সংসার তৈরী হয়েছে, সেই সংসারকে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায়। এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সংসারবৃক্ষকে উপড়ে ফেলা। জঙ্গলের সাথে সংসারের তুলনা করলে জঙ্গলকে জ্বালাতে হবে বললে ঠিক ঠিক মিল হয় না। জঙ্গলের ক্ষেত্রে দেখাতে হবে মানুষ সংসারারণ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, অরণ্যে ভয়ের উপদ্রব আছে। উপমা নেওয়ার সময় দেখতে হয় মূল জিনিষটাকে সঠিকে ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে কিনা। সংসারে এসে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি তখন অরণ্যের উপমা নেওয়া হয় আর যখন সংসার উচ্ছেদের কথা বলতে হবে তখন বৃক্ষের উপমাই উপযুক্ত হবে। কিন্তু মূল কথা হল অশ্বত্থ বৃক্ষের সাথে এই জগতের অনেকগুলো মিল আছে, কিন্তু তার মধ্যে উচ্ছেদনটাই প্রধান। কারণ সংসারকে উচ্ছেদ না করলে শোক, মোহ, দুঃখ, কান্না, জরা, মৃত্যু এগুলো থেকে যাবে। এটাই সংসারবৃক্ষের বর্ণনা।

প্রথম থেকে আচার্য বলছেন জগৎটা অসাড়, মৃগমরীচিকার মত। আমাদের মনে রাখতে হবে, বৃক্ষের সাথে সংসারের যে তুলনা, এগুলো কোন চিন্তা-ভাবনা করে বলছেন না, এখানে কোন বুদ্ধিবিলাস নেই। যাঁরা সমাধিতে গেছেন, ঈশ্বরকে যাঁরা সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁরা দেখছেন এই জগতে কিছু নেই। জগৎ একেবারেই যে

নেই তা নয়, কিন্তু কলাগাছের মত নিঃসার। আচার্য বলছেন, *যদস্য সংসার-বৃক্ষস্য মূলম্, তদেবে শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃস্বভাবম্, তদেব ব্রহ্ম সর্বমহত্ত্বাৎ*, এই যে এত বড় বিশাল জগদ্রূপী বৃক্ষ, এর মূল হল সেই শুদ্ধ, পবিত্র, জ্যোতিস্বরূপ আত্মাতে। মূল মন্ত্রে বলছেন *তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম*। ব্রহ্ম কেন বলছেন? ব্রহ্ম বৃ ধাতু থেকে এসেছে, বৃ মানে বৃহৎ, ব্রহ্ম মানে যাঁর থেকে আর কেউ বৃহৎ হয় না। অন্য দিকে তিনি শুক্র, শুভ্র, জ্যোতির্ময়, সত্যস্বরূপ। *তদেবামৃতমুচ্যতে*, আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন, *তদেবামৃতম্ অবিনাশস্বভাবজম্ উচ্যতে কথ্যতে সত্যত্বাৎ*, তিনি হলে সত্য, সৎস্বরূপ সেইজন্য তিনি অবিনাশী, তিনি অবিনাশী সেইজন্য তিনি অমৃত, মৃতের বিপরীত অমৃত, ভগবানের কখন মৃত্যু হয় না। কেন মৃত্যু হয় না? কারণ তিনি সৎস্বরূপ। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, যে কোন অস্তিত্বের একটা স্থায়ী আরেকটা চিরন্তন এই দুটো জিনিষ থাকে। গ্লাশ আছে বললে গ্লাশের একটা সত্তা আর অস্তি মানে আছে, এই দুটো সত্তাকে দিয়ে একটা জিনিষকে বোঝায়। অস্তির সত্তাকেই বলছেন ব্রহ্ম। অস্তির সত্তা মানে সত্তামাত্রম্, অস্তির সত্তা কোন দিন নাশ হবে না, সেইজন্য তিনি অমর, অমৃত, অবিনাশী।

আচার্য আরও বলছেন, *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্ অনৃতমন্যদতো মর্ত্যম্*। এটাই বেদান্তের সার। *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্*, বাক্ থেকে বাচ, উপনিষদেরই কথা, কিন্তু আচার্য বারবার এই কথাই ব্যবহার করছেন। এটাই বেদান্তকে অন্যান্য দর্শন থেকে আলাদা করে দেয়। অন্যান্য দর্শনে সৃষ্টিকে সত্য বলে নেওয়া হয়, তাঁদের মতে ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন। কিন্তু বেদান্তের সৃষ্টি হল *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্*, আত্মার যে কোন বিকার শব্দ মাত্র, বাণীর বিলাস মাত্র, কথা ছাড়া কিছু নয়। যেমন বলা হয় অস্তি ভাতি প্রিয় নামরূপ। প্রথম হল অস্তি, সৎ বস্তু, যেটা আছে ঐটাই আমাদের বোধ হয়, অস্তিকেই আমরা ভালোবাসি। কিন্তু এটাই যখন নাম রূপ ধারণ করে নেয় তখন অন্য ভাবে জিনিষটাকে দেখায়। পরে বলছেন *মৃত্তিকৈব সত্যম্*, মৃত্তিকাই সত্য, ঐ মৃত্তিকা থেকেই যখন খেলনা তৈরী হচ্ছে, হাড়ি, কলসি তৈয়ার হচ্ছে তখন এগুলোই বাণীর বিকার হয়ে যায়। বাণীর বিকার এই কারণেই, মৃত্তিকার একটা রূপ দেওয়া হয়ে গেল, রূপ দেওয়া হয়ে গেলে তার একটা আলাদা নামও এসে যাবে। নাম এসে যাওয়া মানে বস্তুতে বস্তুতে তফাৎ এসে যাবে। যেমন মৃত্তিকা দিয়ে হাতি, ঘোড়া, উট তৈরী করা হল, প্রত্যেকটা জিনিষের একটা করে নাম দেওয়া হল। হাতি, ঘোড়া, উট এদের অস্তিত্ব আছে কি নেই? বেদান্তের দৃষ্টিতে বলবে নেই, এর সবটাই মাটি, মাটি ছাড়া কিছু নেই। তাহলে এগুলো কি? বলছেন বাণীর বিকার, শব্দ মাত্র, শব্দের খেলা। নাম আর রূপে রূপ আলাদা বলে কিছু হয় না, রূপও যা নামও তাই। যে কোন বস্তুর তিনটি রূপ থাকে, একটা তার বহিঃরূপ যেটা আমরা দেখতে পাই, একটা নামরূপ যেটা আমরা বলতে পারি আর একটা বিচার রূপ যেটাকে চিন্তন করা হয়। এই তিনটেকেই ইংলিশে বলা হয়, Idea, Word and Object, বস্তু, বাণী আর বিচার। বেদান্তে এই তিনটের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। একটা জিনিষকে ভাবাও যা, তাকেও বলাও যা আর সেই বস্তুও তাই।

ঠাকুর বলছেন কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। তার মানে বাকি তিনটে যুগে মনের পাপটাও পাপ। আমি যদি মনে মনে ভাবি তোমকে এক চড় মারব, চড় মারা ভাবাও যা আর চড় মারা একই। ঠাকুর এটাকেই সহজ করে বলছেন কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। তার মানে মনের পাপও পাপ, সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে মনের পাপও পাপ। সন্ন্যাসীর কোন কিছুর প্রতি লোভ আসাটাও পাপ। কারণ সন্ন্যাসীর কাছে মনের জিনিষ আর বাইরের জিনিষে কোন তফাৎ নেই। আচার্য এটাই বলছেন *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্*, তোমার কাছে বস্তুটা বিরাট কিছু মনে হচ্ছে। এবার যুক্তি দিয়ে দেখলে পুরো জিনিষটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বস্তুও যা তার নামও তাই, সেইজন্য বলে নাম আর নামী অভেদ। নামও যা ভাবনাও তাই, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রূপেও যা, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণও তাই আর তাঁকে চিন্তন করলে সেটাও একই হবে। আর এই শ্রীকৃষ্ণ আর যিনি ঐ পরব্রহ্ম রূপে আছেন তিনিও এক। বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুও যা, তার নামও যা, তার বিচারও তাই। কিন্তু এদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকে না, সত্তাস্বরূপ যিনি আছেন বিচারের স্তরে তাঁরই একটা অবস্থার পরিবর্তন করে দিচ্ছে, সত্তা ছাড়া আর কিছু নেই। সেইজন্য ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন কিছু নেই।

এখানে বলছেন, জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, যা কিছু আমরা দেখছি, তার সাথে এই অশ্বত্থ বৃক্ষের সাথে যত কিছুর তুলনা করা হল, সবটাই বাণীর বিলাস, এ ছাড়া কিছু নয়। এটাই কট্টর বেদান্ত। বেদান্তীরা

এরপর আর কোথাও যান না। আপেক্ষিক সত্য, চরম সত্য, পরব্রহ্ম, অপরব্রহ্ম, কার্যব্রহ্ম, কারণব্রহ্ম, জগৎ, ঈশ্বর এই শব্দগুলো খুব সাধারণ স্তরেই চলে। কিন্তু একেবারে ঘোর বেদান্ত যখন চলে, যেটা উপনিষদের মূল দর্শন, যার উপর আচার্য শঙ্কর বারবার জোর দিচ্ছেন তখন *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্*, এটাই চলে। *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্* উপনিষদেরই কথা, আচার্যের কথা নয়। যখন গ্লাশকে আমরা গ্লাশ রূপে দেখছি তখন জানবেন এটা শব্দের খেলা মাত্র। গ্লাশ আর ফোন আলাদা দেখছি এও শব্দের খেলা মাত্র। আমরা বলব, দুটোকে তো আমরা সবাই আলাদাই দেখছি, ঠিকই দেখছি, কিন্তু আমাদের মন অত্যন্ত স্থূল। যাঁদের মন সূক্ষ্ম হয়ে গেছে তাঁরা আলাদা দেখবেন না। ঠাকুরের এই ধরণের প্রচুর ঘটনা আছে। হৃদয়রাম ঠাকুরকে দেখাচ্ছে, মামা এটা লাট সাহেবের বাড়ি। ঠাকুর দেখছেন ইটের ঢিপি। ঠাকুর দেখছেন বিকার ছাড়া কিছু নেই। সেই বিকারের একটা নাম লাট সাহেবের বাড়ি। আমাদের কাছে লাট সাহেবের বাড়ির বিরাট গুরুত্ব। গভর্নর হাউস থেকে একটা আমন্ত্রণ পেলে সবাইকে বলে বেড়াবে, জানেন আমি গভর্নর হাউসে চায়ের আমন্ত্রণ পেয়েছি। ঠাকুরের কাছে সবটাই বিকার। ঠাকুর আবার একজনকে বলছেন, তোমাকে আমি রাজা টাজা বলতে পারব না। কারণ রাজা জিনিষটা বাণীর বিকার ছাড়া কিছু না। সেইজন্য বলছেন, ব্রহ্ম বাদে যা কিছু আছে সবটাই মিথ্যা। আচার্য মিথ্যা না বলে বলছেন *অনৃতম্*। *অনৃতম্* শব্দটা একটা পরিভাষা, অনেক ভাব এর ব্যাখ্যা করা যায়। একটা ব্যাখ্যা হল, জিনিষটা নেই এই অর্থে *অনৃতম্*। আবার এই অর্থেও বলা যায়, যেটা গতকাল ছিল না, আজকে আছে কিন্তু আগামীকাল থাকবে না, তাই *অনৃতম্*। অনৃতমকে দুভাবেই বলা যায়। প্রথমটা হল অলীক, জিনিষটা আদপেই নেই। আরেকটা বোঝায় মায়া, একটা passing existence আরেকটা temporary existene দুটো অর্থেই আসে। বলছেন ব্রহ্ম বাদে সবটাই অনৃতম্। এটাকেই ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। অবস্তু মানে, আছে ঠিকই কিন্তু সবই বাণীর বিলাস, শব্দের খেলা ছাড়া কিছু না।

আমি বলব, আপনি কি করে বলছেন শব্দের খেলা ছাড়া কিছু না! আমি আমার ছেলেকে এত ভালোবাসি, আমার বাড়ি, গাড়ির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু আমার নাতির কথা কি করে ভুলে থাকতে পারি! এনারা তাই এক কথায় বলে দেন, উপনিষদ তোমার জন্য নয়। উপনিষদ একমাত্র উপযুক্ত কয়েকজনের জন্যই, আর জগতে যা কিছু শুভ এনাদের জন্যই হয়। তোমাদের মত যারা সন্তান, নাতি-পোতা, গাড়ি, বাড়ি, গয়নাকে বেশি মূল্য দেয় তাদের নিয়ে জগৎ চলে না। তোমরা জগতে আছ থাকো না, কেউ বারণ করছে না। কিন্তু জগতের আসল যা কিছু হয় এনাদের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দিয়েই হয়।

জগতের উৎপত্তি হয়, স্থিতি হয় আর বিনাশ হয়। *তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ* সত্য লোক থেকে পৃথিবী লোক পর্যন্ত যা কিছু আছে সব পরমাত্মায় আশ্রিত হয়ে আছে। কিভাবে আশ্রিত হয়ে আছে? আচার্য বলছেন মৃগমরীচিকার মত বা গন্ধর্বনগরীর মত। কেন এভাবে আশ্রিত? তা নাহলে দুটো সত্তা হয়ে যাবে। জহুদি, খ্রীশ্চানাদি ধর্মের কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে যায়, কারণ তাদের কাছে ভগবান একটা সত্তা আর সৃষ্টি আরেকটা সত্তা। দ্বৈতবাদীরা আচার্যের কথা মানবে না। তারা বলবে ভগবানের উপর আশ্রিত। ভক্তের দৃষ্টিতে, ভগবানও সত্য ভগবানের সৃষ্টিও সত্য। ঠিকই, সত্য বলেই বোধ হচ্ছে, কেউ অস্বীকার করছে না। আচার্য বলছেন, যখন সমাধিতে যাবে তখন বলবে ভগবান ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এর যুক্তির শেষ নেই, ঠাকুরও এভাবেই বলেছেন, আচার্য শঙ্করও এভাবেই বলেছেন আর উপনিষদ ও অন্যান্য জায়গাতে এভাবেই বলেছেন, সেইজন্য এটাই সত্য – *তস্মিঁল্লোকা শ্রিতাঃ সর্বে*, এই ব্রহ্মের উপরেই সমস্ত লোক আশ্রিত, কিন্তু মরীচিকার মত। এখানে দুটো সত্তাকে মানছেন না, সত্তা একটাই, ভগবান। তাহলে এই জগতের সত্তা আছে কি নেই? অবশ্যই আছে কিন্তু মরীচিকার মত। মরুভূমি দিয়ে যেতে যেতে রাস্থায় পরিষ্কার জল দেখছেন। কিন্তু ঐ জল দিয়ে কোন কাজ হয় না। কিন্তু যারা জানে না, তারা মনে করে জল আছে। যাঁরা জানেন তাঁদের কি মনে হয়? বলছেন পরমার্থ দর্শন হয়ে গেলে এটা বাধিত হয়ে যায়। এটাই বেদান্তের যুক্তির প্রধান ভিত্তি। যেমন রাস্থা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন দেখছেন সামনে জল, এর আগে আপনি যতই মরীচিকা দেখে থাকুন কিন্তু এই জল দেখে একবার অন্তত আপনার ভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার রীতিমত সম্ভবনা থেকে যাবে। এটা বাধিত কখন হয়? একমাত্র যখন পরমার্থ দর্শন হয়, তা নাহলে বাধিত হয় না। একমাত্র ঠাকুরই বলতে পারেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, কারণ ঠাকুরের কাছে এই সংসার বোধ বাধিত হয়ে গেছে। আমরা জগৎকে সত্য বলছি কেন? আসলে যখন এই উপমাগুলো নেওয়া হচ্ছে, যখন মরীচিকা বলছেন তখন আমাদের কাছে মনে হয় সবটাই

যেন মিথ্যা। কিন্তু আমাদের কাছে বাণী বিলাসটাই সত্য বলে বোধ হয়। একমাত্র জ্ঞানীরা সমাধির গভীরে গিয়ে দেখছেন এগুলো সব বাণীর বিলাস।

বলছেন, মাটি থেকে যে জিনিষগুলি তৈরী করা হয়েছে, এই জিনিষগুলি মাটিকে কোন পরিস্থিতিতেই অতিক্রম করতে পারবে না। কারণ মাটিই বস্তু, মাটি থেকে যে জিনিষগুলি তৈরি হয়েছে এরা এক সময় মাটিতে মিশে যাবে কিন্তু মাটি থেকে কোন দিন শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। মাটি দিয়ে পঞ্চাশটা জিনিষ তৈরী করা যাবে কিন্তু ঘট দিয়ে কোন দিন মাটি তৈরী হবে না। সোনা মূল, গয়না সোনার বিকার, গয়না কোন দিন সোনাকে অতিক্রম করতে পারবে না। মূলকে কখন অতিক্রম করা যায় না। সেইজন্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, এরা কোন দিন কোন পরিস্থিতিতে ব্রহ্মকে অতিক্রম করতে পারবে না। এটাই মন্ত্রে বলছেন, *তদু নাত্যেতি কশ্চন*, জগতে কোন কিছু নেই যা ব্রহ্মকে অতিক্রম করবে। Primary জিনিষকে কখন secondary জিনিষ অতিক্রম করতে পারে না। সঙ্গীতের যত বড় ওস্তাদই হোক সা রে গা মা এই সাতটা সুরকে সে কোন দিন অতিক্রম করতে পারবে না, তাকে ঐ সাতটা সুরের মধ্যেই বাঁধা থাকতে হবে। আবার অনেক রাগে সাতটা সুর নেয় না, তিনটে কি চারটে সুর দিয়েই তৈরী, যত ভাবেই হোক সাতটা সুরকে কখন পার করতে পারবে না। ঠিক তেমনি ব্রহ্মকে কেউ কোন দিন অতিক্রম করতে পারে না। *তস্মিঁল্লোকা শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন*, সমস্ত লোক পরমাত্মাতে আশ্রিত আর কোন কিছুই তাঁকে অতিক্রম করতে পারবে না। *এতদ্বৈ তৎ*, নচিকেতা! তুমি আত্মার কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, এই সেই আত্মা যাঁর কথা তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে। একবার দুবার শুনে আমাদের পক্ষে এগুলো ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু শুনে যেতে হয়, শুনে যাওয়াটাও একটা সাধনা।

সংসারকে অশ্বত্থের সাথে তুলনা করে বললেন, সংসারের মূল ব্রহ্মে, ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু জগৎ ক্রিয়াশীল, সেইজন আমাদের মনে একটা শঙ্কা আসতে পারে যেহেতু জগৎ ক্রিয়াশীল সেইহেতু জগতের উৎপত্তি প্রাণ থেকে, ব্রহ্ম বলে বস্তুত কিছু নেই, ভগবান বলে কিছু নেই। সাংখ্যবাদীরা ঠিক এই জিনিষটাকেই মানে, ভগবান বলে কিছু নেই। সাংখ্যবাদীরা বলে যা কিছু করে সব প্রাণরূপিণী প্রকৃতিই তার ক্রিয়াশক্তি দিয়ে করে। আবার উপনিষদে এক জায়গায় বলছেন প্রথমে শুধু অসৎ ছিল। সৎ আর অসতকে ব্যাখ্যাকাররা কয়েক ভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বেদ-উপনিষদের সামগ্রিক যে ভাব সেই ভাবকে সামনে রাখা হলে দেখা যাবে সৎ বলতে সব সময় ব্রহ্মকেই বোঝায় আর অসৎ বলতে যখন সৃষ্টির ব্যাপার আসে তখন প্রকৃতি বা মায়াকে বোঝায়। বেদে কোথাও বলছেন সৃষ্টি সৎ থেকে এসেছে, কোথাও বলছেন অসৎ থেকে এসেছে আবার কোথাও বলছেন তখন সৎও ছিল না অসতও ছিল না। ব্যাপারটা খুব সংশয় মনে হলেও ঠিক ভাবে বেদ ও উপনিষদের অধ্যায়ন করা থাকলে সংশয়ের কিছু থাকে না, সব কিছুকে সাজিয়ে দেওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনের মতে সৃষ্টি কার্য সব সময় অসৎ থেকে হয়, ব্রহ্ম বলে কোন কিছু নেই। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করার সময় দুটো দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। একটা হল শুধু কঠোর যুক্তি আর দ্বিতীয় নেন শ্রুতি প্রমাণ। বৌদ্ধ, জৈন বা ভৌতিকবাদীদের সাথে তর্ক করার সময় উনি শুধু যুক্তির উপর দিয়েই চলেন আর যখন নিজেদের সাথে তর্ক করছেন তখন তিনি শ্রুতি প্রমাণ দিয়ে চলেন। তখন তিনি সাংখ্যবাদীদের দেখাচ্ছেন অসৎ দিয়ে কখন সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ পরের মন্ত্রেই দেখান হচ্ছে সৃষ্টি কখনই অসৎ থেকে হতে পারে না বা বলতে পারেন জড় পদার্থ থেকে কখন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এটাকেই বলতে গিয়ে বলছেন –

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।২/৩/২।।

(এই যা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয়, পরব্রহ্ম আছেন বলেই সব কিছু তাঁর থেকে নিঃসৃত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যতবজ্রের মত ভয়ানক। যাঁরা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরা অমর হন।)

জগতের স্থাবর জঙ্গম যত অনিত্য বস্তু সব প্রাণ থেকে বেরিয়েছে। এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন সব কিছু প্রাণ থেকেই নির্গত হয়েছে, কিন্তু আচার্য বলছেন প্রাণ বলতে যেটা এনার্জি বোঝায় এখানে সেই প্রাণের কথা বলা হচ্ছে না, প্রাণ বলতে ব্রহ্মকেই বোঝাচ্ছেন। আমাদের মনে হতে পারে আচার্য যেন text torture করছেন, স্বামীজীও এক আধ জায়গায় বলেছেন কিন্তু আচার্য কোথাও text torture করছেন না। আচার্যের খুব সহজ যুক্তি, বেদ-উপনিষদ পাঁচ জায়গায় পাঁচ রকম কথা বলবে না, সব জায়গাতে একই কথা বলবেন। সত্য

সব সময় সত্য, সত্য কখন পাঁচ রকমের সত্য হবে না। ঋষিরা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন রকম কথা বলেছেন, তাই সব সময় একটা uniform দর্শন বা unified শব্দ ভাণ্ডার ব্যবহার করা হবে তা নয়, শব্দ ভাণ্ডারের ব্যবহার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হবে। কিন্তু বিচার কোথাও পাল্টাবে না। অনেক জায়গায় প্রাণ বলতে ব্রহ্মকে বোঝায়, প্রাণকে আবার এনার্জি রূপেও নেওয়া হয়। এই মন্ত্রের যিনি দ্রষ্টা তিনি পরিষ্কার দেখছেন *প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্*, সমস্ত সৃষ্টি প্রাণ থেকে বেরিয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানীরাও একই কথা বলছেন, জগৎ এনার্জি থেকে বেরিয়েছে, বিগ ব্যাঙ থেকে বেরিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলবেন উপনিষদও এই কথাই বলছেন। ঠিকই উপনিষদ এটাই বলছেন, কিন্তু অন্য জায়গায় যে আবার অন্য রকম কথা বলছেন। সব কথাকে এক জায়গায় মেলালে আর অন্য জায়গায় প্রাণ মানে ব্রহ্ম বলছেন, সব কিছুকে মেলালে তবে গিয়ে মূল অর্থটা স্পষ্ট হয়। একটা জায়গায় এক রকম কথা বলেছেন বলে ঐ একটা কথাকে নিয়েই মূল সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় না।

কাশ্মীরে থাকাকালীন সেখানকার এক মুসলমান স্বামীজীর খুব ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে আবার এক ফকিরের শিষ্য ছিল। ফকিরের চেলা স্বামীজীর ভক্ত হয়ে যাওয়াতে স্বামীজীর উপর ফকিরের রাগ হওয়া খুব স্বাভাবিক। ফকির রেগে গিয়ে বাণ মারলেন, সাত দিনের মধ্যে এই সাধুবাবার এমন হবে যে এখান থেকে সে পালাবে। দুদিন বাদেই স্বামীজীর রক্ত আমাশা হয়ে গেল। স্বামীজী সেখান থেকে পালিয়ে এলেন। কলকাতায় এসে শ্রীমাকে স্বামীজীকে বলছেন, 'মা! দেখুন কি হল! ঠাকুর আমার রক্ষা করতে পারলেন না'। স্বামীজীর এই উক্তি one off statement, এর অর্থ, তিনি অভিমান করে একটা কথা বলছেন। এবার যদি বলা হয়, ঠাকুর স্বামীজীকে রক্ষা করেননি, তাই স্বামীজী ঠাকুরের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন, ঠাকুরকে স্বামীজী মানতেন না। স্বামীজীর statement শুনে তাই মনে হয়। এখানে স্বামীজী অভিমান করে একটা কথা বলছেন, কিন্তু স্বামীজীর পুরো জীবনী আর তাঁর রচনাবলীর পাশাপাশি এই statementকে রাখলে দেখা যাবে জিনিষটা তা নয়, ব্যাপারটা পুরো অন্য রকম। সেইজন্য যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় শাস্ত্রের সামগ্রিক চিত্রটাকে নিতে হয়, যতক্ষণ পুরো চিত্র না নেওয়া হবে ততক্ষণ অর্থটা অন্য রকম হয়ে যাবে। শাস্ত্রের অর্থ অন্য রকম হয়ে গেলে আমাদের জীবন-দর্শনটাই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তখন বলব, স্বামীজীকেই ঠাকুর রক্ষা করতে পারছেন না, আমাকে আর কি রক্ষা করবেন! প্রাণ থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, প্রাণ থেকেই তার উৎপত্তি প্রাণেই তার লয় এটাই যদি সত্য হয় তাহলে ভগবানকে মানার কোন দরকার নেই, ভগবানই তো নেই, ভগবানকে মেনে কি হবে। জীবন-দর্শনটাই এবার পাল্টে যাবে আর জগৎকে অত্যন্ত ক্রুর বলে মনে হবে, যেখানে আমাদের চোখের জল মুছে দেওয়ার কেউ থাকবে নাই, আমাদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার কেউ থাকবে না।

উপনিষদ বলছেন তা নয়, জগৎ যদি প্রাণ থেকেই উৎপন্ন হত তাহলে চারিদিকে চৈতন্যের যে আভাস দেখছ, এই আভাস কোন দিন আসত না। বাবলা গাছের বীজ থেকে কখন আম গাছ হবে না। আমাদের সহজাত বোধ থেকে আমরা জানি গ্লাশ, পাখা এগুলো জড় আর আমরা চেতন। কিন্তু পাখা কি সুন্দর ঘুরছে, তুমি কোন দিন এভাবে ঘাড় ঘোরাতে পারবে না। জীবন মানে গতি, নদী যেমন পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে চলে, জীবন মানে তাই। পাখার কি সুন্দর গতি, তুমি এভাবে কোন দিন ঘাড় নাড়াতে পারবে না, তুমি মৃত। আমরা তাকে কি বলব? আমরা আমাদের স্বাভাবিক বোধ থেকে জানি পাখাটাই মৃত, একটা জড় পদার্থ। আমরা জানি বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে বলে পাখা ঘুরছে। একটা মানুষ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে কিন্তু আমরা জানি সে জীবন্ত। এই যে চৈতন্য, যে চেতনার বোধ হচ্ছে, এই বোধ জড় থেকে কি করে আসবে! এটাই বিজ্ঞানীদের একটা বড় সমস্যা। পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলতে থাকেন, দুটো সমধর্মী জিনিষের মিশ্রণ হয়ে গেলে অনেক সময় অন্য রকম হয়ে যায়। যেমন সোডিয়াম একটা বিষাক্ত পদার্থ, ক্লোরিন একটা মারাত্মক বিষ, দুটো যখন মিলে যায় তখন হয়ে যায় লবণ, আমরা রোজ খাচ্ছি। হাইড্রোজেন যার প্রচণ্ড দাহ্যশক্তি আর অক্সিজেন যে কোন জিনিষকে জ্বালাতে সাহায্য করে। দুটো যখন মিশে যায় তখন সব আগুনকে নিভিয়ে দেয়। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে গেলে জল তৈরী হয়ে যায়। আগুনে আগুনে মিলে জল হয়ে যাচ্ছে। বিষে বিষ মিশে গেলে লবণ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি কিছু কিছু এমন জড় পদার্থ আছে, মিশে গেলে চেতন হয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি নিয়ে এসে এগুলোকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়। এর আগেও একটা জায়গায় আলোচনা করা হয়েছিল, ধ্যানের গভীরে ঋষিরা জিনিষটাকে বাস্তবিক অন্য রকম দেখেন। যদি এই রকম হত তাহলে বস্তু এক অপরকে জানত, আমাদের ইন্দ্রিয়রা এক অপরকে জানত। যৌগিক পদার্থের ধর্ম

পাল্টাবে কিন্তু আত্মা তো কোন যৌগিক পদার্থ নয়, আত্মা হল সহজ। মন্ত্রে এটাই বলছেন – *যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং*, জগতে আমরা যা কিছু দেখছি সব প্রাণ থেকে নির্গত হয়েছে, প্রাণ বলতে এখানে পরমব্রহ্মকে বলছেন। পরমব্রহ্ম থেকেই সব কিছু প্রাদুর্ভূত। *এজতি*, এজতি মানে কম্পন, স্পন্দিত হওয়া। জগতে যা কিছু স্পন্দিত হচ্ছে পেছনে পরব্রহ্ম আছেন, পরব্রহ্ম থেকেই সব নিঃসৃত হয়েছে। আমরা জগতে প্রাণের প্রকাশ দেখছি, জীবনের প্রকাশ দেখছি, সব কিছুই ব্রহ্ম থেকে নিঃসৃত হয়েছে। এই যে জগৎ ব্রহ্ম থেকে বেরিয়েছে, এই ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য কি?

মহদ্ভয়ম্, ব্রহ্ম হলেন প্রচণ্ড ভয়ের রূপ। পরের মন্ত্রেই বলবেন ব্রহ্মের ভয় আছে বলেই জগতে সব কিছু ঠিক ঠিক চলছে। এখানে ভয়ের ব্যাপারটা খুব মজার। মা কালীকে যেভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়, বিশেষ করে শ্মশান কালী, সেখানে একটা ভয়ের ব্যাপার থাকে। জহুদি ধর্ম পুরোপুরি ভয়ের উপরেই চলে। সত্যিই খুব আশ্চর্যের যে একটা পুরো ধর্ম ঈশ্বরকে ভয় করেই চলছে। জহুদি ধর্ম থেকেই খ্রীষ্টান ধর্ম বেরিয়েছে, পরে ইসলাম ধর্মেও জহুদি ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। ঈশ্বরের সাথে কি রকম ভয়ের ব্যাপার? জহুদিদের যিনি ভগবান, যাঁকে ওরা জেহোবা বলছে, তিনি তাঁর প্রফেটদের, যাঁদের তিনি নিজে বেছে নিয়েছেন, তাঁদের সাথে তিনি চুক্তি করেন – চুক্তিতে বলেন, তোমরা যদি এই রকমটি কর তাহলে আমি এই রকমটি করব। ভগবান নিজের ভক্তকে বলছেন। এরপর ভগবান আর ভক্ত দুজনেই ঐ চুক্তিতে বাঁধা হয়ে গেলেন। অনেক সময় শুধু ভক্তই নয়, পুরো সমাজ এমনকি পুরো রাষ্ট্র ভগবানের সাথে কন্ট্রাক্টে বাঁধা। ভগবানের সাথে তাদের এত রকমের কন্ট্রাক্ট আছে যার জন্য জুদাইজিমের ইতিহাসও খুব মজার ইতিহাস হয়ে গেছে। মানুষ নিজের তরফ থেকে কন্ট্রাক্ট ভেঙে দিলে ভগবান খেপে আগুন হয়ে যান। ভগবান সবাইকে সৃষ্টি করে যদি দেখেন লোকজন তাঁর কথা মানছে না, তিনি তখন বলেন আমি এই সৃষ্টিকেই শেষ করে দেব। ভগবানের এক সন্তান হলেন নোয়া, নোয়া এসে বললেন, আপনি এরকম করবেন না, আমরা আপনার কথা মত চলব। তখন ভগবান নোয়াকে বললেন, তুমি একটা বড় নৌকার ব্যবস্থা কর, তাতে প্রত্যেক জিনিষের জোড়া রেখে দাও। আমি এই সৃষ্টিকে নাশ করে দিচ্ছি, কিন্তু সৃষ্টির বীজগুলো রাখা থাকবে, পরে এখান থেকে আবার সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই বলে ভগবান বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি বৃষ্টি দিয়ে বন্যা এনে সমস্ত সৃষ্টিকে নাশ করে দিলেন। আমাদের পুরাণে মৎস্যাবতারেও এই একই কাহিনী। এরপর প্রথম যে মানব জাতির সৃষ্টি হল তার সাথেও কন্ট্রাক্ট ছিল, তোমরা চিরদিন স্বর্গে আনন্দে থাক কিন্তু কোন দিন স্বর্গের এই আপেল গাছের ফল খাবে না। কিন্তু মানুষের প্রথম থেকেই এমন স্বভাব হয়ে আছে যে কথায় কথায় তারা বিপ্লব করে দেবে, ওরা গিয়ে স্বর্গের ফল খেয়ে নিয়েছে। কন্ট্রাক্ট ভেঙে দিয়েছে, ভগবান ওদের স্বর্গ থেকে বার করে দিলেন। তারপর মোজেসের সময় আবার একটা কন্ট্রাক্ট হল, তোমরা আমাকে ছাড়া আর কাউকে মানবে না। এটাই জেহোবার আদেশ, ইজরায়েলের লোকেরা কেঁদে কেঁদে অঙ্গীকার করল, হ্যাঁ প্রভু! আপনাকে ছাড়া আমরা কাউকে মানব না। এরা তো বলে দিল। স্কুলে ছাত্র বদমাইশি করলে শিক্ষক যখন খুব মারতে থাকে তখন বলে, স্যার! জীবনে আর এই রকম করব না। কতদিন আর না করে থাকবে! আবার বদমাইশি করে, আবার মার খায়। এভাবেই চলতে থাকে। এরাও কিছু দিন পর গোলমাল করতে শুরু করেছে। ভগবান তাতে খুব রেগে গেছেন। রেগে গিয়ে চল্লিশ বছর ধরে সবাইকে মরুভূমিতে ঘোরাতে থাকলেন। শাস্তি দিয়ে ভগবান আবার তাদের বলছেন, আমি তোমাদের ভগবান কিন্তু I am a jealous God, আমি হিংসুটে ভগবান। জহুদিদের টেন কমাণ্ডমেন্টসে আছে I am a jealous God। আমি অন্য আর কাউকে সহ্য করব না। জহুদিদের ভগবান হলেন একজন কঠোর রাজা, নিয়ম মত যদি চল তাহলে ঠিক আছে, তা নাহলে শেষ করে দেব। জহুদিদের ভগবানের এই ধারণা আমাদের উদ্ভট মনে হয়। ঠাকুর যেভাবে মাকে ভালোবাসছেন, যিশু যেভাবে ফাদার ইন হেভেনকে ভালোবাসছেন, এরপর জহুদির এই ব্যাপারটা অন্য রকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

অন্য রকম মনে হওয়ার কিছু নেই। হিন্দু ধর্মে ভগবানের সব রকম রূপের বর্ণনা পাওয়া যাবে। উপনিষদেই ভগবানকে মহাভয়ের কারণ বলছেন। হিন্দু ধর্মের যে বিশালত্ব এই জিনিষ আর কোন ধর্মে নেই, হিন্দু ধর্ম শুধু একটা ভাব নিয়েই চলে না, সব রকম ভাব পাওয়া যাবে। একটু আগেই বলা হল আত্মা সব কিছুতে নির্লিপ্ত। এক্ষুণি বললেন *মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্*, উদ্যত বজ্র থেকে মানুষ যেমন ভয় পায় ভগবান হলেন সেই রকম মহাভয়। জহুদিদের ভগবান যেমন মহাভয়ের কারণ, উপনিষদও বলছেন তিনি মহান ভয়ের কারণ।

এই ভয়ের রূপ পরে মা কালীর মধ্যেও নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু এই ভাব তার আগে উপনিষদেই এসে গেছে, কারণ কোন জিনিষ বা ভাব যদি বেদ উপনিষদে না থাকে সেই ভাব অন্য কোথাও পরে আসবে না।

এখানে শুধু ভয় বলছেন না, বলছেন মহান ভয়। কি রকম ভয়? *বজ্রমুদ্যতম্*, হাতে বজ্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বাড়ির মালিক যদি খুব কড়া হয় বাড়ি চাকর-বাকররা মালিককে খুব ভয় পায়। মালিক যদি কড়া না থাকে সব এলেমেলো হয়ে যায়। বামন যেই বাড়ি যাবে এরাও সব লাঙল ছেড়ে বসে বসে বিড়ি টানবে। কড়া লোক হলে সবাই কাজ করবে, কেউই আর টু ফা করবে না। এখানে যদিও *মহদ্ভয়ম্* বলছেন, কিন্তু এর অর্থ হল তিনি আছেন বলেই কেউ অন্য কিছু করতে পারছে না। যে কোন জিনিষের তিনি অন্তর্যামী, যে কোন বস্তুর তিনিই সার। নিজের ধর্মকে কেউই ত্যাগ করতে পারবে না। যেমন জল, জলের ধর্ম নীচের দিকে যাওয়া, জল কোন দিন উপরের দিকে যাবে না। জল রূপে যেতে পারবে না কিন্তু বাষ্প রূপে যাবে। কারণ *মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্*। ভগবান হাতে ডাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বলে কেউ তার ধর্মকে ছাড়তে পারছে না। মন্ত্রে এটাই দেখাচ্ছেন জগতে যত পদার্থ আছে তাদের কারুরই কোন স্বাধীনতা নেই। ঠিক তেমনি আমার আপনারও কোন স্বাধীনতা নেই। আমরা স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে অনেক কথাই বলি, কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু হয় না। একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাই চলে, কারণ তিনিই একমাত্র চৈতন্য রূপে আছেন। আমাদের সমস্যা হল, একটু শাস্ত্র পড়ে নিয়েই আমরা ভাবতে শুরু করি ঈশ্বর আছেন আর আমি আছি, ঈশ্বরের একটা চেতনা আমার একটা আলাদা চেতনা। ভগবান উপর থেকে কন্ট্রোল করছেন আর আমি নীচে কন্ট্রোল করছি। কিন্তু তা নয়, চেতনা একমাত্র আত্মারই রয়েছে। একট বস্তু তার নিজের ধর্ম থেকে চ্যুত কখন হবে? যদি বস্তুরও নিজস্ব চেতনা থাকে। বাবা আর ছেলে গাড়ি নিয়ে রাস্থা দিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে দুজনের ঝগড়া শুরু হল। বাবা বলছে অমুক দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাও, ছেলে বলছে এই দোকানে দাঁড় করাব। কেন বলতে পারছে? কারণ দুজনেরই চেতনা আছে, দুজনেরই স্বাধীন ইচ্ছা আছে। ঝগড়াতে যে জিতবে তার কথা মতই হবে। আমরা মনে করি ভগবান আর আমিও ঠিক এই রকম। আমি ভগবানের সাথে লড়াই করছি, ভগবান আমার সাথে লড়াই করছেন, লড়াইতে যে জিতবে তার কথাই থাকবে। সেইজন্য বলি ভগবানের ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা, এটাই স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু বেদান্তের শেষ কথায় এই ধরণের জিনিষ দাঁড়াবে না। যে কোন জিনিষ যে তার ধর্মে অবস্থিত থাকছে, কারণ তার যে সার, তার আসল যেটা সেটা আত্মা নিজে। বস্তুর নিজস্ব যদি কোন চেতনা থাকত তাহলে সে বিদ্রোহ করতে পারত, কিন্তু তার তো কোন চেতনা নেই। পাখার ব্লেড চাইলে একবার ডান দিক থেকে আরেকবার বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘুরতে পারবে না। কারণ পাখার কারিকুরি ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটের আইন দিয়ে বাঁধা আছে, ঐ আইন দিয়েই পাখাকে ঘুরতে হবে। এটা একটা ছোট্ট উপমা। কিন্তু চেতনার ব্যাপারে আত্মা ছাড়া কেউই চৈতন্য নয়, সেইজন্য কেউ কোন দিন তার ধর্মকে অতিক্রম করতে পারে না। পাপকর্মটা কি? ঈশ্বরের ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করাটাই পাপকর্ম। আদম পাপ করেছিল, কারণ আদম একজন আর ভগবান আরেকজন। আদমেরও চেতনা আছে ভগবানেরও চেতনা আছে। খ্রীষ্টান ধর্মও তাই বলে, গড্ মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করে ওর মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছেন, তাই মানুষের চেতনা আছে। সেই থেকে মানুষের চেতনা আলাদা আর ভগবানের চেতনা আলাদা, যার ফলে দুটোর মধ্যে সংঘাত লেগেই আছে। এখানে তা নেই, এখানে চেতনা একমাত্র ভগবানেরই আছে। যা কিছু হচ্ছে সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মন চৈতন্যের আলোতে আলোকিত হয়ে নিজেকে চৈতন্যবান মনে করতে শুরু করে আর নিজেকে স্বাধীন বলে ভাবতে থাকে। মন মনে করে সে স্বাধীন, যার ফলে প্রকৃত যিনি স্বাধীন, তাঁর সাথে লড়াই শুরু করে দেয়, মাঝখান থেকে আমরা মার খেতে থাকি। ঠাকুর কাঁচা আমি আর পাকা আমির কথা যখন বলছেন তখন ঠিক এটাই বলতে চাইছেন, পাকা আমি মানে, তিনি আছেন তাঁরই চেতনা আর কাঁচা আমি মানে আমি মনে করছি আমি চেতনা। আমাদের আমি বলতে যেটা বোঝায়, আমাদের যে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সে মনে করে আমি স্বাধীন। বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখলে দেখব প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সেটাই করে যেটা আসল চৈতন্য করবে।

এটাই উপমা দিয়ে বলছেন *মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্*, কারণ সবাই তাঁর অধীনে, তিনি যা চাইবেন তাই হবে। সেবককে মালিক যেমনটি করতে বলবে তাকে তেমনটিই করতে হবে। আত্মাই একমাত্র মালিক। *মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্* বলার একটাই অর্থ, যদি মালিক কড়া হয়, হাতে যদি ডাণ্ডা থাকে তাহলে তার সব সেবক সব কিছু নিয়মমাফিক করতে থাকবে। ঠিক তেমনি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা সবাই বিশ্রাম

না নিয়ে নিয়মমত তাঁর সব আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছেন। যদি নির্গুণ নিরাকার রূপে দেখা হয় তখন হবে তিনি সব কিছুতে আছেন বলেই এরা যার যার নিজের নিজের ধর্মকে অনুবর্তন করে চলেছে। আর যদি সাকার রূপে দেখা হয় তাহলে, ভগবানের একটা বিধান আছে বৌদ্ধরা যাকে ধর্মচক্র বলছেন, তাকেই আমরা বলছি ঋতম্, জহুদিরা বলে ল, খ্রীষ্টানরা তাকে বলে God's will। সব একই জিনিষ, তাঁর বিধানকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না। কেন পারে না? বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখলে, ওদের অতিক্রম করার সেই ক্ষমতাই নেই। তার স্বাধীন ইচ্ছা নেই বলে করতে পারে না। নির্গুণ নিরাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়ে আছেন, সেইজন্য কে কাকে অতিক্রম করবে, নিজেকে নিজে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ঠাকুর দেখছেন তিনিই বলির ছাগ, তিনিই খড়্গ, তিনিই আবার বলি দিচ্ছেন। সেইজন্য ঐ অর্থে অতিক্রম হয় না। জগতের দৃষ্টিতে দেখলে, তিনি সেই ভগবান যিনি কড়া শাসক, একটু ডান দিক বাম দিক হতে দেবেন না। যদি কেউ ডান দিক বাম দিক করে, যেমন অসুররা প্রায়ই করে, ভগবান তখন এদের সোজা পথে নিয়ে আসতে নিজেই নেমে আসেন। নির্গুণ নিরাকার, সগুণ সাকার দুটোতেই *মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্* ধরা আছে।

শেষে আচার্য বলছেন *য এতৎ বিদুঃ স্বাত্মপ্রবৃত্তি-সাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্ম অমৃতা*, এই যে সাক্ষীভূত আত্মা, যেমন সূর্য কোথাও কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না, সূর্য সাক্ষীস্বরূপ, অগ্নি যেমন সাক্ষী, আত্মাও সব কিছুর সাক্ষী। যখন কোন যোগী দেখেন আত্মা আমার অন্তর্যামী, আমার ভেতরে বাস করছেন, তখন তিনি আত্মাকে সাক্ষী রূপে দেখছেন। আবার আত্মারই আরেকটা রূপ তিনি ডাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বলে সমস্ত জগৎ ঠিক ভাবে চলছে। এভাবে যাঁরা দেখেন তাঁরা অমৃতাধর্মা হয়ে যান। যে ভগবানের ভয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সোজা হয়ে চলছে, সেই ভগবানই আমাদের ভেতরে অন্তর্যামী রূপে আছেন, এই জিনিষটাকে যাঁরা জানেন তাঁরাই অমর হয়ে যান, তাঁরাই মুক্ত হয়ে যান। *যদিদং কিঞ্চ জগৎ*, জগতে যা কিছু আছে, *সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্*, ব্রহ্ম থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, *মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্*, সেই ব্রহ্ম হাতে বজ্র নিয়ে সবাইকে চালাচ্ছেন, *য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি*, সেই ব্রহ্মকে যিনি সাক্ষী রূপে জানতে পারেন, সাক্ষী রূপে জানাটা আচার্য নিজের তরফ থেকে বলছেন, আমার অন্তর্যামী রূপে আছেন, এটাকে যিনি জানতে পারেন তিনি অমর হয়ে যান।

এই জগতে সব কিছু যে একটা mechanical force বা একটা dead forceএর দ্বারা চালিত হচ্ছে তা নয়। এভাবে আমরা এই জিনিষটাকে হয়ত নাও বুঝতে পারি, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে জিনিষটা ভালো বোঝা যাবে। যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের খুব নামকরা হলেন গ্যালিলিও, ওনার পর এলেন নিউটন। এনারা যখন বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করলেন, যেমন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, চন্দ্রমা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, তখন বিভিন্ন রকম বিচিত্র থিয়োরী আসতে শুরু করল। স্বামীজীর একটা মজার গল্প বলছেন, এক রাজ্যে শত্রুর আক্রমণ হয়েছে। রাজ্যকে কিভাবে রক্ষা করা যায় ভেবে রাজা খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। রাজা বিভিন্ন পেশার লোকদের পরামর্শ নিতে শুরু করলেন। যারা লোহার কারবার করে তারা বলল, পুরো শহরকে লোহা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে তাহলে আর কেউ কিছু করতে পারবে না। আরেকজন বল, কাঠের মত জিনিষ হয় না, পুরো কাঠ দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেললে আমরা বেঁচে যাব। একজন মুচি এসে বলল, লোহা, কাঠ দিয়ে কিছু হবে না, চামড়া দিয়ে মুড়ে দিতে হবে, চামড়ার মত জিনিষ এই জগতে আর কিছু নেই। স্বামীজী এই গল্পটা মজা করে বলছেন, কিন্তু বলতে চাইছেন, যার মস্তিষ্কের গঠন যেমন সে জগতের সমস্যা আর সমস্যার সমাধান ঐ গঠন অনুযায়ীই দেখে।

সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এক সময় হাজার বছরের জন্য একটা অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল, তার কারণ, ঐ সময় খ্রীষ্টান ধর্ম, বাইবেল আর চার্চ সব কিছুর উপর এমন চেপে বসে গিয়েছিল যে কাউকে কোন স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা করতে দেওয়া হত না। এর নামই হল Dark Ages। ঐ সময় ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, বিজ্ঞান যা কিছু তৈরী হত সব চার্চের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরী হত। হাজার বছর কোন কম সময় নয়। তখন টেলিস্কোপ বেরিয়েছে, এরপর গ্যালিলিও যেমনি অন্য রকম কথা বলতে শুরু করলেন চার্চ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। গ্যালিলিওর প্রতি সবার একটা শ্রদ্ধা ছিল বলে গ্যালিলিওকে বলে দিল, তুমি অনেক ভুলভাল বকছ, ভালোয় ভালোয় ক্ষমা চেয়ে নাও তা নাহলে ব্রুনোর মত হয়ে যাবে। গ্যালিলিও তখন কোর্টে গিয়ে হাতজোড় করে মাফ চেয়ে নিলেন, আমি যা বলেছি সব ভুলভাল বলেছি। খ্রীষ্টান ধর্মের উপর ধাক্কা লাগা এই শুরু হল। তারপর

এলেন নিউটন। নিউটন এসে যখন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গুলো দিতে শুরু করলেন ঠিক তখনই ফ্রান্সে শুরু হল ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের আগে ওখানে ছিলে নামকরা দার্শনিক ভল্টায়ার। ভল্টায়ার ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মের জন্মশত্রু। জন্ম থেকেই যেন তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ করছেন। এই নিয়ে ভল্টায়ারের খুব মজার মজার কাহিনীও আছে। খ্রীষ্টানদের একটা শেষ সেক্রামেন্ট হয়, সেক্রামেন্ট মানে শুদ্ধিকরণ, তাতে জীবনে যা পাপটাপ করেছে মৃত্যুর সময় তাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলতে হয়। চার্চের লোকেরা ভল্টায়ারের উপর খুব খাপ্পা ছিল, ভল্টায়ার যখন মৃত্যুর মুখে তখন চার্চ থেকে পাদরী খবর পাঠিয়েছে, সারা জীবন তো তুমি পাপ করে গেছ এবার একটু শুদ্ধি করে নাও। ভল্টায়ার তাঁর সেবককে বলছেন, পাদরীকে গিয়ে বলে এসো, আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছি, তাতেও যদি না ছাড়ে তাহলে বলবে কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে কোমায় চলে গেছে, তাতেও যদি না মানতে চায় বলবে মারা গেছে, এরপরেও যদি না মানে বলবে মরে গিয়ে he has gone to the hell and go to hell and search him there, গো টু হেল বলা মানে গালাগাল দেওয়া। ভল্টায়ার চার্চ আর খ্রীষ্টান ধর্মের এমন বিরুদ্ধে ছিলেন যে তাঁর চাকরকে গিয়ে বলতে বলছেন সে নরকে চলে গেছে এবার তুমিও নরকে গিয়ে তাকে খোঁজ। সারাটা জীবন চার্চ, বাইবেলের বিরুদ্ধে শুধু লিখেই গেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে দাঁড়াল ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের ফলে সবাই খ্রীষ্টান ধর্ম, চার্চ, বাইবেলের বিরুদ্ধে বলার এমন সুযোগ পেয়ে গেল যে সেই সময় খ্রীষ্টান ধর্ম ফরাসীতে মুখ থুবড়ে পড়ল। পাশেই ছিল ইংল্যাণ্ড, ফরাসী আর ইংল্যাণ্ড তখন ছিল বিজ্ঞানের নতুন নতুন থিয়োরীর কেন্দ্র। এই সুযোগে বিজ্ঞানীরাও উঠে পড়ে ধর্মকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিল। মানুষ স্বভাবেই মুর্খ, কেউ নতুন কিছু বলতে শুরু করে দিলে না বুঝে সবাই তাকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করে দেবে। এতদিন বলছিল ভগবানই সব করছেন, সবাই চার্চে গিয়ে ভিড় করত। তারপর যেই বলতে লাগলেন ভগবান কিছু করেন না, তিনি হলেন ব্লাইণ্ড ওয়াচ মেকার। ইতিমধ্যে একজন এর উপর একটা বইও লিখে দিলেন, ওয়াচ মেকার। ঘড়ি যারা বানায় তারা ঘন্টার কাঁটা, মিনিটের কাঁটা, সেকেণ্ডের কাঁটা একেবারে নিখুঁত ভাবে সেট করে দেয়। ভগবানও ঘড়ির মত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে সেট করে রেখেছেন। সেই থেকে শুরু হয়ে গেল mechanical view of universe।

সেই নিউটনের সময় থেকে mechanical view of universe থিয়োরী শুরু হল এখনও স্টিফেন হকিংএর মত সবাই এর সাথে জুড়ে আছেন। বিজ্ঞানের যে এই ভাব, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা মেশিনের মত চলছে, নতুন নতুন যত থিয়োরী আসছে সব এই ভাবের মধ্যে বসে যাচ্ছে। আর সবাই শোরগোল তুলে দিয়ে বলছে বিজ্ঞান কি ধর্মকে মানে? আচ্ছা বিজ্ঞান যদি ধর্মকে মানে তাতে তোমার আপত্তি কোথায়? না, বিজ্ঞান সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। কি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে? তুমি এটাই তো বলতে চাইছ যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু চলছে সব এনার্জির সোর্সে নিজের মত চলছে, শক্তি সব কিছুকে চালাচ্ছে। বেদের সময় এটাই একটা প্রমাণিত থিয়োরী রূপে গ্রাহ্য ছিল। সেটাকেই এই মন্ত্রে contradict করা হচ্ছে। তুমি যদি মনে কর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছু প্রাণকে আশ্রিত করে নিজে থেকেই চলছে, তাহলে তুমি ভুল মনে করছ। দ্বিতীয় আরেকটা থিয়োরী ছিল, সূর্য, চন্দ্র, সব কিছুর পেছনে যে যে দেবতারা আছেন, তাঁরা নিজের নিজের মত চলছেন, এটাকেও এই মন্ত্রে contradict করছেন। কি দিয়ে এনারা contradict করছেন? এখানে খাপছাড়া একটা মন্ত্রকে নিয়ে বললে তাহলে এই ব্যাপারটাকে খাপ খাওয়ানো যাবে না।

এখানে বলছেন *যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্*, যেখানেই তুমি প্রাণন ক্রিয়া দেখছ, প্রাণন ক্রিয়া মানে যেখানে কোন movement হচ্ছে সেটাকেই প্রাণন ক্রিয়া বলছেন, পাখা ঘুরছে এতেও প্রাণন ক্রিয়া চলছে আর আমাদের শরীরের মধ্যেও প্রাণন ক্রিয়া চলছে। কিন্তু পাখাকে জড় বলছেন, শরীরকে চেতন বলছেন। কারণ পাখাতে বাইরে থেকে এনার্জি যাচ্ছে আর শরীর ভেতরের এনার্জিতে চলছে। যেখানেই কোন প্রাণন ক্রিয়া চলছে তুমি মনে করছ ঐটা একটা স্বাধীন সত্তা, আসলে কিন্তু তা নয়। স্বাধীন সত্তার এই ধারণাকে খণ্ডন করতে হলে বেদ উপনিষদের সামগ্রিক চিত্রটা নিতে হবে। দুম্ করে একটা মন্ত্র নিলে সমস্যা হয়ে যাবে। এখানে বলছেন *মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্*, মালিকের যদি কড়া অনুশাসন থাকে তবেই সবাই নিজের নিজের কাজ ঠিক ঠিক করে। তার মানে সূর্য, চন্দ্র যা কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে এরা নিজে থেকে আর ঠিক থাকছে না। সূর্য ঠিক সময় উদয় হচ্ছে ঠিক সময়ে অস্ত যাচ্ছে, চন্দ্রমাও একটা নিজস্ব নিয়মে চলছে। এখানে

বলছেন তা নয়, যত অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আছেন তাঁরা একটুও বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তার কারণ, সেই ভগবান সব কিছুর ভেতরে অন্তঃকরণে সাক্ষী রূপে বিদ্যমান, তিনিই এই সব কিছুকে চালাচ্ছেন।

স্বাধীন ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা একটি বহুল আলোচিত বিষয়। একজন বলেই দিলেন দুই তৃতীয়াংশ চলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর এক তৃতীয়াংশ চলে স্বাধীন ইচ্ছায়। সাধারণ মানুষ মনে করে সব কিছু আমার ইচ্ছা। ঋষিরা মাঝামাঝি কিছু দেখেন না, তাঁরা দেখেন সবটাই তাঁর ইচ্ছা। কিছুটা ভগবানের আর কিছুটা আমার, ভালোটা ভগবানের মন্দটা আমার বা মন্দটা ভগবানের ভালোটা আমার, এভাবে কিছু হয় না। সবটাই হয় তিনি করছেন আর তা নাহলে সবটাই আমি করছি। অজ্ঞানীরা মনে করে সব আমি করছি, জ্ঞানী মনে করেন সবটাই ভগবান করছেন। আমাদের কাছে স্বাধীন ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছার মিলন বলে কিছু হয় না। এখানে বলছেন সবটাই তাঁর ইচ্ছা। কারণ সব কিছুর অন্তর্যামী তিনি। সাক্ষী রূপে তিনি আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে। খেলনার ভেতরে ব্যাটারী আছে বলে খেলনা গুলো চলাফেরা করছে।

যেখানে যত রকমের ক্রিয়া আছে, অবস্থিতি আছে সেখানে ভগবানের সত্তা আছে বলেই ক্রিয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানে যে বলছে সব কিছু নিজের মত blindly চলছে, তা কখনই নয়। তার পেছনে কি কোন চেতন সত্তা আছে, যেটা আনন্দের চেতন সত্তা? না, তাও না। তাহলে কি আছে? সেই একমাত্র ঈশ্বরের সত্তা। এখানে ভয় শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। আচার্য এখানে ভয়ের ব্যাখ্যা করছেন না। এর আগে আমরা আলোচনার সময় উল্লেখ করেছিলাম যে একমাত্র জহুদি ধর্ম ভয় জিনিষটাকে নিয়ে আসে। আমাদের শাস্ত্রে ভয় জিনিষটা ঠিক জহুদিদের অর্থে আসে না। এখানে এর একটাই অর্থ, তিনি আছেন বলেই এরা স্বাভাবিক ভাবে নিজের নিজের কাজ করবে। এই মন্ত্রকেই আবার অন্য ভাবে পরের মন্ত্রে নিয়ে আসা হয়েছে, এটাই বোঝানর জন্য যে, বেদে যত দেবতাদের কথা বলা হয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, তুমি মনে কর না যে এদের আলাদা কোন স্বাধীন সত্তা আছে, আলাদা গুরুত্ব আছে, ঐ একজনই আছেন। সেইজন্য বলছেন –

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়দিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।২/৩/৩।।

(এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, ভয়ে কিরণ বিকিরণ করেন, ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যুও স্বকর্মে প্রবৃত্ত থাকেন।)

ঈশ্বর, যিনি সবারই অন্তঃকরণে সাক্ষীভূত, তাঁর ভয়ে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। অগ্নি তাপ দিচ্ছে তাঁর ভয়ে, সূর্য তাঁরই ভয়ে তাপ বিকিরণ করছে, সবার রাজা ইন্দ্র তাঁর ভয়ে চলে আর তাঁর ভয় আছে বলেই বায়ু চলছে তার সাথে পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যুও তাঁর ভয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু, যম এদের যদি জাগতিক অর্থে নিই তাতেও এই অর্থই হবে আর অগ্নি, সূর্য, বায়ুর পেছনে যে দেবতাদের সত্তা আছে সেই অর্থে নিলে তখনও একই অর্থ হবে। এই যে পরমেশ্বরের ভয়, আচার্য বলছেন, *ভয়াৎ ভিত্বা অস্য পরমেশ্বরস্য*, এই পরমেশ্বর কিন্তু ব্রহ্ম নন। কারণ ব্রহ্ম নির্বিকার, তিনি নির্গুণ নিরাকার, কোন কিছুতেই তিনি নেই। মায়ার জগতে ব্রহ্মের যে উপলব্ধি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মকে যখন এই মায়ার জগৎ বা মনের জগৎ দিয়ে দেখা হয় তখন ব্রহ্মই পরমেশ্বর রূপে দেখান। পরমেশ্বর, তিনি পরম পিতার মত, ভালোবাসার জিনিষ, কিন্তু তিনি আবার শাসন করেন তাই তিনি ঈশ্বর। যিনি শাসন করেন তিনি দরকার হলে কড়া হাতেও শাসন করেন। কড়া শাসন না থাকলে সব কিছুতে শৈথিল্য এসে যাবে, নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হলেই ঈশ্বর কড়া হাতে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসেন। কোন কিছুই নিজের স্বভাবকে কখনই অতিক্রম করতে পারবে না।

যদিও এই মন্ত্রে ভয়ের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু মন্ত্রে ভয়ের যে খুব বিরাট তাৎপর্য আছে তা নয়। ঠাকুর বলছেন, তুমি যে ডেপুটি হয়েছ তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছ। এখানে একটা জিনিষ হল, যেখানেই কোন বিশেষ শক্তি সেখানে তাঁরই সত্তা আছে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এদের আমরা বড় মন করছি কিন্তু ঠাকুর আবার একজনকে বলছেন, তোমাকে আমি কিন্তু রাজা টাজা বলতে পারব না। কারণ ঈশ্বরই সত্যিকারের রাজা। সাধারণ ভক্ত না হয় রাজা মানে না কিন্তু সে দেবতাদের মানছে। বেদের সময় যারা ভক্ত ছিলেন তাদের কাছে সূর্য, চন্দ্র ইন্দ্রাদি দেবতারাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু ঋষি তাদের বোঝাতে চাইছেন ভগবানই শ্রেষ্ঠ সেইজন্য ভয়ের ব্যাপারটা এনে বলছেন, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র যাদের তুমি শ্রেষ্ঠ মনে করছ এরাও ভগবানের ভয়ে নিজের নিজের কাজ

করছে। কেনোপনিষদেও ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ুর অহঙ্কার হয়েছিল তখন তাঁদের দেখিয়ে দেওয়া হল, তিনি আছেন বলেই তোমাদের এত শক্তি, তিনি না থাকলে তোমাদের সত্তা ওখানেই শেষ। যেখানে ঈশ্বর নেই সেটাই অনীশ্বর, সত্তা বিহীন। সেইজন্য অগ্নি তাঁকে দগ্ধ করতে পারবে না, বায়ু তাঁকে শুষ্ক করতে পারবে না। এটাকেই কাব্যিক ভাবে বলছেন তাঁর ভয়ে কেউ কারুর নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে না। আমাদেরও যখন স্বাধীন চেতনার ভাব আসে তখন মনে করি আমরা সব কিছুকেই অতিক্রম করতে পারি। ধর্মের দৃষ্টিতে একটা পুরনো ধারণা আমাদের মধ্যে চলে আসছে যে, আমাদের যে রোগ শোক হয় এগুলো আমাদের পাপের জন্য হয়। কেউ যখন নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে তখন ওটাই পাপ রূপে তাকে মারতে শুরু করে।

ঠাকুর বলছেন আমি এত এত মা মা করি তাও আমার এত অসুখ আর পাশের মধু ডাক্তার ষাট বছর বয়সে রাঁড়ের জন্য ভাত রেঁধে নিয়ে যায়। ঠাকুরও মেনে নিচ্ছেন অনেক গোলমাল থাকলে রোগ ব্যাধি হবে। আবার বলছেন মধু ডাক্তারকে শেষ বয়সে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। সুন্দরী কাঠ প্রথমে খুব দাউ দাউ করে জ্বলে, পরে জল বেরোতে শুরু করে। শুধু যে খ্রীষ্টান বা ইসলাম পরম্পরাতেই এই ধারণা আছে তা নয়, এখানেও আছে। শ্রীমাও এক জায়গায় বলছেন, প্রায়শ্চিত্ত না করে নিলে পরের জন্ম রোগ ব্যাধি হয়। আমরা ভালো মন্দ যে কাজই করি তাতে দোষ থাকবেই। শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি তাতেও অনেক দোষ হচ্ছে, রান্না, খাওয়া-দাওয়া করতে গিয়ে পাঁচটা দোষ হবেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সব সময়ই করতে হয়। হিন্দু ধর্মে তাই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান আগে থেকেই দেওয়া আছে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ রোজ না করলে অশুদ্ধি যাবে না। অশুদ্ধি থেকেই রোগ-শোকাদি আসতে থাকে। এটাও একটা থিয়োরী, এই থিয়োরী কতটা সত্য কতটা মিথ্যা আমাদের জানা নেই, কিন্তু শাস্ত্রই এর প্রমাণ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর ধাবতি পঞ্চমঃ, এখানে এই কথাই বলছেন দেবতারাও ভগবানের বিধানকে, যে নিয়মে তাঁদের চলার কথা তাকে কখন অতিক্রম করতে পারবেন না। সারা দেশের দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, চারিদিকে কেমন একটা ঢিলেঢালা ভাব চলছে, দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। তার কারণ ভেতর থেকে যিনি শাসন করেন তিনি কোথাও ঢিলে হয়ে গেছেন। কড়া শাসন ব্যবস্থা থাকলে তবেই সব কিছু ঠিক মত চলে। এই ভাবটাই এখানে বলতে চাইছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘড়ির কাঁটার মত চলার কথা বিজ্ঞানীরা যে বলছেন, তা নয়, ভগবান ওয়াচ মেকার নন। শুদ্ধ চৈতন্য রূপে তিনি সবারই ভেতরে আছেন, সেইজন্য কেউ তাঁর নিয়মকে অতিক্রম করতে পারবে না। তাই ভুলেও ভেবো না যে দেবতারা নিজের খুশি মত সব করতে পারে। জহুদি, ইসলাম বা অন্য কোন কোন ধর্মে ভগবানের ভয় ব্যাপারটাকে যেভাবে নিয়ে আসা হয়েছে হিন্দু ধর্মে সেভাবে আসেনি, যদিও মৃত্যুরূপা কালীর কথা আছে, কিন্তু হিন্দুদের মূল ধারণা হল ভগবান অন্তর্যামী, তিনি সাক্ষী রূপে আছেন বলেই সব কিছু ঠিক ঠাক ভাবে চলছে। এটাকে আরেকটু জোর দিয়ে বোঝানর জন্য ভয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। আচার্য শঙ্করও ভয়কে ব্যাখ্যা করছেন না। হিন্দু পরম্পরাতেও এভাবে ভয়ের ব্যাপার আসে না, কিন্তু কঠোপনিষদের এই দুটি মন্ত্র খুব বিখ্যাত মন্ত্র। ঈশ্বরকে আমরা বলছি সৎ, চিৎ আর আনন্দ, তিনি যদি সচ্চিদানন্দ হন তাহলে ভগবানকে ইতি করে কখন বেঁধে দেওয়া যাবে না। যখন বলছি ভগবান মানে ভালোবাসা তখন আমরা ভগবানকে ইতি করে দিলাম। তিনি আর অনন্ত থাকলেন না। ভগবানের নামই ঈশ্ যিনি শাসন করেন, ঈশ্বর মানেই যিনি শাসন করেন। যখনই সগুণ ব্রহ্মের কথা আসে তখন ভালোবাসা আর ভয় দুটো সব সময় মিলেমিশে চলে। যার জন্য গীতায় ভগবান বলছেন, *তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্*, এই সংসারে যারা মানবজাতির নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে অর্থাৎ যারা নরাধম্ তাদেরকে আমি সোজা নরকে পাঠিয়ে দিই।

পুরো জগৎ একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে চলছে। নিয়মে চলার অনেকগুলো সম্ভবনা আছে। প্রথম সম্ভবনা হল এর আগে আমরা বিজ্ঞানের কথা বললাম, বিজ্ঞান বলছে এগুলো সব ব্লাইণ্ডলি চলছে, বিগ ব্যাঙ থেকে ব্ল্যাকহোল, সেখান থেকে এনার্জির নিজস্ব কিছু নিয়মে আছে সেই নিয়মে চলছে। দ্বিতীয় থিয়োরী প্রত্যেক বস্তুর পেছনে যে দেবতারা আছেন তাঁরা নিজের নিজের মত কাজ করছেন। কিন্তু যখন বহু হয়ে যায়, যেমন এখানে এতজন লোক আছে, তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মন, জগতে যত মন আছে সব মন একটা সুবিন্যস্ত ভাবে কি করে চলছে? তখন বলা হয়, ভালোবাসা দিয়ে চলছে। এই ভালোবাসাটা কার? আরও পেছনে গেলে

তখন বলবে, ভগবানের যে ঋতম, মহাজাগতিক যে নিয়মগুলিকে ভগবান বেঁধে দিয়েছেন সেই ঋতমের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু আমরা জানি মানুষ বা দেবতারা কখন ভালোবেসে নিয়ম পালন করে না। কারণ তার মধ্যে প্রলোভনের মত অনেক কিছু আসবেই। সেইজন্য ঐ জিনিষটার উপর জোর দেওয়ার জন্য ভয় শব্দটা আনছেন।

কিন্তু আগে বলছেন *মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্*, জহুদিদের মত ভগবান হাতে ডাণ্ডা নিয়ে শাসন করছেন। খ্রীশ্চানদের ভগবান আবার সব সময়ই ভালোবাসার ভগবান, আল্লাতে এসে এই দুটো মিলেমিশে যায়। হিন্দু ধর্মে ভগবানের সব রকম ভাবই আছে। কিন্তু উপনিষদের ঠিক ঠিক কি ভাব জিজ্ঞেস করা হলে বলা হবে যেটা আমরা আগে বললাম, তিনি সব কিছুর অন্তঃকরণে বিরাজ করে আছেন। গীতায় যেমন ভগবান বলছেন *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি*। সবারই হৃদয়ের তিনিই সার, একমাত্র তিনিই চৈতন্য বলেই সব কিছু চলছে। তিনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, কেউ এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারবে না। কেন যেতে পারবে না? কারণ ঈশ্বর ছাড়া বাকি সব কিছু জড়। অন্য দিকে সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এদের আলাদা সত্তা নেই বললে অনেকেই মেনে নিতে পারবে না। দেবতাদের কথা তো আজকের কথা নয়, চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা, যখন সবাই এনাদের দেবতা বলেই মনে করতেন, আর মনে করতেন দেবতারা সব স্বাধীন। এই জিনিষটাকে এখানে আটকাচ্ছেন। তাঁরাও যে কাজ করছেন সেটাও পরমেশ্বরের ভয়েই করছেন। এই ভাবটাই গীতাতে যখন আসছে তখন ভগবান বলছেন, যাকেই তুমি পূজা কর সব পূজা আমার কাছেই আসে। ঈশ্বরের সত্তাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর ধারে কাছে কেউ আসতে পারে না, এই জিনিষটাকে এখানে বোঝান হচ্ছে। বোঝাতে গিয়ে ভয় শব্দটা নিয়ে আসা হয়েছে, এছাড়া অন্য কোন অর্থ হতে পারে না। এনাদের uniform ভাব হল, আত্মাই আছেন। আত্মা সব কিছুর ভেতরে প্রবেশ করে আছেন, আত্মাই যদি তাঁর স্বরূপ তাহলে সে আর কাকে ভয় পাবে! সেইজন্য ভয় ব্যাপারটা হিন্দু ধর্মে বেশি পাওয়া যাবে না। এখানে মূল ভাব হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে তিনিই আছেন। তিনিই সাক্ষী রূপে সব কিছু দেখছেন, সব কিছুর হিসেব তিনি রাখছেন আর সেই অনুসারে তোমাকে তার ফল দেবেন। অনেকে মনে করছে, এই জন্মে লুটপুটে খাই, পরের জন্মে দেখা যাবে। এখানে সেটাও আটকে দিচ্ছেন। তার চাইতে তাঁকে ভয় করে চল, তা নাহলে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। ঠাকুরও বলছেন, পাপ বোধটা তিনিই রেখে দিয়েছেন তা নাহলে অনাচার বেড়ে যেত। যখন কোন জিনিষ স্পষ্ট থাকে না, তখন নানা রকমের ব্যাখ্যা এসে যায়। তার থেকেও বেশি হল, যেখানে দর্শনকে একেবারে পরিষ্কার ভাবে বোধগম্য করা যায় না বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যখন কিছু কথা বলা হয় তখন সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য অনেকগুলো ব্যাখ্যা এসে যায়। এখানে আমরা আমাদের ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছি, আচার্য কিন্তু সেভাবে কিছু বলেননি, উনি শুধু ভয় শব্দটা উল্লেখ করে ছেড়ে দিয়েছেন।

পর পর এখানে অনেক জ্ঞানের কথা বলে যাচ্ছেন। যেমন আমাদের সবার অন্তরে যিনি আছেন তিনিই আত্মা, এই আত্মাই বাস্তব সত্তা, এই সত্তাই জগৎকে চালাচ্ছেন, যে দেবতাদের আমরা সম্মান করছি, তাঁরাও আত্মার সত্তাতেই চলছেন। যদি এই জ্ঞান না হয় তাহলে কি হয়? সেটাই পরের মন্ত্রে বলছেন –

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।।২/৩/৪।।

(জীবদ্দশায় দেহত্যাগের পূর্বেই যদি কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তবেই মুক্ত হয়, নতুবা অজ্ঞান হেতু (পৃথিব্যাদি) লোকসমূহে জন্মগ্রহণ করে।)

এই যে জ্ঞানের কথা বলা হল, *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*, সূর্য আর অগ্নির ভয়টা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল সেই পরমাত্মার সত্তা। যে কোন জীবের এই পরমাত্মার সত্তার জ্ঞান যদি না হয়ে যায়, কবে? *ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ*, শরীর পতনের আগে পরমাত্মার সত্তাকে জানতে হবে। আচার্য এখানে বলছেন *ভয়কারণং ব্রহ্ম বোদ্ধুমবগন্তুং প্রাক্ পূর্বং শরীরস্য বিস্রসোহবস্রংসনাৎ পতনাৎ*, ব্রহ্মাই পরমেশ্বর রূপে জগতের সব কিছুর ভয়ের কারণ। যদি ভয় পেতে হয় ভগবানকে ভয় পাও, যদি ভালোবাসতে হয় ভগবানকেই ভালোবাস, যদি নির্ভর করতে হয় তাহলে ভগবানের উপরই নির্ভর কর। ঠাকুর বলছেন, বিচার করে দেখ, সব কিছুই দুদিনের জন্য, তুমি কার উপর ভরসা করবে! একমাত্র ঈশ্বরই আছেন যাঁকে ভরসা করা যায়। বলছেন এই বোধ যেন মৃত্যুর আগেই হয়ে যায়। যিশু বারবার স্বর্গের সাম্রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে বলছেন,

Kingdom in Heaven is at hand, স্বর্গের সাম্রাজ্য তোমার কাছেই। অনেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন Kingdom of Heaven মানে ঈশ্বরীয় জ্ঞান। কিন্তু সাধারণ লোক এগুলোকে ধরতে পারে না, জানতেও পারে না। সবাই মৃত্যুর পরে যে স্বর্গ, Kingdom of Heavenকে সেই স্বর্গ বলেই জানে।

উপনিষদ থেকে থেকেই এই ভাব নিয়ে আসছে। গীতাতেও ঠিক একই কথা বলছেন *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, যা কিছু করার এখানেই মৃত্যুর আগেই করে নিতে হবে। ঠাকুর বারবার বলছেন এখনই করতে হবে। ভগবান বুদ্ধেরও এই ভাব। এটাই খুব আশ্চর্যের, আমাদের যে কোন একটা শাস্ত্রের একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে সবাই বলছেন, অনেক হয়েছে এবার সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বরই বস্তু এই জ্ঞানকে প্রাপ্ত করতে নাম। ঠাকুর কত ভাবে বলছেন, সংসারের যা কাজ সব চটপট সেরে নাও বা আবার বলছেন অনেক তো দেখলে শুনলে, অনেক তো হল। যিশুর খুব নামকরা কথা, একজন লোক যিশুকে বলছেন, আমি আপনার সাথে যাব কিন্তু আমার বাবা মারা গেছেন তাঁকে সমাধি দিয়ে আসছি। যিশু বলছেন, যে মরেছে সে বুঝে নিক, তুমি ওসব ছাড়ো আর আমার সাথে চল। নিজের বাবাকে কবর দেওয়ারও যিশু সময় দিচ্ছেন না। সব মহাপুরুষরা চিৎকার করে বলে যাচ্ছেন, এই জগৎটা ছাড়ো। যাঁরা এই কথাগুলো বলছেন, তিনি মোজেসই হন, যিশুই হন, মহম্মদই হন, শ্রীকৃষ্ণই হন, শ্রীরামকৃষ্ণই হন, যেই হন না কেন, সবারই ভেতর একটা উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়, এটাকে ফেলে রেখ না, একটুও দেরী না করে এখনই এখানে করে নাও, সব কিছু তুমি এবার ছাড়, সব ফালতু। মজার হল যাঁরা ফালতু বলে সব কিছু ছেড়ে দেন, পরমাত্মাকে দেখার পর তাঁরাই আবার বাকিদের যখন বলতে যায় তখন তাঁদের মধ্যেও সেই উন্মাদনা, সব ছাড়।

ক্রুশিফাই হওয়ার পর যিশু পুনর্দেহ পেয়েছিলেন কিনা এই নিয়ে একটা মামলা হয়েছিল। বিচারক জানতে চাইলে যিশুর শিষ্যরা এমন ভাবে প্রমাণ সাজাল, যেমন কেউ খুন হয়ে গেলে এমন ভাবে প্রমাণ সাজানো হয় যাতে আসল খুনী ধরা না পরে, যিশুর শিষ্যরাও যত সাক্ষী, প্রমাণ এগুলোকে মিথ্যা করে সাজাল, আর সবটাই রীতিমত জটিল, যখন এ দেখছে তখন সেও দেখেছে ইত্যাদি। আর কিসের জন্য মিথ্যা সাজাচ্ছেন? যাতে তাদের নিজেদের গলায় ফাঁসির দড়ি পড়ে। কারণ যারাই যিশুর পুনরুত্থান দেখেছে বলছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। লোকেরা সাক্ষী ও প্রমাণ এমন ভাবে সাজায় যাতে সে বেঁচে যেতে পারে আর এখানে নিজেদের প্রাণ দেওয়ার জন্য এভাবে সাক্ষী প্রমাণ দিচ্ছে। যাঁরাই ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন তাঁদের কাছে জীবনের আর কোন দাম থাকে না। তাঁরা জানেন এর থেকে আরও ভালো অস্তিত্ব আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি আমাকে শূলে চড়াও, গলা কেটে দেও, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারো যেভাবেই মারো তাতে কিছুই আমার যায় আসে না, একবার শুধু এখান থেকে কোন রকমে বেরিয়ে যেতে পারলেই হয়। একজন কয়েদী প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী হয়ে আছে, জেলর এসে তাকে বলছে তোমাকে এক লাথি মেরে জেল থেকে বাইরে ফেলে দেব। কয়েদী কী বলবে? এক্ষুণি আমাকে লাথি মেরে বার করে দিন। এতে দুঃখের কথা কি আছে! আমার তো মুক্তি হয়ে যাবে। এনাদের কাছে আত্মা আর শরীরের ঠিক এই সম্পর্ক হয়ে যায়।

ভগবান বুদ্ধকে শেষ যে খাবার দেওয়া হয়েছিল, কোন কারণে খাবারটা বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের শরীর সঙ্গে সঙ্গে খুব খারাপ হয়ে যায়। যে খাবারটা নিয়ে এসেছিল সে কাঁদছে, প্রভু এ কি হয়ে গেল! ভগবান বুদ্ধ তাঁকে বলছেন, তুমি খুশি হও, তুমি তো আমাকে এই শরীর থেকে মুক্তি দিয়ে দিলে। যারা আত্মহত্যা করছে তারাও এই কথাই বলে। কিন্তু দুটোতে অনেক তফাৎ, এনারা আনন্দ সাগরে ভাসছেন এই ভেবে যে, আমি আমার স্বরূপে সাথে এক হয়ে যাব। আর আত্মহত্যা যারা করছে তারা প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে পড়ে আছে, কষ্ট থেকে সে বাঁচতে চাইছে। যদি কষ্টটা মিটিয়ে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে বলবে, না না আমি মরব না, আমার সব ঠিক আছে। ওনাদের কাছে বাস্তবিকতাটাই পুরো পাল্টে গেছে, এই যে তীব্র আকাঙ্খা আমার মুক্তি চাই আর যখন ঐ সত্যকে দেখে নিলেন, ওনারা আর এই জগতে থাকতে চান না। ঠাকুর বলছেন একুশ দিন সমাধিতে থাকলে আর সে ফেরে না। কেউ কেউ তার আগেই দেহটা ছেড়ে দেন। একুশ দিন খাওয়া-দাওয়া না করার জন্য শরীর তার ধর্ম পালন করতে পারে না বলে শরীরটা পড়ে যায়। ক্বচিৎ কখন কেউ কেউ তাঁর আদেশে ও তাঁর ইচ্ছাতে জগৎ কল্যাণের জন্য শরীরটা ধরে রাখেন। তাঁরাও আবার বলেন, আর কত দিন, এবার গেলেই বাঁচি। ঈশ্বর তাঁকে এখন মুটে খাটাচ্ছেন, স্বামীজীকে যেমন ঠাকুর মুটে খাটাচ্ছেন। ঠাকুর

বলছেন, চাবি আমার কাছে রইল তোকে জগতের কল্যাণে কাজ করতে হবে। তাও মাঝে মাঝেই সুযোগ পেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু নিরুপায় হয়ে তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন।

এনারা কোথাও কিন্তু একবারও বলছেন না যে, তোমরা ভালো কাজ কর, ভালো কাজ করলে মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে যাবে। পূর্বমীমাংসকরা অনবরত এই কথাই বলে যাচ্ছে। যার জন্য ঈশোপনিষদেও বলছেন, *তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, সারা জীবন আমি পূণ্যকর্ম করেছি আমার জন্য স্বর্গের পথ খুলে দাও। কিন্তু যাঁদের আমরা প্রফেটস বলছি, বা উপনিষদের ঋষিরা কেউই কিন্তু মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে যাবে বা তোমার ভালো জন্ম হবে বলছেন না। এনাদের সবারই এক কথা, এখানে, এই শরীরে, এক্ষুণি মুক্তি চাই।

মন্ত্রের প্রথম লাইনে বলা হল আত্মজ্ঞান মৃত্যুর আগেই পেতে হবে। কিন্তু যদি না পায় তাহলে কি হবে? বিশ্বে মূল আটটি ধর্ম, চারটি মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্ম, জহুদি, খ্রীষ্টান, ইসলাম আর পার্সি আর চারটি ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ, এই আটটি ধর্মের একটা মূল সাধারণ জিনিষ হল, তুমি শুধু মাত্র দেহ নও। এটাই সব ধর্মের একটা অন্যতম মূল নীতি। দেহই যদি শুধু সত্য হয় তাহলে ধর্ম আর কোন দিন চলবে না। তিনটি সেমেটিক ধর্মে বলা হয় ভগবান মাটি দিয়ে মানুষ তৈরী করে তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিলেন, সেই আত্মাই শেষ পর্যন্ত থেকে যায় আর দেহটা মাটিতে মিশে যায়। ভারতের যে চারটি ধর্ম এখানেও আত্মাকে বিভিন্ন ভাবে পরিভাষিত করা হয় কিন্তু মূল ভাবটা একই, আত্মাই সত্য দেহটা মিথ্যা। এই মন্ত্রে বলছেন, *ইহ চেদশকদ্*, এই শরীর থাকতে থাকতেই আত্মার জ্ঞান পেতে হবে, যদি না পাও তাহলে ঝামেলায় পড়ে যাবে। মৃত্যুর পর কি হয় আমাদের জানার কোন পথ নেই। শাস্ত্র যেটা বলে দিয়েছে, সেটাকে মানা ছাড়া, আচার্যদের কথা, প্রফেটদের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। মোজেস, যিশু বা ভগবান বুদ্ধ এনারা সব সময় জোর দিচ্ছেন জ্ঞানের প্রতি, তোমাকে আত্মজ্ঞান পেতে হবে। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে আমার যদি ঈশ্বর দর্শন না হয়, আত্মজ্ঞান যদি না হয় তাহলে আমার কি হবে? একটা কিছু তো তাকে বলতে হবে, কিছু না হলে একটা কিছুর ভয় অন্তত দেখাতে হবে। শুধু মুক্তির প্রলোভন, মৃত্যুর পর স্বর্গের প্রলোভন দিয়েও সব সময় কাজ হয় না। অনেকেই বলতে পারে আমার দরকার নেই, আমি স্বর্গে যেতে চাই না। স্বামীজীকে একজন ফাদার এসে খুব জ্বালাতন করতেন, আপনি যদি খ্রীষ্টান না হন তা নাহলে নরকে যাবেন। শুনতে শুনতে স্বামীজী খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন, বিরক্ত হয়ে বলছেন, আমি নরকেই যেতে চাই কারণ তুমি স্বর্গে যাবে তাই। তুমি স্বর্গে যাবে সেইজন্য তোমার জ্বালা থেকে বাঁচার জন্য আমি নরকে যাব। একটা কিছু তো তাঁদের বলতে হবে। ধর্মগ্রন্থগুলো খুব ভালো করে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে ঋষিরাও খুব পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না। ধর্মের খুব সহজ ধারণা এসেছে জহুদিদের কাছ থেকে, তাতে বলা হয় মৃত্যুর পর আত্মা, আত্মা তারা বলে না, ভগবান মানুষের মধ্যে যে spiritকে ফুঁকে দিয়েছেন, সেটা প্রায়শ্চিত্তের জন্য যায়। সব থেকে বেশি হলে এক বছর তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পূণ্যবানদের আরও তাড়াতাড়ি শুদ্ধি হয়ে যায়। আর যারা গোলমেল তাদেরও সর্বোচ্চ এক বছর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শুদ্ধি হয়ে যাওয়ার পর তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায়, কারণ ঈশ্বরই ফুঁ দিয়েছিলেন।

খ্রীষ্টান ধর্মের সাথে জহুদিদের খুব পুরনো ঝগড়া। সেইজন্য ধীরে ধীরে খ্রীষ্টানরা জহুদিদের এই মতটা পাল্টাতে শুরু করে দিল। মত পাল্টাতে গিয়ে তারা আরও জট পাকিয়ে ফেলল, আশেপাশে আরও যত মত ছিল, গ্রীকদের মত, রোমানদের মত, পার্সিদের মত, সব মতকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা উদ্ভট মত দাঁড় করাল। খ্রীষ্টানদের এই উদ্ভট মতে বলে, একজন মারা গেল, তার কবর দেওয়া হয়ে গেছে, কবর দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তার বিচার হবে। ভালো কাজ যদি করে থাকে তাহলে চলে যাবে স্বর্গে আর খারাপ কাজ করলে চলে যাবে purgatoryতে। সেখানে তাদের অনেক রকমের শাস্তি দেওয়া হবে, কাউকে তেলে পোড়ান হবে, মাথায় জল ঢালা হবে এই ধরণের নানা রকমের শাস্তির কথা বলা আছে। এই সব শাস্তি তাদের উপর চলতেই থাকবে। চলতে চলতে একদিন জাজমেন্ট ডে আসবে। ঐদিন যারা স্বর্গে ছিল আর যারা purgatoryতে গেছে তাদের সবাইকে এক জায়গায় টেনে আনা হবে। সেখানে যিশু ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এক এক করে সবাইকে ডাকা হবে, প্রথম একজনকে ডাকা হলে সে সামনে এসে দাঁড়ালে যিশু বলবেন, এ শুদ্ধ আর আমাকে মেনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তাকে অনন্ত স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। দ্বিতীয় জন এল, যিশু তাকে দেখে বললেন, এই লোকটি ভালো ছিল না কিন্তু purgatoryতে তেলে পুড়িয়ে পুড়িয়ে তাকে শুদ্ধ করে দেওয়া

হয়েছে। ভগবান তাকেও অনন্ত স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন। আর এই লোকটি? এই লোকটি তো ভগবান আপনাকেও মানত না আর আমাকেও মানেনি। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনন্ত নরকে পাঠিয়ে দিলেন। আরেকজন কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। যিশু ভগবানকে বলছেন, এই লোকটি কাঁদছে ঠিকই কিন্তু একটাও ভালো কাজ করেনি, আর আচ্ছা করে তেলে ভাজা হয়েছে। ঠিক আছে একেও অনন্ত স্বর্গে পাঠিয়ে দাও। এরা কিন্তু কেউ আত্মা রূপে কোথাও যাচ্ছে না, সবাই তাদের আগের শরীরটা পেয়ে যাচ্ছে আর ঐ শরীরেই অনন্ত স্বর্গে বা অনন্ত নরকে চলে যাচ্ছে। আগে যেটা ছিল সেটা সূক্ষ্ম শরীর ছিল। পরবর্তি কালে খ্রীষ্টান ধর্মের উপর খুব বিশ্রি ভাবে আক্রমণ শুরু হল। যেমন একটা বাচ্চা জন্ম নিল, জন্ম নেওয়ার একদিনের মধ্যেই মরে গেল। এখন সে কোন শরীরটা পাবে? লড়াই করতে গিয়ে কারুর হাত কেটে গেছে, কারুর পা কেটে গেছে। সেকি হাত কাটা বা খোঁড়া পায়েই অনন্ত স্বর্গে যাবে? খ্রীষ্টানদের কাছে এসবের কোন উত্তর নেই। মুসলমানরা এটাকে আরও সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিল। তুমি বাচ্চাই থাক আর বৃদ্ধই থাক, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মানুষের যেমন শরীর থাকে সেই শরীরটাই তুমি পাবে। আর প্রত্যেকে চারজন করে পঁচিশ বছরের হুরী পাবে। স্বর্গে আছে বলে তাদের শরীরে ঘামের গন্ধ হবে না, সব বর্ণনা আছে, স্বর্গে কি কি হবে কি কি হবে না ইত্যাদি। ওদেরও যে ক্যায়ামৎ আছে মোটামুটি একই রকম কিন্তু একটু তফাৎ আছে। মৌলবীরা তাদের চেলাদের এই জিনিষগুলিকে দিয়েই ভয় দেখায়। যদি তুমি ভালো কাজ না কর, যদি তুমি এই এই না কর তাহলে তোমার এই এই হবে। ভগবান বুদ্ধ যিশুরও আগের। জাজমেন্ট ডে যেদিন হবে সেদিন বুদ্ধ এসে দাঁড়াবেন তখন যিশু বলবেন, আমি তো একে চিনি না। ভগবান বুদ্ধ এবার যাবেন অনন্ত নরকে। ঠাকুর যেহেতু ভগবান সেইহেতু ঠাকুরের না হয় বিচার হবে না, কিন্তু স্বামীজী এসে দাঁড়িয়েছেন, যিশু বলবেন, এর তো ব্যাপ্টিজিম্ হয়নি, পাদরি এর মাথায় জল ছেটায়নি, এবার তুমি চলে যাও অনন্ত নরকে। স্বামীজী অনন্ত নরকে চলে যাবেন। যদি মনে করা হয় সব ভগবানই সমান তাহলে খ্রীষ্টানদের যিনি গড্ তিনিই ঠাকুর, তাহলে ঠাকুরই তাঁর নরেনকে অনন্ত নরকে পাঠাবেন। এসব বর্ণনা বাইবেলেই আছে।

হিন্দুদেরও ভয় দেখাতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা তো জানি না মৃত্যুর পর কি হয়। তবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এই জিনিষটা আমাদের কিছুটা পরিষ্কার হয়ে আছে। শাস্ত্র কিন্তু মৃত্যুর পর কি হয় এর উপর জোর দিচ্ছে না, সবাই জোর দিচ্ছেন একটা জিনিষের উপর তা হল, যা করার এখানেই কর, করলে বাকিটা তুমি নিজেই জানতে পারবে। আচার্য বলছেন এই জিনিষগুলো তুমি ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারবে না, যুক্তি তর্ক দিয়ে যদি জানতে চাও, তাহলে তুমি যে যুক্তিতর্ক দেবে তোমার বিরুদ্ধে ঠিক ততটাই যুক্তিতর্ক এসে যাবে। ভগবানের ব্যাপারে, স্বর্গের ব্যাপারে, পুনর্জন্মের ব্যাপারে বলতে গিয়ে আপনি যে যুক্তিতর্কই দেবেন, ঠিক ততটা শক্তিশালী যুক্তিতর্ক আপনার বিরুদ্ধে এসে যাবে। তাহলে পথ কি? বলছেন, হয় শাস্ত্রকে তুমি মেনে নাও, আর তা নাহলে তুমি নিজে করে দেখ। তুমি নিজে করে দেখ তাহলে নিজেই জানতে পারবে পুনর্জন্ম আছে কি নেই, স্বর্গাদি আছে কিনা, মুক্তি বলে কিছু আছে কিনা। কিন্তু মাঝখানে একটা প্রশ্ন থেকেই গেল। আমি যদি না করি তাহলে কি হবে? জ্ঞানী পুরুষরা না হয় দেখে নিয়েছেন, যার একেবারে ঘোর অজ্ঞানী তারা এসব কথা শুনতেই চাইবে না। কিন্তু মাঝখানে যারা আছে, একটু শাস্ত্রের কথা শুনে জানছে, একটু উপলব্ধি হয়েছে কিন্তু পুরোটা পরিষ্কার নেই, এদের কি হবে? হিন্দু ধর্ম বলছে এদের পুনর্জন্ম হয়। বেদে যদিও পুনর্জন্মাদির ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই, কিন্তু পরের দিকে বেদের ব্রাহ্মণাদিতে পুনর্জন্মের কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে আর কঠোপনিষদে পুরোদমে পুনর্জন্মের সিদ্ধান্তকে নিয়ে আসা হয়েছে।

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ, শরীর ত্যাগের পূর্বেই যদি পরমাত্মার জ্ঞান না হয় তাহলে কি হবে? বলছেন *ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে*, সর্গ মানে যেখানে সৃষ্টি কার্য হয়, যেমন এই পৃথিবী, যেখানেই সৃষ্টি কার্য হয় সেখানে গিয়ে তার জীবাত্মা একটা শরীর ধারণ করবে। সেইজন্য দেহ পতনের আগে যো সো করে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে নিতে হবে। এটাই আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। প্রথম কথা ধর্ম মানেই মৃত্যুর পরেও অস্তিত্বে বিশ্বাস। দ্বিতীয় কথা, বিশ্বের যাঁরা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁরা সবাই এই জীবনেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য জোর দিয়েছেন। তৃতীয়, জ্ঞান প্রাপ্তি না হলে কি হবে এই ব্যাপারে তাঁরা এক মত নন। কারণ এটা তাঁদের কাজ নয়। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে রাজাধানী ট্রেনের টিটিকে জিজ্ঞেস করছে, এই ট্রেনে উঠলে কি হবে? তোমাকে দিল্লী নিয়ে চলে যাবে। আমি যদি এই ট্রেনে না উঠি তাহলে

আমার কি হবে? সে তো তুমি জানবে তোমার কি হবে। তুমি হাওড়া স্টেশনে বসে থাকবে, নাকি লোকাল ট্রেন ধরে ব্যাণ্ডেল যাবে, নাকি জেটিতে গিয়ে লঞ্চ পেরিয়ে কলকাতায় যাবে সেটা আমি কি করে বলব তুমি কি করবে! এখানেও ঠিক তাই হয়, যদি ঈশ্বরের পথ নাও তাহলে তুমি অনন্ত স্বর্গের অধিকারী হবে। খ্রীষ্টানরা পরে অনন্ত স্বর্গকে স্বর্গলোক বানিয়ে দিয়েছে কিন্তু আসলে অনন্ত স্বর্গ হল আত্মজ্ঞান, যে জ্ঞানে তুমি জানবে তুমি দেহ নও, মন নও, বুদ্ধি নও, তুমি শুদ্ধ আত্মা। ভগবান যে তোমার ভেতরে spirit ফুঁকে দিয়েছেন, spirit বলতে আধ্যাত্মিক ভাব, তুমি সেটা। যদি তুমি ঈশ্বরের পথ না নাও তাহলে টিটি কি করে বলবে তুমি কোথায় যাবে! ট্রেনে না উঠলে টিটি কি করে বলবে তুমি কোথায় যাবে, আগে ট্রেনে ওঠ, তখন টিটি বলতে পারবে তুমি কোথায় যেতে পারবে। মহাপুরুষদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়! পরে পরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা ব্যাখ্যা করে বলে দিলেন তুমি নরকে যাবে।

হিন্দু শাস্ত্র কিন্তু প্রথম থেকে পুনর্জন্মের কথা বলে আসছে। স্বামীজী বলছেন জ্ঞানী দেখেন জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আরও দেখেন জন্ম মৃত্যু কখন ছিলই না। শুদ্ধ বেদান্তে একমাত্র আত্মারই শুধু অস্তিত্ব আছে। যিনি শুদ্ধ আত্মা, যিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য তাঁর কখন কোন ধরণের পরিবর্তন হতে পারে না, পরিবর্তন সম্ভবই নয়। কিন্তু তাহলে এত কিছু হল কি করে? বলছেন কোথাও কিছু হচ্ছে না, চৈতন্যের চিন্তার জগতেই সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু চৈতন্যের চিন্তা আমাদের চিন্তার মত নয়। শুদ্ধ চৈতন্য যেটা চিন্তা করেন সেটাই আমাদের কাছে সত্য, আমরা যেমন স্বপ্নে যা দেখি সেটাকে তখন সত্য বলে মনে হয়। তাঁর চিন্তার জগতেই তিনি দেখছেন আমার জ্ঞান হল না। কেন জ্ঞান হল না? কারণ তখনও তাঁর ইচ্ছা থেকে গেছে। ফলে জন্মাচ্ছে মরছে, দুঃখ পেলে কাঁদছে, সুখ পেলে হাসছে। এখানে দুঃখটাই বেশি তাই কান্নাটাও অনেক বেশি। জগতে কষ্ট, দুঃখ, কান্না ছাড়া কিছু নেই। যাদের পছন্দ করছি না তাদের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে, যাকে ভালোবাসি তার থেকে দূরে থাকতে হয়, যেটা চাই সেটা পাই না, যেটা চাই না সেটাই ঘুরে ঘুরে এসে যায়। একটা সুবিধা নিতে গেলে আরও দশ রকমের ঝামেলা এসে যাবে, একটা ঝামেলা থেকে পালাতে গিয়ে আরও হাজার রকমের ঝামেলা এসে যায়। এতটুকু সুবিধা নিতে গেলে হাজার রকমের সমস্যা দাঁড়িয়ে যাবে। এক জন্মে কেঁদে কেঁদে কান্না শেষ না হলে আরেকটা জন্ম আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে কাঁদবার জন্য। সেই জন্মেও কান্না শেষ না হলে আরেকটা জন্ম দাঁড়িয়ে যাবে। এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, এতেও যদি কিছু না হয় তখন কোন জন্মে কুকুর বেড়াল হয়ে জন্ম নিতে হবে।

যেখানে কার্য-কারণ সম্পর্ক সেখানেই দ্বৈতবাদের জগৎ চলে। বেদান্তে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নিয়ে বলা হয়ে থাকে এটাকে বলে semblance of cause and effect, মনে হয় যেন কার্য-কারণের একটা সম্পর্ক আছে। কারণ কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে দিলে আমি ভালো করলে ভালো পাব, খারাপ করলে খারাপ হবে। কিন্তু দেখা যায় ভালো করেও অনেক সময় ভালো কিছু হয় না, অন্য দিকে নেতারা দিনরাত চুরি করছে, মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে এদের সবারই কেমন দিব্যি চলে যাচ্ছে। তাহলে কার্য-কারণ সম্পর্ক কোথায় গেল? তখন আবার বলা হয় আগের আগের জন্মে ভালো কিছু করা আছে। যদিও নিউটনের ফিজিক্সের নিয়মে পুরোটাই কার্য-কারণ সম্পর্কে চলে কিন্তু এখন ফিজিক্সের যে নতুন থিয়োরী আসছে তাতে বলছে কার্য-কারণ সম্পর্ক দিয়ে পুরোপুরি এভাবে চলে না। তা সে যাই হোক, বক্তব্য হল, আমাদের মনে যে একটু কার্য-কারণ সম্পর্কের ভাব আসে, এই ভাব সব সময় দ্বৈতবাদের জগতেই আছে। চৈতন্যের জগতে কার্য-কারণ সম্পর্কের লেশ মাত্র কিছু নেই। প্রত্যেক ধর্মেই এই ভাব বিভিন্ন ভাবে অল্প বিস্তর পাওয়া যাবে। স্বাধীন ইচ্ছা মানেই কার্য-কারণ সম্পর্ক। আমি এই কাজ করেছি আমার এই টাকা চাই। তারপর দেখা গেল কিছুই হল না, তখন বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছা বললে দুটো জিনিষ আসে, একটা আসে অদৃষ্ট। দ্বিতীয়, আমাদের ভেতরে যিনি অন্তর্যামী তিনিই আসল মালিক। তিনি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। কিন্তু তিনি তো রাজা, তিনি চাইলেই অন্য রকম কিছু করতে পারেন। ঠিক তেমনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার সময় অন্তর্যামীর কাছে প্রার্থনা না করে ভগবানের কাছেই করা হয়। তিনি তো সর্বশক্তিমান, তিনি তো কার্য-কারণ সম্পর্ক দিয়ে বাঁধা নন। আমরা ভুলে ভাবি ঈশ্বর কার্য কারণে বাঁধা, কিন্তু ঈশ্বর বাঁধা নন, তিনি কার্য-কারণ সম্পর্কের বাইরে। কিন্তু সাধারণত কার্য-কারণের সম্পর্ককে তিনি ভাঙেন না। তাই বলে যে তিনি ভাঙতে পারেন না তা নয়, চাইলেই ভাঙতে পারেন। ঠিক তেমনি কোন কিছু না করেও, মন যদি প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হয় তাহলে কাজ না করেও ফল

হয়ে যেতে পারে। ইদানিং এটাকেই অনেকে বলতে শুরু করেছে power of positive thinking, কিন্তু power of positive thinking বলে কিছু হয় না, সব ফালতু। যেটা হয়, কিছু যোগশক্তি আসে, যোগে যেমন বলছেন *সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্*, যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনি কাজ না করলেও সেই কাজের ফল তাঁর কাছে এসে যাবে। তার মানে তিনি কার্য-কারণ সম্পর্কটা পেরিয়ে গেলেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে আত্মার শক্তির প্রকাশ সেখানে এসে যাচ্ছে। আত্মার শক্তির প্রকাশ যে জায়গাতেই আসবে সেই জায়গাতে কার্য-কারণ সম্পর্ক আর কাজ করবে না। এখন যিনি আত্মাকে জেনে গেলেন তিনি আত্মার সাথে এক হয়ে গেলেন, কারণ আত্মাকে জানাও যা আর আত্মা হয়ে যাওয়াও তাই। আত্মার সাথে এক যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আত্মাকে কেউ জানতে পারবে না। আত্মার সাথে এক হয়ে গেলে সে তো জগতের মালিক হয়ে গেল, যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে, কার্য-কারণের সম্পর্ক থাকবে না।

পুনর্জন্ম পুরোপুরি কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে। মানুষ যেমন চিন্তা-ভাবনা করছে তেমনটি তার জন্ম হবে, এটাই ঈশ্বরের বিধান। ঈশ্বরের বিধানকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না, *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*। ভগবান যদি চান তিনি কাউকে কাউকে তাঁর বিধানকে অতিক্রম করিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি করেন না। যদি কেউ আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করে তিনি তাকে পার করিয়েও দেবেন। বেদান্ত এত কিছু মানবেই না, বেদান্ত মতে আত্মা চিন্তা করলেন আমি এক আমি বহু হব। বিশুদ্ধ আত্মার চিন্তা করাও যা তাঁর সৃষ্টি হওয়াটাও তাই। আমরা তাঁর চিন্তা বলছি আর বাইবেলে বলছেন ভগবান ইচ্ছা করলেন আর সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা করা আর শুদ্ধ চৈতন্যের ইচ্ছা করাতে অনেক তফাৎ। আমি যখন চিন্তা করছি তখন আমি মন দিয়ে ভাবছি, আর আমার মন দিয়ে যখন ভাবছি তখন জিনিষটা এক রকম হয়, চিন্তা ভাবনাতেই তা থেকে যায়। কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য যখন চিন্তা করেন তখন তিনি কার্য-কারণকে সৃষ্টি করে দিতে পারেন আর কার্য-কারণের পারেও চলে যেতে পারেন। যেমন তিনি চিন্তা করলেন জগৎ হোক, সৃষ্টি দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বলে দিলেন সৃষ্টির খেলাতে যে এত কিছু হচ্ছে এটা এই রকম হয়ে যাক, তখন সৃষ্টি ঐ রকম হয়ে যাবে। কিন্তু তিনিই ঐ খেলাকে চালাচ্ছেন। মুশকিল হল এই ব্যাপারটা ধারণা করা অসম্ভব। স্বামীজী একটা চিঠিতে লিখছেন, দ্বৈতবাদীরা বলে মৃত্যুর পর জীবাত্মা সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, দ্যুলোক ইত্যাদি লোকে গিয়ে শেষে ব্রহ্মলোকে যায় আর সেখান থেকেই জীবাত্মার মুক্তি হয়। বেদান্তবাদীরা মনে করেন, এত যে লোকের কথা বলা হচ্ছে, এমনকি পৃথিবীলোকও শুদ্ধ চৈতন্যের কাছে স্বপ্নের মত ভাসছে। কিন্তু এটা চৈতন্যের কাছে স্বপ্নের মত ভাসছে, চৈতন্যের কাছে ভাসা মানে আমাদের কাছে যেমন এই গ্লাশ একেবারে সত্য, তাঁর কাছে ঐ দৃশ্যগুলি সত্য। এরপর যখন বলেন মুক্তি, তখন দেখেন এগুলো কখন ছিলই না, তাই কিসের বন্ধন কিসের মুক্তি। জ্ঞানীরা সবাই একই কথা বলছেন, না আছে মৃত্যু না আছে জন্ম। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সব কিছুকে তাঁরাও মানছেন। সেইজন্য স্বামীজী যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত, এছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এটাকেই যিশু একভাবে বলছেন, উপনিষদ আরেক ভাবে বলছেন, কেউ কারুর কথাকে contradict করছেন না। স্বামীজী যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাতে সব শাস্ত্রকেই খুব সহজে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হয় চৈতন্য জিনিষটা কি আর তাঁর চিন্তাটা কি তার সাথে তাঁর চিন্তার কি ফল, এই তিনটেকে ধারণা করা অসম্ভব। কিন্তু স্বামীজীর সিদ্ধান্তে বিভিন্ন শাস্ত্র যে কথাগুলো বলছেন সবটাই খাপে খাপে বসে যায়। খ্রীষ্টানরা যখন অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথা বলছেন তখন সেটাও খাপে খাপে বসে যাচ্ছে। মহম্মদের কথাও ফিট করে যাচ্ছে, মৃত্যুর পর স্বর্গে চারটে করে হুরী দিয়ে দিলেও অসুবিধা নেই, কারণ সবটাই চিন্তার মত ভাসছে কিনা। আর যিনি অনন্ত তাঁর কাছে হাজার হাজার বছর ধরে ভাসতে থাকবে। স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্তের যে মডেল দিয়েছেন, যেখানে তিনি দ্বৈত বেদান্তকে সমন্বয় করছেন, সেখানে যত ধর্ম, যত মত, যত শাস্ত্র সবটাই যেন খাপে খাপে মিলে যায়। এখানে মূল আলোচ্য বিষয় হল, যদি এই শরীরেই তোমার জ্ঞান প্রাপ্ত না হয় তোমাকে আবার শরীর ধারণ করে আসতে হবে। স্বামীজী যে মডেল দিচ্ছেন তাতেও তাই হবে আর অন্যান্য ধর্মেও তাই হবে। শুধু মরে নরকে যাবে বলছে, সেটা না হয় কিছু দিন নরকে বাস হয়ে আবার পুনর্জন্ম হয়ে নীচের দিকে যাবে। ঠাকুর একজনকে বলছেন, অপঘাতে বা আত্মহত্যা করে মরলে প্রেতনী হয়। একই জিনিষ, প্রেতলোকটাও একটা জগৎ, ঠিক তেমনি নরকও একটা জগৎ।

সেইজন্য বলছেন, যা করার এখানেই এক্ষুণি করতে হবে, *ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।* যদি করতে না পার তাহলে, *ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে*, বিভিন্ন লোকে যেখানে সৃষ্টি হয় সেখানে তোমাকে আবার শরীর ধারণ করতে হবে। তার মানে ব্রহ্মলোকে তুমি কোন দিন যেতে পারবে না, কারণ সেখানে কোন সৃষ্টি কার্য নেই। সৃষ্টির কার্য পৃথিবী লোকেই হয়, এখানে জন্ম নেয় আর বাকি জায়গায় গমন করে। বা বলা যেতে পারে পঞ্চভূতের শরীর যেখানে জন্ম নেয় সেখানে গিয়ে জন্মাবে। জন্ম নেওয়া মানে শরীর ধারণ, শরীর ধারণ হলেই কর্ম করার ক্ষমতা আসবে, কর্ম ক্ষমতা এলে ভালো মন্দ কর্ম করবে আর কর্মানুসারে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকেব। এর আগে বলেছেন, *যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ*, এখানে ঐ জিনিষটাকে নিয়েই বলছেন, যদি জ্ঞান প্রাপ্ত না কর তাহলে কিন্তু তুমি ফেঁসে থাকবে। তাই সব কিছু ছেড়ে যে করেই হোক জ্ঞান প্রাপ্তির চেষ্টা করা, এটাই মন্ত্রের মূল বক্তব্য। পরের মন্ত্রে বলছেন যাঁরা আত্মার দর্শন করেন বিভিন্ন লোকে তাঁদের আত্মর দর্শন কি রকম হয় –

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।।২/৩/৫।।

(দর্পণে নিজের মুখ যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, বুদ্ধিতে আত্মার দর্শন সেই রকম সুস্পষ্টই হয়, স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর যেমন অস্পষ্ট দর্শন হয়, পিতৃলোকে আত্মদর্শন ঐ রকম অস্পষ্ট হয়, জলে যেমন অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, গন্ধর্বলোকে আত্মদর্শন সেই রকম হয়। ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আলোকের মত বিবিক্তরূপে আত্মার দর্শন হয়।)

কঠোপনিষদের এটি একটি অন্যতম আকর্ষণীয় মন্ত্র। আত্মার দর্শন কোথায় কেমন হয়, মন্ত্রে সেই নিয়ে বলছেন। মন্ত্রের অর্থ অতি সাধারণ কিন্তু এর তাৎপর্য আর ভাব অত্যন্ত জটিল। যত গভীরে যাওয়া যাবে তত এর অনেক রকম ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে, বিশেষ করে দুটো আলাদা ধরণের মত এতে স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুরু করতে গিয়ে আচার্য বলছেন, আত্মার জ্ঞান বা দর্শন বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রকমের হয়, কিন্তু মনুষ্যলোকে আত্মাকে স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। এরূপ স্পষ্ট ভাবে একমাত্র ব্রহ্মলোকে জানা যায়, অন্যত্র কোথাও এত স্পষ্ট ভাবে জানা যায় না। সেইজন্য মানব দেহ থাকতে থাকতেই চেষ্টা করতে হয় আত্মজ্ঞান যাতে লাভ করে নেওয়া যায়।

এখানে আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন বা আমাদের ভাষায় ঈশ্বর দর্শন। কিন্তু উপনিষদ ঈশ্বর বলে জানতেন না, তাঁরা আত্মাকেই জানেন। বেদান্ত, যোগ এনারা বলেন আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি এই জগতে যেন নিজের ছবি দেখছেন। আমরা নিজেদের ভাবছি আমি এই শরীর ও মন, ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞানের কথা বললে মনে করছি এই আমি নিজে জিনিষটাকে যেমন দেখছি। বেদান্ত কিন্তু ঠিক ঐভাবে দেখে না, বেদান্ত পুরো জিনিষটাকে চৈতন্যের দৃষ্টিতে দেখে। মানুষ যেমন আয়নাতে নিজের ছবি দেখে, আত্মা সেই রকম নিজের ছবি জগতের মধ্যে দেখেন, সৃষ্টি যেটা হয়েছে সেটাতে দেখেন। সৃষ্টিটা আবার তিনি নিজে, সৃষ্টি তাঁর থেকে আলাদা নয়। আত্মার ছবি বিভিন্ন লোকে কেমন দেখায় সেটাই বলছেন, মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক আর ব্রহ্মলোক এই চারটে লোকের নাম উল্লেখ করছেন। আচার্য বলে দিচ্ছেন বাকি যত লোকের কল্পনা করা যাবে সব এই চারটে লোকের মধ্যে দেওয়া আছে। মনুষ্যলোক সাধারণ, ব্রহ্মলোক শ্রেষ্ঠ আর মাঝখানে যত লোক কল্পনা করা যেতে পারে সবটাই পিতৃলোক আর গন্ধর্বলোকের মধ্যে ধরে নেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তি রূপে আমরা যে আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করি তাতে একটা বস্তুকে আলম্বন করে বা একটা ধ্বণির প্রতীক বা কোন মুর্তি বা প্রতীকের সাহায্য নিয়ে নিজের মনকে কেন্দ্রিত করার চেষ্টা করি। এই ভাবে মনকে কেন্দ্রিত করার চেষ্টা করতে করতে মন ধীরে ধীরে একাগ্র হয়। মন একাগ্র হওয়া মানে ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ হয়ে যাওয়া। একটা কাজে মন খুব একাগ্র হয়ে গেলে তখন ঐ কাজের সূক্ষ্ম ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে কোন সূক্ষ্ম কাজ, রান্নার কাজ, সেলাইয়ের কাজ, ছবি আঁকা, গান-বাজনা, একাগ্র হয়ে করলে এই সূক্ষ্ম কাজগুলো খুব নিখুত হয়। আমরা মনে করি ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে মন যদি খুব একাগ্র হয়ে যায় তাহলে ঈশ্বর রূপী ছুঁচে এবার সুতো প্রবেশ করবে। কিন্তু তা হয় না। পরে এক জায়গায় বলবেন, আমরা যোগ বলতে যেটা বলি আসলে সেটা বিয়োগ। যোগ মানে আমার সাথে একটা কিছুর যোগ হয়ে গেল, আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগ হয়ে গেল। কিন্তু বেদান্ত মতে যোগ হয় না, যেটাকে যোগ বলা হচ্ছে বেদান্ত মতে আসলে সেটা বিয়োগ

হয়, জগৎ থেকে তার বিয়োগ হয়ে যায়। বিয়োগ হওয়ার জন্য নতুন কোন কিছুর সাথে জুড়ে যায় না, যেটা আছে সেটাই ভেসে ওঠে। যোগদর্শনে যোগ মানে চিত্তবৃত্তিনিরোধ, সেখানে দেখান হয় মন কিভাবে ধীরে ধীরে একাগ্র হয়। কিন্তু তারপরেই বলবেন *তদাদ্রষ্টুস্বরূপে অবস্থানম্,* তখন দ্রষ্টা তাঁর স্বরূপে গিয়ে অবস্থান করেন। তার আগে পর্যন্ত কিসে অবস্থান করেছিল? বৃত্তিজ্ঞানে অবস্থিত ছিল, পাঁচটা জিনিষের সাথে জড়িয়ে ছিল। খুব স্থূল উপমা হল, বিছে কামড়েছে, তিড়িংবিড়িং করে ঘরময় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, একবার এখানে, আরেকবার সেখানে বসছে, কোথাও শান্তি পাচ্ছে না। ওষুধে বা যেভাবেই হোক এবার বিছের বিষের প্রকোপটা কেটে গেল, এবার সে সুস্থ হয়ে একটা জায়গায় স্থিত হয়ে বসল। তখন তার কি হবে? কিছুই হবে না, সে যা ছিল তাই আছে। মাঝখানে তাকে বিছে দংশন করেছিল তাই লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমাদের বর্তমান অবস্থা হল বিছে কামড়ানোর অবস্থা, চারিদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছি। এখানে উপনিষদের কথা শুনছি এটাও বিছে কামড়ানরই ফল। বাড়িতে রান্না করছে সেটাও বিছে কামড়ানর ফল, যাকে ভালোবাসছে সেটাও বিছে কামড়ানর ফল। বিছের যে বিষ, এর প্রভাব থেকে যখন তাকে বার করে আনা হবে তখন সে শান্তিতে বসতে পারবে, এবার সে যা সে তাই। এতক্ষণ সে যা যা করছিল, মলম লাগাচ্ছিল, মাগো বাবাগো বলে চিৎকার করছিল, চারিদিকে তিড়িংবিড়িং করে যে লাফালাফি করছিল, এটাই জগৎ। আমাদের কাছে বিছে কামড়ানোর জন্য লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি এটাই স্বাভাবিক। আর বসে থাকাটাই উপলব্ধি। বেদান্ত মতে উপলব্ধি হয় না, যেটা স্বাভাবিক মনে করছি সেটা থেকে বিচ্যুতি। সংসার রূপ বিছের কামড়ের যন্ত্রণার উপশম হয়ে যাওয়ার পর নতুন কোন উপলব্ধি হয় না, আমি যা আমি তাই হলাম। এই আলোচনা শাস্ত্রে বারবার আসে।

যোগ আর বেদান্তে খুব একটা তফাৎ নেই, কর্ম আর যোগেও কোন তফাৎ নেই। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় শুরু করার আগে আচার্য বলছেন কর্ম হল বহিরঙ্গ সাধন আর যোগ হল তার অন্তরঙ্গ সাধন। যোগের আত্মার জ্ঞান আর বেদান্তের আত্মার জ্ঞানে ছোট্ট একটা তফাৎ থেকে যায়, যোগের কাছে প্রকৃতি বাস্তবিক, বেদান্তের কাছে প্রকৃতি বাস্তবিক নয়। যোগ প্রত্যেক মানুষের ভেতরে যে চৈতন্য তাকে আলাদা দেখে, বেদান্ত সেভাবে দেখে না। দর্শনের যুক্তির গভীরে বেদান্তই ঠিক। কিন্তু এই ঠিক ভুল অনেক উচ্চস্তরে গিয়ে ধরা যায়, এর নিরুপণ করা আমাদের কাজই নয়। কিন্তু মাঝখানে যে পথ সেই পথে কর্ম, যোগ এগুলো না হলেই নয়, বেদান্ত ও যোগ দুজনের জন্যই প্রচণ্ড দরকার। যোগের সাধন পথে যা যা বলছেন সবটাই বেদান্তেও দরকার। তার প্রথম হল চিত্তবৃত্তি নিরোধ। এই চিত্তবৃত্তিকে কিভাবে নিরোধ করা হবে? সাংসারিক কাজকর্ম করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি মন দিয়ে যে কাজ আমরা করি তখন আমাদের উপরতি বা প্রত্যাহার হয়ে যায়। মন একাগ্র করে কাজ করা মানে পাঁচটা জিনিষ থেকে মনকে সরিয়ে এনে কাজ করা। সব কিছু থেকে মনকে টেনে একটা জায়গায় নিয়ে আসা, এটাই প্রত্যাহার। কাজে মন দেওয়া মানেই প্রত্যাহার। মনকে একাগ্র করা বলতে যা বুঝি আসলে মন কারুরই একাগ্র হয় না, অন্য জায়গা থেকে মনকে তখন কুড়িয়ে আনা হয়। পাগল আর শিশু ছাড়া মনের একাগ্রতা সবারই আছে। ভালো সিনেমা, ওয়ানডে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময়, পরনিন্দা করার সময় সবারই মন একাগ্র হয়ে যায়। কিন্তু ভুল জায়গায় একাগ্র হয়। মন স্বভাবতই প্রচণ্ড চঞ্চল, কিন্তু এই চঞ্চল মনই এই ধরণের নিকৃষ্ট জিনিষে একাগ্র হয়ে যায় অথচ কোন সিরিয়াস কাজ করার সময় মনের একাগ্রতা থাকে না। মনোরঞ্জনের বিষয় থেকে সরে কোন গভীর সূক্ষ্ম জিনিষে মন দেওয়ার সময় যে প্রত্যাহার হয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলি মনের একাগ্রতা। একাগ্রতাতে কোন achievement হয় না, একাগ্র করা মানে অন্য জায়গা থেকে মনকে সরিয়ে আনা। মনকে একাগ্র করা নিয়ে ইদানিং অনেক প্রশিক্ষণ, অনেক রকম কথা বলা হয় ঠিকই কিন্তু অন্য জিনিষ থেকে মনকে কিভাবে সরাবে এটাই মন একাগ্র করা, এছাড়া আর কিছু নেই। মনের স্বভাবই হল একটা জিনিষে থাকা, কিন্তু একটা জিনিষে মন বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারে না, সব সময় ছটফট করে যাচ্ছে, মনের এই ছটফটানি কমানোটাই উদ্দেশ্য। বাহ্যিক জিনিষগুলি সরিয়ে দিলে মনের ভেতরের জিনিষগুলিকে নিয়ে লাফালাফি করবে।

মন যেমন যেমন শান্ত হয়, এখানে শান্ত শব্দটা বলা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অর্থ হল পাঁচটা জিনিষ থেকে মনকে সরিয়ে আনা। সাধারণ ভাবে যে পরিভাষার ব্যবহার করা হয় এখানে আমরা তার বিপরীত পরিভাষা বলছি, যেখানে যোগ বলছি আসলে সেটা বিয়োগ, মনকে কেন্দ্রিত করা আসলে তা হল প্রত্যাহার। আমাদের যে সাধারণ পরিভাষা আর যোগেই যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো অন্য ভাবে করা হয়েছে বলে এই

শব্দগুলো এসে গেছে। কিন্তু এই জিনিষটা না বুঝলে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারবো না আর অপরকেও কোন দিন বোঝাতে পারব না। ছেলের পড়াশোনাতে মন কেন নেই? কারণ তার মন আরও পাঁচটা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। ওখান থেকে মনকে সরিয়ে আনার দুটো পথ, একটা হল কোন রকমে সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসা আর তা নাহলে পড়াশোনাতে এমন আগ্রহ তৈরী করে দেওয়া যাতে নিজে থেকে তার মন ওখান থেকে সরে আসে। ইলিয়ড ওডিসিতে খুব নামকরা একটা গল্প আছে, সমুদ্রে সাইরিন আইল্যাণ্ড বলে একটা দ্বীপে অপ্সরারা থাকত। দ্বীপের পাশ দিয়ে যখন বড় বড় নৌকা যেত তখন তারা খুব সুন্দর গান-বাজনা করতে শুরু করে দিত। ওদের গান শুনে নাবিকরা ঐ দ্বীপের দিকে চলে যেত, তারা আর কোন দিন ওখান থেকে ফিরে আসত না। কাহিনীর হিরোকে ঐ দ্বীপের পাশ দিয়ে যেতে হবে। হিরোকে বলে দেওয়া হল সব নাবিকদের কানে মোম ঢেলে দাও যাতে কানে অপ্সরাদের গান বাজনার আওয়াজ না যায়, আর তুমি যদি ওদের গান শুনতে চাও তাহলে তোমাকে মাস্তুলের সাথে বেঁধে রাখা হবে। সবাইকে তাই করা হল। সাইরিন আইল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে সব নাবিকরা দেখছে মেয়েগুলো হাত পা নেড়ে গান করছে, কিন্তু কান বন্ধ থাকাতে কিছুই আওয়াজ তাদের কানে ঢুকছে না। টেলিভিশনের সাউণ্ড অফ করে দিয়ে যদি টিভির কোন প্রোগ্রাম দেখা হয় তাহলে মনে হবে একটা জোকার হাত পা নাড়ছে। যদি মজা পেতে চান, জগৎটা কেমন বোকা তাহলে টিভির সাউণ্ড অফ করে নাচ-গানের প্রোগ্রাম দেখতে হয়। অপ্সরাদেরও জোকার মনে হচ্ছে। ঐদিকে হিরো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে আমাকে তোমরা খুলে দাও আমি অপ্সরাদের কাছে যাব। এদের আগে থেকেই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, যতই চিৎকার করুক বাঁধন খুলে দেবে না। আইল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর ওকে খুলে দেওয়া হল। সে যেন তখন হাঁপাচ্ছে। এদের আগে অন্য একটা জাহাজ গিয়েছিল, ওদেরকেও সাবধান করে দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছিল, তোমরা এমন একজন উচ্চমানের সঙ্গীত বিশারদকে সাথে নিয়ে যাও, ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে এমন উচ্চমানের সঙ্গীত করবে যার ফলে অপ্সরাদের সঙ্গীত আর তোমাদের কাবু করতে পারবে না। ওরা তাই করল, এদের জাহাজে এত সুন্দর সঙ্গীত বাজছে যার কাছে অপ্সরাদের সঙ্গীত ম্লান হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন, যে মিস্রির সরবৎ খেয়েছে তার আর চিটে গুড়ের পানা ভালো লাগবে না। ঈশ্বরীয় মাধুর্যের আস্বাদ যে পেয়েছে তার আর জগতের কিছুই ভালো লাগবে না। অন্য দিকে আমাদের বলা হয়, এবার তুমি জগৎ থেকে নিজেকে সরাও, কত দিন আর জগৎকে ধরে রাখবে। কিন্তু আমরা ছাড়তে পারছি না। কি করে ছাড়বে! ছেড়ে কি নিয়েই বা মানুষ থাকবে। এই দুটো approach, একটা হল, এতই সুন্দর যে ওর দিকে তাকানোর পর আর কোন দিকে তাকাতে মন যায় না, অন্যটা হল, ভালো কিছু নেই কিন্তু বাজেটাকে কিভাবে ছাড়া যায়। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও ভোরবেলা আবার একটা ফেকড়ি বেরিয়ে যাবে। পাঁচটা কামনা-বাসনা কেটে সরিয়ে দেবে দুদিন পর দেখবে আরও পাঁচটা অন্য রকম কিছু এসে গেছে যাকে আর সামলানো যাচ্ছে না। কিন্তু যারাই ঈশ্বরের পথে আসতে চাইছে তাদের এই চেষ্টা করতেই হবে, এছাড়া অন্য কোন পথও নেই।

মন যখন কেন্দ্রিত হতে শুরু হয় তখন ধীরে ধীরে আমার আসল আমির আভাস আসতে থাকে। কোথায় কোথায় এই বোধ কেমন হয়? এখানে চারটে লোকের নাম নিচ্ছেন, মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক আর ব্রহ্মলোক। দ্বিতীয় ব্যাপার হল, জীবাত্মা, মানুষ যেটাকে আমি মনে করে, এই জীবাত্মা সত্যিই বিভিন্ন জায়গায় যায়, নাকি যায় না? কিছু দিন আগে রীডার্স ডাইজেস্টে পুনর্জন্ম নিয়ে একটা লেখা বেরিয়েছিল, তাতে তারা বিদেশের কয়েকটা এই ধরণের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে। ভর্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির একটা ডিপার্টমেন্ট শুধু এই কাজই করে যাচ্ছে। দু-তিন বছরের একটি বাচ্চা তার বাবাকে বলছে আমি তোমাকে আগে diaper পড়াতাম, এরকম কয়েকটা উদ্ভট কথা বলতে বলতে একদিন বলছে, কিছু দিন আগে আমিই তোমার বাবা ছিলাম। বক্তব্য হল ভদ্রলোকের বাবা মরে তার সন্তান হয়ে জন্ম নিয়েছে। আমেরিকাতে এসব কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা কর হল, তুমি মারা গেলে কি করে? মাথায় হাত দিয়ে ইশারা করে বোঝাতে চাইত যে ব্রেইন হ্যামারেজে মারা গেছিল। সত্যিই তাই হয়েছিল। আবার জিজ্ঞাসা কর হল তোমার কি আরও ভাইবোন ছিল? বলছে এক বোন ছিল। বোনের কি হল? ওকে মাছ বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কি করে? দুষ্টু লোকেরা বানিয়ে দিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ষাট বছর আগে ভদ্রলোকের পিসি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কিছু দিন পর নদীতে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। বাচ্চা

ছেলে তারই একটা বর্ণনা দিচ্ছে। খ্রীষ্টান, মুসলমানরা এগুলো মানবে না। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সবাই খুব সহজেই পুনর্জন্ম মানে। তাহলে একজন মারা গেল, মারা যাওয়ার পর আবার জন্ম নিল, কিন্তু মাঝখানের সময়টা সে কোথায় ছিল? কারণ এগুলো নিয়ে রিসার্চ করতে গিয়ে দেখা গেছে কোথাও দু বছরের গ্যাপ, কোথাও পাঁচ বছরের গ্যাপ। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় ঐ সময় জীবাত্মা বিভিন্ন লোকে বাস করে। জীবত্মা যেখানে থাকে সেটাও একটা লোক। আর বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে সবাই বিভিন্ন লোকের অস্তিত্ব মানবেনই মানবেন। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে বলছেন, যেমন বলছেন সুর্যলোক, চন্দ্রলোক আবার এখানে বলছেন পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক। বেদ উপনিষদকে যাঁরা মানেন তাঁদের এসব লোকের কথা মানতেই হবে। কিন্তু ওদিকে খুব বেশি দৃষ্টি দিতে নেই। কারণটা এই মন্ত্রে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্বদ্ধ আত্মা এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবাত্মা রূপে আমাদের যে অস্তিত্ব এই জীবাত্মা আজ মনুষ্যলোকে, কাল পিতৃলোকে, পরশু স্বর্গলোকে ঘুরতে থাকে। তারও নীচে এসে গেলে তখন একটা ভৌতিক শরীর নিয়ে নেয়। আমি বলতে তাহলে তিনটে শরীর, একটা ভৌতিক শরীর, দ্বিতীয় সূক্ষ্ম শরীর আর তৃতীয় শুদ্ধ আত্মা রূপে। সূক্ষ্ম শরীরই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন রকম শরীর গ্রহণ করে, তার মধ্যে একটা হল ভৌতিক শরীর। এই ভৌতিক শরীরে মন দিয়ে ধ্যান করে যখন ঐ বিশুদ্ধ অবস্থায় যায়, যেখানে কাম-কাঞ্চনের ভাব নেই, রাগ-দ্বেষের ভাব নেই, তখন মনের লয় হয়ে গেলে তার আত্মার জ্ঞান হয়। আত্মার জ্ঞান কোথায় কেমন হয় সেটাই এখন বলছেন। *যথাদর্শে তথাত্মনি*, আদর্শ মানে আয়না, যখন বলা হয় উনি আমার জীবনের আদর্শ, সেখানেও আদর্শ শব্দের ভাব একই অর্থে হয়। তার মানে উনি যেন একটা আয়না তাতে আমার জীবনের ছবি দেখতে পাই। আয়নার প্রচলন হওয়ার আগে পালিশ করা পেতলের ধাতুতে মানুষ তার মুখ দেখত। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ভারতে আয়নার প্রচলন খুব প্রাচীন, উপনিষদেই আয়না শব্দ এসে গেছে। আয়নাতে প্রতিবিম্ব সব থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, যেমনটি দেখতে ঠিক তেমনটিই দেখাবে। মনুষ্যলোকে যোগীরা আত্মাকে আয়নার প্রতিবিম্বের মত সুস্পষ্ট দেখতে পান। এখানে প্রতিবিম্ব বলতে প্রতিবিম্ব নয়, প্রতিবিম্ব বলতে একেবারে সুস্পষ্ট। আচার্যও বলছেন, *আদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে*, আয়নাতে আমি আমাকে যেমন দেখছি জগতে সবাই আমাকে সেই রকমই দেখে। *যথাদর্শে তথাত্মনি*, আত্মনি মানে আত্মা নয়, একেবারে শুদ্ধ বুদ্ধিকে বলছেন আত্মনি। মনুষ্যলোকে যে বুদ্ধি পাওয়া যায়, সেই বুদ্ধিকে যদি শুদ্ধ করা হয়, যেখানে রাগ ও দ্বেষের কোন মলিনতা নেই, সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মাকে একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়, এখানে সংশয় আর সন্দেহের লেশ মাত্র থাকে না।

যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে, আচার্য বলছেন *জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূতম্*, জাগ্রত অবস্থায় কামনা-বাসনাজনিত যে চিন্তা-ভাবনা হয়, এই চিন্তা-ভাবনাগুলিই এলোমেলো ভাবে স্বপ্নের মধ্যে আসে, স্বপ্ন কখন মেলে কখন মেলে না। জাগ্রত বাসনাগুলি স্বপ্নে যেমন এলোমেলো হয়ে আসে ঠিক তেমনি পিতৃলোকের যারা বাসিন্দা তারা যেমন কর্মাদি করেছে আর তাদের যেমন যেমন অতৃপ্ত বাসনাদি আছে সেগুলো থেকে যায়, সেইজন্য পিতৃলোকে তাদের মন সব সময় কাম-বাসনার দ্বারা প্রেরিত থাকে। তারা যদি কখন সাধনা করে তাদের কোন দিনই আত্মজ্ঞান হবে না। সিনেমা হলে গিয়ে কেউ ধ্যান করতে চাইলেও ধ্যান করতে পারবে না। সিনেমা হলে মানুষ সিনেমাই দেখতে যায়, ভোগের আনন্দ নিতে যায়। পিতৃলোকেও যারা গেছে তারা সেখানে ভোগ করতেই গেছে। সেখানে আত্মার ধ্যান করবে কি করে! তাহলে এই জগতেও তো আমাদের মন কাম-বাসনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে আছে। ঠিকই, কিন্তু এই জগতে আমি যদি চাই কাম-বাসনার বাইরে গিয়ে মনকে শুদ্ধ করে আমি আত্মাকে যথাবৎ সাক্ষাৎ করতে পারব। কিন্তু পিতৃলোকে চেষ্টা করলেও কেউ পারবে না, কারণ তার মন আগে থেকেই কাম-বাসনার দ্বারা রঞ্জিত হয়ে আছে। পিতৃলোকে জীব স্বাভাবিক ভাবেই আসক্তি নিয়ে গেছে, সেই আসক্তি হেতু সাধনা করেও আত্মার সাক্ষাৎ করতে পারবে না। ঠিক ঠিক মিশ্রিত ফল একমাত্র পৃথিবীলোকেই থাকে, আর কর্মের দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করার সুযোগও একমাত্র এই পৃথিবীলোকেই থাকে।

যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে, গন্ধর্বলোক পিতৃলোক থেকেও শ্রেষ্ঠ। গন্ধর্বলোকের বাসিন্দাদের পৃথিবীলোকের বাসিন্দাদের থেকে দেখতে অনেক সুন্দর। গান, বাজনা, নানা রকম বিদ্যাতেও তারা আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আত্মার দর্শনের ব্যাপারে বলছেন, *যথাপ্সু পরীব দদৃশে*, অপ্সু মানে জল, জলে প্রতিবিম্ব

দেখা যায় ঠিকই কিন্তু তাতে অঙ্গগুলি স্পষ্ট রূপে প্রতিভাসিত হয় না। আগেকার দিনে মানুষ জলেও নিজের প্রতিবিম্ব দেখত। কিন্তু আয়নার মত স্পষ্ট ছবি দেখা যায় না। স্বপ্নে যেমন সব কিছু অস্পষ্ট রূপে দেখায় পিতৃলোকে সেই রকম আত্মার অনুভব অস্পষ্ট হয়। গন্ধর্বলোকে তার থেকে আরেকটু পরিষ্কার, কিন্তু জলে প্রত্যেকটি অঙ্গের ছবি পরিষ্কার আসবে না। শরীরের সূক্ষ্ম জিনিষগুলিও, যেমন কপালে টিপ, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক এগুলো সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাবে না। তার মানে, পৃথিবীলোকে আত্মাকে যেভাবে জানা যায় অন্যান্য লোকে আত্মাকে সেভাবে জানা যায় না। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে আপনি এগুলো কিভাবে জানলেন। আচার্য একেবারে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। শাস্ত্র প্রমাণ মানে, এগুলোকে জানার কোন পথ নেই। স্বর্গ থেকে কেউ ফিরে এসে আমাদের খবর দেবে না যে স্বর্গ কেমন, তেমনি পিতৃলোক বা গন্ধর্বলোক থেকেও কেউ ফিরে এসে খবর দেবে না। যুক্তিতর্ক দিয়ে জানা যায় পিতৃলোকে তারাই যায় যাদের প্রচুর ভোগবাসনা থাকে। গন্ধর্বলোকও ভোগের জায়গা, সেখানে আত্মদর্শন হয় না। রেস্তোরাঁ বা বারে গিয়ে আপনি যদি এক গ্লাশ গঙ্গা জল চাইতে যান, আপনাকে তো গঙ্গাজল দেওয়া হবেই না, উল্টে ভাববে আপনার মাথাটি নির্ঘাৎ খারাপ হয়ে গেছে। বারে গেছে মানে সে মদের নেশা করতেই গেছে, গন্ধর্বলোকে যাওয়া মানে ভোগ করতেই যাওয়া। এগুলোকে এই ভাবে সহজ যুক্তি দিয়ে কিছুটা ধারণা করা যায় কিন্তু তার থেকেও বেশি হল শাস্ত্র প্রমাণ, বেদ উপনিষদ বলে দিয়েছে এর পর আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না, এটাই সত্য। এই কথাগুলো ঋষিবাক্য, ঋষিদের একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাঁদের মিথ্যা কথা বলার কোন কারণই নেই। ঋষিরা শুদ্ধ মনে যা বলছেন সেটাকে মেনে নিতে হয়। ঋষির একটা কথা নিলে তাহলে তাঁর সব কথাই নিতে হবে। নিতে হলে পুরোটাই নিতে হবে তা নাহলে কোনটাই নেওয়া যাবে না। আমার বুদ্ধি দিয়ে বেছে বেছে নিজের মনের মত কিছু জিনিষ নেব কিছু জিনিষকে নেব না, তা কখন হয় না। কঠোপনিষদ যাঁরা খুব মন দিয়ে অধ্যয়ন করবেন তাঁরা কঠোপনিষদের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখতে পাবেন, ঐ পূর্ণাঙ্গ ছবি থেকে দুটো জিনিষকে বাদ দিয়ে দুটো জিনিষকে নেওয়া যায় না। নিতে হলে পুরোটাই নিতে হবে আর না নিলে কোনটাই নেওয়া যাবে না, কারণ পুরোটাই বিভিন্ন রকম যুক্তি দিয়ে দিয়ে সাজানো হয়েছে।

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মলোকে আত্মাকে আলো আর ছায়ার মত একেবারে স্পষ্ট দেখা যাবে। আমি সামনে যেমন আপনাকে দেখছি, এই দেখাটা আলো আর ছায়ার মত একেবারে পরিষ্কার। মনুষ্যলোকে আয়নাতে যেরকম স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আত্মাকে সেই রকম স্পষ্ট দেখা যায় আর ব্রহ্মলোকে ছায়া আর আলো, এটা ছায়া আর এটা আলো দুটো একেবারে আলাদা যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, আত্মাকে ঠিক সেই রকম স্পষ্ট দেখা যায়। মনুষ্যলোকের আত্মার জ্ঞান আর ব্রহ্মলোকের আত্মার জ্ঞানের মধ্যে তুলনা করে অনেকে প্রশ্ন করেন কোন লোকের আত্মার জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে? সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন মনুষ্যলোকের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ আবার অনেকে ব্রহ্মলোকের জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আমরা মেনেই নিচ্ছি যে আত্মজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, এর কখন বেশি শ্রেষ্ঠ আর কম শ্রেষ্ঠ হয় না। কিন্তু যেহেতু এখানে দুটো দৃষ্টিকোণ দিয়ে জিনিষটাকে বলা হচ্ছে, একটা আয়নার মত আরেকটা আলো আর ছায়ার মত, এই দুটোর মধ্যে কোনটাকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। অনেক ভাষ্যকাররা বলেন মনুষ্যলোকের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। আচার্য শঙ্কর এদিকে না গিয়ে একটি মাত্র কথা বলছেন *যস্মাদিহৈবাত্মনো দর্শনম্ আদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে ন লোকান্তরেষু ব্রহ্মলোকাদন্যত্র। স চ দুষ্প্রাপঃ।* এই শরীরেই দর্পণের মুখের ন্যায় প্রত্যগাত্মার সুস্পষ্ট তত্ত্বোপলব্ধি সম্ভবপর হয় এবং ব্রহ্মলোক ছাড়া আর অন্য কোন দেহে তা সম্ভব হয় না। কিন্তু ব্রহ্মলোক অতি দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং মনুষ্যলোকে এই শরীর থাকতে থাকতেই আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করা উচিৎ। শেষের দিকে আচার্য যুক্তিকে অন্য দিকে নিয়ে গেছেন কিন্তু কোনটা শ্রেষ্ঠ এই ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না।

আচার্য ছাড়া অন্যান্য অনেকে ভাষ্যকাররা বলছেন মনুষ্যলোকেই আত্মদর্শন শ্রেষ্ঠ হয়। শাস্ত্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে কখনই এভাবে দুম করে কিছু বলতে নেই। সমস্ত শাস্ত্র ব্রহ্মলোককে পদে পদে শ্রেষ্ঠ লোক বলছেন। তাহলে মনুষ্যলোক কি করে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। আমরা এখানে মনুষ্যলোক আর ব্রহ্মলোকের তুলনা করতে যাচ্ছি না, এখানে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। ব্রহ্মলোকে যে আত্মজ্ঞান হয় তা মনুষ্যলোকের আত্মজ্ঞানের থেকে শ্রেষ্ঠ বললে তার পেছনে অনেক যুক্তি আছে। এখানে আবার বলা হচ্ছে, আত্মজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, এরপর আর কোন কথা চলতে পারে না। আত্মা কোন বস্তু নয়, আত্মাকে আয়না

দিয়েই লাভ করুন আর আলো ছায়া রূপেই জানুন জিনিষটা একই। হাতে চুড়ি পড়ে দেখা আর আয়নাতে গিয়ে দেখা দুটোতে কোন তফাৎ নেই। জ্ঞানের কথা বললে আর জ্ঞানের জন্য মুক্তির কথা বললে দুটোই সমান। আচার্য ঠিক এটাকেই পরে বলবেন। আচার্য বলেই দিচ্ছেন মনুষ্যদেহ ভিন্ন একমাত্র ব্রহ্মলোকেই ছায়া ও আলোর মত অত্যন্ত স্পষ্ট রূপে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। তবে ব্রহ্মলোকে একটা সমস্যা আছে। কি সমস্যা? *স চ দুষ্প্রাপ্য*, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সহজে হবে না, *অত্যন্তবিশিষ্টকর্মজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ*, প্রচুর শুভকর্ম আর অত্যন্ত গভীর জ্ঞান সাধন করা না থাকলে ব্রহ্মলোকে যেতে পারবে না। মনে করুন একটা বিশেষ ধরণের দামী পোষাক আমেরিকার কয়েকটা শহরের দোকানেই পাওয়া যায়। আপনি দেখছেন কলকাতার ময়দান মার্কেটের দোকানেও ঐ একই পোষাক পাওয়া যাচ্ছে। আপনি যদি আমেরিকার দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে কেনেন সেটা একটা গ্ল্যামারাস হবে। আপনি এখন কি করবেন? আমেরিকা যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন নাকি ময়দানের দোকান থেকেই কিনে নেবেন। ময়দানের দোকান থেকে কিনে নেওয়াই ভালো, জিনিষ তো সেই একই। আমেরিকা যাওয়ার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, প্রচুর টাকার শ্রাদ্ধ করতে হবে, কোন কারণে আমেরিকা চলে যাচ্ছেন সেটা আলাদা। ব্রহ্মলোকে আমরা যেতে পারব কি পারব না কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন দুটো পছন্দের আছে, একটা হল খুব করে শুভ কর্ম করতে থাকুন, প্রচুর জপ-ধ্যান করুন তবে যদি ব্রহ্মলোকে চলে যেতে পারেন তাহলে ওখানে আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় পছন্দ হল, সব কিছু ছাড়ুন, এখানেই চেষ্টা করুন, এখানেই কাজটা হয়ে যাবে। জ্ঞান জ্ঞানই, সে আপনি প্রতিবিম্বতেই করুন আর আলোছায়াতেই করুন। ঠাকুর বলছেন, মিছরির রুটি আড় করেই খাও আর সিধে করেই খাও মিষ্টিই লাগবে। আত্মজ্ঞান সে আপনি যেভাবেই পেয়ে থাকুন সমান। কিন্তু এত কিছুর পরেও একটা তফাৎ থাকবে, সেইজন্য ব্রহ্মলোকের যে জ্ঞান এই জ্ঞান অন্য ধরণের জ্ঞান, কিন্তু ফল একই।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাষ্য দিতে গিয়ে আচার্য বলছেন, ভক্তিযোগ খুব ভালো কারণ সহজেই হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁদের উপাসনা অনেক কষ্টসাধ্য। সেইজন্য ভক্তি সহজ, কিন্তু তাই বলে ভক্তি যে শ্রেষ্ঠ তা নয়। ঠিক তেমনি মনুষ্যলোক সহজ কিন্তু শ্রেষ্ঠ নয়, শ্রেষ্ঠ হল ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকে যে আত্মপোলব্ধি হয় সেটা আলাদা এবং মনুষ্যলোকের থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এটা একটা মত, এই মতকেও বুদ্ধি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় আর এর থেকে আরও শক্তিশালী বুদ্ধি এর বিরুদ্ধে অনেক কিছু যুক্তি নিয়ে আসতে পারেন। এটাই যে ঠিক তা নয়। আসলে এটাকে বোঝানর কোন পথ নেই। বোঝার একটাই পথ হতে পারে।

আত্মজ্ঞান যখন হয় তখন জ্ঞানই হয়, জ্ঞান ছাড়া আর কিছু হয় না। ব্রহ্মলোকের জ্ঞান কিন্তু আলাদা আলাদা ধরণের হয়, যেটা আমরা ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে পাই। আলাদা আলাদা কি ধরণের জ্ঞান বলছেন? সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য আর সাযুজ্য এই পাঁচ ধরণের আলাদা আলাদা জ্ঞান হয়। সাযুজ্য মানে ভগবানের সাথে এক হয়ে যাওয়া, সালোক্য মানে ভগবান যে লোকে আছেন আপনি সেই লোকেই আছেন, যাঁকে ভালোবাসেন তাঁর সঙ্গে আনন্দ করছেন। স্বামীজী বিদেশ থেকে ভারতে এসে ভারতের মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আর বলছেন, ভারত পূণ্যভূমি, ভারতের মাটি পবিত্র, ভারতে থাকাই আনন্দ। আর সারূপ্য, ভগবানের যেমন রূপ, যেমন ঐশ্বর্য ঠিক সেই রকম থাকছেন। সামীপ্য, ঈশ্বরের কাছে কাছে সাক্ষাৎ সব সময় ঘুর ঘুর করছেন। এই জিনিষগুলো কখনই মনুষ্যলোকে হবে না, এখানেই মনুষ্যলোক আর ব্রহ্মলোকের তফাৎ হতে শুরু হয়ে গেল। আলোছায়ার তফাৎ এবার বোঝা যাচ্ছে। প্রতিবিম্বে আপনার জ্ঞান হয়ে যাবে কিন্তু প্রতিবিম্বের সাথে এই জিনিষগুলো হবে না। হাতের চুড়ি আপনি স্পর্শ করতে পারবেন, চুড়ির আওয়াজ শুনতে পারবেন কিন্তু প্রতিবিম্বে এগুলো হবে না, প্রতিবিম্বে শুধু আছে। এই তফাতটা ঠিক ঠিক বোঝা যায় ঠাকুরের জীবনে।

ঠাকুর বলছেন, আমি তাঁকে গা, হাত টিপে টিপে দেখেছি। উপনিষদে এই বর্ণনা পাওয়া যাবে না। উপনিষদে মনুষ্যলোকে আত্মজ্ঞানের বর্ণনা আছে কিন্তু এই বর্ণনা নেই। কিন্তু ঠাকুর ঐ অনুভব মনুষ্যলোকে করছেন যেটা অন্যরা ব্রহ্মলোকে করেন, তিনি অবতার বলেই পারেন, অন্য কেউ পারবেন না। ঠাকুরের যত রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি সব অনুভূতি মনুষ্যলোকের নয়, ওনার অনুভূতি বিভিন্ন লোকের। বিভিন্ন লোকে যেমন যেমন অনুভূতি সেই অভিজ্ঞতাও ঠাকুরের আছে আর ব্রহ্মলোকে যে অনুভূতি হয় সেই অনুভূতি ঠাকুরের মনুষ্যলোকে হচ্ছে। সেইজন্যই ঠাকুর ঠাকুর। একবার বলছেন তিনি টিপে টিপে দেখেছেন আবার বলছেন তাঁর

ধনে হাত দিয়ে ফচকিমি করছি। সব কিছুকে তিনি একেবারে বাস্তব ও স্পর্শগ্রাহ্য দেখছেন। এই বর্ণনা আমরা কোন শাস্ত্রেই পাই না। সব শাস্ত্রের যত বর্ণনা আছে সবই এই মনুষ্যলোকে যে জ্ঞান হয় তাকে আধার করে। ব্রহ্মলোকে যে জ্ঞান হয় তার বর্ণনা একমাত্র ঠাকুরের জীবনেই পাওয়া যাচ্ছে, একেবারে ছায়াতপ রূপে। ঠাকুরের মা সীতার দর্শন হয়েছে, ঠাকুর তখন ধ্যানও করছিলেন না। তার আগে ঠাকুরের মা কালীর দর্শন হয়ে গেছে, তারপরেও সাধনা করে যাচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলার দিকে যাচ্ছেন হঠাৎ দেখছেন এক দেবী এগিয়ে আসছেন। কোথা থেকে একটা বানর এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে লিখছেন, ঠাকুরের এটাই প্রথম চোখ খোলা অবস্থায় দিব্য দর্শন। মনুষ্যলোকে এভাবে দিব্য দর্শন হয় না। এটাই পরে শ্রীশ্রীমা বলছেন, চোখ খুলে ঈশ্বরকে কে আর দেখেছে, এক ঠাকুর দেখেছেন আর এক নরেন দেখেছে। ব্রহ্মলোকে চোখ খুলে দর্শন হয়, মনুষ্যলোকে চোখ বন্ধ করে দর্শন হয়। কিন্তু ঠাকুর এখানে চোখ খুলে দর্শন করছেন, ব্রহ্মলোকে ঠিক কেমন অনুভূতি হয় সেটাই ঠাকুর এখানে দেখাচ্ছেন।

জ্ঞানের দৃষ্টিতে মনুষ্যলোক আর ব্রহ্মলোকে কোন তফাৎ নেই। আলাউদ্দিন খিলজী বলছে সে পদ্মাবতীকে দেখবে। তার আগে পদ্মাবতীর ছবি দেখেছিল। কিন্তু রাজা তাকে সরাসরি দেখাবে না, বললেন আয়না লাগানো আছে, আয়নার সামনে দিয়ে যাবে তুমি আয়নাতে দেখে নিও। আয়নাতে পদ্মাবতী দেখেই আলাউদ্দিন খিলজীর মাথা গেছে ঘুরে। কিন্তু ওখানে উদ্দেশ্যটাই পুরো আলাদা। আমি জানতে চাই আপনি কেমন, তা আপনাকে আয়নাতেই দেখি আর আপনাকে সাক্ষাৎ সামনা সামনিই দেখি, একই ব্যাপার। ছবি আর আয়নাতে তফাৎ হবে কোন সন্দেহ নেই। সেটাও শ্রীমা বলে দিলেন, এখন ছবি দেখলেই হয়ে যাবে। লীলাপ্রসঙ্গ আর কথামৃতে ঠাকুরের অনুভূতির যে বর্ণনা পাই তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় দুটো পরিষ্কার আলাদা ধরণের অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। ঠাকুরের অনুভূতিকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মনুষ্যলোক আর ব্রহ্মলোকের অনুভূতির তফাতকে স্পষ্ট বোঝার আর কোন উপায় থাকবে না। অবতারের এটাই বৈশিষ্ট্য, উপনিষদে যে অনেক ধরণের কথা আছে সেই কথাগুলোকে বোঝা যাবে না যতক্ষণ ঠাকুরের মত অবতারের জীবনের ঘটনা দিয়ে না দেখা হবে। যতক্ষণ ঠাকুরের বিভিন্ন ধরণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়ে না দেখা হয় ততক্ষণ এই মন্ত্রের কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাগবতে সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য এই ধরণের অনুভূতির কথা বলছেন, আর তাই না ভক্ত আবার সাজুয্য নিতে চায় না। তার মানে আত্মজ্ঞান জিনিষটা তাঁরা নিতেই চান না। তাঁদের অনুভূতি এতই উচ্চমানের, ভালোবাসা এতই প্রগাঢ় যে সেখানে আত্মজ্ঞানকেও তুচ্ছ মনে হয়, যার জন্য তাঁরা সাযুজ্যও নিতে চাইছেন না। ভগবানকে যেভাবেই দেখে থাকুন, সারূপ্যই হোক আর সাযুজ্যই হোক সব একই, সেইজন্য বলা হয় বৈকুণ্ঠে সবাই মুক্ত হয়ে যান।

তবে গীতায় আছে, ব্রহ্মলোক থেকে অনেকে ফিরেও আসেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে সবারই জ্ঞান হয়ে যায় আর মুক্তি হয়ে যায়। ঠাকুর আবার বলছেন ঈশ্বরকোটিদের ব্রহ্মলোকে বাস করা সত্ত্বেও পৃথিবীতে অবতারের কাজ করার জন্য আসতে হয়। আমরা আর এর বেশি বিস্তারে যাচ্ছি না, কারণ এগুলো ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়, বেশি তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে ঢুকলে আমরা হারিয়ে যাব। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্মলোকের জ্ঞান আর মনুষ্যলোকের জ্ঞান। তোতাপুরীও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তিনিও মুক্ত পুরুষ। কিন্তু ঠাকুরের যে জ্ঞান, ঠাকুর বলছেন আমি হাত পা টিপে টিপে দেখেছি। কিন্তু মা কালীর দর্শনে তা হচ্ছে না, সেখানে আবার মনুষ্যলোকে যে রকম আত্মজ্ঞান হয় সেই রকম। কিন্তু একটা ফিজিক্যাল প্রেসেন্স, একেবারে গা হাত পা সব টিপে টিপে দেখা, অঙ্গ ধরে ফচকিমি করা, এই জিনিষ একমাত্র ব্রহ্মলোকে বা বৈকুণ্ঠ লোকেই সম্ভব, মনুষ্যলোকে কেউ কোন দিন এই অনুভূতি পাবে না। অনেক কাহিনীতে আমরা পাই, অমুক ঋষির কাছে বা অমুক মহাত্মার কাছে আসতেন, কিন্তু ওগুলো সবই ছিল দর্শন। ঠাকুরের যে অনুভূতি এই জিনিষ অবতার পুরুষ ছাড়া সম্ভবই নয়। আর আমরাও যে কজন অবতারের কথা জানি সেখানেও আমরা এই জিনিষ পাই না। যিশুর ছিল কিনা বর্ণনা নেই, মহম্মদ সব সময়ই বাণী শুনতেন, ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ঠিক যেমন দর্শন হয় উনি তার প্রতীক, মহাবীর জৈন, গুরু নানকেরও তাই। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে আমাদের জানার কোন উপায় নেই। উপনিষদ মনুষ্যলোকের ক্ষেত্রে ঠাকুরের অনুভূতির কথা বলছেন না, ঠাকুরের অনুভূতি ব্রহ্মলোকের দিকেই ইঙ্গিত করছে, ব্রহ্মলোকেই যা একমাত্র সম্ভব। এদিক দিয়ে বিচার করলে ব্রহ্মলোকের দর্শনকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে, আলোছায়ার মত পরিষ্কার, যেমন আমরা জগৎকে দেখছি। মনুষ্যলোকে প্রতিবিম্বের মত, জ্ঞান

হবে কিন্তু স্পর্শ করা, আলাপ করা এই জিনিষগুলো তফাৎ করে দেয়। তবে এই তিনটে জিনিষ একসাথে হওয়া খুব দুর্লভ, মানবজীবন, মুমুক্ষুত্ব মুক্তির ইচ্ছা আর মহাপুরুষের সংশ্রয়, এই তিনটে একসাথে একমাত্র মনুষ্যলোকেই সম্ভব। ইন্টারনেটের দৌলতে আমরা বিশ্বের সব রকম শাস্ত্রই হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি। তার থেকেও বড় কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী আর স্বামী সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গ হল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একেবারে condensed milk। এই তিনটে বই যদি পড়া থাকে আর তার সাথে যাঁরা জিনিষগুলো জানেন তাঁদের সাথে যদি আলোচনা করা যায় তাহলে ধীরে ধীরে অনেক কিছুই আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন যেমন মূল জিনিষগুলো পরিষ্কার হবে তত আধ্যাত্মিকতার আরও গভীরে আমরা ঢুকতে পারব। অবাক লাগে স্বামীজী, সারদানন্দজী মহারাজ এনার কী করে এত অল্প বয়সে এত কাজ করতে পারলেন। কারণ তখনকার দিনে শাস্ত্রাদি অত সহজে উপলব্ধ ছিল না। চারজন পণ্ডিতদের কাছে গেলে তাঁরা আমাদের কয়েকটা জিনিষ শিখিয়ে দিতে পারবেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের ভেতরকার জিনিষগুলিকে অন্তঃকরণ করা সম্ভব হত না যদি না আমরা আজকে একেবারে এই condensed milk পেতাম। স্বামীজী আর শরৎ মহারাজ এনারা ঐ বিশাল গোশাল চালিয়ে, যার মধ্যে গোবর আছে, গোমুত্র আছে সেখান থেকে দুধ বার করে দুধকে ঘন করে আমাদের জন্য condensed milk করে রেখে দিলেন, এই condensed milk তোমাদের জন্য রেখে গেলাম এবার একে নিয়ে তোমরা যা করার করে নিতে পার। ইদানিং কালে কম্প্যুটার, ফোনে যে চিপস্ ব্যবহার হয় তাতে হাজার হাজার পার্টসকে একটা ছোট্ট চিপসের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামীজীর রচনাবলী কম্প্যুটার চিপসের মত, ঐ ছোট্টর মধ্যে পুরো আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যকে যেন রাখা আছে।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে আগেকার দিনের লোকেদের কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার এভাবে ছিল না আজকে যেভাবে আমাদের কাছে আছে। স্বামীজী ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত যেখানে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরণের বই পড়ছেন, তিনি আবার নোটস রাখতেন না, সবটাই তাঁর মস্তিষ্কে রাখা থাকত। এখন চারিদিকে লাইব্রেরি, যে কোন বই আমরা সহজে পেয়ে যাচ্ছি। পুরো জিনিষটাকে এনারা এক জায়গায় একত্র করে দেখছেন মনুষ্যলোকের একটা বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আচার্যও মনুষ্যলোককে শ্রেষ্ঠ বলছেন, কারণ ব্রহ্মলোকে যাওয়ার জন্য অনেক খাটাখাটনি করতে হয়, এই খাটাখাটনি করার পরে ব্রহ্মলোকে গিয়েও কোথায় ফেঁসে যাবে কোন ঠিক নেই। মনুষ্যলোকে ফাঁসাফাঁসির কোন ভয় নেই। দ্বিতীয়, মনুষ্যলোক তুমি ইতিমধ্যে পেয়েই আছ। আর ভারতভূমিতে যারা জন্ম নিয়েছে, কোন না কোন ভাবে জ্ঞান তাদের কাছে এসে যাবে। দু-চার পা এদিক ওদিক গেলে মন্দির পেয়ে যাবে, যদিও ইদানিং কমে গেছে তবুও চেষ্টা করলে এখনও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পেয়ে যাবে, আরও একটু ঘোরাঘুরি করলে কোন না কোন মহাত্মা পেয়ে যাবে, ব্যস্ এবার তার পথ খুলে গেল। মনুষ্যলোকে জ্ঞানের এই সহজ লভ্য পথকেই একটা কাব্যিক রূপ দিয়ে বলে দেওয়া হল মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। সেই থেকে আমাদের সংস্কারের মধ্যে ঢুকে গেছে যে মানবজীবনই শ্রেষ্ঠ।

উপনিষদের দিক থেকে বিচার করা হলে তা কিন্তু হবে না। উপনিষদ চারটে শ্রেনী করে দিয়েছেন, প্রথম হল মানুষের থেকে নিম্ন যোনি, এদের দ্বারা কিছু হবে না। দ্বিতীয় মানুষ থেকে যারা উপরে আছে এদেরও অনেক দেরী হবে, কিন্তু দেরী হওয়ার পেছনে অন্য কারণ আছে। নিম্ন যোনিতে দুঃখের জন্য দেরী হবে আর এদের সুখের জন্য দেরী হবে। আর বাকি দুটো হল মনুষ্যলোক আর ব্রহ্মলোক এই দুটো লোক পুরো আলাদা। ব্রহ্মলোকে অন্যথা সম্ভবই নয়, যেমন বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীরাই থাকেন, তেমনি ব্রহ্মলোক হল ব্রহ্মজ্ঞানীদের গড়। তাই বলে কি মনুষ্যলোকে ব্রহ্মজ্ঞানী নেই, নিশ্চয়ই আছে। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞানীদের গড়, তাই বলে কি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থের অধ্যাপক নেই, সেখানেও আছেন। কেউ চাইলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশোনা করে পদার্থ বিজ্ঞানী হতে পারবে। পরের দিকের শাস্ত্রকাররা এই জটিলতা গুলিকে বাদ দিতে চাইলেন। কারণ ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, রামকৃষ্ণলোক রীতিমত জটিল ব্যাপার। এত যজ্ঞ করতে হবে, এত সাধনা করতে হবে তবে গিয়ে সে ব্রহ্মলোকে বা রামকৃষ্ণলোকে পৌঁছাতে পারবে। সেইজন্য বলছেন তুমি যা করার এখানেই কর। সেখান থেকে একটা জিনিষ হল, এখানেও করা যেতে পারে, সেই থেকে এটাও বলা শুরু হল – এখানেও হতে পারে, সহজে হয়ে যেতে পারে, আর এখানেই হতে পারে। কিন্তু তাতেও কোন দিন মনুষ্যলোক ব্রহ্মলোকের সমান হবে না।

যেমন ভক্তি পথ সহজ পথ। কেন সহজ? যাদের দেহবোধ আছে তারাও ভক্তি সাধনা করতে পারে, সেইজন্য ভক্তি পথ সহজ পথ। যাঁরা অক্ষর উপাসনা করতে চান শরীর বোধ থাকলে তাঁরা করতে পারবেন না। কিন্তু তাই বলে ভক্তি পথ যে শ্রেষ্ঠ তা নয়। ঠাকুরও বলছেন ভক্তি পথ সহজ পথ। তবে আবারও বলা হচ্ছে, আত্মজ্ঞান যে কোন জায়গাতেই হতে পারে, কিন্তু মনুষ্যলোক বা পৃথিবীলোক হল কর্মভূমি, স্বামীজীও এই কর্মভূমির উপর বারবার জোর দিচ্ছেন। আর বাকি যত লোক সব লোক হল কর্মফলভোগ ভূমি। এমন কর্ম করছে যে তাকে নিম্ন লোকে নিয়ে যাচ্ছে, আবার এমন কর্ম করছে যার জন্য স্বর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাই বলে যে সেখানে কর্ম একেবারেই হবে না তা নয়, কর্ম সেখানেও হবে কিন্তু কর্মফলভোগ এত বেশি কার্যকর হয়ে আছে যে নতুন করে কর্ম শুরু হওয়ার সুযোগই পাবে না। ব্রহ্মলোকও কর্মফল ভূমি, কিন্তু যজ্ঞ, নিষ্কাম কর্ম আর জ্ঞানের ফলই ব্রহ্মলোক। সেইজন্য এর ফল স্বাভাবিক ভাবেই তাকে ঈশ্বরের কাছে রাখে, অন্যান্য লোকে রাখে না।

ব্রহ্মলোক নিয়ে বলা উপনিষদের উদ্দেশ্য নয়, একটা মূল জিনিষকে সহজ করে বোঝাতে গিয়ে শুধু উল্লেখ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে বললেন *অস্য বিস্রংস্যমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ*, পরে আবার বললেন *শরীরত্বায় কল্পতে*। এখানে শুধু বলতে চাইছেন যে ব্রহ্মলোকে যেভাবে জানা যায় পৃথিবীলোকেও সেই ভাবে জানা যায়। আর এই মানবদেহ থাকতে থাকতে যদি না করে নাও, আর যদি একটুও গাফিলতি কর তাহলে তখন এই ব্রহ্মলোকও তুমি পাবে না। সেইজন্য তুমি পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি সব লোকের কথা ভুলে এখানে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চটপট করে নাও। ব্রহ্মলোক খুব ভালো হতে পারে কিন্তু ওখানে যাওয়ার জন্য তোমাকে প্রচুর নিষ্কাম কাজ করতে হবে, প্রচুর যজ্ঞাদি করতে হবে, প্রচুর ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে, এত কিছু করতে প্রচুর সময় লাগবে, তার মধ্যেই যদি কিছু গোলমাল করে ফেঁসে অন্য লোকে গিয়ে পড় তাহলে সর্বনাশ। আর তুমি ব্রহ্মলোকে যে আত্মজ্ঞান পাবে সেই জ্ঞান এখানেও পেয়ে যাবে। বেদে যে অর্থে স্বর্গাদি পাওয়ার কথা বলা হয় উপনিষদে সেই অর্থে কখনই বলবে না। উপনিষদ বারবার বলছে তুমি এখানেই, এখনই কর। এই মন্ত্রেরও উদ্দেশ্য ব্রহ্মলোক নিয়ে কথা বলা নয়, মনুষ্যলোকের সাথে ব্রহ্মলোকের তুলনা করাও উদ্দেশ্য নয়, তুমি এক্ষুণি সব কিছু ছেড়ে আত্মজ্ঞান পাওয়ার জন্য নেমে পড়।

আবার ঘুরে বলছেন *কথমসৌ বোদ্ধব্যঃ? কিংবা তদববোধে প্রয়োজনম্? ইত্যুচ্যতে*। আপনি আত্মার ব্যাপারে যা বললেন এই আত্মাকে কিভাবে জানা যায়? জানলে কী হবে? তখন বলছেন –

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়স্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।২/৩/৬।।

(আকাশাদি থেকে যে ইন্দ্রিয়সমূহ বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হয়, তারা আত্মা থেকে বিলক্ষণ স্বভাব-বিশিষ্ট এটা জেনে আর তাদের উৎপত্তি ও লয় জেনে ধীমান্ শোকাতীত হন।)

মন্ত্রের শেষ অংশে বলছেন যাঁরা আত্মাকে জেনে যান তাঁরা আর কোন কিছুর জন্য শোক বা দুঃখ করেন না। আমরা এই নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি। যাঁরা আত্মাকে জেনে নেন তাঁদের কাছে জগতের আর কোন গুরুত্ব থাকে না। তাই জগতের শোক, আনন্দ, ভালো, মন্দ কোনটাই আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আত্মাকে কিভাবে জানেন? *ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়স্তময়ৌ চ যৎ*, জাগ্রত অবস্থায় আমাদের চোখ দেখছে, কান শুনছে, নাক গন্ধ নিচ্ছে, কথা বলছি কিন্তু যখন ঘুমিয়ে পড়ছি তখন ইন্দ্রিয়গুলি কাজ বন্ধ করে দেয়। তার মানে ইন্দ্রিয়ের উদয় আর বিলয় ক্রমাগত হয়ে চলেছে। জাগ্রত আর স্বপ্নের দিক দিয়ে দেখলে, ইন্দ্রিয়ের যে এই সৃষ্টি আর সংহার চলছে এটাই জগৎ। যখন আমরা জাগ্রত তখন ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় আর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলে ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এটাকেই খুব সুন্দর বলছেন *উদয়স্তময়ৌ*, সৃষ্টি আর প্রলয়।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবম্, ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হল, আকাশ, বায়ু আদি পঞ্চভূত থেকে এদের আলাদা আলাদা জন্ম। যেমন আকাশ ভূত থেকে শব্দ, বায়ু থেকে স্পর্শ, অগ্নি থেকে রূপ, জল থেকে রস আর পৃথিবী বা ভূমি তত্ত্ব থেকে গন্ধের উৎপত্তি, আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ এই পাঁচটি ভূত থেকে আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয়ের জন্ম। এক একটা গুণ থেকে পৃথক পৃথক জন্ম, এটাই ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এদের রোজ জন্ম হয় আর রোজ বিলয় হয়। এদের সবারই স্বভাব আলাদা, চোখের স্বভাব আলাদা,

কানের স্বভাব আলাদা তেমনি এদের জন্মটাও আলাদা আলাদা ভূত থেকে। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ইন্দ্রিয়গুলির রোজ উদয় হওয়া আর বিলয় হয়ে যাওয়া। ইন্দ্রিয়গুলি যে আত্মা থেকে আলাদা এটা দিয়ে জানতে হয় বুঝতে হয়। আর এটাও বুঝতে হয়, জাগ্রত অবস্থা আর স্বপ্নাবস্থা হল ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় আর নিষ্ক্রিয় অবস্থা। নিদ্রার সময় মস্তিষ্কে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় যার জন্য মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। যখন এটা বুঝতে পারবে, এই যে ইন্দ্রিয়গুলো এখন সক্রিয় হয়ে কাজ করছে, আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ছি এই ইন্দ্রিয়গুলির তখন বিলয় হয়ে যাচ্ছে, আর জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে আমাদের যে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এই তিনটেই ইন্দ্রিয়ের অবস্থা, আত্মার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। জাগ্রত অবস্থাতেও আত্মা সাক্ষী, স্বপ্নাবস্থাতেও সাক্ষী আবার সুষুপ্তি অবস্থাতেও আত্মা সাক্ষী। ইন্দ্রিয়গুলি আত্মা থেকে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, কারণ *পৃথগুৎপদ্যমানানাং*, ইন্দ্রিয়ের জন্ম আলাদা। আর যে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, এর না আছে উদয় না আছে বিলয়, না আছে কোন ভূতের সাথে সম্পর্ক, আত্মাতে কোন ব্যভিচার অর্থাৎ কোন অবস্থার পরিবর্তন হয় না। যখন কেউ এই ভাবে আত্মাকে জেনে যায় তখন সে বুঝতে পারে আমার শোক করার, দুঃখ করার কিছু নেই। যা কিছুই আমার সাথে হোক না কেন, আমি যদি বুঝে থাকি আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, তাই যা কিছু হচ্ছে আমার সাথে কিছু হচ্ছে না, সবই ইন্দ্রিয়ের খেলা। ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে খুব সুন্দর একটা নামকরা গল্প আছে।

একজন লোক ভগবান বুদ্ধকে খুব গালাগাল দিচ্ছে। ভগবান বুদ্ধ কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। কেন ভ্রুক্ষেপ করছেন না, এর উত্তরে তিনি বলছেন – তুমি যদি অতিথির জন্য রান্নাবান্না কর আর সে যদি না আসে, বা কিছুই যদি না খায় তাহলে তুমি কি কর? আমরা নিজেরাই খেয়ে নিই। আমিও যদি তোমার গালাগাল গ্রহণ না করি তাহলে কি হবে? লোকটির তখন চোখ খুলে গেল। তখনকার সময় ব্রাহ্মণরা ভগবান বুদ্ধকে প্রচুর গালমন্দ করতেন। কোন ব্রাহ্মণের বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে গেছেন, ব্রাহ্মণ আচ্ছা করে গালাগাল দিয়ে ভগবান বুদ্ধকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা পারি না, কেউ আমাদের দুটো মন্দ কথা বলে দিলে আমরাও তাকে আরও দুটো মন্দ কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে, শুনিয়ে না দিতে পারলেও মনে মনে গজরাতে থাকি। ভারত পাকিস্থানের মধ্যে দিনরাত কত ঝামেলা চলছে। তার মধ্যে ভারত বলে দিল ঈদের জন্য আমরা আর পাকিস্থানকে মিষ্টি দেব না। মাঝখান থেকে এদের আবার অন্য বুদ্ধির উদয় হল, ওয়ার্ধা সীমান্তে ভারতের সৈনিকরা ঈদের মিষ্টি নিয়ে গেল কিন্তু পাকিস্থান নিল না। সত্যিই কত অপমানজনক! মনু বাবা বলছেন, যখন কাউকে কিছু দাও তখন নিজেকে ধন্য মনে করবে যে তিনি এটা গ্রহণ করলেন, আর যিনি নিলেন তাঁরও বলা উচিৎ, আমি ধন্য এই জন্য যে আপনি আমাকে দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র মনে করেছেন। তত্ত্বতঃ আমরা এগুলো জানি কিন্তু ব্যবহারের সময় প্রয়োগ করতে পারছি না।

যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তিনি দেখেন, ওর ইন্দ্রিয় আমার উপর এই বাক্যবাণ নিক্ষেপ করছে আর আমার ইন্দ্রিয়গুলো এগুলোকে ধরে যাচ্ছে, আমি এর সব কিছু থেকে বিলক্ষণ আমার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ফিজিক্সে বলে static electricityর কিছু প্রপার্টি আছে। তার মধ্যে একটা মজার প্রপার্টি হল, যেখানে ছুঁচোল জিনিষ আছে সেটার দিকে সে দৌড়ে যায় আর সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। যার জন্য বাড়িতে ইলেক্ট্রিক কনডাক্টরগুলো ছুঁচলো থাকে, যাতে বজ্রপাত হলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিতে পারে। তার থেকে আরও মজার ব্যাপার হল, যখনই বিদ্যুৎ চমকায় তখন ওটা সারফেসে থাকে। প্রথমের দিকে লোকেরা static electricityর ব্যাপারে কিছু জানত না। সতের ও আঠারো শতাব্দীতে পদার্থ বিজ্ঞানীরা এর উপর প্রচুর কাজ করেছিলেন। একজন পদার্থ বিজ্ঞানী static electricity থেকে যে ভয়ের কিছু নেই, এটাকে দেখাবার জন্য একটা চেম্বার তৈরী করলেন, তৈরী করে চেম্বারের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, চেম্বারে একটা চেয়ারে বসে বই পড়তে শুরু করে দিলেন। আর চেম্বারের বাইরে যে spherical পুকুর বানানো হয়েছে তাতে জোরে জোরে স্পার্ক ছাড়ছে, কিন্তু উনি আরামসে ভেতরে বসে বই পড়ে যাচ্ছেন। উনি দেখাচ্ছিলেন যে static electricityর যে বৈশিষ্ট্য তাতে সে বাইরের সারফেসে থাকে ভেতরে কিছু করতে পারে না, ভেতরটা একেবারে শান্ত। ঠিক তেমনি সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন প্রবল ঝড় বয়ে যায় তখন সমুদ্রের একটু নীচে চলে গেলে ঝড়ের কোন টের পাওয়া যাবে না। আমাদের জীবনটাও তাই, যত ঝড়ঝঞ্ঝা যা কিছু দেখছি সব ইন্দ্রিয়ের খেলা, বাইরেই খেলা চলছে, ভেতরে আত্মাতে যদি একবার ঢুকে যাওয়া যায় তখন আর কোন কিছুর টের পাওয়া যাবে না, ওখানে সব শান্ত। *মত্বা ধীরো ন শোচতি*, আত্মাকে যিনি জেনে গেছেন তাঁর কখনই আর কোন শোক হয় না।

যে মন্ত্রগুলিকে নিয়ে আলোচনা চলছে এই কটি মন্ত্রে ব্যাখ্যা করছেন আত্মজ্ঞান মানে কি। এই আলোচনা জ্ঞানরাশি হয়ে এখন শ্রোতাদের মধ্যে জমছে। জমতে জমতে একদিন নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে উপনিষদ কি বলতে চাইছে। মানুষ মাত্রই কামিনী-কাঞ্চন আর আহার-নিদ্রা-মৈথুনের মধ্যে ডুবে আছে। ঠাকুর বলছেন, যে কাম জয় করেছে সে তো মহাপুরুষ, তাঁর কৃপায় সে ঈশ্বর দর্শনও করে নিতে পারে। ঈশ্বর দর্শন হয়ত হল না, কিন্তু মহাপুরুষ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা কেউই নিজেকে মহাপুরুষ মনে করতে পারছি না। একটা বয়সের পর আমরা যতই মনে করি না কেন আমি আর কামিনী-কাঞ্চনের পেছনের ছুটছি না, আসলে সবাই কোন না কোন ভাবে কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যেই পড়ে আছে। কামিনী-কাঞ্চনকে যদি একটা অনেক গভীরে চলে যাওয়া শেকড়ওয়ালা গাছ মনে করি তাহলে তার যে শাখা-প্রশাখার বিস্তার, তার পাতা ফল যা কিছু আছে এটাই আমাদের জীবন। শেষ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সব আহার, নিদ্রা, মৈথুনের মধ্যেই চলে যাচ্ছে। কিন্তু এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের জীবন-দর্শন। আহার-নিদ্রাই হোক আর কামিনী-কাঞ্চনই হোক এগুলো হল ঢেউ। সমুদ্রে যে ঢেউ উঠছে, নামছে, এগুলোও আমাদের জীবনের ঢেউ। সমুদ্রটা হল বেঁচে থাকার ইচ্ছা, অস্তিত্ব। আমি একটা জীবন পেয়েছি এই জীবনকে আমি কাজে লাগাব। জীবনকে একটা বিন্দু থেকে আরেকটা বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া। এই যে একটা বিন্দু থেকে আরেকটা বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া, এটাকে বিভিন্ন ভাবে পরিভাষিত করছেন। আমরা সবাই জানি জীবন মানে জন্ম থেকে মৃত্যু। গীতায় ভগবান বলছেন, *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।* জন্মের আগে অব্যক্ত ছিলে মৃত্যুর পর আবার অব্যক্তে চলে যাবে, মাঝখানে কিছু দিন ব্যক্ত ছিলে। তার মানে আমাদের এই যাত্রা অজানা থেকে অজানায়, মাঝখানে কিছুদিনের জন্য জানা। মাঝখানে এই যে জানা, আমরা মনে করছি এইতো অল্প কিছু দিনের জন্য বোধ, কিন্তু তা হয় না, পুরো জিনিষটারই বোধ রয়েছে। আমাদের আগেরটা মনে নেই, পরেরটা বোধ থাকবে না, মাঝখানের অল্প কিছু সময়ের বোধটুকু থাকছে। যার জন্য এই জীবনের প্রচণ্ড দাম, এই জীবনকে যদি কাজে না লাগান যায় সত্যিই জীবনটা বৃথা হয়ে যাবে।

হিন্দু দর্শন মতে ভগবান নিজের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করছেন, সেই শক্তি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকে যেন আবৃত করে দিচ্ছে। আবৃত হয়ে যাওয়া মানেই এবার জগৎ রূপী খেলা শুরু হয়ে গেল। খেলার মধ্যে কোথাও যেন আমাদের আত্মবিস্মৃতি হয়ে যায়। সিনেমা নাটকে যারা অভিনয় করে তাদের বলা হয়, এমন করবে যেন বাস্তব মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক করতে যেও না। কিন্তু অনেক সময় বাস্তবিকও হয়ে যায়। একজন অভিনেতা থিয়েটারে অভিনয় করতে আসার আগে বাড়িতে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে এসেছে, রাগে ফোঁস ফোঁস করছে আর এক্ষুণি মারপিটের অভিনয় করতে হবে, ভেতরটা আগে থেকেই বিগড়ে আছে, অভিনয় করতে গিয়ে সত্যি সত্যিই দু চারটে মেরে দিল। এরকম অনেক সময় হয়ে যায়। অভিনয়ে দেখাতে গিয়ে অনেক সময় বাস্তব হতে শুরু করে দেয়। মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক এই সমস্যা হয়। জগৎ সংসারটাও একটা অভিনয় মঞ্চ, সবাই অভিনয় করছে কিন্তু মনে করেছে এটাই বাস্তব। আমরা সেই শুদ্ধ আত্মা, জগৎকে সৃষ্টিও করছে সেই শুদ্ধ আত্মা, তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তার মানে সৃষ্টিটা আমিই করেছি, কিন্তু জীব রূপে না। সৃষ্টি করে এর মধ্যে ঢুকে আমরা এবার নিজেকেই খুঁজে যাচ্ছি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা যা কিছু করছি সব কিছু করার মাধ্যমে আমি আমাকেই খুঁজছি, যে খুন করছে সেও নিজেকেই খুঁজছে, মা শিশুকে দুগ্ধ পান করাচ্ছে, আদর করছে সে নিজেকেই খুঁজছে। নিজেকে খোঁজা ছাড়া আমরা আর কিছু করছি না, এটাই বাস্তবিক। চুপচাপ একা একা নির্জনে বসে এগুলো নিয়ে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়! কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বিশ্বাস হবে, বেশিক্ষণের জন্য হবে না ঠিকই কিন্তু ঐ মুহুর্তের বিশ্বাসই আমাদের ভালো লাগবে, মনে হবে আমি মুক্ত, স্বাধীন হয়ে গেছি। এখানে উপনিষদে ঠিক এই জিনিষটাই বলছেন।

শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং শাস্ত্রের কথা শুনে শুনে আমাদের মধ্যে এখন দুটি সত্তা এসে গেছে। একটি সত্তা হল যেটাকে আমি নিজেকে মনে করছি আর অন্যটি হল শাস্ত্র যে সত্তাকে আমার বাস্তবিক সত্তা বলছেন। চৈতন্য রূপে যে আমার অস্তিত্ব ঐটাই আমার বাস্তবিক সত্তা। আর ভৌতিক রূপে যে সত্তা এখন দেখছি এই সত্তাটাই কাল্পনিক বা সাময়িক বলা যেতে পারে। অথচ আমাদের শরীর মনের এমনই গঠন, জগৎকে নিয়ে আমরা এমনই সম্মোহিত হয়ে আছি যে জাগতিক রূপটাই আমাদের সত্য মনে হয় আর আসল সত্তার রূপকে

কাল্পনিক মনে হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে ঘুরপাক করতে করতে মানুষ তার বাস্তবিক সত্তাকে ভুলে যায়, এখানে আমি কেন এসেছি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে সব ভুলে যায়। ঠাকুর গল্প বলছেন, রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় হনুমান গেছেন অস্ত্র চুরি করতে। মন্দোদরী হনুমানকে ফলের লোভ দেখাচ্ছে, ফল দেখে যদি হনুমান প্রলোভিত হয়ে যায়, পথ থেকে যদি বিচ্যুত হয়ে যায়। মানুষ মাত্রেই তাই হয়, একবার যদি পথ থেকে বিচ্যুতি হতে শুরু হয় তখন বিচ্যুতি হতেই থাকে। এখন যদি কেউ তাকে মনে করিয়ে দিতে থাকে এটার জন্য জগতে তুমি আসনি, সে মানতেই চাইবে না। শাস্ত্র আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে, তোমার বাস্তবিক স্বরূপ হল তুমি দিব্য। দেহ রূপে ভৌতিক রূপে যেটাকে তুমি আসল মনে করছে তা কখন আসল নয়।

আত্মজ্ঞান কিছুই নয়, তুমি নিজেকে দেহ-মনের সংঘাত রূপে মনে করছ, কিন্তু উপনিষদাদি শাস্ত্র বলছেন তুমি দেহ-মনের সংঘাত নও, তুমি এর স্রষ্টা। যেটা সৃষ্টি হয় মানুষ সেটা কখন হয় না, কারণ আপনি আর আপনার সৃষ্টি দুটো আলাদা। বলছেন যিনি স্রষ্টা তুমি সেই তিনি। জর্জ বার্ণাড'শর একটা নাটকের নাম মাই ফেয়ার লেডী। বার্ণাড'শ গ্রীক কাহিনী পিগমেলিয়ানকে অবলম্বন করে মাই ফেয়ার লেডী লিখেছিলেন। মূল বইয়ের নামও তাই পিগমেলিয়ান, কিন্তু চলচ্চিত্র হওয়ার সময় তার নাম দেওয়া হল মাই ফেয়ার লেডী। পিগমেলিয়ানের মূল কাহিনীতে একজন ভাস্কর্য শিল্পী একটা বড় মুর্তি তৈরী করেছে। মুর্তিটা এতই সুন্দর হয়েছে যে নিজের সৃষ্টির সৌন্দর্য থেকে বেরিয়ে এসে অন্য আর কিছু করতে পারছে না। মুর্তির সৌন্দর্যের মধ্যে হারিয়ে নিজের সব প্রতিভাকে শেষ করে দিল। রেশমের যে গুটিপোকা নিজে গুটি তৈরী করে ওর মধ্যেই বদ্ধ হয়ে মারা যায়। এটা আরেক ধরণের উপমা। নিজের সৃষ্টিকে এত ভালোবেসে ফেলছে যে সে আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই জগৎ সৃষ্টি করে জগতের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন। আমার আপনার এই শরীর মনকে আমরাই সৃষ্টি করেছি, আসল আমিই এর সব কিছুর স্রষ্টা। নিজের সৃষ্টিকে দেখে এমন হাঁ হয়ে গেছে যে, কোন কারণে অপরের সৃষ্টিকে যদি দেখে একটু ভালো মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ছি নিজের সৃষ্টিটাকে ঠিক করার জন্য। স্নো পাউডার, ফেসিয়াল, এত বিউটি পার্লার, এত শাড়ি গয়না কেন? অপরের সৃষ্টি থেকে আমার সৃষ্টি যেন ভালো হয়। আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ, আমিও তার থেকে ভালো সৃষ্টি করতে পারে। কি ভালো সৃষ্টি করতে পারি? আমার শরীর। এগুলো আমাদের মনের ভেতরে কাজ করতে থাকে। উপনিষদ এই জিনিষটাকেই আটকাচ্ছেন, তুমি সৃষ্টি নও, তুমি স্রষ্টা। স্রষ্টাটাই আসল তুমি, সৃষ্টিটা আসল তুমি নও। এই সহজ একটা জিনিষকে বোঝাবার জন্য উপনিষদ কত ভাবে, কত রকমের উপমা দিয়ে বলে যাচ্ছেন। আত্মজ্ঞান মানে এটাই তুমি সৃষ্টি নও, তুমি স্রষ্টা, তুমি দেহ নও তুমি চৈতন্য, তুমি জড় নও তুমি চৈতন্যস্বরূপ, আর তুমি দুর্বল নও, তুমি কাপুরুষ নও, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, তুমি নিজেকে যে সীমিত মনে করছ তা নয়, তুমি অসীম। সমস্যা হল শাস্ত্রের কথা সরাসরি শাস্ত্রের থেকে জেনে নিলে শাস্ত্রের কথা ভালো লাগে না, কিন্তু যখন অপরের মুখে শাস্ত্রের কথা শুনছি তখন শাস্ত্রের কথা শুনতে ভালো লাগার থেকে যিনি বলছেন তাকে বেশি ভালো লাগে। লাউড স্পিকারে ঘোষণা করে বলে দেওয়া হচ্ছে বন্যা আসছে আপনার সবাই বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যান। কিন্তু সবাই বলছে এই লাউড স্পিকারের আওয়াজ কী মধুর! লাউড স্পীকারের কেরামতিটা কি সুন্দর! এবার সবাই লাউড স্পীকারের সামনে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে লাউড স্পীকারকেই দেখে যাচ্ছে। এদিকে লাউড স্পীকারে চিৎকার করে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, বন্যা আসছে আপনার সবাই পালান, সবাই শুনছে কিন্তু লাউড স্পীকার দেখে আমরা এমন মুগ্ধ হয়ে আছি যে বন্যার সাবধান বাণী আমাদের কানেই যাচ্ছে না। আর ঐ রকম দশ খানা স্পীকারে ঘোষণা করা হচ্ছে, দশ জন লোক দশটা স্পীকারের সামনে হাঁ হয়ে লাউড স্পীকার দেখছে। তারপর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু কোন স্পীকারটা বেশি ভালো। সব ধর্ম, সব শাস্ত্র বলছে জগৎটা ছাড়, ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে যাও। এই জগৎ যে বিনাশের জায়গা সেটা কেউ শুনছে না। ধর্মগুলো এক একটা স্পীকার, স্পীকার দেখে সবাই মুগ্ধ। মহম্মদ শ্রেষ্ঠ, নাকি যিশু বড়, না রামকৃষ্ণ বড় এই নিয়ে মারামারি খেয়োখেয়ি চলছে। এনারা যেটা বলতে চাইছেন সেটা কেউ শুনতে চাইছে না। কিছু করারও নেই, কারণ মনটাই সীমিত, মন যেটুকু ধরতে পারছে তার বাইরে আর যেতে পারে না। এর থেকে আরও খারাপ অবস্থা হল, যে যিশুর কথা বলছে, মহম্মদের কথা বলছে এবার আমরা তাকেই ভালোবেসে ফেলছি। কামিনী-কাঞ্চন ছেড়ে আমরা লাউড স্পীকারকেই ধরছি, এটাও

একটা সংসার। কিন্তু সবাই যেটা বলতে চাইছেন, আসল বক্তব্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি যাচ্ছে না। কামিনী-কাঞ্চনই সংসার, আর এই কামিনী-কাঞ্চনের যোগান দিতে আর কামিনী-কাঞ্চনের যে পরিণাম, এই দুটোর মধ্যেই আমাদের জীবন ঘুর ঘুর করছে। ফলে কিছুতেই আর আত্মজ্ঞানের দিকে যেতে দিচ্ছে না।

কত লোক শাস্ত্রের কথা শুনছে, কিন্তু তাও কিছুই হয় না। না হওয়ারই কথা। সবাই যদি শাস্ত্রের কথা শুনে মুক্তির দিকে চলে যায় তাহলে তো ভগবানের সমস্যা হয়ে যাবে, তাঁকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে। তা নয়, আসল কারণ হল কেউ খাটতে চায় না। সবাই খোঁজে কোথায় সহজ উপায়ের কথা বলছে। যেখানে বলবে এখানে বেশি খাটাখাটনি নেই, মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই সেদিকে যাবে। খ্রীষ্টান ধর্ম বলছে তুমি ঠিক ভাবে জীবনটা অতিবাহিত করে যাও, ভগবান যিশু এসে তোমার নরকে যাওয়া আটকে দেবে। চলো ভাই, আমাদের আর কিছু করতে হবে না। সব থেকে বেশি খাটাখাটনি হয় বেদান্তে, যত ধর্ম যত দর্শন আছে সবার থেকে বেদান্তের পথ সব চাইতে কঠিন পথ। কিন্তু স্বামীজী বারবার বলছেন বেদান্তই একমাত্র মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, বেদান্ত ছাড়া মুক্তি হয় না। আচার্য শঙ্কর যত পথ আছে সব কটি পথের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। আচার্য অন্যান্য ধর্মের পথকে সহজ পথ, ভালো পথ কেন বলছেন? কারণ সব কটা ধর্মের পুরো ছবিটা নেওয়ার পর দেখা যাবে বেদান্তের পথ সব থেকে কঠিন পথ, কারণ বেদান্তই একমাত্র মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। বেদান্তের আলোচনা আমরা কত লেকচারে, সেমিনারে, শাস্ত্র ক্লাশে শুনছি কিন্তু তাও আমাদের মুক্তির ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা হচ্ছে না, ধারণা হলেও মুক্তির দিকে যেতে ইচ্ছে করছে না। আসল কারণ হল ধারণা করার জন্য যে খাটনির দরকার সেই খাটনিটা কেউই করতে চাইছে না। সোনাকে শুদ্ধ করতে হলে তাকে আগুনে পোড়াতে হয়, ঠিক তেমনি আমাদের ভেতরে অশুদ্ধির জঞ্জাল জমে আছে, অশুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে হলে আগুনে পোড়াতে হবে। চিতার আগুনে নয়, খাটনির আগুনে পোড়াতে হবে। খাটনির আগুনে আমাদের অশুদ্ধি ভাবগুলো পুড়ে যায়। কথামৃতে ঠাকুর বারবার বলছেন, মুখে বললে হবে না, তোমাকে খাটতে হবে। বেদান্তের ভাব ধারণা না হওয়ার কারণ অনেকে অনেক ভাবে বিশ্লেষণ করেন, কেউ বলেন ইচ্ছাশক্তির অভাব, কেউ বলেন রজোগুণের জন্য, কেউ বলেন মানুষ তার পুরনো সংস্কারকে ছাড়তে পারছে না বলে ধারণা করতে পারছে না। কেউ ভুল কিছু বলছেন না, এগুলোই আমাদের দড়ি রূপে বেঁধে রেখেছে, এই দড়িকে খাটনির আগুনে পোড়াতে হবে। এরপর কেউ যদি বলেন, খাটতে ইচ্ছে হয় না কেন? এদের না আছে কোন ইচ্ছা, না আছে কোন বিশ্বাস, এরা মনে করে আমরা বেশ আছি। যাদের এই ঢিমে তেতালা ভাব তাদের দ্বারা শাস্ত্রের কথা ধারণা করা দূরে থাক, অন্য কোন কিছুই হবে না। তাহলে এদের কিভাবে হবে, এদের কি আদৌ কোন দিন হবে? আপাতদৃষ্টিতে হবে না। খ্রীষ্টান ধর্মে যখন অনন্ত নরকের কথা বলছে, বা গীতায় যখন ভগবান বলছেন *ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু*, আমি তাদের অশুভ যোনিতে নিক্ষেপ করি, তখন এটাই বলতে হয় জীবন মানেই প্রচণ্ড মার খাওয়া, ইচ্ছা করছে না, বিশ্বাস হয় না মানেই তার জীবনে এখনও মার খাওয়া শুরু হয়নি। জীবনে প্রচুর মার খেতে খেতে একটা সময় আসবে যখন বলবে, আমার আর কিছু লাগবে না, তখন সে বিপরীতমুখী হয়। বিপরীতমুখী হয়ে এবার সে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যাবে, এরপর যত সে খাটবে তত সে ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে আবার এগোতে শুরু করবে। পড়াশোনা করাটাও খাটনি, এটাও সাধন-ভজন। আপনাকে উপনিষদ মুখস্ত করতে বলা হল, প্রথমেই বলছেন, ওরে বাবা! অত কঠিন কঠিন মন্ত্র মুখস্ত করা আমার দ্বারা হবে না। আপনি বলবেন আমারতো আরও অনেক কিছুই করতে ভালো লাগে, সাধুসঙ্গ করতে কত ভালো লাগে, সাধুসেবা করতে ভালো লাগে, মন্দিরে আরতিতে যেতে কত ভালো লাগে, ঠাকুরকে পূজা করতে কতই না আনন্দ লাগে। ঠিকই বলছেন, কিন্তু এগুলোই সহজ পথ। যে জিনিষটা করতে খাটনির দরকার হয় না, সেটাই যখন করতে ভালো লাগছে বলছেন তখন আপনার ব্যক্তিত্বের গঠনও সেই রকমই হবে। জিমে গিয়ে যদি বলেন চারবার হাত ওঠানামা আর চারবার বৈঠক দিতে আমার খুব ভালো লাগে, আমার জন্য এই দুটো করাই ঠিক। জিম মাস্টার বলবে, তাহলে তোমার শরীরটাও সেই রকমই থাকবে। অন্য দিকে মানুষ খাওয়া-দাওয়া, সাজপোশাক, আনন্দ-স্ফুর্তির জন্য সব রকম ভাবে খাটবে আর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ঠাকুরের উপর ছেড়ে দেবে, এভাবে হয় না। যত খাটনি হবে তত যত রকমের সীমিত ভাব, দুর্বলতা আছে, সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জাগতিক দিকেও তাই হয়, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও তাই হয় আর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। কেউ যদি পরীক্ষায় নম্বর না পায় বুঝতে হবে সে খাটছে না। খাটলে সে নম্বর পাবেই। একটা স্তরে গিয়ে সে হয়ত তত আর পারবে না। কিন্তু

যদি লেগে থাকে তাহলে সে যত আশা করেছিল তার থেকে অনেক উপরে যাবে। আর যারা হনুমান মন্দির আর সন্তোষীমার মন্দিরে গিয়ে নম্বরের জন্য প্রার্থনা করছে, তারা কোন দিনই নম্বর পায় না। মুক্তির ব্যাপারেও তাই হয়, খাটতে হবে, না খাটলে কোন দিন হবে না। চলতে ফিরতে একশ বার ঠাকুরের নাম নিচ্ছে, মনে করছে আমার পুরো আত্মসমর্পণ আছে, ওতে কোন কাজ হয় না। যাই হোক, আমরা মূল উপনিষদের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

এর আগের মন্ত্রে বললেন ইন্দ্রিয়গুলি আত্মা থেকে ভিন্ন। এরপর সাত আর আট নম্বর যে দুটি মন্ত্র এই ধরণের মন্ত্র এর আগেও আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লীতে পেয়েছি। এখানে আবার জিনিষটাকে নিয়ে এসে অন্য দিক দিয়ে বোঝাচ্ছেন –

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্।।২/৩/৭।।

(ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি উত্তম, বুদ্ধি থেকে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব থেকে অব্যাকৃতা মায়া শ্রেষ্ঠ)

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম এইভাবে যদি দেখা হয় তাহলে *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো*, ইন্দ্রিয় থেকে মন সূক্ষ্ম, *মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্*, মনের থেকেও বুদ্ধি সূক্ষ্ম, সত্ত্ব মানে এখানে বুদ্ধি। *সত্ত্বাদধি মহানাত্মা*, সত্ত্ব বা বুদ্ধি থেকেও সূক্ষ্ম মহৎ তত্ত্ব। *মহতোহব্যক্তমুত্তমম্*, আর মহৎ তত্ত্ব থেকেও সূক্ষ্ম অব্যক্ত। সব থেকে স্থূল হল এই বাহ্য জগৎ। কোন জিনিষকে যখন ধরা হয় তখন তার থেকে বেশি সূক্ষ্ম জিনিষ দিয়ে ধরা হয়। এই টেবিলকে যদি মাপতে হয় তাহলে এর ইউনিটগুলি টেবিলের থেকে ছোট হতে হবে। একটা বিরাট লম্বা বাঁশ দিয়ে এই টেবিলকে মেপে বলা যাবে না টেবিলের এত দৈর্ঘ্য, এত প্রস্থ আর এত উচ্চতা। প্রথম যখন ইসলাম ধর্ম শুরু হল তখন বলা হল, জগতে কে কোথায় কত রকমের বিদ্যা জানে, সব বিদ্যার খবর নেওয়া হোক। তখন আরব, ইরাক, ইরাণ থেকে অনেক পণ্ডিতরা ভারতে ও অন্যান্য দেশে যেতে শুরু করলেন। সেই অনুসারে আলবিরুনি ভারতে এলেন এবং ভারতে যত রকম বিদ্যা আছে জানার চেষ্টা করলেন। সময়ের বিভাজন বিদ্যাটা ভারতে অনেক আগেই এসে গিয়েছিল। সময়ের বিভাজনে আগে ছিল বছর, বছরের থেকে ছোট হল মাস, মাসের থেকে পক্ষ, এই করে সপ্তাহ, দিন, ঘন্টা, মিনিট এবং শেষে সারা বিশ্বে এখন আমরা সময়ের সব থেকে ক্ষুদ্র ইউনিটকে বলছি সেকেণ্ড। হিন্দুরা সেকেণ্ডেরও অনেক নীচে চলে গিয়েছিল। সেকেণ্ডকে ভেঙে কলা, কাষ্ঠাদি রূপে, একটা চোখের পাতা পড়তে যতটুকু সময় লাগে হিন্দুদের সময়ের ইউনিট সেখান থেকে শুরু হয়। ১/১০ সেকেণ্ড, ১/২০ সেকেণ্ডের যখন হিসাব করা হয় তখন অনেক নীচের দিকে চলে যায়। আলবিরুনি সেখানে লিখছেন, সময়ের এত ছোট ছোট বিভজনকে জেনে কার কি কাজে লাগবে! আজ থেকে হাজার বছর আগে আলবিরুনি এই কথা বলেছিলেন আর হিন্দুদের সময়ের এই বিভাজন তারও তিন চার হাজার বছর আগে থেকে চলে আসছে। আরও আশ্চর্যের যে আজকে বিজ্ঞান কোথায় চলে গেছে, এক সেকেণ্ডের যে কোটি বিভাজন, তারও নীচে চলে গেছে। এ্যটমিক ওয়ার্ল্ডে যখন সময় মাপা হয়, এক সেকেণ্ড মানে সৃষ্টির মত। বেশির ভাগ যে পার্টিকেল এ্যটমের মধ্যে থাকে সেখানে তাদের এক সেকেণ্ড মানে আমাদের যে দীর্ঘ জীবন সেটাও যেন সেখানে এক সেকেণ্ড অনেক বেশি হয়ে যায়। ১/১০০ এটা বিজ্ঞানের কাছে কোন হিসাবই নয়, ওটাকে আরও ছোট করতে হবে। এখন সেটা চলে ওয়ান বাই টেন টু দি পাওয়ার টুয়েন্টি, তার মানে একের উপর যদি কুড়ি খানা শূন্য লাগানো হয়, এক সেকেণ্ডের অতগুলো বিভাজন হয়। তারপর গিয়ে বিজ্ঞানীরা মাপা শুরু করেন। তার মানে ঐ জিনিষটাকে মাপার জন্য আমাদের কত সূক্ষ্ম জিনিষ দরকার। যে কোন জিনিষকে ধরতে গেলে তার থেকে আরও সূক্ষ্ম জিনিষের দরকার। সেই সূক্ষ্ম জিনিষকে ধরার জন্য আরও সূক্ষ্ম জিনিষ, সেই সূক্ষ্ম জিনিষকে ধরার জন্য তার থেকেও সূক্ষ্ম জিনিষের দরকার।

এই গ্লাশকে ধরছে হাত, কিন্তু আমাদের এই হাত ধরে না, হাত আর গ্লাশে কোন তফাৎ নেই, হাতও যা গ্লাশও তাই। ধরে ইন্দ্রিয়। যখনই বলছি এই গ্লাশটা কি মসৃন, এটা হাত বলছে না, হাতের উপর যে চামড়া রয়েছে, এই চামড়ার উপর যে নার্ভ রয়েছে, নার্ভগুলো যে সিগন্যাল পাঠায় সেটাকে মস্তিষ্কে স্পর্শেন্দ্রিয়ের যে সেন্টার রয়েছে সে ধরে, ধরছে কারণ সে সূক্ষ্ম। এখানেই আন্দাজ করা যায় ইন্দ্রিয়গুলি কত সূক্ষ্ম। যোগের সাধনা যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে প্রথমে তারা জগতের দিকে তাকাবেই না, ইন্দ্রিয় দিয়ে শুরু করে। সেই

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়কে ধরে আছে মন, তাহলে মন কত সূক্ষ্ম হতে পারে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। সেই মনের জগৎকে ধরে আছে বুদ্ধি। যারা অত্যন্ত স্থূল, যাদের স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর প্রকৃতির তারা ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে না। আর মনের সূক্ষ্ম কাজ তো একেবারেই করতে পারবে না। ভোঁতা মন বলতে বোঝায়, যেন বড় বড় পাথ, আসলে মন একটা জড় পদার্থ। মন পাথরের মত মানে, মনের কোন সূক্ষ্ম ভাবই নেই। মোটা দড়ির মোটা জাল সে ধরবে মোটা মাছ, আর মশারির মত সূক্ষ্ম জাল যার সে ধরবে চুনোপুটি। সূক্ষ্ম জিনিষ ধরতে হলে জালটাও সূক্ষ্ম হতে হবে। বেশির ভাগ লোকের মনের জাল মোটা দড়ির বড় বড় ফোঁকরওয়ালা জাল। ফলে মোটা মোটা জিনিষগুলিই তারা ধরতে পারে। মোটা মোটা জিনিষ ধরা মানে, আহার, নিদ্রা, মৈথুন এগুলোই মোটা জিনিষ। কামিনী-কাঞ্চনের বাইরে কিছু দেখতেই পায় না। ডাণ্ডার ভয় আর প্রলোভন এটাই স্থূল জিনিষ, এর বাইরে কিছু বোঝে না। যদি বলা হয় যদি ভালো ভাবে চল তাহলে ভগবান তোমাকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে সুখ দেবেন, তখন বলবে তাই তো! কি দারুণ কথা! কিন্তু ভগবানের যে একটা সূক্ষ্ম ভাব আছে যেটা অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম না হলে ধরতেই পারবে না। সিনেমার লারেলাপ্পা গান শুনে সবাই নাচে, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনলে এরা সেটাকে আর ধরতে পারবে না। কারণ বুদ্ধিটা সূক্ষ্ম নয়। ঠাকুর বলছেন, দুই বন্ধু মেলা দেখতে গেছে। সেখানে নানা রকমের ছবি, মুর্তি সাজানো আছে, এক বন্ধু দেবদেবীর মুর্তি দেখছিল, আরেক বন্ধু একটা মুর্তিতে উপপতিকে ঝাঁটা মারছে সেটাকে খুব মজা করে দেখছে আর চিৎকার করে বন্ধুকে ডাকছে, আরে ওদিকে কি দেখছিস এদিকে দেখে যা কি দারুণ মুর্তি। সূক্ষ্ম আর্ট কেউ আগ্রহ নিয়ে দেখতে যাবে না, কারণ মনটাই তাঁর ভোঁতা। ভোঁতা মন দিয়ে ভোঁতা ভোঁতা জিনিষ, যেমন কামিনী-কাঞ্চন, আহার-নিদ্রা-মৈথুন, শিল্পকলাও ঐ রকম, লোভ, ভয় এগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেবে। একটা কোম্পানিতে গ্রুপ ইনসিওর‍্যান্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু একজন কর্মচারী কিছুতেই সই করছিল না। একজন সই করছে না বলে কোম্পানীতে গ্রুপ ইনসিওর‍্যান্স লাগু করা যাচ্ছে না। শেষে কোম্পানীর মালিক সেই কর্মচারীকে ডেকে পাঠিয়েছে, তাকে বলে দিলেন, তুমি সই কর, সই না করলে তোমার চাকরী যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সে সই করে দিল। পরে অন্যান্য কর্মচারীরা জিজ্ঞেস করছে, এত দিন সই করছিলে না কেন? সে বলছে, এত পরিষ্কার ভাবে আগে কেউ আমাকে বোঝাতে পারেনি কেন সই করা দরকার। জীবন মানে এটাই, ভোঁতা জিনিষগুলো নিতে পারে সূক্ষ্ম জিনিষগুলো নিতে পারে না। মাথা মোটা মানে মনটা খুব স্থূল, সূক্ষ্ম জিনিষকে নিতে পারে না।

মন থেকে বুদ্ধি আরও সূক্ষ্ম। মনের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই মানে বুদ্ধি খুব দুর্বল। মনের আবেগগুলি মনেরও অনেক নীচে। থেকে থেকে রেগে যাচ্ছে, কোন কারণ নেই হতাশায় ডুবে যাচ্ছে, একটুতেই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, বুঝতে হবে বুদ্ধি খুব দুর্বল। বুদ্ধি মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, সেইজন্য মন তার আবেগকে সামলাতে পারছে না। যার জন্য যারা খুব আবেগপ্রবণ হয় তারা কোন দিন কোন বড় কাজ করতে পারে না। বড় বড় বিজ্ঞানীদের অনেক রকম গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু মনের আবেগ তাদের কখনই নাড়িয়ে দিতে পারবে না। আবেগের উপরে মন, মন আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাগ-দ্বেষকে মন নিয়ন্ত্রণ করছে। ঐ মনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধি। বুদ্ধি বলে দেয় কোনটা করবে আর কোনটা করবে না। বাচ্চাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বাবা-মার সাথে পার্টিতে গিয়ে খাওয়ার সময় বলবে আমি এটা খাবো ওটা খাবো, কিন্তু কোনটাই খেতে পারবে না, না দিলে আবার চিৎকার চেঁচামেচি করে বাবা-মাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। হঠাৎ বলবে আমি প্রস্বাব করব। যেমন যেমন বড় হয় তাকে তেমন তেমন ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখান থেকে মনের উপর নিয়ন্ত্রণ, আর সেখান থেকে বুদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

মন, বুদ্ধ এগুলো সূক্ষ্ম হতে হবে আর ওর সাথে একত্ব বোধ থাকতে হবে। একত্ব বোধ যদি না থাকে কেউ কাজ করতে পারবে না। আমাদের একত্ব বোধ হয়ে আছে শরীরের সাথে, সেইজন্য মনের উপর কারুরই নিয়ন্ত্রণ নেই। যখন মনে হবে আমি শরীর নই, আমি হলাম বুদ্ধি, তখন মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসবে। বুদ্ধির ক্ষমতা মানে, কোথায় মনকে লাগাতে হবে জানা আছে আর কোন জায়গা থেকে মনকে সরিয়ে আনতে হবে সেটাও জানে। এই ক্ষমতা যদি না থাকে জীবনে কোন কিছুতেই সাফল্য আসবে না। এটাই বলছেন, *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্*, ইন্দ্রিয় থেকে মন সূক্ষ্ম, আর মনের থেকে বুদ্ধি আরও সূক্ষ্ম। এই জিনিষটা আমরা দিনরাত দেখছি, জানছি। কিন্তু এরপরে যেটা বলছেন, *সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্*,

এই জিনিষটাকে শাস্ত্রের উপর নির্ভর করেই চলতে হয়। বুদ্ধি থেকে মহৎ আরও সূক্ষ্ম আর মহতের থেকে অব্যক্ত প্রকৃতি আরও সূক্ষ্ম। এটাকে জানা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। একমাত্র যোগীরাই ধ্যানে এই জিনিষটাকে জানতে পারেন। আর ঐ জিনিষটাই যখন শাস্ত্রের মাধ্যমে আসে তখন আমরা জানতে পারি। কি জানতে পারি? ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি থেকে আরও সূক্ষ্ম হল সমষ্টি মন বা মহৎ আর অব্যক্ত প্রকৃতি যিনি ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের সমাহার, তিনি মহতের থেকেও সূক্ষ্ম। সত্ত্ব, রজো আর তমোকে গুণ বলা হয় ঠিকই কিন্তু এগুলো কোন পার্টিকেলও নয়, গুণমাত্র, গুণের আভাস মাত্র, এটাই সূক্ষ্মতম। যার জন্য যিনি প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যান, প্রকৃতিলীন পুরুষ যাঁকে বলা হয়, তিনি সব রকম ক্ষমতা লাভ করেন। কারণ তিনি এতই সূক্ষ্ম হয়ে যান যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বুদ্ধি তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, সমস্ত বুদ্ধির দরুণ সমস্ত মন এবং সমস্ত মনের দরুণ সমস্ত ইন্দ্রিয় আর সেখান থেকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে আসে। এই হল প্রকৃতিলীন পুরুষের পরিচয়। আমাদের ক্ষেত্রে এই শরীরকেই সামলাতে প্রাণ চলে যায়, বৃদ্ধ বয়সে কোন কথা মনে থাকে না, কাজ করতে ইচ্ছে করে না, কাজ করলেও ঠিকভাবে করতে পারে না। কারণ শরীরই সামলাতে পারছে না, ইন্দ্রিয় আর কি করে সামলাবে, যে ইন্দ্রিয়কে সামলাতে পারে না সে মনকে কি করে সামলাবে, যে মন সামলাতে পারছে না সে বুদ্ধিকে কিভাবে সামলাবে। বুদ্ধিকে সামলাতে পারছে না তাই আত্মজ্ঞানও সুদূর পরাহত। এগুলো পর পর এক অপরের থেকে যে সূক্ষ্ম ঐ সূক্ষ্ম ভাব দিয়ে স্থূল জিনিষটাকে ধরে নেয়। অন্য দিক দিয়ে ভাবলে, এই জগতে ব্রহ্মা সবচেয়ে শক্তিমান, প্রকৃতি আর ব্রহ্মা এক। যিনি সূক্ষ্ম তিনিই শক্তিমান হন, স্থূল কখনই শক্তিমান হতে পারে না। পরের মন্ত্রে বলছেন –

অব্যাক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি।।২/৩/৮।।

(সর্বব্যাপী এবং অনুমানের হেতুবিবর্জিত যে পরমাত্মাকে জেনে জীব এই দেহেই মুক্ত হয় এবং দেহান্তে পুনর্বার দেহ প্রাপ্ত হয় না, সেই পরমাত্মা কিন্তু মায়া থেকেও শ্রেষ্ঠ।)

আগেও একই ধরণের একটা মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আলাদা ভাবে একটা জিনিষকে বোঝার আছে। *অব্যাক্তত্তু পরঃ পুরুষঃ*, অব্যক্ত যিনি, প্রকৃতি যিনি তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন পুরুষ বা আত্মা। *ব্যাপকঃ* এবং *অলিঙ্গ* তিনি সব জায়গাতে পরিব্যাপ্ত আর তার সাথে তিনি অলিঙ্গ।

বেদান্তের মতের সাথে অন্য কোন ধর্ম বা দর্শনের মত মিলবে না। এমনকি হিন্দুদের অন্যান্য দর্শনের মতের সাথেও বেদান্ত মেলে না। বিশ্বের সব মত একদিকে আর বেদান্ত যেন একা অন্য দিকে। কারণ, অন্যান্য ধর্মে বস্তু লাভ বলতে অর্থাৎ জ্ঞান লাভের যেটা আসল জিনিষ সেটা যদিও object নয়, অর্থাৎ কারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি নয়, ঈশ্বর বা আত্মা বা ব্রহ্ম বা পুরুষ কোন object নন। দ্বিতীয়া বিভক্তি মানে যার উপর কাজ করা হয়, যেমন আমি জল খাব, জল দ্বিতীয়া, যেহেতু ওর উপর ক্রিয়া করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন ধর্ম বা দর্শনে ঈশ্বরকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয় তাতে মনে হবে ঈশ্বর বা আত্মা object। বলা হয় ঈশ্বর দর্শন করতে হবে, কিন্তু ঈশ্বরই তো সব কিছু দেখছেন, তিনি সাক্ষী, তিনি অন্তর্যামী রূপে আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান। কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের কথা শুনলে কোথাও মনের মধ্যে একটা ধারণা হয়, ঈশ্বর আছেন আর আমি তাঁকে দেখছি। তার মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু রূপে পরিগণিত করতে বলা হল, ঈশ্বর কারকের দ্বিতীয়া হয়ে গেলেন। বিশ্বের যে ধর্মেই যাওয়া হোক না কেন আর আমাদের সাংখ্য, ন্যায় যে দর্শনেই যাওয়া হোক না কেন, মনে হয় ঈশ্বর বা আত্মা যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু, যিনি সেই আসল তিনি যেন কারকের দ্বিতীয়া, object। কিন্তু তিনি তো তা নন।

জহুদি ধর্মে খুব মজার ব্যাপার। জহুদিদের ধর্মে ভগবানের নাম জেহোবা, কিন্তু ঠিক ঠিক যে নাম তা হল Ywh। Ywhর ঠিক ঠিক উচ্চারণ হয় না। জহুদিরাও এটাই বলে Ywh এর উচ্চারণ করা যায় না, তার কারণ ভগবানের নাম উচ্চারণ করা যায় না। কেন ভগবানের নাম উচ্চারণ করা যায় না? কারণ তিনি কোন নাম নন, শুধু ইঙ্গিত করা যায়। আমরা যেমন বলি, ওঁ ঈশ্বরের নাম নয়, ঈশ্বরের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ওঁ বলছি। জহুদিরাও বিশ্বাস করে ভগবানের নাম হয় না, তাই মুখে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যায় না, কিন্তু ইঙ্গিত করা যায়। এই Ywh থেকে অপভ্রংশ হতে হতে ভগবানের নাম হয়ে গেলে জেহোবা। যার জন্য ওরা গড লেখার সময় জি লিখে মাঝখানে একটা ড্যাশ দিয়ে ডি লেখে। জি এর পর একটা হাইফেন দিয়ে ডি লিখে

দিলে কেউ উচ্চারণই করতে পারবে না। বলতে চাইছে তিনি কোন বস্তু নন, বস্তু হলেই তার একটা নাম হবে। যখন বলছি তুলসীদাসের শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন হল, তখন মনে করছি শ্রীরামচন্দ্র একজন আর তুলসীদাস আরেকজন, শ্রীরামচন্দ্র যাদুবলে তুলসীদাসের সামনে এসে গেলেন। ঈশ্বর দর্শন তা নয়, কিন্তু আমাদের সবারই মনে এই ভাবই আসে, যেভাবেই আমরা যাই না কেন ভাব ঐটাই আসে।

সব থেকে উপরে যায় সাংখ্য দর্শন। সাংখ্যে পুরুষ সব কিছু থেকে আলাদা। তখনও পুরুষের কথা যখন ভাবছি তখন ভাবছি পুরুষ একটা আলাদা কিছু আর প্রকৃতি আরেকটা আলাদা কিছু। কিন্তু পুরুষ তা নন, তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞাতা কখনই জ্ঞেয় হবেন না। কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে পুরুষ, ভগবান, আত্মা যেন কারকের দ্বিতীয়া হয়ে যান। বেদান্তের যিনি আত্মা তিনি theoretically practically সব সময় subject বা কর্তা। সাংখ্যের পুরুষও কর্তা, জহুদিদের ভগবান, মুসলমানদের আল্লাও কর্তা বা subject এনারা কেউই কারকের দ্বিতীয়া নন। কিন্তু presentation এমন ভাবে হয় মনে হয় তিনি যেন একটা object বা কারকের দ্বিতীয়া। বেদান্তে আত্মাকে কক্ষণ ঐভাবে হতে দেবেন না। হয় বলবেন তিনি কর্তাও নন কর্মও নন আর তা নাহলে বলবেন তিনি সনাতন কর্তা বা Eternal Subject।

এই মন্ত্র বেদান্তের কিন্তু বলছেন সাংখ্যের মত। কি রকম সাংখ্যের মত বলছেন? ইন্দ্রিয় থেকে সূক্ষ্ম মন, মন থেকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকে সূক্ষ্ম মহৎ, মহৎ থেকে সূক্ষ্ম অব্যক্ত প্রকৃতি আর প্রকৃতিরও পারে সেই পুরুষ। এটাই যোগের ভাব। যোগও আত্মার কথা বলছে, বেদান্তও আত্মার কথা বলছে, দুজনে একই আত্মার কথা বলছে। যোগের ক্ষেত্রে যাত্রা আত্মার দিকে, একটার পর একটা মনের বৃত্তিকে শান্ত করতে করতে এগোচ্ছে, শেষে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। বেদান্তে তা হয় না, বেদান্ত মতে যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনিই কর্তা, কিন্তু তাঁর উপর অনেক আবরণ পড়ে গেছে, সব আবরণগুলো সরানো হচ্ছে, এখানে যাওয়া-আসার কোন ব্যাপার নেই। বেদান্ত ছাড়া বাকি সব ধর্মে ও দর্শনে যাওয়া-আসার ব্যাপার আছে। অন্যান্য ধর্মে সাধনা মানে উপলব্ধি। বেদান্তে কোন উপলব্ধি হয় না, বেদান্তে হয় অনুপলব্ধি, যত আলতু-ফালতু জিনিষের আমাদের উপলব্ধি হয়ে চলেছে এগুলোকে বন্ধ করা। ব্যাপারটা একটু কঠিন মনে হবে, কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারটা ধরতে না পারলে যোগ আর বেদান্তের তফাৎ ধরা যাবে না। প্রত্যেকটি ধর্মের যিনি তত্ত্ব, বস্তু যিনি তিনি অবশ্যই subject বা কর্তা। তিনিই আসল মালিক। কিন্তু যেমনি মালিক শব্দটা আমরা ধরে নিচ্ছি তখনই মনে হবে আমি আছি রাজা আছেন, তিনি ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান, তিনি আমাকে দেখছেন আমিও তাঁকে দেখছি। কথামৃতের পাতায় পাতায় ঠাকুর বলছেন ভগবান তাঁর ভক্তকে দেখেন। তাহলে কিন্তু ভগবান কারকের দ্বিতীয়া অর্থাৎ object হয়ে যান। ভগবান তা নন, তিনি সাক্ষী, তিনি সাক্ষী রূপে সব দেখছেন। যে ধর্মেই আমরা যাই না কেন আমাদের অস্তিত্ব বলে কোথাও কিছু নেই। কিন্তু আমাদের মত মানুষরা ঈশ্বরের দিকে এগোতে চাইছি, আমাদের কাছে তিনি একটা বস্তু, আমি একটা বস্তু আর আমি যেন তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই সাধনাও সত্য, আমিও সত্য আর ঠাকুরও সত্য। বেদান্ত এই জিনিষ কখনই মানবে না, বেদান্তে ঠাকুরই সত্য বাকি সব মিথ্যা। সেইজন্য কেউ কোথাও এগোয় না, কোন উপলব্ধিরও কিছু নেই, কোন কিছুকে ধরাও হয় না, ধরার বদলে ছাড়া হয়। উপনিষদ আসার পর তাঁরা এই দুটোকে মিশিয়ে দিয়েছেন। যোগের পথ কোন ভুল পথ নয়, যোগের আত্মা আর বেদান্তের আত্মার মধ্যে কোন তফাৎ নেই, শুধু সাধনায় তফাৎ। যোগে সবিচার, সবিতর্ক, সানন্দা, সাস্মিতা বিভিন্ন রকম ধ্যানের কথা বলা হয়েছে, যখন ইন্দ্রিয়ের উপর ধ্যান করে একাগ্র হচ্ছে তখন এক রকম ধ্যান, মনের উপর যখন ধ্যান করে তখন এক রকম ধ্যান, প্রকৃতির উপর যখন ধ্যান করছে তখন আরেক রকম ধ্যান। তার মানে উপলব্ধি ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে, শেষে যখন প্রকৃতির সাথে এক হয়ে গেল তখন আরেক রকম। এরপর প্রকৃতিকেও যখন ছেড়ে বেরিয়ে গেল তখন নিজের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে গেল। যোগে প্রথমেই বলে দিচ্ছে *তদাদ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থানম্*, যোগী তখন নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। যোগ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, কিন্তু আমরা ধারণা করছি, তিনি ইন্দ্রিয় জগৎকে জয় করছেন, মনের জগৎকে জয় করছেন, প্রকৃতিকে জয় করছেন, এইভাবে নদীতে সাঁতরে সাঁতরে যেন একটা জায়গায় গিয়ে তাঁর নিজের স্বরূপে অবস্থিত করছেন। বেদান্ত এভাবে কখনই যাবে না। বেদান্ত বলবে, সেই শুদ্ধ আত্মার উপর আবরণ পড়ে আছে, এই আবরণ সরানোটা আলোর উপর থেকে আবরণ সরার মতও নয়। তুমি এই টেবিলকে নিজে ধরে আছ আর বলছ টেবিলের জন্য তুমি ওদিকে যেতে পারছ না। বেদান্ত বলছে তুমি টেবিলকে আগে ছেড়ে দাও। তুমি মনে

করছ তোমাকে টেবিলের সাথে বেঁধে রেখেছে, কেউ বেঁধে রাখেনি, তুমি নিজে ধরে আছ। টেবিলটা তোমাকেই ছাড়তে হবে। জগৎ থেকে বেরিয়ে ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার যে সাধনার কথা বলা হয়, এটা তাও নয়। এখানে উল্টো, তুমি জগৎকে আঁকড়ে ধরে আছে, তুমি ছেড়ে দিলেই হল। ছেলেরা যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে শুরু করে তখন তাকে একজন যদি ধরে নেয় তখন বলে, আমাকে তুই ছেড়ে দে ওকে আমি দেখে নেব। ও জানে ছেড়ে দিলে বেচারা মার খেয়ে যাবে, তুই আমাকে ছাড়, আসলে বলতে চাইছে তুই আমাকে ছাড়িস না। আমাদেরও একই দুরবস্থা, আমরা ছাড়তে চাই না।

এই মন্ত্রটি আসলে বেদান্তের মন্ত্র, কিন্তু উপস্থাপনা করা হচ্ছে যোগের ভাবে। পর পর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, মহৎ, প্রকৃতি বলার পর বলছেন *অব্যাক্তাত্তু পরঃ পুরুষো*। মনে হবে যেন উপলব্ধি করে করে পুরুষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু জিনিষটা তা নয়। সাধন পথ আলাদা আলাদা, সেইজন্য এভাবে বলা হচ্ছে। আমরা যাতে ভুলে একে object না মনে করি, তাই বলছেন *ব্যাপকঃ*, ইনি সর্বব্যাপী। সর্বশক্তিমান যখন বলা হয় তখন মনে করছি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তিনি স্বর্গে বসে আমার ইচ্ছা থেকে শুরু করে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তার মানে তিনি একজন আমি আরেকজন। ঠাকুর যেমন বলছেন, কখন তিনি চুম্বক ভক্ত ছুঁচ, আবার কখন ভক্ত চুম্বক আর তিনি ছুঁচ, এক অপরকে টানছেন। ঠাকুরের এই কথায় প্রথম ধারণা হবে একজন subject আরেকজন object। কখন তিনি subject আমি object আবার কখন আমি subject তিনি object। ঠাকুর কখনই এই কথা বলতে চাইছেন না, একটা জিনিষকে বোঝানর জন্য এভাবে বলা হয়। বেদান্তের সাথে অন্যান্য দর্শনের বড় তফাৎ এখানেই হয়। কথামৃতও যদি ঠিক ভাবে পড়া না হয়, সেখানেও মনে হবে ঈশ্বর কোথাও গিয়ে যেন object হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি তা নন, তিনি সনাতন, তিনিই আছেন। তিনি subject নন objectও নন, subject থাকলে একটা objectকেও থাকতে হবে। কর্তা থাকলেই ক্রিয়া হবে, ক্রিয়া থাকলেই দ্বিতীয়ার কর্ম থাকবে। সব ধর্মে ঈশ্বর subject কিন্তু বেদান্তে subject object কোনটাই নন। তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, তিনি কার উপর কাজ করবেন! কাজ করার জন্য তাঁকে একটা স্পেস দিতে হবে। আমি আর গ্লাশ যেমন আলাদা, আলাদা বলেই আমি গ্লাশকে ধরতে পারছি। ভগবান আলাদা আর সৃষ্টি আলাদা হলে তবেই ভগবান সৃষ্টির উপর কাজ করবেন। কিন্তু ভগবান আর তাঁর সৃষ্টি আলাদা নয়, ভগবানই আছেন, ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই, সেইজন্য তিনি subjectও নন objectও নন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী বিশ্লেষণাত্মক ভাব দেখলে, খ্রীষ্টানদের গড্, মুসলমানদের আল্লা, জহুদিদের জেহোবার সাথে শ্রীকৃষ্ণের খুব বেশি তফাৎ পাওয়া যাবে না। একটু একটু যে তফাৎ আছে সেটা আহামরি কিছু নয়। কিন্তু বেদান্তের সাথে বাকি কারুর কোন মিল নেই। অথচ এটাই আশ্চর্যের যে সব ধর্ম একই কথা বলছে। কিন্তু সাধন পদ্ধতি আর উপস্থাপনাতে এত বেশি তফাৎ যে, কোথাও কোন মিল থাকে না। বৈষ্ণব ধর্মের সাথে অন্যান্য সব ধর্ম মিল পাওয়া যাবে কিন্তু বেদান্তের সাথে কিছুতেই মিলবে না। এটাকেই এখানে বলছেন, তুমি ভুলে বুঝে নিও না যে তিনি object, তিনি *ব্যাপকঃ*, সর্বব্যাপী তিনি। যিনি সর্বব্যাপী তাঁর আর object আসবে কোথা থেকে, এটাই বেদান্ত। কিন্তু এই জায়গাতে নিয়ে আসার জন্য তাঁরা যোগের ভাব অবলম্বন করে বললেন ইন্দ্রিয় থেকে সূক্ষ্ম মন, মন থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে প্রকৃত আরও সূক্ষ্ম। তাহলে পুরুষ হলেন সবচেয়ে সূক্ষ্ম। আমদেরও এই ধারণা যে, এই দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন এইভাবে আত্মা একটা ছোট্ট আলোর বিন্দুর মত ভেতরে বসে আছেন, মৃত্যুর পর যিনি দেহ থেকে বেরিয়ে যান। এটা কোন পুরনো ধারণা নয়, সমস্যা হল এই ধারণা আজও বহাল তবিয়তে অনেকের মধ্যেই বিরাজ করছে।

তার সাথে বলছেন, *অলিঙ্গ এব চ*। লিঙ্গ মানে যেটা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, শরীরে এমন কিছু কিছু ধর্ম আছে যে ধর্ম দ্বারা চিহ্নিত করা যাচ্ছে এ পুরুষ সে নারী। এখানে লিঙ্গ মানে পুরুষ স্ত্রী অর্থে বলা হচ্ছে না, তিনি পুরুষও নন স্ত্রীও নন সেই অর্থেও অলিঙ্গ বলছেন না। শিবলিঙ্গ মানে যেটা দিয়ে শিবকে চিহ্নিত করা হয়। বিদেশীরা লিঙ্গের অর্থ অন্য করতে গিয়ে জিনিষটার গুরুত্বকে অনেক খাটো করে ফেলেছে। বলছেন তিনি অলিঙ্গ, একটা জিনিষকে জানা যায় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে, যেমন শিং দেখে, লেজ দেখে বোঝা যায় এটা গরু। এরপর গরু আর বলদের তফাৎ করার জন্য অন্য লিঙ্গকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু লিঙ্গ সচরাচর ব্যবহার করা হয় এমন একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে যেটা দিয়ে জিনিষটাকে সঙ্গে সঙ্গে

বুঝিয়ে দেওয়া যায়। আত্মার এমন কোন লিঙ্গ নেই যেটা দিয়ে এই জগতে তাঁকে আলাদা করে কোন কিছু দিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ তাঁর না আছে ইন্দ্রিয়, না আছে মন বা বুদ্ধি। সেইজন্য বলছেন তিনি অলিঙ্গ, তাঁকে জানার কোন পথ নেই। ভাগবতাদি গ্রন্থে ঈশ্বরের বর্ণনা করতে গিয়ে যে বলছেন, ভগবান শেষনাগে শয়ন করে আছেন, শ্রীকৃষ্ণ বংশী ধারণ করে আছেন, যাতে আমরা সহজে ধারণা করতে পারি, চিন্তন করতে পারি। কিন্তু ভগবানের কখনই এই ধরণের রূপ হতে পারে না। তার কারণ তিনি ব্যাপক ও অলিঙ্গ। কিন্তু আমরা হলাম মোটা বুদ্ধির লোক, এই বুদ্ধি দিয়ে কোন রকমে সগুণ সাকারই চিন্তা ভাবনা করা যায়, এর বাইরে চিন্তা করা সম্ভব না। যিনি ব্যাপক, যিনি অলিঙ্গ তাঁকে ধরা যায় না। এখানে তাই সাবধান করে দিচ্ছেন, পর পর সূক্ষ্মের কথা বলা হচ্ছে বলে তুমি ভুলে মনে করো না যে, মন, বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম তিনিও এই রকম এদের থেকেও সূক্ষ্ম কোন জিনিষ। ইনি ব্যাপক ও অলিঙ্গ। আশ্চর্যের এটাই, যে জিনিষ যত সূক্ষ্ম সেই জিনিষ আরও বৃহৎ, সূক্ষ্ম ভাবে ছড়িয়ে আছে, তার থেকে স্থূল জিনিষকে সে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর প্রকৃতিরও বাইরে সেই আত্মা, যিনি সব কিছুতে প্রবেশ করে আছেন।

একটা সার্কেলের মধ্যে পাথর রয়েছে, সেই সার্কেলের বাইরে বালি আছে, তারও বাইরে জল, তারও বাইরে বাতাস, তার বাইরে আকাশ সব কিছু খোলা। আকাশের পাথর পর্যন্ত অবাধ গতি, কিন্তু আকাশকে ধরা যায় না, কারণ যা দিয়ে ধরবে সেটা আকাশের থেকে স্থূল। পাথর বালির সার্কেলে যেতে পারবে না, কিন্তু বালি পাথরের সার্কেলে যেতে পারবে। বালি জলের দিকে যেতে পারবে না, কিন্তু জল বালিতেও যেতে পারবে আবার পাথরেও যেতে পারবে। এবার দুটো পাথরের মাঝখানে খুঁজতে গেলে বালিই পাওয়া যাবে। ঐ পাথরের মধ্যেই বালি, বালির আরও সূক্ষ্মে জল আছে আর দুটো জল পার্টিকেলসের মাঝখানে বাতাস আছে, দুটো বাতাস পার্টিকেলের মাঝখানে আকাশ আছে। বাইরে সেই অনন্ত আকাশ, অনন্ত এখানে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে, আকাশ সেই অর্থে অনন্ত হয় না। আত্মা অনন্ত। আত্মা কোথায় আছেন? যত ভেতরের দিকে যাওয়া যাবে তত আত্মার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যত সূক্ষ্মের দিকে যাওয়া যাবে আত্মা তত বেশি বৃহৎ ভাবে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছে। যত মনের দিকে ভেতরের যাচ্ছি বা যত সূক্ষ্মের দিকে যাচ্ছি আমরা মনে করছি ভেতরের দিকে গেছি, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না যে, আরও বাইরের দিকেই যাচ্ছি। যে যত সূক্ষ্ম সে তত ভেতরে প্রবেশ করে থাকে, কিন্তু বাইরে আরও বেশি সে ঘিরে রেখেছে। ধ্যানের গভীরে যাওয়া মানেও তাই, ভেতরে যাওয়া মানেই আমাদের ঐ জিনিষটা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আমরা মনে করছি একটা বড় কৌটা, সেই কৌটার মধ্যে আরেকটা কৌটা, ঐ কৌটার মধ্যে আরেকটা কৌটা আর তার মধ্যে একটা জিনিষ লুকানো আছে, আমাদের কাছে আত্মাও যেন ঐভাবে আছেন। কিন্তু তা নয়।

এবার কতগুলি ধাপ এসে যাচ্ছে, আমরা বাতাস, আকাশ ছেড়ে দিয়ে শুধু পাথর, বালি আর জলকে নিচ্ছি যাতে ভালো করে বুঝতে পারি। পাথর যদি বালির কণাকে বুঝতে যায় কোন দিন সে বুঝতে পারবে না, কারণ ছোট জিনিষ দিয়ে বড়কে জানা যায়, বড় দিয়ে ছোটকে জানা যায় না। আধ্যাত্মিক জীবন মানে এটাই। উপমা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে, পাথর হল আমাদের দেহ আর ইন্দ্রিয়। এই দুটো দিয়েই আমাদের সব কাজ চলে যাচ্ছে, সবাই তাই এই দুটো দিয়ে খুশী। এবার যদি জানতে চাই দেহ আর ইন্দ্রিয়ের পেছনেও কে আছে। পাথরের পেছনে পাথরের ছোট টুকরো বা বালি আছে, এই করে করে শেষে গিয়ে দেখছে এর পেছনে আছে জল। এবার সে খুশী, কারণ আমার যে অস্তিত্ব তার মূল আমি পেয়ে গেছি। সেখান থেকে আরেক ধাপ এগোলে দেখবে অন্য যে বালি কণা আছে তারও মাঝখানে সেই জলই আছে। তখন বলবে আমি বিশেষ কিছু নই, যে জল আমার মাঝখানে সেই জল তোমার মাঝখানেও আছে। আর ওখান থেকে বেরিয়ে বাইরে দেখতে গেলে দেখবে আরে এত দেখছি মহাসমুদ্র শুধু জলই আছে, জল ছাড়া আর কিছু নেই। আত্মজ্ঞান ঠিক তাই। দেহের পেছনে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের পেছনে মন, মন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে ছেয়ে আছে, মনের মাঝখানে যে ফাঁক সেখানে বুদ্ধি ছেয়ে আছে, বুদ্ধি আরও সূক্ষ্ম, এইভাবে বুদ্ধির পেছন মহৎ আর মহতের পেছনে অব্যক্ত প্রকৃতি। ধ্যান করে যে জিনিষকে আমি উপলব্ধি করে জানতে পারছি, ঐ জিনিষটাই বাইরেও সেইভাবে ঘিরে রেখেছে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন চিদাকাশ, চিদাকাশ মানে মনের আকাশ। এই চিদাকাশ বাইরের এই আকাশকে পুরো ঘিরে রেখেছে। আর সব কিছুর বাইরে সেই আত্মা সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে।

বলছেন *যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি*, যে ব্যাপক ও অলিঙ্গের কথা বলা হল, এটাকে যখন জেনে যাবে তখন সমস্ত সংসারধর্ম থেকে তার মুক্তি হয়ে যাবে। আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করে তিনি জীবদ্দশায় অবিদ্যা আদি থেকে মুক্তি পেয়ে যান আর অমর হয়ে যান। পাথর, বালি, জল হল জগতের উপমা, কিন্তু এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এগুলোকে অন্য ভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যিনি সর্বব্যাপী আত্মা, যিনি অলিঙ্গ, তিনি অব্যক্তের মধ্যেও ওতপ্রোত হয়ে আছেন। প্রকৃতি মিশে রয়েছে মহতে, আত্মা, প্রকৃতি ও মহৎ মিশে রয়েছে বুদ্ধির সঙ্গে, এই চারটে মিশে আছে মনের সঙ্গে আবার এই পাঁচটা মিশে আছে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আর শেষে এই ছটি মিশে রয়েছে দেহের সঙ্গে। এর মধ্যে সব থেকে ভোঁতা হল দেহ। স্থূল দেহকে ছেড়ে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে পেছনের দিকে যেতে শুরু করবে। কিন্তু এখানে ধ্যানের গভীরে পেছনের দিকে যাচ্ছে, বহির্জগতে এর ঠিক উল্টোটা হয়। সে তখন বৃহৎ থেকে আরও বৃহৎ হতে থাকে। বলছেন, যখন তুমি জেনে যাবে ভেতরে যিনি তোমার আত্মা তিনিই বহির্জগতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, ওখানে যিনি অন্তরতম বাইরে তিনিই শ্রেষ্ঠতম, তখনই তোমার অমরত্ব হয়ে যাবে। যখন জেনে গেল ভেতরে ঐ আত্মা আছেন বলেই এত সব কিছু হচ্ছে, তখন দেখে ভেতরে যিনি সূক্ষ্মতম তিনিই বাইরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, সব কিছুতে তিনিই আছেন। এটাই বলছেন *যৎ পিণ্ডাণ্ডে তৎ ব্রহ্মাণ্ডে*, পিণ্ডের যা সারতত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের সারতত্ত্ব সেই একই। *যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি*, এখানে আচার্য বলছেন, *যং জ্ঞাত্বা আচার্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ*, গুরু যেমন শাস্ত্রের কথা বলছেন, আচার্য যেমন বলেছেন ঐভাবে জেনে যে এটাকে উপলব্ধি করেছে, *অমৃতত্বং চ গচ্ছতি*, জীবদ্দশাতেই অবিদ্যাদি হৃদয়গ্রন্থি থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় আর এই শরীরের পতন হয়ে যাওয়ার পর সে অমর হয়ে যায়। অমর হয়ে যাওয়া মানে তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

ঠাকুর বলছেন পেঁয়াজের খোসা, খোসা ছাড়ালে আরেকটা খোসা, সেই খোসাকে ছাড়ালে আবার খোসা। এই দেহটাও একটা খোসা, ইন্দ্রিয় একটা খোসা, মন আরেকটা খোসা। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে দেখে কিছুই নেই। এটা একটা উপমা ঠিকই কিন্তু এই উপমা আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বকে ধারণা করতে অনেক সাহায্য করে। পেঁয়াজের খোসা উপমা, খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ভেতরে গিয়ে দেখছি কিছু নেই, দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, ভেতরে আর কিছু নেই। এই যে 'কিছু নেই' বলছেন, এই 'কিছু নেই' এটাকেই বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সিদ্ধ পুরুষরা বিভিন্ন ভাবে বলেন। বৌদ্ধরা বলছেন শূন্যবাদ, কিছু নেই, ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার পর আর কিছু থাকে না। আবার অনেকে বলছেন যা আছে মুখে বলা যায় না। জহুদিরা বলছে ভগবানের নাম উচ্চারণ করা যায় না, সেইজন্য তাঁদের ভগবানকে তাঁরা বলছেন Ywh, যেটাকে কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না। ভক্তরা বলছে, এটাই আসল যা সব কিছুকে ধারণ করে আছে। বেদান্তীরা আরেক ধাপ এগিয়ে বলে, যে জায়গাটা যেখানে কিছু নেই বলছে, এটা যেমন পেঁয়াজের ভেতরে এটাই আবার পেঁয়াজের বাইরেও, এটাই সব কিছুর ভেতরে এটাই সব কিছুর বাইরে। বেদান্ত তাঁকেই আত্মা বা ব্রহ্ম বলছে। কিন্তু ঐ পেঁয়াজের খোসা থেকে 'কিছু নেই' অবস্থায় যাওয়ার যাত্রা পথটাই খুব কঠিন।

পেঁয়াজে না হয় পাঁচটা খোসা, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে দেখলে খুবই হাস্যকর মনে হবে। 'আমি দেহ' থেকে যাত্রা শুরু, যাত্রা শেষ হয় 'আমি আত্মাতে' গিয়ে। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত আমার যে এত কোটি কোটি জন্ম হয়েছে, আরও কত জন্ম গ্রহণ করতে হবে শুধু একটা ছোট্ট জিনিষকে জানার জন্য। কি জানা? আমি দেহাত্মা নই আমি প্রত্যগাত্মা, ভেতরের এই ছোট্ট এটুকু জানতে কোটি কোটি বার দেহধারণ করতে হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা বলেন আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয় অধ্যক্ষ মহারাজের বাসস্থান থেকে আর শেষ হয় তার তিন পা দূরেই যে শ্মাশান সেখানে। সন্ন্যাসীর দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস ঐ বাড়ি থেকে শুরু হয় আর তিন পা দূরে যে শ্মশান সেখানে গিয়ে সব শেষ হয়। মাঝখানে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চরকির মত ঘুরে যাচ্ছেন। এটুকু সময়ে কত কি হচ্ছে, এর সাথে ভালোবাসা, ওর সাথে মনোমালিন্য, এখানে পোস্টিং, ওখান থেকে ট্রান্সফার, এখানে ওখানে কত লেকচার, কত সেমিনার। সব করে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সময় অধ্যক্ষ মহারাজের ঘর থেকে তিন পা দূরে সব কিছুর সমাপ্তি। টলস্টয়ের কাহিনীতে বলছেন মানুষের জন্য তিন হাত জমি দরকার। তার জন্য কত কি করতে হচ্ছে। এগুলো কাহিনী নয় এটাই বাস্তব। ভগবান সৃষ্টি করে আমাদের মধ্যে দেহের বোধ দিয়ে দিলেন। আর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা জানতে চাইছি আমি দেহ নই আমি আত্মা, আমি আত্মা মানে এই দেহকে খসিয়ে দেওয়া। আমি দেহাত্মা, দেহকে সরিয়ে দিলে থাকে আমি আত্মা

– এটাই আমাদের দীর্ঘ আধ্যাত্মিক যাত্রা। একটি বাক্যের তিনটে শব্দের ‘দেহাত্মা’ থেকে শুধু একটা ‘দেহ’ শব্দকে বাদ দেওয়ার জন্য কোটি কোটি জন্ম লেগে যাচ্ছে, যার মধ্যে কখন আমি মশা হয়েছি, কোন জন্মে পিঁপড়ে হয়েছি। এটা কোন কাব্য নয়, কোন কল্পনা নয়, কোন উপমা নেই, এটাই বাস্তব। যিনি শুদ্ধাত্মা তিনি মনে করছেন আমি দেহাত্মা। আত্মজ্ঞান মানে, শুধু ‘আমি দেহাত্মা’ এই বাক্য থেকে দেহটাকে সরিয়ে দেওয়া, এছাড়া আর কিছু না। এর থেকে আশ্চর্যের আর কী হতে পারে! জ্ঞান আর অজ্ঞানের মধ্যে শুধু একটা ‘অ’এর তফাৎ। এত শাস্ত্র, এত সাধনা, এত কিছু শুধু এই সামান্য একটা ‘অ’কে সরাবার জন্য। দুটি মন্ত্রে ঠিক এই কথাই বলছেন। তোমাকে বলে দেওয়া হল তুমি দেহ নও, তুমি ভাববে তাহলে আমি কি? আমি কি, এর উত্তর খুঁজতে নেমে পড়া মানে এবার তোমার পেঁয়াজের খোসা সরান শুরু হল। যেমন যেমন খোসা ছাড়ানো হবে তেমন তেমন সূক্ষ্মের জ্ঞান হবে।

ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, মন্দের ভালো। মন্দের ভালো মানে, এই কথাগুলো শোনার পর আমাদের খুব ভালো লাগল। ভালো লাগার পর আমি মনে করছি, আমি তো আর কামিনী কাঞ্চনে জড়িয়ে নেই, আমার কাছে যা টাকা-পয়সা থাকার আছে, অপরের টাকা-পয়সার প্রতি তো কোন লোভ করছি না, সৎ ভাবে আছি আর ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে আছি। এটা হল তমোগুণের পরাকাষ্ঠা, এর থেকে ঘোর তমোগুণ আর হতে পারে না। ভালো সাধু মানে, সকালে মঙ্গলারতিতে যাবেন, শাস্ত্র পাঠ করবেন, অফিসে কাজকর্ম করবেন, সবার সাথে মিষ্ট ব্যবহার করবেন। এগুলো সব মন্দের ভালো, আলস্যে সময় কাটানোর থেকে অনেক ভালো। সাধুর জীবনের উদ্দেশ্য কখনই তা নয়। স্বামীজী বলছেন, যে আধ্যাত্মিক পুরুষ নয় সে হিন্দু নয়। ভালো হিন্দু বলে কিছু হয় না। হিন্দু মানেই সে অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবিদ্যা সম্পন্ন। যদি ব্রহ্মবিদ্যা না থাকে, জীবনমুক্ত যদি না হয়ে থাকে তাহলে তার হিন্দুত্বের কোন দাম নেই। এর বাইরে উনিশ আর কুড়ি, কেউ একটু এগিয়ে কেউ একটু পিছিয়ে তাতে বিরাট আহামরি করার মত কিছু নেই। যে আজ একটু এগিয়ে আছে কালই সে হয়ত পিছিয়ে যাবে, আজ যে পিছিয়ে আছে কালই হয়ত সে এগিয়ে যাবে। কিন্তু যিনি অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পন্ন, ব্রহ্মবিদ্যা সম্পন্ন ঐ অবস্থায় গিয়ে তাঁর আর এগনো পেছনোর কিছু থাকে না।

স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়াই অত্যন্ত কঠিন। এটাই এই দুটি মন্ত্রে বলছেন, সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মে যাও। এই লড়াইয়ে হাজার বার তুমি বিফল হবে, যত বারই বিফল হওনা কেন আবার তুমি উঠে দাঁড়াবে, এটাকে কিছুতেই ছাড়বে না, আত্মজ্ঞানই আমার উদ্দেশ্য। সমস্যা হল, আমরা খুব সাধারণ যে চিন্তা-ভাবনা নিয়ে চলি তা হল, শাস্ত্র শুনে বুঝেছি আত্মজ্ঞান মানে ঈশ্বর দর্শন, আর ঈশ্বর দর্শনের সব থেকে সহজ পথ হল, সৎ জীবন-যাপন করছি, ঠাকুরের নাম করছি, ধ্যান করছি, ঠাকুর কৃপা করবেন, ঠাকুর দর্শন দেবেন, এতে আহামরির কি আছে! যে তুমি একটা পাথর ছিলে পাথরই হয়ে থেকে যাবে। ঠাকুর গরুর উপমা দিচ্ছেন, যে গরুর লেজে হাত দিলেই শুয়ে পড়ে, সেই গরু কেউ কিনতে চায় না। ভক্ত মানেই তাই, ভালো মানুষ মানেই তাই, লেজে হাত দিলেই শুয়ে পড়বে। ভালো মানুষ মানে দেহকে পেরিয়ে ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করছে। কিন্তু যোগীদের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে, সেখান থেকে তাঁদের মনের উপরেও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এসে যায়। এই করে করে শেষে *অমৃতত্বং চ গচ্ছতি*। অমৃতত্বং কখন পায়? যখন জানতে পারে সেই পুরুষ *ব্যাপকঃ* আর *অলিঙ্গ*। সমস্যা হল এটা অলিঙ্গ, এর কোন চিহ্ন নেই, চিহ্ন না থাকার জন্য জানার কোন পথ নেই। জলের যেমন না আছে কোন স্বাদ, না আছে কোন গন্ধ। হাইড্রোজেন গ্যাসেরও তাই, তার না আছে কোন গন্ধ, না আছে কোন রঙ কিছুই নেই।

একেই তিনি অলিঙ্গ আবার অব্যক্তেরও পারে, এই জায়গায় এসে সমস্যা হতে শুরু হয়। আবার একটা খুব সহজ উপমা নেওয়া যেতে পারে, ধরুন পেঁয়াজের মাঝখানে কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে। একটি ব্যাকটেরিয়ার জানার সখ হল সব কিছুর মূলে কি। তখন তাকে বলা হল, পেঁয়াজের যত খোসা আছে এগুলো একটা একটা করে পার করে যাও তাহলেই জানতে পারবে। সে ঐ জায়গাতে গেল, এবার তাকে বোঝাচ্ছে ঐ জায়গাতে যে কিছু নেই দেখছ, এটাই আসল। আমাদের যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এর বাইরেও তাই। সে বলছে, এখানে তো কিছু ছিল না, পেঁয়াজের কোন রকম ধর্ম ওখানে তো পাচ্ছি না, ধর্ম না থাকার জন্য কিছু জানা গেল না।

পেঁয়াজের উপমা নিচ্ছি বলে ধর্ম বলছি। কিছুই যখন জানা যাচ্ছে না তার মানে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, আত্মা বলে কিছু নেই। কারণ তার কোন লিঙ্গ নেই, জানার কোন পথ নেই। তখন উপনিষদ পরের মন্ত্রে বলছেন –

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।২/৩/৯।।

(এর রূপ দৃষ্টির গোচর হয় না। একে কেউই চক্ষু দ্বারা অনুভব করতে পারে না। এই আত্মা যখন মননরূপ সম্যগ্‌দর্শন সহায়ে অভিপ্রকাশিত হন, তখন তিনি হৃদয়ে অবস্থিত বিষয়-কল্পনা-শূন্য বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধ হন। যাঁরা উক্ত আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানেন, তাঁরা অমর হন।)

অলিঙ্গ, তাঁকে জানা যায় না। যার মধ্যে প্রকাশ রয়েছে তাকে চক্ষু জেনে যাবে, যার শব্দ আছে তাকে কান জেনে যাবে, যার গন্ধ আছে তাকে নাক জেনে যাবে। এগুলোই বস্তুর লিঙ্গ। যাজ্ঞবল্ক্যের একটা সংলাপে বলছেন যখন দিনের আলো থাকে না তখন কিভাবে দেখে, বলছেন চন্দ্র, তারার আলো দিয়ে দেখে। যখন চন্দ্র তারাও থাকে না তখন কিভাবে দেখে? তখন কান দিয়ে জানে। এভাবে একটার পর একটা চলছে। যখন কিছুই নেই তখন আত্মা দিয়ে দেখে। আত্মতত্ত্ব, এর কোন লিঙ্গ নেই, সেইজন্য বলছেন *ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য*, এর কোন রূপ নেই যেটা আমাদের দৃষ্টিতে গোচর হবে। রূপ থাকলে আমরা জানতে পারি জিনিষটা কি, রূপ থাকলে অন্য জিনিষের সাথে তুলনা করতে পারি, রূপ থাকলে কবিতা রচনা করতে পারি, গান করতে পারি, অপরকে বর্ণনা করতে পারি। কিন্তু আত্মার কোন রূপ নেই তাই চক্ষু দিয়ে তাঁকে দেখা যায় না। এখানে চক্ষু বলে দেওয়ার পর সব ইন্দ্রিয়কেই ধরে নিতে হবে। কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই আত্মাকে জানা যায় না।

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চৈনম্, চেষ্টা করে যে দেখব তাও সম্ভব নয়, নিজে থেকে যে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থির হয়ে যাবে সেটাও সম্ভব নয়। অনেক সময় হঠাৎ করে আমাদের চোখে পড়ে যায়, আবার অনেক সময় আমরা নিজেরাই কোথায় আছে দেখার জন্য খুঁজে বেড়াই। আত্মা হঠাৎ করে নিজে থেকেও চোখে পড়ে যান না আর চেষ্টা করেও তাঁকে দেখা যায় না। মূল বক্তব্য হল আত্মাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে কোন ভাবেই জানা যায় না। অলিঙ্গ বলে দিলে সমস্যা হয় যে, মনে হবে যে আদপেই কিছু নেই। উপনিষদ সাবধান করে দিচ্ছেন, অলিঙ্গ মানে আত্মাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, তাই বলে তুমি এই সিদ্ধান্ত নিও না যে আত্মাকে জানা যাবে না। আত্মাকে অবশ্যই জানা যায়। কিভাবে জানা যাবে? সেটাই এবার পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, হৃদয়স্থিত বুদ্ধির কথা বলছেন। আমরা অনেক সময়ই বলি তাঁর কথা হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় বা বলি মর্মস্পর্শি। যদিও কাব্যিক অভিব্যক্তি, কিন্তু যে কোন ইমোশান মনেতেই থাকে, মনের জন্য ইমোশানের ধাক্কাটা হৃদয়ে বোধ হয়। রাগ, অভিমানে রক্ত প্রবাহের তারতম্যের ফলে আমরা বুকে ব্যাথা অনুভব করি। খুব সাধারণ কাজ আমাদের মস্তিষ্ক দিয়েই হয়ে যায় কিন্তু সূক্ষ্ম কাজ হৃদয় দিয়ে হয়। যেমন সংবেদনশীলতা, গরীবের প্রতি করুণার ভাব, ভগবানের প্রতি ভক্তি এই ধরণের যে কোন সূক্ষ্ম আবেগ হৃদয় থেকে হয়। সত্যিই কি হৃদয় থেকে হয়? মূলতঃ সব মস্তিষ্ক থেকেই হয়। কিন্তু যখনই হৃদয় দিয়ে কিছু করার কথা বলা হয়, তখন এর অর্থ দৈনিন্দীন জীবনে আমরা যে ধরণের আবেগ নিয়ে চলি এটা তা নয়, এটা সূক্ষ্ম জিনিষ। সূক্ষ্ম ভাবকে বোঝাবার জন্য সব সময় হৃদয় শব্দকে নেওয়া হয়। হৃদয় দিয়ে কিছু অনুভূত হওয়া বলা মানে একটা সূক্ষ্ম ভাবের কথা বলা হচ্ছে। এখানে বলছেন যে মন হৃদয়ে অবস্থিত, এখানে আবেগকে নিয়ে আসছেন না, আনছেন মনকে। তার মানে এই মন খুব সূক্ষ্ম মন, সূক্ষ্ম মন মানে সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত শুদ্ধ মন। *হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো*, হৃদয়স্থিত বুদ্ধি দিয়ে মনীষীরা যখন এটাকে দেখেন। হৃদয়স্থিত মন কেন বলছেন? কারণ স্থূল মন দিয়ে আমাদের জগতের কাজ চলছে। গাছ কাটার জন্য কুঠার লাগে, সব্জী কাটার জন্য কেউ কুঠার ব্যবহার করে না, সেখানে ছুরি ব্যবহার করে। আর দাড়ি কামানোর জন্য ব্লেড ব্যবহার করে, আরও সূক্ষ্ম হয়ে গেল। জগৎকে চালানোর জন্য স্থূল মন দিয়েই কাজ চলে যায়। কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্ব, আত্মতত্ত্বকে জানার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম মন দরকার। এই সূক্ষ্ম মনকেই কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করার সময় বলা হয় হৃদয়স্থিত, যেমন মনের আবেগকে বোঝাবার জন্য বলে তোমার কথা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে গেছে। বলতে চাইছে তোমার কথাগুলো খুব সূক্ষ্ম, সাধারণ কথা মন দিয়েই নিচ্ছে। সাধারণ কথায় বলে না যে, আমার হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। যেগুলো স্থূল মনের কাজ সেগুলো মন দিয়ে হয় আর যেগুলো সূক্ষ্ম মনের কাজ সেই কাজ হৃদয় দিয়ে

হয়। মন বা হৃদয় দিয়ে কিছুই হয় না, সবটাই মস্তিষ্ক দিয়ে হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবকে বোঝাবার জন্য বলা হয় হৃদয়স্থিত। এই সূক্ষ্ম মন মানে যে মনের সঙ্কল্প-বিকল্প ওঠা থেমে গেছে।

আমাদের যত গোলমাল ইন্দ্রিয়কে নিয়েই, ইন্দ্রিয়ের বিষয় মানেই কামিনী আর কাঞ্চন। কোন বয়স্ক লোক বলতে পারেন, আমার কামিনী-কাঞ্চনের কোন ব্যাপার নেই আর কোন দিন ছিলও না। কিন্তু আমাদের যাবতীয় যা কিছু আছে সবই কামিনী আর কাঞ্চনের খেলা, খাওয়া-দাওয়া করছি এও সেই কামিনী-কাঞ্চনের খেলা। কোন ঋষি সব ছেড়ে হিমালয়ের গুহাতে চলে গেলেন, পাশেই জঙ্গলে ফলমূল পেয়ে যান, তাতেই তাঁর জীবন-ধারণের রসদ মিটে যাচ্ছে। এরপর গুহার দরজাটা বন্ধ করে দিলে পুরো জগৎটাই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যত গোলমাল যে ইন্দ্রিয়দের নিয়ে, সেও ইন্দ্রিয় তাঁর এমনিতেই সংযম হয়ে গেল। তাহলে তাঁর ঈশ্বর লাভ হয়ে যাওয়ার কথা। না, কোন মতেই তা হবে না। কারণ তিনি স্থূল জিনিষগুলিকে ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিষগুলো মনের ভেতরে থেকে গেছে। শুধু মনের ভেতরেই না, এতদিন এই মন দিয়ে যত চিন্তা-ভাবনা করে এসেছেন সব চিন্তা-ভাবনা গুলো ভেতরে সূক্ষ্ম হয়ে বসে আছে। সূক্ষ্ম জিনিষ মানেই অধিকতর শক্তিশালী। এবার এই সূক্ষ্ম জিনিষগুলো তাঁকে এমন নাচাতে শুরু করবে যে, সাধুবাবা কিছু দিনের মধ্যেই ভাব প্রচার করার জন্য গঙ্গোত্রী থেকে হরিদ্বারে নেমে আসবেন – ভাইরে! আমি অনেক অনেক জ্ঞান পেয়ে গেছি, তোরা সবাই আমার কথা শোন। ঋষি আর গুহায় থাকতে পারবেন না। সেইজন্য পতঞ্জলি যোগে স্মৃতির উপর খুব জোর দিয়েছেন। স্মৃতি, নিদ্রা, স্বপ্ন, সবরকম চিন্তা সব সময় মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আসল হল মন, যা দিয়ে সব কিছুর ধারণা তৈরী হয়, ফলে কিছুতেই এগোতে পারবেন না। যে মনের চাঞ্চল্য বন্ধ হয়ে গেছে সেই মনই শুদ্ধ মন। এই শুদ্ধ মনকেই মন্ত্রে বলছেন হৃদয়স্থিত। প্রথমেই ধরে নিচ্ছে তোমার ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য থেমে গেছে, ইন্দ্রিয়ের অস্থিরমন্যতা থেকে তুমি অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছ। কিন্তু তাও সাধু গুহায় থাকতে না পেরে ভাব প্রচারে চলে গেলেন? কারণ জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় যা কিছু আছে সব মনের ভেতর বসে আছে। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য থেমে যাওয়ার পর মন তার বিভিন্ন রকম খেলা শুরু করে। ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হয়েছ তো কি হয়েছে, মন তোমার না শুদ্ধ হয়েছে, না হয়েছে মন স্বচ্ছ আর না মন সূক্ষ্ম হয়েছে।

ঋষিরা, মনীষীরা তাঁরা মনকে শুদ্ধ পবিত্র করে নেন, সেইজন্য শুদ্ধ মন হৃদয়ে অবস্থিত বলছেন। মন যখন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, মন যখন হৃদয়স্থিত হয়ে যায় তখন কি হয়? *য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি*। যে মনীষীর মন একেবারে বিকল্প শূন্য, মনে আর কোন চাঞ্চল্য আসছে না তখনই তাঁর যথার্থ দর্শন হয়। আচার্য এখানে নিজের থেকে যোগ করছেন *মনসা মননরূপেণ সম্যগদর্শনেন*, সমস্ত দিকে প্রকাশিত করছে। সাধারণ ভক্ত নিজের হৃদয়ে ভগবানকে দেখেন। নিজের হৃদয়ে ভগবানকে দেখা আর উপরে আকাশে দেখা একই। কিন্তু যখন দেখছেন সবারই ভেতরে তিনিই আছেন, এটাই অনেক উচ্চ অবস্থা। কিন্তু তারপরেই যখন দেখেন তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই – এটাই অদ্বৈতের শেষ অবস্থা। যথার্থ দর্শন মানে আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। এই যথার্থ দর্শন হয়ে গেলে সমস্ত রকম সঙ্কল্প-বিকল্প নাশ হয়ে যায়। ঠাকুর মা কালীর ধ্যান করে মা কালীর যখন দর্শন হয়েছে তখন কিন্তু তাঁর মা এই বোধ আছে, ঠাকুরও পরে মা মা বলে ডাকছেন। তার মানে ঠাকুরের মা কালীর জ্ঞানে বিকল্প আছে। কি বিকল্প? তিনি মা আর আমি তাঁর সন্তান। অনেক উচ্চাবস্থায় যেখানে মানুষ স্বপ্নেও পৌঁছাতে পারে না, সেখানেও বিকল্প থেকে যায়। যিশু যখন বলছেন My Father is in Heaven আমি আছি আর আমার পিতা আছেন, তখনও বিকল্প থেকে যাচ্ছে। মহম্মদও যখন বলছেন আল্লাই একমাত্র শক্তিমান, বিকল্প থেকে যাচ্ছে, আমিও আছি আল্লাও আছেন, আমি আছি আমার পিতাও আছেন, আমি আছি আমার মা কালীও আছেন, সবটাতেই বিকল্প থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে যথার্থ দর্শনে বলছেন কোন বিকল্প থাকবে না। বিকল্প না থাকলে কি হবে? তিনিই আছেন, আত্মাই আছেন, ঈশ্বরই আছেন, এই ভাব যখন এসে গেল তখন আর বিকল্প নেই, আমি বলে কোন বোধ হবে না। ভাগবতে প্রহ্লাদের বর্ণনায় বলছেন, প্রহ্লাদের যখন ঈশ্বর জ্ঞান হচ্ছে তখন দেখছেন তিনিই আছেন, তখন দেখছেন জীব নেই, জগৎ নেই কিছুই নেই, ঈশ্বর নেই, আমি নেই, শুধু এই বোধ অস্তি, আছে এইটুকু বোধ। এরপরেই বোধ হল আমি আছি, যেই আমি বোধ এসে গেল তখন জগৎও আছে, জীবও আছে, বিষ্ণুও আছেন সবই আছে। যদি একটি বিকল্প থাকে তাহলে সব বিকল্পই থাকবে। ঠাকুর বলছেন, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। আমি থাকলে জীব, জগৎ, ঈশ্বর সবই থাকবে। বিকল্প বিহীন, বিকল্প শূন্য অবস্থাই অদ্বৈতের শেষ অবস্থা। *হৃদা মনীষা*

মানসভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি, অমৃত কোন অবস্থায়? যখন যথার্থ দর্শন, যথার্থ দর্শন মানে তিনিই আছেন, আমি তুমি কোনটাই আর নেই, সঙ্কল্প-বিকল্প অর্থাৎ এটাও আছে সেটাও আছে এই জিনিষটা আর থাকবে না, ভগবানও আছেন ভক্তও আছেন এই জিনিষটা আর থাকবে না, মা কালীও আছে ঠাকুরও আছেন এই জিনিষটা আর থাকে না। গানে বলছে মা আছেন আর আমি আছি, বেদান্ত এই জিনিষ একেবারেই মানবে না। তবে ওটাও ভালো, আমি আছি আর আমার গাড়ি বাড়ি স্ত্রী আছে বলার তুলনায় আমি আছি আর মা আছেন মনে করা অনেক ভালো। দুটোই সংসার, একটা অবিদ্যার, আরেকটা বিদ্যার সংসার। এখানে বেদান্তের অত্যন্ত উচ্চাবস্থার বর্ণনা চলছে, এগুলো ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, তবে শুনে রাখতে হয়। উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা শুনলেও একটা শুভ সংস্কার তৈরী হয়, তাই শ্রবণ করা মানে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া। সমস্যা হল আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে এমন সহজ ভাবে, সরল ভাবে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে যত সাধন ভজন করে করে উচ্চ অবস্থার দিকে যেতে থাকে তত তত এই সত্যগুলিকে গভীর বলে বোধ হতে থাকে। কথামৃত একটা বাচ্চা ছেলেও পড়ে নিতে পারে, মজার মজার কাহিনী আছে, সুন্দর সুন্দর কথা আছে, ভালো ভালো উপদেশ আছে। কিন্তু যেমন যেমন মনের বিকাশ হতে থাকবে, বিকাশ হওয়া মানে মন আরও সূক্ষ্ম হওয়া, যেমন যেমন স্বাধ্যায় করবে তখন গিয়ে বুঝতে পারবে কথামৃতে ঠাকুরের কথা কত গভীর। এরপর বুঝবে যে এবার আমার ধারণা হতে শুরু হয়েছে। হঠাৎ একটা কথা পড়ে মনে হবে, আরে! দশ বছর আগে এই কথাটা যখন শুনেছিলাম তখন এক রকম মনে হচ্ছিল এখন পড়ে মনে হচ্ছে এই কথার তাৎপর্য এই রকম। যদি বোধ হয় আগে যা বুঝতাম আসলে তা নয়, বুঝতে হবে এবার তার আধ্যাত্মিক যাত্রা ঠিক ঠিক শুরু হয়েছে।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের মধ্যে বসে থাকলে স্টেশনের দৃশ্যগুলো এক রকম দেখায়, চাওয়ালা যাচ্ছে, ঠেলাওয়ালা যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি নিজের সীটে যেখানে বসে আছি সেখানে দৃশ্যগুলো নড়ছে না। দৃশ্যগুলো যদি নড়াচড়া করতে শুরু করে দেয়, প্ল্যাটফর্মের থাম্বা, হোর্ডিং, দোকান, স্টল সব যদি নড়তে শুরু করে দেয় তখন বুঝতে পারছি আমার ট্রেন চলতে শুরু করেছে। জীবনের পঞ্চাশ রকমের যে আইডিয়া নিয়ে মনের মধ্যে বসে আছি, এগুলো হল প্ল্যাটফর্মের স্টল, ভেণ্ডরস, হোর্ডিং, চায়ের দোকান, সবটাই স্থির। যেমনি চলতে শুরু করল সব পাল্টাতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ পর ব্যাণ্ডেলে এসে দেখছি হোর্ডিং গুলো সব পাল্টে গেছে, চায়ের দোকানগুলো পাল্টে গেছে। পাটনায় ট্রেন ঢুকে গেল, দেখছি চাওয়ালার ভাষাও পাল্টে গেছে। তার মানে ট্রেনটা চলছে। যখনই মনে হবে এতদিনের ধারণা, বিচার এগুলোর পরিবর্তন হচ্ছে, চার বছর আগে শাস্ত্রের কথা শোনার পর আমার মনে যে ধারণাগুলো হয়েছিল এখন সেগুলো অন্য রকম মনে হচ্ছে, আনন্দের ভাবটাও অন্য রকম, তার মানে এবার চায়ের দোকান, হোর্ডিং, স্টল সব পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছে। আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়েছে কিনা বোঝা যাবে, পুরনো যে ধ্যান-ধারণা গুলি রয়েছে সেগুলো পাল্টাতে শুরু হয়েছে কিনা। কথা একই থাকবে, শরৎ আমার ছেলে আমজাদও আমার ছেলে, একই কথা থাকবে। কিন্তু আগে ভাবতাম, আহা! মায়ের সবার প্রতি কত মমতা, কত স্নেহ, কী মিষ্টি কথা! চার বছর পর শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে এখন যখন পড়ছি তখন মনে হচ্ছে, কি সাংঘাতিক অদ্বৈতের ভাব। মায়ের ভালোবাসা থেকে উত্তরণ হয়ে অদ্বৈতের ভাব এসে গেল। এরপর আমিও যেদিন সত্যি সত্যি দেখছি আমার ছেলেও যেমন আর আমাদের কাজের মেয়ের ছেলেও তেমন, তখন বুঝতে হবে এবার আমিও অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, এটাই শেষ কথা, ঐ হৃদয়ে কোন বিকল্প থাকে না, তখন আর মন দিয়ে দেখে না, হৃদয় দিয়ে অর্থাৎ আত্মা দিয়ে দেখে। *য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি,* সে অমৃত লাভ করে গেল। কী করে আর মরবে! আমি দেহাত্মার দেহটা তো খসে পড়ে গিয়ে আমি আত্মা হয়ে গেছে। এই ভাবকে ধারণা করা কত কঠিন আমরা কল্পনাই করতে পারব না। যে ধর্ম দিয়েই আমরা যাই না কেন, নিজের মনকে যদি একটু বিচার করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে আমরা ঈশ্বরকে কারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি রূপে দেখি, এই নিয়ে এর আগেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ঈশ্বরকে object রূপে দেখা থেকে যতক্ষণ না বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে, ততক্ষণ *হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো* উপনিষদ বা বেদান্তের এই উচ্চতম ভাব কখনই ধারণা হবে না। মনের সমস্ত রকমের সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত অবস্থায় যে জ্ঞান হয় ঐ জ্ঞানই ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞান। ঐ অবস্থায় আমিটা আর থাকে না শুধু তিনিই থেকে যান। তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈত সাধনা করার সময় ঠাকুর কিছুতেই নির্বিকল্প সমাধিতে যেতে পারছেন না, বারবার মা কালীর মুর্তি ভেসে উঠছে, সঙ্কল্প-বিকল্প যাচ্ছে না। তোতাপুরী তখন

ঠাকুরের কপালে কাঁচের টুকরো দিয়ে আঘাত করে বলছেন, ইঁহা ধ্যান কোরো। কিন্তু মা কালী আবার এসে গেলেন, আবার বিকল্প এসে গেল। ঠাকুর তখন জ্ঞান খড়্গ দিয়ে মা কালীর মুর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। তারপরে কি হয়েছে আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। এরপরেও ঠাকুর নানান রকমের কথা বলছেন, মা কালীর কথা বলছেন, কিন্তু কপালে কাঁচ দিয়ে আঘাত করার পর সমাধির যে অবস্থায় চলে গেলেন সেখানে তখন কি হয়েছে আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। ঠাকুর যে তাঁর বর্ণনা একেবারেই দেননি তা নয়, মুখে বলা যায় না ইত্যাদি বলছেন। কিন্তু মন অখণ্ডে লয় হয়ে গেল, ওখানে কি হয়েছিল মুখে বলা যায় না, কারণ ঐটাই বিকল্প শূন্য অবস্থা। বিকল্প শূন্য অবস্থা অর্থাৎ নির্বিকল্প অবস্থায় গেলে তবেই মানুষ অমর হয়।

খ্রীষ্টান ধর্মে যিশু তোমরা পাপী বলে বলতে চাইছেন তোমাদের মন জগতে পড়ে আছে, স্বর্গের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত, এদিকে আসার চেষ্টা কর। যিশুর বক্তব্য হল, জগতের দিক থেকে ঘুরে তোমরা ঈশ্বরাভিমুখী হও। পরবর্তিকালে খ্রীষ্টান ধর্মের নেতারা ঈশ্বরাভিমুখীটা ভুলে গেলেন, থেকে গেল শুধু তোমরা পাপী। এখনও খ্রীষ্টানরা সব কিছুতে পাপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাপ খুঁজে পাচ্ছে না বলে তারা খুঁজে খুঁজে বার করল আজ থেকে অনেক আগে আদম আর ঈভ তারা এক অপরকে জেনেছিল বলে তাদের স্বর্গ থেকে পতন হয়েছিল, এখনও যে জন্ম নিচ্ছে তাদের সবারই মাথার উপর ঐ পাপ চেপে বসে যাচ্ছে, ঐ পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যিশু এসেছেন। এখন পুরো ধর্মটাই পাপের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীশ্রীমা বলছেন, যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগতে কেউ পর নয়। আসলে জগতে কেউ পর নেই, এটাই অদ্বৈত। জগতে বিকল্প বলে কিছু নেই, পর বলেও কিছু হতে পারে না। আমি আর ঈশ্বর এই পর বোধটাও নেই, ঈশ্বরের সাথে যে আপন ভাব সেটাও নেই। আপন ভাব কখন হয়? যখন আমি আর আপনি আলাদা, আত্মীয়তা মানেই আমি আর আপনি আলাদা, এখানে তাও না, অদ্বৈতে পর বলে কিছু নেই। সেইজন্য মা বলছেন কারওর দোষ দেখো না। অদ্বৈতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্বের ভাব বলে কিছু হয় না, পর বলে কিছু হয়ই না। তুমি দেখতে পারছো না সেটা তোমার সমস্যা কিন্তু তাই বলে আদর্শকে ছেড়ে দিও না। সেইজন্য অপরে যদি কোন গোলমাল করে তার জন্য আমিই দায়ী। গান্ধীজী তাই বলতেন, দেশে যে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার এর শুদ্ধির জন্য আমিই উপবাস করব। চৌরিচরাতে পুলিশের নির্মম অত্যাচার হয়েছে গান্ধীজী বলছেন আমি উপোস করব। গান্ধীজী অন্য ভাবে করছেন, দেশের স্বার্থে কর্ম আদি করে যদি শুদ্ধি করা যায়। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি দেখতে হয় তাহলে আমার থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। সন্তান আর মায়ের মধ্যে যেমন একটা একত্বের ভাব, ছেলের মঙ্গলের জন্য মা উপোস করে। ঠিক তেমনি অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে আমি উপোস করলে আপনার মঙ্গল হবে, কারণ আপনার জন্ম আমার থেকেই হয়েছে।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, এই মন্ত্রকে আরও পরিষ্কার ভাবে যোগ অবস্থার যে ভাব সেই ভাব দিয়ে পরের মন্ত্রে বর্ণনা করছেন। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ আছে, তা হল কুণ্ডলীনির জাগরণ। অনেকেই বলে দিতে পারেন আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে কিন্তু কুণ্ডলিনী জাগরণ, আর অন্যান্য অনেক লক্ষণ দিয়ে বোঝা যায় ঈশ্বর দর্শন হয়েছে কিনা। ঈশ্বর দর্শনে যোগের একটা ভূমিকা থাকে আর যোগের দৃষ্টিতে অনেক কিছু পরিষ্কার বোঝা যায়। ভক্তি আছে, নিষ্ঠা আছে, অনেক কিছুই আছে এরপর এসে একদিন বলছে আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, এভাবে কোন কথাকেই দাম দেওয়া যায় না। ভক্তি পথ দিয়ে যদি যায় তাকেও এই পথ দিয়েই যেতে হবে। সেই পথের কথা পরের মন্ত্রে বলছেন –

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।।২/৩/১০।।

(যে অবস্থায় মনের সাথে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলে থাকেন।)

পঞ্চ মানে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বলছেন। ইন্দ্রিয় বলতে জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই বোঝায়, *জ্ঞানানি মনসা সহ*, পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে মন জ্ঞান আহরণ করে সেইজন্য *জ্ঞানানি মনসা সহ* বলছেন। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন মনের সাথে চুপ মেরে যায়। কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে বিভিন্ন কর্ম করা হয় তাই এগুলোকে কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। এখানে

ধরাই আছে যে কর্মেন্দ্রিয়গুলো নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু তার সাথে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও মনের সাথে পুরো নিয়ন্ত্রণে। এর আগের মন্ত্রে যার উপর আলোচনা চলছিল সেটাই আবার এখানে ঘুরে আসছে।

যে হিমালয়ের গুহায় বসে ধ্যান করছে, সেখান কিন্তু তার ইন্দ্রিয় সংযম হচ্ছে না। ইন্দ্রিয় সংযম না হয়ে ইন্দ্রিয়গুলো ভেতরে ছটফট করতে থাকে। একজন সাধুবাবা জগৎ থেকে বিরক্ত হয়ে গভীর জঙ্গলে কুঠিয়া করে থাকতেন, সারাদিন তপস্যা করছেন, জপ-ধ্যান করছেন। অনেকদিন থাকার পর হঠাৎ একদিন জঙ্গলে কুঠিয়ার সামনে মেয়েদের পায়ের মলের ছম্ ছম্ আওয়াজ কানে এল। জঙ্গলের পথ দিয়ে হয়ত কোন মহিলা যাচ্ছিল। সাধুবাবা এতদিন একা একা জঙ্গলে পড়ে আছেন, ভুলেই গেছেন নারীর মুখ কেমন হয়। তিনি আসন ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে দেখতে গেছেন মহিলাটি কেমন। ঐ দেখার পরই তাঁর বোধদয় হল, ছিঃ! মেয়ে দেখার জন্য ধ্যান ছেড়ে আমি উঠে এলাম! আমার এই পা এরাই আমাকে আসন থেকে তুলে নিয়ে গেল। ঠিক আছে, এই পা জীবনে আমার জন্য কোন কাজ করতে পারবে না। আমি এই আসনেই বসে থাকব, আর আমি আসন ছেড়ে আর উঠছি না। এটা কাহিনী, এর কতটা সত্য আমাদের জানা নেই। এত বছর ধরে জঙ্গলে আছে কিন্তু একটা চাঞ্চল্যের কারণ আসতেই মন চঞ্চল হয়ে গেল। আমরা মনে করি নির্জনে একা একা থাকলেই যেন সব কিছুকে জয় করে নিতে পারে। একেবারেই ঠিক নয়, একমাত্র আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই তার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসবে না। অদ্বৈত ভাবের নীচে থাকা মানেই বিপদের সম্ভবনা থাকবে। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানীও ভয়তরাসে। যে স্তরেই চলে যাও ভয়ের ত্রাস তোমার থাকবেই। বশিষ্ঠদেব এত বড় জ্ঞানী তিনিও পুত্রশোকে অধীর হয়ে পড়ছেন, ব্যাসদেব এত বড় জ্ঞানী তিনিও শুকদেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর পুত্রশোকে অধীর হয়ে শুকদেবের পেছন পেছন ধাওয়া করেছেন। কিন্তু যিনি বিজ্ঞানী তাঁর কোন কিছুতেই কিছু হয় না। ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখি, কোন কিছুতেই তাঁর কিছু হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*, যেখানে যা কিছু হচ্ছে তাতে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় না। যাঁরা ঠিক ঠিক বিজ্ঞানী, অদ্বৈত জ্ঞানে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের মধ্যে দুঃখ-কষ্টের কোন ছাপই পড়ে না।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানিনা মনসা সহ, এখান থেকে শুরু হয়ে গেল চিত্তবৃত্তি নিরোধের ধারণা। বেদান্ত কিন্তু যোগের পথে চলে না। অন্য দিকে বেদান্ত যদি যোগের উপর দিয়ে যায় তাহলে জিনিষগুলো বুঝতে সহজ হয়ে যায় আর সাধন-ভজনের পথটাও সহজ হয়ে যায়। বেদান্তের নিজস্ব সাধনা হল নেতি নেতি। নেতি নেতি মানে যাবতীয় যা কিছু সব আত্মার উপর আরোপিত, আরোপিত জিনিষগুলো সরিয়ে দিলে আত্মা নিজের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু এটাই বেদান্তের চিরাচরিত সাধনার পথ নয়, এর সাথে উপনিষদ পাঠ, মন্ত্র জপ বা ওঁ জপ আর যোগেরও একটা স্থান আছে। এর আগে কঠোপনিষদেই অনেকগুলো সাধনার পথের কথা বলছেন বা অন্যান্য পথের কথা বলছেন। এই মন্ত্রে যেমন একমাত্র যোগের কথা বলছেন।

যোগ শুরুই হয় চিত্তবৃত্তি দিয়ে, চিত্তবৃত্তি মানে মনের ভাব, মনে যে নানা রকমের ভাব উঠছে এটাই চিত্তবৃত্তি। বিজ্ঞানের একটা জার্নালে নিউরো বিজ্ঞানের উপর কমিকস তৈরী করে দেখানো হয়েছে মস্তিষ্কে নিউরোন গুলো কিভাবে কাজ করে। এক নিউরো বিজ্ঞানী নিউরোনের ভেতরে গেছেন, ভেতরে যাওয়ার পর তিনি জিনিষগুলিকে কেমন দেখছেন সেটাই কমিকসের মাধ্যমে মজা করে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। এক একটা নিউরোন যেন এক একটা গাছ। একশ কোটি নিউরোনকে যদি গাছ রূপে দেখান হয় তাহলে একশ কোটি গাছ হবে, একটা গভীর জঙ্গল। ওর মধ্যে কোন মানুষকে যদি ছেড়ে দিয়ে প্রত্যেকটি গাছকে মার্কিং করতে বলা হয়, মার্কিং করতেই তার জীবন চলে যাবে। আরও সমস্যা হল, আম গাছ, কাঁঠাল গাছ করে করে প্রত্যেকটি গাছকে সে মার্কিং করে যাচ্ছে, পরের দিন সকালে এসে দেখছে আম গাছ পাল্টে আখরোট গাছ হয়ে গেছে। মস্তিষ্কে সত্যিই এই ঘটনা হরদম হয়, কাল সকালে আম গাছ আখরোট গাছ হয়ে যাবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মস্তিষ্কে সেল গুলো আজ যে রকম আছে কাল তা পাল্টে যেতে পারে, নাও পাল্টাতে পারে। সত্যিই বিরাট সমস্যা হয়, যার ফলে মস্তিষ্কের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার কাজটা খুব কঠিন।

ঋষিরা এসব ঝামেলার দিকে গেলেন না, মস্তিষ্ককে ঠিক করা ঋষিদের কাজ নয়, মানুষকে আধ্যাত্মিক তৈরী করাই তাঁদের কাজ। ঋষিরা বলছেন, পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগত থেকে ক্রমাগত যে সূচনা আসছে তাতে তোমার মন একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেয়। প্রতিক্রিয়া ছোঁড়া মানে মস্তিষ্কের নিউরোন গুলো সক্রিয় হয়ে

গেছে। চোখ দিয়ে আমি দৃশ্য দেখছি, চোখ একটা সূচনা পাঠাচ্ছে। এবার পুরনো নিউরোনগুলো যে ছবি আগে থেকে রেখে দিয়েছে, ওগুলোকে তখন সক্রিয় করে দিচ্ছে। এক একটা নিউরোনের আবার অনেকগুলো সংযোগ থাকে, সেগুলোও সংযোগ হয়ে যাচ্ছে। পুরো এলাকাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের খেলা হচ্ছে, দুটো দলের খেলার সাথে সাথে এক লক্ষ লোক একসাথে কখন চেঁচিয়ে উঠছে, কখন শান্ত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক এভাবে জিনিষটা হতে থাকে। স্বামীজী পুকুরের উপমা দিচ্ছেন। পুকুরে একটা পাথর ছুঁড়লে পুকুরের জলে ঢেউ উঠল। ঢিল ছোঁড়াটা হল পুকুরের জলে একটা সূচনা গেল, ঢেউ উৎপন্ন হওয়াটা তার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াকেই বলে মনের বৃত্তি। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্জগত ক্রমাগত সূচনা দিয়েই যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে ঘরে বসে আছি, চোখের সামনে কোন দৃশ্য নেই, নাকেও কোন গন্ধ আসছে না, জিহ্বাতে কোন কিছুর আস্বাদ হচ্ছে না, হঠাৎ কোথায় একটা শব্দ হল, সেই শব্দ কানে এসে ধাক্কা দিল, তাতেই মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সাধুবাবার কাহিনী বলা হল, সাধুবাবার কানে একটা মেয়ের পায়ের ছম্ ছম্ আওয়াজ গেছে, তাতেই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল, নারীমুখ দেখার ইচ্ছা জেগে গেল। এগুলো উপমা, উপমা দিয়ে মূল জিনিষকে বোঝান মুশকিল। খুব জোর বাতাস চলছে, তাতে গঙ্গার জলে বড় বড় ঢেউ উঠছে, তার মধ্যে আমি গঙ্গাতে একটা ঢিল ছুঁড়লাম, তাতে গঙ্গার জলে ঢেউ কতটুকু আর হবে। বোঝাই যাবে না। আমাদের মনে সব সময় ঝড় চলছে, সকালে উঠে খেয়েদেয়ে অফিসে যেতে হবে, তার আগে কত কিছু আছে, বাজার যেতে হবে, স্নান করতে হবে, খবরের কাগজে চোখ বোলাতে হবে, ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসতে হবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার দুশ্চিন্তা ট্রেন ঠিক মত এলে হয়, না এলে অফিসে হাফ ডে নিতে হবে, অফিসে গিয়েও কত রকমের দুশ্চিন্তা, বাড়ি ফিরে আবার কত রকমের কাজের চিন্তা, তার মধ্যে বন্ধুর মেয়ের বিয়ে, অমুকের ছেলের পৈতা, অমুকের বিবাহ-বার্ষিকী এসব লেগেই আছে, মনের ভেতর ঝড় অনবরত হয়েই চলেছে। এরমধ্যে একটা কোন ভোগের দিকে দৃষ্টি পড়ল, বেচারী টেরও পাবে না। সন্ন্যাসী জগৎকে ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর পুকুর অনেক শান্ত। এবার কেউ দিল একটা পাথর ছুঁড়ে, ছোট্ট পাথরও যদি ছোঁড়ে পরিষ্কার বোঝা যাবে শান্ত জল নড়ে উঠেছে। কিন্তু সংসারীদের মনে ঝড় সব সময়ই চলছে, ওর মধ্যে একটা বড় পাথর ছুঁড়ে দিলেও কিছু বোঝা যাবে না। শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন, সংসারীদের কাপড় কালো কাপড়, দাগ লাগলে বোঝা যায় না, সাধুদের কাপড় সাদা কাপড় একটু দাগ লাগলে দূর থেকে বোঝা যায়। সেইজন্য সন্ন্যাসী সব সময় প্রাণপন চেষ্টা করেন বহির্জগতের কোন সূচনা যেন তাঁর মধ্যে ঢুকতে না পারে।

খুব গভীর সাধনায় যাঁরা ডুবে আছেন তাঁরা ছাড়া কেউ ধরতে পারবে না। শান্ত পুকুরে ছোট্ট ঢিল পড়লে যেমন বোঝা যায়, সাধকের মনের সামান্য চাঞ্চল্যও ঠিক সেই রকম পরিষ্কার দৃষ্টি গোচর হয়। বৃত্তি শুধু পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েই আসছে না, এর আরও মাধ্যম আছে। পতঞ্জলি পাঁচ রকম বৃত্তির কথা বলছেন, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রমাণ, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসছে। বিপর্যয় আর বিকল্প, কোন কারণ নেই অবান্তর কল্পনা চলছে আবার চিন্তা-ভাবনা থেকে আসছে। আর আসে স্মৃতি থেকে। বিপর্যয়, বিকল্প আর স্মৃতি মনকে ক্রমাগত যে কি জ্বালাতন করে কল্পনাও করা যাবে না। মানুষকে কিছু দিনের জন্য একাকীত্বের জীবনে ঠেলে দিলে তার মন থেকে কবিতা বেরিয়ে আসবে। কবিতা বের হওয়া মানে মন বিপর্যয় আর বিকল্প বৃত্তিতে চলে গেছে। অনেক আগে একটা দৃশ্য দেখেছিল, সেটা স্মৃতিতে পড়েছিল, সেটাই এখন বিপর্যয় বা বিকল্প হয়ে বেরিয়ে আসবে। মিথ্যা কোন কল্পনা বা অবান্তর কিছুর কল্পনা করে যাচ্ছে, বস্তুর সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই বা নিজের মত কল্পনা করে যাচ্ছে। জাগ্রত অবস্থায় যদি থেমেও যায় কিন্তু পরে স্বপ্নে আসবে। এইভাবে চিত্তে ক্রমাগত আলোড়ন হয়ে চলেছে। প্রথম হল প্রমাণ, যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসছে আর বাকি চারটে আসে মন দিয়ে। স্বামীজী জলাশয়ে যে পাথর পড়ার কথা বলছেন, যার জন্য মনে অনবরত যে ঢেউ উঠছে, এই পাথর পাঁচ ভাবে পড়ে। একটা ইন্দ্রিয়গুলির দিক থেকে আসছে। ইন্দ্রিয় দিয়ে আসাটা যদি বন্ধ করে দেওয়াও হয়, একটা সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে একা বসে গেল, পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে সূচনা আসা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু বাকি রইল তিনটে, বিপর্যয়, বিকল্প আর স্মৃতি। বিরক্ত হয়ে ঘুমোতে চলে গেলেন এবার স্বপ্নে সব ভেসে উঠছে। বৃত্তিকে নিরোধ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এখানে পথ বলছেন না, এখানে তত্ত্ব আলোচনা চলছে। পথ হল ইষ্টের উপর ধ্যান বা মন্ত্র জপ। এগুলো করলে বৃত্তিগুলো আস্তে আস্তে কমতে শুরু হয়। যোগশাস্ত্রে বলছেন *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্*, মন্ত্র জপ আর মন্ত্রের অর্থ চিন্তন করলে বৃত্তিগুলো ধীরে ধীরে কমতে

থাকে। বৃত্তি যত কমতে থাকবে মন তত একাগ্র হবে। যে বস্তুকে ধ্যানের বিষয় করা হয়েছে সেটাই এবার বাস্তবিক ভেসে উঠবে, এখন আর কোন কল্পনা চলছে না। যোগ চার রকম সমাধির কথা বলছে, সবিচার, সবিতর্ক, সাস্মিতা আর সানন্দা। এর আবার দুটো দুটো করে ভ্যারাইটি আছে। কিন্তু যাকে নিয়ে ধ্যান করা হচ্ছে সেটাই এবার তাকে ঘিরে নেবে। যদি সাবধান না থাকে, গুরুর নির্দেশ যদি না থাকে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ যদি না থাকে, ওর মধ্যেই কয়েক জন্ম ঘুরতে থাকবে। সেখান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলে আসবে আরও উচ্চমানের সমাধি। জ্ঞানের স্তরটাও অনেক উঁচুতে চলে আসবে। কিন্তু ঐটাই এখন তার জন্য বিঘ্ন হয়ে যাবে।

শেষ স্তরে আসে বুদ্ধি। এখানে শুধু বুদ্ধি বলছেন, যোগে আরও অনেক কিছু বলছে। *যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ*, পুকুরে পাথর পড়া পুরোপুরি বন্ধ, মনের যে খেলা চলছিল সেগুলোও বন্ধ। শেষ যে বৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি, যেটা বিকল্প, যেমন মহম্মদের আল্লার বোধ, ঠাকুরের মা কালীর বোধ, এটাই শেষ বৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি। এতে আমি আছি আর তিনি আছেন, এই বৃত্তি মানুষকে জগৎগুরুর আসনে বসিয়ে দেয়। যখন ঐ বৃত্তিটাও বন্ধ হয়ে যায় তখন কি হয়? *তামাহুঃ পরমাং গতিম্*, ঐটাই পরম গতি। তার আগে পর্যন্ত পরম গতি বলা যাবে না। ভারত এবং অন্যান্য দেশের বড় বড় মহাত্মাদের জীবনকে এই মন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে কেমন দেখাবে? এনারা সবাই ঈশ্বরের উপরেই ধ্যান করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের ধ্যান করার সময় সবাই একটা স্তরে গিয়ে আটকে গেছেন। যাঁরা একটু গভীরে গেছেন, যেখানে ঈশ্বরের ধ্যান করে ইন্দ্রিয় সংযম পুরো হয়ে গেছে এনারা হলেন মহাত্মা। আর ঈশ্বরের ধ্যান করে বিপর্যয় বিকল্পকেও নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছেন, এনারা আরও বড় মহাত্মা। আর যাঁরা ঈশ্বরের ধ্যান করে পুরো মনকেই নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছেন তাঁরা আরও বিরাট মহাত্মা। আর ঈশ্বরের ধ্যানে যাঁর শুধু বুদ্ধিটুকু থেকে গেছে, বুদ্ধিই তাঁর কাজ করছে আর কোন কিছুই কাজ করছে না, এনারাই অবতার। যাঁদের বুদ্ধিও কাজ করে না তাঁদের আমরা ভগবান বলেই জানি বা অনেক সময় তাঁদের জানাও যাবে না। কারণ ঋষি হয়ে এনারা লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান, এনারাই জগৎকে ঠিক ঠিক জ্ঞান দেন। একজন সাধক বিষ্ণুরই ধ্যান করুন আর শ্রীরামকৃষ্ণেরই ধ্যান করুন, তাঁর ধ্যানের গভীরতা এভাবেই জানা যাবে। প্রথমে ঈশ্বরের ধ্যান করে শরীরের সংযম করে নিয়েছেন, আমরা তাঁকে বলি ভক্ত। ইন্দ্রিয়কে সংযম করে নিয়েছেন মানে তিনি রীতিমত একজন মহাত্মা। আপনি বলবেন মনের সংযম না করলে মহাত্মা কি করে হবেন? যোগশাস্ত্রে জিনিষটা পরিষ্কার হয়। যোগশাস্ত্রে বলছেন সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার। এগুলো সমাধির এক একটা অবস্থা আর এক এক সমাধিতে অনুভূতিও এক এক রকমের হয়, তার যে ফল আর তার যে জ্ঞান এক এক রকম হয় আর তাঁর শক্তিও এক এক রকমের হয়। এনারাই মহাত্মা। তাহলে তুলসীদাস যিনি এত সুন্দর রামকথা রচনা করেছেন আর ঠাকুর যাঁর কথা নিয়ে কথামৃত, দুজনের মধ্যে তফাৎ কি করে বুঝব? কোন তর্ক বা তুলনা করার জন্য বলা হচ্ছে না, উপনিষদ বা যোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিষয়কে স্পষ্ট করা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, তুলসীদাসের যে জ্ঞান, সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার, নির্বিচার এই কটি স্তরের কোথায় আছে? এর উপরে বেশির ভাগ মহাত্মারা যেতে পারবেন না। আর কখন সখন বোধ হয়ে যাচ্ছে তিনিই আছেন, তাতে মনে হবে অদ্বৈত জ্ঞান। অদ্বৈত জ্ঞান যাঁর ঠিক ঠিক হয়েছে ঈশ্বরের মতই তাঁর পূজা হবে। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে মনে হয় না যে এক জন্মে অদ্বৈত জ্ঞান সম্ভব। কিন্তু আছেনও, নেই যে তাও নয়। উপনিষদের বক্তব্য হল, যদি ইন্দ্রিয় সংযম হয়ে যায় তখন এক রকমের চলে, মনও যখন সংযম হয়ে গেল তখন আরেক রকমের কিন্তু বুদ্ধিও যেখানে থেমে গেল, একটা মাত্র বৃত্তি ছিল সেটাও চলে গেল, তখন বুদ্ধি দিয়ে আর কাজ হয় না। ঐ অবস্থাকেই বলছেন *তামাহুঃ পরমং গতিম্*, এটাই পরম গতি, এটাকেই বলে যোগ।

শাস্ত্রানুসারে জ্ঞান দুই রকম, একটা বৃত্তি জ্ঞান আরেকটা স্বরূপ জ্ঞান। বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান হয় তাকে বলছেন বৃত্তি জ্ঞান। যেমন এই গ্লাশ দেখছি, এটা বৃত্তি জ্ঞান। স্বপ্ন দেখছি সেটাও বৃত্তি জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা করছি সেটাও বৃত্তি জ্ঞান। ঈশ্বরের ধ্যান করে ঈশ্বরকে জানছি সেটাও একেবারে বৃত্তি জ্ঞান। স্বরূপ জ্ঞান একমাত্র অদ্বৈত অবস্থাতেই হয়, অন্য কোন অবস্থায় হয় না। যতক্ষণ স্বরূপ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ একটা বেশি ভালো, একটু কম মন্দ, এর বেশি কিছু না। সেইজন্য বলছেন *বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি*, সেখানে বুদ্ধির কোন চেষ্টা থাকে না। বুদ্ধির চেষ্টা থাকে না মানে, বুদ্ধি বৃত্তি কাজ করছে না। আমি তুমি এই বোধ যখন মিটে যায় তখনই বুদ্ধি বৃত্তি আর কাজ করে না। এটাই অদ্বৈতের অবস্থা, এই অবস্থার কথাই মন্ত্রে বলছেন। ঈশ্বর করুণাময়, ঈশ্বর কৃপাময় এই বোধ যতক্ষণ ততক্ষণ এটাও বৃত্তি জ্ঞান। ঈশ্বর জ্ঞান বলতে সাধারণ ভাবে আমরা যা জানি সেটাও

বৃত্তি জ্ঞান। ঠাকুরের মা কালীর দর্শন হচ্ছে, সেটাও বৃত্তি কিন্তু একটাই বৃত্তি। একটি মাত্র বৃত্তি জ্ঞান, যেমন ঠাকুরের মা কালীর দর্শন বা মহম্মদের যে জ্ঞান, এই জ্ঞান মুষ্টিমেয় কয়েকজনরই হয়। কিন্তু শেষ অবস্থায় *বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি*, মন, অহঙ্কার, চিত্ত সব নাশ হয়ে যায়। তখন *তদাদ্রষ্টুস্বরূপে অবস্থানম্*। *দ্রুষ্টু*, যিনি ধ্যান করছেন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। তাঁর স্বরূপ কি? আমি আত্মা, আমিই আছি এই বোধ। আর বাকি সব কিছু চেষ্টাবিহীন হয়ে খসে পড়ে যায়।

মহাভারতের যুদ্ধে অভিমন্যু বধ হয়ে যাওয়ার পর অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে বসলেন আগামীকাল সূর্যাস্তের আগেই আমি জয়দ্রথকে বধ করব, না করতে পারলে আমি চিতায় প্রবেশ করে যাব। অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শোনার পর শ্রীকৃষ্ণ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, আমার সাথে পরামর্শ না করে তুমি এরকম একটা প্রতিজ্ঞা কেন করতে গেলে, এর পরিণাম যে কত সুদূর প্রসারী তুমি বুঝতে পারছ না। ঐদিকে দ্রোণাচার্য ও কৌরব পক্ষের সবারই খুব আনন্দ, আগামীকাল অর্জুন শেষ। দ্রোণাচার্য তৈরী করলেন সর্পব্যূহ, সৈন্যবাহিনীকে সাপের মত সাজিয়ে দিলেন, আর সাপের লেজে জয়দ্রথকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এবার অর্জুন জয়দ্রথকে ধরতে চললেন। কিন্তু সাপের মত লম্বা সৈন্যবাহিনীকে পেরিয়ে গিয়ে অর্জুনকে জয়দ্রথের নাগাল পেতে হবে। অর্জুন যেদিকেই যাবে সাপের মুখ সেদিকেই চলে যাবে। অর্জুন সকাল থেকে যুদ্ধই করে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে বলছেন তুমি এদিক থেকে তীর চালিয়ে যাবে আর ওদিক থেকে ওরাও তীর চালাতে থাকবে আমরা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকব, সাপের লেজে পৌঁছাবে কবে? দুপুর হতে হতে ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেই সকাল থেকে যুদ্ধ করেই যাচ্ছেন, অর্জুন এগোতেই পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন। কৌরবরাও এগোতে দেবে না। প্রত্যেককে পরাস্থ করে করে অর্জুনকে এগিয়ে যেতে হবে। এভাবে জয়দ্রথের কাছে পৌঁছাবার আগেই সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। যোগশাস্ত্র হল ঠিক এই সর্পব্যূহের সাথে লড়াই করার মত। একটা বৃত্তিকে দমিয়ে দিল, আবার আরেকটা বৃত্তি সামনে এগিয়ে এল, ওটাকেও দমিয়ে দেওয়া হল পেছন থেকে আবার একটা বৃত্তি উঠে এল। এভাবে লড়াই করতে করতে এক একটা স্তর পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর আমরা এদিকে ভাবছি খুব সহজ, ঠাকুরের আশ্রয় নিয়ে নিলেই সব হয়ে যাবে। কিছুই হবে না, কখন সম্ভবই নয়। যদি সম্ভব হত তাহলে আর যোগশাস্ত্র থাকত না, অন্য শাস্ত্রেরও প্রয়োজন হত না। পঞ্চাশ রকম ধ্যানের কথা যে যোগে বলছেন, তার মধ্যে এক রকম ধ্যান হল ঠাকুরের উপর ধ্যান করা। ওখানেই শেষ, বাকিটা এরপর সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে, ওখানে কোন ছাড়াছাড়ি নেই। এখানে যোগের একটা জিনিষ বলছেন, যোগের দ্বিতীয় আরেকটা জিনিষকে পরের মন্ত্র বলছেন।

এখানে আমাদের একটা জিনিষকে মনে রাখা দরকার। খুব নিরপেক্ষ ভাবে যদি কোন ধর্মের একটা সিদ্ধান্ত কতটা ঠিক, তা সে যে কোন ধর্মই হোক না কেন, কতটা গ্রহণ যোগ্য যদি বিচার করতে হয় সেখানে কয়েকটা জিনিষ জানা থাকলে আর কোন সমস্যা হয় না। যেমন মহম্মদ বলছেন, আল্লাই আছেন আর মহম্মদই আল্লার শেষ পয়গম্বর, এটাও ধর্মের একটা সিদ্ধান্ত। আবার ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, আবার বলছেন যেই রাম সেই কৃষ্ণ ইদানিং সেই রামকৃষ্ণ, এগুলো সব ধর্মের এক একটি সিদ্ধান্ত। গীতার প্রত্যেকটি শ্লোকই আবার এক একটা সিদ্ধান্ত। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের কোন ইয়ং ছেলেকে যদি গীতার কথা বলা হয় সে বলবে, ওসব আপনার কাছেই রেখে দিন, এগুলো গাঁজাখুড়ি ছাড়া কিছু না। নিরপেক্ষ ভাবে দেখতে গেলে কি করে বুঝব যে এগুলো ঠিক ঠিক ধর্মীয় কথা? ঠিক ঠিক ধর্মীয় কথা নাও হতে পারে। কিছু দিন আগে দেওবান্দ স্কুল থেকে মুসলমানদের একটা ফতোয় দিয়ে বলে দিল অপরের বা নিজের দাড়ি কাটা ইসলামের খিলাপ, যদিও গর্হিত পাপ নয় কিন্তু পাপ। সাহারানপুরের কয়েকজন নাপিত সেলুনে নোটিশ লাগিয়ে দিয়েছে, এখানে দাড়ি কামানো বা ছাঁটা হয় না। দাড়ি রাখা, মেয়েদের বোরখা পড়া এগুলো ধর্মীয় নির্দেশ। আমরা কি করে বুঝব এই ধর্মীয় নির্দেশ কতটা গ্রহণীয়, কতটা গ্রহণ যোগ্য নয়?

কথা তিন রকমের হয়, প্রথম হয় কোন ব্যক্তি বলছেন, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্ব বলছেন। ধরুন কয়েকজন নিষ্ঠাবান ছাত্র আচার্যের কাছে অনেকদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে। আচার্যের প্রতি তাদের একটা শ্রদ্ধা ভালোবাসা এসে গেছে। তারা এক অপরের সাথে ধর্মীয় কথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলবে আমাদের আচার্য এই রকম বলেছেন, তখন সবাই বলবে, আচার্য যদি বলে থাকেন তাহলে তা ঠিক। তার মানে আচার্য

তাদের কাছে একজন ব্যক্তিত্ব হয়ে গেছেন। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে আচার্য একজন ব্যক্তি। ব্যক্তির যে কথা হয় সেই কথার দাম সব থেকে কম। কিছু মহৎ লোক আছেন যাঁরা তাঁদের ব্যক্তির ঊর্ধে চলে যান। যেমন নেতাজী বললেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তিনি কিন্তু আর লোক নন, তিনি হয়ে গেলেন ব্যক্তিত্ব। তাঁকে মানুষ বিশ্বাস করছে, তাঁর কথায় সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে। গান্ধীজী বললেন সত্যাগ্রহ, সবাই পুলিশের লাঠি খাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ল। একজন লোক যখন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্ব হয়ে যান তখন তাঁর উপর মানুষের বিশ্বাস এসে যায়। কিন্তু এই বিশ্বাস করাটা কতটা ঠিক? এই জায়গাতে এসে বিশ্বাস করাটা খুব কঠিন হয়ে যায়। এই জন্যই কঠিন হয়ে যায়, ব্যক্তিত্ব রূপে তিনি অবতার হতে পারেন, ভগবান হতে পারেন, যাই হয়ে থাকুন না কেন, মানুষ মানুষই। ঠাকুর বলছেন আমার এক কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমার সব কথাই মিথ্যা। ঠিকই বলছেন, আমার আপনার কাছে ঠিক। কিন্তু যারা ঠাকুরকে মানে না, জানে না তাদের কাছে ঠিক হবে না। আর তৃতীয় যেটা হয় তা হল সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত দেশ, কাল, পাত্রের সীমা মানে না। যখন আমরা ধর্মীয় কথাতে যাই বা বিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মগুলোর দিকে যাই, তখন প্রথমেই এগুলো দেশ, কাল, পাত্রের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ হল সিদ্ধান্তের সাথে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই। আমরা কোন মানুষকে অনেক সম্মান দিতে পারি, খুব শ্রদ্ধা করতে পারি, আইনস্টাইনকে বিজ্ঞানী রূপে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তিনি যদি ঈশ্বরকে নিয়ে কিছু বলেন, লোকেরাও কোট করে বলে আইনস্টাইন ঈশ্বরের ব্যাপারে এই এই কথা বলেছেন। আইনস্টাইন ঈশ্বরের ব্যাপারে যা বলেছেন তা কি মেনে নেওয়া যাবে? যারা আইনস্টাইনকে মানে, তারা নেবে। কিন্তু ঐ কথা নেওয়া যাবে না। আগে দেখতে হবে সিদ্ধান্তের দিক থেকে ঠিক কিনা। সিদ্ধান্তের দিক থেকে ঠিক কিনা মানে, দেশ, কাল, পাত্রের পারে। দেশ, কাল, পাত্রের পারে হলে সেটা আমার কাছেও সত্য হবে আপনার কাছেও সত্য হবে। যে ঋষি এই কথা বলছেন তিনি এটাকে উপলব্ধি করেছেন, উপলব্ধি করার জন্য ঋষি যা যা করেছেন আপনিও যদি তাই করেন তাহলে আপনারও উপলব্ধি হবে। সিদ্ধান্ত মানে এটাই। জল নীচের দিকে যাবে, এটা সিদ্ধান্ত, জল আপনার জন্যও নীচের দিকে যাবে আমার জন্যও নীচের দিকে যাবে। যোগক্রিয়া দিয়ে কেউ জলকে উপরের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে সেটা কখনই সত্য হবে না।

মহম্মদ বলছেন আল্লা আছেন, প্রথম গোলমাল এই জায়গাতেই হয়। আল্লা যখন বলছেন, তখন আল্লা একটা নাম, আল্লাকে অনেকে মানবে, অনেকে মানবে না। এটা তখন আর universal truth থাকল না। জহুদিদের কাছে ভগবানের কোন নাম নেই, যদিও জেহবা বলে কিন্তু উচ্চারণের সুবিধার জন্য আসল শব্দটাকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে, আসল শব্দটা হল Ywh, যা উচ্চারণ করা যায় না। আমাদেরও ঠিক তেমনি ব্রহ্ম কোন নাম নয়, একটা চরম সত্যকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্রহ্ম শব্দকে আনা হয়েছে। যখন বলছেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* তখন এটাই একটা সিদ্ধান্ত বাক্য হয়ে গেল। বলছেন, তুমিও যদি একই প্রস্তুতি নিয়ে একই ভাবে সাধনা কর তাহলে তোমারও সিদ্ধি হবে, সেই সিদ্ধিতে দেখবে, ব্রহ্মই আছেন। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ঠাকুরও একই কথা বলছেন কিন্তু ভাষাটা পাল্টে যাচ্ছে। এটাই সিদ্ধান্ত। সেইজন্য যখনই শাস্ত্র পড়া হয় তখন দেখতে হয় এর মধ্যে সিদ্ধান্ত বাক্য কোন গুলো, on principle কোন গুলো রয়েছে। Principle দিয়ে যেগুলো আসছে সেগুলো Principle। Personality দিয়ে যে কথাগুলো আসছে সেগুলো হল second level কথা। ঠাকুরের এই ধরণের অনেক কথা আছে, যেমন ঠাকুর বলছেন, যেই রাম সেই কৃষ্ণ ইদানিং রামকৃষ্ণ, এই কথা কিন্তু আর সিদ্ধান্ত থাকল না। কারণ এটা personality দিয়ে আসছে। কিন্তু ঠাকুরের ভক্তদের কাছে এটাই বেদবাক্য, যারা ঠাকুরের ভক্ত নয় তাদের কাছে এই কথার কোন দাম নেই। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন ঈশ্বরই নিত্য, এটা সিদ্ধান্ত। বাইবেলে যিশু অনেক কথা বলছেন, সেখানে পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলো সিদ্ধান্ত আর এই কথাগুলো personality দিয়ে আসছে। যারা যিশুকে মানে তাদের কাছে সেগুলোও বেদবাক্য। শাস্ত্র প্রমাণ কাদের জন্য? যারা ঐ শাস্ত্রকে মানে। তার মানে যে personality দিয়ে ঐ কথাগুলো এসেছে তারা ঐ personalityকে মানে। সেইজন্য মহম্মদ যদি বলেন দাড়ি কামাবে না, তাহলে মহম্মদকে যে মানছে সে দাড়ি কামাবে না। কিন্তু দাড়ি কামানো না কামানোর সাথে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্কই নেই।

হিন্দু ধর্মের এটাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে হিন্দু ধর্মে সিদ্ধান্ত বাক্যকে সব থেকে বেশি মান্যতা দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত অনেক বেশি। শাস্ত্রে personalityর কথাও আছে, যেমন বলছেন *কৃষ্ণস্তু*

ভগবান স্বয়ং, এখানে personalityর কথা এসে যাচ্ছে। এরপর আরও কিছু মজার ব্যাপার হয়, কিছু কথা আছে যার অর্ধেকটা সিদ্ধান্ত আর বাকি অর্ধেক personalityর কথা। কারণ ধ্যানের গভীরে, সমাধির গভীরে তিনি দেখছেন তাইতো ঈশ্বরই আছেন আর জগৎটা যেন independent হয়ে অল্প একটু আছে। যারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত তারা বলবে কৃষ্ণের মধ্যেই এই জগৎ আছে। কিন্তু যারা শ্রীকৃষ্ণকে মানে না তাদের কাছে এই কথার কোন দাম নেই। ভাগবত, পুরাণাদি গ্রন্থে প্রচুর personality ঢুকে আছে। Personality সব থেকে কম ঢুকেছে উপনিষদ আর যোগশাস্ত্রে। উপনিষদ আর যোগশাস্ত্র পুরোপুরি সিদ্ধান্তের উপর চলে, এই এই সিদ্ধান্ত, তুমি এই এই কর তুমিও এই ফল পাবে। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া কর, ভালো করে ঘুমোও আর শরীরচর্চাদি কর তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, এটাও সিদ্ধান্ত। যে কোন শাস্ত্র পড়ার সময় দেখতে হয় এর মধ্যে সিদ্ধান্ত কত আছে। সিদ্ধান্ত আবার দুটো হয়, একটা principle আরেকটা conclusion। এটাও principleর অর্থে বলা হচ্ছে। যেটা principleএর উপর founded সেই কথাগুলো সত্য হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি। কারণ বলেই দিচ্ছেন তুমিও যদি কর তুমিও পাবে। কিন্তু যেটা principle দিয়ে আসছে সেটাকে verify করার পথ থাকে না। যেমন ঠাকুর বলছেন, যেই রাম সেই কৃষ্ণ, এই বাক্যের মধ্যে principleও আছে আবার personalityও আছে। এবার কেউ সাধনা করে করে এমন অবস্থায় যেতে পারে যেখানে সেই অনন্তের মুখ যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রামকৃষ্ণ এই ভাবকে পরিষ্কার দেখতে পারবে। যখনই আমরা কোন কথা শুনছি, কেউ কোন ধর্মীয় কথা বলছেন বা কোন লেখা পড়ছি তখন সব সময় বিচার করতে হবে এই কথাগুলো কি সিদ্ধান্ত রূপে এসেছে নাকি ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আসছে। শ্রীমা বলছেন, আমি পাতানো মা নই, সত্যিকারের মা। শ্রীমার এই বাক্য একটা মিশ্র মন্তব্য, এই কথার মধ্যে সিদ্ধান্তও আছে আর ব্যক্তিত্বও আছে, যারা ভক্ত তারা ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলছে কিন্তু সাধক সিদ্ধির অবস্থায় গিয়ে দেখবে, তাই তো, মা সত্যিকারের মা। কিন্তু যেখানে শুধু মাত্র সিদ্ধান্ত আছে সেটাই ঠিক ঠিক ধর্ম। স্বামীজী তাই বারবার বলছেন go back to Upanishad। Go back to Upanishad মানে go back to principles। ব্যক্তির উপর তোমাকে আর নির্ভর করতে হবে না। আমরা এখন যে মন্ত্রগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছি এর সব কটি মন্ত্র pure principle এর উপর দিয়ে চলছে।

যোগশাস্ত্রে যত রকম বৃত্তির কথা বলা হয়েছে সব বৃত্তিকে দুভাবে ভাগ করে দেওয়া যায়, বাহ্যিক বৃত্তি আর আভ্যন্তরীণ বৃত্তি। বাহ্যিক বৃত্তি ইন্দ্রিয় দিয়ে আসে আর আভ্যন্তরীণ বৃত্তি হল যত রকমের স্মৃতি, স্বপ্নাদির মধ্যে জমে আছে। যখন সব বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায় তখনই *বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্*, এটাই পরম গতি। বৃত্তির নিরোধ সচেতন ভাবে করতে হয়। কি রকম সচেতন? মাথায় আঘাত লেগে অচেতন হয়ে পড়ে গেল, অচেতন হয়ে পড়ে গেল মানে তার আর কোন কিছুর বোধ নেই, এই অবস্থাকে সমাধির অবস্থা বলা যাবে না। তার মস্তিষ্কের কার্য চলছে, আর কর্মের বীজও থেকে গেছে। এই যে এখানে বলছেন ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ হয়ে গেল, মনের কার্য বন্ধ হয়ে গেল, বুদ্ধির কার্যও বন্ধ হয়ে গেল, তার মানে ভেতরের বৃত্তিগুলিও যখন বন্ধ হয়ে গেল, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপ্ন আর অলীক চিন্তন, অলীক চিন্তন মানে অস্তিত্বহীন বস্তুর কল্পনা, কল্পনা একটা হল আমি আপনাকে ভালোবাসছি, আমি কল্পনায় দেখছি আপনি আমার কাছে আছেন, মিষ্টি কথা বলছেন কিন্তু অলীক মানে আকাশ কুসুম, আকাশ কুসুম বলে কিছু হয় না, আকাশ কুসুমকে নিয়ে ভাবাটা অলীক কল্পনা, বুদ্ধির যখন এই ধরণের কোন impulse থাকে না, সেটাই *তামাহুঃ পরমাং গতিম্*। আত্মাকে নিয়ে যে প্রশ্ন চলছে, আত্মজ্ঞানকে নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সেখানে এটাই হল পরম গতি। এর আগেও এর উপর আলোচনা করা হয়েছে। মনের যে রূপই নেওয়া হোক, মনের যে বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন, সব রকম পরিবর্তন হওয়া অর্থাৎ মনের সমস্ত ক্রিয়াকে সচেতন ভাবে বন্ধ করা হয়েছে। প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর পেয়ে মনের সব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল, এই বন্ধ হওয়া নয়, তখনও প্রিয়জনের কথা মনে পড়ছে। তখন বলছেন –

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরমিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।।২/৩/১১।

(বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়গুলিকে অচলভাবে ধারণকরারূপ যে অবস্থা, তাকেই যোগিরা যোগ-শব্দে অভিহিত করেন। সেই যোগারম্ভেই প্রমাদ পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ যোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে।)

সাইকেলকে দাঁড় করিয়ে দিলে সাইকেল পড়ে যাবে। সাইকেল যাতে পড়ে না যায় তার দুটো পথ। হয় সাইকেলে একটা স্ট্যাণ্ড লাগাতে হবে আর তা নাহলে সাইকেলকে চালিয়ে যেতে হবে। সাইকেল কখনই দাঁড়াতে পারে না। আমাদের মন হল চলন্ত সাইকেল, হাজার রকম বিষয়ে মন চলতে থাকে বলে মনের কোন সমস্যা হয় না। ঠাকুরের সাইকেল হল স্ট্যাণ্ড দেওয়া সাইকেল, ঠাকুরের মন থেমে গেছে, জগতে আর চলছে না। ঐ স্ট্যাণ্ড কে? নরেন রাখালাদি অন্তরঙ্গ কয়েকজন। বৃদ্ধা বিধবাদেরও সাইকেল চলা থেমে গেছে, নাতি-নাতনিরা হল বিধবার স্ট্যাণ্ড। সবারই জীবনে একটা আলম্বন দরকার। সারা সপ্তাহ অফিসে কাজকর্ম করছে, ছুটির দিনে বা অবসর সময়েও সমাজের জন্য কাজ করছে। বাড়ির লোকেরা বকাঝকা করছে, সংসারের কাজ না করে দেশোদ্ধার করে বেড়াচ্ছে। দৌড়ে দৌড়ে সব রকম কাজ করে বেড়াচ্ছে, সাইকেলের মত দৌড়াচ্ছে। এই চলাটাই ওর ব্যালেন্স, মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রটা স্থির থাকছে। সব কাজ থেকে সরিয়ে দিলে সে ভেঙে পড়বে, পাগলের মত আচরণ করতে শুরু করবে। মন যদি কেন্দ্রিত হয়ে যায় তখন তার একটা আলম্বন দরকার পড়ে। টিভি দেখছে, বই পড়ছে বা কোন একজন বিশেষ লোকের উপর তার মনকে রেখেছে। বিয়ের পর স্ত্রীর মন স্বামীর উপর থাকে। সিদ্ধ পুরুষদের কেউ কেউ মনকে ঈশ্বরের উপরেই রেখে দেন, কিন্তু সাধারণত দেখা যায় একজন বা দুজন উত্তম শিষ্যর উপর মনটাকে রেখে দেন। মনকে কোথাও না কোথাও রাখতে হয়, একটা কিছুকে আলম্বন করে মনকে এই জগতের সঙ্গে জুড়ে রাখেন। আলম্বন না থাকলে তিনি জগতে থাকবেন না।

মনের চাঞ্চল্য সব সময় কোন জিনিষকে কেন্দ্র করেই হয়। যাদের মন একেবারেই কোন কিছুকে কেন্দ্র করে থাকে না, তারা পাগল। মন যাদের বহু জিনিষকে কেন্দ্র করে চলে তারা রজোগুণী। সাজগোজ, খাওয়া আর নিদ্রাকে কেন্দ্র করে থাকে এরা তমোগুণী। সত্ত্বগুণী লোক কোন ভালো পরিচিত লোককে কেন্দ্র করে রাখে। ভালো লোক মানে যাদের আমিত্ব বোধ কম। মন কখন ফাঁকা থাকবে না, মনের সব সময় কিছু না কিছু ক্রিয়া দরকার। ক্রিয়া মানেই কোন জিনিষ, কোন বস্তু, কোন মানুষকে কেন্দ্র করে তার মনের ক্রিয়া চলছে। আমাদের এত রকমের কাজ, এত রকমের জিনিষ আছে যে আমরা বুঝতেও পারি না যে এত কিছুকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবন চলছে। মন স্থির হলে বুঝতে পারি মন কোন জিনিষকে কেন্দ্র করে আছে।

ইন্দ্রিয় স্থির, মন স্থির, বুদ্ধি স্থির, ইন্দ্রিয় আর মন কোন কাজ করছে না, এই অবস্থাকে বলা হয় যোগ। যোগের এই অবস্থায় মন অপ্রমত্ত হয়ে যায়। মত্ত, প্রমত্ত আর অপ্রমত্ত এই তিনটে শব্দ, মত্ত মানে মন একেবারে মজে রয়েছে, প্রমত্ত মানে এমন ভাবে মন মজে আছে যে আর ওখান থেকে মনকে সরান যাচ্ছে না। সাধারণ অবস্থায় মানুষের মন প্রমত্ত হয়ে থাকে, ভালো মন্দের কোন বোধ থাকে না। ফলে এদের চিত্তের কখনই সমাধান হয় না। সমাধান হওয়া মানে একটা বস্তুতে একাগ্র হওয়া, মন এদের একাগ্র হয় না। ধ্যান না হওয়ার একটাই কারণ, মন এত অপ্রমত্ত হয়ে আছে ধ্যান করতে দেবে না, ধ্যান করতে বসলেও উঠিয়ে দেবে। গুরু বলে দিয়েছেন সকাল বিকেল একশ আটবার জপ করতে তাই কোন রকমে একশ আটবার জপ করে উঠে পড়ছে, তাও দশ বারোবার জপ করতে করতেই মন চঞ্চল হয়ে যায়। এটাই প্রমত্ত মনের লক্ষণ। মন যখন কোন উচ্চ চিন্তন নিয়ে থাকে তখন বলে অপ্রমত্ত। নিম্ন চিন্তন বা ছড়ানো ছেটানো চিন্তন নিয়ে মন যখন থাকে, তখন তাকে বলে প্রমত্ত। যে কামী পুরুষ তার চিত্ত সব সময় কামের বিষয়ের উপর পড়ে আছে, এটা হল প্রমত্ত। আমাদের মত লোকেদের মন কোন একটা বিষয়কে নিয়ে থাকে না, এটাও প্রমত্ত। কিন্তু যিনি সাধক তিনি যখন একটা কোন উচ্চ চিন্তন বা সাধনা নিয়ে থাকেন, শুধু ওঁ কে নিয়েই পড়ে আছেন, বা গড বা আল্লাকে নিয়ে চিন্তন করে যাচ্ছেন, এই রকম একটা উচ্চ চিন্তন যখন চলতে থাকে তখন তাকে বলে অপ্রমত্ত।

অপ্রমত্ত কখন হয়? এর উত্তর আগের মন্ত্রেই দেওয়া হয়ে গেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় আর মনকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে, তখন তাকে বলছেন অপ্রমত্ত অবস্থা। তার মানে মনের এবার সমাধান হয়ে গেছে, একটা জিনিষকে কেন্দ্র করে মন থাকছে। নিজের ইচ্ছা মত, অনিচ্ছাকৃত ভাবে মন একটা জিনিষকে নিয়ে আছে তা নয়, সচেতন ভাবে মনকে একটা জিনিষে কেন্দ্রিত করে রাখছে। বাচ্চাদের লেখাপড়াতে মন বসে না, তার মানে মন প্রমত্ত হয়ে আছে। কিসে প্রমত্ত হয়ে আছে? হয় আলস্যে, নয়তো নিদ্রাতে বা অবান্তর চিন্তাতে বা কোন ভোগ-বাসনার চিন্তাতে। চঞ্চল মন দিয়ে কোন কাজ হয় না। আগে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা মানেই, যেটা উচ্চতম মন, যে মন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে যেখানে বুদ্ধিরও কোন চেষ্টা নেই। তার নীচে হল মনে

কোন চিন্তা নেই আর তারও নীচে হল ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ন্ত্রণে। মন আর ইন্দ্রিয় যখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যায় তখন সেই অবস্থাকে বলছেন অপ্রমত্ত। *তাং যোগমিতি মন্যন্তে*, এই অবস্থাকেই বলা হয় যোগ।

প্রথম হল, যোগ মানেই মনের অপ্রমত্ত অবস্থা। দ্বিতীয় হল, নিদ্রা, আলস্য, নিরর্থক চিন্তা, বিষয় চিন্তা, সব মিলিয়ে হয় প্রমত্ত। আর তৃতীয় হল, যোগ মানে বিয়োগ (সংসার থেকে)। যোগ শব্দের সাধারণ বাংলা অর্থ জুড়ে দেওয়া, যোগ মানে সংযোগ। কিন্তু এখানে আচার্য শঙ্কর বলছেন যোগ মানে বিয়োগ। আচার্য তাঁর ভাষ্য শুরুই করছেন *যোগমিতি মন্যন্তে বিয়োগমেব সন্তম্*। আচার্য হঠাৎ কেন এই কথা বলতে গেলেন, যোগ না বলে তাহলে তো বিয়োগই বলে দিতে পারতেন। যোগ শব্দ সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়, ভক্তিযোগও যোগ, কর্মযোগও যোগ। ঠাকুর কথামৃতে এক জায়গায় বলছেন, যদিও যোগের মূল শাস্ত্রে নেই, ঠাকুর বলছেন যোগী আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন দেখে। যেখানে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই যোগ হবে। ভক্ত দেখছে ঈশ্বরের সাথে মিলন, সেখানেও যোগ। আচার্য শঙ্কর বলছেন, আসলে এটা বিয়োগ। কারণ বেদান্তে যোগ হয় না। বেদান্তে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থাটাই ব্রহ্মের, কিন্তু আমরা সংসারের সাথে জুড়ে রয়েছি। এখানে দৃষ্টিভঙ্গীটা সম্পূর্ণ আলাদা। বেদান্ত ছাড়া আর যত ধর্ম আছে প্রত্যেকেই সংসারকে সত্য রূপে দেখে, বর্তমান অবস্থাকে সত্য রূপে নেয়, সেই অনুসারে সব ধর্ম বলছে সংসারকে ছাড়ো আর ঈশ্বরের দিকে যাও। বেদান্তও বলছে এটাকে ছাড়ো কিন্তু ঈশ্বরের দিক যাও না বলে বলছেন, তোমার যেটা স্বাভাবিক সেটাতে অবস্থিত হও। এখানে যুক্তি তেমন কিছু কঠিন নয়, খুব সহজ যুক্তি। সব ধর্ম, সব দর্শন বলবে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হও, একমাত্র বেদান্ত বলছে সংসারের সাথে তুমি যুক্ত হয়ে আছ, সেটাকে ছাড়ো, মানে তুমি বিয়োগ কর। যোগ শব্দ উপনিষদেই এসেছে, তার মানে আগে থেকেই যোগের কথা ছিল বা বলা যেতে পারে, রাজযোগ যাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁরাও উপনিষদ থেকেই যোগকে নিয়েছেন। যোগের একেবারে সাধারণ অর্থই হল কোন জিনিষের সাথে যুক্ত হওয়া। আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন বেদান্তে বিয়োগই হল যোগ। যোগ শব্দকে এখানে technical অর্থে নিচ্ছেন, বাংলায় বা সংস্কৃতে যোগ যে অর্থে নেওয়া হয় এখানে সেই অর্থে নিচ্ছেন না। তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই আত্মা, এটাই তোমার স্বাভাবিক স্থিতি, কিন্তু তুমি সংসারের সাথে পুরোপুরি জুড়ে রয়েছ। এই জুড়ে থাকাটাকে যদি বিয়োগ করা হয়, এই অবস্থা যখন পূর্ণ বিয়োগ হয়ে যাবে, এরই নাম যোগ। আমরা বলতে পারি, তাহলে যোগ হলটা কোথায়? হল কি হল না সেটা কিছু নয়, যোগ এখানে একটা technical শব্দ, technicalশব্দের সঙ্গে শাব্দিক ভাষার কোন সম্পর্ক থাকে না। এই জায়গাতেই বেদান্ত আর ভক্তিশাস্ত্রের তফাৎ।

ভক্তিশাস্ত্র বলবে তুমি জোর করে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে দাও, এটাই যোগ। বেদান্ত বলবে, তুমি সংসারের সাথে বিয়োগ করে দাও, এটাই যোগ। সেইজন্য বলছেন, *যদা পঞ্চবাতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ*। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আটকে দেওয়া মানে সংসার থেকে বিয়োগ করা। মনকে থামাবার চেষ্টা করা মানে আসলে বিয়োগ করাই। *বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি* যখন বলছেন তখনও আমরা বিয়োগ করছি। বিয়োগরূপী যেটা হয় সেটাই ঠিক ঠিক যোগ। যোগশাস্ত্রের দর্শনেও একই জিনিষ হয়। এটাই বেদান্ত, যোগশাস্ত্রেরও এই দর্শন। যোগও একই কথা বলছে, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ, মন নিয়ন্ত্রণ আর বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ। এটাকে যদি যোগের নিয়মানুসারে বলা হয় তখন বলা হবে আত্মা যিনি আমাদের ভেতরে রয়েছেন, কারণ যোগশাস্ত্রে *সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম হয় না*, যোগশাস্ত্র ব্যক্তি আত্মা আর সেই পরমাত্মার কথাই বলছে, আমার আপনার সবার আত্মা আলাদা আলাদা, সেই পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যাওয়ার কথাই বলছে। এক হয়ে যাওয়ার উপায় কি? সংসার রূপী বন্ধনগুলোকে সরিয়ে দেওয়া। সেইজন্য এই পদ্ধতিকে উপনিষদ এখানে যোগ বলছেন। যোগ মানে কারুর সাথে যুক্ত হওয়া, কিন্তু বেদান্তে যুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তুমি পূর্ণই আছ। সংসার রূপী বন্ধনকে সরিয়ে দেওয়ার পর দেখবে তুমি চিরদিনই পূর্ণ ছিলে, বিন্দু গিয়ে সিন্ধুর সাথে মিলছে না, চিরদিন সিন্ধুই ছিল। এই জায়গাতে এসে বেদান্তের সাথে অন্যান্য দর্শন ও ধর্মের বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। সেইজন্য বলছেন এখানে আসল ব্যাপারটা হল বিয়োগ, সংসারের বিয়োগ আর সংসারের কার্যের বিয়োগ। এই অবস্থাকেই বলছেন *তাং যোগমিতি মন্যন্তে*, এটাকেই যোগ বলে। এই যোগে কি হয়? *স্থিরমিন্দ্রিয়ধারণম্*, ইন্দ্রিয়গুলি সব থেমে যায়।

ইন্দ্রিয়গুলি স্থির হয়ে যাওয়ার পর হয় অপ্রমত্ত। এর আগে প্রমত্তের ব্যাখ্যা করা হল, মন যখন আলস্যে যায়, নিদ্রায় যায়, বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় বা কোন বাসনার মধ্যে ডুবে থাকে, এটাই প্রমত্ত। যোগ অবস্থায় মন স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রমত্ত হয়ে যাবে, কারণ তখন ইন্দ্রিয়ের, মনের কোন কার্যই হচ্ছে না, মন তখনই অপ্রমত্ত হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর কত জায়গায়, কত বার, কত ভাবে বলছেন, যোগের দৃষ্টিতেও বলছেন আবার ভক্তির দৃষ্টিতেও বলছেন, যারা ঠিক ঠিক যোগী এদের দ্বারা সাংসারিক কোন কাজ হয় না। মথুরবাবু ঠাকুরকে কলকাতার নর্তকীদের কাছে নিয়ে গেছেন, ঠাকুর তাদের দেখে মা মা বলে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কারণ ঠাকুরের মন তখন অপ্রমত্ত হয়ে গেছে। স্বামীজী কায়রোতে জাহাজ থেকে নেমে ঘুরতে ঘুরতে নিষিদ্ধ এলাকায় চলে এসেছেন, যেখানে মেয়েরা স্বামীজীকে দেখে হাসাহাসি করছে, কিন্তু স্বামীজী অপ্রমত্ত, মনে কোথাও কোন ধরণের চাঞ্চল্য নেই। ঠাকুরের জীবনে, তাঁর কথাবার্তায় এই একটি জিনিষই সব সময় পাওয়া যাবে। এমনকি নিজের স্ত্রীর সাথেও যে সঙ্গ হবে সেই কার্যও ওনার দ্বারা সম্ভব নয়। এটাই অপ্রমত্ত অবস্থার সব থেকে উচ্চ অবস্থা। এই অপ্রমত্ত অবস্থা কার হয়? যিনি যোগে অবস্থিত তিনিই অপ্রমত্ত।

আচার্য বলছেন, এর অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে, যখন অপ্রমত্ত হয় তখনই যোগের অবস্থা হয়। মন্ত্রে কাব্যিক শৈলীতে বলা হয়েছে বলে এভাবেও এর অর্থ করা যেতে পারে আবার অন্য ভাবেও হতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যা হল, যোগী পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার সাথে মন আর বুদ্ধিকেও নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে, এবার তার মন স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রমত্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে, যদি কেউ সচেতন ভাবে চাইছে আমি যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই, তখন সে নিজেকে অপ্রমত্ত করে নিয়ে যোগে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। দুটো দৃষ্টিভঙ্গী, একটা নীচ থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে আরেকটা উপর থেকে শুরু করে নীচে যাচ্ছে। যিনি উপরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে যোগে অবস্থিত হয়ে গেলেন তিনি অপ্রমত্ত হয়ে গেলেন। তাঁর মন আর কোন দিকেই যাবে না আর সংসারের কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না, গীতায় অপ্রমত্তের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, *আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতিন কামকামী।।* জগতের কোন কাম্যবস্তুই এই প্রকার যোগীর বুদ্ধিতে কোন ধরণের চাঞ্চল্য তৈরী করতে পারবে না, কারণ তিনি অপ্রমত্ত হয়ে গেছেন, এখান থেকে তিনি আর কখনই প্রমাদ অবস্থায় যাবেন না।

অন্য দিকে কি হতে পারে, যদি তুমি নিজেকে সচেতন ভাবে চেষ্টা কর আমার মনকে আমি চঞ্চল হতে দেব না, এই ভাবে চেষ্টা করে করে যে অবস্থা আসে সেটাই যোগের অবস্থা। এদিক থেকে দেখলে যোগ হয়ে যাবে আর ঐদিক থেকে দেখলে অপ্রমত্ত হয়ে যাবে। একটাতে যোগ হলে অপ্রমত্ত হয় আরেকটাতে বলছেন অপ্রমত্ত হলে যোগ হয়, দুদিক থেকেই বলছেন, দুটোর অর্থই সমান। এ পি জে আবদুল কালাম আজাদকে সবাই বলছেন তিনি একজন সাধু ছিলেন। তাঁকে কেন সবাই সাধু বলছেন? এই কারণেই বলছেন, কারণ তিনি অপ্রমত্ত ছিলেন। অপ্রমত্ত যিনি তিনিই যোগী, যিনি যোগী তিনিই অপ্রমত্ত। সাধু যাঁকে বলি তিনি যোগী, তিনি অপ্রমত্ত হয়ে গেছেন। অপ্রমত্ত শব্দকে নিয়ে আসার তাৎপর্য আছে, অপ্রমত্ত মানে যাঁর মনে কোন চাঞ্চল্য নেই। তাহলে যারা গাঁজা, ড্রাগস নিয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে, কুকুর মুখে প্রস্বাব করলেও টের পায় না, এদেরও তো মনে কোন চাঞ্চল্য নেই। এরাও কি অপ্রমত্ত? কখনই অপ্রমত্ত হবে না। এই কারণেই অপ্রমত্ত শব্দটা নিয়ে আসা হয়েছে। প্রমত্ত শব্দে নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদি অনেক কিছুকে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়, সবটাকে মিলিয়ে বলে দিলেন প্রমত্ত। কিন্তু প্রমত্তের মূল হল বহু চিন্তন আর বিষয় চিন্তন, এই দুটির একটি যদি থাকে তাহলে সে প্রমত্ত। সমাজে সাধুপুরুষদেরই বেশি সম্মান। সাধুপুরুষ মানে কি তিনি বোকা? একেবারেই নয়, সাধুপুরুষ মানে তিনি কখনই প্রমত্ত হন না। তিনিও রেগে যাবেন, কেউ খারাপ কাজ করলে বকাবকি করবেন, কিন্তু তিনি প্রমত্ত নন, কারণ মনের নিয়ন্ত্রণ সব সময় তাঁর হাতের মুঠোয় থাকে। ইন্দ্রিয় জগতে যখন আসছেন তখন তিনি সেখানে ভোগের জন্য নেমে যান না। আমরা যাই করি না কেন, সমাজসেবা করি, জপ-ধ্যান করি, শাস্ত্র পাঠ করি, কোন কিছুই আমাদের যোগী করবে না, এর কোনটাই আমাদের সাধু করবে না। যদি সাধু হতে হয় তাহলে আমাকে যোগী হতে হবে, যোগী হওয়া মানে অপ্রমত্ত। অপ্রমত্ত মানে, তমোগুণ, রজোগুণ আর সত্ত্বগুণ তিনটে গুণকেই নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা অর্জন করা। তমোগুণকে পুরোপুরি, রজোগুণকেও পুরোপুরি আর সত্ত্বগুণকেও বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ গুণ মানেই চাঞ্চল্য, ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যের

কোন প্রশ্নই নেই, মনের চাঞ্চল্য একটু কম আর বুদ্ধির চাঞ্চল্য অল্প একটু, এই অবস্থায় মানুষ অপ্রমত্ত হয়ে যায়। যিনি সমাধিবান পুরুষ তাঁর তো এসবের কোন প্রশ্নই নেই, তিনি একেবারেই আলাদা।

কিন্তু সমস্যা হল *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*। এটি উপনিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। যোগদর্শনে পতঞ্জলি যোগ বিঘ্নের কথা বলছেন, কিন্তু উপনিষদ যোগ বিঘ্নের কথা না বলে খুব মজার কথা বলছেন, *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*, এই কটি শব্দ আমাদের মুখস্থ রাখা দরকার। *প্রভব* আর *অপ্যয়ৌ*, এই দুটি শব্দ, প্রভব মানে ওঠা, আর অপ্যয় মানে নীচে নেমে যাওয়া। যোগের সব থেকে বড় সমস্যা হল *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*, প্রভব মানে বাড়ে আর আবার অপ্যয়ৌ, কমে যায়। সর্বক্ষণ সচেতন ও সাবধান যদি থাকে তাহলে প্রভব, যোগ বাড়ে আর সর্বদা সাবধান যদি না থাকা হয় তাহলে যোগ অপ্যয়, নীচের দিকে পড়ে যায়। যমরাজ নচিকেতাকে সাবধান করে দিচ্ছেন। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যখন বুদ্ধিতেও কোন চেষ্টা থাকছে না তখন সেই অবস্থাকে বলছেন যোগ। যদিও যোগ বলছেন, কিন্তু বাস্তবে বিয়োগ, সাংসারিকতা থেকে বিয়োগ।

যোগের অবস্থায় মানুষ যখন যেতে শুরু করে তখন তার অনেক ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিদ্রা, ব্যাধি, আলস্যাদি হল যোগের পথে সমস্যা। যোগ অভ্যাস শুরু করার, কিছু দিনের মধ্যেই নানা রকম ব্যাধি এসে তাকে ঘিরে ধরবে, যোগ করতেই দেবে না। ঠাকুর বেদান্ত চিন্তন করছেন, ঐ সময় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, শুধু বাহ্যে যাচ্ছেন আর আসছেন, কিন্তু ঠাকুরের মন পুরো বেদান্তে, মন শরীরে নামছে না। কিন্তু সাধারণদের মন একটুতেই শরীরে নেমে যায়। যাদের মন সব সময় শরীরে পড়ে থাকে তাদের দ্বারা যোগ তো দূরের কথা, সাধারণ কাজ করাও সম্ভব নয়, একটা বড় কাজ করে যে জীবনে কিছু উপলব্ধি করবে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। এটাই বলছেন, *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*, এটাই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র, যোগের প্রভব আর অপ্যয় হয়। আচার্য এই দুটোকে বলছেন উৎপত্তি আর লয়, উৎপত্তি মানে জন্ম হয়। যোগের জন্ম কখন হয়? যখন কেউ পুরো বিয়োগে অবস্থিত, এটাই যোগের জন্ম। আর যখন সংসারে ফেরত চলে যাচ্ছে তখন যোগের লয় হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে। জ্ঞানীর মনে ত্রাস লেগে আছে। কেন? *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*। বিশ্বামিত্র এত সাধনা করছেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সাধনা করে একটু শক্তি হতে না হতেই তাঁর মাথায় এল, একটা রাক্ষস সৃষ্টি করে বশিষ্ঠ মুনির ছেলেকে বধ করতে হবে, যোগের নাশ হয়ে গেল। আবার সাধনায় চলে গেলেন, তখন মেনকা এসে গেল, তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ভোগে নেমে গেলেন, যোগের আবার লয় হয়ে গেল। আবার যোগের তপস্যা করছেন তখন আবার যোগের প্রভব হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে আবার একটা কিছু হয়ে যোগের নাশ হয়ে লয় হয়ে যাচ্ছে। এনারা না হয় ঋষি ছিলেন, এনাদের কথা অনেক উঁচু কথা। সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা যখন চেষ্টা করি তখন যোগের জন্ম হয়। যোগের জন্ম হওয়া মানে মনের অবস্থাটা একটু উঁচু হয়ে গেল, এরপর সাবধান না থাকলে আবার নীচে চলে যাবে। ঠাকুর বলছেন, রঙের গামলায় যে রঙে ছোপাবে সেই রঙই হবে। যখন যোগের চেষ্টা চলছে তখন উপরের দিকে চলে যায়, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে আবার নীচের দিকে পড়ে যায়, *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*।

এই দুটি মন্ত্র দিয়ে উপনিষদ যোগের ব্যাখ্যা করছেন। এর উপর আধার করেই যোগ আরও বিস্তার করেছে এবং আরও কিছু মিলিয়ে একটা আলাদ দর্শনের জন্ম দিয়েছে। দুটি মন্ত্রে শুধু ব্যাখ্যা করলেন যোগ কি। ইন্দ্রিয়ের উপর মনের নিয়ন্ত্রণ আর মনের উপরে বুদ্ধিরও নিয়ন্ত্রণ, এটাকেই বলছেন যোগ। যদি কেউ বলে আমি যোগী, কি করে বুঝব যে সে ঠিক ঠিক যোগী কিনা, তখন দেখতে হবে তার প্রমাদ হয় কিনা, মনে কোন চাঞ্চল্য আছে কিনা, আলস্য নিদ্রা এগুলো আছে কিনা, আর নানা রকম সঙ্কল্প আছে কিনা আমাকে এই করতে হবে সেই করতে হবে, মূল কথা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা এর কোন একটা আছে কিনা। গরীবের ভালো করতে চাই, সাধারণ লোকের মঙ্গল করতে চাই, এই চাওয়াটাও যোগ বিঘ্ন। যিনি যোগী তিনি সব কিছুকে পেছনে ফেলে দিয়ে শুধু ঐদিকেই এগিয়ে যান। কিন্তু অনেকে বলবেন, কেন স্বামীজী বলেছেন দেশের সেবা করার জন্য। ওটা আলাদা জিনিষ, ওগুলো হল প্রস্তুতি। দেশ সেবার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, যোগ মানেই সব কিছুকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা শুরু হলে পরিবার, সংসার, দেশ সব কিছুই মন থেকে সরে যাবে। সেইজন্য বলছেন, খুব সাবধান থাকতে হয়, কারণ যোগের উত্থান হয় আবার পতন হয়, *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*। মন্দিরে ঠাকুর দর্শন হল, একটু ধ্যান করল, জগৎকে ভুলে

গেল, কিছুক্ষণ খুব ভালো লাগল। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার মনের মধ্যে কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য যোগের প্রভব হয়েছিল আবার যোগের বিলয় হয়ে গেল। যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক এই মন্ত্রে তাঁদের সাবধান করা হচ্ছে। তুমি মনে কর না যে তুমি অনেক উচ্চাবস্থায় চলে গেছ, খুব সাবধান যে কোন সময় তোমার যোগের নাশ হয়ে যেতে পারে। কিভাবে? নিদ্রা, ব্যাধি, স্ত্যান ইত্যাদি অনেক রকম বিঘ্ন আছে। কামিনী-কাঞ্চন খুব স্থূল বিঘ্ন কিন্তু আভ্যন্তরীণ কিছু সূক্ষ্ম বিঘ্ন আছে যা যোগাবস্থা থেকে নামিয়ে দেয়।

বুদ্ধিতেও যখন কোন চাঞ্চল্য থাকছে না তখন তাকে বলছেন যোগ। স্বাভাবিক ভাবে তাই সন্দেহ হতে পারে, যে জিনিষকে আমি বোধ করতে পারছি না, সেই জিনিষটা আদৌ নেই, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, আত্মা বলে কিছু নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দুটো বড় যুক্তি আছে। প্রথম হল ঈশ্বরকে আমরা কেউ দেখতে পাই না। ঠাকুরকে একজন বলছে, ঈশ্বর আছে কিনা আমাকে কেউ দেখিয়ে দিক। ঠাকুর তাকে বলছেন, তোমাকে দেখাতে তার ভারি বয়ে গেছে। কিন্তু নরেন যখন জানতে চাইছেন তখন তিনি তাঁকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। মূল কথা, ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি দিয়ে আমাদের ঈশ্বর উপলব্ধি কখনই হয় না। কিন্তু এর থেকেও যা আরও মারাত্মক যুক্তি তা হল, যে দুটি মন্ত্রকে আমরা পার করে এলাম। দুটি মন্ত্রের মূল বক্তব্য হল ইন্দ্রিয়ের তো কোন চাঞ্চল্য হবেই না, তার সাথে মনেরও কোন চাঞ্চল্য থাকবে না, বুদ্ধিতেও কোন চাঞ্চল্য নেই। প্রথম এক দল আছে যারা ঈশ্বরকে মানে না, তারা বলে আমি যদি ঈশ্বরের কথা শুনতে নাই পারি, ঈশ্বরকে চোখ দিয়ে যদি দেখতে নাই পাই, ঈশ্বরের গন্ধকে যদি ঘ্রাণ নাই করতে পারি তাহলে তো এটাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ে কোন চাঞ্চল্য তৈরী করছেন না, এটা হল ঈশ্বর নেই যারা বলছে তাদের সব থেকে বড় যুক্তি, যেটা নাস্তিকবাদীরা বা ভৌতিকবাদীরা বলছে। এর পরের থাকের যারা তারা বলছে, ঈশ্বর নেই কারণ সেখানে বুদ্ধির কোন চেষ্টাই নেই, সেখানে বুদ্ধিতে কোন ধরণের কম্পন হয় না, বুদ্ধি কোন কিছুকে ধরতে পারছে না। প্রথমটা হল আমার চোখ, কান, নাক ঈশ্বরকে ধরতে পারছে না, আর দ্বিতীয় বুদ্ধি ধরতে পারে না, তাই ঈশ্বর নেই। এটাই স্বাভাবিক, কারণ যে জিনিষকে বুদ্ধিও ধরতে পারছে না, তাহলে সেটা নেই। যারা বলছে ইন্দ্রিয়, মন যেহেতু ধরতে পারছে না তাই ঈশ্বর নেই, এরা হল চার্বাক, এরাই নাস্তিক, ভোগবাদী। প্রথমটাতে পারছে না আর দ্বিতীয়রা বলছে পারে না, দুটোতে তফাৎ আছে। দ্বিতীয়রা হল যারা বৌদ্ধ তারা এই কথা বলছে, বুদ্ধিও ধরতে পারে না তাই ঈশ্বর নেই। বৌদ্ধদের মূল দর্শন এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে তাই মনে করে কঠোপনিষদ বৌদ্ধ ধর্মের পরে রচিত হয়েছে। কিন্তু যুক্তিতে এই তথ্য ঠিক নয়। এই ধরণের চিন্তা চিরদিনই ভারতবর্ষে ছিল। বৌদ্ধরা যোগ মানবে, ইন্দ্রিয়ের সংযম মানবে, বাকি অনেক কিছুই মানবে কিন্তু আত্মাকে মানবে না। ওদের কাছে জ্ঞান মানে শূন্য, সেইজন্য বৌদ্ধদের পরিভাষা হল নির্বাণ। একটা জ্বলন্ত মশালকে ঘোরালে মনে হবে একটা আলোর বৃত্ত চলছে, চলতে চলতে আলোটা নিভে গেল, বৃত্তটাও চলে গেল। তাহলে কি থাকল? কিছুই থাকল না, এটাই নির্বাণ। চৈতন্যের একটা ধারা চলছিল, চৈতন্যের সেই ধারাটা থেমে গেল, সব কিছু শেষ হয়ে গেল। বৌদ্ধদের দর্শন বেদান্তের এত কাছাকাছি যে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকলে সব গুলিয়ে যাবে। সেইজন্য অনেকে আচার্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলতেন। বৌদ্ধরা বেদান্তে যা যা বলছে, যোগ যা কিছু বলছে সবটাই মানে, কিন্তু একেবারে শেষ অবস্থায় গিয়ে, *বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি* মানে বুদ্ধির নাশ, বুদ্ধির নাশ মানে মনোনাশ, নাশ মানে এরপরে আর কিছু নেই, শূন্য থেকে গেল। একটা প্রদীপ জ্বলছে, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, সব শেষ। জীবন যেমন শেষ হয়ে যায়, সেখানেও সব কিছু শেষ হয়ে যায়, এটাই নির্বাণ, এটাই পরম শান্তি। এই জায়গাতে এসে এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

যা কিছু ইন্দ্রিয়ের গোচর তাকে বলা হয় সৎ। যে জিনিষ ইন্দ্রিয়ের গোচর নয় তাকে বলছেন অসৎ। বেদান্ত বলছে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়। ব্রহ্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয় থেমে যাবে, মন থেমে যাবে, বুদ্ধি থেমে যাবে তার মানে ব্রহ্ম অসৎ। আমরা অসৎ জিনিষের পেছনে কেন দৌঁড়াতে যাব? এই জায়গায় এসে একটা নতুন দিক খুলে যায়। আত্মা বা ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। যুক্তিতর্ক যদি নিয়ে আসা হয় তাহলে যত যুক্তিতর্ক এর পক্ষে আছে ঠিক ততটাই যুক্তিতর্ক বিপক্ষেও আছে। কোন দিকেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না। যুক্তিতর্ক দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে গেলে যে যে যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে প্রমাণিত করবে ঠিক সেই সেই বিপরীত তর্ক এসে যাবে ঈশ্বর নেই প্রমাণে। আবার উল্টো দিক থেকে ঈশ্বর নেই প্রমাণ করতে যত তর্ক নিয়ে আসা হবে ঠিক তত তার বিপরীত তর্ক নিয়ে আসা যাবে ঈশ্বর আছেন বলে। ঈশ্বর ইন্দ্রিয় গোচর নন,

ঈশ্বর আছেন যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না। তাহলে ঈশ্বর আছেন কি করে জানব? ঈশ্বর আছেন এর একমাত্র প্রমাণ হল শাস্ত্র প্রমাণ। ঋষিরা বলে গেছেন, শাস্ত্রে আছে এটাই একমাত্র প্রমাণ।

প্রমাণ মানে method of knowledge, একটা জিনিষকে জানার বিভিন্ন উপায়। অনেকে বলবে গাঁজাখোড়রাও তো অনেক কিছুই বলে, যা হোক একটা বলে দিলেই তো হল। এখানে কিন্তু তা হবে না, কারণ ঋষিরা যাঁরা এই কথা বলছেন, তাঁরা সারাটা জীবন ধ্যান ধারণাতে কাটিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ ঋষিদের কোথাও কোন স্বার্থ ছিল না। এই ধরণের কথা বলে যে তিনি তাঁর কোন স্বার্থের সিদ্ধি করবেন তাও নয়। তৃতীয়তঃ, তাঁদের সারাটা জীবন ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। আজ ঠাকুরকে আমরা অবতার বলছি, বড় বড় মন্দির বানাচ্ছি, ঘরে ঘরে ঠাকুরের পূজো হচ্ছে অথচ নিজের সময় ঠাকুরের খাবারটুকুও ভালো মত জুটত না। আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, ত্যাগ তপস্যাতে সমর্পিত। ঠাকুরের সমগ্র জীবন ত্যাগ তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়, নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির সঙ্কল্প নেই, ঠাকুরের জীবনে যা একেবারেই নেই। এর বাইরে ঠাকুরের জীবনশৈলী আর ইদানিং কালের বাবাজীদের জীবনশৈলীকে মেলাতে গেলে আমাদের মাথা ঘুরে যাবে। ঠাকুরের জীবন সহজ সরল সাদামাটা জীবনধারা। অনেক আগেকার কথা, স্বামী প্রেমেশানন্দজী মুর্শিদাবাদের সারগাছির মত এক গ্রামে মঠ চালাচ্ছেন। একবার একজন ভক্ত মহারাজকে খুব সুন্দর দামী একটা সিল্কের আসন দিয়েছিল। মহারাজ আসনটাকে সব সময় উল্টে রাখতেন। সেবক দেখে একদিন বলছেন 'আসনটাকে যদি উল্টো করেই রাখতে হয় আপনি নিলেন কেন'? মহারাজ সেবককে বলছেন 'দিল তাই নিলাম, কিন্তু আমি যদি সোজা করে রাখি তাহলে এই দামী আসন দেখে গ্রামের গরীব লোকেদের মনে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে'। মহারাজ ব্যবহার করে তাই উল্টে রাখতেন। ঠাকুর বলছেন, টাকা হলে কি হয়, খাওয়া-দাওয়া চলে আর সাধুসেবার জন্য একটু দানধ্যান করা যায়। সাধুর আনুষাঙ্গিক ব্যাবহার্য জিনিষ যদি দামী দামী হয়ে থাকে তাহলে তাঁকে দিয়ে আমার কি লাভ! এই জায়গাতে এসে ধরা পড়ে যায়। যাঁরা ঠিক ঠিক ধর্মগুরু, এই জায়গায় যাঁদের কথা বলা হচ্ছে, সেই ঋষিরা, তাঁদের কাছে কখন ভোগ সামগ্রী থাকবে না। জীবন চালাবার জন্য কিছু জিনিষ তাঁকেও রাখতে হয়, কিন্তু এমন আহামরি কিছু থাকবে না যেটা দেখে সংসারীদের মনে চাঞ্চল্য হবে, আহা! আমারও যদি এরকম একটা থাকত। ঠাকুরের দিকে তাকালে দেখছি তাঁর কিছুই নেই। আবার তিনি শ্রীমাকে একদিন জিজ্ঞেস করছেন, তুমি রাতে কটা রুটি খাও। ভাবলে আমাদের হাসি পায়। ঠাকুর হিসাব করছেন মাসে কত আটা লাগবে, মাসে এত আটা যদি লাগে তাহলে সেই আটার জন্য কত পয়সা লাগবে। ঠাকুর ভাবছেন, ঠাকুরের অবর্তমানে শ্রীমা যে পাঁচ টাকা পেনসন পাবেন সেটা দিয়ে তাঁর চলবে কিনা। যাঁকে এই সামান্য একটু আটার হিসাব করতে হচ্ছে তিনি আবার অবতার, যিনি তাঁর লীলাসহচরী তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি কটা রুটি খাও, আর আমরা তাঁর কাছে কত কিছু প্রার্থনা করছি, টাকা দাও, যশ দাও, এই দাও, সেই দাও। এই ধরণের মানুষ যখন বলছেন ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য, তখন কি হয়? এই তিনটে জিনিষের কথা বলা হল – মশাই! আপনার জীবন কি ত্যাগ তপস্যায় ছিল? অবশ্যই। আপনার কি কোথাও কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে? আমার স্বার্থ বলতে কিছুই নেই যে সিদ্ধ হবে। তাঁর নিজেরও খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাঁর সন্তানদেরও কোন খাওয়ার ব্যবস্থা করে গেলেন না, এখন না হয় তাঁর সন্তানরা যে করেই হোক একটু দাঁড়িয়ে গেছে। আর তৃতীয়, তাঁর নিজের জীবনে ভোগের কিছু নেই। এই লোক মিথ্যে কথা কেন বলতে যাবেন? ভোগবাদীরা, নাস্তিকরা বলবে লোকটার মাথা খারাপ ছিল। সেইজন্য ঠাকুর আগে থাকতেই বলে রেখেছেন, জড়ের চিন্তা করে করে তোমাদের খুব বুদ্ধি আছে আর আমি চৈতন্যের চিন্তা করে করে বেহেড হয়ে গেছি! সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব যুক্তিকে ধারণা কর খুব মুশকিল। ঈশ্বর চিন্তন মানে চৈতন্যের চিন্তা করা, চৈতন্যের চিন্তা করে কখনই কেউ বেহেড হয়ে যায় না।

দ্বিতীয় বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে ঋষিরা, অবতার পুরুষরা এই একই কথা বলেছেন। আর সবারই ক্ষেত্রে একই জিনিষ প্রযোজ্য, তাঁরাও ত্যাগ তপস্যাতে সমর্পিত, তাঁদের জীবনও স্বার্থগন্ধশূন্য। এই ধরণের মানুষ কেন মিথ্যা কথা বলতে যাবেন! যে কথাগুলো তাঁরা বলছেন সেগুলো সব সিদ্ধান্ত বাক্য, যেটা নিয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করলাম। এখানে ব্যক্তি বলে কিছু নেই। ঠাকুর যদি বলতেন, আমি অবতার তোমরা আমাকে মান, তাহলে আমরা ঠাকুরকে অবশ্যই সন্দেহ করতাম। তখন তাঁর কথাগুলো ব্যক্তির বা ব্যক্তিত্বের কথা হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু একবারও সেই কথা বলছেন না। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু, কামিনী-

কাঞ্চন ত্যাগ করলে মন ঐদিকে যায়, সাধুসঙ্গ করতে হয়। সবাই বিশ্বাস করতে পারবে না, কিন্তু কিছু দিন সাধুসঙ্গ করে দেখুক নিজেই বুঝতে পারবে কি হয়। ঠাকুরের আবার ব্যক্তিত্বের কথাও আছে, একদিন এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে। সেই অর্থে এটা কোন সিদ্ধান্ত বাক্য নয়, যে অর্থে আমরা সিদ্ধান্ত বাক্য মনে করি। যিশুর পূজা করা আর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করাতে কিছু আসে যায় না। যে আদর্শকে নিয়ে তাঁরা ছিলেন তার পূজা দরকার। স্বামীজী বলছেন, I am a voice without a form, formটাই ব্যক্তিত্ব voiceটাই principle। যে সিদ্ধান্তকে বলছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তি কখন important হন না। এই জিনিষগুলিকে আমরা সহজে ধরতে পারি না, কিন্তু যত গভীরে যাওয়া যাবে তত বোঝা যাবে। উপনিষদ যা বলছেন সবটাই সিদ্ধান্ত, এগুলোই principles। তুমিও ধ্যান-ধারণা করতে থাক, যত গভীরে যাবে তুমিও সব জানতে পারবে।

ভগবান বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্যরা, তাঁরাও কিন্তু সাধনাতে ছিলেন। এই জায়গাতে এসে বেদান্ত আর বৌদ্ধদের দর্শনে একটা সংঘাত লাগে। একবার নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুরকে বলছেন, ভগবান বুদ্ধ ঈশ্বর মানতেন না, তিনি নাস্তিক ছিলেন। শুনে ঠাকুর চমকে উঠে বলছেন, এটা তাঁর পথ নয়, ভগবান বুদ্ধের এই মত ছিল না। আসলে আমাদের পক্ষেও বলা খুব মুশকিল, কারণ ঈশ্বরকে নিয়ে যখনই কেউ ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করতেন, ভগবান বুদ্ধ একটা হেঁয়ালি কিছু বলে দিয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতেন। কারণ যিনি অবাঙমনসগোচরম্, যাঁকে মন দিয়ে ধরা যায় না, বাক্য দিয়ে যাঁকে ব্যক্ত করা যায় না, ভগবান বুদ্ধের কাছে তাঁর ব্যাপারে দু-চারটে মুর্খ লোককে বলাটা নিরর্থক মনে হত। আরও মারাত্মক হল, ঐ সময় শিষ্যরা যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁরা হেঁয়ালি জিনিষটাই বেশি বেশি করে তুলে ধরলেন, তার সাথে শূন্যবাদকে, কিছু থেকে যায় না, এটাকেই তাঁদের দর্শনের মূল স্তম্ভ করে দিলেন। বৌদ্ধদের দর্শন পড়লে সবারই খুব logical মনে হবে। নাগার্জুন তাঁদের একজন খুব নামকরা দার্শনিক ছিলেন, তাঁর মত কয়েকজন দার্শনিক এমন জোরালো ভাবে বৌদ্ধ দর্শনকে দাঁড় করিয়েছেন যে পরবর্তি কালে এদের উত্তর দেওয়ার জন্য বেদান্তকে প্রচুর খাটতে হয়েছে। অবশ্য তাতে বেদান্ত আরও সমৃদ্ধ হয়ে গেছে।

এখানে আলোচনার মর্ম হল, ইন্দ্রিয় দিয়ে যাঁকে জানা যায় না, মন এবং মনেরও উপরে যে বুদ্ধি সেখানেও যখন কোন চাঞ্চল্য হয় না, তখন সেই জিনিষের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এর একেবারে নিম্ন প্রান্তে আছে চার্বাকরা আর এর সব থেকে উচ্চ প্রান্তে আছেন বৌদ্ধরা। অন্য দিকে যোগকে বৌদ্ধরাও মানছেন, *অপ্রমত্তস্তদা ভবতি* তাঁরাও মানছেন, এগুলোই ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের শিক্ষা দাঁড়িয়ে আছে অপ্রমত্ত হওয়াতে, যেখানে বলছেন সমস্ত দুঃখের নাশ হয়ে যায় আর বুদ্ধি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কিন্তু শেষ কথাতে তাঁরা বলছেন শূন্য। এই জায়গাতেই বেদান্ত বৌদ্ধদের বিরোধিতা করছে। একটা মতে বলে যে কঠোপনিষদ বৌদ্ধদের উত্তর দেওয়ার জন্যই পরে রচিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের পরম্পরার কোন পণ্ডিতই এই তথ্য মানবেন না। আসলে ভগবান বুদ্ধ যে চিন্তাধারাকে অবলম্বন করেছিলেন, এই চিন্তাধারা বুদ্ধের আগে থেকেই ভারতবর্ষে ছিল। বিভিন্ন ধরণের চিন্তাধারা ভারতে চিরদিনই ছিল। যদি তুমি বল শেষে শূন্যই থেকে যায়, তখন তার উত্তরে এখানে পরের মন্ত্রে বলছেন –

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবোতহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।।২/৩/১২।।

(পরমাত্মা বাক্যের দ্বারা অবগত হন না, মনের দ্বারাও না, চক্ষুর দ্বারাও নয়। 'অস্তি', এই রূপে যাঁরা আত্মার সম্বন্ধে উল্লেখ করে, সেই আস্তিকগণ থেকে ভিন্ন নাস্তিকগণের কাছে ব্রহ্ম কি রূপে উপলব্ধ হবেন?)

এর আগে যে principles and words of personality নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছিল কোথাও কোথাও সিদ্ধান্ত আর ব্যক্তিত্বের কথা মিশে যায়, এই মন্ত্রে প্রথম লাইনে সিদ্ধান্ত আর ব্যক্তিত্বের কথা দুটো মিশে আছে। যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, বা গুরু শিষ্যকে বলছেন, *নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা*, বচন দিয়ে তাঁকে জানা যায় না, মন দিয়েও তাঁকে জানা যায় না, *অবাঙমনসোগোচরম্*। শিষ্যের মনে সন্দেহ এসেছে, শব্দ দিয়ে যদি না জানা যায়, মন দিয়েও যদি জানা না যায় তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাবে। গুরু তখন বলছেন, যেহেতু গুরুর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে সেইহেতু এখন তুমি এটা মেনে নাও, সাধনা করে করে যখন তুমি এগিয়ে যাবে তখন তুমিও এর সত্যটা জানতে পারবে। শুরু হচ্ছে words of

personality থেকে, শেষ হচ্ছে principleএ গিয়ে। আসলে এটা principle, কিন্তু আসছে words of personality থেকে। বলছেন, যদিও ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, শব্দ দিয়ে জানা যায় না, মন দিয়ে জানা যায় না, কিন্তু সমস্ত জগতের মূল হল সেই তত্ত্ব। কি সেই তত্ত্ব? আত্মা, আত্মতত্ত্বই সমস্ত কিছুর মূল। বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে ফেরার পর স্বামীজী একটি বক্তৃতায় বেদান্ত আর বৌদ্ধ ধর্মকে তুলনা করে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেখানে তিনি বলছেন, গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার বাইরে গঙ্গার আর কোন অস্তিত্ব নেই, আর গঙ্গায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। বেলুড় মঠের মায়ের ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছি প্রতি মুহূর্তে গঙ্গার জল পাল্টে যাচ্ছে। বৌদ্ধরা এটাকে বলছে চৈতন্যের ধারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বামীজী বলছেন, গঙ্গা এই জন্যই বয়ে যাচ্ছে তার কারণ গঙ্গার নীচে একটা রিভার বেড আছে, যাকে অবলম্বন করে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যাবতীয় চেতনার যে বোধ আমাদের মনে হয়ে চলেছে, তার নীচে একটা আধার আছে সেইজন্য সব কিছু চলছে। এই আধারই আত্মা। এর আগেও এই আধার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুর আধার হলেন আত্মা। কারণ অস্তিত্ব, সত্তার আধার না থাকলে কোন জিনিষকে কখনই বোঝা যাবে না। আধার না থাকলে তার অস্তিত্বই থাকবে না। বস্তু থাকলে তার একটা আধার থাকতে হবে, বস্তুর নাশ হয়ে গেলেও আধারের কখন নাশ হয়ে যাবে না। এই করে করে যখন নীচের দিকে যাবে তখন একেবারে শেষ দেখবে সৎবুদ্ধি হল শেষ, যেখানে সব কিছু আশ্রিত।

খুব সহজ উদাহরণ মাটির গ্লাশ, মাটির ঘট, মাটির থালা, এগুলোকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ঘটকে যদি নাশ করে দেওয়া হয় ঘট আবার মাটিতে মিশে যাবে। মাটিকেও যদি বিলয় করে দিতে চাই তখন মাটি জিনিষটা বিলয় হয়ে বিভিন্ন ধরণের বস্তুতে মিশে যাবে। তার মানে স্থূল জিনিষকে নাশ করে দিলে সেই জিনিষটাই আরও সূক্ষ্ম জিনিষে গিয়ে বিলয় হয়ে যায়। কিন্তু যে জিনিষে বিলয় করে যাচ্ছে তারও সত্তা আছে। যে কোন বস্তুকে যার সত্তা আছে, যদি নাশ করে দেওয়া হয় ওর নাশ সব সময় অন্য একটা সত্তাতে গিয়ে হবে, যেটা সেই সত্তা থেকে আরও সূক্ষ্ম। হিন্দুদের মতে দুটি সত্তা, দেহ আর দেহের মধ্যে জীবাত্মা। আত্মা আর স্থূল শরীর মিলিয়ে জীব তৈরী হয়েছে। আমরা সবাই স্থূল শরীর আর আত্মার একটা সম্মিলিত রূপ। মারা গেলে দেহের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে, হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে রক্ত নীচ থেকে জমতে শুরু করবে, অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও কোষে জীবন থাকবে না, শরীরের ব্যাকটেরিয়া গুলি তুলকালাম শুরু করে দেবে, সেখান থেকে শরীরটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যাবে, শরীরের তাপমাত্রা কমে আশেপাশের তাপমাত্রায় চলে যাবে আর শরীরে পচন আসতে শুরু হবে। শরীরে পচন আসার জন্য দুর্গন্ধ ছাড়তে শুরু করবে। তারপর এই শরীরটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হল। পোড়াতে গিয়ে শরীরের কিছু জিনিষ বাতাসে মিশে গেল, কিছু জিনিষ ছাই হয়ে পড়ে থাকল। সবাই বলতে শুরু করে দিল অমুক শেষ হয়ে গেল, তিনি মারা গেছেন, তাকে দাহ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ হয়ে কোথায় যাবে? স্থূল রূপে ছিল সে এখন আরও যে সূক্ষ্ম অস্তিত্ব আছে সেই সূক্ষ্মে চলে গেল। আর তার জীবাত্মা, যিনি এই স্থূল রূপে খেলা করছিলেন, তিনি এই শরীর থেকে বেরিয়ে গেছেন, তার আর কাণ্ডকারখানা দেখা যাবে না। শরীরের মলিক্যুলস্ গুলি এখন অন্য একটা জায়গায় গিয়ে আরেক ধরণের কাজ করবে আর জীবাত্মা আরও অন্য কিছু করবে। মূল হল, স্থূল জিনিষের অস্তিত্ব অন্য একটা অস্তিত্বে যেটা তার থেকেও সূক্ষ্ম সেখানে চলে গেল। আমরা বলি তার শরীরটা পঞ্চভূতে চলে গেল, পঞ্চভূত ছেড়ে দিয়ে না হয় এই বাতাসই নিচ্ছি। বাতাসকে যদি লয় করতে হয় তাহলে কোথায় যাবে? বিভিন্ন যে গ্যাস আছে সেই উপাদানে চলে যাবে। অক্সিজেন লয় হয়ে গিয়ে কোথায় যাবে? যেহেতু সব কিছু হাইড্রোজেন থেকে এসেছে সব হাইড্রোজেনে গিয়ে লয় হয়ে গেল। হাইড্রোজেনও লয় হয়ে গিয়ে এনার্জিতে চলে যাবে। তার মানে অস্তি, অর্থাৎ আছে জিনিষটা সব সময়ই থেকে যাচ্ছে, শুধু লয়টা আরও সূক্ষ্ম, ঐ সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মে গিয়ে লয় হয়ে যাচ্ছে। শরীরকে নিয়ে বলা হল, শুধু শরীরই নয় যে কোন বস্তুরই একই জিনিষ হবে। এই গ্লাশ ভেঙে গেলে এটাই কাঁচ হয়ে যাবে, কাঁচেরও যদি নাশ করে দেওয়া হয় তখন সেটাই সিলিকন হয়ে যাবে। সিলিকনকেও যদি নাশ করে দেওয়া হয় তখন সিলিকন এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যেদিক দিয়েই দেখা হোক না কেন, অস্তিত্ব যেটা, সত্তা যেটা, এটাকে কোন ভাবেই নাশ করা যায় না। সত্তা শুধু আরও সূক্ষ্ম সত্তায় বিলয় হয়।

এবার বলছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে যদি লয় করে দেওয়া হয় তাহলে একটা জিনিষ থেকে যাবে সেটা হল সৎ বুদ্ধি। সৎ বুদ্ধি মানে, বুদ্ধিতে যে সৎ ভাব, যে অস্তিত্ব ভাব আছে সেটাতে লয় হয়। চলছিল বস্তুর কথা সেখান থেকে সরে চলে গেলেন বুদ্ধিতে। আসলে আমরা কোন জিনিষকে যখন জানছি আমাদের বুদ্ধি দিয়েই জানছি, সব কিছুতে এই বুদ্ধিই থাকে। গ্লাশের নাশ হয়ে গেলে গ্লাশ বুদ্ধি মিশে যায় কাঁচ বুদ্ধিতে, কাঁচ বুদ্ধি মিশে যায় সিলিকন বুদ্ধিতে, সিলিকন বুদ্ধিটা মিলে যায় এনার্জি বুদ্ধিতে। ছোটবেলা থেকে বহির্জগৎ করে করে আমাদের ট্রেনিং এমন হয়ে গেছে যে আমরা ভুলে যাই যে বাইরে কিছুই হয় না, সব আমাদের মস্তিষ্কেই হয়। আর সব কিছুই যখন চলে যাবে তখন সৎ বুদ্ধি অর্থাৎ আমি আছি বা জিনিষটা আছে এই বুদ্ধিটা থেকে যাবে। সেইজন্য সব কিছুর শেষ হয় সৎ বুদ্ধিতে গিয়ে, সৎ বুদ্ধি মানে অস্তিত্ব বোধ। বুদ্ধির যে অস্তিত্ব বোধ, আমি আছি, অহম্ অস্মি এই বোধটাই শেষ বোধ যেখান থেকে বাকি সব কিছু বেরিয়ে আসছে। আমাদের মনে হতে পারে খুব উচ্চ দর্শনের খুব কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, কিন্তু এটা একটা অত্যন্ত সহজ জিনিষ।

আমাদের মন অতি সাধারণ, ইদানিং বিজ্ঞানের দৌলতে মন আরও বেশি বহির্মুখী হয়ে গেছে। বহির্মুখী হওয়ার জন্য এই গ্লাশ, গ্লাশের জল, গ্লাশের ঢাকনা এগুলোর গুরুত্ব বিরাট হয়ে গেছে। আসলে এগুলোর কোন গুরুত্ব নেই। যেখানে আমি কেন্দ্র, সেখানে আমার মস্তিষ্কে সব কিছুর যে আইডিয়া গুলো আছে তার গুরুত্ব বেশি। গ্লাশের নাশ হয়ে গেল এটা কাঁচে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কাঁচেই পরিবর্তিত হোক আর যেখানেই পরিবর্তিত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিটাই পাল্টাচ্ছে। আর বুদ্ধি বৃত্তি যেটা স্থূল জিনিষকে ধরে রাখছিল সেটা এখন আরও সূক্ষ্ম জিনিষকে ধরছে, কিন্তু ধরছে অস্তিত্বকে। কথার কথায় যদি ধরে নিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু নাশ হয়ে গেলেও এই সৎ বুদ্ধি থেকে যাবে, আমি আছি। কারণ এই সৎ বুদ্ধিও যদি চলে যায় তাহলে তো এই জগতের ব্যাপারে কোন প্রমাণ থাকবে না। প্রমাণ মানে, এটাকে সত্য সাব্যস্ত করছে আমাদের বুদ্ধি। বুদ্ধি যার নেই তার কাছে জগৎ নেই। বুদ্ধি আছে বলে জগৎও আছে। সব কিছুর শেষ প্রমাণ হল বুদ্ধি। আচার্য শঙ্করও বারবার বলছেন, শাস্ত্র যদি এমন কোন কথা বলে যেটা তার বুদ্ধির জ্ঞানের বিপরীত তখন শাস্ত্রের কথাকে নেওয়া যাবে না। শাস্ত্র যদি বলে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরছে, কিন্তু বিজ্ঞান যখন বাস্তবিক দেখিয়ে দিচ্ছে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে তখন শাস্ত্রের কথা না নিয়ে বিজ্ঞানের কথাই নিতে হবে। এই ব্যাপারে বেদান্ত একেবারে পরিষ্কার। যে জিনিষকে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান দিয়ে জানা যাচ্ছে, সেখানে অন্য কোন কথাই গ্রাহ্য হবে না। তার মানে জগতের যে কোন জ্ঞানের আসল মালিক হল বুদ্ধি, এই বুদ্ধিকে কোন দিন প্রশ্ন করা যাবে না। সেইজন্য অস্তি ভাব, সৎ ভাব, আছে কি নেই, এর একমাত্র মালিক হল বুদ্ধি। বুদ্ধিতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যদি বিলয় হয়ে যায়, তখন কোথাও কিছু নেই। তখন কি থাকবে? অহম্ অস্মি। এটাই ব্রহ্মা বলছেন, আমি এক আমি বহু হব। ব্রহ্মার প্রথম ভাব আসছে আমি আছি, আমি এবার বহু হব। ঐ সৎ ভাব, আমি আছি, এবার সেখান থেকে সব বেরিয়ে আসতে শুরু করবে। এই কথাগুলো আগেও আমরা শুনেছি, বইতেও পড়েছি, কিন্তু জিনিষটাকে ধারণা করাই খুব কঠিন। অথচ এই জিনিষটাকে যদি ধারণা না করতে পারা যায় তাহলে জেনে নিন সে কোন দিন শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে পারবে না।

আমাদের পূর্ব পুরুষরা এই সব উচ্চমানের সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন, ঠাকুর স্বামীজী এসে এগুলোকে পুনর্জীবিত করলেন। স্বামীজী বারবার বলছেন, go back to Upanishads। এটাই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য, পুরো ধর্মটাই দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধান্তের উপর। কিন্তু আমরা ঘুরে ফিরে সেই এক উপদেশ পালন করে যাচ্ছি, চরণামৃত খাও, বাতাসা খাও তাতেই মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। এটা আমাদের সিদ্ধান্তই নয়, আমাদের ধর্ম দর্শনও নয়। আমাদের ধর্ম দর্শন দাঁড়িয়ে আছে গীতার এইসব মহাবাক্যে *‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো’*, এই শরীর থাকতে থাকতে এখানেই সব কিছুকে জয় করতে হবে। এরজন্য বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম করতে হবে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে জিনিষটাকে ধরার চেষ্টা করতে হবে। প্রথম কথা বলছেন অস্তি বুদ্ধি, সৎ বুদ্ধি, যত যা কিছু আছে, যত জিনিষের অস্তিত্ব আছে, এর সব কিছুকে নাশ করে দিতে পারেন, কিন্তু সব কিছু গিয়ে শেষে সৎ বুদ্ধিতে লয় হয়ে যায়। স্বামীজীকে শিষ্য ঘটত্ব নিয়ে যখন প্রশ্ন করছেন তখন স্বামীজী বলছেন, জগতের সমস্ত ঘটকে নাশ করে দেওয়া যায়, কিন্তু ঘট আইডিয়া রূপে কখনই নাশ হবে না। এটা হল দ্বিতীয় ধাপ, কিন্তু এর মৌলিক ধাপ হল, আইডিয়া রূপেও ঘট নাশ হয়ে যেতে পারে কিন্তু বুদ্ধিতে যেখানে ঘটের ঐ আইডিয়াকেও নাশ করে দেওয়া হল, ঐ সৎ বুদ্ধির কখন নাশ হবে না।

আমরা এখন আধ্যাত্মিকতার অত্যন্ত সুগভীর তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এগুলোকে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন, বুঝে নেওয়ার পর ধারণা করা আরও কঠিন। প্রথম কথা হল, এই তত্ত্বগুলিকে বুঝতে হলে আমাদের জগতের অনেক কিছু থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে হবে। অনেক কিছু থেকে হয়ত আমরা নিজেদের সরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হব কিন্তু ধর্মের যে গতানুগতিক আড়ম্বরের মধ্যে আমরা বড় হয়ে এসেছি, এই আড়ম্বর থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য। ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমরা কোন দিন আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না। কেন পারা যাবে না বোঝার জন্য একটা কাহিনী বলা হচ্ছে।

এক রাজ্যের রাজা মারা গেছে। এবার কে রাজা হবে বলাতে বলে দেওয়া হল রাজা বেছে নিতে হবে। কি করে বাছা হবে? একটা হাতির শুঁড়ে মালা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল, হাতি যার গলায় মালা দেবে তাকেই রাজা করতে হবে। সেই মালা গিয়ে পড়ল এক হালুইকারির গলায়। লোকটি খুব ভালো পায়েস বা ক্ষীর রান্না করত, ক্ষীর ছাড়া অন্য আর কিছু রান্না করতে জানত না। রাজা তো করে দেওয়া হল। রাজা হওয়ার পর ওর কাছে যে সমস্যা নিয়েই যাওয়া হোক, যেমন বলা হল, হুজুর! এ চুরি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজা বলে দিল, যাও! ক্ষীর বানাও ক্ষীর খিলাও। হুজুর এ মার্ডার করেছে। যাও! ক্ষীর বানাও ক্ষীর খিলাও। হুজুর প্রজারা খাজনা দিচ্ছে না, যাও! ক্ষীর বানাও ক্ষীর খিলাও। অন্য কিছু আর জানেই না। শত্রু আক্রমণ করেছে, তখনও আদেশ দিয়ে দিচ্ছে ক্ষীর বানাও ক্ষীর খিলাও। শত্রুরা রাজাকে ফাঁসি দিতে যাচ্ছে, রাজাকে জিজ্ঞেস করছে, এখন কি হবে? ঔর ক্যায়া করেঙ্গে! ক্ষীর বানায়েঙ্গে ক্ষীর খিলায়েঙ্গে। এই বলে ফাঁসিতে ঝুলে গেল। ভক্তদের দর্শন, তাদের ধর্মের আড়ম্বর এখন এটাই হয়ে গেছে, খিচুড়ী বানাও খিচুড়ী খিলাও। এই দিয়ে ধর্ম চলে না।

যে কোন সংগঠন বা কমিউনিটি জীবন হল মধ্যম শ্রেনীদের জন্য। প্রতিভাবানদের জন্য কোন সঙ্ঘবদ্ধ জীবন নয়। যার জন্য দেখা যায় কোন বাঁধাধরা সিস্টেমে প্রতিভাবানরা খুব বেশি দিন টিকে থাকতে পারেন না, তাঁরা নিজের পথ নিজেরাই বার করে নেন। ইদানিং কালে বরিষ্ঠরাও বলতে শুরু করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনও মধ্যম শ্রেনীদের জন্য, তোমার যদি বেশি বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, প্রতিভা থাকে এখানে তুমি কষ্ট পাবে, তুমি অন্য রকম পথ দেখ, এটা তোমার উপযুক্ত জায়গা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন আধ্যাত্মিক মহামানব ছিলেন, স্বামীজীও তাই ছিলেন, স্বামী সারদানন্দজীও একদিকে আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ অন্য দিকে প্রতিভাবান দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তাঁদেরই বংশধর, যাঁরা এই সংগঠনকে ধরে আছেন তাঁদের নাকি মিডিওকার হতে হবে, এটা কি কখন যুক্তিতে দাঁড়াতে পারে! এই জগতে যে কোন প্রফেশান মিডিওকাররাই চালায়। কলকাতার সব ডাক্তারদের এক জায়গায় জড়ো করে দেখুন সবাই মিডিওকার। সব ইঞ্জিনিয়ারকে এক জায়গায় নিয়ে আসুন সেখানেও সবাই মিডিওকার, যে কোন প্রফেশান নিয়ে নিন মিডিওকাররাই সেই প্রফেশানকে ধরে রেখেছে। অথচ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, শিক্ষকদের সম্মান করা হয়। কেন সম্মান করছে? কারণ ঐ সিস্টেমে দুই একজন আছেন যাঁরা সত্যিকারের প্রতিভাবান। ঐ দুজন প্রতিভাবানের প্রতিভার জন্য বাকিরা সবাই সম্মান পায়। যে কোন প্রফেশানে দুই একজন থাকেন যাঁরা ঐ সিস্টেমকে প্রাণবন্ত করে রাখেন। সব ডাক্তাররা মিডিওকারই হয় তাই বলে কি দু চারজন যে প্রতিভাবান ডাক্তার আছেন তাঁরা গলায় দড়ি দিয়ে দেবেন? কখনই দেবেন না, কারণ ঐ দু চারজন ব্যতিক্রমী তাঁরাই নিজের জগৎকে আলো করে রাখেন। এই ধরণের প্রতিভা যখন কমে যায় তখন ঐ প্রফেশানও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। যেমন যারা মাটির ঘট বানাচ্ছে, এই কুম্ভকাররা সবাই মিডিওকার। যখন এই প্রফেশন খুব প্রবল ছিল তখন এই প্রফেশানে কিছু প্রতিভাবানও ছিলেন। এখনও যদি দু একজন প্রতিভাবান কুম্ভকার থাকে লোকেরা এখনও তাঁর কাছেই যাবে। কিন্তু মিডিওকাররাই ছিল, তারপর অন্য অনেক বিকল্প জিনিষ এসে যাওয়াতে পুরো শিল্পটাই শেষ হয়ে যাচ্ছে। মিডিওকারদের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে সমস্যা, যখন অন্য বিকল্প কিছু এসে যায় তখন ঐ প্রফেশানটাই নাশ হয়ে যায়। যেমন আয়ুর্বেদ চিকিৎসা মিডিওকারদের হাতে ছিল, হোমিওপ্যাথি এসে যাওয়ার পর এরা আর তাই দাঁড়াতে পারল না। আমরা গর্ব করে বলি আয়ুর্বেদ ভারতে চার পাঁচ হাজার বছর ধরে চলছে। কিন্তু একটাও রোগ সারাতে পারছে না। কারণ মিডিওকারদের হাতে চলে গিয়েছিল।

ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ধর্ম, মিডিওকার বললে বোধ হয় বেশি সম্মান দেওয়া হয়ে যাবে, সরাসরি বলে দেওয়া যায় অধম ভক্তদের হাতে পড়ে গেছে। খিচুড়ী বানানো আর খিচুড়ী খাওয়ানো ছাড়া এরা আর কিছু

জানে না। এখানে যে দীর্ঘদিন ধরে কঠোপনিষদের আলোচনা চলছে, ধৈর্য ধরে যাঁরা শুনে যাচ্ছেন, এটাই অবাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপার। যারা খুব ফ্যানাটিক হয়, যেমন মুসলমানরা বলে আমি আল্লার কাজ করছি, ঠিক তেমনি যাঁরা এখানে কঠোপনিষদের গভীর আলোচনা শুনছেন তাঁদেরকেও একটা ব্রত নিতে হবে। ফ্যানাটিক ভাব নিয়ে বলতে হবে আমরা হলাম ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ভাবের, হিন্দু ধর্মের সংরক্ষক, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকা, হিন্দু ধর্মের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরতে চাই। খিচুড়ী খাওয়া, বাতাসা খাওয়া, চরণামৃত পান করা অনেকে হয়েছে আর আমার লাগবে না। এগুলোর বাইরেও ঠাকুরের আরেকটি রূপ আছে। সেই রূপটি কী? বেদ, উপনিষদ, গীতার বাণীর মূর্ত রূপ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সর্বশাস্ত্রের living commentary, জীবন্ত ভাষ্য। কঠোপনিষদে এখন যে কথাগুলো যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, এই কথাগুলোই ঠাকুরের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। যতক্ষণ না আমরা এই দায়ীত্ব না নিচ্ছি, আমি তো কোন মান-সম্মান পাওয়ার জন্য কঠোপনিষদ অধ্যয়ন করছি না, দুটো লোক আমাকে সম্মান করবে, দুটো পয়সা উপার্জন করতে পারব এর জন্য আমরা এখানে উপনিষদের কথা শুনছি না, আমরা এখানে আলোচনা শুনেছি, শোনার পর আমাদের মনে হল হিন্দু ধর্মের প্রতি আমাদের একটা দায়ীত্ব আছে, ভারতবর্ষের প্রতি দায়ীত্ব আছে, ঠাকুর মা স্বামীজীর প্রতি দায়ীত্ব আছে। এখানে যে উচ্চ চিন্তন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, এর মর্মকে আগে আমি অনুধাবন করব, অনুধাবন করার পর আমরা আরও পাঁচজনকে এই দিকে নিয়ে আসব। কেউ যদি নাও আসে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, আমরা কিন্তু প্রস্তুত।

এর আগে বলা হয়েছিল, কথা সব সব সময় তিন ভাবে আসে, person, personality আর principle, এই তিনটে উপর কথা চলে, একজন লোক বলছেন, ব্যক্তিত্ব বলছেন আর সিদ্ধান্ত বলছে। যে কোন বক্তা শুধু সিদ্ধান্তকে নিয়ে যদি না চলে তখন বুঝতে হবে উনি তত্ত্বটা ধরতে পারছে না। কারণ সিদ্ধান্ত খুব সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম জিনিষকে ধরার জন্য দরকার সূক্ষ্ম বুদ্ধি। ঐ সূক্ষ্ম জিনিষকে যিনি ধরতে পারেন না, তখন তিনি নেমে যাবেন personality based talksএর উপর। Personality based talks মানে, ঠাকুর এই রকম বলেছিলেন, আপনাদের কোন চিন্তা নেই, শ্রীমা এই কথা বলেছেন কোন চিন্তা নেই। মা বলছেন শরৎও আমার ছেলে আমজাদও আমার ছেলে, আমজাদকেও মা সমান স্নেহে রুটি খাওয়াচ্ছেন। সেইজন্য আমি সবাইকে অকাতরে রুটি খাইয়ে যাব। কিন্তু এগুলো আমাদের ধর্ম নয়। এই ধর্ম পালন করার জন্য অনেকেই আছেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই ধর্ম পালন করে যাচ্ছে। দু-চারজন ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন। অনেকেই এগুলো করছেন, আপনি দায়ীত্ব নিন ধর্মের উচ্চ আদর্শকে স্থাপন করার জন্য। দূর্গাপূজায় খিচুড়ী বানাবেন খিচুড়ী খাবেন, বছরের চারটে দিন খিচুড়ী খাওয়ান আর খান, বাকি তিনশ একষট্টি দিন এই কাজের জন্য রাখুন, বলুন এটাই আমার ধর্ম, এটাই আমার জীবন, এই উচ্চ আদর্শে আমি নিজেকে উৎসর্গ করলাম।

কোন সন্ন্যাসী, তিনি নিজের কলেজ জীবনে খুব কৃতী ছাত্র ছিলেন, সবাই তাঁকে খুব সম্মান করতেন। সেখান থেকে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে কুড়ি বছর সন্ন্যাস জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কুড়ি বছরে আপনার কি achievement? যখন কলেজে পড়তেন সবাই তখন আপনাকে একজন প্রতিভাবান ছাত্র বলত। সন্ন্যাস নেওয়ার পর লোকেরা আপনার শুধু আরতি করতে বাকি রেখেছে। যদি বলেন সন্ন্যাসী হয়ে সেন্টারে সেন্টারে কাজ করেছি আর লেকচার দিয়েছি। কুড়ি বছর ধরে আপনি শুধু এই করে গেলেন! ঠাকুর বলছেন, দুই ভাই ছিল, দাদা যোগবিদ্যা শিখে এসে জলের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। ভাই দেখে বলছে 'দাদা! তুই কুড়ি বছর ধরে শিক্ষা নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই দু-পয়সার বিদ্যা আয়ত্ত করলি! আমি তো দু পয়সা দিয়ে নৌকা করেই নদী পেরিয়ে যাই'।

একবার কয়েকজন সন্ন্যাসী অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। শেষনাগের কাছে একটা জায়গায় কয়েকজন টেলিফোনের টেকনিশিয়ানদের সাথে দেখা হয়েছে। ঐ সময় চারিদিকে প্রচুর সন্ত্রাস চলছিল। এক টেকনিশিয়ান একজন সন্ন্যাসীকে বলছিল 'আমাদের এখানে বহু কষ্টে থাকতে হয়। এখন আমাদের কোন চাকরি নেই, কাজকর্ম নেই। আমি আজ দশ বছর ধরে টেলিফোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি, দশ বছরে এই ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিয়েছি, ফোনের যদি কানেকশান না থাকে আমি জানি সমস্যাটা কোথায়, আমি ঐ সমস্যার মধ্যে নেমে ফোন সারিয়ে দেব। আপনি বলছেন আপনার কুড়ি বছর সন্ন্যাস জীবন হয়ে গেছে। আমি তো আশা করব যে আপনার এতদিনে এতটা যোগশক্তি হয়ে গেছে যে আপনি বললে ভগবান আপনার কথা

শুনবেন, আপনি ভগবানকে একটু বলুন যাতে আমাদের এই কষ্ট চলে যায়, এখানে আমরা একটু শান্তিতে থাকতে পারি'। সন্ন্যাসী বললেন 'এভাবে কিছু হয় নাকি'! তখন ঐ টেকনিশিয়ান অত্যন্ত বিদ্রুপের সঙ্গে বলল 'আপনি তাহলে কুড়ি বছর ধরে সন্ন্যাসী হয়ে করেছেনটা কি? দশ বছর কাজ করে আমি যদি একটা অবস্থায় আসতে পারি যেখানে আমি আমার subjectকে ভালো ভাবে রপ্ত করেছি। কুড়ি বছরে আপনি যদি নিজের এলাকাকে ভালো না জানেন তাহলে আপনি এতদিন কি করলেন'! সন্ন্যাসীর কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনেক পথ আছে ঠিকই, কিন্তু সন্ন্যাসী যাই উত্তর দিক সন্ন্যাসী নিজে সন্তুষ্ট হবেন কিন্তু তার সামনের লোকটি কোন দিন তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হবে না। সন্ন্যাসী মনে করতে পারেন সামনের লোকটি মুর্খ, ওর কোন পাত্রতা নেই, কিন্তু সেটা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীর কোন পাত্রতা নেই যে লোকটিকে বোঝাবে। কুড়ি বছর আগে ঘরবাড়ি সব কিছু ছেড়ে আপনি সন্ন্যাসী হয়েছেন আর আপনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে ঠাকুর শুনবেন না, কি করে হয়! তাহলে আপনি কি করেছেন এতদিন! যারা ভক্ত তাঁরাও জানেন যে এভাবে হয় না। কিন্তু একজন সাধারণ লোক সন্ন্যাসীর কথায় কখনই সন্তুষ্ট হতে পারবে না, কারণ কুড়ি বছর সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করে কিছুই করতে পারবেন না এটা তারা কোন দিন মানতে পারবে না। তার কাছে সে একজন নিষ্ঠাবিহীন সন্ন্যাসী, নিষ্ঠাহীন সন্ন্যাসীকে তারা কী সম্মান করবে!

এই আলোচনা আমরা এই জন্যই করছি, আমরা এখন যে মন্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এগুলো খুবই গভীর অর্থবহ, খুব শ্রদ্ধার সাথে মন্ত্রের ভাব বোঝার চেষ্টা করতে হবে আর তার সাথে এই দায়ীত্ব নিতে হবে যে, আমি নিজে বুঝে আরও পাঁচজনকে বোঝাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব, এই দায়ীত্ব আমাকেই নিতে হবে। জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, আমি এখন শাস্ত্রের অমৃতকুম্ভে পড়ে গেছি। জেনেশুনেই পড়ি আর কেউ ঠেলে ফেলে দিক আমি অমর হয়ে গেছি। এখন আমার দায়ীত্ব হল সত্যকে জানা। আমাদের পূর্বজরা, ঋষিরা এই সত্যকে কিভাবে দেখেছিলেন, সেই সত্যকে ঠিক ঠিক জানা, জিনিষটা এই। যে জায়গাটা কঠিন মনে হবে ঐ জায়গাটা পাঁচবার, দশবার আমাকে পড়তে হবে, না বোঝা পর্যন্ত আমি ছাড়ব না। এটাই এখন আমার ধর্ম। ধর্ম যখন হয় তারপরেই হয় কর্ম। স্বামীজী যখন কর্মযোগের কথা বলছেন তখন তিনি সহজ করেই বলেছেন, কিন্তু আমরা সব সময় ভুলে যাই যে, ধর্ম ঠিক ঠিক পরিভাষিত না হলে কখনই কর্ম হবে না। ধর্ম পরিভাষিত হলেই কর্ম হয়। কর্ম যখন হয় তখন কর্ম আর অকর্মের তফাৎ জানা যায়। ঐ অকর্মকে ছেড়ে দিয়ে যখন কর্মকে ধরে তখন সকাম কর্ম নিষ্কাম কর্ম হয়, নিষ্কাম কর্ম ধরে যখন এগোয় তখনই মানুষ সিদ্ধির দিকে এগোয়। কর্ম মানে আমার কর্তব্য। আমরা সারা জীবন কি করে এসেছি! খেয়ে গেছি, কোন দিন ভাত ডাল, কোন দিন মাছ ভাত, ঐ খেয়ে খেয়েই জীবন কাটিয়েছি, আর কিছুই করিনি।

অনেক শুভ কর্মের সংযোগে আমরা শাস্ত্রের কাছে এসে গেছি। এবারে বলুন আমি আর খিচুড়ী বানাও খিচুড়ী খিলাও ধর্মে থাকব না। এই ধর্ম করার জন্য অনেকে আছেন, তারা সেই ধর্ম পালন করতে থাকুন, তাদের জন্য দরকার আছে, আমরা নিষেধও করতে যাচ্ছি না। আমরা কিন্তু নেমে গেছি শাস্ত্রে কি আছে জানতে আর শাস্ত্রবাক্যের একটা জ্বলন্ত মূর্ত রূপ আমি হতে চাই। নিষ্কাম কর্ম তখনই করা যাবে যখন শাস্ত্রের মর্মার্থ জানতে পারবে। নিষ্কাম কর্ম মানে, আমি কাউকে উপদেশ দিতে যাচ্ছি না, যিনি আসবেন তাঁর সাথে আলোচনা হবে, যিনি জানতে চাইবেন তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে পরিষ্কার করে দেব, এটাই নিষ্কাম কর্ম। এই নিষ্কাম কর্মই আমাদের সিদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। সিদ্ধির দিকে যাওয়ার এটাই আজকের দিনের সব থেকে সহজ পথ। কিন্তু তার আগে আমার আপনার ধর্মকে ঠিক ভাবে পরিভাষিত করতে হবে। কারণ আমার ধর্ম আপনার ধর্ম নয়, তার ধর্ম আমার ধর্ম নয়, সবারই ধর্ম আলাদা আলাদা। স্বধর্ম মানেই তাই, আমার ধর্মকে আমাকে নিজেই পরিভাষিত করতে হবে।

এখানে আমাদের জন্য একটা suggestion হতে পারে, আমাদের সবারই পরিবার আছে, পরিবার পরিবারের মত আছে সেখানেও কাজ আছে। কিন্তু আমি যে এত বছর ধরে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, এবার আমার জীবন আমি এটাতেই দিয়ে দিলাম, আধ্যাত্মিক ছ্যাবলামো, আধ্যাত্মিক চটকাদারীতে আমি আর নেই। ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে আমি এখন ব্রাহ্মণ বংশীয়, মানে আমি এখন শুধু বিদ্যাচর্চা নিয়েই থাকব। এর মধ্যে সব কিছুই হবে, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো, জপ-ধ্যান, মন্দিরে যাওয়া সবই হবে কিন্তু মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে এটা, এই

কেন্দ্রবিন্দুকে আবর্ত করেই বাকি সব কিছু চলবে। আর এখান থেকেই হবে কর্ম, কর্ম থেকে নিষ্কাম, নিষ্কাম থেকে সিদ্ধি। নিষ্কাম শাস্ত্র পাঠ, লোকে জানবে ইনি শাস্ত্র জানেন। যে কোন মন্ত্রের বিষয় যখন আসছে সেখানে আচার্য শঙ্কর এই মন্ত্রের ভাষ্যে কি বলতে চাইছেন আমাকে সেই ভাবটা নিয়ে যেতে হবে। যদি না জানা থাকে তাহলে একবার বইটা দেখে নিলেন, তারপর যেমনটি বলেছেন ঠিক তেমনটিই বলতে হবে। যদি এটা করতে পারা যায় তাহলেই আমাদের জীবন ধন্য হবে। আর যদি না করতে পারেন তাতেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই, জগৎ তো মিডিওকারদের জন্যই আছে। গীতায় ভগবান বলছেন লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যেও কয়েকজন মাত্র সত্যকে জানতে পারে। আর বাকিদের কী হয়? *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*, ভেড়া ছাগলের মত জন্মাবে ভেড়া ছাগলের মত মরতে থাকবে।

এতদিন ধরে যাঁরা এই শাস্ত্র কথা শুনছেন ভেতরে তাঁদের একটা শক্তি এসে গেছে তবেই না তাঁরা ধরে রাখতে পারছেন। আর ধরে রেখেছেন বলে শক্তি আরও বেড়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের এবার একটা মহৎ উত্তরণের দিকে যেতে হবে তবে গিয়ে আমাদের জীবন সার্থক হবে, ধন্য হবে, পরমপদের দিকে এগোবে। সেইজন্য শাস্ত্র কঠিন লাগলেও এর মধ্যেই পড়ে থাকতে হবে। শুনতে ভালো লাগছে বলে আসছি তা যেন কখনই না হয়, আমাকে জানতে হবে উপনিষদ ঠিক কি বলতে চাইছে। এটাই আমার পবিত্র ধর্ম, এটাই আমার ঠাকুরের কাজ, এটাই আমার আত্মোন্নতির পথ।

হিন্দু ধর্মে মৃত্যুর উপর মাত্র দুটি দর্শন আছে। প্রথম দর্শন হল *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এই জীবন থাকতে থাকতেই আমাকে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে আর আমাকে জীবনমুক্ত হতে হবে। স্বামীজী বারবার বলছেন, এটাই হিন্দু ধর্ম, এটাই হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য, জীবনমুক্তি। স্বামীজী বলছেন, হিন্দুদের এত দোষ থাকা সত্ত্বেও ভগবান এই জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কারণ ব্রহ্মবিদ্যা এদের হাতে, যেটা অন্য কোন জাতির কাছে নেই। আর হিন্দুরা কোথায় থাকে? ভারতবর্ষে। সেইজন্য স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষের এত দাম। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন যাতে একে কেন্দ্র করে হিন্দু জাতি আর ভারতবর্ষ তথা সমগ্র মানবজাতি জেগে ওঠে। সেইজন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হিন্দু ধর্ম, ভারতবর্ষ আর এই ব্রহ্মবিদ্যা এই চারটের যে কোন একটাতে কাজ করাই ঠাকুরের কাজ। এটাই আজকের ধর্ম, হয় ভারতবর্ষের সেবা, কারণ এখানে হিন্দুরা বাস করে। হিন্দুদের সেবা কেন? কারণ এই জাতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা আছে। ব্রহ্মবিদ্যা কেন? কারণ অধ্যাত্মবিদ্যার স্বর্ণকিরীটি হল এই ব্রহ্মবিদ্যা। আইনস্টাইন যেমন বিজ্ঞানকে অনেক উচ্চ অবস্থায় নিয়ে গেছেন, ঠিক তেমনি ভারতের ব্রাহ্মণরা বিশেষ করে ঋষিরা ব্রহ্মবিদ্যাকে একটা উচ্চ অবস্থায় নিয়ে গেছেন, যেটাকে রক্ষা করা প্রত্যেকটি হিন্দুর কর্তব্য। ভারতবর্ষে কত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু সব নিকৃষ্ট মানের গ্রাজুয়েটই তৈরী হয়ে বেরোচ্ছে। কারণ তারা ব্রহ্মবিদ্যাকে ধরে রাখতে পারছে না। ব্রহ্মবিদ্যাকে ধরে রাখাটাই এখন মুখ্য কাজ। ব্রহ্মবিদ্যা শুধু হিন্দুদেরই নয়, মানব সভ্যতার এটাই শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি। বেঁচে থাকতেই তোমাকে জানতে হবে তুমি আত্মা। কঠোপনিষদে একটু পরেই বলবেন *এতাবৎ অনুশাসনম্*, কি অনুশাসনম্? *অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি*, মৃত্যুধর্মা মানুষ তখন অমর হয়ে যায়। এখানেই অমর হয়ে যাবে। মৃত্যুর জন্য তাকে কাশী যেতে হবে না। যারা বলছে কাশীতে মরলে মুক্তি হয় তারা আর হিন্দুই থাকল না। ভালো ডাক্তারও আছে খারাপ ডাক্তারও আছে, ভালো হিন্দু যেমন আছে তেমনি মন্দ হিন্দুও আছে, এরা হল মন্দ হিন্দু। ভালো হিন্দু বলবে কোথাও যেতে হবে না, এখানে এই জীবদ্দশাতেই মুক্তি। মধ্যম হিন্দু বলে *ক্রতো স্মর কৃতং স্মর*, এখন তিনি মরতে যাচ্ছেন, এবার মনকে টেনে কেন্দ্রিত করবেন। সূর্যকে বলছেন, *তত্ত্বং পূষন্নাপাবৃণু*, হে সূর্য! তোমার আলোকে তোমার মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নাও যাতে আমি দেখতে পারি তোমার স্বরূপ কি, আর সেটা আমিই! আর এটা আমি এমনি এমনি কোন প্রার্থনা করছি না, আমি কোন কাঙালী ভিখারী নই, আমার এটা অধিকার। *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, কারণ আমি সারা জীবন সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আমার এটা অধিকার। এনারা হয়ে গেলেন মধ্যম হিন্দু। আর অধম হিন্দু হল যারা বলছে কাশীতে মরলে মুক্তি হবে বা যারা বলছে শেষ সময়ে ঠাকুর এসে হাত ধরে নিয়ে যাবে। কোথাও আমাদের শাস্ত্রে এসব কথা নেই, ঠাকুর মা স্বামীজী এনারা কি কখন শাস্ত্রের বাইরে কোন কথা বলতে যাবেন! আবার পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন পথ মাত্র দুটো, প্রথম পথ হল এখানেই মুক্তি আর দ্বিতীয় পথ হল নিজের শরীর মনকে নিয়ন্ত্রণে এনে উপরে যাওয়া। এই দুটো পথের বাইরে বাকি সবাই মরণধর্মা। মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য দুটো কথা এদিক সেদিক করে বলে দিতে পারেন, কিন্তু

সেটাকে কখন তত্ত্ব হিসাবে নেওয়া যায় না। যাঁরা উত্তম ভক্ত তাঁরা বেদ, উপনিষদ, গীতার বাইরে আর কোন তত্ত্ব নেবেন না। আর ঠাকুরের যে মূল ভাব, ঐ মূল ভাবকে নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যাবেন। কাউকে কাশী পাঠানো ঠাকুরের মূল ভাব নয়। কথামৃতে কোথাও ঠাকুর একবারও তো বলছেন না যে, বাবা! তোমাদের কিছু করতে হবে না কোন রকমে তুমি কাশী চলে যাও তাতেই তোমার সব কিছু হয়ে যাবে, তার আগে তুমি যত রকমের পাপ কর দুষ্কর্ম কর, কাশীতে চলে গেলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচ্ছা না হয় মানলাম উপনিষদের পর অন্য অন্য শাস্ত্রে লেখা আছে যে কাশীতে মরলে মুক্তি হবে, কিন্তু আমাদের যত রামকৃষ্ণশাস্ত্র আছে, কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামীজীর রচনাবলী, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, কোথাও কেউ বলছেন না কাশীতে গিয়ে মর তাহলে তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। কবীর দাস সারা জীবন কাশীতে কাটালেন আর মৃত্যুর সময় তিনি কাশীর ওপারে চলে গেলেন, লোকে বলে কাশীর অপর পারে একটা জায়গা আছে ওখানে মরলে নাকি গাধা হয়। কবীর দাস মরার সময় ওখানেই চলে গেলেন, বললেন আত্মজ্ঞানী যেখানেই মরুক তাতে তাঁর আর কোন কিছুই হয় না।

বক্তব্য হল আমরা একটা অমূল্য সুযোগ পেয়েছি, শাস্ত্র ঠিক কি বলতে চাইছে, সত্য জিনিষটা কি জানার সুযোগ পাওয়া গেছে। এটাই আমাদের ধর্ম, এই ধর্মে এবার আমাদের জীবনকে ঢেলে দিতে হবে। আর এটাই ঠাকুরের কাজ। ঠাকুর স্বামীজী এর জন্যই এসেছিলেন যে ব্রহ্মবিদ্যাকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে। শঙ্করাচার্য গীতার ভাষ্যে সেখানেও তিনি এই কথাই বলছেন ব্রাহ্মণদের রক্ষা করলেই ব্রহ্মবিদ্যা রক্ষিত হয়। শ্রাদ্ধবাড়ি, বিয়েবাড়িতে খাওয়া আর চালকলা বাঁধা ব্রাহ্মণদের কথা আচার্য বলছেন না, যাঁদের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা আছে তাঁদের কথা বলছেন। এখানে আমাদের কাছে ব্রহ্মবিদ্যাকে খুলে দেওয়া হচ্ছে। এবার এই ব্রহ্মবিদ্যাতে যদি আমরা নিজেদের সমর্পিত করি তাহলে ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীতে আমরা একজন ব্রাহ্মণ রূপে পরিগণিত হয়ে গেলাম, এবার আমরা ঠাকুরের ঠিক ঠিক সেবাপূজা করা আরম্ভ করলাম। নিজের দিক থেকে এই লাভ হবে, জ্ঞানে যে আনন্দ হয় অন্য কিছুতে সেই আনন্দ হয় না। সেইজন্য আমাদের সাধারণ জিনিষগুলিকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। পুরো জীবনটা এর মধ্যেই উৎসর্গ করে দিতে হবে। উপনিষদ কি বলতে চাইছে, কেন বলতে চাইছে, এটাকে ধারণা করা আর নিজের জীবনে প্রস্ফুটিত করা। স্বামীজী বলছেন, be and make, আগে নিজে হও, হয়ে বাকিদের অনুপ্রাণীত কর। কারণ মানবজাতির যেটা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সেই ব্রহ্মবিদ্যা হিন্দুদের কাছে সংরক্ষিত হয়ে আছে। অন্য কোন ধর্মে এই বিদ্যা নেই।

বেদান্তে অমরত্বের ভাবটাই স্বাভাবিক, কিন্তু কামনা-বাসনার সাথে নিজেদের জড়িয়ে আমরা মৃত্যুধর্মা হয়ে গেছি, কামনা-বাসনা থেকে সরিয়ে নেওয়া, ইন্দ্রিয়, মনকে টেনে সংসার থেকে সরিয়ে নিয়ে আসাকে বেদান্ত বলছেন বিয়োগ। কিন্তু যোগশাস্ত্রে, ভক্তিশাস্ত্রে যোগ মানে সংযোগ। ভগবানের সাথে যোগ করা বা পরমাত্মার সাথে যোগ করা। বেদান্তের দৃষ্টিতে বিয়োগ, এটাই ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা মানে কোন কিছুর সাথে সংযোগ নয়। ব্রহ্মবিদ্যাতে যোগ মানে বিয়োগ। এই ভাবকে জাগ্রত রাখা, আমি আমার ইন্দ্রিয় মনকে ছড়িয়ে রেখেছি, এই ছড়ান ছেটানো মনকে এবার গুটিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তখনই হবে প্রমাদরহিত, তার কোন কামনা-বাসনা থাকবে না, কামনা-বাসনা না থাকার জন্য তার কোন ক্রোধ হবে না, কোন ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা কোন কিছুই আর থাকবে না। এই অবস্থার পর বুদ্ধিরও আর কোন চেষ্টা থাকে না, *বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি*। তখন মনে সংশয় হতে পারে যেখানে বুদ্ধিরও কোন চেষ্টা নেই, বুদ্ধি যেটা গ্রহণ করতে পারে না সেটা অসৎ, সেই জিনিষের অস্তিত্ব নেই। এই জিনিষগুলো অত্যন্ত কঠিন। নিষ্ঠার সাথে আমরা উপনিষদের কথা শুনে যেতে পারি কিন্তু বেদান্তের কিছু মূল সিদ্ধান্ত আছে, যে সিদ্ধান্তের উপর বেদান্তের পুরো রাজমহল দাঁড়িয়ে আছে, এখনও এই সিদ্ধান্তগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার না হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, এই জিনিষগুলি জানার কিছু নয়, এগুলো ধারণা করতে হয়। যেদিন ধারণা হতে শুরু হবে তখন বেদ পড়ুক, উপনিষদ পড়ুক, পুরাণ পড়ুক সবটাই ম্যজিকের মত খট্ খট্ করে ভেতরে বসে যাবে। মূল বক্তব্যকে যদি ধরে নেওয়া যায়, যেমন পরে বলবেন *এতাবৎ অনুশাসনম্*, উপনিষদ কি বলতে চাইছেন, তুমি নিজেকে মৃত্যুধর্মা মনে করছ কিন্তু তুমি অমর হয়ে যেতে পার যদি তোমার হৃদয়ের কাম-বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এবার আপনি উপনিষদের মর্ম বুঝে যাবেন। সেইজন্য যে কোন subjectকে জানতে হলে subjectএর মর্মটা আগে বুঝতে হয়।

প্রত্যেকটি ধর্ম, প্রত্যেকটি মত পথকে বোঝা অত্যন্ত সহজ। কারণ হিন্দু ধর্মের কাছে বিশ্বের সব কটি ধর্ম শিশু নয়, শিশুতম। হিন্দু ধর্ম ছাড়া সব ধর্মের শেষ কথা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক অভিযান শুরু হয়। এগুলোকে যখন আপনি আপেক্ষিক ভাবে জানবেন তখন বুঝবেন স্বামীজী যে আমেরিকাতে গিয়ে এত কিছু বলছেন তখন তাঁর ভেতরে কি রকম জ্বালা ছিল। তোমার কাছে বন্দুক আছে, টাকা আছে, তার জোরে মানবজাতির যে শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি তাকে তাচ্ছিল্য করছ। যেখানে মন থেমে যায় সেখান থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের উপলব্ধির দরজা খুলে যায়। কোন ধর্মের কাছে এই ধারণাটাই নেই, ওদের কাছে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাওয়া, জগতের প্রতি ভালোবাসা আসাই শেষ কথা। এদের এই সব মন্ত্রের অর্থ কে বোঝাতে পারবে!

আমরা এখন যে মন্ত্রের আলোচনার মধ্যে আছি, *নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা*, এই মন্ত্রের যে ভাব এই ভাব আগেও আমরা কঠোপনিষদের কয়েকটি মন্ত্রে পেয়েছি। বেদান্ত ঠিক এই ভাবকেই বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে। সংক্ষেপে এর বক্তব্য হল, বেদান্ত মতে আত্মাই আছেন, আত্মা চৈতন্য। যে কোন কারণে আত্মার উপর উপাধি এসে গেছে। এই 'যে কোন কারণে' বেদান্তে এর শাস্ত্রীয় পরিভাষা মায়া। মায়া মানে জিনিষটা আছে কিন্তু তার বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই, আছে কিন্তু নেই। জিনিষটা হয় থাকে তা নাহলে থাকে না। এই টেবিলের উপর গ্লাশ আছে আর এই টেবিলের উপর জলের জার নেই, এটা খুবই সহজ ব্যাপার। মায়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হল, মায়া যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আছে, আর যার জন্য মায়া চলে গেছে সে দেখছে নেই, তার থেকে আরও মারাত্মক হল, দেখে যে ওটা আদপে কখন ছিলই না। তাহলে মায়া কি কোন কাল্পনিক কিছু? তাও নয়। যেমন রাত্রিবেলা অন্ধকার থাকে, সূর্যোদয় হলে অন্ধকার চলে যায়। দিনের আলোতে অন্ধকার নেই। অন্ধকার কখনই ছিল না একথা কেউ বলতে পারবে না। অবশ্যই ছিল, অন্ধকার তাহলে সত্য। মায়ার ক্ষেত্রে তা হয় না। মায়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হল, যতক্ষণ মায়া আছে ততক্ষণ অজ্ঞান আছে, অজ্ঞান যতক্ষণ আছে মায়া ততক্ষণ আছে। যখন মায়া চলে যায়, কেমন চলে যায়, যেমন দিন এলে রাত চলে যায়। সমস্যা হল যখন চলে যায় তখন দেখে মায়া আদপে কখন ছিলই না, সেইজন্য তার নাম মায়া। মায়া কি কাল্পনিক? আমি আপনাকে দেখছি এটা কি কোন কল্পনা? একেবারেই কল্পনা নয়, পুরোপুরি বাস্তব। এই দেখা যদি কল্পনা হয় তাহলে এখান থেকে যে ঈশ্বরের অবধারণা করা হবে সেটাও কল্পনা হয়ে যাবে। চৈতন্য, সচ্চিদানন্দ সবটাই কল্পনা হয়ে যাবে। সচ্চিদানন্দ যিনি আছেন, যিনি আত্মা তিনিই একমাত্র চৈতন্যময়। তিনিই এই জগৎকে জানছেন। কাকে দিয়ে জানছেন? তিনি মন দিয়ে জানছেন, তিনি ইন্দ্রিয় দিয়ে জানেন, তিনি শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেন। অথচ আমাদের সাধারণ ভাষায় ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে জগৎকে জানা হয় কিন্তু আত্মাকে জানা যায় না। এবার এরা চলল ব্রহ্মবিদ্যাতে আত্মাকে জানতে। এখানে এসে পুরোপুরি অসঙ্গতি হয়ে যাবে। একটু ভাবলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে।

খুব স্থূল উপমা যদি নেওয়া হয়, একজন পুলিশ কমিশনার আছেন, যিনি তলে তলে একজন ডাকাতের সর্দার। কলকাতার পুরো পুলিশ ফোর্স তার আণ্ডারে। যত ক্রিমিন্যালদের ধরতে হবে পুলিশ কমিশনার অর্ডার করলেই তাদের ধরা হবে। এবার পুলিশের কাছে খবর আছে এদের পেছনে একজন কেউ বড় মাথা আছে যাকে ধরতে হবে। পুলিশের কেউ রিপোর্ট নিয়ে গেল কমিশনার সাহেবের কাছে। কমিশনারকে বলল 'স্যার! একজন বড় ক্রিমিন্যাল আছে তাকে ধরতে হবে'। কমিশনার সাহেব কি বলবেন? বলবেন 'অবশ্যই ধরতে হবে'। 'স্যার আপনার অনুমতি চাই'। 'আমার অনুমতি আছে'। তারপরে কি হবে? পুলিশ কিছুই এগোতে পারবে না। কারণ আসল যে জায়গাতে আঘাত হানবে সেই জায়গাটা তো সে নিজে। আসল ক্রিমিন্যাল তো কমিশনার নিজে। পরে দেখা যাবে একটা জায়গায় গিয়ে সব ফাইলগুলো আটকে যাচ্ছে। এখানে সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল হল মন। এই জগতে মানুষের ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের চিফ হল মন। ক্রিমিন্যালদের এত দৌরাত্ম্য কেন? এত দুর্নীতি, দাঙ্গা, লুঠতরাজ কেন? কারণ ক্রিমিন্যালদের চিফ সে আবার পুলিশ কমিশনার হয়ে বসে আছে। ট্রাজেডি হল সেটা আবার কেউ জানে না, বুঝতেও পারছে না, একমাত্র কমিশনার সাহেবই জানে। এবার এই দুর্নীতি, লুঠতরাজকে যদি ঠাণ্ডা করতে হয় তাহলে কমিশনারকে মারতে হবে। কে মারতে পারবে কমিশনারকে? কমিশনারকে কমিশনারই খোদ মারতে পারবে। কারণ কমিশনার পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতেই পারবে না। নিজের সার্ভিস পিস্তল দিয়ে নিজেকেই মারতে হবে। এটা কি কখন সম্ভব? কখনই সম্ভব নয়। সেইজন্য কক্ষণ কোন

ধর্ম এই ব্রহ্মবিদ্যার অবধারণা করতে পারে না। কারণ এই জিনিষটা এত কঠিন, এত সূক্ষ্ম, এত জটিল যে এই কাজ কেউই করতে পারে না।

বেদান্ত বলছেন, আত্মাই সব কিছুকে জানেন আর মন ও ইন্দ্রিয়কে দিয়ে তিনি সব কাজ করান। তাহলে তাঁকে জানা যাবে কি করে? আমরা কেউ জানতে পারব না, কারণ মন, বাণী, ইন্দ্রিয় এদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এদেরকে আবার অতিক্রম করা যাবে না। সব কাজ মন আর ইন্দ্রিয় দিয়েই চলে। মন আর ইন্দ্রিয় যদি থেমে যায়, কারণে আগের আগের মন্ত্রেই বলছেন *যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি বা যখন বলছেন স্থিরামিন্দ্রিয়াধারণম্‌*, বুদ্ধিকেই মেরে রেখেছে, পুলিশ কমিশনারকেই উড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। কারণ আমরা যা জ্ঞান পাই সব বুদ্ধি দিয়ে পাই। এর আগেও এই জিনিষগুলো শুনেছি, কিন্তু এখানে নতুন করে আবার বলা হচ্ছে।

তিনটে শব্দ, সৎ, অসৎ আর অলীক। সৎ মানে যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায়, অসৎ মানে ইন্দ্রিয়ে দিয়ে যেটা জানা যায় না। অলীক মানে যার কোন অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন জায়গায় সৎ অসতের বিভিন্ন রকম অর্থ করা হয়। সেখানে ভাষ্যকার কি বলেছেন সেটাকে দেখে নিয়ে অর্থ করতে হয়। অনেক সময় অসৎ মানে হয় অলীক, সব সময় নয়, কখন সখন অসৎ অলীক অর্থেও হয়। সৎএর আরেকটা অর্থ যিনি সব সময়ই আছেন। সেইজন্য প্রথম প্রথম শাস্ত্র পড়তে গেলে তালগোল পাকিয়ে যায়, একই শব্দের অর্থ এক এক জায়গা এক এক রকম করা হয়েছে, অন্য জায়গায় আবার তার বিপরীত অর্থ করা হয়েছে। আচার্যের কাছে অনেক দিন শাস্ত্র নিয়ে পড়ে থাকলে এগুলো ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়। অলীক শব্দকে ছেড়ে দিয়ে দুটো শব্দকে রাখছি, সৎ আর অসৎ। সৎ আর অসৎ এই দুটোকে খুব ভালো করে না বুঝতে পারলে এই মন্ত্রের মূল ভাবটাই ধরতে পারব না। সৎ মানে, যেটা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়ে ধারণা করা যায়। যেমন এই গ্লাশ, গ্লাশকে ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরছি, মন আর বুদ্ধি দিয়ে গ্লাশকে জানছি। এটাকে বলে ভাব, মানে অস্তি, আছে। অসৎ মানে যেটা গ্রহণ করা যায় না। মন্ত্রে অসৎ মানে যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। যার আরেকটা অর্থ হয় অভাব, জিনিষটা নেই। যেমন এই ঘরে অনেক কিছু আছে কিন্তু সিংহ নেই। এই জায়গায় এসে বেদান্ত আর অন্যান্য দর্শনের মধ্যে যুক্তিতর্কে বিরাট সংঘাত লাগে। প্রথমের দিকে যে ব্যাখ্যা করা হল বেদান্ত মতে জিনিষটা এই, এই ব্যাখ্যা যারা শ্রদ্ধা নিয়ে শুনছেন তাঁদের জন্য। কিন্তু যাঁরা শ্রদ্ধা নিয়ে শুনছেন না, যাঁরা যুক্তিতর্ক দিয়ে যেতে চান, আচার্য তাঁদের জন্য ব্যাখ্যাটা পুরো যুক্তিতর্ক দিয়েই করছেন। উপনিষদও ঐ জায়গায় যুক্তি দিচ্ছেন। এটা হল one of the very rare মন্ত্র যার ভাষ্য যুক্তি দিয়ে একটা উচ্চতম তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এই মন্ত্র এবং পরের মন্ত্র হল সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত। এমন সিদ্ধান্তের আলোচনা করছেন, যেটা অন্য কোন ধর্মে তো আদপেই নেই, এমনকি হিন্দু দর্শনেরও অন্যান্য জায়গায় নেই, অথচ জিনিষটাকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন। আর এত সূক্ষ্ম যুক্তি যে ধারণা করা যায় না। কারণ ধারণা করতে পারলে অন্যরাও এই সিদ্ধান্তকে তাঁদের দর্শনে নিতেন।

এনারা বলেন, এই যে অভাব, এই অভাব কি আলাদা কোন বুদ্ধি বৃত্তি, নাকি দৃষ্ট প্রমাণের একটা অঙ্গ। বেদান্তে ষট্‌ প্রমাণের কথা বলা হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ, আগম প্রমাণ, উপমান প্রমাণ, অর্থাপত্তি প্রমাণ আর অনুপলব্ধ বা অভাব প্রমাণ। প্রমাণ মানে একটা জিনিষকে জানার পদ্ধতি, জানার এই ছয়টি পদ্ধতি। প্রত্যক্ষ মানে যা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, অনুমান যুক্তি দিয়ে জানছি, আগম শাস্ত্র দিয়ে যেটা জানছি, উপমান মানে একটা জিনিষের ধারণা আছে কিন্তু বাস্তবে জানা নেই, সেই জিনিষকে পরে বাস্তবে দেখলে তুলনা করে জানছি। অর্থাপত্তি মানে একটা জিনিষকে বলা হয়েছে সেখান থেকে অর্থের উপসংহারে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন বলা হল মোটা দেবদত্ত দিনে খায় না, যদি না খেয়ে থাকে তাহলে মোটা হল কি করে? তার মানে রাত্রে খাচ্ছে। এটাকে বলছেন অর্থাপত্তি। অনেকে বলবে এটাতো যুক্তি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুতরাং অনুমান প্রমাণে যাবে। কিন্তু অনুমান প্রমাণে যাবে না। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিষ, বিশ্লেষণ করে বোঝাতে গেলে আমাদের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করবে। এনারা বিশ্লেষণ করে দেখাবেন এটা deductive logic, inductive logicএ পড়ে না। যদি টেনে অনুমান প্রমাণে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে অন্যান্য অনেক জটিলতা এসে যাবে। এই করে করে শেষ আসে অনুপলব্ধি, অনুপলব্ধি মানে অভাব, যে জিনিষটা নেই। এখন বলা হল এই ঘরে সিংহ নেই, এটা হল অনুপলব্ধি।

ইংলিশে খুব নামকরা কথা বলা হয়, he was conspicuous by his absence, conspicuous মানে পরিষ্কার দৃষ্টগোচর, যেটাকে চোখে দেখা যাচ্ছে। কেউ যদি জোকারের মত পোষাক চাপিয়ে উদ্ভট ভাবে রাস্তা দিয়ে যায় তার দিকে সবার দৃষ্টি চলে যাবে, তখন বলবে he was conspicuous by his dress। এখানে বলা হল he was conspicuous by his absence। কিভাবে সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল? তার অনুপস্থিতি দিয়ে সে সবার দৃষ্টির গোচর হল। তার মানে এমন একটা সম্মিলন ছিল যেখানে তাকে দেখা যাওয়াটা আবশ্যক ছিল। সবারই চোখে পড়ছে সে এখানে নেই। ছেলের বিয়েতে বিরাট পার্টি হচ্ছে, সেখানে ছেলের বাবা উপস্থিত নেই। সবারই নজর পড়বে, ছেলের বাবা কিন্তু আসেনি। পরে আত্মীয়-স্বজনরা জিজ্ঞেস করবে আপনাকে তো সেদিন পার্টিতে দেখলাম না, তার মানে conspicuous by his absence। এখন ওনাকে যে দেখা গেল না, এটা কি দৃষ্ট প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণে নেওয়া হবে নাকি অন্য প্রমাণে পড়বে? এই নিয়ে বিরাট যুক্তির প্রদর্শন চলতে থাকে। কিন্তু বেদান্ত এখানে একেবারে দৃঢ়, এটা হল আলাদা method of knowledge। Conspicuous by his absence যে বলা হচ্ছে, তার অনুপলব্ধি, এই conspicuous মনে একটা আলাদা বৃত্তির সৃষ্টি করছে। Absent থাকা মানেই যে প্রত্যক্ষ থেকে সরে গেল তা নয়, তার মানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আলাদা অভাব প্রমাণ আলাদা। অভাব প্রমাণের উপর বেদান্ত দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এর বেশি বিশ্লেষণে যাচ্ছি না, আর যাওয়ার দরকারও নেই। তবে জেনে রাখা ভালো যে, ওনারা রীতিমত যুক্তিতর্ক দিয়ে দেখান অনুপলব্ধি অর্থাৎ অভাব প্রমাণ নিজের জায়গাতে একটা পুরোপুরি স্বতন্ত্র প্রমাণ। যখন একটা জিনিষকে আমি অনুপলব্ধি করছি, অর্থাৎ উপলব্ধি হচ্ছে না, এটাই জানার একটা পদ্ধতি। কিন্তু জানার জন্য বুদ্ধি বৃত্তির দরকার, মস্তিষ্কে নিউরোন যদি না নাচে তাহলে তো আমরা জানতে পারব না। যখন একটা জিনিষকে আমরা জানছি তখন বুদ্ধি নড়ে, কিন্তু এই জায়গাতে জিনিষটা নেই কিন্তু বুদ্ধিটা নড়ছে। সেটা কি কখন হতে পারে? এই ঘরে সিংহ নেই তার জন্য বুদ্ধি কি আমাদের নড়ে উঠছে? এর এত সূক্ষ্ম যুক্তি যে ধরা যায় না, কিন্তু এটাই বেদান্তের প্রাণ। এই যে ছেলের বৌভাতে ছেলের বাবা গেলেন না, কোথাও তো আমাদের বুদ্ধি নড়ে উঠছে, কই ছেলের বাবাকে তো দেখা যাচ্ছে না। তার মানে বুদ্ধিতে একটা কিছু নড়ে উঠছে। অথচ নড়ে উঠছে অভাবে, ছেলের বাবার অভাবে, ছেলের বাবা অনুপলব্ধ।

এই জায়গাতে এসে বেদান্ত রীতিমত মারামারি শুরু করে দেবে। বেদান্ত বলবে বুদ্ধি বৃত্তি তখন নড়ে। কোথায় নড়ে? যে জায়গাতে আমি জিনিষটাকে আশা করছি অথচ নেই। অন্যরা তখন বলবে এটা তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেল। কিন্তু এনারা বলবেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হবে না, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণে একটা জিনিষ আছে, সেই জিনিষটা যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে যায় তখন যে বুদ্ধি নড়ে সেটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কিন্তু এখানে জিনিষটাই নেই। এখানে আমি তার ভাবকে ধরছি না, তার অভাবকে ধরছি। একটা জিনিষ নেই সেটাকে বুদ্ধি বৃত্তি ধরছে, তার মানে এটা একেবারে পজিটিভ জিনিষ, it is not mere absence। অনুপস্থিত যেটা, যেটা অনুপলব্ধি সেটা নিজেই একটা ভাব, যে ভাব মস্তিষ্কে উপস্থিত। মনে করুন আপনার খুব আদরিনী মেয়ে। সেই আদরিনী মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কোন কারণে আপনার মেয়ের সাথে মনোমালিন্য হয়ে গেছে। এবার আপনার বাড়িতে কোন উৎসব লেগেছে, সেই উৎসবে মেয়েটি আসেনি। মেয়ের না আসাটা সবারই চোখে পড়বে। তার মানে মস্তিষ্ক মেয়ের অনুপস্থিতিকে নিয়ে ঘুরছে, ওকে দেখছি না কেন। সবাই আপনাকে জিজ্ঞেসে করছে, ওকে দেখছি না কেন। এই যে দেখছি না কেন, এই সৎকে, অর্থাৎ positive feeling of absenceকে বেদান্ত বলছে অভাব প্রমাণ, it is not mere absence। আমাদের মাথায় যেমন হাজার হাজার রকম বৃত্তি আছে, সেগুলোকে নিয়ে এখন আমাদের মস্তিষ্ক নড়ছে না, কিন্তু একটা বৃত্তি আছে যেটাকে নিয়ে মস্তিষ্ক নড়ছে। কি সেই বৃত্তি? মেয়ের অনুপস্থিতি। এই যুক্তির উপর অন্যান্য দর্শনের সাথে বেদান্ত দর্শনের বিরাট সংঘাত লাগে। অন্যান্য দর্শন বলবে এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অঙ্গ। বেদান্ত বলবে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে যাবে না, এটা প্রমাণের আলাদা একটা পদ্ধতি, যে পদ্ধতিকে বলছে অভাব প্রমাণ। এই অভাব প্রমাণকে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে বেদান্ত দর্শন বলে আর কিছু থাকবে না।

মন্ত্রে বলছেন *নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা*, ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে আত্মাকে অবগত করা যায় না। যদি আমি ইন্দ্রিয়ে দিয়ে জানতে না পারি, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে জানতে না পারি, মুখ দিয়ে তার কথা যদি বলতে নাই পারি তাহলে বুঝতে হবে জিনিষটা নেই। তখন আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করছেন, আচার্য

শঙ্করই যে যুক্তি দিয়ে বলছেন তা নয়, উপনিষদই যুক্তি দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে। আচার্য বলছেন, যে জিনিষটা আছে অথচ তার অভাব, ঐ অভাব, যেটা অসৎ হয়ে গেল কিন্তু সৎ ছিল, সেই বুদ্ধিটা সব সময় সৎ বুদ্ধিতে গিয়ে লয় হয়। যেমন একটা মাটির ঘট, মাটির ঘটটা ভেঙে গিয়ে মাটিতে মিশে গেল। মাটির ঘটকে আর দেখা যাচ্ছে না, মাটির ঘট অভাব হয়ে গেল, অসৎ হয়ে গেল। এই তো ঘটটা এখানে ছিল, কেন দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাবে না, কারণ ভেঙে গেছে। ঘটের অভাব হয়ে গেছে, ঐ অভাবকে আমি বোধ করেছি। কিন্তু ঘটটা কোথায় গেল? ঘটের যে আরও সূক্ষ্ম ভাব মাটি, সেই মাটিতে মিশে গেল। তাহলে জিনিষটা ছিল সৎ অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর ছিল কিন্তু হয়ে গেল অসৎ, ছিল ভাব রূপ হয়ে গেল অভাব। তাহলে অভাব কতটা সত্য বা অসতটা কতটা সত্য? বলছেন, এটা সম্পূর্ণ সত্য। কেন সত্য? কারণ ওটা আরেকটা সৎ অর্থাৎ সূক্ষ্মে গিয়ে মিশে গেছে। যদি এই ভাবে বিচার করা হয় তখন দেখা যাবে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যদি নাশ হয়ে যায়, কিছুই যদি অবশিষ্ট না থাকে, তখন সব কিছু কোথায় যাবে? বলছেন সৎ বুদ্ধিতে আশ্রিত হয়ে যাবে। আমরা যাবতীয় যা কিছু জানছি বুদ্ধি দিয়েই জানছি। বুদ্ধিতে সব সময় দুটো জিনিষকে ধরা হয়। যেমন মাটির ঘটের কথা বলা হল, ঘটের দুটো সত্তা, একটা ঘটের সত্তা আরেকটা মাটির সত্তা। মাটিটা অমূর্ত আর ঘটটা মূর্ত। মাটিরও আবার দুটো সত্তা, মাটিতে মাটির সত্তা আছে আবার বস্তুর সত্তা চলছে। বস্তু হল অমূর্ত আর মাটি হল মূর্ত। বস্তুতে আবার দুটো সত্তা চলছে, বস্তু আর এনার্জি। যদি সব কিছু চলে যায় সত্তা কিন্তু থেকে যাচ্ছে তবে আরও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম আরও সূক্ষ্মতরে। অন্তিমে সব কিছু গিয়ে শেষ হয় সৎ বুদ্ধিতে, মানে আছে, আমি আছি। আমি আছি এই সৎ বুদ্ধিই চূড়ান্ত অবস্থা, যখন কোথাও কিছু নেই তখন আমি আছি এই সৎ বুদ্ধিটা থেকে যায়। গভীর নিদ্রা থেকে যখন জেগে উঠি তখন আমাদের প্রথম বোধ আসে আমি আছি। গভীর নিদ্রাতে আমার মধ্যে যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল সব ঐ সৎ বুদ্ধিতে গিয়ে লয় হয়ে ছিল।

ইন্দ্রিয় দিয়ে এতক্ষণ যা কিছু ধারণা হচ্ছিল সবটাই অসৎ হয়ে গেল, কোন অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব যে নেই বুঝলাম কিন্তু গেল কোথায়? কোথাও যায়নি সব ঐ সৎ বুদ্ধিতে গিয়ে আশ্রিত হয়ে গেছে। সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্রের সাথে যেমন এক হয়ে যায়, সেই রকম এক হয়ে গেছে। *বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি*, এই বুদ্ধিরও যখন লয় হয়ে যায় তখন কোথায় যায়? আচার্য এখানে একটা শব্দ *সৎগর্ভিতা* এনে বলছেন *সৎপ্রত্যয়গর্ভৈব বিলীয়তে*, এই বুদ্ধি শুধু সৎ বোধে গিয়ে লয় হয়ে যায়। যা কিছু আছে এটা একটা সৎ বোধ, বুদ্ধি সব কিছুর আশ্রয়, বুদ্ধি হল সব থেকে নৈর্ব্যক্তিক তাকে বাকি সব কিছুকে মূর্ত করতে হয়, এবার বুদ্ধিও হয়ে গেল অমূর্ত, তখন ওটা হারিয়ে যায় শুদ্ধ সৎ বোধে। এই যে শুদ্ধ সৎ বোধ এটাই সেই আত্মা। আমরা সেটাই বোধ করি যেটা আছে, যেটা নেই তাকে আমরা কখনই বোধ করি না। আর যেটা আছে তাকেই জানি, যেটাকে জানি সেটাই আনন্দ দেয়। এখন বুদ্ধি নেই কিছুই নেই শুধু আছে সৎ বোধ, ঠাকুর বলছেন সত্তামাত্রম্। এই সত্তামাত্রমই চিৎ মাত্রম্, এটাই আনন্দম্ সেইজন্য এটাকে বলে সচ্চিদানন্দ, যিনি সৎ তিনিই চিৎ তিনিই আনন্দ।

বলছেন, সমস্ত জগৎ জুড়ে যা কিছু আছে সব সৎ বুদ্ধির আশ্রিত হয়ে আছে। বুদ্ধির যখন নাশ হয়ে যায় তখন সৎ বুদ্ধি গিয়ে শুদ্ধ সৎ এ গিয়ে হারিয়ে যায়। এবার যদি কেউ যুক্তি নিয়ে বলেন সৎ বলে কিছু নেই শুধু অসতই আছে, বৌদ্ধরাও এই কথা বলছে বা বিজ্ঞানীরা আবার বলছেন শূন্য থেকে সৃষ্টি, যাঁরা বলেন চোখ বুজলেই সব শেষ, মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যায় তাহলে মনে হবে সব কিছুর বিলয় অসতে হচ্ছে আর সব কিছুর উৎপত্তি অসৎ থেকেই হচ্ছে। স্বামীজী এই যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করার সময় বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বলছেন একটা মেশিনে যতটা শক্তি প্রয়োগ করা হবে ঠিক ততটাই মেশিন উৎপাদন করবে। আমি কোন শক্তি দেব না আর মেশিন থেকে জিনিষ বেরিয়ে আসবে কখনই তা যুক্তিতে দাঁড়ায় না। অসৎ থেকে অসতেরই জন্ম হবে, অসৎ থেকে সৎএর জন্ম, কোন যুক্তিতেই দাঁড়াবে না। বিজ্ঞানের দিক থেকেও শক্তির যে সংরক্ষণ হয় সেটাকেও উল্লঙ্ঘন করে যায়। কোন এনার্জি দিলেন না, হঠাৎ এনার্জি দাঁড়িয়ে গেল, তা কি করে সম্ভব! দাঁড়াতে পারে যদি এর নীচে ঈশ্বরের সত্তা থাকে। আপনি বলছেন কোন সত্তা নেই সবটাই অসৎ হঠাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এসে গেল! যদি কোন সত্তা না থাকে তাহলে তার সৃষ্টিটাও অসৎ হবে। আকাশ কুসুম যদি কিছু থাকে যেটা অসৎ, তার যে গন্ধ হবে সেটাও অসৎ হবে। এখানেই আচার্যের যুক্তির বলিষ্ঠতা। তিনি বলছেন, আমরা যে জগৎকে অনুভব করছি আমাদের কাছে এই জগৎ পুরোপুরি বাস্তব। একটা পাগল আকাশ কুসুমকেও বাস্তব দেখছে। তার হাতে কিছু নেই কিন্তু হাতটা এমন ভাবে নিয়ে যাচ্ছে মনে হবে যেন কিছু একটা নিয়ে

যাচ্ছে। আপনি জিজ্ঞেস করলেন 'হাতে কি নিয়ে যাচ্ছ'? 'ফুল নিয়ে যাচ্ছি'। 'এই ফুলটা কোথায় পেলে'? 'আকাশে ঝুলছিল'। 'ফুলের রঙ কেমন'? একটা রঙ বলে দিল। 'গন্ধ কেমন'? 'আঃ কি দারুণ'! আপনি বলবেন লোকটা বদ্ধ পাগল। কিন্তু আমরা এর মত পাগল নই, আমরা জগৎ যেমনটি আছে তেমনটি দেখছি, আমাদের কাছে জগৎ সত্য। আচার্য বলছেন, জিনিষটা সৎ না অসৎ, একমাত্র বুদ্ধিই এই জ্ঞান দিচ্ছে। সেইজন্য আমাদের বুদ্ধির উপরই নির্ভর করতে হবে, এর জন্য শাস্ত্রের কাছে, অন্য কারুর কাছে যেতে হবে না।

পঞ্চতন্ত্রে একটা কাহিনী আছে, একজন ব্রাহ্মণকে একজন একটা ছাগল দান করেছে। পাঁচজন লোক ঠিক করল ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ছাগলটা হাতিয়ে নিতে হবে। প্রথম জন এসে বলল, পণ্ডিত মশাই 'কুকুর নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন'? দ্বিতীয় জনও এসে জিজ্ঞেস করছে 'কুকুর কোথায় পেলেন'? তৃতীয়জনও এসে একই প্রশ্ন করছে, এই করে চতুর্থজন, পঞ্চমজন একই প্রশ্ন করার পর ব্রাহ্মণ ছাগলটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এই ঘটনা কাহিনীতে হবে, গবেট ব্রাহ্মণের সাথে হবে। হাজারটা লোক এসে যদি আমাকে বলতে থাকে 'এই ঘরে আপনি একা একা বসে কি করছেন'? আমি কখনই তা মানব না। আমি এই ঘরে পঞ্চাশ জন ভক্তের সাথে উপনিষদের আলোচনা শুনছি, এই জ্ঞান আমাকে কে দিচ্ছে? আমার বুদ্ধি দিচ্ছে। বেদান্ত সেইজন্য বুদ্ধিকে সাংঘাতিক দাম দেয়। বেদান্তের ধর্ম এমন এক ধর্ম যা কিনা শুধু সিদ্ধান্তের উপর চলে, ওখানে যিশু বলেছেন, আল্লা বলেছেন, ঠাকুর বলেছেন, কে কি বলছেন তার কোন দাম নেই। বেদান্ত একমাত্র বিশুদ্ধ যুক্তিকে দাম দেয়। কি সেই বিশুদ্ধ যুক্তি? জগতের সৎ আর অসতকে বিচার করার জন্য একমাত্র instrument হল বুদ্ধি। চার্বাক বা বিজ্ঞানী বলবে, আমরা কিন্তু জানি অসৎ থেকে অসতেরই জন্ম। অসৎ থেকে যদি অসতের জন্ম হয়, তাহলে আমরা যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন অস্তিত্ব হতে পারে না, অথচ আমি এর অস্তিত্বকে জানছি। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি সৎ হয়ে থাকে তাহলে তার উৎপত্তি সব সময় সৎ থেকেই হতে হবে। কিন্তু এই সৎ কোথায় লয় হয়? যার আলোচনা আগেই করা হয়েছে – ঘট মাটিতে, মাটি পদার্থে, পদার্থ এনার্জিতে এই করে করে শেষে সৎ বুদ্ধিতে গিয়ে সবটাই লয় হয়ে যাচ্ছে। ধ্যানের গভীরে একমাত্র সৎ বোধ, সত্তামাত্রম্ যেটা ঠাকুর বলছেন, এই সত্তামাত্রমে গিয়ে সব লয় হয়ে যায়।

সেইজন্য নাস্তিকবাদীরা যাই বলুক, ব্রহ্মবাদী ও উপনিষদের উপর শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির কাছে আত্মা আছেনই আছেন। নাস্তিকবাদীরা মনে করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৎ, এই সৎ অসতের উপর দাঁড়িয়ে আছে, মানে শূন্য থেকে সৃষ্টি, এরা কোন দিন ঈশ্বরকে জানতে পারবে না, আত্মাকে জানতে পারবে না। চার্বাকপন্থীদের বা বিজ্ঞানীদের এই সৃষ্টি কোথা থেকে এল জিজ্ঞেস করলে এরা যে দর্শনকে ভিত্তি করে উত্তর দেবে তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে এদের কোন coherent philosophy নেই। এদের সব ব্যাখ্যা ছোট্ট একটা গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরপাক করে। এদের সাথে তর্ক করাটাই বৃথা। প্রত্যেকটি জিনিষের সব সময় দুটো রূপ থাকে, একটা শাশ্বত রূপ আরেকটা অশাশ্বত রূপ, অশাশ্বত রূপটা শাশ্বত রূপে মিশে যায়। যেমন ঘট মাটিতে মিশে যায়, মাটি পদার্থে মিশে যায়, পদার্থ এনার্জিতে মিশে যায়, এভাবে চলতে থাকে। শেষে সৎ বুদ্ধি, অস্তি অর্থাৎ আছে, isness, ওটাতে গিয়ে লয় হয়ে যায়। আর এই সৎ বুদ্ধিটাই সৎ বৃত্তি। এই বোধ যাদের নেই তাদের কাছে আত্মা কখনই স্পষ্ট হন না, আত্মজ্ঞানও তাই কোন দিন হয় না।

যারা মনে করছে অসৎ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, তাদের কখনই এই জিনিষগুলির ধারণা হবে না। ঘোর ভৌতিকবাদী এমনকি বৌদ্ধদের যে শূন্যবাদ, তাদের মতে সৃষ্টি শূন্য থেকে হয়। কোন ভাবে সৃষ্টিটা হয়ে গেছে। বেশি প্রশ্ন করতে গেলে এরা আর উত্তর দিতে পারে না। আমরা মনে করি যাঁরা ঠাকুরের কথা বেশি বলেন তাঁদের একটু চেপে ধরলে আর উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু জিনিষটা ঠিক উল্টো, যারা ভৌতিকবাদী তারাই উত্তর দিতে পারে না। ভৌতিকবাদীদের বক্তব্য, সব কিছু ধীরে ধীরে শূন্যে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়। তখন বেদান্তীরা বলেন তা কখন হয় না, এই আত্মজ্ঞান, যার আলোচনা এখানে চলছে, এই আত্মজ্ঞানকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, না জানতে পারাটাই স্বাভাবিক কারণ আত্মজ্ঞান আরও সূক্ষ্ম। যদি যুক্তি দিয়ে দেখতে হয়, এখন যা আলোচনা করা হল এটাই জগতের আধার, আত্মাকে ইন্দ্রিয়ে দিয়ে জানা যাবে না, কিন্তু জগতের আধার রূপে আত্মাকে সব সময় জানা যাচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বরে তখন লাটু মহারাজ আছেন। তাঁকে কেউ ঈশ্বর নিয়ে কিছু বলেছিল, সেটা আবার তিনি ঠাকুরকে এসে বলছেন। ঠাকুর তখন লাটু মহারাজকে বলছেন, তুই বলতে পারলি না যে, এই যে জগৎ, গাছপালা, মানুষ, পশুপাখী এগুলো ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি তো কে করেছেন! কথামৃত প্রথম এই জায়গাটা পড়লে ঠাকুরের যুক্তিতর্কটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কেমন একটা স্থূল যুক্তি মনে হবে। ঠাকুর বলছেন কে করেছেন, এর অনেক উত্তরই আছে, নিজে থেকেই হচ্ছে। কিন্তু এই মন্ত্রের গভীরে গেলে ঠাকুরের কথার গভীর তাৎপর্যটা স্পষ্ট হয়। আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম গাছাপালা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব কিছু নিজে থেকেই হচ্ছে। তাহলে বলুন নিজে থেকে হওয়াটা কিসের উপর নির্ভর করছে? তার যে বীজ, এই বীজ কোথা থেকে এল? এই করে করে শেষে যখন যাবে তখন দেখা যাবে সব কিছু সৎ বুদ্ধিতে আশ্রিত। আর এই সৎ বুদ্ধি কোথায় যায়? সৎ বোধে, অস্তি, সত্তামাত্রমে। সবটাই ঈশ্বর, ঈশ্বর না হলে এই সৃষ্টি কখনই হবে না। এখানে পরিষ্কার যুক্তিতে যাচ্ছে, ভাগবত এই রকম বলেছে, এটা ঠাকুরের কথা, যিশুর কথা, বুদ্ধের কথা কারুর কোন কথা দিয়ে যাচ্ছে না, একেবার নির্ভেজাল যুক্তি দিয়ে যাচ্ছে। তাই আত্মাকে যদি জানতে হয়, ঈশ্বরকে যদি জানতে হয় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দিয়েই জানা যাচ্ছে। মুণ্ডকোপনিষদও একই কথা বলছেন, *ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্*, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দিয়েই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর তার সব কিছুর আধার হলেন আত্মা বা ঈশ্বর। আবার অন্য দিকে দিয়ে গেলে বলা হয়, কোন জিনিষই শূন্যে লয় হতে পারে না, এই গ্লাশ কখনই শূন্যে লয় হয়ে যাবে না। গ্লাশের নাশ হয়ে গেলে গ্লাশ এমন জিনিষেই লয় হবে যেটা সৎ, জিনিষটা সূক্ষ্ম হতে পারে কিন্ত সৎ। যেমন এই গ্লাশ কাঁচে লয় হয়, কাঁচ গ্লাশের থেকে আরও সূক্ষ্ম। কাঁচ আবার সিলিকনে গিয়ে লয় হয়ে যায়, সিলিকন আবার পিণ্ডর পদার্থে লয় হয়, পদার্থ এনার্জিতে লয় হয়ে, এইভাবে একটা থেকে আরেকটাতে লয়, সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মে লয় হয়, কিন্তু কখনই শূন্যে লয় হবে না। যে জিনিষটা শূন্যে লয় হয় তার মানে সেই জিনিষটা শূন্যই ছিল। বেদান্তের এটাই প্রধান যুক্তি।

আরও বলছেন, যেখানে গিয়ে ঐ জিনিষটা লয় হচ্ছে সেই জিনিষটা আগে থেকেই আছে, ঘট যখন মাটিতে লয় হয়, গ্লাশ যখন কাঁচে লয় হয়, মাটি আর কাঁচ আগেই ছিল, ঘট আর গ্লাশ পরে এসেছে। যে কোন কার্য সব সময় মিশে যায় তার কারণে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যখন লয় হয়ে যাবে, তখন লয় হবে তার মূল কারণে। আমরা তাঁকে আত্মা বলি, ঈশ্বর বলি, সচ্চিদানন্দ বলি যাই বলি না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, এটাই positive existence। এও বলছেন যে, অসৎ বুদ্ধির যে বিলয় হয় সেটাও কিন্তু সৎ বুদ্ধিতেই হয়। যেমন আমরা বলছি এই লোকটি আসেনি, এটা অসৎ বুদ্ধি, এটাও কিন্তু লয় হচ্ছে বোধে, এলো না এই বোধে, এই বোধ যে হচ্ছে এটাও সৎ বুদ্ধি থেকে হয়। যেমন মরীচিকা অসৎ কিন্তু মরীচিকার লয় হয় মরুভূমিতে, মরুভূমি কিন্তু সৎ। মরীচিকার জন্য দরকার একটা মরুভূমি, মরীচিকা যে মিলিয়ে যাবে তার জন্যও দরকার মরুভূমির। আমি যখন মরীচিকা দেখছি তখন মরীচিকা রূপে জানছি। একজন আমাকে বলে দিল, আরে ওটা মরীচিকা, ওখানে জল নেই। তাহলে মরীচিকা কোথায় গেল? মরীচিকা কি উবে গেল? না, সৎ বুদ্ধিতে মিশে যায়। কোন সৎ বুদ্ধিতে? যেটা মরুভূমি। অসৎ মরীচিকা মিশে গেল মরুভূমির সৎ বুদ্ধিতে। সৎ জিনিষ সৎ বুদ্ধিতে মিলে যায় কিন্তু অসৎ বুদ্ধিও মিলে যায় সৎ বুদ্ধিতে। সেইজন্য সৎ বুদ্ধিকে কখন প্রশ্ন করা যাবে না।

কোন পরিস্থিতিতে যদি বলাও হয় যে চরমে সব কিছু অসতেই যায় বা অসৎ থেকে সব কিছুর জন্ম, তখনও যুক্তিতে এই জিনিষ একেবারেই দাঁড়াবে না। কারণ যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসৎ থেকে জন্ম নিত তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ছিল সবটাই অসৎ প্রতীত হত। বুদ্ধি বলছে এই যা কিছু আছে সব সৎ, যদি এটা সৎ না হয় তাহলে আপনি যে ঈশ্বরের কথা বলছেন, ঈশ্বরও তাহলে অসৎ হয়ে যাবেন। অসৎ থেকেই যদি সৃষ্টি হয় বা শূন্য থেকে যদি সব কিছুর জন্ম হয় তাহলে আপনি যে কথাগুলো বলছেন বা বলবেন বা বলেছিলেন সবটাই অসৎ হয়ে যাবে।

সব কিছু যে পর পর সৎ বুদ্ধিতে গিয়ে মিলে যাচ্ছে তাতে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে যায়, কার্য আর কারণ দুটো একই জিনিষ। এই সৎ আর সৎএর যে সৃষ্টি সবটাই এক বোধ হয়ে যাবে। সব কিছু আত্মা থেকেই এসেছে আর যা কিছু আছে সব আত্মার সাথে অভিন্ন। কারণ মাটিও যা ঘটও তাই, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই বলছেন, যাদের এই বোধ এখনও হয়নি, ভাসা ভাসা যারা বলছে, যদি আমি চোখ দিয়ে ভগবানকে

নাই দেখতে পাই, মন দিয়ে ভগবানকে যদি নাই জানতে পারি তাহলে এটাই হয় যে ভগবান নেই, এরা কোন দিন ভগবানকে জানতে পারবে না। যুক্তিতে এই মন্ত্রে ঠিক এই জিনিষটাকেই বলে দিচ্ছেন *অস্তীতি ব্রুবোতহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে*, যাদের এই বোধটাই আসছে না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা কিছু আছে সব অন্তিমে সৎএ গিয়ে মিলে যায়, এরা কি করে সেই আত্মাকে জানবে! কারণ ঈশ্বরকে যদি জানতে হয়, আত্মাকে যদি জানতে হয় আগে তাকে জানতে হবে পুরো জিনিষটা ওখান থেকেই বেরোচ্ছে। এই বোধটুকু যদি না এসে থাকে তাহলে তো তার আস্তিক বোধই আসবে না। অস্তি বোধ যদি না থাকে মানুষ তাহলে সেই জিনিষের দিকে এগোতে চাইবে কেন! ভক্তরা সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে, মহারাজ জপ হয় না, মহারাজ ধ্যান হয় না, মহারাজ ভগবানের দিকে মন যায় না। কিন্তু একবার ভেবে দেখুক কেন কিছু হচ্ছে না, কেন ভগবানের দিকে মন যায় না। ঈশ্বর আছেন বলে তাদের কি একটুও বিশ্বাস আছে? তোমার কি বিশ্বাস আছে তুমি মরে যাওয়ার পর সব কিছুর অন্ত হয়ে যাবে না? তোমার কি বিশ্বাস আছে তোমার এই অসৎ ভাব একটা সূক্ষ্ম সৎ ভাবে মিশে যাবে? আর ঐ সৎ ওটাও আপেক্ষিক ভাবে সৎ, আসলে ওটাও অসৎ, সেটা আবার আরেকটা বেশি সূক্ষ্ম সৎএ গিয়ে মিশে যাবে। আর চূড়ান্তে গিয়ে সত্তামাত্রম্ থাকছে। ওখানে আর কোন মেশামেশির ব্যাপার থাকছে না, তখন তিনিই আছেন, কালও ছিলেন, আজও আছেন, আগামীকালও থাকবেন। এই বোধ যাদের এখনও পরিপক্কতা লাভ করেনি তারা কি করে আশা করবে যে আমার ঈশ্বরের জ্ঞান হবে বা আমার আত্মজ্ঞান হবে! উপনিষদ এই প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন করা মানে বলতে চাইছেন এদের কোন দিনই জ্ঞান হবে না।

সংক্ষেপে এই মন্ত্রের বক্তব্য হল, বস্তুর নাম আর রূপেরই নাশ হয়, নাশ মানে আরেকটা জিনিষে বিলয় হওয়া। নাশ বলতে যে অর্থে আমরা বুঝি সেই অর্থে কিন্তু কোন কিছুরই নাশ হয় না। একটা রূপ আরেকটা রূপে পরিবর্তিত হয়, একটা বস্তু আরেকটা বস্তুতে লয় হয়ে যায়। এই যুক্তিকে ধ্রুব সত্য মেনে নিলে প্রথমেই ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম এই ধরণের সব ধর্মের দর্শন মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ তখন সৃষ্টিতে নাশ বা মৃত্যুতেই সব শেষ বলে কিছু থাকবে না। নাশ মানে বস্তু তার রূপ আর নাম পাল্টে আরেকটা বস্তুতে চলে গেছে। বস্তুর আসল সত্তা কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে গেল। এর আগে ক্রিস্টালাইজ করা নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে, জলের মধ্যে অনেক ক্রিস্টাল দিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ঐ জিনিষটা স্যাচুরেটেড হচ্ছে, এরপর একটা ক্রিস্টাল পড়তেই পুরো জিনিষটা তৈরী হয়ে যায়। সাধনা মানে তাই, একটা জিনিষ অনেক দিন ধরে করে যাচ্ছে, হয়ত যান্ত্রিক ভাবেই করে যাচ্ছে। করতে করতে কোন এক সন্ত মহাত্মা তাঁকে খুব সাধারণ একটা তত্ত্ব বলে দিলেন, ঐ একটা কথাতেই এত দিন যে সাধনা করে করে একটা প্রস্তুতি নিয়েছে সেটা চট করে জমে একটা সলিড জিনিষে দাঁড়িয়ে যায়, এটাকেই বলা হয় বস্তু লাভ। আমরা ভাবি তাঁর কৃপায় বস্তু লাভ হয়, কাঙালীকে তিনি ধনী করে দেন, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ কত রকম কথা বলছি, কিন্তু হিন্দু মতে এভাবে কখনই হয় না। যদি কখনও দেখা যায় কারুর খুব কম বয়সেই জ্ঞান হয়ে গেছে, তখন বলবে আগের জন্মে ওর সাধনা করা আছে। তাই হতে হবে, তা নাহলে যুক্তিতেই দাঁড়াবে না। আচার্য শঙ্কর ছোটবেলাতেই সব শাস্ত্রের অধ্যয়ন করে নিয়েছেন। আমাদের সাথে তফাৎ হল আমাদের সব কথা মনে থাকে না, কিন্তু তাঁর মনে থাকে, তিনি শ্রুতিধর। স্বামীজীও শ্রুতিধর, যেটা পড়ছেন সেটা আর ভুলছেন না। কিন্তু তাঁদেরও পড়াশোনাটা করতে হয়েছে। আমাদের খুব প্রচলিত ধারণা যে তাঁর কৃপাতে সব হয়ে যাবে। কিন্তু এর সপক্ষে আমরা কোন দৃষ্টান্ত পাই না। অধ্যয়ন ছাড়া কারুরই হয়নি। সবাই লাটু মহারাজের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসেন, কিন্তু লাটু মহারাজ কত খেটেছেন, কত শুনেছেন, কত সৎসঙ্গ করেছেন সেগুলো কেউ দেখছে না। বিদেশে স্বামীজী কি কি বলছেন আলোচনাতে সব শুনতেন। একদিন তিনি স্বামীজীকে বলছেন – লোরেন ভাই! তুমি যাই বল, আমার তো মনে হয় তুমি শুধু দাগা বুলিয়েছ। লাটু মহারাজের কথা শুনে স্বামীজী হতচকিত হয়ে গেছেন। স্বামীজীকে নিয়ে সারা বিশ্ব তখন মেতে উঠেছে, কী উচ্চমানের কথা মানুষের সামনে বলে গেছেন, কিন্তু লাটু মহারাজ এক কথায় বলে দিলেন তুমি শুধু দাগা বুলিয়েছ। তার মানে বলতে চাইছেন স্বামীজী নতুন কথা কিছু বলছেন না, শাস্ত্রেরই কথা ভিন্ন আঙ্গিকে বলছেন। লাটু মহারাজের এই যে বিচক্ষণতা, তিনি এই উচ্চমানের অনুভূতি সম্পন্ন ছিলেন বলেই তাঁর এই বিচক্ষণতা এসেছে। ভেতরে অনেক কিছু গিয়েছিল বলেই তিনি আলাদা ধরণের অনুভূতি সম্পন্ন হতে পেরেছিলেন। উপনিষদের মন্ত্রের ধারণা করা আর এর মাহাত্ম্যকে জানার জন্য অন্যান্য ধর্মে কি

বলছে, তাঁরা জিনিষটাকে কিভাবে দেখছেন, হিন্দু ধর্মেরই অন্যান্য মতের লোকেরা উপনিষদকে কিভাবে দেখছেন এগুলো জানা দরকার।

প্রথম যুক্তি হল, কোন জিনিষের নাশ হওয়া মানে আরেকটা জিনিষে লয় হয়ে যাওয়ার মধ্যে দুটো বোধ, বস্তু বোধ এবং বস্তুর লয় হয় তার কারণে, অর্থাৎ কার্য কারণে লয় হয় আর সৎ বুদ্ধি যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয় হয়ে যাবে তখনও একটা জিনিষের বোধ থাকবে, কিছু নেই এই বোধ থেকে যাবে। অভাব বোধটাও বোধ। হিন্দু দর্শনের ষড়্‌দর্শন অভাব কি বোধ নাকি বোধেরই একটা রূপ, এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচুর তর্কাতর্কি করে। বেদান্ত বলবে অভাব বোধ একটা positive জিনিষ, জিনিষটা নেই এটাও একটা বোধ, কোন কিছুই নেই এটাও একটা বোধ, বোধ জিনিষটা আগাগোড়া থেকেই যাচ্ছে। ঠাকুর এটাকেই সত্তামাত্রম্ বলে বলছেন বোধে বোধ হয়, তখন শুধু বোধটুকুই থাকে আর কিছু থাকে না। বস্তু বলে কিছুই থাকবে না। ঠাকুর যাঁকে নিয়ে সারা জীবন সাধনা করে এলেন, তিনিও থাকবেন না। থাকছে শুধু বোধ, এই বোধই জ্ঞান। এই জ্ঞান যাঁর হয় তিনি সৎ বোধ, জ্ঞান বোধ আর জ্ঞানের জন্য যে আনন্দ এই তিনটেতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, এটাই সচ্চিদানন্দের অবস্থা। অন্যান্য মতালম্বীরা, রামানুজম, মাধ্বাচার্য, ভক্তিমার্গীরা এভাবে মেনে নেবেন না। এনারাও প্রচুর যুক্তিতর্ক নিয়ে আসেন। ঠাকুর ছিলেন অদ্বৈত, তিনি যা বলে দিয়েছেন তার বাইরে আমরা কখনই যাবো না, সেইজন্য কে কি তর্ক করছে সেদিকে আমাদের যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। স্বামীজী আচার্য শঙ্করের মতকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেইজন্য সত্তামাত্রম্‌কে কেন্দ্র করেই আমাদের চলতে হবে। এটা খুব সংক্ষেপে বলা হল। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে এত সহজে মীমাংসা হবে না, অন্যান্য দর্শন বেদান্তকে ছাড়বে না, দু পক্ষকেই অনেক রকম যুক্তিতর্ক নিয়ে আসতে হয়।

বেদান্ত শেষে যুক্তি দিয়ে দেখাবে, তুমি সাধারণ ভাবে যে জগৎ দেখছ, এই জগতেরও কখনই কোন কিছু নাশ হয় না, হয় কার্য কারণে লয় হয়ে যায় নয়তো কারণ কার্যকে জন্ম দেয়। বীজ বৃক্ষে পরিণত হবে, বৃক্ষ আবার বীজকে জন্ম দেয়। বীজে যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আছে ঐটাই বৃক্ষে পরিণত হয়ে যায়, আর বৃক্ষে যে পূর্ণ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আছে ঐটাই আবার খুব সূক্ষ্ম রূপে বীজাকারে চলে যায়। মাঝখানে নাশ কোথাও নেই। নাশ নেই তাই প্রসারণ আর সঙ্কোচ ছাড়া কিছু হয় না। আচার্য শঙ্করের এই যুক্তিকে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে প্রথমেই সমস্ত বিদেশী ধর্মগুলো সমস্যায় পড়ে যাবে। কারণ এদের কাছে এটাই সত্য যে, ভগবান একবার সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এই সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যাবে সৃষ্টিটাও চিরদিনের মত নাশ হয়ে যাবে। বেদান্তের কাছে এই যুক্তি দাঁড়াবেই না। বেদান্তের যুক্তিকেও এরা নিতে চাইবে না, কারণ তাদের প্রফেট এই রকম বলে দিয়েছেন। প্রফেটই বলে থাকুন আর যিনিই বলে থাকুন সেটাকে যুক্তিতে দাঁড় করাতে হবে। যুক্তিতর্ক বলেও একটা জিনিষ আছে।

বারো নম্বর মন্ত্র মূলতঃ নাস্তিক দর্শন ও বৌদ্ধদের দর্শনের সমস্ত যুক্তিকে খণ্ডন করছে। নাস্তিক দর্শন মানে চার্বাকদের মত, যাঁরা একমাত্র ভৌতিক জিনিষকেই মানেন। বৌদ্ধ ধর্ম বলে জ্ঞানের পর আর কিছু থাকে না। এখানে আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার করে বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলছেন না, কিন্তু তিনি যে যুক্তি দিচ্ছেন তাতে বৌদ্ধ ধর্মের যুক্তিও খণ্ডন হয়ে যায়। স্বামীজীও বেদান্তের উপর বলতে গিয়ে এই জিনিষটাকে নিয়েই বলছেন, যে পরিবর্তনই হোক আর যত পরিবর্তনই হোক ঐ পরিবর্তনের একটা আধার সব সময় থাকে। স্বামীজী যে আধারের কথা বলছেন যুক্তিতর্ক দিয়ে তত বোঝা যায় না, কিন্তু ধ্যানের গভীরে আরও চিন্তন করলে মনে হয় যে এনারা ঠিকই বলছেন। কিন্তু ঠাকুরই আছেন বা ঠাকুরই ঈশ্বর এটাই যদি চূড়ান্ত দর্শন হয়ে যায় তাহলে অনেক ধরণের সমস্যা এসে যাবে। বিশ্বের ভক্ত সম্প্রদায়রা যাঁদের আচার্য রূপে বরণ করেছেন, তিনি যেই হন না কেন, যিশু, মোজেস, মহম্মদ, জরাথ্রুষ্ট আর ভারতবর্ষের ঋষি, মুনি, মহাত্মারা সবাই ঠিক এভাবেই সাধনা করেছেন – আমি আছি, জগৎ আছে আর ঈশ্বর আছেন, আমি জগৎকে চাই না, আমি বিয়ে-থা করব না, আমার সন্তানাদি হবে না, আর হলেও একটা সময়ের পর আমি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানি না। এবার সাধনা করে করে ঈশ্বর সত্য জেনে যাওয়ার পর একটা বড় সমস্যা হয়।

ঈশ্বর সত্য আমি জেনে গেছি আর ঠিকই জেনেছি। একবারও বলা হচ্ছে না যে খ্রীষ্টান, ইসলাম, জুদাইজিম ধর্ম যা বলছে সব ভুল বলছে, ধর্মের দিক দিয়ে সবাই ঠিক বলছে। কিন্তু সমস্যা হল দর্শনের দিক

দিয়ে এই ধর্মগুলো নির্ভুল নয়। আপনি বলবেন দর্শন দিয়ে আমার কি হবে? দর্শন যদি ঠিক না থাকে তখন ধর্মকে অনেক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিলে সেই ধর্মের অনেক সমস্যা এসে যাবে। তখন তলোয়ারের জোর না থাকলে ধর্মটাই হারিয়ে যাবে। ধর্ম হারিয়ে গেলে কি হবে? এইসব ধর্মের প্রফেটরা সাধনা করে করে উচ্চমানের যে আধ্যাত্মিক সত্যকে নিয়ে এসেছিলেন সেটাও ধর্মের সাথে সাথে চলে যাবে। ইংরাজীতে একটা নামকরা প্রবাদ আছে Don't throw the baby out with water। বাড়িতে কাজের মহিলাকে বাথটাবটা পরিষ্কার করতে বলা হল, এই টাবে বাচ্চাকে স্নান করানো হয়েছে। কাজের মহিলা পরিষ্কার করতে গিয়ে বাচ্চা সমেত টাবের জলটা বাইরে ফেলে দিল। মালকিন তার বাচ্চাকে টাবে স্নান করিয়েছে, কাজের মহিলাকে বলেছে টাবটা পরিষ্কার করে রাখতে, মহিলাটি জল আর বাচ্চা দুটোই বাইরে ফেলে দিয়েছে। এখন দর্শনকে ফেলে দিতে চাইছেন, তাতে ধর্মতত্ত্বটাও বাইরে ফেলা হয়ে যাবে। ধর্মতত্ত্বকে নিয়ে কেউ প্রশ্ন করছে না। যিশু ঈশ্বরের সন্তান, যিশু যা কিছু উপলব্ধি করছেন, দেখছেন এগুলোকে নিয়ে কোন হিন্দুই কোন দিন প্রশ্ন করতে যাবে না। মহম্মদ যে বলছেন আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর এই নিয়েও কোন হিন্দু প্রশ্ন করবে না। প্রশ্ন করবে ঠিক ঐ জায়গাটায় যখন সাধনা শুরু করেছেন, আমি আছি, ঈশ্বর আছেন আর জগৎ আছে, সেখান থেকে আমি আর ঈশ্বরের মিলন হয়ে আমি হয়ে গেলাম ঈশ্বরের সন্তান বা সেবক বা ঈশ্বরের সাথে এক যাই হোক, কিন্তু এবার জগতের কি হবে? কেশব সেন বলছেন, আশীর্বাদ করুন যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকি। ঠাকুর তখন বলছেন, চিকের আড়ালে যারা আছে তাদের কি হবে? আমি না হয় ভগবানে ডুবে গেলাম কিন্তু আমার পেছনে যারা আছে তাদের কি হবে, চিকের আড়ালে যারা আছে অর্থাৎ এই জগতের কি হবে? এই জায়গাতে এসে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মশাস্ত্র বা দর্শন জন্ম নেয়। এখান থেকে তাঁরা দেখাতে যান ঈশ্বরের সাথে জগতের কি সম্পর্ক বা আমার সাথে জগতের কি সম্পর্ক। যিনি ঈশ্বরের জ্ঞান পেয়ে গেলেন, ঈশ্বর দর্শন যাঁর হয়ে গেল তাঁর কাছে জগতের আর কোন দাম নেই, তাঁরা শুধু বাকিদের বলছেন তোমরা সৎ ভাবে থাকবে, ঈশ্বর নামগুণগান কর, ধ্যান কর তাতেই তোমার হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের তো সেই জ্ঞান নেই বা ক্ষমতা নেই। তাদের এখন সবটাই দেখতে হচ্ছে, একদিকে তাদের সংসার সামলাতে হচ্ছে অন্য দিকে আচার্য যেটা বলে দিয়েছেন সেটাও সত্য। কিন্তু বাস্তবে গিয়ে দেখছে দুটো কোথাও মিলছে না। ঈশ্বরের সত্তার সাথে সংসারের বাস্তবিকতাকে মেলান যাচ্ছে না। আচার্য বলে দিয়েছেন ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কিন্তু জগৎটা দেখছি শুধু দুঃখ স্বরূপ। বলছেন ঈশ্বরকে ভালোবেসে যাও সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু সংসারে কেবল আঘাত আর যন্ত্রণাই জুটছে। আবার বলছেন ঈশ্বর অজর অমর কিন্তু সংসারের সব কিছুই প্রতিনিয়ত পাল্টে যাচ্ছে। এরপর মনে নানান রকম প্রশ্নের উদয় হয়, সংসারের উৎপত্তি কিভাবে হল, আমি কোথা থেকে এলাম, ইত্যাদি। প্রত্যেক ধর্মের অবতার পুরুষরা সব কিছু বিস্তার করে বলেন না। অবতারের পরে যারা আসেন তাঁরা বিস্তারিত ভাবে সব ব্যাখ্যা করতে থাকেন।

দ্বৈতবাদীদের যত ধর্ম আছে তাদের সবারই এই সমস্যা হয়, ঈশ্বর কোথায় আর জগৎ কোথায়। কেউ বলবেন, ঈশ্বর উপরে কোথাও বসে আছেন, তিনি মাটি দিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করলেন বা তিনি ইচ্ছা করলেন আর জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল। তাহলে ঈশ্বর কোথায় আর জগৎ কোথায় থাকল? বলবেন, জগৎ নীচের দিকে আর তার উপরে বাতাসের মধ্যে তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। আরেকজন বলবে, সিংহাসনেও বসে আছেন আবার জগতের মধ্যেও মিশে আছেন। এই সমস্যা গুলো এইজন্যই হয় যে, আধ্যাত্মিক সত্য আর দার্শনিক তত্ত্ব এই দুটোকে বৌদ্ধিক ভাবে মেলবন্ধন করার চেষ্টা করা হয়নি। ঋষিরাই এই মেলবন্ধন করেন। ধর্মীয় সম্প্রদায়ে প্রচুর ঋষি যদি না থাকেন, সেখানে এই সমস্যা হবে। ঋষিরা কেমন হবেন? তাঁকেও আধ্যাত্মিক সত্যের যিনি দ্রষ্টা তাঁর মতই হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় যেমন ঠাকুর ছিলেন, যদিও আমরা বলব না স্বামীজী ঠাকুরের মতই ছিলেন, এক রকম না হলেও কিছুটা তো ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী যদি না থাকতেন আমরা কল্পনাই করতে পারি না যে রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্ম আজ কি হত! শুধু কথামৃত আর লীলাপ্রসঙ্গকে আধার করে যদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আর তার সাথে জগৎকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া হয় সেখানে অনেক ফাঁক থেকে যাবে। এই দুটোর সাথে স্বামীজীর Complete Worksকে যখন জুড়ে দেওয়া হয় তখন ঐ ফাঁকগুলো ভরাট হতে শুরু হয়। অন্যান্য ধর্মে ঠিক এই সমস্যাই হয়েছে, ফাঁকগুলো ভরাট করা হয়নি। একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তে এই ফাঁকগুলোকে ভরাট করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত অবতারই মানে না, গুরু আর শিষ্য একজন আরেকজনের উপরে। এই জিনিষতো কখন হয় না। আচার্য শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের সাথে তর্ক করতে গেছেন। সারা ভারতে তখন মণ্ডন মিশ্রের কি

বিশাল খ্যাতি, অন্য দিকে শঙ্করাচার্যকে কেউ জানেও না। তর্ক করার আগে শর্ত করা হল যে হেরে যাবে সে অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নেবে। আচার্য শঙ্করকে বলা হয় বর্তমান হিন্দু ধর্মের প্রণেতা, তাঁর মত লোক যাঁর সাথে তর্ক করছেন, তিনিও তাহলে কত তুখোড় পণ্ডিত। শঙ্করাচার্য দেখাচ্ছেন কর্মকাণ্ড কখনই সত্য হতে পারে না, বেদান্তই সত্য। এবারে শুধু তর্কই চলতে থাকল। শেষে মণ্ডন মিশ্র তর্কে হেরে গেলেন। এবার মণ্ডন মিশ্র হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী তার সাথে শঙ্করাচার্যের প্রধান শিষ্য, নাম হল সুরেশ্বরাচার্য। সুরেশ্বরাচার্য এবার নিজে বেদান্তের খুব নামকরা একটি গ্রন্থ রচনা করলেন, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় কী তুখোড় পণ্ডিত আর জ্ঞানী ছিলেন। বয়সে আবার শঙ্করাচার্যের থেকে অনেক বড়। কিন্তু উনি বুঝে গেলেন, আমার মত ও পথ নির্ভুল নয়, ওর মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে। অদ্বৈত বেদান্তের এটাই বৈশিষ্ট্য। এই কথা আমরা আজকে বলছি, কিন্তু উপনিষদের কালে জিনিষটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। বলছেন *ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্*, বড়দের কাছে আমরা এটাই শুনেছি, পূর্ব পূর্ব ঋষিরদের কাছে এটাই শুনেছি। মুণ্ডকোপনিষদে একের পর এক ঋষিরদের নাম বলে যাচ্ছেন। একজন ঋষির সারা জীবনে যা উপলব্ধি সেই উপলব্ধিকে তিনি দুটো বাক্যে রেখে দিচ্ছেন। পরে তাঁর দু একজন খুব উচ্চমানের শিষ্য আসছেন, তিনিও তাঁর সারা জীবনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে দুটো মন্ত্রে রেখে দিলেন, এইভাবে ধীরে ধীরে উপনিষদ দাঁড়াল। যার ফলে উপনিষদ হয়ে গেল আধ্যাত্মিক সত্যের এক ঘনীভূত রূপ আর বৌদ্ধিক, যৌক্তিক দিক থেকে সুদৃঢ়। তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে উপনিষদ হল এক গভীর ভাবের সমাবেশ, যুক্তির দিক থেকে একেবারে নির্ভুল। সেইজন্য উপনিষদকে কখনই কোন ধর্মের সাথে তুলনা করা যাবে না। বাকি সব ধর্মের পেছনে মাত্র একজন লোক, তিনি ঋষি কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সব কথাকে দুধ জাল দেওয়ার মত জাল দিতে দিতে যেটা দাঁড়াবে দেখা যাবে সেটা অল্প একটুতে দাঁড়াচ্ছে। পুরো বাইবেল বা মহম্মদ আল্লাকে নিয়ে যা কিছু বলছেন, সবটাকে জাল দিতে দিতে যদি উপনিষদের দশটা বাক্যে নামিয়ে দেওয়া হয় তখন গিয়ে বক্তব্যের পুরো ছবিটা পাওয়া যাবে। তাহলে ভাবুন এই রকম দশটা দশটা করে কত উপনিষদে কত কথা বলা আছে। এতেই বোঝা যায় উপনিষদের perfection level কোথায়।

দ্বৈতবাদের কথা যখনই বলা হয় তখন সেখানে এটাই বলা হয় যে, ঈশ্বরও আছেন আর জগৎও আছে বা ঈশ্বরও আছেন আর আমিও আছি। দ্বৈতবাদে সত্তা দুটো আর এই দুটো সত্তা একবারে স্বতন্ত্র। এনারা এটাকে প্রমাণিত করতে উপমা নিয়ে আসেন বৃক্ষ আর বৃক্ষের ডাল পাতা। কিন্তু মূল বক্তব্য হল আমি আলাদা আর ঈশ্বর আলাদা। আমার আর ঈশ্বরের মধ্যে একটা যোগ আছে, কিন্তু যোগটা যাই হোক অস্তিত্ব আলাদা। এই মতকে উপনিষদ নাকচ করে দিচ্ছেন। ঠাকুরের সাধনাকে দেখলে বোঝা যায় এখানে উপনিষদ কি বলতে চাইছেন। বারো আর তেরো নম্বর মন্ত্র ঠাকুরের সাধনাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। বারো নম্বর মন্ত্র হল, মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আর কিছু নেই। ঠাকুর সবাইকে বোঝাতে চাইছেন ঈশ্বরই আছেন। বারো নম্বর মন্ত্রে তাই বলছে। তের নম্বর মন্ত্র এটাই দেখাচ্ছে যে, ঠাকুর মা কালীকে মানছেন আর জগৎকেও মানছেন, তোতাপুরী এসে এটাকে পাল্টে দিলেন। তোতাপুরী বললেন, তুমি এভাবে ধ্যান কর। ধ্যান করতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, হচ্ছে না, যিনি সৎ তিনি মা কালী রূপে আমার সামনে এসে যাচ্ছেন। তখন তোতাপুরী কাঁচের টুকরো দিয়ে ঠাকুরের কপালে আঘাত করলেন। এবার এখানে ধ্যান কর। আবার ধ্যান করতেই মা কালী আবার এসেছেন। মা কালী এসেছেন মানে, এই যে সৎ রূপে ঠাকুর মা কালীকে দেখছেন এই সৎকেও খণ্ডন করে দিচ্ছেন। খণ্ডন করা আর খণ্ডনের পরে যে উপলব্ধি হয় সেটাই এই তেরো নম্বর মন্ত্রে বলছেন –

অস্তীত্যেবোপলব্ধস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।২/৩/১৩।

(প্রথমে সোপাধিক আত্মাকে অস্তিরূপে অনুভব করতে হবে এবং পরে নিরুপাধিরূপেও অনুভব করতে হবে। সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভয়ের মধ্যে অস্তিরূপে অনুভূত সোপাধিক আত্মারই নিরুপাধিক ভাবটি আত্মপ্রকাশার্থে তত্ত্বান্বেষীর সম্মুখে উপস্থিত হয়।)

ঠাকুর প্রথমে সৎ রূপে মা কালীকে দর্শন করছেন, এটাকে বলছেন *অস্তীত্যেবোপলব্ধঃ*, জিনিষটা যে আছে আগে সেটা বোধ করতে হয়। বোধ কিভাবে করতে হবে? দুভাবেই বোধ করা যেতে পারে। একটা হল বিচার করে করে নিষ্ঠা এত গভীরে চলে গেল যে, জিনিষটা একেবারে সত্য বলে বোধ হয়। অদ্বৈত সাধনার যে শেষ সাধনা, যেমন ঠাকুর মা কালীকে দেখছেন, দেখছেন মা কালীই সব কিছু, সেখান থেকে আবার অদ্বৈত

ভাবে যাচ্ছেন, এটা একটা ভাব। কিন্তু ঐভাবে না করে যাঁরা সরাসরি করেন, এনারাই জ্ঞানমার্গ। মার্গ দুটো, ভক্তিমার্গ আর জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানমার্গীদের সাধনা অন্য রকম হয়। জ্ঞানমার্গী বিচার করেন। এর আগে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল – নাশ বলে কোন কিছু নেই, পরিণাম বলে কিছু নেই, কার্য কারণে লয় হয়, এটাই বিচার করেন। এইভাবে বিচার করে করে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যান যেখানে তিনি বোধ করেন ঐ সত্তামাত্রমই আছেন। কেউ মারা গেলে তিনি তখন দেখেন মৃত্যুটাও একটা পরিবর্তন, রোগ, শোক, হাসি, কান্না সবটাই নাম আর রূপের খেলা। নাম আর রূপের নীচে এই সৎ সব সময় থেকে যাচ্ছে। শুধু বিচার করে যিনি এই অবস্থায় পৌঁছে গেছেন আর আচরণও সেই রকম হয়ে গেছে, তাঁর এই অবস্থা আর সাধনা করে ঠাকুরের মা কালীর দর্শন এই দুটো অবস্থার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ ভক্তিমার্গ দিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে যে ঈশ্বরই আছেন আর জ্ঞানমার্গ দিয়ে যিনি যাচ্ছেন তাঁর স্থির বিশ্বাস সত্তামাত্রই আছেন, দুটোই এক। দুটোতেই কিন্তু একটা ধাপ কম থেকে যায়। ঐ সত্তা ছাড়া আর কিছু নেই এটাকে বাস্তবিক উপলব্ধি করা। ভক্তিমার্গ দিয়ে ঠাকুর যে ধ্যান করে করে বাস্তবিক যে উপলব্ধি করছেন, সেই ধ্যান তাঁকে তোতাপুরী দেখিয়ে দিলেন, তুমি এখানে ধ্যান কর, ঠাকুরও সেইভাবে ধ্যান করলেন। আর যিনি জ্ঞানমার্গ দিয়ে যাচ্ছেন, তিনিও আরেক ধাপ লেগে থাকেন, সেই ধাপে কি হয় তারই বর্ণনা এখানে করছেন।

প্রথম ধাপ সবার জন্য এক, *অস্তীত্যেবোপলব্ধঃ*, আছে এই জিনিষটাকে উপলব্ধি করা। আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে বেশীর ভাগ মহাত্মারা সবাই এই জায়গাতে এসেই থেমে যান। কারণ ঈশ্বরের সত্তাকে তাঁর দেখা হয়ে গেছে, এরপর তাঁর আর কিছু লাগবে না। তোতাপুরী যদি ঠাকুরকে দিয়ে অদ্বৈত সাধনা না করাতেন বা অদ্বৈত সাধনার অংশটুকু যদি ঠাকুরের সাধনার ইতিহাস থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ঠাকুরের ধর্মও ইসলাম আর খ্রীষ্টানদের মত একটা ধর্ম হয়ে যেত যেখানে মা কালীই সব কিছু হয়ে থাকতেন। শাক্ত পরম্পরার লোকেরা বলতেন আমাদের পরম্পরায় ঠাকুর একজন বিরাট সিদ্ধ পুরুষ। যতক্ষণ এটাকেও ভেঙে বেরিয়ে আসার সাধনা না করা হয়, আর সাধনা করে উপনিষদের সত্যকে উপলব্ধি না করা হয় ততক্ষণ কিন্তু একজন অবতার আর একজন সিদ্ধ পুরুষের তফাৎ বোঝা যাবে না। তিনিই আছেন এই সৎ অবস্থায় পৌঁছে গেলে তিনি সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু এর পরবর্তি যে ধাপ এটাই unique, এর সাথে কারুর তুলনা হয় না।

এবার বলছেন, তিনিই আছেন, অস্তি মাত্র, এটা একটা ভাবে জানা হল। এর আরেকটা ভাব হয়, তত্ত্ব ভাবে জানা। প্রথমটা উপলব্ধি হল, এই উপলব্ধিকে এবার তত্ত্ব ভাবেও জানতে হয়। সেটা কি রকম? *অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি*, সৎই আছেন এই বোধ যাঁর ঠিক ঠিক হয়ে গেছে, এবার তাঁর অভিমুখী হয়ে শ্রদ্ধার সাথে লেগে থাকলে একটা সময় তিনি *প্রসীদতি*, ঐ তত্ত্বভাব কৃপা করে তাঁর দিকে তাঁর মুখটা ঘুরিয়ে দেন, অর্থাৎ তাঁকে ঐ জ্ঞানটা দিয়ে দেন। এই জ্ঞান সবাই পায় না। ভক্তিমার্গও এই ভাবকে নেয়, তাঁরাও বলেন তাঁর কৃপা না হলে জ্ঞান হয় না। কিন্তু এই মন্ত্রকে যদি ঠিক ভাবে বিচার করা হয় আর খুব সততার সাথে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হল, সাধনা করে করে মানুষ একটা অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, এরপর তার দ্বারা আর কিছু প্রাপ্ত করা যাবে না। ক্রিস্টাল দিয়ে যাচ্ছে, জলে উত্তাপ দিয়ে যাচ্ছে, সব কিছু করে যাচ্ছে, এরপর ক্রিস্টালাইজেশান যেটা হবে সেটা নিজে থেকেই হবে, ওখানে তোমার কোন হাত নেই। ঠিক তেমনি শেষ যে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান যেটা হবে সেখানে সাধকের কোন হাত নেই। তিনি কখন কাকে কিভাবে কৃপা করবেন, তত্ত্বভাব কবে কখন কার দিকে অভিমুখী হবেন, *প্রসীদতি* অর্থাৎ প্রসন্ন হবেন আমরা জানি না, অপেক্ষা করে পড়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই।

আত্মা আছেন আগে এটাকে বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। কিভাবে? বিচার করে বা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করে বা জপ-ধ্যান করে। উপনিষদে ঈশ্বরের ভাব সেভাবে আসে না। তাহলে কিভাবে আসে? উপনিষদে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার এগুলো তাঁর সব উপাধি। উপাধি মানে এগুলো তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নয়, তাঁর উপর এগুলো আরোপিত। ফলে মানুষকে মানুষ রূপে দেখাচ্ছে, পশুকে পশু রূপে দেখাচ্ছে, জগৎকে জগৎ রূপে দেখাচ্ছে। উপাধির কথায় ঠাকুর বলছেন, বাবু এক সময় এক রকম পোষাক পড়ে নিল তখন তাকে এক রকম দেখাচ্ছে, অন্য সময় আরেক রকম জামা-কাপড় পড়ে নিলে অন্য রকম দেখাবে। রাজার পোশাক পড়লে রাজার মত দেখাবে, মিলিটারির পোশাক পড়লে মিলিটারির মত দেখাবে। আত্মাও ঠিক তেমনি তাঁর উপর

উপাধি নিয়ে নেন, উপাধি হল মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এই জিনিষগুলো। বুদ্ধিও যে তাঁর উপাধি এটাকে বুঝতে হয়, কারণ বুদ্ধি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেমন বলছি মহামায়া, মহামায়াও একটা উপাধি, মহামায়া হলেন প্রকৃতিস্বরূপা, শক্তি যাঁর উপাধি এই অর্থে। অন্য জায়গায় বলবে শক্তি আর শক্তিমান অভেদ, কিন্তু এখানে উপাধি জিনিষটাকে বোঝাচ্ছেন। কারণ উপনিষদ একেবারে শুদ্ধ বেদান্ত, উপনিষদের যে জায়গাতে এখন আমরা যে জায়গাতে আছি, শুদ্ধ বেদান্ত এই জায়গাকে নিয়ে চলছে। প্রকৃতির বা মহামায়ার যা কাজ সব কাজই তাঁর উপর উপাধি হয়ে পড়ে আছে। সব কিছু হল বুদ্ধির খেলা। যখন ব্যষ্টি রূপে দেখছে তখন বুদ্ধি রূপে দেখছে আর সমষ্টি রূপে যখন দেখছে তখন মহৎ রূপে দেখছে। যাবতীয় যা কিছু দেখছে সব তাঁরই কার্য।

এই বোধ হয় যে, সমস্ত জগৎ, আমার যত কার্য সবই বুদ্ধির বিকার, যে বুদ্ধি আত্মার উপাধি। আর সমস্ত কার্য হল বাণীর বিলাস মাত্র, নাম আর রূপের খেলা। আমাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক সত্য অত্যন্ত কঠিন। এই মায়ার দরুণ আমরা আমাদের সবাইকে দেখছি, আমার আপনার কাছে এতগুলো সত্তা আছে, তার মধ্যে আবার রূপ, রস, গন্ধাদির খেলা চলছে, অথচ যদি এক ধাপ পিছিয়ে যাই তখন স্পষ্ট বোঝা যায় আমার মন এগুলোকে নিয়ে কিভাবে খেলা করছে, তার মানে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু হচ্ছে সবটাই মনের খেলা, মস্তিষ্কে কয়েকটা নিওরোন্স এই খেলা করে যাচ্ছে। আমি যে জগৎকে দেখছি এই মস্তিষ্কের ভেতরেই দেখছি। আমি খাচ্ছি, শুনছি, দেখছি সব মস্তিষ্কেই হচ্ছে। মস্তিষ্কের খেলা মানে বুদ্ধির খেলা ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই, নাম আর রূপের খেলা ছাড়া কিছু নেই। পুরোটাই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, অথচ ঋষিরা এই জিনিষটাকে কত হাজার হাজার বছর আগে আধ্যাত্মিক ভাবে দেখছেন। এখানে কোন কিছুকেই নেগেট করছেন না, সবটাই পজিটিভ, পুরো জিনিষটাই নাম আর রূপের খেলা এছাড়া আর কিছু নেই। নাম-রূপের খেলা মানেই বুদ্ধির কার্য। বুদ্ধি আবার আত্মার উপাধি। এই ব্যাপারটা আগে বুঝতে হয়। খুব সহজ ভাষায় আমরা বলি ঠাকুরই আছেন আর এই জগৎ ঠাকুরই কার্য। এগুলোকেই খুব বিচার করে চলতে হয়। অন্যান্য ধর্ম বলে শাস্ত্রে যা বলে দেওয়া হয়েছে সেটাকে তুমি মেনে নাও। কিন্তু একমাত্র হিন্দু ধর্মই বলছে মেনে নেওয়ার আগে তুমি বিচার করে চল, শাস্ত্র যে কথা বলা হয়েছে সেটাকে আগে বিচার করে দেখ, ওটাকে উপলব্ধি কর। সেটাই এখানে বলছেন, তোমার ঠিক বোধ হবে যে ঈশ্বরই আছেন, আর সমস্থ কার্যবর্গ তাঁরই উপাধি। যদি বেদান্তের দিক দিয়ে যাওয়া হয় তখন আত্মাই আছেন আর সমস্থ কার্য নাম আর রূপের খেলা, এই খেলা বুদ্ধিরই খেলা যে বুদ্ধি হল আত্মার উপর উপাধি। ভক্তির দিক দিয়ে ঈশ্বরই আছেন, সব কিছু ঈশ্বরের লীলা। এই বোধ হয়ে যাওয়ার পর যিনি তত্ত্ব, তিনি আত্মাই হন আর ঈশ্বরই হন আর যেভাবেই যান, তিনি যদি তাঁর প্রতি কৃপাবান হন তিনি তাঁর রূপ দেখিয়ে দেন। প্রথমের দিকে কঠোপনিষদে বলছেন *যমৈবেষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, এখানেও এই কথাই বলছেন *তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি*। দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে এই সত্তাই একমাত্র আছেন আর ঐ সত্তার উপর বুদ্ধি হল আদি, সেই বুদ্ধিরই সমস্ত কার্য হল এই জগৎ। এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর এবার আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় আত্মা আপনাকে বরণ করে নেবেন। এই জ্ঞানকেই বলে তত্ত্বজ্ঞান।

এই তত্ত্বজ্ঞানকে আচার্য বলছেন *তদা তস্য নিরুপাধিকস্য অলিঙ্গস্য সদসদাদিপ্রত্যয়বিষয়ত্ববর্জিতস্য*, অলিঙ্গ শব্দ নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। কোন জিনিষকে কিছু চিহ্ন দিয়ে জানা যায় এটা এই, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের কোন চিহ্ন নেই যে চিহ্ন দিয়ে জানা যাবে। আমরা যেমন বলি ভগবান বিষ্ণু শেষনাগের উপর শয়ন করে আছেন, এখানে ভগবান বিষ্ণুর লিঙ্গ এসে গেল। শিব কৈলাসে আছেন, তাঁরও একটা লিঙ্গ হয়ে গেল। আত্মা অলিঙ্গ, তিনি আছেন এই বোধটুকু ছাড়া জানার আর অন্য কোন পথ নেই। আর বলছেন তিনি সৎ অসৎ আদির প্রতীতির বিষয় নন। ঠিক এই জায়গায় এসে সব ধর্ম সমস্যায় পড়ে যায়। শেষ কথা তাঁরা ঠিকই বলছেন, যেমন জহুদিরা অলিঙ্গ রূপেই দেখে, যিশু একটু লিঙ্গ রূপে নিয়ে এলেও অনেকটাই অলিঙ্গ, ইসলামও বলছে আল্লা অলিঙ্গ। কিন্তু তারপরই বলছেন তিনি সৎও নন অসতও নন, তিনি ইন্দ্রিয়গোচর নন, ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না, আর তিনি নেই এই বোধটাও চলে যায়। ভগবান বিষ্ণু শেষনাগে শুয়ে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ, এখানে ভগবান আর অলিঙ্গ থাকলেন না। ভগবান যদি অলিঙ্গ না হন তাহলে শিব আর বিষ্ণু দুজন আলাদা হয়ে যাবেন, তখন মারাত্মক সমস্যা হয়ে যাবে, ভগবানকে যে অনন্ত বলা হয় সেই অনন্তই আর তিনি থাকলেন না। যখন ঠিক ঠিক এই বোধ হয়, আত্মা অলিঙ্গ, কোন শাব্দিক অর্থ দিয়ে তাঁকে ব্যক্ত করা যায় না, আর জিনিষটা যে নেই এটাও জানা যাবে না, অসৎ বলেও বোধ হয় না, সৎ বলেও বোধ হয় না। যেমন এই

ঘরে সিংহ নেই এটা হল অসৎ বোধ, আমরা এখানে সবাই আছি এটা হল সৎ বোধ। আত্মার ব্যাপারে এভাবে সৎ বোধও হয় না অসৎ বোধও হয় না। অলিঙ্গ অথচ আছেন। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন সত্তামাত্রম্।

এভাবে বলার পর আচার্য বলছেন *সোপাধিক-নিরুপাধিকয়োরস্তিত্বতত্ত্বভাবয়োঃ*। এখানে দুটো জিনিষকে নিয়ে বলছেন, সোপাধিক অস্তিভাব আর নিরুপাধিক তত্ত্বভাব, এই মন্ত্রের এটাই মূল বক্তব্য। অধ্যাত্ম সাধনায় এগুলো কোন দর্শন নয় এটাই বাস্তবিক। সাধনা এই দুটো স্তরেই চলে, সোপাধিক অস্তিভাব আর নিরুপাধিক তত্ত্বভাব। বিশ্বের সমস্ত ধর্ম এই দুটির মধ্যে বাঁধা। নিরুপাধিক তত্ত্বভাব, যেখানে আর কোন কিছুই নেই, এটাই অদ্বৈত বেদান্ত। ওখান থেকে নামতে নামতে সোপাধিক অস্তিভাবে যখন চলে এল তখন যে উপাধি নেওয়া হবে সেই উপাধিটাই ঈশ্বর হয়ে যাবেন, তখন বিষ্ণু এসে যাবে, আল্লা এসে যাবে, রামকৃষ্ণ এসে যাবে, উপাধি এসে গেল তাই সোপাধিক অস্তিভাব। যেমনি কোন উপাধি নিয়ে আসা হবে, ঠাকুর আমাকে দেখছেন, আল্লার মর্জি তখনই উপাধি এসে যাওয়াতে সোপাধিক হয়ে গেল। দেখা যেমন একটা উপাধি না দেখাটাও একটা উপাধি। এরপর তিনি করুণাময়, তিনি কৃপা করেন, তিনি দয়াময় এইভাবে একটার পর একটা উপাধি আসতে শুরু হয়ে গেল। যেমন যেমন উপাধি নিয়ে আসা হবে তেমন তেমন ধর্মগুলো আলাদা হতে শুরু করবে।

সাধনা শুরু হয় সোপাধিক অস্তিভাব থেকে, তিনি আছেন আর শেষ হয় নিরুপাধিক তত্ত্বভাবে। শুরু আর শেষ বলা হচ্ছে, কিন্তু এর অর্থটা একটু অন্য রকম, সবাইকে দুটোই বোধ করতে হয়, সাধনার শুরুতে তাঁর সোপাধিক অস্তিভাবেরই বোধ হয়, সেখান থেকে তত্ত্ববোধে যান। আধ্যাত্মিক জগৎ, জগতের অনুভূতি এই দুটি সত্যের মধ্যেই বাঁধা হয়ে আছে। এই দুটোর বাইরে বাকি যা কিছু এর কোন দাম নেই। কোথায় একটা শব্দ পেলাম, কোথায় একটা কিছু জানলাম, কোন একটা নাদ শুনছি বা ঠাকুরের একটা দর্শন হয়ে গেল এগুলোর কোন দাম নেই। দাম ঠিক ঠিক হয় সোপাধিক অস্তিত্ব আর নিরুপাধিক তত্ত্বে গিয়ে, এই দুটোর মধ্যে যে বাচ খেলা চলে তখন যা কিছু হয় সেটারই দাম হয়। যেমন কেউ ঠাকুরকে নিয়ে সাধনা করছেন, এটাই সোপাধিক সাধনা, ঠাকুর আছেন এটাই অস্তিভাব। এই জিনিষটাকে ঠিক ঠিক জানা হয়ে গেল, ঠাকুরই আছেন, এটাই সোপাধিক অস্তিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। এবার এখান থেকে তত্ত্বভাবে নিরুপাধিক ভাবকে নিয়ে এগোতে হবে। আচার্য এ ব্যাপারে একেবারে দৃঢ়। সেইজন্য ঠাকুরকে আমরা দুটোই বলি, সোপাধিক রামকৃষ্ণ এবং নিরুপাধিক রামকৃষ্ণ। প্রথমে সাধনা করে করে সগুণ ঈশ্বরকে জানতে হয়, সেখান থেকে নির্গুণ নিরাকারের বোধ করতে হয়। উপনিষদও সগুণ আর নির্গুণের ব্যাপারে খুব স্পষ্ট। কিন্তু প্রথমে বুঝতে হবে জিনিষটা আছে। ঠাকুর বারবার বলছেন, ঈশ্বর আছেন এই বোধটুকু কর। কিভাবে বোধ করা যাবে? নানান ভাবেই বোধ করা যেতে পারে। উপনিষদ এর আগে কত রকম যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি আছেন। খুব সাধারণ ভাবে বোঝা যায় তটস্থ লক্ষণ দিয়ে, কার্য দেখলে বোঝা যায় কারণ আছে। এনারা আগাগোড়া যুক্তির পথ দিয়েই যাচ্ছেন। কার্য যখন শেষ হয়ে যায় তখন তা কারণে লয় হয়ে যায়। ঐ কারণ যখন লয় হয় তখন তা মহাকারণে লয় হয়ে যায়। মহাকারণেরও যখন লয় হয়ে যায় তখন শুধু সত্তামাত্রম্ থেকে যাবে। কারণ আপনি যদি বলেন কিছু নেই, তখনও কিন্তু এই বোধটা থাকে যে কিছু নেই, তার মানে সৎ বোধ থেকে যাচ্ছে। প্রথম অস্তিপ্রত্যয়, বুদ্ধি দিয়ে জানা হয় যে এটা আছে। সেখান থেকে যত রকম উপাধি আছে সব নিবৃত্ত হয়ে যায় তখন তত্ত্বভাব, এই জিনিষটাই আছে বোধ হয়। বলছেন ঐ বোধটাই *প্রসীদতি*, ঐ বোধ নিজেই অভিমুখ হয়। বড় গাছ কাটার সময় শেষটা আর কাটে না, একটু ছেড়ে দিয়ে সরে আসে, এরপর গাছটা নিজেই পড়ে যায়। খাল কাটার সময়ও নদীর কাছে এসে একটু জায়গা আর কাটে না, জলে ভিজে ভিজে ঐটুকু জায়গা জলের তোড়েই ভেঙে যায়। সাধক এই যে সোপাধিক অস্তিভাব থেকে খাল কেটে কেটে নিরুপাধিক তত্ত্বভাবের দিকে নিয়ে এসেছেন, এবার একটা জায়গায় এসে সাধককে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে যেতে হবে। এবার তিনি নিজেই অভিমুখী হয়ে যাবেন, তিনি নিজেই শেষটুকু ভেঙে দিয়ে সাধককে আপ্লুত করে দেবেন।

গাছ কাটা, খাল কাটা এগুলো উপমা, উপমা দিয়ে বোঝান হচ্ছে শেষটা নিজের জোরে আপনা থেকেই খুলে যায়, কাউকে কিছু করতে হয় না। তার মানে আমি জিনিষটাই আর থাকে না। যিনি এতদিন ধরে খাল কেটে এসেছেন এবার তাঁর আমিত্বটা সরে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন যাঁকে নিয়ে সাধনা করেছিলেন,

যিনি একমাত্র আছেন তিনিই এবার *প্রসীদতি* হন, সাধকের অভিমুখী হয়ে যান। তখন যে জিনিষটাতে এতদিন অস্তি ভাব ছিল সেই ভাবটাই পরিবর্তিত হয়ে যায় তত্ত্বভাবে, তখন পরিষ্কার দেখেন এটাই আছে। এখানে শুধু যুক্তি দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। কারুর কথাকে বিশ্বাস করতে হবে না, কোন ধর্মগ্রন্থের কাছে যাওয়ার আর প্রয়োজন থাকবে না, যুক্তি দিয়ে জিনিষটাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। এটাই বেদান্তের বৈশিষ্ট্য, স্বামীজী বারবার বলছেন, একটা সময় আসবে যখন বেদান্তের ধর্মই থাকবে, এই কারণেই বলছেন।

সমগ্র আলোচনাকে খুব সংক্ষেপে বুঝতে হলে প্রথম হল, যাঁরা আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে চাইছেন তাঁদের যে কোন একটা ভাবকে, যে ভাব বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত সেই ভাবের উপর মনকে একাগ্র করা। যেমন ঈশ্বর, ঈশ্বরের যে ভাব তার উপর মনকে একাগ্র করা যেতে পারে। ঈশ্বর ছাড়াও যে কোন জিনিষ হতে পারে, স্বামীজী সূর্যোদয়ের একটা দৃশ্যকে বা হৃদয়ের মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ধ্যান করার কথা বলছেন, যে কোন জিনিষকে নিয়ে যে জিনিষটার সাথে মন বা বুদ্ধির যোগ রয়েছে, তার উপর মন একাগ্র করা যেতে পারে। এইভাবে মনকে একাগ্র করতে করতে মন যখন গভীরে চলে গেল তখন দেখতে হয় এতক্ষণ উপাধিসহিত বুদ্ধির যে ধ্যান করা হয়েছে এটাকে মাথায় রেখে এবার উপাধি ছাড়া যে জিনিষটা আছে সেই দিকে মনকে নিয়ে যেতে হয়। তখন সমস্ত রকম উপাধিশূন্য যে তত্ত্বভাবের আলোচনা করা হল সেটাকে বুঝতে হয়। এখানে এসে সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মকে নিয়ে আচার্য শঙ্কর আর রামানুজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হয়ে যায়। শুধু রামানুজই বা কেন, যে কোন দ্বৈত ভাবের সাথে এই জায়গাতে তফাৎ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে যাঁরা যান তাঁরা কখনই বলবেন না যে, উপাধি ছাড়া ঈশ্বর হতে পারেন। ভক্ত সব সময় ঈশ্বরকে করুণাময়, দয়াময়, তিনি কৃপা করেন, এভাবেই দেখবেন। এগুলোই উপাধি, এমন কি সৎ, চিৎ আর আনন্দ এই তিনটেও তাঁদের কাছে ঈশ্বরের উপাধি। বেদান্তের কাছে সৎ, চিৎ আর আনন্দ ঈশ্বরের উপাধি বা গুণ নয়, এটাই তিনি। যেমন নীল ফুল, জিনিষটা ফুল আর নীল রঙটা ফুলের গুণ বা উপাধি। কিন্তু স্ফটিকের পাশে যদি ঐ নীল ফুলকে রেখে দেওয়া হয় তখন স্ফটিককে নীল রঙের দেখায়। এখানে স্ফটিকের বাস্তবিক কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, এই উপাধির কোন দাম নেই। কারণ নীল ফুলকে সরিয়ে নিলে স্ফটিক যেমন নির্মল, যেমন স্বচ্ছ তেমনই থাকবে। যে কোন ধর্মের ভক্তিমার্গের পথিক এই জিনিষটাকে মানতে চাইবে না। কিন্তু বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আর এখানে তো পরিষ্কার বলেই দিচ্ছেন, বুদ্ধির সাথে যে জিনিষটা যুক্ত সেটাকে প্রথমে বোধ করতে হয়। যেমন সগুণ ঈশ্বরকে আগে জানতে হয়, জানার পর নিরুপাধিক, যেখানে কোন উপাধি নেই, স্ফটিকের পাশ থেকে যত রকম ফুল ছিল সব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এরপর এই জিনিষটাকে জানতে হয়।

এখন দেখছেন আত্মার উপর যে উপাধি আরোপিত, এই উপাধিগুলো আলাদা কিছু নয়। অর্থাৎ বলতে চাইছেন আত্মা এই বুদ্ধি থেকে আলাদা কিছু নন। এই অর্থে আলাদা, আত্মা নাম রূপ বিহীন কিন্তু বুদ্ধি আর বুদ্ধির কার্য নাম আর রূপ। নাম-রূপ শুধু বাণীর বিলাস, *বাচারম্ভণং বিকারো*, এটাই মায়া। নাম-রূপটাই খেলা, নাম-রূপকে নিয়ে থাকলে জীবন চলে, জীবনের কার্য চলে কিন্তু এটা তত্ত্ব নয়, শেষ কথা নয়। আচার্য বারবার বলতে চাইছেন আত্মা আর বুদ্ধি, বুদ্ধি আর তার কার্য এগুলো কিছু নয়। আচার্য শঙ্করের পরবর্তি যে বেদান্ত দর্শনাদি রচিত হয়েছে, সেখানে পণ্ডিতরা মায়াকে এমন ভাবে বোঝাতে শুরু করলেন, ত্রিকাল মে জগৎ নেহি হ্যায় এগুলোকে এমন ভাবে বলতে শুরু করলেন যার ফলে সাধারণ মানুষের মনে প্রচুর সংশয়ের জন্ম দিয়েছে। বক্তব্য হল, আত্মার উপর যে উপাধি এই উপাধি বাইরে কোথাও থেকে আসেনি, উপাধিও আত্মারই কার্য। বুদ্ধির যে কার্য, যে কার্যে জগতের খেলা চলছে এটাও আত্মারই কার্য। কিন্তু তফাৎ হল, এগুলোকে আমরা যেভাবে আলাদা দেখছি সেভাবে আলাদা নয়। কার্য যেমন যেমন কারণে লয় হতে শুরু হয় তখন দেখে এটাই আত্মা, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। সেইজন্য আমরা যদি জগৎকে চালাতে চাই, জগৎকে উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে আমাদের বুদ্ধি আর বুদ্ধির কার্যকেই ধরতে হয়। কিন্তু জানবেন এটাও আত্মা কিছু নয়। কিন্তু যদি তত্ত্বভাবে নিতে চান তাহলে জানবেন সবটাই মায়া, সব নাম আর রূপের খেলা, সব বাণীর বিলাস। মায়া শব্দের ব্যবহারের বক্তব্য হল, বুদ্ধি আর বুদ্ধির কার্যের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন আমি আছি আর এই মাইক্রোফোন আছে। যে কোন ধর্মে আমি আলাদা মাইক্রোফোন আলাদা, সাধারণ বুদ্ধিতেও তাই বলে আমি আর মাইক্রোফোন আলাদা। বেদান্ত বলবে, এই জ্ঞান দিয়ে তোমার জগৎ চলছে ঠিকই, কিন্তু যদি তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখ তাহলে তুমি আর মাইক্রোফোন আলাদা নও। কিভাবে আলাদা নই? যখন তোমার নাম আর রূপ

সরিয়ে দেওয়া হবে তুমি তোমার কারণে বিলীন হয়ে যাবে। মাইক্রোফোনের নাম আর রূপকেও সরিয়ে দিলে সেও তার নিজের কারণে বিলীন হয়ে যাবে। এইভাবে যেতে যেতে একটা জায়গাতে গিয়ে দেখবে আত্মা ছাড়া কিছু নেই। তখনও সব কিছু আত্মারই অভিব্যক্তি মনে হবে, আত্মা রূপে সব এক কিন্তু বস্তু রূপে আলাদা। যদি বস্তু রূপে আলাদা দেখতে চান তাহলেও এই বোধ রাখতে হবে যে দুটোরই আধার সেই আত্মা। ভক্তিশাস্ত্রে সহজ ভাবে বলা হয় আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। সন্তান রূপে আমরা সবাই আলাদা হতে পারি কিন্তু আমাদের মিলনটা হয় ঈশ্বরে গিয়ে, ঈশ্বর রূপে সবাই এক। তাতেও কিন্তু ঈশ্বর আর সন্তান থেকে যাচ্ছে। এখানে বলছেন ব্রহ্ম রূপে তুমি এক কিন্তু বস্তু রূপে আলাদা, কিন্তু বস্তু রূপের দিকে বেশি নজর দিও না, বস্তু রূপকেও মনে রেখ কিন্তু তার সাথে মনে রাখবে আত্মার উপরে বস্তুর নাম আর রূপের খেলা চলছে।

সংসারে সব দুঃখ কষ্টের কারণের মূল তো এটাই। যদি আমি জানি আমি আর তুমি আত্মার উপর নাম রূপের খেলা, তাতেই আমাদের শোক আর মোহ অনেক কমে যাবে। আমি তোমাকে শেষ করে দিতে চাই, আমি তোমার উপর জয়ী হতে চাই এই ভাবগুলো চলে যাবে। আর যাঁরা আত্মদর্শন করে নিয়েছেন তাঁদের জন্য আর কোন কথাই চলে না, তাঁরা সব সময় ঐ ভাবকে নিয়েই চলেন। দুটো মন্ত্রের বক্তব্য এটাই। সৎই আছে, আত্মাই আছেন। কিন্তু এই যা কিছু দেখছি এগুলো আত্মার উপর সব নাম আর রূপের খেলা চলছে। বস্তু রূপে দেখলে জগৎ খুব মসৃণ ভাবে চলে যাবে, কিন্তু এটা শেষ কথা নয়। স্বামীজী যখন প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের উপর প্রচুর লেকচার দিচ্ছেন তখন তিনি এই জিনিষটার উপর প্রচণ্ড জোর দিয়েছেন। সেখানেও তিনি বলছেন, জগৎকে যদি জগৎ রূপেই দেখা হয় তাতে দোষের কিছু নেই, জগতের উপলব্ধি যদি কেউ করতে চায় তাতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু এটা অন্তত জানা দরকার এই জগৎ আত্মারই অভিব্যক্তি। এটাই ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছে, *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।* জগৎ আর তার সব কিছুকে ঈশ্বর ভাব নিয়েই চিন্তন করতে হবে। ঈশ্বর ভাব নিয়ে দেখলে তখন কার টাকা-পয়সাকে আপন করতে যাব। এগুলো আমাদের পক্ষে ধারণা করা খুব কঠিন ঠিকই। কিন্তু এই ভাব সামান্যও যদি ভেতরে যায় তখন বোঝা যায় এই কথাগুলো কত গভীর আর তার থেকেও বড় কথা, এটাই সত্য।

নাম-রূপের এই জগৎ দিয়ে আমাদের কাজ চলে। শুধু একবার বুঝে নেওয়া যে এই জগৎ আত্মারই অভিব্যক্তি, এখানে ত্যাজ্য গ্রাহ্য কিছুই নেই। আমাদের সমস্যা হল গ্রাহ্য ত্যাজ্যকে নিয়ে, রাগ আর দ্বেষ, যে জিনিষকে গ্রাহ্য মনে হয় সেই জিনিষের দিকে এগিয়ে যাই, যেটা আমাদের পছন্দের নয় সেটাকে ফেলে দিতে চাই। কিন্তু একটু চিন্তন করলে দেখা যাবে, এখানে কি ফেলার মত আছে আর কিই বা নেওয়ার মত আছে, সব আত্মারই অভিব্যক্তি, সবাইকেই আপনি গ্রহণ করুন। আপনি সব সময় যদি সচেতন যে আত্মা ছাড়া কিছু নেই, আপনার শক্তিও তখন অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এখানে অস্তি ভাবে দেখছেন, তত্ত্বভাবে যখন আসবে তখন পুরো ছবিটাই পাল্টে যাবে। সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মকে মায়ার আবরণের মধ্য দিয়ে দেখা মানে অস্তি ভাবে দেখা। ঐ অস্তি ভাব বোধ হয়ে গেলে, সগুণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়ে যাওয়ার পর বেশির ভাগ সাধকেরই আর আগ্রহ থাকে না। এটা ঠিকই যে সগুণ ব্রহ্ম যা নির্গুণ ব্রহ্মও তাই, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু এক একটা শাস্ত্র এক এক রকম জিনিষকে প্রাধান্য দিয়েছে। ঠাকুর বলছেন, মায়ের পাঁচ সন্তান, পাঁচ জনের জন্য মা মাছ রান্না করছেন, কারুর জন্য মাছের কালিয়া, কারুর জন্য মাছ ভাজা, কারুর মাছের ঝোল ইত্যাদি, কিন্তু জিনিষটা একই। নির্গুণ ব্রহ্মও যা সগুণ ব্রহ্মও তাই, কিন্তু কিছু লোক আছেন যাঁরা শুধু অস্তি ভাবেই থেমে না গিয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে যান। যখন তিনি ঐ নির্গুণ ব্রহ্মের অভিমুখী হন তিনি তাঁর বাধাটা সরিয়ে দেন, যেটা এর আগেই আমরা বলছিলাম। আত্মা+বুদ্ধি = সৎ এর আভাস আর শুধু আত্মা, বুদ্ধি ব্যতিরেকে যে আত্মা এটাই তত্ত্ববোধ। যখন আত্মার উপর বুদ্ধি এসে যায়, অন্য জায়গায় মায়া বা প্রকৃতি বলা হয়, তখন সৎ আভাস হয়। সৎ আভাস মানে জিনিষটা আছে এই বোধ হওয়া। এই যে মাইক্রোফোন আছে বলছি, তার কারণ আমাদের যিনি আত্মা, যিনি সব কিছুকে বোধ করেন, তিনি বুদ্ধির আবরণ দিয়ে এই মাইক্রোফোনকে দেখছেন। বুদ্ধির আবরণ দিয়ে যখন দেখছেন তখন এটাও অস্তি বোধ বা সৎ বোধ। বুদ্ধির আবরণ যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন কি দেখবে? তখন তত্ত্ববোধ দেখবে, দেখবে যে আত্মাই আছেন।

জগৎকেও আমরা দু ভাবে দেখছি – বুদ্ধির পর্দা দিয়ে আর বুদ্ধির পর্দা সরিয়ে। বুদ্ধির পর্দা দিয়ে দেখাকে বলা হয় সৎ বোধ আর বুদ্ধির পর্দা সরিয়ে দেখলে তত্ত্ববোধ। আমাদের ক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধিই থাকছে না, বুদ্ধির সাথে থাকে মন, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, রাগ, দ্বেষ। সবটাই মিলে মিশে থাকে বলে আমাদের কোন বোধই থাকে না, আছে শুধু সংসার বোধ, এটাকে অস্তি বোধ বলা যায় না। বুদ্ধি যখন একেবারে শুদ্ধ হয়ে যায় তখনই অস্তি বোধ হয়। যারা সংসার নিয়ে পড়ে আছে এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে না, তাদের কথা অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। যাদের মন বুদ্ধি একেবারে পবিত্র হয়ে গেছে তাদের কথাই এখন চলছে।

অস্তিত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ, বলছেন দুটোকেই জানতে হয়, বুদ্ধি দিয়েও জানতে হয়। কারণ বুদ্ধি দিয়ে না দেখে সরাসরি আমরা যেতে পারব না। ব্রাহ্মরা এই গোলমালটাই করেছিল, বুদ্ধি দিয়ে না দেখে সরাসরি নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্বকে ধরতে গিয়েছিল। যার জন্য এদের কথাবার্তা, গানে সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। একদিকে বলছে আমরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করি আবার অন্য দিকে বলছে আমার মাথা নত করে দাও তোমার চরণতলে। নিরাকার ব্রহ্মের চরণ কোথা থেকে এসে গেল তারাই বলতে পারবে। শুধু যে ব্রাহ্মরা এই ধরণের গোলমাল করেছে তা নয়, পুরো সেমেটিক ধর্মগুলি আর আমাদের দ্বৈতবাদীরা তারা সবাই সগুণ ব্রহ্মোপাসাক অথচ তারা দেখাতে যায় নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক রূপে। ব্রাহ্মরা আসলে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, উপনিষদের এই জিনিষটাকে জানেও না, কিন্তু বর্ণনা করে যাচ্ছে সগুণ ব্রহ্মের। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা কখনও কচিৎ কোন দুই একজনের জন্য। কিন্তু তাত্ত্বিক ভাবে জানতে কোন বাধা নেই, একটা অবস্থায় সবাইকেই জানতে হবে। জানা যাবে কিন্তু সাধনা করে উপলব্ধি করতে পারবে না, তাতে দোষের কিছু নেই। এভারেস্টে আমি উঠতে না পারি, কিন্তু তাই বলে কোন পাহাড়েই আমি উঠতে পারব না তা নয়।

আমাদের জানতে হবে উপনিষদ কি বলতে চাইছে। এখানে আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কথা জানতে এসেছি, সেখানে কঠোপনিষদ নিয়ে আলোচনা চলছে। আমাদের পূর্বজ ঋষিরা খুব কম করে হলেও চার হাজার বছর আগে আর বেশি হলে ছয় সাত হাজার বছর আগে কি করে এই জিনিষকে ধারণা করেছেন, ধারণা করার পর প্রত্যক্ষ করেছেন। আর ছয় কি চার হাজার বছর ধরে পরম্পরার পর পরম্পরা না লিখে শুধু মুখস্ত করে এই জ্ঞান চলে আসছে। আজ আধ্যাত্মিকতার সব থেকে উচ্চ ভাবগুলিকে আমরা বিজ্ঞান দিয়ে, অন্য ধর্মকে এনে বোঝাচ্ছি, কিন্তু তখন অন্য কিছুই ছিল না, ভগবান জানেন তাঁরা কি করে বোঝাতেন আর বুঝতেন। আচার্য শঙ্কর যখন এর ভাষ্য লিখছেন তখন সবটাই তাঁর কাছে জলবৎতরলবৎ। বলা হয় ষোল বছর বয়সেই তাঁর সব ভাষ্য রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্কীর্ণ মন বিশ্বাস করতে চায় না, আচ্ছা না হয় তিরিশ বছর বয়সেই করেছিলেন, কারণ ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত যে বত্রিশ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়ে গিয়েছিল। তিরিশ বছর বয়সেও যদি লিখে থাকেন তাতেও আমাদের বিশ্বাস হয় না। সন্ন্যাসীদের তিরিশ বছর বয়েসে উপনিষদ মুখস্ত করতেই হিমসিম খেতে হয় আর ঐ বয়সে উপনিষদের সব কিছুকে আয়ত্তের মধ্যে এনে তার ভাষ্য রচনা করে দিলেন, ঋষিদের পরম্পরার উপর তিনি চলেছেন সেইজন্য কোথাও কোন ফাঁক নেই, কোন ত্রুটি নেই, একটা অতিরিক্ত শব্দ নেই।

অন্যান্য ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের মূলতঃ দুটো তফাৎ খুব পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রথম তফাৎ হল হিন্দু ধর্ম পুরোপুরি সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর আগে personal, personality ও principlesকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, হিন্দু ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে principlesএর উপর। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে personalityর উপর। আগামীকাল কেউ যদি এসে প্রমাণিত করে বলে দেয় মহম্মদ বা যিশু বলে কেউ ছিলেন না, ইসলাম আর খ্রীষ্টান ধর্ম নড়ে উঠবে। যেহেতু হিন্দু ধর্ম সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই কখনই এই ধরণের কোন সমস্যা হবে না। হিন্দু ধর্ম আবার বলছে চেষ্টা করলে তুমিও ঐ জায়গায় পোঁছে যাবে। ইসলাম ধর্ম বলবে, তুমি আর যাই হয়ে যাও মহম্মদ কোন দিন হতে পারবে না। তুমি যত ভালো খ্রীষ্টানই হও না কেন যিশু কোন দিন হতে পারবে না। কারণ এই সব ধর্মে ব্যক্তি এতই উপরে চলে গেছে যে বাকিরা তাঁর কাছেই যেতে পারবে না। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ঋষিরা বলছেন, আমি যা পেয়েছি তুমিও পেতে পার। কঠোপনিষদের শেষ মন্ত্রেই বলবেন, নচিকেতা যা পেয়েছে তুমিও পেতে পার। এখানে কোন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্বকে বরণ করা হচ্ছে। অন্যান্য ধর্ম একজন ব্যক্তির কথার উপর দাঁড়িয়ে আছে আর হিন্দু ধর্ম সিদ্ধান্তের

উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সিদ্ধান্ত ঋষিরা পেয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্ত আমিও পেতে পারি আর তুমিও পেতে পার। কিন্তু যিশু যখন বলছেন আমি ঈশ্বরের পুত্র এরপর খ্রীষ্টান ধর্ম অন্য কাউকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মানবে না।

এর থেকেও বড় পার্থক্য হল, এখানে ঈশ্বরকে সব সময় দুটো রূপে দেখা হয়। আমরা এখন যে মন্ত্রের আলোচনা করছি, এই মন্ত্রই হিন্দু ধর্মকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। *অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ*, তিনি আছেন, অস্তি ভাব আর তত্ত্ব ভাব, হিন্দু ধর্মের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ধর্ম নির্গুণ নিরাকার আর সগুণ সাকার দুটোকেই নেয়। আপনি যদি বলেন আমি সগুণ সাকারই চাই, নির্গুণ নিরাকার আমার লাগবে না, তখন আপনি ঈশ্বরকে সীমিত করে দিলেন, আপনার আচরণও হিন্দু ধর্মের মত না হয়ে অন্য ধর্মের মত হয়ে যাবে। যিনি বলছেন ঠাকুরই সব, তিনি কামারপুকুরে জন্ম নিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বর সাধনা করলেন আর সব ধর্মের সমন্বয় করলেন, এতেই ঠাকুর শেষ। তিনিও আর হিন্দু থাকলেন না। এদের সাথে গোঁড়া বৈষ্ণবদের কোন তফাৎ নেই, গোঁড়া বৈষ্ণবদেরও মুসলমানদের সাথে কোন তফাৎ নেই। হিন্দু ধর্ম মানেই *অস্তি ইতি উপলব্ধব্যঃ*।

মঠ মিশন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সবাই প্রথম যে কথা বলেন তা হল, ঠাকুর কি শুধু বেলুড় মঠেই আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হয়, মহাশয়! আপনি কি উপলব্ধি করেছেন যে ঠাকুর বেলুড় মঠে আছেন? এই মন্ত্রে এটাই বলছেন, *অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ*, আগে আপনি জানুন, উপলব্ধি করুন যে ঠাকুর বেলুড় মঠেই আছেন। কেন তিনি বেলুড় মঠেই আছেন? কারণ ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, তুই মাথায় করে আমায় যেখানে রাখবি আমি সেখানেই থাকব। সগুণ সাকারের এটাই বৈশিষ্ট্য। ইসলাম বলুন, খ্রীষ্টান বলুন, জুদাইজিম বলুন এই ধর্মগুলো সগুণ সাকারের উপর এভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। মা ছেলেকে বলে দিয়েছে অমুক তোর দাদা, ছেলের স্থির বিশ্বাস সে আমার দাদা, ওখানে আর কোন কথা চলবে না। স্বামীজীকে ঠকুর বলে দিয়েছেন, এখানে ঠাকুর থাকবেন, ঠাকুর আছেন, ব্যস্ এরপর আর কোন কথাই চলবে না। এটাই যদি শেষ কথা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা আর হিন্দু ধর্মে থাকলাম না। আর যদি বলেন ঠাকুর সর্বত্র আছেন তখন জিজ্ঞেস করা হবে, ভাই! আপনার কি উপলব্ধি হয়েছে যে ঠাকুর বেলুড় মঠে আছেন? আমার উপলব্ধি হয়নি আর আমার দরকারও নেই। তাহলে বুঝতে হবে আপনার জ্ঞানটা গোলমেলে। জ্ঞানী হতে হলে দুটো জ্ঞানই পেতে হবে, দুটো জ্ঞানই যদি না হয় তাহলে ওজনে কম পড়ে যাবে।

তোতাপুরীর ঠিক এই সমস্যাই ছিল। তিনি দেখছেন ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজ করে আছেন, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুর তাঁকে বলছেন, আমার যে কালী সেও ব্রহ্মময়ী। তোতাপুরী মানবেন না। শেষে একদিন তোতাপুরীর এমন পেটের ব্যারাম হল যে, পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি ঠিক করলেন গঙ্গায় ডুবে এই হাড়মাস দেহকে বিসর্জন দিয়ে দেবেন। কিন্তু এমনই মহামায়ার খেলা যে গঙ্গায় নেমে দেখছেন সব জায়গাতেই হাঁটু সমান জল, ডুবে মরার মত জল কোথাও নেই। মহামায়াই বলুন আর যাই বলুন, গঙ্গায় এমনিতেই চড়া পড়ে, আর লোকেরা হেঁটেই পার হয়ে যায়। মহামায়ার খেলাই হোক আর গঙ্গায় ভাটাতে চড়াই পড়ুক, মূল কথা তোতাপুরী মা কালীকে মানলেন। মা কালীকে মানা মানে এবার তিনি নির্গুণ নিরাকার সগুণ সাকার দুটোকেই মানলেন। মা কালীকে মেনে যে তিনি মা কালীর পূজারী হয়ে গেলেন তা নয়, মা কালীকে তাচ্ছিল্য করে যে উড়িয়ে দিতেন সেটা বন্ধ হয়ে গেল। এই জায়গাতে এসেই হিন্দু ধর্মের একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। ইংলিশে একটা কথা প্রায়ই বলা হয় তা হল – immanent and transcendent। Immanent মানে সব কিছুতে তিনি ব্যপ্ত আর Transcendentএর অর্থ সব কিছুর তিনি বাইরে। কিন্তু আমাদের এখানে transcendent ঐ অর্থে নেওয়া হয় না, এখানে মন্ত্রের অর্থ হল, ঈশ্বর বুদ্ধি রূপে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভাসিত। জগৎকে শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে যখন দেখছি সেটাও ঈশ্বর, আর বুদ্ধির ক্রিয়া থেমে যাওয়ার পর সেখানে যা দেখব সেটাও ঈশ্বর। তার মানে ঈশ্বরের দুটি রূপ, সগুণ সাকার আর নির্গুণ নিরাকার। দুটোকেই নিতে হয়, সাধারণ ভাবে প্রথমে সগুণ দিয়ে ফুটে ওঠেন আর কখন সখন উল্টোটাও হতে পারে যেমন তোতাপুরীর ক্ষেত্রে উল্টো হয়েছে, কিন্তু নিতে হবে দুটোকেই। যদি না নেওয়া হয় তাহলে ঠাকুর বলছেন ওজনে কম পড়বে।

প্রায়ই আমাদের শুনতে হয়, ঈশ্বর এক, ঈশ্বর সর্বত্র, যারাই এই ধরণের কথা বলে বুঝবেন তারা গোলমেলে। কেন গোলমেলে? তোমার কি কোন ঈশ্বরের দর্শন হয়েছে যে তুমি বলছ সব ঈশ্বর সমান? তোমার কি একটা কোন জায়গায় ঈশ্বরের দর্শন হয়েছে যে তুমি বলতে পারছ ঈশ্বর সর্বত্র আছেন? এগুলো ফাঁকা

আওয়াজ ছাড়া কিছুই না। এই মন্ত্রে বলছেন দুটো রূপই তাঁর, এই রূপটাও তাঁর ঐ রূপটাও তাঁর, আর দুটোকেই উপলব্ধি করতে হয়। অস্তি বোধ, মানে একেবারে নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছেন, বেলুড় মঠে ঠাকুর আছেন এটা সাক্ষাৎ দেখছি। আর তার সাথে তত্ত্ব ভাব, ঠাকুর সর্বত্র আছেন। ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্মের এটাই মূল বৈশিষ্ট্য। প্রথমেই আত্মাই ব্রহ্ম বলে দিলে অনেকেই বুঝতে পারবে না। তাহলে নিরাকারও তিনি সাকারও তিনি, নির্গুণ যিনি সগুণও তিনি এই কথাও তো অনেকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে। তা নয়, সাকার নিরাকার সবাই বুঝতে পারে কারণ বিভিন্ন ধর্মেই এর কথা আছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণের ব্যাপারে যা বলা হয় সেখানে এই অর্থেই বলছেন তিনি আছেন, চৈতন্যই আছেন এই রূপেই নির্বাণ বলছেন। এমনকি শিখ বা জৈন ধর্মেও এভাবেই নেওয়া হয়। খ্রীষ্টান ধর্মেও কিছু কিছু মত আছে যে মতে এই ভাবেরই কথা বলা হয় আবার তাঁরা অন্য ভাবেও নেন, তাঁরা বলছেন transcendent, জগতের বাইরেও তিনি, যেখান থেকে তিনি এই জগৎকে শাসন করছেন। এখানে কিন্তু জগতের বাইরে বা জগতের পারে এই কথা বলছেন না। শুদ্ধ মন দিয়ে যে জগৎকে দেখা হয় সেটাও তিনি, বুদ্ধির কার্য যখন থেমে যায় তখন যেটা বোধ হয় সেটাও তিনি। এটাই হিন্দু ধর্মের ঠিক ঠিক বৈশিষ্ট্য। এই দুটো দিককেই হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই নেয় না। অথচ সব ধর্মই মোটামুটি এই কথাই বলছেন। কিন্তু ইসলামে আল্লাকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তিনি ওখানে বসে আছেন, এই জিনিষ এখানে পৌরাণিক কাহিনী রূপেই আসে, যেমন ভগবান বিষ্ণু বৈকুণ্ঠধামে বসে আছেন। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাকে যেভাবে নেয়, তিনি সব কিছু থেকে আলাদা, মানুষের সব ক্রিয়াকলাপ থেকে তিনি আলাদা, অথচ তিনি সব কিছু লক্ষ্য রাখছেন, হিন্দুরা বিষ্ণুকে সেভাবে নেয় না। ভগবান বিষ্ণু তিনিই আবার ব্রহ্মা, তিনিই আবার শিব, তিনি আবার সব কিছুর সাথে ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছেন। এই দুটো বড় তফাৎ, অন্যান্য ধর্ম ব্যক্তিত্বের উপর দাঁড়িয়ে আর হিন্দু ধর্ম সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় বড় তফাৎ হল, ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকার আর সগুণ সাকার দুটো রূপই হিন্দু ধর্ম নেয়। এখানে সগুণ নির্গুণ, সাকার নিরাকার যত সহজে বলে দেওয়া হচ্ছে উপনিষদ কিন্তু জিনিষটাকে সেভাবে না বলে বলছেন অস্তীতি আর তত্ত্বভাব। অস্তীতি মানে বুদ্ধি দিয়ে যেটা নির্দেশ করা যাচ্ছে আর তত্ত্বভাব হল যেটা বুদ্ধি দিয়ে নির্দেশ করা যায় না। যেমন বুদ্ধি দিয়ে বলছি ঠাকুর বেলুড় মঠে আছেন। আমরা সবাই মুখে বলে যাচ্ছি ঠাকুর বেলুড় মঠে আছেন, বিশ্বাসও করছি, কিন্তু ঠাকুর বেলুড় মঠে আছেন এই জ্ঞান কি আমাদের এই বুদ্ধি দিয়ে হচ্ছে? তা কখনই হবে না, এই জ্ঞান সব সময় শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে হবে। স্বামীজী যখন বেলুড় মঠ করছিলেন তখন বালী মিউনিসিপ্যালিটি বলছে, বেলুড় মঠ হল স্বামীজীর বাগানবাড়ি। তারা ভুল কিছুই বলছে না, কারণ তাদের বুদ্ধি যেমনটি তেমনটিই দেখবে। একজন ভদ্রমহিলা বলছেন, ছোটবেলায় আমি বেলুড় মঠে গিয়ে পড়া মুখস্ত করতাম, কারণ বেলুড় মঠ তখন খুব নিরিবিলি ছিল। ভদ্রমহিলার কাছে বেলুড় মঠ ঠাকুরের স্থান নয়, একটা নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা যেখানে মন দিয়ে পড়াশোনা করা যায়। আবার একজন স্বামী-স্ত্রীর কাছে বেলুড় মঠ খুব প্রিয় জায়গা, কেন প্রিয়, বলছে এখানেই আমরা দুজন বিয়ের আগে গঙ্গার পারে বসে গল্প করতাম। বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দির আছে বলেই যে তীর্থস্থান হয়ে যাবে তা নয়, যাদের শুদ্ধ মন তারাই বেলুড় মঠকে ঠাকুরের স্থান রূপে দেখবে। অস্তীতি যেখানে বলছেন, সেইখানে যে বুদ্ধি দিয়ে নির্দেশ করা হচ্ছে সেই বুদ্ধি হল শুদ্ধ বুদ্ধি। এই শুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিয়াও যেখানে থেমে যায় তখন তাকে বলছেন তত্ত্বভাব। আবার একজন বলছেন আমি তত্ত্বটা জানি কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারব না। এটাই এখানে বলতে চাইছেন, *অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ*, তত্ত্বভাবে বুঝে গেলেও হবে না, তোমাকে অস্তি ইতিও জানতে হবে। আমাদের অনেকেই তত্ত্বভাবে জিনিষটাকে জেনে গেছেন কিন্তু অস্তি ইতি এই ভাবে জানেন না। উপনিষদ এই মন্ত্রে বলছেন তোমাকে দুটোই জানতে হবে। শুধু উত্তরটা জানলে হবে না, উত্তরকে ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতাও থাকা চাই। ব্যাখ্যা দেওয়ারও ক্ষমতা যখন হয়ে গেছে মানে অস্তি ইতি হয়ে গেছে। একেবারে পিন পয়েন্ট করে বলতে পারবে এটাই সেটা।

যাঁরা আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের উপর প্রবচন দেন তাঁদেরও অস্তি ভাব আর তত্ত্ব ভাব দুটোকেই জানতে হবে। তত্ত্বটা জেনে গেলেও অস্তি জানা না থাকলে অপরকে সে কোন দিন ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না। অনেকের আবার তত্ত্বটা জানা নেই কিন্তু অস্তির উপর অনেক লম্বা লম্বা কথা বলে যাবে, এই বলার কোন দাম নেই, তত্ত্বটাও জানতে হবে। বক্তাকে আগে নিজেকে তত্ত্বটা জানতে হবে আর তাঁকে শ্রোতাদেরও তৈরী করতে হবে। আমেরিকায় স্বামীজীর লেকচার পড়লেই বোঝা যায় তিনি কিভাবে প্রথমে শ্রোতৃমণ্ডলী তৈরী করেছেন।

যাঁরা অনেক বছর ধরে শাস্ত্রের কথা শুনে যাচ্ছেন এতদিনে তাঁদের এই আস্থাটুকু এসেছে যে, আচার্য শাস্ত্রের যে কথা বলছেন তিনি ঠিক কথাই বলছেন, তাঁদের শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ বাইরের একজন এসে যদি এখানে শাস্ত্রের কথা শোনে সে বিশ্বাসই করবে না। এটা হল প্রথম ধাপ। এরপর আরও শাস্ত্রের কথা ভেতরে যেতে যেতে একদিন দেখা গেল আপনার কাছে একটা আইডিয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর একটার পর একটা আইডিয়া পরিষ্কার হতে থাকবে। এইভাবেই শ্রোতা তৈরী হয়। স্বামীজী কেন ভারতবর্ষ ছাড়লেন? তিনি চেয়েছিলেন আমেরিকা থেকে দেশের কাজের জন্য কিছু টাকা নিয়ে আসবেন। পরে তিনি দেখছেন আমি শুধু অভাবগ্রস্ত নই, আমি কিছু দিতেও পারি। স্বামীজীই একমাত্র ভারতীয় যিনি আমেরিকাকে কিছু দিতে গিয়েছিলেন, বাকিরা সব বাটি নিয়ে কিছু আনতে যায়।

শুধু অস্তি ভাবে আরেকটা বড় সমস্যা হয়ে যায়, তখন মুর্তি, প্রতিমাকেই আসল মনে করে। এখনও তার ঐ বোধ হয়নি, শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে দেখা হয়নি। এটাই পরে অধঃপাত হয়ে গোঁড়ামি এসে যায়। এই মন্ত্র খুব গভীর তাৎপর্য বহন করছে। মন্ত্রের দুটো দিক, দুটোকেই হিন্দুরা নেয়। হিন্দু ধর্ম উপনিষদের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদ এই মন্ত্রে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন শুদ্ধ মন দিয়ে যাঁকে দেখছেন সেটাও তিনি, ঐ শুদ্ধ মনের ক্রিয়ার বাইরে যা দেখছেন সেটাও তিনি। এবার পরের মন্ত্রে এর পরিণাম কি হয় বলছেন –

যদা সর্বে প্রমুচ্যতে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।২/৩/১৪।।

(মানব-হৃদয়ে যত কামনা আশ্রিত আছে তারা যখন বিশীর্ণ হয় তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করে।)

তত্ত্বভাব হয়ে গেলে মানুষ, যাকে আমরা মৃত্যুধর্মা বলে জানি, অমর হয়ে যায়, জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যায়। শুধু অমরই হয়ে যান না, এই শরীরেই তাঁর ব্রহ্ম ভাব হয়। গীতাতেও এই ভাবকে অনেকবার আনা হয়েছে, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই জয় করতে হবে। এখানে বলছেন *অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে*। এটিও হিন্দু ধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। প্রথম বৈশিষ্ট্যই হল এখানে, এই জীবনে, এই শরীর থাকতেই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে। দ্বিতীয় অমরত্বের বোধ, মৃত্যু আমাকে কিছু করতে পারে না, আমি জন্ম-মৃত্যুর পারে। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের দ্বারা যে অমরত্ব প্রাপ্তি হয় সেটা এই শরীর থাকতে থাকতেই হয়। মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোকে যাওয়া, সেখান থেকে অমর হয়ে যাওয়া, এটা মন্দের ভালো। বেদান্ত এই ধারণাকে কোন মূল্যই দেয় না। বেদন্তের একটাই কথা আত্মজ্ঞান আমাকে এখানেই পেতে হবে, জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য জীবদ্দশায় অর্জন করতে হবে। কারণ মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি হয় কিনা কেউ জানে না, মৃত্যুর পর মুক্তি হয় কিনা কে দেখেছে! হিন্দু ধর্ম সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কি সেই সিদ্ধান্ত? তোমাকে আত্মার জ্ঞান উপলব্ধি করতে হবে। কবে উপলব্ধি করতে হবে? এখানেই, এই শরীরেই উপলব্ধি করতে হবে, যাতে তুমি বলতে পার এটাই সত্য। মৃত্যুর পর মানুষের কোন বোধ থাকে না, মৃত্যুর পর স্বর্গ আছে কিনা জানা নেই। সেইজন্য মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোকে গিয়ে মুক্তি হওয়ার জন্য তোমাকে অপেক্ষা করে থাকার কোন অর্থই হয় না, *অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে*, এখানেই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে। ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে তাঁদেরই উপর যাঁরা জীবদ্দশায় এই জ্ঞান পেয়েছেন। এখানেই হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। মহম্মদ আল্লাকে পেয়েছিলেন, মোজেস পেয়েছিলেন, আর তাঁরা বলেই দিচ্ছেন মহম্মদ আর মোজেস ছাড়া আর কেউ আল্লা বা ঈশ্বরকে পায়নি আর পাবেও না। মহম্মদ আল্লাকে দেখেছিলেন কিনা, ঠাকুর মা কালীর দর্শন পেয়েছিলেন কিনা তাঁদের মুখের কথা ছাড়া কোন প্রমাণ নেই। যদি প্রমাণ পেতে চাও তাহলে তুমি নিজে করে দেখ ঈশ্বরকে দেখা যায় কিনা। আর এই যে কচিৎ কদাচিৎ কখন দু-চারজন দেখেন, তাঁদের কথাতেই শাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। তা নাহলে শাস্ত্রের সব কথা আরব্য রজনীর গল্পের মত হয়ে থাকত। সমস্ত ধর্মের শাস্ত্র দাঁড়িয়েই আছে এই কজন মানুষের উপর। কারণ এনারা *অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে*, এখানেই, এই শরীরেই ব্রহ্ম ভাব পেয়েছেন। ঠাকুর হঠাৎ কোন বেদের মন্ত্র শুনছেন, কোন উপনিষদের মন্ত্র শুনছেন, শুনেই বলছে, আরে! আমি তো এই রকমটিই দেখেছি। উপলব্ধি যদি এই শরীরেই না হয় তাহলে এর verification হবে না। এটা যে শুধু হিন্দু ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য তা নয়, বৌদ্ধ ধর্মও তাই বলছে। ভগবান বুদ্ধ যখন শরীর ত্যাগ করছেন তখন আনন্দকে বলছেন

আত্মদীপো ভব, নিজের জ্ঞান তুমি নিজেই উপলব্ধি কর। বৌদ্ধদের ভাষায় আত্মদীপো আমাদের ভাষায় আত্মজ্ঞান। বৌদ্ধ ধর্মও বলছে, এই শরীরেই যদি তোমার জ্ঞানপ্রাপ্তি না হয় তাহলে তোমাকে আবার শরীর ধারণ করতে হবে। জৈন ধর্মেও এই একই কথা বলছে। কিন্তু এটা হিন্দু ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য, যেখানে বলছে মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে যাবে, রামকৃষ্ণলোকে যাবে নাকি ব্রহ্মলোকে যাবে এর কোন দাম নেই। হিন্দু ধর্মের কাছে দাম একমাত্র *অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে*। জীবদ্দশায় যদি তুমি ব্রহ্মভাব পাও তাহলে ভালো তা নাহলে ধর্ম তোমার কাছে মুখের কথা হয়েই থাকবে। জীবদ্দশাতেই যিনি এই ব্রহ্মভাবকে পেয়ে যান আর বলেন কেউ চাইলে আমিও তাকে দেখিয়ে দিতে পারি, এছাড়া হিন্দু ধর্মে আর কোন কিছুর দাম নেই। কখন এই অবস্থা হয়?

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ, হৃদয়ের মধ্যে যত কামনা বাসনা আছে সব কামনা-বাসনা যখন নাশ হয়ে যায় তখনই এই স্বরূপোলব্ধি হয়। তবে কামনা-বাসনা তো হৃদয়ে হয় না, সব কিছু মনেই হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলছেন *কাম সঙ্কল্পঃ*, সঙ্কল্প থেকেই কাম হয়, মনে যখন কোন ইচ্ছা জাগে সেখান থেকেই কাম হয়। হৃদয় শব্দটা হল একটা generic term, সব কিছুকে মিলিয়ে একটা পরিভাষা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় মন থেকেই হয়। মনে যতক্ষণ কামনা-বাসনা থাকবে ততক্ষণ ঈশ্বর জ্ঞান হয় না। ঠাকুর বলছেন সুতোর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচে সুতো প্রবেশ করবে না। উপনিষদ বলছেন মনে কামনা-বাসনা থাকলে আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর দর্শন হবে না। এখন কেউ যদি উপনিষদের এই বাক্যকে না মানে আর যদি বলে এর প্রমাণ কি আছে? এর উত্তর কিন্তু উপনিষদ দিয়ে রেখেছেন। আগে আমরা একটা মন্ত্র পেরিয়ে এসেছি যেখানে বলছেন *তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরমিন্দ্রিয়ধারণম্(২/৩/১১)*। আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর দর্শন কখন হয়? যখন মন সম্পূর্ণ ভাবে স্থির হয়ে যায়। মনের মধ্যে নানান রকমের বৃত্তি অনবরত উঠছে আর তার সাথে আলস্য, নিদ্রা, স্মৃতি আদি এগুলো সব সময় মনের মধ্যে আলোড়ন করতে থাকে ঠিকই, কিন্তু সব থেকে শক্তিশালী বৃত্তি হল কামনা, কামনা-বাসনার মত শক্তিশালী বৃত্তি আর কোন কিছু হতে পারে না। আমরা মনে করছি আমার ভেতরে কোন কামনা নেই, কোন বাসনা নেই। কিন্তু তাও তো আমাদের কিছুই হয় না। একটা ফাঁকা জমি পরিষ্কার হয়ে পড়ে আছে, কোথাও কোন আগাছা নেই। কিন্তু যত রকমের বীজ হতে পারে সব ওখানে ভর্তি হয়ে পড়ে আছে। একটু জল ঢেলে দিলে কদিনের মধ্যে আগাছাতে পুরো জমিটা ঢাকা পড়ে যাবে। এটিএম কার্ডে পাঁচ টাকা আছে নাকি পাঁচ কোটি টাকা আছে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, ঠিক তেমনি মনের মধ্যে কি আছে কিছু বোঝা যায় না। কত রকম সুপ্ত বাসনাতে মন ভর্তি হয়ে আছে আমরা জানিও না, সুপ্ত বাসনা বলছি বটে কিন্তু একেবারে জাগ্রত বাসনা, একটু শুধু জল পড়ার অপেক্ষা। বলে যে, মজবুরী কা নাম মহাত্মা গান্ধী। যখন পারে না তখন বলে আমি এগুলোতে নেই। আমি এগুলোতে নেই কিছুই না, একটু ছিটিয়ে দিলেই সব বেরিয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, বুট পরিয়ে দিলে কেমন শিস্ দিতে দিতে সিড়ি দিয়ে নামবে। বয়স হয়ে গেছে, কিছু করার ক্ষমতা নেই, মনে করছি সব কামনা-বাসনা মিটে গেছে, কিন্তু কিছুই মিটে যায়নি। যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে, যেমনি নতুন শরীর, নতুন ইন্দ্রিয় পেয়ে যাবে আর নতুন ভোগ্যবস্তু এসে যাবে, সব কামনা-বাসনা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে। এই কামনা-বাসনার নাশ না হওয়া পর্যন্ত শরীর ধারণের প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। পুরো কঠোপনিষদ জুড়ে এই আলোচনাই করা হল।

হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ, হৃদয় বলতে মনকেই বোঝায়, মনের ভেতর যত কামনা-বাসনা আছে সব কামনা-বাসনার যতক্ষণ না নাশ হয় ততক্ষণ কিন্তু কিছুই হবে না। কামনা-বাসনার নাশ হবে কিভাবে? অভ্যাস করে এই কোটি কোটি বাসনার নাশ করা অসম্ভব। যোগশাস্ত্রে খুব বিজ্ঞানসম্মত ভাবে দেখানো হয়েছে কিভাবে নাশ করতে হয়। যোগে বলছেন প্রতিপক্ষভাবনা, যে ভাবটা আসছে ঐ ভাবকে প্রতিপক্ষ ভাব দিয়ে আটকাতে হয়। যেমন পুরুষের নারী শরীরের প্রতি বা নারীর পুরুষের শরীরের প্রতি যে আসক্তি, এই আসক্তিকে নাশ করার জন্য প্রতিপক্ষ ভাবনা নিয়ে আসতে হবে। ঠাকুর বলছেন বিচার করে দেখ নারী শরীরে কি আছে। কে না জানে নারী শরীরে কি আছে তবুও তো পুরুষ নারী শরীরকে ভালোবাসছে। প্রতিপক্ষ ভাবনা যেমন একটা শক্তি তেমনি ভালোবাসাটা আরও বেশি শক্তিশালী। ডাক্তাররা দিনরাত দেখছে শরীরে কি আছে, ডাক্তারী পড়ার সময়ও মড়া কাটতে গিয়ে দেখছে মানুষের শরীরে কি আছে। তাই বলে ডাক্তারদের কি শরীরের প্রতি এমন ঘেন্না এসে গেছে যে প্রেম করা, বিয়ে করা সব ছেড়ে দিয়েছে! কারণ প্রতিপক্ষভাবনা ঠিক ঠিক হয় না, প্রতিপক্ষভাবনার জন্য খুব শক্তিশালী মন দরকার, ঐ শক্তিশালী মন একমাত্র যোগীদেরই হয়, সাধারণ মানুষের

মধ্যে সেই মন থাকে না। তলোয়ার চালানো মানুষ আগে শেখে, ঢাল ধরতে আরও পরে শেখে। ইন্দ্রিয়ের কার্য মানুষ আগে শেখে আর বস্তুর যে আঘাত আসছে সেই আঘাতকে ঢাল দিয়ে সামাল দেওয়াটা আরও পরে শেখে। যোগীরাই একমাত্র প্রতিপক্ষ ভাবনা দিয়ে আটকাতে পারেন। কিন্তু যোগীদেরও শেষে একটা দুটো কামনা-বাসনা যে থাকে না তা নয়। কিন্তু যোগীরা তাঁদের সৎগুণ দিয়ে এত বেশি এগিয়ে যান যে, ঈশ্বর দর্শন যদি হয়ে যায় বা আত্মজ্ঞান যদি হয়ে যায়, যেগুলো থেকে গেছে সেগুলো ওখানেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কঠোপনিষদেই কয়েকটি মন্ত্র আগে বলছেন *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*, যোগের উত্থান পতন আছে। যোগকে আশ্রয় করে মানুষ মনকে সেই অবস্থায় নিয়ে চলে গেল, যেখানে মন কিছুক্ষণের জন্যও পুরো শান্ত হয়ে গেল, তার মানে ওখানেই তাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেল। আমরা এত আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বর দর্শনের কথা শুনছি, আমাদের কি একবারও ইচ্ছা হয় যে আমারও যেন আত্মজ্ঞান হয়? ঠাকুরের কথা কত শুনে আসছি, ঠাকুরের প্রতি আমাদের সেই আকর্ষণ কি হয়? হয় না, এটা ঠিকই যে সাধনা করতে করতে হয়। তাহলে আত্মজ্ঞানে সব কামনা-বাসনার নাশ হয়ে যাবে এটা কি করে সম্ভব? আত্মজ্ঞান হলে যে কামনা-বাসনা মিটে যায় এই কথাতেও অনেকের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপনিষদ বারবার এই কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আমরাও এতদিন ধরে আত্মার কথা শুনছি, ব্রহ্মের কথা শুনছি, ঈশ্বর আছেন শুনছি, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। সেখান থেকে আমাদের মন এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাবছে, ভাই আমাদের তো কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু আপনি যদি আত্মাকে জেনেই গেলেন, আপনার সব বৃত্তি যদি থেমেই গেল তাতেই আপনার জন্মজন্মান্তরের কামনা-বাসনার সমস্ত সংস্কার কি করে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, সব পাপ-পূণ্যের কি করে নাশ হয়ে যাবে? আমার শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, আর আপনিও বলছেন তাই মেনে নিচ্ছি, কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকছে না।

সত্যিই এই জিনিষগুলো আমাদের সহজে ধারণা হয় না। আমরা এত শাস্ত্র পড়ছি, শাস্ত্রের কথা শুনছি, উপনিষদের মন্ত্র মুখস্ত করছি এগুলোর সাথে আত্মজ্ঞানের একটা গুণগত পার্থক্য আছে। এই গুণগত পার্থক্যের ধারণা না থাকলে এই জিনিষটাকে কোন দিন বুঝতে পারা যাবে না। একটা হয় পরিমাণগত তারতম্য আর আরেকটা হয় গুণগত তারতম্য। ঠাকুরের বলছেন, একটি মেয়ে বিয়ের পর নিজের বাড়িতে এসেছে, তাকে আরেকটি বাচ্চা মেয়ে জিজ্ঞেস করছে স্বামী সুখ কেমন হয়। মেয়েটি বলছে, তোর যখন স্বামী হবে তখন তুই বুঝতে পারবি। বাচ্চা মেয়েটি ভাবছে, আমিও তো পুতুলের সাথে খেলা করি, খুব মজা হয়, স্বামী এই রকমই কিছু হবে, মা আমাকে ভালোবাসে, স্বামী সুখ এই রকমই হবে, বন্ধুদের সাথে আমার কত মজা হয়, স্বামী সুখ এই রকমই হয়ত হবে। কিন্তু স্বামী সুখ কি তাই? বাচ্চা মেয়েটি যত সুখের কথা বলছে তার সাথে স্বামী সুখের বিরাট গুণগত পার্থক্য। যতক্ষণ না স্বামী সঙ্গ না হয় ততক্ষণ স্বামী সুখ বুঝতে পারবে না। ঠিক তেমনি আত্মার জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আত্মজ্ঞানের ধারণা করা যায় না। খুব কাছাকাছি এর উপমা দেওয়ার জন্য বলা যেতে পারে, মনে করুন আপনার একজন খুব প্রিয়জন আছে, সে আপনার স্বামী হতে পারে, সন্তান হতে পারে, মা, বাবা, বন্ধু যে কেউ একজন হতে পারে। সেই প্রিয়জন আপনার ঘরেই থাকে। আপনাকে কেউ বারবার বলে সাবধাণ করে দিচ্ছে তোমার ঐ প্রিয়জন কিন্তু খুব বিপজ্জনক, তোমার সর্বনাশ করে দিতে পারে, এই ধরণের অনেক কিছু আপনাকে বলে যাচ্ছে। আপনার কিন্তু কোন দিন তার কথা বিশ্বাস হবে না। হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা আপনার ঘুম ভেঙে গেল, ঘুম ভেঙে দেখছেন আপনি যাকে খুব ভালোবাসেন সে মানুষ নয়, একটা বিষধর সাপ হয়ে আপনার বিছানায় শুয়ে আছে। আপনি দেখেই মা গো! বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছেন, আর তখনই সে আপনাকে বলছে, মুখ খুলেছ কি তোমাকে শেষ করে দেব। এবার আপনি নিজের কথা ভাবুন, সকালে উঠে আপনার কি অবস্থা হবে? প্রিয়জন আপনার সাথে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলতে শুরু করল। আপনার তখন কি রকম লাগবে? ভাবছেন পালাতে পারলে বাঁচি। আপনাকে পঞ্চাশ জন বারবার বলে যাবে, তোমার ঐ স্ত্রী একজন সর্পিণী বা বিষকন্যা বা ডাইনী, অনেক কিছু বলতে পারে কিন্তু আপনার কোন দিনই বিশ্বাস হবে না যতক্ষণ না আপনি নিজের চোখে দেখে নিচ্ছেন। আত্মজ্ঞান মানে ঠিক তাই। আত্মজ্ঞান হওয়া মানে দুটি জিনিষ একসাথে হবে, এই জগৎকে তখন বিষধর সর্পের মত দেখে অন্য দিকে অপরিসীম আনন্দের একটা অবস্থাকে দেখতে পায়।

ভাতের মাড়ে চিনি দিয়ে পায়েস বলে আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছে, আমি জানি না সত্যিকারের পায়েস কি জিনিষ, কিন্তু চিনি দেওয়া ভাতের মাড় পায়েস মনে করে খেয়েই আমি কত খুশী। তখন একজন আমাকে বলছেন, আরে ভাই! আসল পায়েস খাও তাহলে বুঝতে পারবে পায়েস কি জিনিষ। আমি তখন কি মনে করব? এর থেকে আর কত ভালো হবে, খুব হলে একটু মিষ্টি বেশি হবে, এর বেশি কিছু হবে না। কিন্তু সত্যি সত্যি যেদিন পায়েস খাব সেদিন বুঝতে পারব চিনি দেওয়া ভাতের মাড় আর পায়েসে কি তফাৎ! আমাদের কাছে যত ভাবেই আত্মার বর্ণনা করে দেওয়া হোক না কেন, আমরা কোন দিনই আত্মার ধারণা করতে পারব না। কিন্তু যেমনি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে তখন যা হবে সেটা আর মুখে বর্ণনাই করতে পারবে না। এই যে বলছেন কামের নাশ হয়ে যায়, ঐ অর্থে কামের নাশ হয় না। এই অর্থে কামের নাশ হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, কামনা-বাসনা এগুলো একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়, এর আর কোন তাৎপর্যই থাকে না। আপনি রাত্রিবেলা একটা ঘরে আছেন। সকালে উঠে দেখছেন ঘরে একগাদা কেঁচো আর সাপ গিজগিজ করছে। আপনি তক্ষুণি ওখান থেকে প্রাণ ছেড়ে পালাবেন। এরপর আপনি আর একবারের জন্যও ঐ ঘরের দিকে পা বাড়াবেন না। এগুলো উপমা দিয়ে বোঝান হচ্ছে। আমাদের কাছে জ্ঞান আর অজ্ঞানের ঠিক এই তফাৎ। আমাদের কোন ধারণাই নেই আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে ওনারা কি দেখতে পান। আত্মজ্ঞানের দিকে চলে গেলে জগতের বাস্তবিকতা আর আত্মজ্ঞানের বাস্তবিকতা এই দুটোকে পরিষ্কার দেখতে পান। আমরা জগৎ সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, আমরা জানি না আত্মজ্ঞানে কি হয়। সেইজন্য আমরা অনেক রকম হিসেব করতে বসে যাই, আমি তো শাস্ত্র পড়েছি, আমি তো মন্ত্র মুখস্ত করেছি, আমার নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞানের পথে একটু উন্নতি হয়েছে। কত উন্নতি হবে, এর থেকে আরেকটু উন্নতি হবে। এভাবে হয় না, এখানে একেবারে গুণগত তারতম্য হয়ে যায়। গুণগত তফাৎ মানে, জিনিষটা যেমন আছে, যথাবৎ, ঠিক তেমনটিই দেখে নেওয়ার পর তার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন এই জগতের কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ইচ্ছে থাকে না। ঠাকুর সহজ করে বলছেন মিছরির শরবৎ খেলে আর চিটেগুড়ের পানা খেতে ইচ্ছে করবে না। ঠাকুরও বোঝানর জন্য উপমা দিচ্ছেন। আত্মজ্ঞানীদেরও ঠিক এই অবস্থাই হয় – *যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ*।

এখানে একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে। বলছেন যখন সব কামের নাশ হয়, কিন্তু কামনা-বাসনা গুলিকে এভাবে নাশ করা যায় না। কাম নাশ করার একটাই পথ – সাধনা করতে করতে কামনাগুলো দমতে শুরু করে, কোন কামনাই আর বেশি ক্ষতি করতে পারে না। এরপর যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হয় বা আত্মজ্ঞান যদি হয়ে যায় তখন ঐ দিককার আকর্ষণের জন্য সব কামনা-বাসনাগুলি তুচ্ছ হয়ে যায়।

এই অবস্থায় কি হয়? *অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি*, এই অবস্থায় মরণধর্মা বা মৃত্যুধর্মা থেকে একেবারে অমর হয়ে যায়। আচার্য এখানে বলছেন *অথ তদা মর্ত্যঃ প্রাক্ প্রবোধাদাসীৎ*, আত্মজ্ঞানের আগে পর্যন্ত এই যে তার *প্রাক্ প্রবোধাৎ*, অর্থাৎ এই জ্ঞান যখন এল যে আমি আত্মা তখন অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এই তিনটি মৃত্যুরূপ নাশ হয়ে যাওয়ার জন্য অমর হয়ে যান আর পরলোক বা বিভিন্ন লোকে গমন করানোর জন্য মৃত্যুরও বিনাশ হয়ে যাওয়ার দরুন দীপ নির্বাণের মত সমস্ত বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়। এখানে দুটো বিষয়, আত্ম সাক্ষাৎকারের আগে পর্যন্ত যে জীব এতদিন মরণধর্মা ছিল সেই জীব আত্মজ্ঞান হওয়ার জন্য অবিদ্যা, কাম ও কর্মরূপ মৃত্যুকে জয় করে নেয়, মৃত্যুকে জয় করার জন্য সে অমর হয়ে যায়। মৃত্যুই শক্তি রূপে জীবকে অন্য লোকে নিয়ে যায়। সেই মৃত্যুরই নাশ হয়ে গেছে এখন অন্য লোকে যে নিয়ে যাবে তারই নাশ হয়ে গেল। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এই তিনটেকে মিলিয়ে মৃত্যু, সেইজন্য বলছেন মৃত্যুর নাশ হয়ে গেল। সংসার চলে অবিদ্যা, কাম আর কর্মের দ্বারা, আত্মজ্ঞান মানেই এই তিনটের নাশ হয়ে যাওয়া, এটা প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট, অবিদ্যা, কাম ও কর্মই মৃত্যু। তৃতীয় পয়েন্ট, মৃত্যুর নাশ হয়ে যাওয়া মানে তাঁর আর কোন লোকে গমনাগমন হবে না। চতুর্থ পয়েন্ট, এটাই অমৃতত্ব।

এটাই কঠোপনিষদের প্রাণ। কেন প্রাণ? নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করেছিলেন মৃত্যুর পর কি হয়। মৃত্যুর পর কি হয় এই প্রশ্নের উত্তর এখানে এসে পাওয়া যাচ্ছে, যার জ্ঞান হয়ে গেল সে অমর হয়ে গেল। যার জ্ঞান হয়নি সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতেই থাকবে। এর আগে বলেছিলেন *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, আর এখানে তার বিপরীতটা বলে দিলেন, যাঁর আত্মসাক্ষাৎকার হয়ে গেছে তাঁর অবিদ্যা, কাম ও কর্ম নাশ হয়ে গেল। অনেকে বলছেন যে, একজন ভারতীয় গুগুল কোম্পানীর প্রধান পদে বসেছেন, বিদেশীরা আমাদের দেশের

প্রতিভাকে নিয়ে তাদের কাজে লাগাচ্ছে, ভারতবর্ষের আর কিছু হচ্ছে না। এই চিন্তাধারাটাই ভ্রান্ত। ভারত হল বেদের দেশ, বেদের দেশ মানে গুরু যা বলে দিয়েছেন তার বাইরে কেউ যাবে না। কচিৎ কবে কোন গুরু আসবেন তিনি যা বলে দিয়ে যাবেন সবাই সেটাকে মুখস্ত করে তার মধ্যেই ঘুরপাক খাবে, এর বাইরে তারা কেউ যেতেই পারবে না। পুরো ইতিহাসে মৌলিকতা ভারতীয়দের কখনই ছিল না। স্বামীজীই প্রথম যিনি সব কিছুকে নিজের মত করে স্বতন্ত্র ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপনা করেছেন। বাকিরা প্রথম থেকে ষড়্‌দর্শন মুখস্ত করতে করতেই জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে গেছেন। আমাদের এটাই সমস্যা, শব্দের আবরণকে ভেদ করে কি বলতে চাইছেন সেটাকে আমরা কখনই ধরার চেষ্টা করি না। যিনি করেন তিনিই মহৎ হয়ে যান। বাচ্চা বয়স থেকে এই ধরণের যত কথা শুনে আসছি সব আমাদের কাছে শব্দমাত্রই থেকে গেছে, আমাদের মাথার উপর রাশি রাশি শব্দ যেন ঢেলে দিয়ে গেছে। ঐ শব্দরাশির মধ্যে আমরা হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছি। বালির মধ্যে সাঁতার কাটলে কখনই গা ভিজবে না। শরীরকে ভেজাতে হলে জলে নামতে হয়। আমরাও শব্দের মধ্যে সাঁতার কেটে যাচ্ছি, সেইজন্য জ্ঞানের আলো আমাদের অন্তরকে আলোকিত করতে পারছে না।

এখানে খুব সহজ কথা বলছেন, আত্মসাক্ষাৎকার মানে অবিদ্যা, কাম ও কর্মের নাশ, অবিদ্যা, কাম ও কর্মই মৃত্যু, মৃত্যুর যখন নাশ হয়ে গেলে মানেই আর পরলোক গমন হবে না, পরলোক গমন না হওয়া মানেই অমর হয়ে গেল। এগুলো আমাদের কাছে এখন শব্দ মাত্র। একটু গভীর ভাবে চিন্তন করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে জিনিষটা ধারণা হবে। এর আগে যেমন উপমা দিয়ে বলা হল, স্বামীর পাশে তার স্ত্রী শুয়ে আছেন, স্বামী দেখছে স্ত্রী নয়, তার পাশে এক বিষধর সর্পিণী শুয়ে আছে। এরপর সেই স্বামীর কি হবে চোখের সামনে দেখার চেষ্টা করুন। স্ত্রী বা ছেলেকে যদি কেউ এভাবে একবার দেখে নেয় তার পুরো চিন্তা-ভাবনাটাই পাল্টে যাবে। আর সেই সর্পিণী সাবধাণ করে দিল, কাউকে যদি আমার কথা বলে দাও আমি কিন্তু জানতে পারব, এরপর তোমার কি হবে বুঝে নাও। এখন সেই বেচারার কি অবস্থা হবে? ঠাকুর হারুর কথা বলছেন, হারুকে প্রেতনীতে পেয়েছে, আগে হারু কত হাসিখুশী ছিল এখন তার মুখ শুকিয়ে গেছে। এটা নেগেটিভ সাইড দিয়ে বলা হল, এর পজিটিভ সাইড হল, আপনি দেখেছেন আপনি সেই আনন্দস্বরূপ।

ভগবান বিষ্ণু আর নারদ একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে নারদ ভগবানকে বলছেন আপনার মায়া জিনিষটা কি আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। ভগবান বলছেন তুমি হলে দেবর্ষি, তোমাকে কী মায়া দেখাতে যাব! নারদ খুব জেদ করাতে ভগবান বললেন, ঠিক আছে বলছি, কিন্তু আমার এখন খুব জলতেষ্টা পেয়েছে তুমি দেখ কোথাও একটু জল পাওয়া যায় কিনা। নারদ এক গৃহস্থের বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে এক রূপসী যুবতী বেরিয়ে এসেছে। যুবতীকে দেখে নারদের মাথা ঘুরে গেল। এরপর মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, বিয়ে করার পর তার সন্তানাদি হয়েছে। স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে খুব আনন্দে আছে। একদিন সেখানে বন্যা এসে গেল, বন্যায় তার ঘরবাড়ি সব ভেসে যাচ্ছে, নারদও স্ত্রীকে এক হাতে ধরে রেখেছে, আরেক হাত দিয়ে ছেলে মেয়েকে ধরে আছে। জলের তোড়ে নারদের হাত থেকে সন্তান দুটো ছিটকে বেরিয়ে গেল, আরেক হাত দিয়ে তাদের ধরতে গিয়ে স্ত্রীও হাত ছাড়া হয়ে ভেসে গেল। নারদ হাউ হাউ করে কাঁদছেন আর বলছেন, হায় ভগবান! আমার কী হল! নারদ দেখছেন ভগবান বিষ্ণু সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছেন, নারদ! তৃষ্ণাতে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে জল আনতে পাঠালাম এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? নারদ ধড়মড় করে উঠে বসে ভাবছে, এতক্ষণ তাহলে এগুলো কী হচ্ছিল? এটাই ভগবানের মায়া। নারদ খুব লজ্জায় পড়ে গেছে। আবার শিবের কাহিনীও আছে। সমুদ্র মন্থনে প্রথমে হলাহল বেরিয়ে এল, শিব সেই হলাহল পান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন। হুঁশ হওয়ার পর শিব শুনলেন ভগবান মোহিনীর অবতার হয়েছিলেন। শিব তখন বিষ্ণুর কাছে গিয়ে জেদ ধরেছেন, আপনার কাজের জন্যই আমাকে হলাহল পান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল, আমি আপনার মোহিনী অবতারের রূপ দেখতে পাইনি, এখন আমাকে সেই মোহনী রূপটা দেখান। ভগবান বিষ্ণু বলছেন, আপনি হলেন কামজয়ী এগুলো আপনার জন্য নয়। বিষ্ণু এই কথা বলতে না বলতেই শিব দেখছেন বিষ্ণুধামে কোথাও কেউ নেই, তিনি একাই সেখানে আছেন। সেখানে তিনি দেখছেন সুন্দর এক বাগান, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, সেই বাগানে এক যুবতী মেয়ে বল নিয়ে একা একা খেলা করছে, খেলা করতে করতে তার কাপড় সরে যাচ্ছে। ঐ দৃশ্য দেখে শিব আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না, যুবতীর পেছনে পেছনে ছুটছেন। মেয়েটির বসন শিথিল হয়ে যাচ্ছে, শিবেরও ব্যাঘ্রচর্ম খসে পড়ে

গেছে, যাচ্ছেতাই অবস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যে শিবের টনক নড়ে গেল, এ আমি কী করছি! একটু ভাবতেই দেখছেন কোথাও কিছুই নেই, সেই বিষ্ণুধাম, ভগবান বিষ্ণু বসে আছেন, এদিকে শিবের কাপড়চোপড় খুলে গেছে, পাশে মা পার্বতীও সেই আগের মত দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই হাঁ করে দেখছেন। ভগবান বিষ্ণু বলছেন, আপনি শিব, আপনি কামজয়ী বলে এত তাড়াতাড়ি এই মোহিনীর মায়া থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যরা কোন দিন এর থেকে বেরোতেই পারবে না। এগুলো কাহিনী, কিন্তু কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের একটা আইডিয়া দেওয়া হচ্ছে মায়া জিনিষটা কি আর মায়া ভঙ্গ হলে কি হয়। মায়াতে নারদ দেখছেন, এক যুবতীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন, বিয়ে করলেন, কত আনন্দ, সন্তান হল, কত আনন্দ, আবার দুর্যোগ, শোক, দুঃখ, কান্না সবই হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মায়া ভঙ্গ হয়ে গেল, দেখছেন কিছুই হয়নি, ভগবান বিষ্ণুর জন্য জল নিতে এসেছি।

কল্পনার জগতে বাস করা, স্বপ্নের জগতে বাস করা নিয়ে আমরা কত উপমা দিই আর এই জিনিষ বাস্তবিক তাই হয়। যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করেন তিনি দেখেন যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, চৈতন্য মানে যাঁর চেতনা আছে, চেতনা বলতে এখানে পিঁপড়ের চেতনা নয়, যিনি চিন্তন করতে পারেন, তিনি এখন চিন্তা করছেন। চেতনার চিন্তা করা, মানুষের চিন্তা করা আর একটা ছাগলের চিন্তা করা এই তিনটেতে তফাৎ আছে। ছাগলের চিন্তা করাটা চিন্তা নয়, চিন্তা মানে চিন্তন। মানুষ যা চিন্তা করে চাইলে সে তার চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করে দিতে পারে। একজন ইঞ্জিনিয়ার একটা বাড়ির মডেলের চিন্তা করছে, ইঞ্জিনিয়ার চাইলে ঐ মডেলের একটা বাড়ি বানিয়ে নিতে পারে। ছাগল যদি ঘাসের চিন্তা করে ছাগল কোন দিন ঘাস দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে না। মানুষ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই কারণেই, মানুষ যা চিন্তা করে সে চাইলে সেই চিন্তাকে বাস্তবে কার্যে পরিণত করে দিতে পারে। আর চেতনার চিন্তা করা বা ভগবানের চিন্তা করার মধ্যে তফাৎ হল, তাঁর চিন্তা করাও যা আর সেটা বাস্তবে পরিণত হওয়াও তাই। ভগবান চিন্তা করলেন সৃষ্টি হোক, চিন্তা করতে না করতেই সৃষ্টি হয়ে যাবে। ঈশ্বরের চৈতন্য, মানুষের যে চেতনা আর ইতর প্রাণীর চিন্তনের মধ্যে এটাই তফাৎ। পাথর কখন চিন্তা করতে পারে না, প্রানীর যে চিন্তা সেই চিন্তা কখন কার্যকরী হয় না। নিজের শরীরকে নিয়ে যতটুকু হয়, আমি খাব, এটুকুকে কার্যে পাল্টে নিতে পারে। কিন্তু সে যদি চায় এই রকমটি হোক, সেটা কখনই কার্যকরী হবে না। মানুষ যেটাকে নিয়ে চিন্তা করবে সেটাকেই সে চেষ্টা করলে কার্যে পরিণত করে দিতে পারবে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এসে পুরোটাই পাল্টে যায়। তাঁর চিন্তা করাও যা সেটা বাস্তবে পরিণত হওয়াও তাই। তিনি যখন চিন্তা করলেন সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হয়ে গেল। সৃষ্টিটা তো আর ফাঁকা বাড়ি হয়ে পড়ে থাকবে না, তার মধ্যে সব কিছুই হবে, বিগ্ ব্যাঙ হবে, ব্ল্যাকহোল হবে, সৃষ্টিতে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য সবই থাকবে, সৃষ্টিতে অনেক প্রানী থাকবে, সেই প্রানীর মধ্যে মানুষও থাকবে, আর মানুষ নানা রকমের কামনা-বাসনা নিয়ে চলতে থাকবে। আসলে কে চলছে? কেউই চলছে না, কিছুই চলছে না। স্বপ্নে দেখছি আমি দিল্লী চলে গেলাম, সেখানে কেউ কোথাও যাচ্ছে না। তাহলে কি হচ্ছিল? ঐ অবস্থায় আমি এখান থেকে দিল্লী গিয়েছিলাম। চৈতন্য যখন দেখেন সৃষ্টি হয়েছে তিনি তখন এই সব কিছুকে দেখছেন। সৃষ্টির মধ্যেই তিনি নিজেই হয়ে রয়েছেন। তিনি এখানে কঠোপনিষদ ব্যাখ্যা করছেন, তিনি শ্রোতা হয়ে আবার সেই ব্যাখ্যা শুনে যাচ্ছেন।

এখন এর মধ্যে তিনি একজন হয়ে আছেন, সে যখন specific এই জিনিষটাকে নিয়ে চিন্তন শুরু করে, আমি আমার যেটা আসল স্বরূপ সেটাকে জানব, তখন একটা অবস্থায় আসে যেখানে সে আসল জিনিষটাকে নিয়ে এগিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তিনি দেখছেন চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। সেই চৈতন্যই বহু রূপে বা প্রতি রূপে আছেন। রূপের দুটি দিক, একটা প্রতিরূপ আরেকটি বহুরূপ। একই জিনিষ যখন বিভিন্ন রূপে আসে তখন তাকে বলে বহুরূপ, যেমন ঈশ্বর এই গ্লাশ হয়েছেন, আবার এই মাইক্রোফোনও হয়েছেন, সব মানুষই তিনি আলাদা আলাদ রূপে আছেন, এটা হল তাঁর বহুরূপ। আরেকটা হল তাঁর প্রতিরূপ। একটা ঘরে বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলো আয়না আছে। সেই ঘরে একজন দাঁড়াতে সেখানে তার অনেক প্রতিরূপ ভেসে উঠল। আয়না যেমন তার প্রতিরূপটাও তেমন। সব কটি আয়নাকে ভেঙে দিলে যা ছিল তাই থাকবে। আর কোন কারণে সে যদি জানতে পারে এই যে এতগুলো রূপ দেখা যাচ্ছে, সব রূপে আমাকেই দেখা যাচ্ছে, আমিই এত রূপে আছি। তখন সে বলতে যাবে না যে, ঐ আয়নাতে লোকটিকে কেমন রোগা দেখাচ্ছে, এই আয়নাতে লোকটাকে মোটা দেখাচ্ছে, ওখানে লম্বা দেখাচ্ছে। আয়নার মধ্যে সে লোকটিকে

দেখছে। কাকে দেখছে? নিজেকেই নিজে দেখছে, কোনটা কনকেভ আয়না, কোনটা কনভেক্স আয়না। নানা রকমের আয়না বলে নানা রকমের প্রতিচ্ছবি, নানা রকমের প্রতিচ্ছবি বলে নানা রকমের জিনিষ দেখছে, এটাই প্রতিরূপ। বহুরূপ হল, মাটি থেকে তিনিই বহু জিনিষ হয়ে গেছেন, মাটিরই বহুরূপ হয়ে গেছে। আমরা বহুরূপ দিয়েই দেখি আর প্রতিরূপ দিয়েই দেখি, যদি জানি সব আমারই রূপ তখন আমার মধ্যে যে এই বোধ হয়ে আছে একে ভালোবাসতে হবে, ওর থেকে দূরে থাকতে হবে, স্বাভাবিক ভাবেই এই বোধটা খসে পড়ে যাবে। কারণ তখন দেখছে সবটাই সেই চৈতন্য, চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। এই অবস্থাকেই বলে জ্ঞানের অবস্থা। জ্ঞানের এই অবস্থায় দেখেন জগতে ত্যাজ্যও কিছু নেই গ্রাহ্যও কিছু নেই। এটাকে ধারণা করা খুব মুশকিল। যতক্ষণ এই মায়ার মধ্যে আছে, বন্ধনে থাকছে তখন কেউ মারা গেলে দেখছে লোকটি মরে গেল, কিন্তু ঋষির মত শুদ্ধ মন যদি হয় তখন দেখবে মরার পরে সে স্বর্গে গেল, বা শাস্ত্রে যেমন বলে সেই রকম কোন স্বর্গে চলে গেল কিংবা অন্য কোন লোকে চলে গেল। কিন্তু যখন বোধ হয়ে গেল আমিই সেই সচ্চিদানন্দ, বাকিরাও তাই, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, তখন দেখে কেউ কোথাও যাচ্ছে না। মৃত্যুর সংজ্ঞাটাই তার চলে গেল। মৃত্যু মানে শরীরের ভেতরে যিনি জীবাত্মা আছেন তিনি এই শরীরটা ছেড়ে আরেকটা জায়গায় গেলেন। সে নিজে সেই আত্মার সাথে এক হয়ে গেছে, দেখছে কোথাও কিছু নেই, সেই আনন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। সব সময়ই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এতক্ষণ তিনি চিন্তা করছিলেন। নারদ যেমন মেয়েটিকে দেখে ভাবছেন, একে পেলে আমার আনন্দ হবে, মেয়েটিকে হারিয়ে ভাবছে ওকে হারিয়ে আমি শোকাকুল হয়ে গেছি। আমরা এখন কাহিনী পড়ে জানছি যে নারদ ভাবছেন, কিন্তু তাঁর কাছে তখন ওটাই সত্য। ঠিক তেমনি আমার কাছে এর সব কিছুই সত্য, কিন্তু জ্ঞান হয়ে গেলে দেখছি এগুলো কখন ছিলই না। এই যে এই লোক থেকে সেই লোকে যাওয়া আসা, স্বর্গলোক, পরলোক এগুলো আদপে কখন ছিলই না।

আত্মজ্ঞান, আত্মসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মজ্ঞান এই কথাগুলো যখনই আমরা শুনি সব সময় আমাদের মনে হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সে জন্মাচ্ছিল মরছিল, এই লোক থেকে সেই লোক যাচ্ছিল, সব করে করে এবার তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেল। যেমন এক বিন্দু জল হিমালয় থেকে নেমে বিভিন্ন নদী নালা হয়ে হয়ে গঙ্গায় এসে পড়ল তারপর গঙ্গা দিয়ে সে সমুদ্রে চলে গিয়ে তার অস্তিত্বে মিলে গেল। আমাদের জ্ঞানের পরিভাষা এই রকম। কঠোপনিষদ যে জ্ঞানের কথা বলছেন, এটা তা নয়। সমুদ্র সমুদ্রই আছে, সমুদ্রে একটা ঢেউয়ের জন্ম হল, সমুদ্র ভাবছে আমি এই ঢেউ। এই ঢেউ একবার উপরে উঠছে, একবার নীচে নামছে, এই হচ্ছে সেই হচ্ছে, সে ভাবছে আমি উপরে উঠে গেলাম আবার নীচে পড়ে গেলাম। আসলে ওর কোথাও কিছুই হচ্ছে না। সমুদ্র যেমন আছে তেমনই আছে। এখানে এই বর্ণনাই দিচ্ছেন। ঐ অবস্থায় সে বুঝতে পারে আমি শরীর নই, আমি মন নই। তাকে এখন কেটে দু টুকরো করে দিলেও তাতে তার কিছু এসে যায় না। শারীরিক একটা ব্যাথা বোধ হতে পারে, কারণ সমস্ত নার্ভ শরীরের সাথে জুড়ে আছে, সেই বোধটা আছে। কিন্তু তাই বলে আমি মরে গেলাম, আমি শেষ হয়ে গেলাম এই বোধ কখনই হবে। ছোট্ট মেয়ের ইচ্ছে যে বাবা যেন আজ অফিসে না যায়। হ্যাঙারে বাবার যে প্যান্ট ঝুলছে সেই প্যান্ট ধরে মেয়ে বলছে, বাবা তোমাকে আজ অফিসে যেতে দেব না। প্যান্ট তো হ্যাঙারে ঝুলছে, বাবা ঐদিকে তৈরী হয়ে অফিসে চলেছে। বাচ্চার ধারণা প্যান্ট যেখানে বাবা সেখানে, সে ভাবতে পারছে না বাবা যেখানে প্যান্ট সেখানে। আমাদেরও ঠিক এই বোধই হয়, যখন কেউ শরীরকে কাটছে আসলে হ্যাঙারে ঝোলান প্যান্টকে সে ধরছে। কিন্তু সে ঐ শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে নয়তো এটা তার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আমাদের পক্ষে সত্যিই এসব ধারণা করা খুবই কঠিন। এগুলোকে নিয়ে একান্তে বসে খুব গভীর ভাবে চিন্তন করতে হয়। আমাদের সমস্যা হল আমরা যখনই সমুদ্রের কথা ভাবছি তখন ভাবছি সমুদ্র এক, এক সমুদ্র যখন চিন্তা করছি তখন একেরই চিন্তা করছি। কিন্তু এই সমুদ্র সাধারণ সমুদ্র নয় এ হল সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, সেখানে কোটি কোটি অনন্ত সৃষ্টি, তার চিন্তাও অনন্ত। আর যদি আমরা একক ভাবেও দেখি কারণ মুক্তি এককেরই হয়, সেই এককেরই বোধ হয়ে গেলে আমি তো সেই সচ্চিদানন্দ, যিনি একক তিনিও দেখবেন আমি সচ্চিদানন্দ, দ্বিতীয় সেও নিজেকে সচ্চিদানন্দ দেখবে, সবাই মিলেও দেখবে আমি সচ্চিদানন্দ। যখন সৃষ্টি হচ্ছে তখনও দেখবে আমি সচ্চিদানন্দ, যখন সৃষ্টি নেই তখনও দেখবে আমি সচ্চিদানন্দ – এই ধারণা করা সত্যিই কঠিন। সব সময় এই চিন্তন মনন নিয়ে যদি থাকা যায় তখন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে শুরু হবে এখানে কি বলতে চাইছেন। নিজেকে অনন্তের সঙ্গে এক করে

দেখাটাই ব্রহ্মভাব। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়ার পর ব্যক্তি রূপে আর কাউকে দেখে না। কিন্তু ঐ অনন্ত আর এই সীমিত জগৎ এই দুটোকে মেলানোটাই আমাদের বিরাট সমস্যা। ঠাকুরের জীবনে ঠাকুর নিজে অনন্ত আর বাকিরা সীমিত, এই ভাব ঠাকুরের কখনই ছিল না। নিজেকে যখন সীমিত দেখবেন তখন বাকিদেরও সীমিত দেখবেন আর যখন নিজেকে অনন্ত রূপে দেখবেন তখন বাকি সবাইকেও অনন্ত রূপেই দেখবেন। সেইজন্য এই ধরণের লোকের পক্ষে অপরকে শিক্ষা দেওয়া খুব মুশকিল হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, লেটো গালে হাত দিয়ে বসে আছে, দেখছি তিনিই গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। লাটু মহারাজকে এখন শ্রীরামকৃষ্ণ কী শিক্ষা দেবেন! লাটু মহারাজকে যখন তিনি সীমিত দেখছেন তখন নিজেকেও সীমিত ভাবে দেখছেন। কিন্তু ঠাকুর হলেন অবতার, অবতারের ঐ বোধ সব সময়ই থাকবে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা দেখেন আমিও জ্ঞানী আর জগৎও জ্ঞানী, সচ্চিদানন্দ ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। তিনি যদি সমস্ত সৃষ্টিকে নাশ করে দেন তাতেও তাঁর এই বোধ আসবে না যে আমি নাশ করেছি। কথামৃতে ঠাকুর যেখানে নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন সেগুলো পড়ার সময় জিনিষটা পরিষ্কার হয়। ঠাকুর সবাইকেই অনন্ত দেখছেন, ফলে কাউকে মন্দ রূপেও দেখতে পারছেন না, কাউকে ভালো রূপেও দেখতে পারছেন না, দেখছেন সেই সচ্চিদানন্দই সব হয়ে আছেন। এটাই *ব্রহ্ম সমশ্নুতে*। তখন মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই বলে কোন লোকেও তাকে পাঠানো যাবে না, কোন লোকই নেই। সব কিছুর মূলে অবিদ্যা। অবিদ্যা যখনই আসে তখন আমি তুমির বোধও এসে যায়। অবিদ্যা এসে গেলে কাম এসে যাবে, কাম এসে গেলে কর্মও এসে যাবে। কাম ও কর্ম এসে গেলে মৃত্যুও এসে যাবে, তখন পরলোকও এসে যাবে।

সাধারণ ভাবে জ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি, আত্মজ্ঞান তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একবার আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে আর কোন দিন তার অজ্ঞান আসবে না। আত্মজ্ঞানী আমাদের সাথে সাধারণের মত ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু অজ্ঞানে কোন দিন আর পড়বেন না। জগতের সাথে তাঁর ব্যবহার জগতের মতই চলবে কিন্তু তিনি জানেন আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কারণ যিনি অনন্ত, সর্বব্যাপী তিনি সেটাই, এটাই ব্রহ্মভাব। এই ব্রহ্মভাবকে বাস্তবিক যতক্ষণ না কেউ প্রত্যক্ষ করছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন হবে না। এটাই এখানে বলতে চাইছেন, সবটাই একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক যুক্ত। আত্মজ্ঞানের সাথেই সমস্ত কামনা-বাসনার সমাপ্তি। কামনা-বাসনার সমাপ্তি মানেই হয় মৃত্যুর সমাপ্তি, মৃত্যুর সমাপ্তি হয়ে যাওয়া মানে মানুষ অমর হয়ে গেল। ভগবান বুদ্ধ যেমন বলছেন নির্বাণ, নির্বাণ মানে যে জিনিষটা একটার পর একটা জীবনকে চালিয়ে যাচ্ছিল সেই জিনিষটাই শেষ হয়ে গেল, এরপর আর পুনর্জন্ম কি করে হবে! বৌদ্ধরা উপমা দেন, প্রদীপ জ্বলছিল, ফুঁ দিতেই প্রদীপ নিভে গেল। দেখে মনে হবে এটাও মৃত্যু, সাধারণ ভাবে মৃত্যুতেও তাই হয়, আমরা বলি জীবনের তেল ফুরিয়ে গেল। এখানে তা হয় না, জীবন আর মৃত্যু যে শক্তি দিয়ে চলে সেই শক্তিটাই শেষ। তখন কি হয়? *অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে*। বৌদ্ধ ধর্ম আর হিন্দু ধর্মে এখানে এসে তফাৎ হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্ম বলছে নির্বাণ, আসলে বলতে চাইছেন তখন কি হয় বলা যায় না। কিন্তু বেদান্ত খুব জোরের সাথে বলে, ইঙ্গিত ইশারায় বলা যায় অস্তিত্ব থাকে, ঐ অস্তিত্বের সাথে এক হয়ে মিশে যায়।

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্র। কয়েকটি জিনিষ এই মন্ত্রে রয়েছে। জ্ঞান হলে কি হয়, পরলোক কিভাবে শেষ হয়ে যায় আর এটাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই জীবনে যিনি ধর্ম পাচ্ছেন না, তিনি ভাবতে পারেন মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন। কিন্তু বেদান্ত মতে বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্তে এ জিনিষ কখনই হবে না। ব্রহ্মভাব আমাদের সজ্ঞানে নিতে হবে। এই জন্মে না হলে পরের জন্মে হবে, এখন মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, সেখান থেকে আবার এই লোকে আসবে, তারপরে হবে। কিন্তু যা কিছু হওয়ার তা হতে হবে এই চেতনা দিয়েই। কারণ আগের মন্ত্রেই বলছেন অস্তি বোধ আর তত্ত্ব বোধ দুটোই হবে, অস্তি বোধের সাহায্য নিয়ে যখন তত্ত্ব বোধ হয়ে যায় তখন দেখে আমি তো সর্বব্যাপী। যে নিজেকে সর্বব্যাপী রূপে দেখছে সে যাবেটা কোথায়, যাওয়ার জন্য তো একটা জায়গা চাই, যে জায়গা থাকবে সেখানেও তো তিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। সেইজন্য সর্বব্যাপীর আর কোথাও যাওয়ার থাকে না, তাই পরলোক বলেও কিছু থাকল না। এই উপলব্ধি যে নতুন করে হয়েছে তাতো নয়, সব সময় সে এই রকমই ছিল। কিন্তু অন্য কিছু ভাবছিল। পরের মন্ত্রে এসে বলছেন –

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
ততো মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্।।২/৩/১৫

(জীবিতাবস্থায়ই যখন বুদ্ধির বন্ধনসমূহ বিনষ্ট হয় তখন মরণধর্মী মানুষ অমর হয়। এইটুকু মাত্রই সর্ববেদান্তের উপদেশ।)

কঠোপনিষদের মূল বক্তব্য এই মন্ত্রে এসে শেষ হয়ে যায়। ঠিক ঠিক উপনিষদ বলতে যা বোঝায় উপনিষদের যে মূল ভাব আত্মজ্ঞান বা আত্মব্রহ্মৈক্য, এই ভাব এই মন্ত্রে এসে শেষ হচ্ছে। সেইজন্য বলছেন *এতাবৎ হি অনুশাসনম্*, এই অনুশাসন মানে বাংলা অনুশাসন নয়, এখানে অনুশাসন মানে গুরু পরম্পরায় যা বলা হল সেই মূল উপদেশ। এখানে *এতাবৎ হি অনুশাসনম্* বলে উহ্য রেখে গেছেন, এই ফাঁককে আচার্য পূরণ করে বলছেন *সর্ববেদান্তানামিতি বাক্যশেষঃ*, সমস্ত বেদান্তের শেষ কথা, অনুশাসন মানেই শেষ কথা। অনেক সময় বলা হয়, একশ কথার এক কথা, মানে মূল কথা কি বলতে চাইছেন, এটাই অনুশাসন। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কিছু করতে বললে বা কিছু করতে নিষেধ করলে, প্রথমেই হাজারটা প্রশ্ন করবে, কেন করতে হবে, কেন করা যাবে না। বাবা পান খাচ্ছিল, তার আট বছরের ছেলেও পান খেতে চাইছ। বাবা ছেলেকে বলছে তুমি পান খেও না। ছেলেটি জিজ্ঞেস করছে, কেন খাবো না, তুমি তো খাচ্ছ। বাবা বলছে, আমি বড় কিনা, তুমি বড় হও। ছেলেটি বলছে, কেন! আমিও তো বড়, আমার ভাইয়ের থেকে তো আমি বড়, আমিও পান খেতেই পারি। ওরা দুই ভাই, বড়টি আট বছরের আর ছোটটি ছয় বছরের। ভদ্রলোক সেদিন থেকে পান খাওয়াই ছেড়ে দিলেন। অনুশাসন হল, তুমি পান খাবে না। এর অনেক রকমের ব্যাখ্যা দিতে হবে। কিন্তু এখানে বলছেন অনুশাসন, শেষ কথা। শাস্ত্র মানেই যিনি শাসন করছেন, যিনি শেষ কথা বলছেন।

কি শেষ কথা বলছেন? *যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ*, গ্রন্থি মানে কামনা বাসনার পুটলি। সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ এই কামনা বাসনার পুটলি যখন ছেদন হয়ে যায় তখন কি হয়? *অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্*, তখনই মরণশীল মানুষ অমর হয়ে যায়। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করা হয় Gordians knot। তুরস্কের পশ্চিমে ফ্রিজিয়া নামে একটা রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজধানীতে একটা জায়গায় বড় একটা থামের সাথে দড়ি দিয়ে গিট বাঁধা ছিল। প্রবাদ ছিল যে, এই গিট যে খুলে দিতে পারবে সে সমস্ত এশিয়ার রাজা হবে। ফ্রিজিয়ার রাজা ছিল গর্ডিয়ান, তার নামেই এই গিটের নাম ছিল গর্ডিয়ানস্ নট। আলেকজাণ্ডার বিশ্বজয়ে বেরিয়েছেন, তিনি এই প্রবাদটা শুনলেন। ঐ গিট এমন জটিল ভাবে বাঁধা ছিল যে কারুর সাধ্য হবে না যে খুলে দেবে। তখন আলেকজাণ্ডার বলছেন গিট ঐভাবে খোলে না, গিট এভাবে খুলতে হয়। আলেকজাণ্ডারের বাক্কাস নামে ঘোড়া ছিল, বিরাট উঁচু ঘোড়া, সেই ঘোড়ার পিঠে চেপে দৌড়ে দৌড়ে এসে তলোয়ার দিয়ে এক কোপ দিয়ে খ্যাঁচ করে দড়িটাকে কেটে দিলেন। দড়ি কেটে দিয়ে বলছেন, এবার আমি এশিয়ার রাজা হব। হলেনও তাই। গর্ডিয়ান নটের কাহিনীটা একটা mythical, কোথা থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের জানা নেই। অনেক দিন ধরে একটা প্রবাদ চলে আসছিল। আলেকজাণ্ডার বলছেন, গিট এভাবে খোলা হয় না, এভাবে খুলতে হয়। বলার পর দুরন্ত ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিয়ে তার পিঠে চেপে তলোয়ারের এক কোপে দড়ি কেটে দিলেন। অত শক্তিশালী রাজা, কার সাহস আছে যে বিচার করবে আলেকজাণ্ডার ঠিক করলেন নাকি ভুল করলেন। কিন্তু গোটা এশিয়াকে জয় করে তিনি দেখিয়ে দিলেন। এখানেও ঐ একই জিনিষ, হৃদয়ের গ্রন্থিকে যদি কেউ ছাড়াতে যায় কোন দিনই খোলা যাবে না। তাহলে এই হৃদয়গ্রন্থিকে কি করে খোলা হবে? আলেকজাণ্ডারের মতই খুলতে হবে। গীতায় ভগবান এই কথাই বলছেন, *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*, এক কোপে কেটে উড়িয়ে দিতে হবে। উপনিষদেও ঐ এক কথাই বলছেন *যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে*, একেবারে ছেদন করে দিতে হবে। কামনা-বাসনা রূপ যে বীজ থেকে আগাছা তৈরী হয়ে চলেছে, ঐ বীজটাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দিলে সবটাই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই জিনিষটা আমাদের মাথাতেই আসতে চায় না। বটবৃক্ষের বীজ থেকে ধীরে ধীরে বটবৃক্ষ বাড়তে থাকে কিন্তু হয়ও সেই রকম বিশাল, কিন্তু ঘাস, আগাছাগুলো সঙ্গে সঙ্গে বীজ থেকে দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার বীজ তৈরী করে নেয়, কিন্তু মরেও তাড়াতাড়ি। অন্য দিকে বটবৃক্ষ শত শত বছর বেঁচে থাকে। এর থেকে বাঁচার একটাই পথ সব বীজে আগুন লাগিয়ে দাও। আগুন লাগানো মানে আত্মজ্ঞান।

আগের মন্ত্রে বলছেন *প্রমুচ্যন্তে* আর এই মন্ত্রে বলছেন *প্রভিদ্যন্তে*, *প্রমুচ্যন্তে* মানে শেষ করে দেওয়া আর *প্রভিদ্যন্তে* মানে ভেদন করে দেওয়া। ভেদন সব সময় হয় আত্মজ্ঞানে। আত্মজ্ঞান মানে আমি কে, আমার স্বরূপকে জেনে গেলাম। আগের মন্ত্রে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শিবের মাথায় চন্দ্র আর গলায় সাপ। শিবের চাঁদ দেখে কেউ যদি এগিয়ে যায় ঐ সাপই এক ছোবলে শেষ করে দেবে। এটা গেল নেগেটিভ

সাইড, এর পজিটিভ সাইড হল, যে একবার শ্রেষ্ঠ জিনিষকে আস্বাদ করে নেয় তার কাছে নীচের জিনিষগুলি চিরদিনের মত হেয় হয়ে যায়। *প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ*, হৃদয়ের মধ্যে যত রকমের গ্রন্থি আছে, সব গ্রন্থিকে ভেদন করে দেয়। করে দিলে কি হবে? আবার সেই একই কথা বলছেন *অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি*।

গভীর নিদ্রাতে মানুষের সব কামনা-বাসনা শেষ হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন ঘুমের মধ্যে মানুষের কোন হুঁশ থাকে না, কুকুর প্রস্রাব করে দিলেও টের পায় না। অচেতন হয়ে পড়ে থাকলে, বা কোমাতে চলে গেলে সব কামনা-বাসনাও তখন চলে যায়। কিন্তু বলছেন, তা হয় না, কামনা বাসনা চলে যায় না। ঐ অবস্থা থেকে ফিরে এসে দেখে কামনা বাসনা যেমন ছিল তেমনটাই আবার এসে যায়। বৃদ্ধ হয়ে গেছে বলে ভাবছে আমার সব কামনা বাসনা চলে গেছে, মৃত্যুর পর আর কোন ঝামেলা থাকবে না। গভীর নিদ্রাতে যেমন হয়, কোমাতে যেমন হয়, মৃত্যুও ঠিক তেমনই। মৃত্যু থেকে বেরিয়ে যেমনি আরেকটা নতুন শরীরে যাবে আবার সব আগের মত এসে যাবে। এটিএম কার্ড মেশিনে ঢোকালে যত ইচ্ছে টাকা বার করে আনা যাবে, এটিএম কার্ড যেমনি বার করে নিয়ে এল তখন ওতে কোন পয়সা নেই। এটিএমে কার্ডে কতক্ষণ পয়সা নেই, যতক্ষণ না আবার এটিএম মেশিনে না দেওয়া হয়। সূক্ষ্ম শরীর যেমনি নতুন শরীরে ঢুকলো, তার মানে আবার এটিএমে ঢুকে গেলে। এবার যা চাই সব বেরোতে শুরু করে দেবে। এই কথাগুলো শাস্ত্রে বলছে ঠিকই কিন্তু এটাই বাস্তব। ঋষিরা শাস্ত্রে যত কথা বলেছেন, সবটাই তাঁরা জীবনকে প্রজ্ঞার আলোকে দেখে দেখে অনেক কিছুর সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর ধ্যানের গভীরে গিয়েও যা যা উপলব্ধি করেছেন সব তাঁরা পরম্পরাতে রেখে দিলেন।

আচার্য এটাই বলছেন, অবিদ্যার জন্য আমাদের নানান রকমের প্রতীতি হচ্ছে। কি রকম প্রতীতি হয়? *অহমিদং শরীরং, মমেদং ধনং, সুখী দুঃখী চাহম্*, আমি এই শরীর, এই ধন আমার, আমি সুখী আমি দুঃখী, এগুলোই প্রতীতি। প্রতীতি মানে, আমি আর আমার এই বোধ সব সময় লেগে আছে। এটাই অবিদ্যা গ্রন্থি। অবিদ্যার কাজ হল যেখানে কিছু নেই সেখানেই বহু দেখিয়ে দেয়। এর আগে নারদের গল্পে এই জিনিষটাই হয়েছে। নারদকে জল আনতে পাঠিয়েছেন, সেখানে কিছুই নেই কিন্তু নারদ কত কিছু দেখে নিল। দরজায় টোকা দিতে একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে, সেই মেয়েকে দেখে ভালোবাসা হল, সেই ভালোবাসা থেকে প্রেম হয়ে গেল, সেই প্রেম থেকে তার সন্তান, তারপর বন্যা এল, বন্যাতে সে ভেসে যাচ্ছে, তার স্ত্রী সন্তানরাও ভেসে যাচ্ছে। অথচ কোথাও কিছু নেই। ভগবান এসে নারদকে জিজ্ঞেস করছেন, আরে নারদ! জল আনতে তুমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে? নারদ অবাক হয়ে ভাবছে, এতক্ষণ তাহলে কী দেখছিলাম? এটাই মায়া। আমরা ভাবব এটা স্বপ্ন, অবান্তর কল্পনা। কিন্তু এটাই ঈশ্বরীয় মায়া, যেখানে কিছুই নেই সেখানে অনেক কিছু করিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এগুলো আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। আমাদের মনের যে গঠন সেই ভাবেই আমরা সব সময় জগৎকে মাপছি। কিভাবে কিভাবে কুয়োর মধ্যে সমুদ্রের একটা ব্যাঙ এসে পড়ে গেছে। কুয়োর ব্যাঙ সমুদ্রের ব্যাঙকে এক ঝাঁপ মেরে বলছে, তোমার সমুদ্র কি এত বড়? সমুদ্রের ব্যাঙ বলছে, না। কুয়োর ব্যাঙ আরেকটা বড় ঝাঁপ দিয়ে বলছে, তোমার সমুদ্র কি এত বড়? সমুদ্রের ব্যাঙ বলছে, না। কুয়োর ব্যাঙ বলছে, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কুয়োর ব্যাঙের কোন দোষ নেই, সে নিজের মন দিয়ে জগৎকে যেমন বুঝেছে আত্মাকেও সেই মন দিয়েই মাপতে যাবে। চিন্তনের জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎ আর বাস্তবিক যে জগৎ এই জগৎ যে কত বিশাল ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়। মনের জানলা খুলে এই জগৎকে আমরা কখন দেখিনি। মনে হয় আমি যতটুকু জানি, যতটুকু বুঝি তার বাইরে আর কিছু হয় না। যদি অন্য কেউ তার বাইরে কিছু নিয়ে আসে আমরা ঐটা দিয়েই তাকে সঙ্গে সঙ্গে মাপতে শুরু করি। যারা পড়াশোনা করে তাদের এক রকমের ধারণা আর গভীর চিন্তা করলে আরেক রকম ধারণা হয়। অনেকে মনে করে ঠাকুর যে মা কালীকে দেখছেন এটা হল গভীর চিন্তার ফল। কিন্তু জিনিষটা তো তা নয়। জিনিষটা যে কি এই ধারণাও করা যায় না। আমরা বলছি ঠিকই যে সব কিছু অবিদ্যা জনিত নাম রূপের খেলা, এটাই দৈবী মায়া বা ঈশ্বরীয় মায়া, কিন্তু মুখে বলা এক রকম, ধারণা করা সম্ভব নয়। শাস্ত্র কখনই আমাদের খুশী করার জন্য সহজ করে কিছু বলবে না, জিনিষটা যেমন ঠিক তেমনই বলবে। আমার দুর্বলতার জন্য একটা জিনিষ আমি না করতে পারি, কিন্তু তার জন্য আদর্শকেই নীচে নামিয়ে দেওয়া যায় না, আমি কখনই বলতে পারি না যে জিনিষটা কখনই সম্ভব নয়। যদি বলি এটা কখনই সম্ভব নয়, তাহলে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে যাবে। আমাদের ঋষিরা এই উচ্চমানের সত্যগুলিকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা এগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা এগুলোকে ধারণা করতে

পারছি না, ধারণা করতে পারি না তাই বিশ্বাসও করতে পারি না। আমরা মনে করি ঋষিরা চিন্তা ভাবনা করে কিছু একটা বলে গেছেন। কিন্তু তা নয়, সচ্চিদানন্দই আছেন, তিনি যখন চিন্তা করেন সেই চিন্তা আমার আপনার মত চিন্তা কখনই নয়। এর আগে আমরা এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ছাগল বা কুকুরের চিন্তা সীমিত চিন্তন, মানুষ যেটা চিন্তা করে সেটাকে সে কার্যে পরিণত করে দেয়। কিন্তু ঈশ্বর যখন কোন কিছু চিন্তা করেন সেই চিন্তা আমাদের চিন্তা করার মত নয়। ঈশ্বর যেটা ভাববেন সেটাই সত্য হয়ে যায়। তিনি ভাবলেন জগৎ হোক, জগৎ হয়ে যাবে। ঈশ্বরের ভাবাও যা তাঁর হওয়াটাও তাই। তিনি ভাবলেন সৃষ্টি হোক, ভাবা মাত্রই সৃষ্টি দাঁড়িয়ে গেল। তিনিই ভাবছেন, সচ্চিদানন্দ সাগর আর তাঁর একটি কণা ও সমস্ত সাগর একই জিনিষ, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সচ্চিদানন্দ সাগর কোন জলের সমুদ্র নয়, আলোর সমুদ্রও নয়, এই সমুদ্র চৈতন্যের সমুদ্র। আর তার মধ্যে একটা স্পেস সে যখন ভাবছে সৃষ্টি হোক সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, আরেকটা স্পেস সে ভাবছে সৃষ্টি হোক সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সেই সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু হচ্ছে সব তিনিই হয়েছেন। সবটাই যেন আমরাই সৃষ্টি করি, তার মধ্যে যে হাসি, যে কান্না সবই তাঁর। এরপর একটা জায়গায় সব কিছু থেমে গেল। এই জিনিষটাকে সবাই বুঝতে পারছে না, কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন, ধ্যানের গভীরে গিয়ে গিয়ে ঐ জ্ঞানের অবস্থায় যখন যাবেন, তখন দেখছেন সব তো আমিই ভেবে যাচ্ছি, সব কিছু তো আমিই হয়ে আছি।

এগুলোকে ধারণা করা কঠিণ বলে এইসব মন্ত্রের তাৎপর্যকে অনুধাবন করাও মুশকিল হয়ে যায়। এখানে শুনতে খুব ভালোই লাগছে, দুদিন পরেই সব মাথা থেকে নেমে যাবে। তখন আবার মনে হবে এগুলো খুব উঁচু কথা। কিন্তু এই কথাগুলো শোনার পর মন্ত্রের তাৎপর্যকে নিয়ে অনেক ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে করতে একদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচার্য বলছেন, *অবিদ্যাপ্রত্যয়া*, অবিদ্যার দরুণ এই বোধ হয়, এর বিপরীত ভাব ব্রহ্মাত্ম ভাব, আমি সেই ব্রহ্ম। এতক্ষণ আমি বলছিলাম আমার এই দেহ, আমার এই টাকা, আমি সুখী, আমি দুখী, ব্রহ্মাত্ম ভাব এসে গেলে দেখে আমি অসংসারী। অসংসারী মানে যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, সেই সচ্চিদানন্দ যিনি আনন্দস্বরূপ, যাঁর দুঃখ বলে কোন কিছু নেই। সংসারের যে আনন্দ সেই আনন্দের তুলনায় সচ্চিদানন্দের আনন্দ কোটি কোটি গুণ আনন্দ। সেই আনন্দে যিনি সদা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত তাঁর তো অন্য কোন দিকে মন যাবে না। এই বোধ যখন হয়ে যায়, তখন অবিদ্যাজনিত যা কিছু হচ্ছিল, যে অবিদ্যাগ্রন্থি তাকে এতদিন বেঁধে রেখেছিল, নিজে থেকেই ওটা নষ্ট হয়ে যায়। অবিদ্যা থাকবে কোথাও যাবে না কিন্তু তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে থাকবে। আত্মজ্ঞানের আনন্দ সব কিছুকে সরিয়ে দেয়। অবিদ্যাগ্রন্থির জন্য যে কামনার জন্ম হয়, আত্মজ্ঞানে সেই কামনা সমূলে নাশ হয়ে যায়, অবিদ্যার পুরো বীজটাই নাশ হয়ে যায়। তখনই মানুষ অমর হয়। অমর হওয়া মানে, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এদের পরিচয়টাই শেষ হয়ে যায়, তখন আর নতুন কোন কামনার জন্ম হয় না, কামনার জন্ম হয় না বলে নতুন করে কোন কাজ করতে হয় না, কারণ অবিদ্যাগ্রন্থিটাই নাশ হয়ে গেছে। অবিদ্যা থাকার জন্য মন থাকে, মন থাকার জন্য কামনা থাকে, কামনা থাকার জন্য কর্ম হয়। সেইজন্য দেখে আমি মরলাম, আমি স্বর্গে গেলাম, আমি জন্ম নিলাম। এখন যেখানে কাম নেই, কর্ম নেই এরপর সে কোথায় যাবে! এটা হল যৌক্তিকতার দিক দিয়ে। আর আসল হল সে দেখে আমি সেই শুদ্ধ আত্মা।

বলছেন, এটাকে নিয়ে যদি তুমি আশংকা কর তাহলে তুমি ভুল করবে, কারণ এটাই বেদান্তের অনুশাসন। এর আগে প্রমাণ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি; আমরা অনেক সময় জিজ্ঞেস করি এই খবরটা কে দিল। এই খবর দিচ্ছে বেদান্ত, *এতাবৎ হি অনুশাসনম্*। গুরু পরম্পরায়, ঋষিদের পরম্পরায় আমরা এটাই শুনে এসেছি, এটাই সত্য, তাই এটাকে নিয়ে তুমি প্রশ্ন করতে যেও না। যমরাজ নচিকেতাকে এই কথা বলছেন। এখানে এসে কঠোপনিষদ শেষ হয়ে যায়।

নচিকেতার প্রশ্ন ছিল পুনর্জন্মকে নিয়ে, আর আত্মা আছেন কিনা। এতক্ষণ যমরাজ আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করলেন। আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ হল তাঁর জন্ম নেই মৃত্যু নেই। কোন অবস্থায় হয়? যখন অবিদ্যা, কাম ও কর্মের নাশ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় আরেকটা জিনিষ বাকি থেকে যায়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন বলছেন সে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তুমি যুদ্ধ কর, কারণ তুমি সেই নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, যাঁর না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু, সর্বদা সব অবস্থায় তিনি একই থাকেন। অর্জুন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ আত্মার ব্যাপারে যা বললেন সেটাকে ধারণা করতে পারেননি। ভগবান তখন আত্মার

দর্শনকে এক ধাপ নীচে নামিয়ে আনলেন। তুমি এটা মানো তো যে তোমার শরীরে আত্মা বলে কিছু একটা আছে? সেই আত্মা আজকে এই শরীরে আছে, শরীরের মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, সেখান থেকে নেমে এসে আরেকটা শরীর ধারণ করবে। তার মানে এই আত্মা এই লোকে সেই লোকে যাচ্ছে, এই শরীর, সেই শরীর ধারণ করছে। তাহলে জন্মই বা কি আর মৃত্যুই বা কি! ভগবান বলছেন *অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্*, যদি মনে কর আত্মা নিত্য জন্মায়, নিত্য মরছে তাহলে মৃত্যুজনিত অনুশোচনা করার কি আছে! এরপর তৃতীয় আরেকটা মত নিয়ে আসছেন, *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।।* যদি তুমি মনে কর আত্মা বলে কিছু নেই, এই শরীরটাই সব, তাহলে তো আরও ভালো। জন্মের আগে তুমি ছিলে না, মৃত্যুর পরে তুমি থাকবে না, তাতে শোক করার কি আছে? পনেরশ কোটি বছর আগে এই পৃথিবীর যদি জন্ম হয়ে থাকে আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্মের হিসাব করতে এর পরে আরও কয়েকটা শূন্য লাগিয়ে দাও, এতদিন তুমি ছিলে না, আর পৃথিবী এরপর আরও যত দিন থাকবে তখন তুমি থাকবে না, আচ্ছা ধরে নাও আগে পনেরশ কোটি আর পরে আরও পনেরশ কোটি, এই তিন হাজার কোটি পৃথিবীর যদি আয়ু হয়, সেখানে তুমি একশ বছর না বেঁচে ষাট বছরে মরে গেলে তাতে এই তিরিশ কোটি বছরে চল্লিশ বছর কোথাও খুঁজেই পাওয়া যাবে না। তার জন্য নিজের স্বধর্মকে কেন ছাড়বে? এই কটি দিন বেঁচে থাকার জন্য স্বধর্মে ছেড়ে কেন তুমি কলঙ্কিত হতে যাবে?

এখানেও ঠিক একই ভাবে বলা হয়েছে। প্রথম যমরাজ আত্মার স্বরূপ বলে দিলেন, আত্মা সর্বব্যাপী, সর্ব অবস্থায়, সব জায়গায় একই রকম থাকেন, সেখান থেকে এবার নিয়ে আসছেন নচিকেতার মূল প্রশ্নে, আত্মা আছে কিনা, আত্মার কি হয়। যাদের জীবিত অবস্থায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে যায়, তাদের সব কিছুই নাশ হয়ে গেল। কিন্তু যাদের ব্রহ্মভাব হয়নি, আচার্য বলছেন যারা মন্দ ব্রহ্মজ্ঞানী তাদের এই অবস্থা প্রাপ্ত হবে না। আর যারা উপনিষদের বিদ্যাকে অনুসরণ করে না, যারা যজ্ঞযাগ করে যাচ্ছে, বলছেন তারাও ঠিক পথেই আছে। কিন্তু তাদের জীবনদর্শন এই মহৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এগুলোর ফল হল সংসারগতি। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা তো অমর হয়ে গেলেন, কিন্তু যাঁরা ক্রিয়া কর্মাদি করছেন তাঁদের কি হবে? যাঁরা সৎ জীবনযাপন করছেন তাঁদের এখন কি হবে? তাঁদের জন্য প্রশংসা করে পরের মন্ত্রে বলছেন –

শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।।২/৩/১৬।।

(হৃদয় হতে নিষ্ক্রান্ত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হয়েছে। উৎক্রমণকালে এই নাড়ীকে অবলম্বন করে ঊর্ধ্বে গমনপূর্বক সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ীমার্গে উৎক্রমণ সংসারগতির কারণ হয়।)

শতং চৈকা, শত বলতে শত শত, শরীরের মধ্যে শত শত নাড়ি আছে আর *চৈকা*, এর শাব্দিক অর্থ করলে এর অর্থ হবে শরীরের মধ্যে একশ এক নাড়ি আছে। এখন *শতং চৈকা* বলতে একশ একটি নাড়ীর কথা বলছেন নাকি শরীরের মধ্যে অনেকগুলো নাড়ী আছে তার মধ্যে একটা বিশেষ নাড়ীর কথা বলছেন বোঝা দরকার। *হৃদয়স্য নাড্যাঃ*, এই হৃদয় থেকে সেই নাড়ী নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। হৃদয় শব্দটা এনাদের খুব সাধারণ শব্দ, শরীরে প্রাণন ক্রিয়া যে চ্যানেল গুলি দিয়ে হয়, যেটা আমাদের জীবনকে ধরে আছে, বলছেন এই রকম একশ এক নাড়ী আছে বা শত শত নাড়ী আছে তার মধ্যে একটা বিশেষ নাড়ী আছে। পরম্পরায় যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা একশ এক নাড়ীর বাইরে যাবেন না, যাঁরা পরম্পরাতে যান না তাঁরা মূল জিনিষটাকে ধরবেন। এখানে মূল বক্তব্য হল *তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা*, একটা নাড়ী আছে যেটা আমাদের ব্রহ্মতালুকে ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। একটা নার্ভ কারেন্ট আছে, যে কারেন্ট সব সময় বন্ধই থাকে। এখানে বলছেন যদি ঐ নার্ভ কারেন্টটা খুলে যায় তখন *তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি*, যাঁরা মৃত্যুর সময় *ঊর্ধ্বম্ আয়ন্*, ঐ পথ দিয়ে যান তাঁদের *বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি*, অমরত্ব গতি হয়, আর বাকি সব নাড়ী দিয়ে গেলে সাধারণ গতি হয়।

এটি একটি খুব মজার মন্ত্র। এইসব কথা আমাদের পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে, শাস্ত্রেও বলছে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করা খুব কঠিন। বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তবেই এই মন্ত্রের ভাবকে বোঝা যায়। অন্যান্য দর্শন দিয়ে এর অর্থ করলে অনেক জটিলতা এসে যাবে। এর সহজ বক্তব্য হল, আমাদের খুব প্রচলিত বিশ্বাস হল এই শরীর, শরীরের ভেতরে মন, মনের মধ্যে আলোময় আত্মা আছে। এর

আগে আমরা একটা মন্ত্র পেরিয়ে এসেছি যেখানে বলছিলেন, *ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।।(২/২/৩)।* তার আগে বলছেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ (২/১/১৩)*, এই ধারণাগুলো আমাদের মধ্যে আগে থেকেই চলে আসছে। ধ্যানের গভীরে ঋষিরা বাস্তবিক এটাই দেখেন। যাঁরা দেখছেন তাঁরা তো দেখে নিলেন, কিন্তু যাঁরা দেখছেন না তাঁদের কি ঐ আত্মা আছেন কি নেই? তাঁদেরও তো আছে। আত্মার বেরিয়ে যাওয়া মানেই শরীর পতন। মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, কোমাতে পড়ে আছে, তার মানে আত্মা বেরচ্ছে না। অথচ অনেকের ক্ষেত্রে হঠাৎ বুকে ব্যাথা হতে লাগল, ধর ধর করতে করতেই সব শেষ। কেন কারুর ক্ষেত্রে আত্মা বেরিয়ে যাচ্ছে কেন কারুর ক্ষেত্রে বেরিয়ে যেতে চাইছে না, এটা কারুর জানা নেই। কিন্তু সবাই বলছে আত্মা বেরিয়ে যায়। এখন আত্মা যখন বেরিয়ে যায় তাঁকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা তো দিতে হবে। কোন রাস্তা দিয়ে আত্মা বেরিয়ে যাবেন? বলছেন আত্মার বেরিয়ে যাওয়ার একশ একটি রাস্তা আছে। আমরা বলতে পারি আমাদের ইন্দ্রিয় দশটি, এই দশটি দিয়েও তো বেরিয়ে যেতে পারে। বলছেন, অন্যান্য জায়গা দিয়েও বেরিয়ে যেতে পারে, একশ এক খানা রাস্তা খোলা আছে, তার মধ্যে একটা রাস্তা খোলা থাকে যেটা জন্মানোর সময় ব্রহ্মতালুতে থাকে, ওখান দিয়ে আত্মা বেরিয়ে গেলে বলে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তার আত্মা বেরিয়ে গেছে। বলছেন, যদি আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বেরিয়ে যান তাহলে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। যদি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ না করে অন্য জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যান তাহলে মৃত্যুর পর নানান রকমের গতি প্রাপ্ত হবে। সেই থেকে আমাদের অনেকের মধ্যে নানা রকমের ধারণা তৈরী হয়েছে। মৃত্যুর সময় হয়ত মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে তখন সবাই বলে যে, এর আত্মা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে।

কিন্তু এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিষ, একমাত্র যোগীরাই দেখতে পান আত্মা কিভাবে বেরিয়ে গেছে। বেদান্তের সাথে মেলালে জিনিষটা স্পষ্ট হয়। আত্মা হলেন চেতনার কেন্দ্রস্থল। আমাদের যে চেতনার বোধ, যে জায়গাতে আমাদের চেতনার বোধ হয়, ঐ চেতনার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সে নিজের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যখন বেরিয়ে যাওয়ার সময় আসে, যারা বিষয়ী বা কামী লোক তাদের চেতনার স্তর এক রকম, ফলে তাদের জীবাত্মাও এক ভাবে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা যোগী, প্রচুর তপস্যা করেছেন কিন্তু মন্দ ব্রহ্মজ্ঞানী, এদের চেতনার বোধ নিয়ন্ত্রণে থাকে, এনারা বুঝে যান আমার শেষ সময় এসে গেছে। তখন তিনি চেতনাকে নিয়ে এসে বলেন *ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর*। এখন তাঁর চেতনা পুরো নিয়ন্ত্রণে, তখন তিনি বলতে পারেন *অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্* অথবা বলতে পারেন *হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্*। তিনি যেন জানান দিচ্ছেন আমি আসছি, আমি আমার দেহকে ত্যাগ করছি এই বোধ স্পষ্ট থাকে। এভাবে সাধারণ মানুষ বোধ করতে পারবে না, যাঁরা খুব উচ্চমানের যোগী তাঁরাই পারেন। চেতনার উপর যেমন তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকে তার সাথে নিজের প্রাণশক্তির উপরও পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে এর বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণই যখন সাধনার অবস্থায় হয় তখন তাকে বলছেন কুণ্ডলীনি জাগরণ। কুণ্ডলীনি জাগরণেও ঠিক তাই হয়, তাঁর চেতনার স্তর পাল্টে যায়। সাধারণ মানুষের চেতনার স্তর আহার, নিদ্রা আর মৈথুনের মধ্যেই অবস্থিত থাকে, ঠাকুর এটাকেই বলছেন বিষয়ীদের মন সব সময় লিঙ্গ, গুহ্য আর নাভিতে থাকে। এগুলো হল আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতীক, যোগীরা সাধনার গভীরে এগুলোকে দেখতে পান, আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। ঠাকুরও এই জিনিষগুলিকে নিয়ে বারবার বলছেন, তিনি বলছেন, ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ হল কুণ্ডলীনি জাগরণ। কুণ্ডলীনি জাগরণ মানেই হয় চেতনার স্তরের বিন্যাস। আমরা এখন নিজেদের শরীর, অপরের শরীর, এই জগৎকে যেভাবে দেখছি কুণ্ডলীনি জাগরণে এই দেখাটা পুরো পাল্টে যায়। ঠাকুর বলছেন, কুণ্ডলীনি যখন অনাহতে আসে তখন সে জ্যোতি দেখে বলে ওঠে এ কী! এ কী! বাস্তবিকই এভাবে হয়, ঠাকুর দিনরাত এগুলোকে দেখছেন, এগুলো কোন শোনা কথা নয়, বাস্তবিক তিনি যেটা দেখছেন সেটাই বর্ণনা করছেন। এখন অনেকের অনাহতের উপর আর নাও যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা আরও কয়েকজনের কবিতা পড়লে মনে হবে, কোথাও তাঁরা একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি পেয়েছিলেন, সেটা কুণ্ডলীনি জাগরণই হোক বা যাই হয়ে থাকুক, অবশ্যই কিছু অনুভূতি ছিল তা নাহলে এই ধরণের উচ্চমানের কবিতার জন্ম হবে না। বেদান্তে এটাকে বলছেন, তাঁর চেতনার স্তরটা পাল্টে গেছে। আমাদের যে চেতনার স্তর সেটাই কিন্তু আত্মা, এই যে আমি বোধ হয়ে চলেছে, যোগী পরিষ্কার দেখতে পান আমার এই যে আমি বোধ এটাই আত্মা। আর মৃত্যুর সময় যোগী নিজের চিন্তনকে আস্তে আস্তে, যা এতদিন করে এসেছেন সেটাকে স্মরণ করতে থাকেন।

ক্রতো স্মর কৃতং স্মর যখন বলছেন তখন তিনি চেতনাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন যেখানে তিনি বলতে পারছেন আমি এখন দেহকে ছেড়ে দিচ্ছি এবার আমি আমার আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে পার করাব। যাদের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই তাদের কি হবে? তাদের আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে এবার কোথায় যে যাবে কোন ঠিক নেই। ব্যাগাডুলি খেলাতে যেমন লোহার বলকে কাঠি দিয়ে ঠেলে উপরে পাঠিয়ে দেওয়ার পর লোহার গুলি যে কোথায় গিয়ে পড়বে কোন ঠিক নেই, একশতেও পড়তে পারে, পঞ্চাশেও পড়তে পারে আবার মাইনাসেও পড়তে পারে। এদেরও আত্মা বেরিয়ে যে কোথায় কোন যোনিতে গিয়ে বা কোন লোকে গিয়ে পড়বে কোন ঠিক নেই। কিন্তু যিনি যোগী তিনি সব সময় পাকা খেলোয়াড়, ঠাকুর বলছেন পাকা খেলোয়াড় বলবে কত চাই? ছয় চাই? এই নাও ছয়। পুট চাই? এই নাও পুট। তিনিই বলতে পারেন আমার আত্মাকে আমি ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে পার করাব। এই ধরণের যোগীরা হলেন দ্বিতীয় স্তরের, তাঁর এখনও ইচ্ছে আছে আমি ব্রহ্মলোকে যাব, আমি রামকৃষ্ণলোকে যাব, আমি বৈকুণ্ঠধামে যাব। বেদান্তের দৃষ্টিতে আমি বৈকুণ্ঠধামে যাব এটাও অবিদ্যা। বৈষ্ণবদের এই কথা বললে তারা তেড়ে আসবে, তা আসুক। কিছু করার নেই, আমরা এখানে উপনিষদ পড়ছি, উপনিষদ কিভাবে দেখছে সেটাকে আমাদের বলতে হবে। উপনিষদ বলছেন দ্বিতীয় স্তরের যোগীদেরও উপরে হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁর সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি নাশ হয়ে গেছে, অবিদ্যাগ্রন্থি নাশ হয়ে গেছে মানে, তাঁর মধ্যে কোন কামনা নেই, মৃত্যুর পর আমি বৈকুণ্ঠধামে বা ব্রহ্মলোকে যাব এই কামনাও খসে পড়ে গেছে। উপনিষদ বলছেন কোন ধরণের কামনা-বাসনা থাকবে না। ঈশ্বর আমার উপর প্রসন্ন হন, এই ভাবটাও থাকবে না। এখানে তিনটে শ্রেণী এসে যাচ্ছে, প্রথম হয়ে গেলেন আত্মজ্ঞানী, তিনি আর কোথাও যান না, যাওয়ার তো কোন জায়গাও নেই কারণ সবটাই যে তিনিই হয়ে আছেন। মন্দ ব্রহ্মজ্ঞানী সাধারণত তাঁরাই হন যাঁরা খুব নিষ্ঠার সাথে কোন সাকার উপাসনা গভীর ভাবে করেছেন। পরের দিকে ভক্তি আর বেদান্তের মধ্যে যখন একটা সমন্বয় করেছেন তখন তাঁরা এটাই বলছেন যে তিনি যে ইষ্টকে নিয়ে সাধনা করে এসেছেন, সেই ইষ্ট হলেন অবিদ্যা বা মায়ার আবরণ দিয়ে যখন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকে দেখা হয়, তখন তাঁর সঙ্গেই থাকেন, তাঁর সাথেই রমণ করেন। আর সৃষ্টির নাশ যখন হয়ে যায় তখন তাঁর পুরোপুরি মুক্তি হয়ে যায়।

আমাদের একটা জিনিষকে মনে রাখতে হবে, বেদান্তে বারবার বলছে মৃত্যুর সময় যা হচ্ছে, মৃত্যুর পরে যা কিছু হচ্ছে এটা হল মন্দের ভালো, এই নিয়ে আলোচনা করা বেদান্তের কাজ নয়। বেদান্ত এটাকে অন্যদের জন্য ছেড়ে রেখেছে। কিন্তু দেখা যায় মৃত্যুর সময় তিন রকমের ভাব থাকে। সাধারণ মানুষ ভাববে যে মরতে যাচ্ছে তার কি আর কোন বোধ থাকে, তাহলে মৃত্যুর সময় ভাব হবে কি করে? মৃত্যুর সময় ঠাকুর শ্রীমাকে বলছেন, আমি তো কোথাও যাইনি, এই ঘর আর সেই ঘর। যে কোন আত্মজ্ঞানী পুরুষ মৃত্যুর সময় যদি তাঁর পাশে কেউ থাকে তিনি তাকে বলবেন, এই আমি আমার শরীরকে ছেড়ে দিচ্ছি। ভগবান বুদ্ধকে যে শেষ খাবার দিয়েছিল, তিনি তাকে বলছেন, তুমি তো আমাকে দেহ থেকে মুক্তি দিয়ে দিলে, আমি তো তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। এনারা হলে প্রথম শ্রেণীর, আত্মজ্ঞানী জানেন যে দেহটা পড়ে গেলেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁর সত্তা ছড়িয়ে গেল। এতক্ষণ শরীর যেটা তাঁর কেন্দ্র ছিল সেটা এখন কেন্দ্রবিহীন। সত্তা তখনও অনন্ত ছিল এখনও অনন্তই আছে। তখন কেন্দ্র ছিল একটা শরীর, এখন কেন্দ্র কিছু নেই কিন্তু চাইলে তিনি যে কোন একটা দেহ তৈরী করে নিতে পারেন, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। দ্বিতীয় শ্রেণী হল, যাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন বা বিরাট কর্মী, প্রচুর যজ্ঞযাগ করেছেন, যজ্ঞ করা মানেও তো কাউকে আহুতি দেওয়া হয়। সেই আহুতি দেওয়াটাও সগুণ সাধনার মধ্যে আসছে। এনারা সবাই বলেন, আমি যেন স্বর্গ পাই, তা বৈকুণ্ঠ স্বর্গই হোক আর যে স্বর্গই হোক। মৃত্যুর সময় এনাদের চেতনাটা থাকে, চেতনা যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে সাধনাতে কিছু গোলমাল আছে। তৃতীয় শ্রেনীর হল এই দুটো শ্রেণীর বাইরে যারা তারা সবাই সমান, কেউ বিক্ষিপ্ত হয়ে মরছে, কেউ অর্ধ বিক্ষিপ্ত হয়ে মরছে, কেউ খেতে খেতে মরে যাচ্ছে, কেউ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে যাচ্ছে, এরা সবাই সমান। বেদান্তে এদের সবাইকে একটা পুটলিতে বেঁধে রেখে দিচ্ছে। কেউ গরুর পেটে জন্মাবে কেউ ছাগলের পেটে জন্মাবে। এই তৃতীয় শ্রেণীকে নিয়ে আলোচনা করা বেদান্তের কাজ নয়। পুরাণাদিতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা আছে, যারা এইভাবে মরেছে তাদের এই হয়েছে ইত্যাদি।

বেদান্ত দেখছে মৃত্যুর সময় তার হুঁশ আছে কিনা। প্রথম শ্রেণীরা হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি বলবেন আমি মুক্ত হয়ে গেলাম, আমি সর্বত্র আছি সর্বত্রই বিরাজ করে থাকব। দ্বিতীয় শ্রেণীরা বলবেন, আমার সময় হয়ে

গেল, এবার আমি সেই লোকে যাচ্ছি যেখানে আমার ইষ্ট অপেক্ষা করছেন। কিন্তু বাকিদের কি হবে? এটাই এখানে বলছেন *বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি,* বাকিরা যাদের মৃত্যুর সময় কোন হুঁশ থাকে না, যাদের আত্মা শরীরের যে কোন জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যায় তারা নিকৃষ্ট ধরণের, এই সংসারের মধ্যেই তারা ঘুরপাক করতে থাকে, এদের কথা আলোচনা করা উপনিষদের কাজ নয়। সব থেকে উচ্চাবস্থা হল যেটা আগের মন্ত্রে বলা হয়েছে, মৃত্যুধর্মা অমর হয়ে যায়। দ্বিতীয় উচ্চাবস্থা হল যাঁরা প্রচুর শুভকর্ম করেছেন, কিন্তু সকাম ভাবে করেছেন বা ভক্তিমার্গ দিয়ে নিষ্কাম ভাবে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যেই আবার দুটো বিভাগ এসে গেল। একজন সারা জীবন নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে গেছেন, মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জন্য যেটা উচ্চতম লোক হতে পারে সেখানে যাবেন। সারা জীবন ধরে ঠাকুরের সেবা পূজা করে গেছেন, ঠাকুরেই তাঁর মন সব সময় লেগে আছে, মৃত্যুর সময় যদি তাঁর চেতনা থাকে তিনি অবশ্যই রামকৃষ্ণলোকে যাবেন। বেলুড় মঠে অনেক মহারাজ মৃত্যুর সময় তাঁরা কিভাবে দেহ ছাড়ছেন, এর প্রচুর কাহিনী সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কাশী অদ্বৈত আশ্রমের এক মহারাজ নিজে একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একজন বৃদ্ধ মহারাজ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে থাকতেন, সন্ধ্যে বেলায় সবাই যখন জপ-ধ্যান করতে বসেন তিনি তখন হীটারে খুটুর খুটুর এটা সেটা রান্না করতেন আর খাওয়া-দাওয়া করতে থাকতেন। হঠাৎ একদিন সাধুদের বলছেন 'আজ সন্ধ্যেবেলা আরতির পর আপনারা সবাই আমার ঘরে আসতে পারবেন'? সাধুরা এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না, নিজের মত থাকেন, জপ-ধ্যান বেশি নেই। একজন সাধু বললেন, 'আজকে তো হবে না মহারাজ, আরতির পর তো আজ রামনাম আছে'। 'তাহলে রামনামের পরেই সবাই মিলে একবার আসুন'। একজন সিনিয়র মহারাজ বলছেন তাই সবাই রাজী হয়ে গেলেন। রামনামের পর সব সাধুরা এসেছেন। তিনি হালুয়া বানিয়ে রেখেছিলেন, সবাইকে এক চামচ করে হালুয়া খাওয়ালেন। হালুয়া দেওয়ার পর বললেন, 'আমি বিছানায় শুয়ে পড়ছি আপনারা সবাই মিলে একটু রামনাম করুন'। বিছানায় শুয়ে পড়লেন, সাধুরা রামনাম করছেন, তার মধ্যেই সব শেষ। মৃত্যুর উপর এতটাই নিয়ন্ত্রণ যে, তিনি জানেন আমার মৃত্যু এসে গেছে, সবাইকে আরতির পরে আসতে বলে দিলেন, সাধুরা বলল আজ আরতির পর হবে না, রামনাম আছে। আচ্ছা রামনামের পরেই আসুন। তিনি বলছেন না ঠাকুর আমাকে নিতে এসেছেন। বেলঘরিয়াতে স্বামী নির্বেদানন্দজী মহারাজ খুব উচ্চমার্গের সাধু ছিলেন, অনেক বই লিখেছেন। ওনারই ছাত্র পরে ডাক্তার হয়ে মহারাজের চিকিৎসা করতেন। মহারাজের কাছে ডাক্তার বসে আছেন। মহারাজ তাঁর ছাত্রকে বলছেন, 'তুমি তো ডাক্তারী পাশ করেছ, তুমি জান মানুষের দেহত্যাগ কিভাবে হয়'? 'না মহারাজ, আপনি এসব কি বলছেন'? 'তাহলে এই দেখ! এই আমি ধ্যানে বসলাম। এবার আমার দেহটা ছাড়ছি। আমার পা থেকে আমার চেতনাটা চলে গেল'। ডাক্তার তো ঘাবড়ে গেছে 'করছেন কী মহারাজ'! 'এবার আমার থাই থেকে চেতনা চলে গেল, ওখান থেকে আমার চেতনাকে টেনে উপরে নিয়ে আসছি'। ডাক্তার আরও ঘাবড়ে গেছে 'দাঁড়ান মহারাজ! এক্ষুণি আমি ওষুধ দিচ্ছি'। 'তোমার ওষুধে এখন কিছুই হবে না, এই দেখ আমার বুকের নীচে চেতনাটা চলে গেছে'। ডাক্তার তো ছুটে গেছে ওষুধ আনার জন্য। এসে দেখছেন ধ্যানের অবস্থাতেই সব শেষ। ওনার আত্মজ্ঞান ছিল কি ছিল না, আমরা জানি না আর সাধুদের এগুলো আলোচনা করতেও নেই।

এখানে বক্তব্য তা নয়, বক্তব্য দুটো। এখানে সবটাতেই চেতনাকে নিয়ে চলছে, প্রথম চেতনা হল আমি সর্বব্যাপী, মৃত্যুর সময়ও তাঁর এই চেতনা। ঠাকুর মৃত্যুশয্যায়, নরেন মনে মনে ভাবছেন এখন যদি তিনি বলেন আমি অবতার তাহলে মেনে নেব। সঠিক কি হয়েছিল আর কি হইনি তাই নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু নরেন যদি বলেও থাকেন, মশাই! আপনি কি এখন বলতে পারবেন আপনি অবতার? ঠাকুরের মৃত্যু যন্ত্রণা চলছে সেই সময়েও ঠাকুর বলছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ ইদানিং সেই রামকৃষ্ণ। আমরা বর্ণনাতে পাই নরেন মনে মনে শুধু ভেবেছেন আর ঠাকুর বলে দিলেন। ইনি ভাবছেন আর উনি বলছেন এখানে এতে কিছু যায় আসে না। এগুলো কোন অস্বাভাবিক বা আহামরি কিছু নয়। এখানে মূল হল চেতনার স্তর, ঠাকুর তখনও সচেতন, তাঁর যে চেতনার স্তর তিনি সেই সত্তা, যে সত্তাতে যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ, তিনি রামকৃষ্ণ। এখানে ঠিক ঠিক এই জিনিষটাকেই বলতে চাইছেন। এই আলোচনাই করছেন, মৃত্যুর সময় আপনার চেতনা কি বলতে চাইছে, আপনি তখন নিজেকে কি দেখছেন। সেইজন্য বলে মৃত্যুর সময় মানুষ মিথ্যা কথা বলে না, কারণ আপনি যেটা সেটাই তখন ভেসে আসে। নচিকেতার প্রশ্ন ছিল আত্মা আছে কিনা, এটা একটা আখ্যায়িকা, সেই প্রশ্নের

উত্তর দিতে গিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করে ইতি করছেন। এর আগেও বলেছিলেন, *যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ*, আবার এখানে নতুন করে বলছেন চেতনার স্তর যেমন হয় পরের জন্মও ঠিক সেই চেতনার স্তর অনুযায়ীই হয়।

আচার্য এখানে নিজের তরফে যোগ করে বলছেন, যাঁরা সূর্যমার্গ দিয়ে অমৃতত্বে বা বৈকুণ্ঠাদি লোকে যায়, এটাকে বলে আপেক্ষিক অমরত্ব। আপেক্ষিক বলছেন এই কারণে যে, এই অমরত্ব আত্মজ্ঞানের অমরত্ব নয় কিন্তু দীর্ঘ দিন সেই উচ্চলোকে থাকছেন বলে অমর বলা যেতে পারে। আচার্য বলছেন নানান শ্রুতি ও স্মৃতিতে এই ধরণের কথা আছে। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সঙ্গে থেকে নানান রকমের ভোগ করেন, শাস্ত্রে যেখানে যেমন যেমন ভোগের বর্ণনা আছে, সব ভোগ করার পর সৃষ্টি যখন শেষ হয় যাবে তখন তাঁর সত্তা লয় হয়ে যাবে, পরের কল্পে তাঁকে আর নতুন করে জন্ম নিতে হবে না। এই ব্রহ্মলোক থেকেই পরবর্তিকালে শিবলোক, বৈকুণ্ঠলোকের ধারণা এসেছে, ইদানিং ঠাকুরের ভক্তরা নিয়ে এসেছে রামকৃষ্ণলোকের ধারণা। ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আর বিষ্ণুলোকের বর্ণনা যদিও একই রকম কিন্তু সৃষ্টিকর্তা রূপে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু বা ভগবান নারায়ণের তফাৎ আছে। যিনি নানা রকমের ক্রিয়াকর্মাদি করেন তাঁদের জন্য ব্রহ্মালোক কিন্তু যাঁরা যে ইষ্টে ভক্তি করেন তাঁরা ঐ ইষ্টের লোকে যান। যেমন যাঁরা শিবের ভক্ত তাঁরা শিবলোকে যান, যাঁরা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন তাঁরা বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠধামে যান। যারা ঠাকুরের ভক্ত তারা রামকৃষ্ণলোকে যাবেন। রামকৃষ্ণলোকে যাওয়া মানে, যিনি পরম সত্তা, ঠাকুরের ভক্ত সেই পরম সত্তাকে রামকৃষ্ণ রূপে দেখবে।

যার চেতনা ঐ স্তরে নেই, তার প্রাণন ক্রিয়া প্রাণ আর অপানের মধ্যেই চলতে থাকে, যেটাকে পরের দিকে ইড়া পিঙ্গলা বলা হচ্ছে। মৃত্যুর পর সে বিভিন্ন লোকে যায়। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে কেউ কোথাও যায় না। মৃত্যুর সময় তার যে চেতনা, সেই চেতনার জন্য সে আবার নিজেকে ভাবতে শুরু করে, আমি এখন অমুক স্বর্গে আছি, আমি এখন বাছুর হয়ে আছি, আমি মানুষ হয়ে এই বাড়িতে জন্ম নিয়েছে, তার চেতনাটা পাল্টাতে থাকে। শুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তে যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি ভাবছেন। যখন তিনি ভাবেন আমি সুষুম্না দিয়ে বের হচ্ছি বা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরোচ্ছি তখন আমি ব্রহ্মলোকে চলে গেলাম। আর যখন দেখেন তাঁর অজ্ঞান রাশি পুরোটাই চলে গেল তখন দেখেন আমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। আর যখন অন্য কোন ভাবে থাকে তখন ভাবছে আমি মারা গেছি, আমি আবার জন্ম নিলাম, জন্মের পর আমি অমুক হয়েছি, এই চেতনাটাই তার আবার চলতে থাকবে। চৈতন্যের সমুদ্রের একটি ছোট্ট কণা নিজেকে ভাবছে। এই কণা কিন্তু বাস্তবিক সেই অনন্ত চৈতন্যের সমুদ্র। সে ভাবছে আমি অমুক হয়ে বসে আছি, মৃত্যুর সময় ভাবছে, ঠাকুরের ধ্যান করে আমি রামকৃষ্ণলোকে এলাম। কত দিন ভাববে? অনন্তকাল ধরে ভেবে আসছে। একদিন তার অজ্ঞানরাশি সব নাশ হয়ে গেল, তখন দেখে আরে! এতদিন এ আমি কি করছিলাম, আমি তো কখন কিছু হইনি, আমি শুধু বসে বসে ভাবছিলাম। কিন্তু চৈতন্যের ভাবা আর আমাদের ভাবাতে তফাৎ আছে। চৈতন্য যখন একজন মানুষ রূপে নিজেকে ভাবছে তখন তার এক রকম ক্রিয়া হবে, সেই চৈতন্যই যখন কুকুরের আত্মা হয়ে জন্মাবে তখন সে আরেক রকম ভাববে, তার ক্রিয়া আরেক রকম হবে। এই জগৎ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি আর তার মধ্যে সে নিজেই হাসছে, নিজেই কাঁদছে। সব কিছু করার পর একটা সময় বলে আমার আর কিছু লাগবে না, তখন কিছুই নেই। তখন দেখে কখন কিছু ছিলই না। এটাই বেদান্তের শেষ কথা। দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে যাঁরা ঈশ্বরের সাধনা করেছেন বা যজ্ঞযাগ ও শুভকর্ম করেছেন, তাঁরা ব্রহ্মালোকে যান। সৃষ্টির যখন নাশ হয়ে যায় তখন ব্রহ্মাও থাকেন না, সেই সময় ব্রহ্মার সাথে তাঁরও অমরত্ব হয়ে যায়। গীতায় বলছেন, যাঁদের ঐদিকে মন নেই, বিশেষ করে যাঁরা শুধু কর্ম করে গেছেন তাঁরা আবার ফেরত চলে আসেন আর ভালো জায়গায় জন্ম নেন। আর যাঁরা ঈশ্বরে ভক্তি করে ঐ জায়গায় গেছেন তাঁরা মুক্তি পেয়ে যান। এইভাবে ব্রহ্মালোকে যাওয়ার দুটো আলাদা শ্রেণী, একটা শ্রেণী ফিরে আসে আরেকটা শ্রেণী ওখান থেকেই মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বেদান্তের একটিই কথা, এখানেই যা করার করে নাও, করার পর দেখবে তোমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই, এটাই আসল। পরের মন্ত্রে বলছেন –

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি।।২/৩/১৭।।

(অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা বিদ্যমান। মুঞ্জ ঘাস থেকে শীষের ন্যায় তাঁকে স্বীয় শরীর থেকে ধৈর্যের সাথে পৃথক করবে। এইভাবে বিবিক্ত তাঁকেই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বলে জানবে।)

এর আগেও একটি মন্ত্রে বলেছিলেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ*, ধ্যানের গভীরে গিয়ে দেখেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ*, আংঠা পরিমাণের আত্মাকে জ্যোতি রূপে দেখেন। এই জ্যোতি জাগতিক কোন আলো নয়, *অধুমকঃ*, জ্যোতিতে কোন রকমের মলিনতা নেই, জাগতিক আলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে আরও জোর দিয়ে বলছেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা*, প্রত্যেক মানুষের ভেতরে এই অন্তরাত্মা আছেন। কোথায় তিনি থাকেন? *সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ*, সর্বদা সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যে সম্যক্ রূপে আবিষ্ট হয়ে আছেন।

ভক্তিমার্গের এবং যোগমার্গের সাধকদের কাছে জীবন আর জগৎকে এক রকম দেখায় কিন্তু যারা অদ্বৈত মার্গের সাধক তাদের কাছে জীবন, জগৎ আর সত্য আরেক রকম দেখায়, যদিও দুটোই এক। যাঁরা ঘোর বেদান্তী তাঁরা সত্যকে কিভাবে দেখেন আগে আগে বলা হয়েছে। এখানে আলোচনা করা হচ্ছে যাঁরা ভক্তিমার্গে ও যোগমার্গে সাধনা করেন তাঁদেরকে নিয়ে। যখন সাধনা করছেন তখন নিজেকে শরীর রূপে বোধ হয়, আমি এই শরীর। ধ্যানের গভীরে যখন যাওয়া শুরু হয় তখন প্রথম এই শরীর বোধটা চলে যায়। শরীর বোধ চলে যাওয়ার পর মন যেমনি ভেতরের দিকে যেতে শুরু করে তখন নিজেকে *অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা*, যেটা আগেও বর্ণনা করেছেন, আংঠা পরিমাণ জ্যোতি রূপে নিজেকে দেখেন। এই জায়গাতে এসে এই মন্ত্র খুব জটিল হয়ে যায়, কারণ যাঁরাই আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছেন তাঁরা সবাই কিন্তু ঈশ্বরকে জ্যোতি রূপেই দেখেন, এর কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু প্রথমটা যে তিনি কি দেখবেন তাঁর কোন নিশ্চয়তা নেই। দেখবেন জ্যোতি রূপেই কিন্তু ঐ জ্যোতি কি রূপ নেবে বলা অসম্ভব। জহুদি ধর্মের ঋষি মোজেস ধ্যানের গভীরে দেখছেন একটা burning bush, পাহাড়ে একটা ঝোপে আগুন জ্বলছে, কিন্তু ওটা আগুন ছিল না, জ্যোতির্ময় ছিল। মোজেস নিজের জ্যোতিকে নিজের শরীরের বাইরে দেখছেন। বাইবেলে যেখানে যিশু ভগবানের কথা বলছেন সেখানে তিনি প্রকাশ রূপে বলছেন, যেমন let there be the light বা I am the light বলছেন। অধ্যাত্ম আর জ্যোতির প্রকাশ, প্রকাশ বলতে আমরা বুঝি জাগতিক প্রকাশ, আধ্যাত্মিক জ্যোতি অন্য ধরণের জ্যোতি। যাঁরাই এই জ্যোতিকে অনুভব করেছেন একমাত্র তাঁরাই জানেন। যাঁরাই সাধনা করছেন তাঁদের বেশির ভাগই চেষ্টা করে সাধনা করছেন। সাধনা মানে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করা বা ধ্যান করা বা চিন্তন করা, ফলে শরীরটাই তাদের কেন্দ্র হয়ে যায়। সাধনা শুরুই হয় শরীরকে কেন্দ্র করে। সেইজন্য প্রথম যে জ্যোতি দর্শন হয় সেটা সব সময় শরীরের ভেতরেই হয়। কিন্তু এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে এভাবেই সব সময় সবাই দেখবেন। ঠাকুর মা কালীকে বাইরে দেখেছেন, তিনি দেখছেন জ্যোতির সমুদ্র তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ঠাকুর নিজেকে কিন্তু ঐভাবে অনেক পরে দেখেছেন। আবার এটাও দেখবে সেটাও দেখবে কিনা বলা মুশকিল। এটাও বলা মুশকিল কার কোথায় জ্যোতি দর্শন হবে। কিন্তু কেউ যদি systematic wayতে বা scientific processএ এগিয়ে যায়, ভক্তিমার্গ ও যোগমার্গের সাধনায় এভাবেই হবে অর্থাৎ শরীরের ভেতরেই দেখবে। কিন্তু তাতেও জ্যোতিকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র রূপে দেখবে নাকি ইষ্টকে জ্যোতি রূপে দেখবে বলা মুশকিল, কিন্তু দেখবে।

কিন্তু কিভাবে দেখেন? আমরা যেমন এই মাইক্রোফোন দেখছি, গ্লাশ দেখছি, এভাবে দেখেন না। আমি এই গ্লাশকে আমার থেকে আলাদাই দেখছি, আমি আলাদা গ্লাশ আলাদা। কিন্তু ধ্যানের গভীরে জ্যোতি দর্শনে সাধক জ্যোতিকে নিজের সত্তা রূপে দেখেন, আমিই এই জ্যোতি। চেতনার স্তর পাল্টানো শুরু হওয়ার পর শরীর, মন এগুলো সরে গিয়ে সেখানে নিজেকে চৈতন্য রূপে দেখেন। কি চৈতন্য রূপ? অঙ্গুষ্ঠমাত্র চৈতন্য রূপে দেখেন। সেখান থেকে অন্যদের ভেতরে যে সত্তা তাদের সেই সত্তাকেও সেইভাবে দেখেন। তারপর দেখেন চৈতন্য জ্যোতি ছাড়া আর কিছুই নেই। আল গাজালি একজন সুফি সাধক ছিলেন, তিনি সাধকদের বিভিন্ন জ্যোতিদর্শনের খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, কেউ প্রকাশ দেখেন, যেন একটা জ্যোতির রেখা চলে গেছে, নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না যে এটাই দেখবেন। উপনিষদ তাহলে কেন একেবারে এই একটিকেই জোর দিয়ে বলছেন? কারণ এই পদ্ধতিতে গেলে বেশির ভাগ সাধক সাধারণ ভাবে এটাই দেখবেন। কিন্তু এই পদ্ধতিকে সবাই অনুসরণ করবে না। সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত হল ঠাকুর নিজে। তিনি এই পদ্ধতিতে যাননি, ঠাকুর অন্য পদ্ধতিতে গেছেন। ফলে তাঁর প্রথম জ্যোতির অনুভূতি পুরো আলাদা বা মোজেস তিনি জানতেনও না যে জ্যোতি বলে কিছু হয় কিন্তু তিনি দেখছেন একটা ঝোপে আগুন লেগে আছে, কিন্তু সেই আগুনে কোন তাপ

নেই, কিছু পুড়ে যাচ্ছে না। আমাদের কাছে এগুলো কিছু না, উপনিষদ এই জিনিষকে অনেক আগেই বলে দিয়েছেন। কারণ ঋষিরা প্রথম থেকেই তাঁদের সমগ্র জীবন এর মধ্যেই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আরব, ইরানে এই জিনিষগুলো অনেক পরে এসেছে।

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, যতই আমাকে চিৎকার করে উপনিষদ বলে দিক, যতই আমি সাধনা করে যাই না কেন, আমরা কিছুতেই জ্যোতিকে বস্তু রূপে ছাড়া অন্য ভাবে চিন্তা করতে পারবো না। মোমবাতির আলো বা টর্চের আলোকে যেভাবে দেখি জ্যোতিকেও আমরা সেভাবেই দেখার মত ভাবি। যাঁর ঠিক ঠিক জ্যোতি দর্শন হয়, তিনি দেখেন আমিই এই জ্যোতি। মন সম্পূর্ণ ভাবে ঐ জ্যোতির চেতনাতেই বসে যায়। মন যখন জগতের উপর নেমে আসে তখনও ঐ চেতনা চলে যায় না। একজন বড়লোক কিছুক্ষণের জন্য কোন সাধারণ লোকের কাছে গেলে তার মধ্যে দুটো বোধের আভাসই থাকে। সন্ন্যাসী কোন গৃহস্থের বাড়ি গেলে সেখানেও তাঁর বোধ থাকবে যে আমি একজন সন্ন্যাসী, আমি এক গৃহস্থের বাড়ি এসেছি। একজন সন্ন্যাসী ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেক দিন আগেই জগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। এরপর একদিন সেই সন্ন্যাসী নিজের পূর্বাশ্রমে গেলেন, যেমন শঙ্করাচার্য গিয়েছিলেন, স্বামীজীও গিয়েছিলেন। তখন তিনি নিজেকে সন্ন্যাসী রূপেও দেখবেন, আবার এই বাড়িরই একজন লোক সেই রূপেও দেখবেন আর এটাও দেখবেন যে আমি এই বাড়ি থেকে আলাদা, অথচ সন্ন্যাসী হওয়ার আগে পর্যন্ত ঐ বাড়িতেই ছোট থেকে বড় হয়েছেন, তারপর সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে ঐ বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। ঠাকুর ঝুনো নারকেলের উপমা দিচ্ছেন। ঝুনো নারকেলের শাঁস আর খোল আলাদা হয়ে যায়, নাড়লে ঢপর ঢপর আওয়াজ করে। সন্ন্যাসী পরিষ্কার বুঝতে পারেন আমি আলাদা আর এই বাড়ি আলাদা। আমরা ভাবছি যিনি জ্যোতি দেখছেন তিনি জ্যোতিকে বস্তু রূপে দেখছেন, আসলে তিনি শরীরটাই বস্তু রূপে দেখেন। গৃহস্থরা নিজের বাড়ির সাথে এক রস হয়ে আছে, সবুজ নারকেলের মত, নারকেল, তাঁর শাঁস, খোল সব মিলেমিশে এক হয়ে আছে। গৃহস্থরা সেইজন্য এই জিনিষটাকে বুঝতে পারবে না। সন্ন্যাসীর খুব ভালো বুঝতে পারেন। সন্ন্যাসী যদি তাঁর পূর্বাশ্রমে যান সেখানে সব সময় তিনি তেল আর জলের মত আলাদা থাকবেন। কখনই তাঁর মনে হবে না যে এই ঘরবাড়ি আমার। অথচ এই শরীর নিয়ে ওখানেই বড় হয়েছেন। এগুলো কাউকে বোঝান যাবে না।

শরীরকে কেন্দ্র করেই আমি বোধটা বেড়ে ওঠে, এখন তাঁর আমি বোধটা চলে গেছে জ্যোতিতে। তখন আমি শরীর এই বোধটা সরে গিয়ে একটা নতুন বোধ আসে, আমি এই শরীরকে কিছু দিনের জন্য আশ্রয় করে আছি এই বোধে চলে গেল। এই জিনিষটাকেই বলছেন, *তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ*। মুঞ্জ ঘাসের শিসকে খুব সাবধানে মাঝখান থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসতে হয়, সেই ভাবে খুব সাবধানে ধৈর্যের সাথে আত্মাকে টেনে শরীর থেকে আলাদা করতে হয়। এই পদ্ধতি দ্বিতীয় শ্রেণীদের জন্য, শ্রেষ্ঠ বেদান্তীদের জন্য আলাদা পদ্ধতি। স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ একবার মন্দিরে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করছিলেন, সেখানে লাটু মহারাজ ছিলেন। লাটু মহারাজ হঠাৎ বলতে শুরু করেছেন, পণ্ডিত ঠিক বলছে, ঠিক এই রকমই হয়। লাটু মহারাজ স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে পণ্ডিত বলতেন। সত্যিকারের এই রকমই হয়, ভেতরের বোধটা পুরো আলাদা। যেদিন কেউ এটাকে ধারণা করে নিতে পারবে তার মানে এবার সে শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারছে। চেতনার স্তর তখন পুরো পরিবর্তন হয়ে যায়। এখন আমি মনে করছি আমি যেমন আমার হাত দেখছি, পা দেখছি ঠিক তেমনি ভেতরে আমি একটা জ্যোতি দেখতে পারব। কিন্তু তা নয়, চোখ বন্ধ করে যখন ধ্যানের গভীরে যায় তখন যে জ্যোতির দর্শন হয় সে দেখে এটাই আমার আসল। যাঁরা নিজের ইষ্টের ধ্যান করেন তখন ঐ অবস্থায় সে আলোময় ইষ্টকেই দেখবে। জ্যোতি দেখার পর যেমন দেখেন এই জ্যোতিটাই আমি, এখানে সে তো বেদান্তী নয়, ইষ্টের ধ্যান করছে মানে ভক্তিমার্গের সাধক, ভক্ত দেখবে আমি এই জ্যোতির্ময়, আলোময় ইষ্টের সাথে জুড়ে আছি। কিভাবে জুড়ে আছেন? দাস ভাবে, সন্তান ভাবে, সখা রূপে, যে রূপেই হোক। তাহলে আসল আমি কে? এই মন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যদি মীরাবাঈয়ের দর্শনকে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন এভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, মীরাবাঈ তখন দেখবেন জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণের আমি হলাম প্রেমিকা। সেইজন্য মীরাবাঈয়ের স্বামী তাঁকে দুটো কথা বলছেন আর তিনি বুঝতেই পারছেন না কী বলছেন, কেন বলছেন। বৃন্দাবনের গোপীরা রাসলীলার অনেক পরে দ্বারকায় গেছেন শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজবেশে গোপীদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন গোপীরা পরস্পরের দিকে চোখে চাওয়া-চাওয়ি করে জিজ্ঞেস

করছেন, আমরা এ কাকে দেখছি, এর সাথে কথা বলে কি আমরা দ্বিচারিণী হব। আমরা তো একজনকেই ভালোবেসেছি, ময়ূরমুকুটবংশীধারী পীতাম্বর বনমালী বৃন্দাবনপতি শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছি। এ কোন কৃষ্ণ? গোপীরা ঘোমটা টেনে মাথা হেঁট করে রইল। যে যাকে একবার সত্যিকারের ভালোবেসে থাকে সে জীবনে আর কারুর দিকে তাকাতেই পারবে না। এই ভালোবাসার গভীরতা আমরা ধারণাই করতে পারব না, আমাদের ভালোবাসা মানেই ইন্দ্রিয় সুখ। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকেই অন্য রূপে আর দেখতে চাইছেন না। ঐ পর্যায়ের ভালোবাসা না এলে এগুলোকে ধারণা করা মুশকিল। মীরাবাঈ দেখছেন জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমি এক, এরপর মীরাবাঈ অন্য কারুর সাথে নিজেকে জড়াতেই পারবে না। অথচ তাঁকে থাকতে হচ্ছে এই সংসারে।

তখন বলছেন *তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং*, ধ্যান করে করে গভীরে গিয়ে ঐ জিনিষটাকে জানা, বাস্তবিক আমি ঐটা। এরপর নিজের শরীর থেকে ঐটাকে আলাদা করে দেখা। ঐভাবে দেখার পর দেখছেন ঐ আত্মাই শুদ্ধ, পবিত্র, ঐটাই জ্যোতির্ময়, এটাই আমার আসল আমি। যখন আসল আমিকে দেখে নিলেন, এবার মৃত্যুর সময় কি হবে? তখন এই আমি ঐটাকে টেনে বার করবে, আগের মন্ত্র যেটাকে বললেন, ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে তখন মীরাবাঈ কৃষ্ণলোক বা বৈকুণ্ঠলোকে যাবেন। কিন্তু যাদের ঐ চেতনাটা আসেনি, আমি ঐ জ্যোতির্ময় জিনিষটা, ততক্ষণ ওর আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে যাবে না। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তীরা শুধু ভেতরেই জ্যোতিকে দেখেন না, তাঁরা দেখেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ জ্যোতিরই সাগর, আমিই এই জ্যোতির সাগর। তাই তাঁর আর কোথাও যাওয়ার থাকে না।

বেদান্তী আর দ্বৈতবাদীতে এটাই তফাৎ। তাহলে সত্যিই কি শেষে বেদান্তী আর দ্বৈতবাদে তফাৎ হয়ে যায়? না, কোন তফাৎ থাকে না। এই যে এখানে বলছেন *তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাংচ্ছুক্রমমৃতমিতি*, ঐ যে শুক্র, ঐ যে অমৃত ওটাকে জানো। অমৃত তো তুমি এমনিও হয়ে গেলে। তোমার সগুণ সাকার উপাসনা তাই ব্রহ্মালোকে যাবে, বিষ্ণুলোকে বা শিবলোকে যাবে, আর সেখানে তুমি মোদন অর্থাৎ আনন্দ করবে। আনন্দ করার পর কি হবে? সৃষ্টি নাশ হয়ে গেলে সেই অমরই তো তুমি হয়ে যাবে।

এই দুটো মন্ত্রকে একসাথে নিলে খুব সংক্ষেপে এর অর্থ হবে, তুমি কে, তোমার যে সত্তা, এটাকে আত্মা রূপে বোধ করা। আর আত্মার একটা বাস্তবিক স্বরূপ আছে, *জ্যোতিরিবাধুমকঃ*, শুভ্র নির্মল জ্যোতি। যাঁরা সগুণ সাকার সাধনা করেন তাঁরা ঐটাই সগুণ সাকার রূপে দেখেন, ইষ্টকেই জ্যোতির্ময় বা আলোময় দেখেন। যারা সগুণ সাকারের সাধনা করে না, কিন্তু মন্দ ব্রহ্মজ্ঞানী তারা অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতি দেখবে। কারণ তারা সগুণ সাকার মানে না, অন্য দিকে শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞানীও নয়, মন্দ ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু ঐ জ্যোতিকে দেখতে হবে, জ্যোতি দেখা মানে জানতে হবে আমিই এই জ্যোতি, বাকি সবটাই আবরণ। এখন যদি দেখেন ঐ জ্যোতিই মহাসমুদ্র তাহলে তাঁর মৃত্যু নেই, কোথাও যাওয়া আসা নেই। কিন্তু যদি অঙ্গুষ্ঠমাত্র দেখেন তাহলে তাঁরা জন্ম আছে মৃত্যুও আছে। কিন্তু এই জন্ম-মৃত্যু সাধারণদের মত নয়, এরপর ব্রহ্মালোকে যাবেন, সেখান থেকে তার মুক্তি হয়ে যাবে। এখানে *তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং* দ্বিরুক্তি করছেন এই জিনিষটাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আর বলতে চাইছেন এখানেই উপনিষদ শেষ। বলার পর পুরো জিনিষটার স্তুতি করছেন –

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথ লব্ধা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোহপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব।।২/৩/১৮।।

(মৃত্যুপ্রোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সম্পূর্ণ যোগবিধি লাভপূর্বক নচিকেতা বিরজ ও বিমৃত্যু হয়ে মুক্তিলাভ করেছিলেন। অন্য যিনি প্রত্যগাত্মাকে এইরূপে জানেন তিনিও উক্ত ফল প্রাপ্ত হন।)

এইভাবে যমরাজের মুখ থেকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করার সাথে সাথে নচিকেতা ব্রহ্মভাব পেয়ে গেলেন এবং তার সাথে যোগবিধিটাও পেয়ে গেলেন। বলছেন নচিকেতা আত্মার সাথে এক হয়ে যাওয়ার পর বিরজ হয়ে গেলেন। রজ মানে হয় ধুলো, বিরজ মানে ধুলোশূন্য বা ধুলোর পারে। শাস্ত্রে রজ মানে ধর্ম আর অধর্ম। ধর্ম আর অধর্ম দুটোই রজ, দুটোই বন্ধন। অধর্ম তমো আর রজোগুণের বন্ধন আর ধর্ম সত্ত্বগুণের বন্ধন।

বলছেন নচিকেতা বিরজ হয়ে গেছেন। কেন বিরজ হয়ে গেলেন? ধর্ম আর অধর্ম হল মনের ধর্ম, এরা আত্মার ধর্ম নয়। যিনি জেনে গেলেন আমি আত্মার সাথে এক, তাঁর আর কিসের ধর্ম আর কিসের অধর্ম! নচিকেতাও তাই পাপ-পূণ্যের পারে চলে গিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে গেলেন।

এখন অবিদ্যা নেই, অবিদ্যা নেই তাই কোন কামনাও নেই। যমরাজের মত আচার্য আর নচিকেতার মত শিষ্য যেখানে সেখানে অবিদ্যা কি করে থাকবে! শুধু তাই না, *অন্যোহপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব*, এই যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচনা করা হল, এখানে যেমনটি বলা হয়েছে, এটাকে যে শুনবে তারও একই জিনিষ হবে, তারও মুক্তি হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্মে exclusive বলে কিছু নেই। মহম্মদ আল্লাকে দেখেছেন, আর কেউ দেখতে পারবে না, মোজেস দেখছেন আর কেউ দেখতে পারবে না, এই জিনিষ হিন্দু ধর্মে কোথাও পাওয়া যাবে না। আমাদের এখানে ভক্তিশাস্ত্রে পরের দিকে অবতার তত্ত্ব এসেছে, সেখানে বলা হয় তুমি সব কিছু হতে পারবে কিন্তু অবতার কোন দিন হতে পারবে না। উপনিষদে আবার অবতার তত্ত্ব নেই, উপনিষদ হল পুরো আত্মজ্ঞানের কথা। সেইজন্য জ্ঞানীরা অবতার তত্ত্ব মানেনই না, আর এর জন্য তাঁদের কোন ভ্রুক্ষেপও নেই। এনাদের কাছে হল, ভাই এটা যদি আপনারই কাহিনী হয়ে থাকে তাহলে আমি জেনে কী করব, আমি সেটাই জানব আমি যেটা হতে পারি, যেটা আমার কাজে লাগবে। কি কাজে লাগবে, কি হতে পার? যমরাজের কাছে নচিকেতা যে বিদ্যার কথা শুনলেন, যেটা শোনার পর নচিকেতা মৃত্যুর পারে চলে গেলেন, ধর্মাধর্মের পারে চলে গেলেন, সেই বিদ্যাকে যে কোন লোক যদি অধ্যয়ন করে, অধ্যয়ন করার পর যেমনটি ভাবার্থ তেমনটি ভাব নিয়ে বোঝে তারও নচিকেতার মত একই ফল হবে। বলছেন, এখানে কোন ধরণের উপাচার থাকবে না। আত্মা যেমনটি তেমনটি যখন চিন্তন করে তখন নচিকেতার যা হয়েছে তারও ঠিক তাই হয়। সেও তখন ধর্ম আর অধর্মের পারে চলে যায়, সেও বিরজ হয়ে যায়। এটাই এই মূন্ত্রের মূল বক্তব্য। উপনিষদ বলতে ঠিক ঠিক যেটা বোঝায় সেটা পনের নম্বর মন্ত্রে শেষ হয়ে যাচ্ছে। লাটু মহারাজ আঠারো নম্বর মন্ত্র শোনার পর বলছেন, কঠোপনিষদ শোনার পর যদি আত্মজ্ঞান না হয় তাহলে কঠোপনিষদ শোনা বৃথা। লাটু মহারাজ কঠোপনিষদ শুনতেন, শোনার পর এখানে তিনি জোর দিচ্ছেন।

কঠোপনিষদের যে আত্মতত্ত্ব এই আত্মতত্ত্বের সাথে নিজের যে আত্মা যেমনটি আছে তেমনটি ভাবে যদি কেউ ধরে রাখতে পারেন তাহলে তিনিও অমর হয়ে যাবেন। আসলে আমরা হলাম অত্যন্ত সাধারণ লোক, আমরা ভাবতে চাই না, চিন্তন করতে ইচ্ছে করে না, আমরা নিজেদের শরীর মন রূপেই বেঁধে রেখেছি, এই উচ্চ তত্ত্বকে নিয়ে চিন্তন করা তাই আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। কিন্তু যিনি নিজেকে এই উচ্চ তত্ত্বের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নচিকেতা যেমন অমর হয়ে গেলেন তিনিও সেই রকম অমর হয়ে যাবেন। আমরাও এই প্রার্থনা জানিয়ে কঠোপনিষের এই দীর্ঘ আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বী নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।
।।শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।।